মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল

ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম
ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা

অনুবাদঃ ড. আব্দুল্লাহ্ আল্ মা'রূফ

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল

ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা

ড. আবদুল্লাহ আল মা'রূফ
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ঃ ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা
মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল
ড. আবদুল্লাহ আল মা'রূফ অনূদিত

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৩৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯৫৬.৯৪
ISBN : 984—06—0778—2

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৩
পৌষ ১৪১০
শাওয়াল ১৪২৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

বর্ণ সংযোজন
মাহফুজ কম্পিউটার
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (৪র্থ তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি
১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

PHILISTINER MUKTI SANGRAM : YAHUDI SHARAJANTRA O ARABDER BHUMIKA (The Liberation War of Palestine : Conspiracy of the Jews and Arab's stand) : Written by Muhammad Hasnain Haykal, translated by Dr. Abdullah Al-Ma'ruf into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka – 1207.

December 2003

Price : Tk 200.00; US Dollar : 7.00

প্রকাশকের কথা

ইসলামের ইতিহাসে এক বেদনা-বিক্ষুব্ধ অধ্যায়ের নাম ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম। অসংখ্য নবীর স্মৃতিধন্য ও মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মোকাদ্দাস-এর পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন আজ ইহুদীদের কবজায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পরাশক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ মদদে সেখানে ইহুদীরা জবরদখল করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে প্রতি মুহূর্তে মুসলমানদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর যেখানে ঘনিষ্ঠ অবস্থান তারই এক কৌশলগত স্থানে ইহুদীদের এ রাষ্ট্র সংস্থাপিত। সাধারণভাবে সবাই জানে যে, মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ কুক্ষিগত করা ও বিভিন্ন স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনেই এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে লালন করা হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে এর ভিত্তি রচিত হয়, কারা এর মদদ যোগায়— ইতিহাসের সেইসব খলনায়ক তখন পর্দার আড়ালে কি সব ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিল, আরবদের ভূমিকাই বা কি ছিল, সেইসব অনেক অজানা তথ্যের প্রামাণিক বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল রচিত "আল মুফাওয়াফাতুম সিররিয়্যাহ বাইনাল আরব ওয়া ইসরাইল" গ্রন্থটিতে।

লেখক মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল ইতিহাসের এইসব ঘটনার এক বিরাট অংশের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আরব জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের-এর কেবিনেটে তথ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি মিসরের প্রধান দৈনিক বিখ্যাত আল-আহ্‌রামের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ইউরোপ-আমেরিকার বহু ক্ষমতাধর ব্যক্তির সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুবাদে তিনি অনেক অজানা তথ্যের প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। সেসব ডকুমেন্টের ভিত্তিতে তিনি এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন, যা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি গ্রন্থটিতে সময়ানুক্রমিক ধারায় ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকার বিশ্লেষণ করেন। আরবদেশগুলোর নেতৃত্ব যখন দিকভ্রান্ত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী থাবা তখন ভয়ঙ্করভাবে বিস্তারিত; মার্কিন প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা ইহুদীদের কূটকৌশল তখন ইসরাইলীদের সহযাত্রী। রাশিয়াও চাচ্ছিল ইহুদীদেরকে তার দেশ থেকে বিদায় করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে।

এই গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে বলে মনে করি। এ বিষয়ে আগ্রহী সাধারণ পাঠকরাও এতে অনেক মূল্যবান নতুন নতুন তথ্য পাবেন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ আমাদের কর্তব্য স্থির করা প্রয়োজন। এক উম্মাহ্ চেতনা নিয়ে জাগ্রত হওয়ার সময় এখন। এ দিক থেকে এই গ্রন্থটি আমাদের চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বইয়ের ইংরেজি ও আরবি সংস্করণগুলো যেভাবে দেশে দেশে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে, বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে এর বাংলা অনুবাদটি তেমনি গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মূল গ্রন্থকার মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল ও অনুবাদক ড. আব্দুল্লাহ আল-মারূফকে এ গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে ইসলামের হারানো গৌরব ফিরে পাবার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَالِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ ـ

'ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রাম ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা' শিরোনামের এ বইটির মূল আরবী নাম ঃ 'আল্-মুফাওয়াদাত আস্-সিররিয়্যাহ্ বাইনাল আরব ওয়া ইসরাইল'। গ্রন্থকার মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল লেখক জগতে এক জীবন্ত কিংবদন্তির নাম। তিনি মিসরের ঐতিহ্যবাহী দৈনিক 'আল-আহরাম'-এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ইতিহাস বিখ্যাত আরব জাতীয়তাবাদের নেতা মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন্ নাসেরের মন্ত্রীপরিষদে মুহাম্মদ হাইকল পর্যায়ক্রমে তথ্যমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। উপরিউল্লিখিত গ্রন্থটি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কালজয়ী রচনা।

এই বইটিতে তিনি দুষ্প্রাপ্য ও গোপনীয় দলীলাদির সাহায্য নিয়ে বিপুল মূল্যবান তথ্যভিত্তিক এক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে ফিলিস্তিন ইস্যুর সূচনাপর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রবহমান ঘটনার আড়ালে নেপথ্য নায়কদের ভূমিকাগুলোও তুলে ধরা হয়েছে এতে। এক কথায় এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করার জন্য এ গ্রন্থটি তুলনাহীন।

এই বইটি ইংরেজিতে প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই ৬টি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। পরে গ্রন্থকার নিজেই বর্ধিত কলেবরে আরবিতে বইটি প্রকাশের পর আরব বিশ্বে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। 'দৈনিক জনকণ্ঠ'-এর উপদেষ্টা সম্পাদক বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের একান্ত আগ্রহে এর অনুবাদ দৈনিক জনকণ্ঠে প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সারা দেশে বহু আগ্রহী পাঠক এ লেখার কাটিং নিজস্ব সংগ্রহে রাখেন এবং টেলিফোনে ও পত্র দিয়ে এ ধরনের একটি লেখার জন্য সাধুবাদ জানাতে থাকেন। মূল গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫২৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

ফিলিস্তিন ইস্যুর প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আগ্রহ ও অনুভূতি সকলের জানা। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণার প্রাক্কালে এ ধরনের গ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট সমাদৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য, হাইকল-এর ভাষা হৃদয়ঙ্গম করে তা পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অবহিত আছেন। সচেতন পাঠক মহল এ অনুবাদকে স্বাগত ও সাধুবাদ জানিয়েছেন, এটা একজন অনুবাদকের জন্য সবচেয়ে শোকরিয়ার বিষয়।

আল্লাহ্ আমাদেরকে মুসলিম বিশ্বের কল্যাণে অবদান রাখার তৌফিক দিন। আমীন।

ড. আব্দুল্লাহ্ আল্-মা'রুফ
৫৬/১-এ পলাশ নগর,
মিরপুর, ঢাকা – ১১

সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

(মূল ৭-১৪পৃ.)

এই বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ হাসানাইন হাইকল একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত মিসরীয় লেখক। ইনি মিসরের বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক 'আল্-আহ্‌রাম'-এর সম্পাদক এবং জামাল আব্দুল নাসের মন্ত্রীসভার সদস্য।

এই গ্রন্থটি ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনে ইংরেজিতে। ঐ বছরই লেখক নিজে আরো কিছু সমৃদ্ধি ঘটিয়ে এটি প্রকাশ করেন এবং বছর শেষ না হতেই এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ বের হয়।

ফিলিস্তিন সংকটকে ঘিরে যুদ্ধ ও শান্তির ঘুরপাকে অনেক ঐতিহাসিক সত্য তালগোল পাকিয়ে যায়। সে প্রেক্ষিতে জাতিকে ঘটনার ক্রমধারা সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে স্বল্প পরিসরে একটি 'মাকেট' বা মূর্তিমান বাস্তবতাকে পেশ করেছেন।

বইটির প্রথম দিককার পরিচ্ছেদগুলো একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছে ঃ "আরব-ইসরাইল আলোচনা কেন পর্দার অন্তরালে চলছিল ?"

'আরব-ইসরাইল গোপন আলোচনা' আসলে এমন একটি উপাখ্যান, যা বেশ দীর্ঘ এবং এর নায়ক-নায়িকার সংখ্যা দেদার। বৃটেন, ইহুদীবাদী আন্দোলন, উসমানীয় সাম্রাজ্য ও হাশেমী শাসকবৃন্দ এবং মিসর এর মূল পক্ষ হলেও আরো অনেক কিছু এর সাথে সম্পৃক্ত হয় ঘটনার অনিরুদ্ধ পরিণতিতে।

১৯৫২ সালের বিপ্লবের পর মিসরের উপর এর দায়িত্বভার এসে পড়ে। একটি পর্যায়কে নেতৃত্ব দেন জামাল আব্দুন্ নাসের। তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই নেতৃত্ব দিচ্ছিল সার্বিকভাবে। এর মধ্যে ফিলিস্তিন সমস্যাটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণে গোপন আলোচনা ছিল অসম্ভব।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আনোয়ার সাদাতের নেতৃত্বে 'শান্তি' প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে ধারণা করা হয় অথবা কল্পনা করা হয় যে, 'আরবদের কেন্দ্রীয় সমস্যাটির সুরাহা হয়েছে'। এও ধারণা করা হয় যে, এ অঞ্চলের নেতৃত্ব হিসেবে মিসরের এমন কিছু করার অধিকারও আছে বৈ কি। কিন্তু লেখকের বিশ্বাস এসব ধারণা ছিল নিছক কল্পনার

ফানুস। হ্যাঁ, কেউ কেউ ভাবতে পারল যে, যে কারণে তাদের আরাম হারাম হয়ে গিয়েছিল তা দূর হয়ে গেছে; এখন শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

কিন্তু এত কিছুর পর 'শান্তি' তো আসেনি বরং আরবদের কেন্দ্রীয় বিষয়টিও তেমন হালে পানি পায়নি। তবে এটি আরবদের ঐক্যের তন্তু হিসেবে কাজ করছে— এই যা। এমনি করে মিসরও তার যথাযোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অতি সহজেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আরবদের উপর এত দ্রুত পড়ছে যে, মিসরের নেতৃত্ব আর প্রয়োজন নেই।

মিসর যে সময় ইসরাইলের সঙ্গে গোপন আলোচনার উদ্যোগ নিল। ততক্ষণে বেশ দেরী হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনীদের নিজেদেরই অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। তারা পৌঁছে গেল ওসলোতে, এরপর কায়রো, ওয়াশিংটন আরো কত স্থানে।

এ ধরনের চলমান বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি পেশ করা অনিবার্য। আর এতে পাঠক যেন বিরক্তি অনুভব না করেন সে জন্য বিষয়ের আবেদন অনুযায়ী বইটিকে তিন ভাগ করা হয়েছে ঃ

১. প্রথমভাগে গোপনীয়তার কারণসমূহ, সাম্রাজ্যবাদের সাথে কিংবদন্তীর সংযোগ, ধর্মের সাথে রাজনীতির মিশাল ও পবিত্রতার সাথে সংরক্ষণের প্রশ্ন এবং অধিকারের সাথে হাতিয়ারের সংঘাত ইত্যাদি পেশ করা হয়েছে, যাতে গোপন আলোচনার প্রেক্ষিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

২. দ্বিতীয়ভাগে মিসরের প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে জামাল আব্দুন নাসেরের সময়কার প্রচেষ্টা যা ছিল সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাল। এবং আনোয়ার সাদাতের যুগ যেখানে বাস্তবে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে এর উজান-ভাটি পরিমাপ করা হয়েছিল।

৩. তৃতীয়ভাগে ফিলিস্তিনীদের পর্যায়কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ সময় অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত উত্তরের ভালুকদের মাঝে তারা ওসলোর দিকে ধাবিত হলো। এর পরই বিস্ফোরিত হলো তারা; যার ধমক এখনো আরব ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনকে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলায় অস্থির করে রাখছে।

(উল্লেখ্য, ইংরেজি সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭২ অথচ আরবি সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ১২০০। তদুপরি রয়েছে অনেকগুলো ডকুমেন্টের সমাবেশ।)

উপক্রমণিকা

এ গ্রন্থটি মূলত একটি প্রশ্নের উত্তরের এক ব্যাপক প্রচেষ্টা। প্রশ্নটি সে সকল প্রশ্নের একটি যা সূচনা লগ্ন থেকে আরব-ইসরাইল সংঘাতকে ঘিরে জন্ম নিয়েছে এবং এর বিবর্তন ও উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে এর সহযাত্রী হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কার্যকারণ সৃষ্টি করে চলেছে।

যে জিজ্ঞাসার জবাবে এই গ্রন্থটি প্রণীত তা হচ্ছে ঃ

কেন এই লড়াই আসন্ন ছিল ? কেন সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরে শান্তি দূরে ছিল ? ... কেন আবার শান্তি আসল— যখন কোন শান্তিই আসল না— এ ধরনের পরিস্থিতিতে, এই অবয়বে এবং এই সব মাধ্যমে ? ... আর কেনইবা শান্তির জন্য এই সকল উদ্যোগ গোপনে হলো— পর্দার অন্তরালে নিকষ আঁধারে— যে সময় শান্তি ছিল স্বভাবতই মানুষের লালিত প্রত্যাশা। আর প্রত্যাশা তো স্বভাবতই জ্যোতি ও আলোর উদ্ভাস।

হ্যাঁ, এটিই ছিল জিজ্ঞাসা। আর এর জবাব আমি উপস্থাপন করছি অত্যন্ত সমীহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে— এই আরব জাতির— বিশেষ করে মিসরের নতুন প্রজন্মের যুবশ্রেণীর নিকট। পরিসমাপ্তিতে তাদের সকলের কাছে ওজরখাহী করা হয়েছে। কারণ এই পৃষ্ঠাগুলোর অধিকাংশ বিষয় তাদের কাছে উইনস্টন চার্চিলের সেই বিখ্যাত উক্তির উৎপ্রেক্ষায় তাদের কাছে উপস্থাপন করা কঠিন ঃ "সেটা ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভীতিকর মুহূর্ত"।

কিন্তু প্রত্যাশা সব সময়ই হতাশার উপর বিজয়ী হয়। এটা সৃষ্টির প্রতি মহান স্রষ্টার এক বিরাট অবদান যে, যখন তাদেরকে জীবনের নেয়ামত দান করলেন তাতে ইচ্ছাশক্তিও দিয়ে দিলেন, তাদেরকে বুদ্ধির নেয়ামতও দিলেন যার মধ্যে রয়েছে স্মৃতিশক্তি!

— মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ	
শক্তি ও সত্য	
পবিত্রতা ঃ সংরক্ষণ	১৭
নেপোলিয়ন	২৪
ব্রিটেন	৩২
মুহাম্মদ আলী	৩৯
বিল মারস্টোন	৪৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	
একটি মানচিত্র তার জমীন খুঁজে ফিরছে	
রোচিল্ড	৫১
ডিজরাঈলী	৫৭
হের্তুজাল	৬৩
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	
উপকূল আর অভ্যন্তর	
ম্যাকমোহন	৭৫
আযীয মিস্‌রী	৮২
মার্ক সায়েক্স	৮৯
শরীফ হোসেইন	৯৭
লরেন্স	১০৪
বেলফোর	১১০
ফয়সাল	১১৫
লয়েড জর্জ	১২০
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	
মিসর আবার ময়দানে ফিরে এসেছে	
বাদশাহ্ ফুয়াদ	১৩৫
বাদশাহ্ ফারুক	১৪০
রাব্বি হায়েম নাহুম	১৪৯
ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট	১৬১
মুস্তফা নাহ্‌হাস	১৬৯
এলিয়ানূর রুজভেল্ট	১৮০
ট্রুম্যান	১৯৩
বেফেন	২০০
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	
শক্তির মালিক কে?	
বেন গোরিয়ন	২১৫
মোশে শার্তুক	২২৭
নাকরাশী পাশা	২৪০
বেন গোরিয়ন-২	২৪৭
বার্নাডট	২৫৯
আ-লোন	২৬৪
সাসুন!	২৭২

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
যুদ্ধের ঘূর্ণিঝড় আর শান্তির বেয়াড়া বাতাস	২৮৭
প্রথম অধ্যায় ঃ	
সীমানহীন এক রাষ্ট্র!	
লোযান	২৯৩
এডেনাওয়ার	৩০২
জামাল আব্দুন নাসের	৩০৭
জেফারসন কাফরি	৩১১
ফস্টার ডালাস	৩২১

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
সুয়েজের ভূমিকম্প
এডেন ৩৪৩
বায়রড ৩৫২
ফয়সল আল্ সউদ ৩৬১
এন্ডারসন ৩৬৯
এন্ডারসন-২ ৩৭৫
আইজেনহাওয়ার ৩৮০

তৃতীয় অধ্যায় ঃ
প্রচলিত-অপ্রচলিত অস্ত্র
কেনেডি ৩৮৯
জনসন ৩৯৭
জুলিয়ান এমরে ৪০৫
১৯৬৭ ৪১৩
নিক্সন ৪২৩
চসেস্কু ৪৩০
রজার্স ৪৪০

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
আনোয়ার সাদাত
যুদ্ধ ও শান্তি ৪৫৬
গোল্ডা মায়ার ৪৫৭
কিসিঞ্জার ৪৬৫
জেনারেল গোর ৪৯১
লিবিয়া ৪৯৯
কিসিঞ্জার–২ ৫০৪
কিসিঞ্জার–৩ ৫১৬

পঞ্চম অধ্যায় ঃ
অসময়ের খেল
ফোর্ড ৫২৫
কামাল আদহাম ৫৩২
বাদশাহ্ হাসান ৫৪০
অ্যান্টিবী ৫৪৯
আল-আহ্রাম ৫৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ
জানুয়ারি ১৯৭৭ ও এর পরের ঘটনা!
কার্টার ৫৭১
বেগিন ৫৮৩
গাদ্দাফি ৫৯২
আল-কুদ্স ৫৯৯
হাসান তেহামী ৬০৯

সপ্তম অধ্যায় ঃ
শান্তির পটভূমি
নেসেট ৬২৩
ওয়াইজম্যান ৬২৮
টেলিভিশন ৬৪২
মুহাম্মদ ইব্রাহীম কামেল ৬৫০
শিমন পেরেজ ৬৬৪

অষ্টম অধ্যায় ঃ
ক্যাম্প ডেভিড ও তারপর!
কার্টার ৬৭১
মোস্তফা খলীল ৬৮৩
খোমেনী ৬৮৭
জীযার পিরামিড ৬৯৬
রোনাল্ড রিগান ৭০৭
পরিশিষ্ট ৭১৫

প্রথম খণ্ড

আরব ও ইসরাইলের মধ্যে গোপন আলোচনা

কিংবদন্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদী রাষ্ট্র
আরবরা কেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি ?
তারা কীভাবে আলোচনা করল ?

ইতিহাস ভবিষ্যতের দিকে চলমান

'হে বোন স্পেন ! তোমাকে সালাম !
তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে
খেলাফত আর ইসলাম।'
– আহ্‌মদ শাওকী

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইতিহাস লেখা নয়— ইতিহাস পড়ার একটি চেষ্টা মাত্র। শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা, বাস্তবতা ও ঘটনার নায়কদের বিভিন্ন বর্ণনা নিয়েই এই সংক্ষিপ্ত সফর। এখানে এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড ও তথ্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও শিক্ষার দিক তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বলা দরকার যে, ইতিহাসের অভিযাত্রা অন্য যেকোন ভ্রমণের মতই একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে শুরু হয় এবং একটি পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়— চাই তা সঠিক হোক বা ভিন্ন। এটাই যে কোন জ্ঞান অন্বেষণের অভিযাত্রার স্বভাব। (হয়তো আমরা লক্ষ্য করে থাকবো যে, ইতিহাস অধ্যয়নের এই চেষ্টা এই গ্রন্থের মূল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হচ্ছে— রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতির সময়কালে বা তার একটু পরে আরব ও ইহুদীদের মধ্যকার যোগাযোগ। এই সময়কার যোগাযোগ ছিল ইতিহাসের বুনোনের সূতোর কিছু অংশ আর এটাই স্বাভাবিক।)

প্রথম অধ্যায়

শক্তি ও সত্য

চিন্তা অথবা কর্মে রাজনীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপের আবেদন হচ্ছে প্রথমে ইতিহাস অধ্যয়ন। কারণ যারা জানে না, তাদের জন্মের আগে কি ঘটেছিল তাদেরকে অনিবার্যভাবে সারা জীবন শিশু হয়ে থাকতে হয়!

॥ ১ ॥

পবিত্রতা ঃ সংরক্ষণ

"প্রশ্ন ঃ শতাব্দীর আরবরা কি উন্মাদনা, কল্পনা বা
অভিযাত্রীর স্বপ্নে পুরোপুরি বিভোর ছিল ?"

সকল মানব উপদলের জীবনেই– সকল মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠা লগ্নে– তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, জীবনাচার, মানসিক ও বস্তুগত নিরাপত্তার স্বার্থে– জন্ম লাভ করে এবং আস্তে আস্তে মজবুত হয় এমন কিছু সংরক্ষিত বিষয় বা বস্তু যা থেকে তারা দূরে থাকে এবং সেগুলোর সীমা মাড়ায় না তারা। এসব বিষয়কে হাল্‌কা মনে করে এগুলোর কোন ক্ষতি করে বসলে তারা মনে করে– সে সব দুঃসাহসী লোকের উপর নেমে আসবে বিধাতার অভিশাপ। তারা এমন অপমান ও লজ্জার সম্মুখীন হবে যে তা থেকে নিজেদের ছাড়ানো অথবা পরিত্রাণ লাভ করা হবে সুকঠিন।

এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা সভ্যতার জীবনে এইসব সংরক্ষিত বিষয়, তা কিন্তু কোন খেয়ালীপনা বা কল্পনাপ্রসূত কোন স্বপ্নচারিতা নয় বরং এগুলো হচ্ছে আসলে তাদের প্রয়োজন, সীমা ও মৌল নীতিরই বহিঃপ্রকাশ। এগুলো এমন কিছু মূল্যবোধ, যা সুস্থ সহজাত প্রকৃতি থেকে উৎসারিত হয় এবং হৃদয়ের গভীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসব জিনিস এক ধরনের স্বতঃসাহায্যপুষ্ট হয় যা এক সময় 'পবিত্রতার' সীমা স্পর্শ করে যা তার অন্তর্গত শক্তি থেকে বিভিন্ন হুকুম-আহ্‌কাম (নির্দেশ) আরোপ করে থাকে। এক সময় এর সাথে শক্তি ও আইনের কার্যকারণ সংশ্লিষ্ট হয়।

এমনকি আসমানী পয়গাম নাযিল হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতা 'পবিত্র ও সংরক্ষিত বিষয়াদি'র সংস্পর্শে এসেছে এবং সহচারী হয়েছে। এই ধারণা মূলত পারিবারিক পরিমণ্ডলেই প্রথম সূচিত হয়, তখনো এটা ছিল গুহার কোলে এবং তার অন্ধকারে। এরপর বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার অন্তর্লোকে সে প্রবাহিত হতে চলল এবং সময়ের ব্যবধানে তা বিকশিত হলো এবং তার আবাদ সমৃদ্ধ হলো। এটা ছিল সবসময় সুরক্ষিত। এই ধারায় চলে এসেছে যেমন– মা তার ছেলের জন্য হারাম, কন্যা তার পিতার জন্য এবং ভাইয়ের জন্য বোন। এভাবেই রক্তের পবিত্রতা, স্বত্বের পবিত্রতা, চুক্তি ও ওয়াদার পবিত্রতা, স্থানের পবিত্রতা, আত্মীয়ের পবিত্রতা, প্রতিবেশীর পবিত্রতা এমন কি দেবতার পবিত্রতা।

বস্তুত এইসব পবিত্র ও সংরক্ষিত বিষয়ের ধারণা মানুষের প্রাথমিক বিশ্বাসগত দিক যা তাদের অনুভূতি, অন্তর ও মজ্জাগত বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। এগুলোকেই পরবর্তীতে আসমানী শরীয়ত, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রণয়নকারীরা নিশ্চিত করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই এই সকল পবিত্র ও সংরক্ষিত বিষয় ও বস্তুগুলো তার লক্ষ্যভেদী পরাক্রম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্যই যে বিষয়ের ফয়সালার ব্যাপারটি খোদ শরীয়ত শেষ বিচারের দিনের জন্য বাকি রেখে দিয়েছে এবং যা কোন রাষ্ট্রের চোখেও অদৃশ্য এবং যা কোন আদালতেরও নাগালের বাইরে, সে সম্পর্কেও মানুষ তার এই 'পবিত্রতা ও সংরক্ষণের' বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও আরবি ভাষা এমন কোন শব্দ ধারণ করেনি যা দিয়ে এই 'পবিত্র ও সংরক্ষিত'কে সম্যকভাবে বোঝানো যেতে পারে যা 'Taboo' শব্দটি ধারণ করে আছে। সম্ভবত– অন্যান্য অনারবীয় ভাষাও এ ধারণার চিত্রায়ণে সফল হয়নি বলেই এই ইংরেজি 'Taboo' বিশ্বব্যাপী এত প্রচার ও প্রসার পেয়েছে যে বিশ্বের বেশ কিছু ভাষায় এ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে– মানুষের জটিল ও বিক্ষুব্ধ একটি অবস্থা বর্ণনায়– বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার অভিজ্ঞতার গভীরে, যেটি মানুষের আবেগ ও হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি কার্যকারণ হিসেবে তাদের অবচেতন মনে বাসা বেঁধে আছে এবং যথাসময়ে সেখান থেকে মানুষের চৈতন্য ও মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বভাবতই, প্রগতির আন্দোলন ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো এ দু'টি বিষয় কোন একদিন বৈধ ছিল– নিষিদ্ধ হওয়ার আগে– যেমনটি এ দু'টি জিনিস কোন এক কালে প্রশ্নাতীতভাবে প্রভাব বিস্তারকারী এই 'পবিত্রতা'কে ঝেড়ে ফেলে দিতেও সক্ষম, প্রকৃতপক্ষে তা-ই হয়েছিল। বুদ্ধিবৃত্তি সকল কুসংস্কারকে বাতিল করে দিয়েছে, জ্ঞান-কৌশল দূর করে দিয়েছে জ্যোতিষীকে। যেমনি করে তাওহীদের পয়গাম মূলোৎপাটন করেছে জড় দেবতাদের খোদা হওয়ার দাবিকে। কিন্তু এটা করতে প্রয়োজন হয়েছিল প্রচণ্ড চিন্তাশক্তির, আসমানী অবতারণার। এর চেয়েও বেশি প্রয়োজন হয়েছিল এক ব্যাপক ও বিরাট লড়াইয়ের। তারপর সত্য বিজয় লাভ করল এবং মানুষ আলোকোজ্জ্বল সেই পথকে অনুসরণ করল।

প্রায় শতাব্দীকাল ধরে– ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশ পর্যন্ত– আরব জাতি জায়নিস্টদের মোকাবিলা করল, তারা স্বপ্ন দেখতে থাকল নিজেদের রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের। কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তর পাড়ি দিয়েছে অধিকাংশ পথ এমন উপলব্ধি থেকে যাতে সংমিশ্রণ ছিল এই 'পবিত্রতা ও নিষিদ্ধ'-এর বিশ্বাস। আর এটাই 'নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত' বিষয়াদি সৃষ্টি করেছিল যাকে তারা 'Taboo' বলে আখ্যায়িত করে। এই মোকাবিলা পৌঁছে গেল সর্বশেষ প্রত্যাখ্যানের স্টেশনে যা কখনো কখনো যুক্তির সীমাও ছাড়িয়ে গেল।

তবে এই প্রত্যাখ্যান কোন পাগলামো বা উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত সংশয় থেকে উৎসারিত ছিল না। এটা কোন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা উপদলের স্বার্থের সংঘাত থেকেও আসেনি যাদের স্বপ্ন ছিল পতনশীল জনগণের মধ্যে ভয় ও প্রলোভন সৃষ্টি করে নিজেদের মর্যাদা প্রকাশ করবে এবং এ লক্ষ্যে তারা এমন কোন শত্রুর সন্ধান করবে যাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে এবং তাদের মুখের উপর বন্দীত্বের লেলিহান শিখা ফুঁকতে পারে এবং বোবাকান্না জাগাতে পারে তাদের হৃদয়ে!

বস্তুত আরব জাতি তাদের বিভিন্ন শাখা সত্ত্বেও অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। তাছাড়া এমন কল্পনা করাও কঠিন যে, পুরো একটি জাতিকে উন্মাদনায় পেয়ে বসেছিল। এমন কল্পনাও করা যায় না যে, একশ' বছর ধরে গোটা একটি জাতি কল্পনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল।

অপরদিকে এই প্রত্যাখ্যানের অবস্থানটি কোন ওহী বা প্রত্যাদেশ ছিল না অথবা কোন দল বা ব্যক্তির নির্দিষ্ট সীমানায় বা নির্দিষ্ট বয়সের কোন খেয়াল খুশী ছিল না। কারণ আরবের তিনটি রাজ পরিবার মিসরে মুহাম্মদ আলী পরিবার, হাশেমী পরিবার— বিশেষ করে বাগদাদে এবং সউদী পরিবার রিয়াদে– তারা সবাই নিজেদের অবস্থান 'প্রত্যাখ্যানেই' রেখেছে– যদিও কেউ কেউ কখনো কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা করেছে। এভাবে স্বাধীনতা দাবির পর্যায়ে এবং এর অব্যবহিত পরে সিরিয়া, মিসর, ইরাক, লেবানন, সুদান, মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনেসিয়ার সকল শক্তি, ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল এবং এর সাথে আরব উপদ্বীপ ও উপসাগরের সকল সুলতান, আমীর ও শেখ শাসিত দেশের সকল পক্ষ এই 'প্রত্যাখ্যানের' পক্ষেই নিজের অবস্থান রাখেন। আর এ অবস্থানে প্রত্যেক দেশের বাদশাহ্, সুলতান, শেখ ও রাজনৈতিক নেতাদের চেয়েও সেসব দেশের জনগণ অগ্রগামী ছিল। এছাড়া আরব বিশ্বের ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সবসময় সংখ্যাগুরুর উপর চাপ সৃষ্টি করত এবং তাদেরকে একই অবস্থানে প্রতিযোগিতায় নামাত।

এই বিপুল সমাবেশের সাহচর্যে, বাদশাহ্, সুলতান ও শেখদের প্রাসাদে, রাজনীতি, ক্ষমতা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, শহর, গ্রাম, মরু-ময়দানে চিন্তা-চেতনা, শিল্প-সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে জাতির মেধা ও মনন– কি গানে-কবিতায়, কি চিত্রে–সমাবেশে, কি বর্ণে কি ছায়ায়– সব কিছু– কোন ব্যত্যয় ছাড়া– এই অবস্থানকেই কেবল স্বাধীন সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে বাঙ্ময় করে তুলছিল।

যখন সময় বদলালো এবং পঞ্চাশের দশকে পরিস্থিতি গেল পাল্টে আর মিসরে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং এর উত্তাল তরঙ্গমালা আছড়ে পড়ল মহাসাগর থেকে উপসাগর পর্যন্ত, তখন অনেক কিছুই দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিল। কেবল বিদায় নিল না ইহুদীবাদ (জায়নিজম) ও ইসরাইল সম্পর্কে সেই অবস্থানটি।

বরং সম্ভবত সে 'অবস্থানটি' আরো বেশি মজবুত ও শক্তিশালী হলো এমনকি এটা মুক্তি, ঐক্য এবং সার্বিক উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষার সাথে অন্যতম অঙ্গ হিসেবে মিলেমিশে গেল।

আর এটা রক্ষণশীল যুগ বা নয়া যুগে যুদ্ধের উন্মাদনা ছিল না বরং এটা ছিল প্রথম ও প্রধানত শান্তিরই অন্বেষা।

তখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক– চাই জাতি হোক বা রাষ্ট্র– এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এমন কি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতেও একটি সমঝোতা ও সমর্থন ছিল আরবদের 'প্রত্যাখ্যানের' অবস্থানের পক্ষে, যা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। তাদের ন্যায্য দাবি ন্যায়নিষ্ঠ শান্তির প্রতি ছিল সমঝোতা ও সমর্থন। এই সমর্থনের প্রতিফলন ঘটেছে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতিনিধি ও আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্তগুলো এমন সুশৃঙ্খলভাবে একটার পর একটা গৃহীত হতে লাগলো যে এটাকে তোষামোদি বা মুখরক্ষা বলা যায় না। উপরন্তু সে সময়কার বৃহৎ শক্তি এর সঙ্গে কেবল ঐকমত্য বা সমর্থন প্রকাশই করেনি বরং কথাকে কাজ দিয়ে বাস্তবায়নে এগিয়ে গিয়ে এই 'অবস্থানের' দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, অন্য বৃহৎ শক্তি তার (ইসরাঈল) সাথে অসহযোগিতা করেছিল, তার সাথে কারবার ও লেনদেন রাখেনি। এবং বহুবার তার কর্মকাণ্ডে নিন্দাবাদ করেছে, অস্ত্রের চালান দেওয়াতে গড়িমসি করেছে ঐ অবস্থানকে সাহায্যপুষ্ট করার লক্ষ্যে।

তখনকার পর্যায়ে এটা কোন উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ বা সংশয়ের প্ররোচনা বা অভিযাত্রার নেশা ছিল না বরং এ ছিল 'পবিত্রতা ও নিষিদ্ধির' ডাকে সাড়া দেওয়া মাত্র ঃ এর পিছনে ছিল অনেক বাস্তব কার্যকারণ ঃ ঐতিহাসিক ও মানবিক, সুপ্ত অথবা প্রকাশমান– যা ছিল অনুভূত এবং তার যুগ ও বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তারকারী, যেমনটি সেটা ছিল তার অধিবাসী ও সহযাত্রীদের জন্যও প্রভাবশালী।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা যা মূলত আংশিক এবং 'পবিত্র ও সংরক্ষিত'-এর চাহিদার প্রেক্ষিতে যে মূল্য দিতে হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। এই উম্মাহ যা করছে তা অবধারিত ছিল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল। না হয় এই সুদীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা করতে হয়েছে তার কোন অর্থ হয় না। এই সুদীর্ঘ দুঃখময় ও ভয়ঙ্কর সময়ে দেখেছে দু'টি মহাসমর– প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দেখেছে তিনটি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঃ বৃটিশ, ফ্রান্স ও সোভিয়েত সাম্রাজ্য। প্রত্যক্ষ করেছে চারটি ক্লান্তিদায়ক স্পটের (Phenomenon) উন্মেষ ও পিছুটান ঃ সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্য, ফ্যাসিবাদ ও সমাজবাদ।

সেই ভয়ঙ্কর দুঃসময়টি একই সাথে বড় বড় দিগ্বিজয় ও প্রতিশ্রুতিরও সময় ছিল। এর পরে পাঁচটি যুগ এলো ঃ বিদ্যুতের যুগ, আণবিক শক্তির যুগ, ইলেক্ট্রোনিক যুগ, মহাকাশ যুগ ও তথ্য বিপ্লবের যুগ।

ভয়ঙ্কর দুঃসময়টি জাতির মন থেকে মুছে যায়নি, যখন সে তার জন্য অবস্থান গ্রহণ করছে। এমনিভাবে ভবিষ্যতের অন্তরে যে বিজয় আর প্রত্যাশার যুগ ঘুমিয়ে আছে তাও তার মন থেকে উবে যায়নি। মূলত যা ঘটেছে তা হচ্ছে— এ জাতি বিপদ আর প্রত্যাশা দুটোর উপরই হামলা করে বসেছিল। এবং সকল শক্তি দিয়ে কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে এবং একই সময় আন্দোলনও করেছে। আসলে 'পবিত্র ঃ সংরক্ষিত'-এর প্রতি আকুল প্রয়াসের প্রেক্ষাপটেই উভয় ব্যাপারেই এ প্রত্যাশা করেছিল যেন বিপদ এবং বিজয় ও প্রতিশ্রুতি যেন ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে আসে। কিন্তু এ উম্মাহর ভাগ্যলিপি ছিল মোটামুটি ভারসাম্যপূর্ণ– যতটুকু পরিস্থিতি তাদের সুযোগ দিয়েছিল, সে অনুসারে। কারণ এই উম্মাহ্ প্রথমেই হত্যাযজ্ঞ দিয়ে তার মোকাবিলা শুরু করেনি বরং সে প্রাধান্য দিয়েছে যেন তার দায়িত্বশীলতা বোধগম্য হয় 'পবিত্র বিষয়াদি ঃ সংরক্ষিত বিষয়াদি'-এর প্রেক্ষিতে প্রথমটি থেকে বিরত থাকবে, দ্বিতীয়টি ধারণ করবে।

এই উম্মাহ্ ১৯৪৮ সালে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেনি বরং দু'বারই তার লড়াই ছিল আত্মরক্ষামূলক, একবার সফল হয়েছিল, অন্যবার সফল হয়নি।

আর যেহেতু সে ১৯৬৭ সালে সফল হয়নি তাই এটা অনিবার্য হয়ে দেখা দিল যে, সে যেন সূচনাপর্বের ভূমিকা নেয় এবং আত্মরক্ষার বৈধ অধিকারের ভিত্তিতে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। সেই কাজটি করেছিল মিসরী ফ্রন্ট থেকে রক্তভেজা যুদ্ধে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত। এরপর আত্মরক্ষার অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হতে হতে অক্টোবর ১৯৭৩ এর যুদ্ধে চূড়ান্ত রূপ নিল।

সে যুদ্ধে— যেখানে এ জাতি 'পবিত্র ঃ সংরক্ষিত' নীতি গ্রহণ করেছিল– আত্মরক্ষার সীমা রক্ষা করে চলেছিল— তারা যে মূল্য দিয়েছে এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছে তার হিসাব-নিকাশ এমনই ছিল যে তা প্রত্যক্ষ করে কেউ বলতে পারবে না যে, এটা ছিল নিছক পাগলামো, উদ্ভট কল্পনা বা একটা এডভ্যাঞ্চার। এ প্রসঙ্গে তিনটি ফ্রন্টের ত্যাগ ও কুরবানীর পরিমাণই যথেষ্ট যার সম্পর্কে যথেষ্ট বাস্তব প্রমাণ রয়েছে ঃ

লড়াইয়ের উত্তপ্ত চুল্লি স্বয়ং ফিলিস্তিন ভূমিতে প্রতিরোধ লড়াইয়ের শুরু থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনী জাতি উপহার দিয়েছে ঃ

২৬১,০০০ জন শহীদ,

১৮৬,০০০ জন আহত,

১৬১,০০০ জন পঙ্গু।

এছাড়া প্রায় দু মিলিয়ন ফিলিস্তিনী স্বদেশ ছেড়ে বাইরে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের পরিবারবর্গসহ শরণার্থীতে পরিণত হয়। সে দু মিলিয়ন দেশছাড়া লোক এখন ৫ মিলিয়নে পৌঁছে গেছে। সঠিক সংখ্যা হচ্ছে ৫ মিলিয়ন ৪ লক্ষ।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে ছোট আরব দেশ লেবাননেই এই ক্ষয়ক্ষতি ছিল বীভৎস রকমের। আরব-ইসরাইলী সংঘাত বহুগুণ হয়ে এটা গৃহযুদ্ধের রূপ লাভ করেছিল। এই যুদ্ধ যখন শেষ হলো, তখন পর্যন্ত এ দেশটি দিয়েছে ঃ

৯০,০০০ জন শহীদ,
১১৫,০০০ জন আহত,
৯,৬২৭ জন পঙ্গু।

এবং ৮,৭৫,০০০ লোক স্বদেশ ছেড়ে বাইরে হিজরত করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আরব দেশ— যে দেশটি ব্যাপক আরব প্রচেষ্টার নেতৃত্বের ভার বহন করছে– সেই মিসর পেশ করেছে ঃ

৩৯,০০০ জন শহীদ,
৭৩,০০০ জন আহত,
৬১,০০০ জন পঙ্গু।

এ ছাড়া সুয়েজখাল এলাকার প্রায় দু মিলিয়নের বেশি লোক তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে নিজ দেশেই দু'বার করে হিজরত করতে হয়। একবার ১৯৫৬ সালে, দ্বিতীয় বার ১৯৬৭ সালে।

আরো কিছু আরব দেশ আছে যারা অনেক মূল্য দিয়েছে। যেমন সিরিয়া ও ইরাক। যদিও আমার কাছে এখন সূক্ষ্ম পরিসংখ্যান নেই। তবুও যুদ্ধের মূল কেন্দ্রবিন্দু ফিলিস্তিনের দেওয়া মূল্য ও লেবানন (আশেপাশের সবচে ছোট দেশ) এবং মিসর (পক্ষগুলোর সবচে বড় দেশ) যে মূল্য দিয়েছে সে অনুপাতে হিসেব করলে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে— যেহেতু সঠিক তথ্য হাতে নেই।

এই 'পবিত্র ঃ সংরক্ষিত'-এর অবস্থানের জন্য আরো কিছু মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু সময়, শ্রম আর সম্পদ ইত্যাদি যে কোন মূল্যের চেয়ে যে কোন অবস্থায় রক্তের দাম সবসময়ই বেশি! মূল্যায়নের মানদণ্ড বদলাতে শুরু করেছে সেই ১৯৭৪ সাল থেকে। যখন ১৯৯৪ সাল এল তখন চাকা পুরোই ঘুরে গেল।

সংরক্ষিত হওয়ার সকল কারণ মুখ থুবড়ে পড়ল। এমনিভাবে পবিত্রতার সকল আবেদনও দূরীভূত হলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে কিছুসংখ্যক বাস্তবতা ও মূল্যবোধ আদৌ পাল্টালো না। বিপ্লবের কারণ কিন্তু এমন কোন বুদ্ধির দ্বীপ্তি ছিল না যা অকস্মাৎ ঝলকে উঠেছিল, আর না তো কোন কৌশল উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল অথবা আসমানী ওহী নাযিল হয়ে মানুষের কাছে নতুন শরীয়ত-সংবিধান নিয়ে হাজির হয়েছিল।

বিপ্লবের আসল কারণ ছিল— (আসল অবস্থানকে উন্মাদনা, কল্পনা আর অভিযাত্রার রোমান্স বলে অপবাদ দেওয়া ছাড়াও) পরিস্থিতি বদলে গেছে বলে জনমত

সৃষ্টি করা। আসলেও পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছিল প্রতিনিয়ত ও অনবরত। পৃথিবী ও যুগের সংযোগ যাচ্ছিল বেড়ে, তাই। আর এসবই হচ্ছিল মানব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এবং গুহার অন্ধকার থেকে চাঁদের পীঠে তার দুর্নিবার অভিযাত্রার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে।

হ্যাঁ, পার্থক্যের দিক ছিল এই যে, পরবর্তীটি তুলনামূলকভাবে চেতনা ও জ্ঞানের দিক থেকে বেশি ছিল। কারণ সে মানবেতিহাসের জমীন বরং রূপকথার মধ্যে তার স্থানেই পড়েছিল এবং 'পবিত্র জিনিসগুলো' এর উপরই ছিল অনড় এবং সেই সংরক্ষিত বিষয়াদির প্রতিটি ছিল অবিচল।

সেটি– দু হাজার বছর অনুপস্থিত থাকার দাবির পরও এখনো নাকি 'ইসরাইলের দেশ' 'আল্লাহ্র মনোনীত জাতি', 'দাউদের রাজ্য', 'তাল্মূদ', 'আওরসালীম', 'ইয়াহুদা', 'সামেরাহ'-এর রাজ্য এবং 'সুলাইমানের হাইকাল', 'কাদানিয়া দেওয়াল', 'তীহ', 'হোলোকস্ট' এটা আসলে নিরাপত্তার চোরাবালি, যেখানে স্বস্তির কোন পথ নেই। তবে একটি বস্তুই এইসব সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের মধ্যে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে রয়ে গেল আর তা হচ্ছে— দু'শো পারমাণবিক বোমা!

॥ ২ ॥

নেপোলিয়ন

'হে ইহুদীগণ ! জাগো, এই তো সময় !'

— বিশ্বের ইহুদীদের প্রতি এক আহ্বানে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

'পবিত্রতা ও সংরক্ষণের' নীতি জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের জীবনেও সূচিত হয়, যেমনটি এ নীতির উন্মেষ ঘটে বিভিন্ন সমাজ ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে। আর এর পেছনে থাকে শক্তিশালী সব কারণ। বিবেক এবং হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু বাস্তব আবেদনের প্রেক্ষিতে এসব কারণ লালিত হয়। কালের অনিরুদ্ধ ধারায় সময়ের ব্যবধানে এসব কারণের সংখ্যা হয়তো বিলীয়মান হয় কিন্তু এগুলোর প্রভাব আবেগের গভীরে বাসা বেঁধে থাকে। এটা ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন বিভিন্ন মানুষের মধ্যে থাকতে পারে তেমনি সামষ্টিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে থাকতে পারে। তখন তারা সে আবেগের অস্ফুট আহ্বানে এমনি বিশ্বাসে সাড়া দিয়ে থাকে যে, তারা সত্যের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা গভীরভাবে কোন না কোনভাবে বিশ্বাস করে যে, সেটির নিরাপত্তাই তাদের নিরাপত্তা।

ইহুদীবাদ ও ইসরাইলের প্রতি আরবদের এই 'পবিত্রতা ও সংরক্ষণের' বিশ্বাসটি জন্ম লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে– যে শতাব্দী তার পরবর্তী যুগের উপর আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তারে অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দী ....।

সর্বকালের সর্ববৃহৎ ও ভয়ঙ্কর এই ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে গোটা বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের বিরাট বিরাট আবিষ্কারের সাথে সাথে ব্যস্ত ছিল চারটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে, যেগুলো পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটিয়েছে এবং শতাব্দীর গুরুত্বকে কুক্ষিগত করেছেঃ

১. জাতীয়তাবাদ ঃ ফরাসী বিপ্লবের ফলে এই চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং প্রতিটি জাতি তার নিজস্ব শিকড় সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকে নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, ভাগ্য নির্মাণে নিজেদের অধিকার এবং স্বাধীন ও সামাজিক রেনেসাঁর অন্বেষণে ব্যপৃত হয়।

২. উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা এবং এ নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ এই দৌড়ে তিনটি শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল— বৃটিশ সাম্রাজ্য, ফরাসী সাম্রাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্য। এরা তাদের সেনাদল, নৌবহর এবং বাণিজ্য-কোম্পানীসমূহ বা খৃস্টান মিশনারী দলসমূহকে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে

পাঠাতে লাগল। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পতাকাই উঁচু করে ধরেছিল। প্রয়োজনে অন্যদের স্বার্থহানি করা বা বঞ্চিত করাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩. **প্রাচ্যবিষয়ক নীতি ঃ** এ নীতির শীর্ষে ছিল উসমানীয় খেলাফতের উত্তরাধিকারকে রহিত করার প্রক্রিয়া। তখন এ খিলাফত ছিল এমন এক সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য যা কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশ্বের বক্ষস্থলে তার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এটি তখন দক্ষিণ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বহু ভূখণ্ডকে তার কব্জায় রেখেছিল। কিন্তু একসময় তাকে দুর্বলতায় পেয়ে বসেছিল আর তাই রুগ্ন ও অক্ষম হয়ে পড়ায় তার ইউরোপীয়, এশীয় ও আফ্রিকান মালিকানা পরিণত হয়েছিল সুস্থ-সবল বিজয়ীদের উত্তরাধিকার সম্পদে। কিন্তু তারা এই গনীমত ভাগাভাগির বেলায় কোন ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়, যদিও পতনশীল খিলাফতের সম্পদ বা তার বাইরেরও বিভিন্ন অঞ্চল, উপজাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর উপর তাদের আধিপত্য বজায় ছিল। কালো পর্দার অন্তরালে বিজয়ীদের সিদ্ধান্ত ছিল 'ইউরোপের এই রুগ্ন মানব'-এর মৃত্যুর ঘোষণা বিলম্বিত করা। (হ্যাঁ, এটাই উসমানী খেলাফতের তখনকার বহুলপ্রচারিত 'উপাধি' ছিল।) যাতে প্রত্যেকেই পুরো গনীমত দখল বা সিংহভাগ লাভ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই জীবনমৃত অবস্থায় উসমানীয় খিলাফত তার অস্তিত্বের বোঝা বয়ে যাচ্ছিল। যখন ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য স্থিরতা লাভ করল তখন বিজয়ীরা নিজেদের হিস্‌সা গনীমতের ভাগ দাবি করা শুরু করল।

৪. **ইহুদীবাদ ঃ** এটি এমন একটি ধর্মীয়গোষ্ঠীর বিষয় যার অনুসারীরা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এ ছাড়া তারা ছিল শত্রুতার শ্যেন লক্ষ্যস্থল, বিশেষ করে যে এলাকাগুলোতে ইহুদীদের ঘনবসতি ছিল যেমন পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া। এ সময় বিশ্বের প্রায় ১২ মিলিয়ন ইহুদীর মধ্যে প্রায় ৯০% ইহুদী রাশিয়া থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করত। এ সময় প্রায়শঃ Pogrom নামক ধর্মীয়, সামাজিক ও স্নায়ুবিক সংঘাত সূচিত বহু রক্তাক্ত আক্রমণের শিকার হতো তারা। Pogrom শব্দটি মূলত রুশ ভাষার শব্দ। এর অর্থ কোন দল বা গোষ্ঠীকে সংগঠিতভাবে ধ্বংস করা। পূর্ব-ইউরোপের ইহুদী ইতিহাস জুড়ে এর ব্যবহার রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী রাশিয়া ও পোল্যান্ডে যখন বার বার ইহুদী নিধনযজ্ঞ চলছিল তখন এ শব্দটি ছিল পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলোতে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ।

সেকালে ইউরোপের কৌশলগত চিন্তা ছিল কিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলোকে একটির সাথে অন্যটিকে বাঁধা যায়। কিভাবে পরস্পর ভিন্নমুখী বিষয়গুলোকে একই সূত্রে গাঁথা যায়। যাতে করে এমন সব রাজনৈতিক মেরুকরণে তাদের ব্যবহার করা যায় যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ও শক্তিগুলোর স্বার্থ চরিতার্থ হয়।

তখনকার সময়ের— এবং পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের বিশ্ব ইতিহাসের এক তারকা— নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ছিলেন এই সব বৈশিষ্ট্য– জাতীয়তাবাদ, উপনিবেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাচ্য বিষয় ও ইহুদীবাদ-এর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনার অগ্রনায়ক। তিনি অভিন্ন রাজনৈতিক কৌশলের খেদমতে এইসবকে একসাথে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে তিনি সর্বশেষ বিষয়– ইহুদীবাদকেই সর্বাগ্রে বেছে নিয়েছিলেন।

বস্তুত নেপোলিয়নের আগে বিশ্বের ইহুদীরা– স্পেন থেকে মুসলমানদের সাথে এক সঙ্গে বের হওয়ার বিয়োগান্ত ঘটনার পর ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। এ সময় তাদের ফিলিস্তিনে ফিরে আসার কথা ছিল নিছক এক পাদ্রীর (হাখাম) বহুকাল পর পর একটি দূরাগত আহ্বান। সম্ভবত প্রতি তিরিশ কি চল্লিশ বছর পর একবার এই কথা উচ্চারিত হতো। তার এই আহ্বানকে মনোযোগের সাথে কেউই হাতে নিত না। বেশি হলে এই মন্তব্য করা হতো যে, এ আসলে কল্পনা-তাড়িত চাপাকান্না মাত্র। কেননা প্রত্যাবর্তনটি হচ্ছে ইতিহাসের সাথে কল্প-কাহিনীর এক দুঃসাধ্য মিশ্রণ। এমনকি বর্তমান কিংবদন্তী অনুসারেও এটি ছিল কিছু ইশারা-ইঙ্গিত মাত্র— যা কোন দিকেই প্রকাশ পায়নি এখনো।

যাহোক, কিংবদন্তীর এই ডাক ইহুদী সমস্যা থেকে ভিন্ন একটি বিষয় ছিল।

কারণ কিংবদন্তীর আহ্বান থাকে অভিলাষের কোলে। আর ইহুদী সমস্যা ছিল আর্থ-সামাজিক বাস্তববাদীদের করতলগত। কারণ ইহুদী সমস্যাটির মূল কারণ হচ্ছে ইউরোপে ইহুদীদের উপর নিপীড়িত সেই নির্যাতনযজ্ঞ। চাই তারা প্রাচীনকাল থেকেই পশ্চিমা বাসিন্দা হোক অথবা যারা বিভিন্ন সময়ে প্রাচ্য থেকে অভিবাসী ঢেউয়ে প্রতীচ্যে আশ্রয় নিয়েছিল।

ইহুদী সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রাচ্য থেকে অভিবাসী ঢেউ হচ্ছে একটি বিব্রতকর পয়েন্ট। কারণ কেউই প্রাচ্য থেকে পশ্চিমে পালিয়ে আসা শরণার্থী ইহুদীদের চায়নি। পশ্চিমের খৃস্টানরা যেমন চায়নি কারণ তাদের দেশের ইহুদীদের প্রতিই তাদের বক্ষ সঙ্কুচিত ছিল, তেমনি খোদ পশ্চিমের ইহুদীরাও তাদেরকে সমপরিমাণে বা তার চেয়ে বেশি অনীহা প্রকাশ করছিল। কারণ পশ্চিমা ইহুদীরা যে যেখানে আছে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। এতদিনে তারা সুচতুরভাবে তাদের অস্তিত্বের দিক থেকে অন্যদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে সফল হয়েছে। যখন তারা প্রাচ্য ইহুদীদের অভিবাসীদের দেখল— যাদেরকে তারা 'অসভ্য' বলে মনে করত— তখন তারা তাদের ভোগ-বিলাসে দীনী ভাইদের ভাগ বসানোর কথা ভেবে খুবই বিরক্তি অনুভব করতে লাগল। এছাড়াও খৃস্টান সমাজে তাদের অবস্থানগত স্পর্শকাতরতারও একটি কারণ ছিল। কারণ তারা চেয়েছিল যে কোন উপায়ে হোক তারা যেন ঐ সমাজের ভেতর মিশে যেতে পারে।

নেপোলিয়নের সেই 'অনন্য' চিন্তা— বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে একই সূতোয় গেঁথে উনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা ছিল কয়েকটি পদক্ষেপের সমন্বয় ঃ

১. ইহুদীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার ব্যবহার যাতে তাদের চেতনাকে জাগ্রত করে তাদের ভাগ্য গড়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার চিন্তা এবং ইহুদীদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র দাবি উত্থাপিত হয়, যে রাষ্ট্র তাদেরকে বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ধার করবে এবং তাদেরকেও স্বস্তি দিয়ে সাথে ইউরোপকে আরেকটু বেশি স্বস্তি দিবে— প্রাচ্য ইহুদীদের অভিভাসী ঢলের ক্রমবর্ধমান বোঝা থেকে।

২. ইহুদীদের ধর্মীয় অনুভূতি ও কিংবদন্তীকে কাজে লাগানো, যাতে ফিলিস্তিনকে প্রতিশ্রুত ও কাঙ্ক্ষিত ইহুদী রাষ্ট্র বানানো যায়। কারণ ফিলিস্তিন তখন উসমানী খিলাফতের আয়ত্তাধীন ছিল— যার উত্তরাধিকার লাভের জন্য তখন প্রতিযোগিতা চলছিল।

৩. যখন ফ্রান্সের পৃষ্ঠপোষকতায় ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটল সেটাই ছিল উসমানি খিলাফতের বক্ষস্থলে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রযাত্রার সূচনা।

৪. যখন এই দিকনির্দেশনা সাফল্য লাভ করবে তখনই ফ্রান্স খিলাফতের উত্তরাধিকার লাভের প্রক্রিয়া শুরু করবে। এতে করে সে অন্যান্য শক্তি ও পক্ষ সক্রিয় হওয়ার আগেই উত্তরাধিকারে বড় ভাগটি বসাতে সক্ষম হবে।

আর যদি অন্যরাও সে অভিমুখে রওয়ানা হয় তাহলেও ফ্রান্স তাদের আগে পৌঁছে সবচেয়ে মজবুত ও সুবিধাজনক স্থানটি দখল করতে সক্ষম হবে। এই ছিল তার চাল।

তখনকার সাধারণ আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট ছিল সকলের সুপরিচিত

* দু'টি সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ভীষণ রকমের– দুটি শক্তির মধ্যে। তারা ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দিকে ধাবিত হয়েছিল। এ দু'টি শক্তি হচ্ছে– বৃটেন ও ফ্রান্স। এ সময় তৃতীয় সাম্রাজ্য শক্তি– রাশিয়া ছিল এশিয়াতে তার বিস্তার ঘটাতে ব্যস্ত। তার স্বপ্ন ছিল কিভাবে চীন সাগর পর্যন্ত পৌঁছানো যায় আর প্রশান্ত মহাসাগরে তো তার আধিপত্য আছেই।
* এদিকে ফ্রান্স তার 'সূর্য-সম্রাট' রাজা চতুর্দশ লুইস-এর যুগের পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুটা প্রত্যাহার করে নিল। কারণ তার দু উত্তরসুরি– পঞ্চদশ লুইস ও ষোড়শ লুইস নিজ নিজ কারণে সাম্রাজ্য বিস্তার থেকে বিরত ছিল। এদের প্রথমজন ছিল 'ভারসাই' প্রাসাদের ভোগ-বিলাস, গান-বাজনা আর জৌলুসে বিভোর। দ্বিতীয়জনকে অবরোধ করে রেখেছিল ফ্রান্স বিপ্লবের ঘূর্ণিঝড়। এ বিপ্লব স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের স্লোগান তুলেছিল এবং বারবনের রাজন্যবর্গকে গিলোটিনের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

* বিপ্লবের পুরুষোত্তম জেনারেল নতুন করে 'চতুর্দশ লুইস'-এর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন এবং ফরাসী সাম্রাজ্যকে বিস্তারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন— এমনকি এতে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে সশস্ত্র সংঘাতও হয়। এ প্রেক্ষাপটেই সেই বিখ্যাত মিসর আক্রমণ যাকে 'বোনাপার্ট' 'নীল অভিযান' নাম দিয়েছিলেন– তার পেছনেও যুগপৎভাবে দুটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল ঃ

১. খিলাফতের উত্তরাধিকার প্রক্রিয়ার সূচনা হিসেবে মিসর দখল এবং সেখান থেকে ফিলিস্তিন ও শাম (বৃহত্তর সিরিয়া)-এর দিকে অভিযান পরিচালনা। ২. তারপর বৃটিশ যোগাযোগ পথকে বিচ্ছিন্ন করার অপারেশন করা। সে সময় এ পথটি ছিল যেন এক একটি মুক্তোর দানা দিয়ে তৈরি একটি হার, যার অপারেশন শেষ দানাটি ছিল বৃটিশ মুকুটে সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন— ভারতবর্ষ।

নেপোলিয়ন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যে কোন বাধা-বিপত্তির মুখেও এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না।

এজন্যই দেখা যায়, মিসর আক্রমণের সময় তার দাবি ছিল যে, তিনি হচ্ছেন মুসলমানদের উসমানী খলীফার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি তখন তার সাম্রাজ্যকে অভ্যন্তরীণভাবে দাসদের হুমকি ও বাইরের খৃস্টান রাজাদের হুমকির মুখে স্থিতিশীল রাখতে আকুল প্রয়াসী ছিলেন। কথিত আছে যে, নেপোলিয়ন ইসলামের সত্যনিষ্ঠ মহান শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনের দাবি করার সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল।

যখন নেপোলিয়ন মিসর থেকে ফিলিস্তিন বা শাম-এর অভিমুখে অভিযান শুরু করলেন তখন তাঁর সেনাদলগুলো আল্-কুদ্স-এর সীমানা প্রাচীর এবং আক্কা ও ইয়াফা প্রভৃতি মুসলিম দুর্গের নিকট থেমেছিল। এখানেই নেপোলিয়ন তাঁর ইসলামী পাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেক ইহুদী পাতা বের করলেন।

নেপোলিয়নের ইসলামী পাতাটি মিসরে প্রকাশিত হয়েছিল মিসরীদের কাছে একথা প্রচারের জন্য যে খলীফার সাথে তাঁর বন্ধুত্ব রয়েছে এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই পাতাটি মূলত ফরাসী অভিযান তার বন্দর থেকে রওয়ানা হওয়ার আগেই ছাপানো ছিল। পক্ষান্তরে নেপোলিয়নের ইহুদী পাতাটি এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও প্রস্তুতির সময়েও সুস্পষ্ট ছিল না। তবে এতটুকু সম্ভাবনা থাকতে পারে যে, নেপোলিয়ন ফ্রান্স ত্যাগের আগেই এর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কিন্তু ইসলামী পাতাটির উপর প্রভাব পড়তে পারে বলে তা প্রকাশ করতে চাননি, কিন্তু এটা প্রমাণিত যে ফরাসী হামলার রূপকারকে কেউ কেউ ফিলিস্তিনের কিছু ইহুদী পাদ্রীর সাথে আগেভাগেই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যেমন মূসা মুর্দেখাই ও জেকোর আল্ জাবী। হয়তো এ ছাড়াও রয়েছে নেপোলিয়নের ইহুদী পাতাটি– যা আল-কুদ্স-এর সীমানা প্রাচীরের নিকট প্রকাশ করেছিলেন– ছিল বিশ্ব ইহুদীদের প্রতি এক আহ্বান,

যা কেবল ফিলিস্তিনেই বিতরণ করা হয়নি বরং একই সময়ে তা ফ্রান্স, ইতালী, জার্মান প্রদেশসমূহ, এমনকি স্পেনেও বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্-কুদ্স-এর প্রাচীর যখন নেপোলিয়নের কাছে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল তখন তিনি যে স্থানীয় পরিস্থিতির মুকাবিলা করেন প্রকৃত সঙ্কটটি তার চেয়ে অনেক বড় ও ব্যাপক ছিল।

বিশ্ব-ইহুদীদের কাছে নেপোলিয়নের আহ্বানটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, আফ্রো-এশিয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক-এর পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনের বৈধ উত্তরাধিকারীদের প্রতি।"

হে ইসরাইলীগণ! হে অনন্য সাধারণ জাতি! যে জাতির নিজস্ব পরিচয় ও জাতীয় অস্তিত্বকে কোন অত্যাচারী বিজয়ী শক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেনি, যদিও তাদের বাপ-দাদার ভূমিকে কেবল ছিনিয়ে নিয়েছে।

বিভিন্ন জাতির ভাগ্য পর্যবেক্ষণকারী সচেতন ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ— যদিও আশ্'ইয়া ও যূঈল-এর মতো নবীদের শক্তি তাদের নেই— তারা তাদের উচ্চ বিশ্বাসের মাধ্যমে অবহিত হয়ে সম্যক উপলব্ধি করেছেন যে, আল্লাহ্র দাসেরা অচিরেই গাইতে গাইতে 'যায়ন'-এ ফিরে আসবে এবং তারা যখন নির্ভয়ে তাদের রাজ্য ফিরে পেতে চাইবে তখন তারা পরম সৌভাগ্য লাভ করবে।

হে 'তীহ্' প্রান্তরে বিতাড়িতগণ! শক্তির সাথে জাগ্রত হও! তোমাদের সামনে এখন তোমাদের জাতির জন্য এক ভয়াবহ যুদ্ধ অপেক্ষা করছে! কারণ এ জাতির শত্রুরা ভেবে বসে আছে যে, তারা তাদের বাপ-দাদার সূত্রে উত্তরাধিকার হিসেবে যে ভূমি লাভ করেছে তা হচ্ছে যুদ্ধে-লব্ধ গনীমতের মাল যা তাদের ইচ্ছেমত ভাগ-বাটোয়ারা করে নিবে ...। দাসত্বের যে জিঞ্জির তোমাদের পতিত রেখেছে সেই লজ্জা তোমাদেরকে ভুলতেই হবে। ভুলতে হবে সেই অপমান যা দু'হাজার বছর ধরে তোমাদের বিবশ করে রেখেছে। পরিস্থিতি কখনো অনুকূল ছিল না যে তোমাদের দাবির ঘোষণা দিবে বা প্রকাশ করবে। বরং এই সব পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতা তোমাদেরকে তোমাদের অধিকারের দাবি থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। এ কারণে ফ্রান্স এখন ইসরাইলের উত্তরাধিকার বহন করে তোমাদের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। আর এ কাজটি করছে ঠিক এখনই— হতাশা আর অক্ষমতার অনেক সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও।

ঐশ্বরিক দান আমাকে যে সেনাবাহিনীর অধিকারী করেছে যারা সামনে বিজয় আর পেছনে ইনসাফ রেখে অগ্রসর হচ্ছে— তারা তাদের কমান্ডের কেন্দ্র হিসেবে আল্-কুদ্সকে নির্বাচিত করেছে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তারা পার্শ্ববর্তী দামেশ্‌কে চলে যাবে, যে দামেশ্‌ক দাউদের শহরকে দীর্ঘদিন অবহেলিত ও অপমানিত করে

রেখেছে। হে ফিলিস্তিনের বৈধ উত্তরাধিকারীগণ! মহান ফরাসী জাতি অন্যদের মতো কখনো জনগণ আর দেশসমূহ নিয়ে ব্যবসা করে না। তাই ফরাসীরা তোমাদেরকে তোমাদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছে এবং সাথে সাথে এর গ্যারান্টি দিয়ে এর সকল দখলদারদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য-সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস জ্ঞাপন করছে।

তোমরা জাগো! দেখিয়ে দাও যে, পরাক্রমী অত্যাচারী শক্তিসমূহ আজও সেইসব বীরের প্রপৌত্রদের সাহসকে নিভিয়ে দিতে পারেনি যাদের ভ্রাতৃজোট ছিল আস্‌বারতা ও রোমের জন্য এক সম্মান এবং দীর্ঘ দু হাজার বছর দাসের মতো ব্যবহার করেও এই সাহসিকতাকে মেরে ফেলতে পারেনি।

দ্রুত অগ্রসর হও, এই তো সময়— এমন সুবর্ণ সময় হয়তো হাজার বছরেও আর ফিরে আসবে না। তোমাদের ন্যায্য অধিকার এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে তোমাদের মর্যাদার আসন পুনরুদ্ধারের দাবি করার এটাই উপযুক্ত সময়। যে অধিকার হাজার হাজার বছর ধরে তোমাদের থেকে হরণ করা হয়েছে তা হচ্ছে— বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটি জাতি হিসেবে তোমাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং তোমাদের প্রভু 'ইয়াহুয়াহ'কে তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করার নিরঙ্কুশ সহজাত অধিকার। তা তোমরা প্রকাশ্যে কর, চিরদিন কর! – বোনাপার্ট

নেপোলিয়নের ইসলামী পাতাটি মিসরীয়দের ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটি সহজ ফন্দি ছিল— চাই তাদের সাধারণ লোকই হোক বা আল্-আযহারের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণই হোন।

দুর্ভাগ্যবশত একথা স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, ধোঁকাটি তখনকার সাধারণ লোক ও পণ্ডিত নির্বিশেষে মিসরীয়দের উপর আরোপিত হয়েছে। হয়তো তাদের সবাইকে এ জন্য মাফ করা যায় যে, দাস বংশের শাসকদের জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ট মিসরীয়রা তখন শয়তানের সাথেও সখ্যতা করতে প্রস্তুত ছিল— যদি তা ঐ সকল লোকদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য অনিবার্য হয় যারা তাদের ভাগ্য ও জীবিকা কেড়ে নিয়েছিল এবং একই সময় ইসলামী দেশ ও নিজেদের দেশকে রক্ষা করতেও অক্ষম হয়েছিল।

শয়তান পাগড়ি পরে তাদের কাছে এল এবং তারা সবাই তাকে বিশ্বাসও করল, কারণ তারা তাকে স্বীকৃতি দিতে চাইল, তাছাড়া তাকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া তাদের আর করারও কিছু ছিল না।

যাহোক, নেপোলিয়নের ইসলামী পাতাটি এতটুকু এসে থেমে গেল। এর কিছু পৃষ্ঠা আর স্মৃতি ছাড়া কিছু অবশিষ্ট রইল না। তার কিছু তো অভিনব আর কিছু হচ্ছে সরল। এসবের ফিরিস্তিতে ভরে রয়েছে প্যারিসের নেভাল মন্ত্রণালয়ের ফাইলগুলো। এখানেই সংরক্ষিত আছে ফ্রান্সের মিসর আক্রমণের অধিকাংশ দলীল-দস্তাবেজ। এই অভিযান মিসরের রাজনীতি ও জনজীবনে এক বীভৎস চিত্র অঙ্কন করে যাচ্ছিল এমন

এক সময় যখন বিশ্ব অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পা রাখছিল। উল্লেখ্য, ফ্রান্সের মিসর আক্রমণের প্রামাণ্য দলীলগুলো এক সময় নষ্ট হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হতো। কিন্তু ডঃ আহমাদ হুসেইন আস্-সাবী ফ্রান্সের নেভাল মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে পান যে ডকুমেন্টের এক বিশাল ভাণ্ডার এখানে লুক্কায়িত রয়েছে। অনেক চেষ্টা করার পর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি প্রায় ২০ হাজার দলীল-দস্তাবেজ উদ্ধার করেন। এতে ফ্রান্স সাম্রাজ্যের অনেক কৌশল এবং মিসরীয়দের জীবনে ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের অনেক অজানা সত্য প্রকাশিত হয়। যাহোক সেগুলোতে ছিল নেপোলিয়নের আঁকা কৌশলগত দর্শন— যদিও তা অনেক কিছুর সাথে সংমিশ্রিত ছিল। এমনি করে এর মধ্যে ছিল কিছু কবিতা, কিছু খোলামেলা প্রেমের কবিতা। এগুলো নেপোলিয়নের কিছু সেনা অফিসারের নীল চোখ আর সোনালী চুলের প্রেমে আবেগ উদ্বেলিত কিছুসংখ্যক পণ্ডিত (শুয়ূখ) লিখেছেন।

কিন্তু নেপোলিয়নের ইহুদী পাতাটিই হলো সেই প্রামাণ্য দলীল যা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ সেটাই সেই-দিনগুলো থেকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন তথা একবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত ঐ ভূখণ্ডে এক স্থায়ী কৌশলগত প্রভাব।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইহুদী ছিলেন না, বা ইহুদীদের বন্ধুও ছিলেন না। বরং বিপরীতটাই সত্য। কিন্তু আল্-কুদ্স প্রাচীরের বাইরে সারা দুনিয়ার ইহুদীদের প্রতি তার আহ্বান সম্বলিত পত্রটি মিথ্যা ছিল না— যদিও ইসলামী পাতাটি মিথ্যাই ছিল। কারণ সেই ইসলামী পাতাটি ছিল একটি মানবগোষ্ঠী— মিসরের অধিবাসীদের প্রতি যাদের সংখ্যা ছিল তখন দু মিলিয়নের কিছু বেশি। যারা ঘুরে দাঁড়ালে মিসর তার বাহিনীর জন্য— সেতু নয় বরং ফাঁদ হতে পারতো। সেজন্যই সে এই প্রতারণামূলক প্রহসনের আশ্রয় নিয়েছিল।

পক্ষান্তরে ইহুদী পাতাটি ছিল ভিন্ন পরিস্থিতিতে। কারণ সে সময় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা দু' হাজারের বেশি ছিল। সঠিক সংখ্যা হলো— খোদ নেপোলিয়নের অগ্রগামী সেনাদলের কিছু অফিসারের উপস্থাপিত রিপোর্ট অনুসারে – ১৮০০। এর মধ্যে মাত্র ১৩৫ জন ছিল আল্-কুদ্স শহরে। এরা যতই চেষ্টা করতো এদের ক্ষমতা ছিল না যে তাকে বিজয়ী করে অথবা অপমানিত করে। এছাড়া নেপোলিয়নের ইহুদী পাতার এমন একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে যা তার ইসলামী পাতার প্রহসনকে বৈধতা দেওয়ার ব্যাখ্যা ছাড়াও আরো কিছু ব্যাখ্যা করে।

যদি নেপোলিয়নের ইহুদী পাতা মিথ্যা না হয়, যদি তা ইসলামী পাতার মতো রাজনৈতিক ধোঁকা না হয়ে থাকে, তাহলে সেটি আসলে কি ছিল?

এর শুদ্ধ ব্যাখ্যা — যা পরবর্তী ঘটনাসমূহও সাক্ষ্য দেয়— তা হচ্ছে, এই পাতাটি ছিল একটি 'স্বপ্ন'। এটি কোন 'নবীর স্বপ্ন' ছিল না। তবে এটি ছিল দূরদর্শী বিজ্ঞ কৌশলের অনুভূতিসম্পন্ন এক সম্রাটের স্বপ্ন।

॥ ৩॥

ব্রিটেন

"তাঁর কাছে আমি ইহুদীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেননি। আর যখন ব্রিটেনের স্বার্থ বিষয়ে কথা বললাম তখন তার হাতের ব্রান্ডির গ্লাস রেখে চোখ বিস্ফারিত করলেন এবং আমার কথা শুনতে শুরু করলেন।"

— লর্ড শাভতেসবেরী

বিশ্বের ভূগোল ও ইতিহাস অধ্যয়নের ফলে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, মিসর পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কৌশল অধ্যয়নের পর তাঁর এ বিশ্বাস চূড়ান্তভাবে প্রোথিত হলো যে, মিসরের গুরুত্ব সম্পর্কে তার যে বিশ্বাস জন্মেছিল তা এক সন্দেহাতীত বাস্তবতা। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা তিনি তাঁর বহু বক্তৃতা, স্মৃতিচারণ ও আলোচনায় পুনর্ব্যক্ত করেন। এমনকি তিনি যখন রাজনীতি, যুদ্ধ বরং সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন সাগর মহাসাগরের নির্জন দ্বীপ 'সেন্ট হিলানা'তে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন, তখনও তাঁর আলোচনায় একথা প্রকাশ পেয়েছিল। মিসরের অবস্থান আসলেই ছিল এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঃ

* জিব্রালটার থেকে উৎসারিত ভূমধ্যসাগর থেকে অসীম অতলান্তিক মহাসাগর হয়ে নতুন দুনিয়া আমেরিকা একদিকে— অপরদিকে লোহিত সাগরের পাড়ে এর অবস্থান। এদিক থেকে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছাও সম্ভব। দক্ষিণ দিকে 'এডেন'-এর কাছে আরব সাগরেও প্রবেশ করা যায় অনায়াসে, সেখান থেকে ভারত মহাসাগর এবং তারপর প্রশান্ত মহাসাগরে।
* এই দেশটি আফ্রিকার মাথার কাছে অবস্থিত। অপর দিকে এশিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে আছে।
* এ ছাড়া ভূপ্রাকৃতিক অবস্থাটি এমন যে সমতলভূমি হওয়ার ফলে এখানে প্রচুর কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়, এতে একটি বিরাট সেনাবাহিনীর এমন একটি নিরাপদ ঘাঁটি হতে পারে যে, এখানে নিরাপত্তার সাথে খেয়ে পরে অবস্থান গ্রহণ করে প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হবে।
* এছাড়া সাম্রাজ্য বিস্তারের পথসমূহ বিশেষ করে ভারতের দিকের পথসমূহ ও এর আগে-পিছের সব যাতায়াত পথের উপর নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থানে রয়েছে এ দেশটি।

কাজেই এ দেশটি কব্জায় রাখা যে কোন শক্তির জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বপ্রস্তুতি, যাতে এর মাধ্যমে ব্রিটেনকে প্রতিহত করা যায় এবং বাণিজ্য ও সাগরের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ দিতে পারে। কিন্তু নেপোলিয়ন কেবলমাত্র মিসরের দিকেই নজর দেননি বরং তিনি সিরীয় উপকূলের সাথে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন যা ভূমধ্যসাগরে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ঘিরে একটি কোণের মতো ছিল। এই কোণ তার দক্ষিণ বাহু মিসরে বিস্তার করেছিল যা আফ্রিকার গোটা উত্তর উপকূলে তার প্রভাব বিস্তার করছিল এবং দৈর্ঘ্যে দক্ষিণ দিকে নীল নদের উৎস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ ছাড়া তার উত্তর বাহু ছিল সিরিয়ায় যা দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল (ইরাক), আরব উপদ্বীপ ও আরব্যোপসাগরকে স্পর্শ করে আছে। এমনকি পারস্য ও ভারতে স্থল ও জলপথের নিকট-পথও ছিল এ অঞ্চলের আওতায়।

এভাবেই পূর্ববর্তী দিগ্বিজয়ীদের মতো নেপোলিয়ন ও মিসরে স্থিতিশীল হতে না হতেই সিরিয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। যাতে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব প্রান্তের দক্ষিণ কোণটি তার পূর্ণ কর্তৃত্বে থাকে। আর ঠিক এটাই করেছিলেন মিসরের ফেরাউনগণ, গ্রীকের দিগ্বিজয়ীগণ, রোমান কায়সার আর পারস্যের কেস্‌রাগণ। ঠিক এ পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছিলেন নবীযুগোত্তর মুসলিম খলিফাগণ এবং সেটাই অব্যাহত রেখেছিলেন আব্বাসী ও উমাইয়্যা খলিফা ও আমীরগণ। এরপর আহমদ বিন তুলুন ও সালাহুদ্দীন থেকে নিয়ে বিজয়ী পেপরাস ও 'ক্লাউন' পর্যন্ত মিসরের সকল শাসনকর্তা সেই পাঠই গ্রহণ করেছিলেন।

এর অর্থ— যুগ যুগ ধরে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণকে সম্পূর্ণভাবে কব্জায় আনা ছিল সকলেরই বৈশিষ্ট্য। এতে এই কোণের উভয় বাহুকে একই রাজনৈতিক সূত্রে গাঁথা যায় এবং একটি অপরটির নিরাপত্তা বিধান করে। কারণ এটাই ছিল ভূপ্রাকৃতিক আবেদন এবং ইতিহাসের সবক।

কিন্তু নেপোলিয়নের ধারণায় একটি ছন্দপতন ছিল এই যে, তুর্কী খেলাফতের এত কাছে সিরিয়ার অবস্থান ছিল যা একটি ভাববার বিষয়। তার অনুমান ছিল যে, কোন একদিন খেলাফত তার প্রদেশের দাবি নিয়ে বৈধতার অধিকারে নেপোলিয়নকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করবে। সে ক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন সাম্রাজ্যের— যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহায়তা পেয়ে যেতে পারে।

সে জন্যই এই বিকল্পহীন কোণের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও নেপোলিয়ন সব সময় বাইরের বিপদ সম্পর্কে শঙ্কিত থাকতেন। তিনি জানতেন যে মিসর ও সিরিয়া— কোণটির এই দুই বাহুর ইসলাম ও আরব জাতীয়তাবাদ কোন একদিন বিগত ক্রুশেড যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের মতো নিজস্ব এক শক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম হবে, যার মাধ্যমে তারা তার কব্জা থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে নিতে পারবে। তখন

এমন এক শক্তি তার মোকাবিলা করে বসতে পারে যাদেরকে হিসাবেই রাখেনি বা আদৌ প্রত্যাশা করেনি।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় দেখা গেছে এই কৌশলগত সদা উজ্জীবিত কোণটির দুটি বাহু বা পাঁজর একে অন্যের অন্বেষণে সদা ব্যাপৃত ছিল, তাই পরিস্থিতি যতই পাল্টাচ্ছে অথবা যুগের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এসেছে— এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফেরাঊনিয়া-রোমান হোক বা বাইজেন্টাইন-ইসলামী হোক বা ক্রুসেড ও সাম্রাজ্যবাদীই হোক।

এই সকল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সত্যের গবাক্ষেই নেপোলিয়ন বোনাপার্টের চোখে সেই 'কৌশলগত স্বপ্নটি' প্রতিভাত হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই 'ইহুদী পাতাটি' প্রকাশ পেয়েছে।

নেপোলিয়নের বিশ্ববিজয়ের স্বপ্নটি তাঁর প্রথম পদক্ষেপেই নিম্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

১. নেপেলিয়নকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের কোণের দক্ষিণ বাঁকের ওপর অর্থাৎ মিসরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এবং তাঁর বাহিনী ততক্ষণে সেখানে অবস্থান করছে।
২. ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণকে নিজ আধিপত্যে রাখার লক্ষে সিরিয়াকে নিরাপদ রাখতে হবে এবং সে এখন সেদিকেই ধাবিত হবে।
৩. কিন্তু সাথে সাথে এ গ্যারান্টিও থাকতে হবে যে আরবি ও ইসলামী এ দুটি দিক যেন কখনো এক হতে না পারে। কারণ তারা এই কোণটির কেন্দ্রস্থলে মিলিত হতে পারলে নতুন এক ফসল উৎপন্ন হবে, যা না আরবি আ না ইসলামী। কিন্তু এই ফসলকে অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বরং সৃষ্টির জন্য বীজ লাগবে— চাই তা এনথ্রোবায়লজী (নৃবিজ্ঞান)-এর কূপ খননের পর জীন থেকে হলেও— যাতে তা মাটিতে রোপণ করা যায়। যখন নিয়মিত সেচ দেয়ার পর এর কিছু কচি পাতা গজাবে ঠিক তখন মৌলিক আর অনুপ্রবেশকারী পার্থক্য তথা প্রকৃতিক ও কৃত্রিমের মাঝের প্রভেদ ঘুচে যাবে।

এভাবেই নেপোলিয়নের ইহুদী পাতাটি তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা করেছিল, আর স্বপ্ন— যদিও তা অত তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হবে না, তবুও আগামী দিনে বাস্তবায়নযোগ্য তো বটে! এভাবেই— যদি সম্ভব হয় একটি ইহুদী দেশের উন্মেষ ঘটাতে পারলে তা হবে একটা বাড়তি গ্যারান্টি। আবার প্রয়োজনে এর থেকে দূরত্বও বজায় রাখা যাবে। আর এর গঠন প্রক্রিয়ায় এর আবিষ্কারক কাজে লাগিয়েছেন সাম্রাজ্যের স্বার্থ, ইতিহাসের শিক্ষা, প্রাচীন ধর্মাবলীর কিংবদন্তি। আর এসবকে তিনি ফেলেছেন এক অভিনব কৌশলের নিগড়ে। আর এটা প্রমাণিত সত্য যে, নেপোলিয়ন তাঁর এই কৌলশগত মূল্যায়ন থেকে কখনও সরে দাঁড়াননি— এমনকি, এক রাতে

মিসর থেকে চুপিসারে ভেগে ফ্রান্সে ফিরে আসতে বাধ্য হওয়ার পরও। তিনি প্যারিস থেকেই ইউরোপের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মল্লযুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, যেখানে তাঁর কীর্তি তাকে বয়ে নিয়ে যাবে এবং যেখানে তাঁর নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র পৌঁছবে।

যখন নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট হলেন তখনও তাঁর হিসাব-নিকাশে মিসরই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এছাড়াও 'বিচ্ছিন্ন একটি ইহুদী' দেশ-এর ধারণা তখনও তাঁকে বিভোর করে রেখেছিল। এভাবেই তিনি ১৮০৭ সালে 'সান হার্ডান' ইহুদী সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে তিনি ইউরোপের সকল ইহুদী গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দকে প্রতিনিধিত্ব করার দাওয়াত জানিয়েছিলেন। তাদের প্রখ্যাত হাখাম বা পাদ্রীদেরও দাওয়াতে শামিল করেছিলেন যা তাঁর ভাষায়— 'ইহুদী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়ক হবে।' এ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ৩নং সিদ্ধান্তটি ছিল বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এর ভাষ্য ছিল এরকম ঃ

"ইহুদীদের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনের প্রতি তাদের চেতনাকে জাগ্রত করা জরুরী। যাতে তারা তাদের ধর্মের জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্র কর্তব্য আদায় করতে সক্ষম হয়।"

এটাই সম্ভবত 'ভোলগার'-এর মতো প্রখ্যাত রাজনৈতিক চিন্তাবিদের মনে সেই নজরকাড়া গ্রন্থটি লেখার প্রেরণা যুগিয়েছিল ঃ "নেপোলিয়ন ও ইহুদী সামরিকায়ন!" ইতিহাসের চাকা থেমে থাকেনি। ব্রিটেন নেপোলিয়ানের পরিকল্পনা ব্যার্থ করে দিতে সক্ষম হলো। এডমিরাল নেলসন যার সূচনা করেছিলেন, ডিউক ওয়ালিংটন তা সম্পূর্ণ করেন। প্রথম পদক্ষেপে অবসান হলো যখন 'ওয়াটারলো' যুদ্ধে বেলজিয়াম উপকূলে সম্রাট নেপোলিয়নের বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। দ্বিতীয়টি ছিল ঃ নীলনদের মোহনায় 'আবু কীর'-এর লড়াইয়ে জেনারেল নেপোলিয়নের নৌবহর ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বড় দীগ্বিজয়ীদের মৃত্যুতে তাদের ব্যাপক কৌশলগত স্বপ্ন দর্শনের মৃত্যু হয় না। বরং সেগুলো ইতিহাসের থলেতে অবশিষ্ট থেকে যায়, যা ঐসব স্বপ্নদ্রষ্টার পরেও এমন ব্যক্তিত্বের অপেক্ষায় থাকে যারা নতুনভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণত তা ফিরে পাবার দুঃসাহস রাখে।

এই অমোঘ ধারা বেয়েই দেখা গেল কয়েকটি বছরের বিশৃঙ্খলা আর বিহ্বলতা কেটে যাওয়ার পর ভূমধ্যসাগরীয় দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দুটি প্রান্ত— সিরিয়া ও মিসরের মিলনের স্বপ্ন আবার স্থিরতা পেল 'মুহাম্মদ আলীর' হাতে— বৃহত্তর মিসর হিসাবে। বাহ্যত মিসরে মুহাম্মদ আলীর ক্ষমতা স্থিতিশীল হওয়ার পর তিনি সিরিয়াকে মিসরের সাথে যোগ করার প্রয়োজন অনুভব করতে লাগলেন। সম্ভবত তার মাথায় এ চিন্তা এসেছিল— নেপোলিয়নের এক সেনা অফিসার—'সুলাইমান পাশা ফরাসী'-এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুপ্রেরণায়। এই সেনা অফিসার পরবর্তীকালে মুহাম্মদ আলী

পাশার পুত্র ইব্রাহীম (পাশা)-এর সর্বাধিনায়কত্বে সমর অধ্যক্ষ বা চীফ অব ওয়ার স্টাফ হয়েছিলেন। সম্ভবত মিসর ও সিরিয়া— এ দু'টি সদা সরগরম দেশ নিয়ে গঠিত এ এলাকার অভিন্ন কৌশলগত দর্শন-এর সাথে মুহাম্মদ আলীর অভিজ্ঞতা যা যোগ হয়েছিল, তা হচ্ছে মুহাম্মদ আলী একটি আধুনিক মিসরীয় আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন, যে রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির সকল উপায়-উপকরণ আর আরব বিশ্বের ঐক্যের উপাদানগুলো উপস্থিত ছিল।

বস্তুত মুহাম্মদ আলী যোদ্ধার বেশে সিরিয়াতে প্রবেশ করেননি। বরং তিনি সিরিয়ার জাতীয় জাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে প্রবেশ করেছিলেন। কারণ তাঁরা 'মুহাম্মদ আলী মডেলেই' তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের মতো অন্য প্রভাবশালী বিষয়গুলো তাদেরকে ধাবিত করেছিল যেন মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে একটি অনন্য পরিবেশে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন জাতীয়তাবাদের যুগসন্ধিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে ইহুদীবাদ দিয়ে প্রাচ্য-সঙ্কটের সমাধান করতে। সম্ভবত এই জাতীয়তাবাদই ইসলাম-আরবি দিকটির ওপর সক্রিয় ছিল। কাজেই, এক্ষেত্রে কোন সশস্ত্র সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অভিনব সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদানকারী কোন ফরাসী সম্রাটের কষ্ট-কল্পিত গল্প ফাঁদার দরকার পড়েনি।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লর্ড বিল মারস্টোন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের নিকট থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটেনের উত্থানের সময়ে এ ছিল তার একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। তার শত্রুদের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করে নিজের সংস্কৃতিতে তা উত্তমভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন তিনি।

পর্তুগীজরাই আন্তঃমহাদেশীয় জলপথের ওপর অগ্রণী শক্তি ছিল। ব্রিটেন তাদের পেছনে ছুটল এবং এক সময় তাদেরকে ধরে ফেলল, এমনকি তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেল। আর স্পেন ছিল আমেরিকার নতুন জগতে উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে সকলের আগেভাগে। তাদের পেছনেও ব্রিটেন ছুটল, তাদের স্থানে পৌঁছে গেল এবং তাদেরকে পেছনে ফেলে দিল। সেই উপনিবেশী যুগে কৌশলগত গুরুত্বের কারণে সিরিয়াসহ মিসরের দিকে সর্বপ্রথম অভিযান চালাল নেপোলিয়ন তথা ফ্রান্স। কিন্তু এখানেও ব্রিটেন তার পিছে ছুটল, তাকে ধরে ফেলল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পিছে ফেলে এগিয়ে গেল।

কাজেই বলা যায়, বিল মারস্টোন নেপোলিয়নের দর্শনের ওপর পুরোপুরি ভিত্তি করেই অগ্রসর হয়েছিলেন তবে তার চেয়েও বেশি শক্তিসামর্থ্য নিয়ে তা আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং ফরাসী শত্রুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তার চেয়ে এক কদম এগিয়ে গিয়েছিলেন।

বিল মারস্টোন সে সময়ে তার প্রজন্মের অন্যান্য রাজনীতিকের মতোই ইহুদী সমস্যাটিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতেন। স্বভাবতই তিনি ব্রিটেনের বিদেশ মন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রাচ্য সঙ্কট নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এ দুটি সঙ্কটকে এক সুতায় গাঁথার বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা প্রকাশ পেল নেপোলিয়নের পর।

বোঝা যায়, সে সময় ফরাসী পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে বিল মারস্টোন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। যদিও ওল্ড টেস্টামেন্টের ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছু প্রটেস্টান্টের পক্ষ থেকে 'ইহুদীদের জাতীয় দেশ'-এর ধারণাটি তার কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল।

যখন এসব মিশনারির দাবি বিল মারস্টোন-এর কানে পৌঁছল তখনও বলা যায় না এটা তার মাথায় ঢুকেছিল কিনা। আর এ কাজটি কারও না কারও করা দরকার ছিল— যা শেষ পর্যন্ত কাঁধে নিলেন লর্ড শাভসপেরি। লর্ড শাভসপেরি ছিলেন বিল মারস্টোনের নিকটাত্মীয় (শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক); সে সাথে ছিলেন লর্ড রুচিল্ড ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ পরিবারটি প্রাচ্য থেকে ইউরোপে অভিবাসী ধনকুবেরদের একটি এবং এরাই ফিলিস্তিনের দিকে অতিরিক্তদের রপ্তানির কাজে প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা যোগাত। শাভসপেরি ইহুদীদের পবিত্র দাবি সম্পর্কে বিল মারস্টোনকে পুরোপুরি বোঝানোর চেষ্টা শুরু করলেন। যখন দেখলেন যে, প্রাচীন লোককাহিনীর উপাদান যথেষ্ট নয়, তখন এর সাথে যোগ করলেন রাজনীতিকে যাতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন।

শাভসপেরি তাঁর রোজনামচায় ১৪ জুন, ১৮৩৮ সালে যা লিখেছিলেন, "গত রাতে বিল মারস্টোনের সাথে নৈশভোজ গ্রহণ করলাম এবং আহারের পর ইহুদীদের দুর্দশা ও কষ্টের কথা তাঁকে বলতে লাগলাম। তিনি অর্ধনির্মিলিত চোখে আমার কথা শুনছিলেন। তাঁর হাতে ছিল ব্রান্ডির গ্লাস। মাঝে মধ্যে সেখান থেকে কিছু টানতেন।

যখন আমি ইহুদীদের দুর্দশার কথা ছেড়ে প্রাচ্যে ব্রিটেনের জন্য কি কি বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বার্থ ও সুবিধাদি রয়েছে তা আলোচনা করতে শুরু করলাম, তখন তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং ডাইনিং টেবিলের এক পাশে ব্রান্ডির গ্লাস ঠেলে রেখে আমার কথা শুনতে লাগলেন।" তখনকার সময়ের ব্রিটিশ প্রামাণ্য কাগজপত্র ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ধারণার বিবর্তন ও উত্তরণের তথ্যে ভরপুর। শেষ পর্যন্ত তিনি মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ রাজনীতির তিনটি লক্ষ্য স্থির করেন। এই চিন্তা-চেতনা থেকেই তিনি ইউরোপীয় শক্তিসমূহের বৃহত্তর মৈত্রী রচনা করেন, যাতে সকলেই খেলাফতের উত্তরাধিকার হারাবার আগে তাঁকে সমর্থন যোগায়।

ঐ তিনটি লক্ষ্য সে যুগ থেকেই ব্রিটিশ কাগজপত্রে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ছিল। সেগুলো হচ্ছে—

১. মুহাম্মদ আলীকে সিরিয়া থেকে বের করে দেয়া, যাতে ঐ কৌণিক অঞ্চলের দুই পাঁজর— মিসর ও সিরিয়াকে পরস্পর বিভক্ত করা যায়।

২. মুহাম্মদ আলীকে সিনাই মরুভূমির ওধারে মিসরের সীমান্তের অভ্যন্তরে অবরোধ করে রাখা এবং মরুভূমিকে বোতলের ছিপিতে পরিণত করা, যাতে নীল অববাহিকার প্রতিনিধিত্বকারী মিসরী বোতলের মুখে এঁটে দেয়া যায় (এই উপমাটি নেয়া হয়েছে ২১ মে, ১৮৩৯ সালে বিল মারস্টোনকে লক্ষ্য করে দেয়া রোচিল্ডের ভাষণ থেকে)।

৩. ইহুদী অভিবাসনের জন্য ফিলিস্তিনের দরজা খুলে দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা এবং তাদেরকে আবাসভূমির উপনিবেশের একটি খিড়কি বা কাউন্টার খোলা, যাতে এখান দিয়ে এমন বিচ্ছিন্নতাবাদী কিছু পয়দা হয়, যাতে মিসরকে সিরিয়া থেকে আলাদা করে রাখা যায় এবং যাতে এ দুটি দেশ এই নিয়ন্ত্রণকারী কৌশলগত কৌণিক অঞ্চলে মিলিত হতে না পারে।

বিল মারস্টোনের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তৎকালীন ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার লর্ড ওয়েলিংটনের পক্ষ থেকে সমর্থন ও সহায়তা পেয়েছিল। ইনিই 'ওয়াটার লু' যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাস্ত করেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো— ব্রিটেনের বহু ডকুমেন্টের রিপোর্ট এই ইঙ্গিত করে যে, ওয়েলিংটনই হচ্ছে মুহাম্মদ আলীকে তিনটি পর্যায়ে মুকাবিলায় মন্ত্রণাদাতা ঃ

(১) তাকে সিরিয়া থেকে বের করা, (২) মিসরে অবরোধ করে রাখা এবং (৩) দু'টি দেশের মধ্যে ছেদ টানার মতো কিছু সৃষ্টি করা।

॥ ৪ ॥

মুহাম্মদ আলী

"ঘুঘুর জন্যও বাসা আছে
শিয়ালের জন্য গুহা"

—ব্রিটিশ কবি বায়রন তাঁর এক হিব্রু গানে

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে উসমানী খেলাফতকে মিটিয়ে দেয়ার যুদ্ধের কারণে ব্রিটেনের পরিস্থিতি ছিল জটিল। তখন মনে হচ্ছিল যে, এ হচ্ছে 'মিরাসী সম্পত্তি' যা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার এই তো সময়। তখন রাজনীতিবিদরা পরিকল্পনা আঁটছিল আর সামরিক কমান্ড তার নক্সা আঁকছিল। এমনকি সাহিত্য এবং কবিতাও যুদ্ধের ময়দানে বিনা আহ্বানে ঢুকে পড়ল। স্বভাবত যা হয়, কোন কোন দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তাদের জীবনের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে এমনই হয় যে, তা আর্টিলারি থেকে নাট্যমঞ্চ আর বোমা থেকে গীতিকাব্য পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুর ওপরই প্রভাব বিস্তার করে ফেলে!

খেলাফত রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ রচনার লড়াই শুরু হয়েছিল। যৌক্তিকভাবেই—নিরবচ্ছিন্নভাবে আলীয়্যা রাষ্ট্রের ইউরোপীয় মালিকানার ওপর আক্রমণ শানানোর মধ্য দিয়ে। এ সব আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মুসলিম উসমানী খেলাফতের জিঞ্জির থেকে খ্রিস্টানদের মুক্ত করা। এ সময় আকস্মিকভাবে ইহুদী পাতায় এবার ব্রিটেন ঢুকে পড়ল, যা এতদিন ফরাসীদের বিষয় ছিল। আর যেহেতু ইহুদীরা এতদিন উসমানী খেলাফতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সুলতানের অধীনে নিরাপদেই দিন গুজরান করছিল। হ্যাঁ, তাদের অনেককেই এই খেলাফত আশ্রয় দিয়েছিল। যখন তারা মুসলমানদের সাথে এক সাথে স্পেন থেকে বের হয়ে এসেছিল। কাজেই কোন ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বাধীন করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার পরিবেশ এই ইহুদীদের 'জাতীয় দেশ' গঠনের চিন্তাটি দিন দিন বড় আকার ধারণ করতে লাগল। আর বায়রনের মতো কবিও 'গ্রীস' নিয়ে লেখা কাব্যের অনুপ্রেরণায় কিছু কবিতা লিখে ফেললেন। তার নাম দিলেন 'হিব্রু গানের ডালি'। তাঁর প্রথম গীতিকবিতাটি হলো—

ঘুঘুর জন্যও বাসা আছে
শিয়ালের জন্য গুহা

সকল জাতির দেশ আছে।
(শুধু) ইহুদীর নাই উহা
হ্যাঁ, তারও আছে ঘর—
এক চিল্‌তে মাটির কবর।

বায়রনের কাছে কবিতাও রাজনীতি থেকে দূরে ছিল না। রাজনীতি (চাই তা সামরিক সম্প্রসারণ হোক বা অর্থনৈতিক, আর্থিক সম্প্রসারণ অথবা বর্তমান যুগের বর্ণবাদী স্বদেশী আন্দোলনই হোক) সমগ্র পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে গ্রাস করে নিয়েছিল। স্বভাবতই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সাধারণ ব্যস্ততার বিষয়গুলো কাব্য চিন্তা থেকে দূরে থাকতে পারে না। যদিও এই কবিতার ভাবের সাথে রাজনীতির ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে পরোক্ষ এবং কোন স্থির ও সুশৃঙ্খল ভাবনা ছাড়াও কেবল আবেগ ও সচেতনতা থেকেই তা উৎসারিত হতে পারে।

ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হের্তুজাল-এর বন্ধু ইহুদী নেতা নাহুম চোকোলভ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন যে, তিনি অনেক ভেবেছেন এবং ব্রিটেন যে ফিলিস্থিনে ইহুদী প্রকল্পকে এত উৎসাহ ও সমর্থন যোগাচ্ছে তার পেছনে কি কি কারণ থাকতে পারে ? তিনি তাঁর ডায়েরীর ভূমিকায় বলেছেন—

"আমি নিজেকে বহুবার প্রশ্ন করেছি— কেন ইংল্যান্ড আমাদের আন্দোলনকে এত সমর্থন দিচ্ছে ? আমি চারটি কারণ খুঁজে পেয়েছি, এগুলো আমি এভাবে বিন্যাস করেছি—

১. ইংরেজ জাতির মধ্যে ইঞ্জিল কিতাবের ছাপ রয়েছে।
২. ইংরেজি সাহিত্যে ইঞ্জিলের প্রভাব।
৩. ফিলিস্তিনের জন্য ইংরেজদের ভালবাসা।
৪. ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে নিকট প্রাচ্য ইংরেজদের রাজনীতি।

বালা বাহুল্য, প্রথম তিনটি কারণ লেখালেখির জগতের সাথে সম্পৃক্ত। চতুর্থ কারণটিই হচ্ছে বাস্তবতা ও স্বার্থের জগতে একমাত্র কারণ।

সে সময় ইংল্যান্ডে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ছিল মুহাম্মদ আলীকে সিরিয়া থেকে বের করে মিসরে অবরোধ করে রাখা এবং মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে একটি দূরত্বের দেয়াল সৃষ্টি করে তাকে কাবু করা।

১৮৩৮ সালের শেষের দিকে ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার ও নেপোলিয়নকে পরাস্তকারী লর্ড ওয়েলিংটন, লর্ড বিল মারস্টোন-এর নিকট একটি প্রতিবেদন লিখলেন। সেখানে তিনি নিকটপ্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে এক সার সংক্ষেপে বলেন ঃ

"এ বছর মিসর ও তুর্কিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও টানাপড়েনের কারণে ভয়ানক এক বিপর্যয় সৃষ্টি হলো। মুহাম্মদ আলী দশ বছরেই এমন এক নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনী

গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন, যা তাঁর হুকুমতের সুরক্ষার আবেদন মিটাতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। তিনি তাঁর জনগণের প্রতি নির্যাতন ও অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এমন বাহিনী গঠন করেন যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বিশাল। তিনি এক লাখ পুরুষকে রিক্রুট করে তাঁর প্রভু উসমানী খলিফার বিরুদ্ধে তাদের সমাবেশ করেছে, যদিও বাহ্যিক কিছুটা আনুগত্য দেখিয়ে থাকে এবং তিনি মিসরে বিভিন্ন দেশের কনস্যুলারদের সামনে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চান। এছাড়া তিনি সিরিয়াকে একীভূত করতেও চান এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা পরিচালনায়ও তিনি কামিয়াব হন। তিনি তুর্কী-সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত 'নাসিবাইন' এলাকায় তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। মুহাম্মদ আলীর সমরশক্তি কেবল স্থলবাহিনীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তাঁর নৌবাহিনী তুর্কী নৌবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তুর্কী নৌবাহিনীর কমান্ডার তাঁর পরাজয়ের পর ইস্তাম্বুলে ফিরে আসতে ভয় পেয়েছিলেন, পাছে এর শাস্তি তাঁকে পেতে হয়। এভাবে এক খেয়ানতমূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি মিসরের বিজয়ী ডিক্টেটরের সাথে নিজ বাহিনীসহ যোগ দিলেন এবং তাঁর নৌবাহিনীকে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে নিয়ে গেলেন বিশ হাজার নৌ সেনাসহ। এরা সবাই এখন মুহাম্মদ আলীর ইচ্ছার ওপর ন্যস্ত। এসব অবস্থার দাবি হচ্ছে ইংরেজ সরকার যেন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ত্বরিত হস্তক্ষেপ করে এই 'পোশা'কে ফিরিয়ে আনে— যে তার বুদ্ধির কাছে পরাভব মানে না এবং সুলতানের প্রতি আনুগত্যের কাছেও না।"

কর্তব্য স্থির করতে বিল মারস্টোনের এর বেশি প্রয়োজন ছিল না। বরং পুরোপুরি বুঝে ফেলেছিলেন যে, মিসরের এই প্রচণ্ড নতুন শক্তির মুকাবিলায় সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তাঁকে যা বেশি করে ভাবিয়ে তুলল, তা হচ্ছে মূল মিসরীয় নৌশক্তির সাথে নতুন সংযুক্ত তুর্কী নৌবহরের মিলিত শক্তি এমনরূপ লাভ করতে পারে যা ভূমধ্যসাগর ও তার উপকূলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এভাবে সে মিসরে একটি বড় আরব রাষ্ট্র কায়েম করতে পারে অথবা তুর্কিস্তানে ঢুকে পড়ে উসমানী খেলাফতের যৌবন ফিরিয়ে আনতে পারে। উভয় অবস্থায় সে এমন একটি শক্তি, যা উসমানী খেলাফতকে ভাগ-বাটোয়ারা করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইংরেজ রাজনীতি এটা কবূল করতে আদৌ রাজি নয়। এ প্রেক্ষাপটে বিল মারস্টোন মুহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে একটি মিত্রশক্তি গঠন করলেন। এতে ইংল্যান্ডের সাথে যোগ দিল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ব্রুশিয়া। এই জোট গঠনের ঘোষণার সাথে সাথেই মিসর ও শামের নৌবন্দরগুলোর ওপর অবরোধ আরোপ করা হলো। এই অবরোধ পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের গোপন দালালরা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শাম-এর সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংঘাতের উস্কানি দিতে শুরু করল। এক্ষেত্রে অবরোধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থাকে তারা ব্যবহার করল। বিশেষ করে যখন মুহাম্মদ আলীর 'মিসরী-তুর্কী' নৌবাহিনী

'নাফারিনো' উপসাগরে ব্যাপক নৌ আক্রমণের শিকার হয়েছিল। পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ইংরেজ, রাশিয়ান, অষ্ট্রিয়া ও ব্রুশীয় নৌবাহিনীগুলো। উদ্দেশ্য শামে মুহাম্মদ আলীর বাহিনীর যাতায়াত পথে তাদের তাক করে গোলন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করা; যাতে তিনি সিরিয়া থেকে ফিরে আসেন বা মিসরস্থ ঘাঁটির সাথে সিরীয় শক্তির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে।

এহেন পরিস্থিতিতে সত্যি সত্যিই মুহাম্মদ আলীর পরাজয়ের সূচনা হলো। এক সময় সিরিয়া থেকে তাঁর শক্তি প্রত্যাহার করে নিয়ে সম্ভব হলে মিসরে তাঁর অবস্থানকে মজবুত করা তাঁর জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে (প্রায় দেড় শতাব্দী পর ঠিক একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন জামাল আব্দুন নাসের। মুহাম্মদ আলীর মতো তাঁর বিরুদ্ধেও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তি জোটবদ্ধ হয়ে মিসর-সিরিয়া ঐক্যকে বানচাল করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। সে সময় নিকট-প্রাচ্যের সমগ্র পরিস্থিতিটাই ছিল জটিল। এদিকে নেপোলিয়নের 'ইহুদী পাতা'টি নিজস্ব দোলাচলে বিশ্বের বক্ষ্যস্থল এই ভূ-খণ্ডে ইংরেজ রাজনীতিকে মাতিয়ে রাখছিল। বিভিন্ন পক্ষ ও বিবেচ্য বিষয় একটি অপরটির সাথে জট পাকিয়ে পানি ঘোলা করে ফেলেছিল। বিল মারস্টোন চাচ্ছিলেন না যে 'রুগ্ন লোকটি' এখনই মরে যাকে। একই সময় তিনি এটাও চাচ্ছিলেন না যে, সে রোগ থেকে সেরে উঠুক। ইহুদী নেতা নাহুম চোকোলভ-এর স্মৃতিচারণে এ জটিলতার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুঠে উঠেছে।

১. সুলতান কারও সহযোগিতা ছাড়া একা সিরিয়াকে রক্ষা করার শক্তি রাখেন না।
২. সিরিয়ার ওপর মিসরের কোন অধিকার নেই। হ্যাঁ, কেবল যদি তুর্কিস্তানের দিক থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা করে, তবে অন্য কথা।
৩. মিসর পারলে স্বাধীন হয়ে যাওয়া তার অধিকার।
৪. কিন্তু সিরিয়া যদি তুর্কিস্তানের অংশ হয়ে যায় তাহলে তা মিসরের জন্য একটি চলমান হুমকি হয়ে থাকবে।
৫. আর যদি সিরিয়া মিসরের অংশ হয়ে যায় তাহলে তুর্কিস্তান নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েব।
৬. যদি তুর্কিস্তান নিরাপত্তার অভাব বোধ করে তাহলে তা ইউরোপের শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে। কাজেই এমন একটি বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব সৃষ্টি করা জরুরী যা মিসর ও তুর্কিস্তানকে আলাদা করে রাখবে এবং উভয়ই তার নিজ নিজ স্থানে থাকবে এবং একটি অপরটিকে যৌক্তিক সীমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে দেবে না।

এ প্রেক্ষিতে চোকোলভ মন্তব্য করছেন যে, ইহুদী আন্দোলনের সেটা ছিল এক স্বর্ণালি সুযোগ, যাতে তারা শূন্যতা পূর্ণ করে নুতন করে ইসরাইলী উত্থানের দাবি করতে পারে। এটাই হচ্ছে ইহুদী সঙ্কটের প্রকৃত সমাধান এবং প্রাচ্য সংকটের

আংশিক সমাধান। কারণ এতে করে উসমানী খেলাফতের বিষয়টিকে পরবর্তী এমন এক সময়ের জন্য তুলে রাখা যাবে যখন সবাই সে ব্যাপারে প্রস্তুত থাকবে।

মোটামুটি এটাই ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড বিল মারস্টোনেরও যুক্তি। এজন্যই দেখা যায় তিনি ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট তাঁর ইস্তাম্বুলস্থ রাষ্ট্রদূত 'বনসন বে'-এর নিকট কিছু নির্দেশনা লিখে পাঠান। তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সুলতান এবং তাঁর পারিষদবর্গকে এ মর্মে পরিতৃপ্ত করা যে, ইংরেজ সরকার মনে করে যে, ফিলিস্তিনের দরজা ইহুদী অভিবাসনের জন্য খুলে দেয়ার সময় হয়েছে। এই বিতাড়িত জাতি তার ঐতিহাসিক ভূমিতে ফিরে যাবার সময় এসেছে। হয়ত সুলতান ও তাঁর পারিষদবর্গ এই নৈতিক যুক্তি মেন নেবেন না।

ব্রিটিশ লর্ড বিল মারস্টোন ইস্তাম্বুলস্থ রাষ্ট্রদূতকে যে নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি আরও বলেছিলেন ঃ তখন আপনার কাজ হবে তাদেরকে এটা বুঝতে দেয়া যে, বিশ্বের ইহুদীরা বিশাল ধনভাণ্ডারের মালিক। তারা যদি সুলতানের সহায়তা পায় তাহলে তারা তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। আর তারাও নিঃসন্দেহে তাদের প্রতি তাঁর এই সহানুভূতির মূল্যায়ন করবে। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে— সুলতান ও তাঁর পারিষদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের মধ্যে একটি জোরালো অনুভূতি দানা বেঁধে উঠেছে যে, তাদের ফিলিস্তিনে ফিরে যাবার সুযোগ অতি সন্নিকটে। আর এটা জানা কথা যে, ইউরোপের ইহুদীদের হাতে রয়েছে বিশাল সম্পদ। আর এটাও নিশ্চিত যে, এই ইহুদীরা যে স্থানকে তাদের আবাসভূমি হিসাবে বেছে নেবে সে অঞ্চল সে ইহুদীদের অঢেল সম্পদ থেকে প্রভূত সুবিধা লাভ করবে। যদি সুলতানের সহায়তা ও আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ইহুদী জাতি ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে এটা তার সম্পদ লাভের একটি উৎস হবে। সাথে সাথে তারা মুহাম্মদ আলী বা তার উত্তরাধিকারী এবং সিরিয়া মিসরের মিলনের 'অশুভ' পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের মাঝে বাধার প্রাচীর হয়ে 'আলীর রাষ্ট্রের' হুমকি থেকে সুরক্ষা করবে।

যদি সুলতান ফিলিস্তিনে বিরাট সংখ্যক ইহুদীর অভিবাসনে এই অনুপ্রেরণাকে পাত্তা না দেন তাহলে কমপক্ষে যদি ইহুদী অভিবাসনের অধিকার দিয়ে তিনি কোন আইন জারি করেন তাহলেও এটা সুলতানের প্রতি সমগ্র ইউরোপীয় ইহুদী সমাজের বন্ধুত্বের মনোভাবকে চাঙ্গা করার ব্যাপারে কাজ করবে। এবং অচিরেই তুর্কী হুকুমত দেখতে পাবে যে সে এ ধরনের একটি মাত্র আইনের বদৌলতে অনেক শক্তিশালী ও উপকারী বন্ধু অর্জন করে ফেলেছে।

পরবর্তী পত্রে ১ ডিসেম্বর, ১৮৪০ সালে বিল মারস্টোন ইস্তাম্বুলে তাঁর রাষ্ট্রদূতের নিকট লিখেছেন ঃ সুলতানের পারিষদ এবং স্বয়ং কি সুলতানকে এ ব্যাপারে বোঝাতে চেষ্টা করবে যে, 'মুহাম্মদ আলী' দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে পারে। যদি তাকে আপনি সে সুযোগ দেন তাহলে সে আবার দামেস্কে এসে নতুন খেলাফতের ঘোষণা দেবেন এবং

উমাইয়্যা খেলাফতের স্মৃতিময় দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনতে চাইবেন। এরপর তিনি আরবদের আহ্বান করে তাদের এক প্লাটফরমে আনার জন্য বড় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন। আর তাহলে এটা নিকটপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরের ভারসাম্যের ওপর প্রভাব ফেলবে।

ইস্তাম্বুলের রাষ্ট্রদূতের কাছে লেখা বিল মারস্টোনের পত্রে আরও বলা হয় ঃ এই সাম্রাজ্য যদি প্রতিষ্ঠা হয় তবে তুর্কীস্তানের ওপর হুমকি সৃষ্টি করবে। এমনকি একটি রাষ্ট্র হিসাবে এর অস্তিত্বের অবসান ঘটাবে। এখন ত্বরিত সমাধান হলো উসমানী খেলাফত ও মুহাম্মদ আলী বা তাঁর উত্তরসূরিদের উচ্চাভিলাষের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। সুলতান ও তার পারিষদবর্গের এখন উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, মুহাম্মদ আলীর লিপ্সা কেবল পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ওপরই সীমিত নয় বরং তার উচ্চাভিলাষ লোহিত সাগর, এমনকি এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত— যাতে তার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য নিষ্কণ্টক হয়। যে প্রতিবন্ধকটির কথা ভাবা যায় তা হচ্ছে ফিলিস্তিনে ইহুদী পুনর্বাসন। কারণ তাদের দ্বারা মুহাম্মদ আলীর কোমরে একটি কাঁটা রাখা হবে যাতে সে একদিকে তুর্কিস্তানকে হুমকিমুক্ত রাখবে অপরদিকে লোহিত সাগরে তার লালিত স্বপ্ন ডুব সাঁতারের খেলা খেলতেও দেবে না। যদি সুলতান ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শগুলো গ্রহণ করে তাহলে ফিলিস্তিনের ইহুদী উপনিবেশগুলো তার (ব্রিটেনের) প্রটেকশনে রাখতে প্রস্তুত; যাতে এটা মুহাম্মদ আলীর জন্য একটি সদাসতর্ক সঙ্কেত হয়ে থাকবে, যাতে সুলতান রাষ্ট্রের হুমকি থেকে নিরাপদ থাকেন।

দু'মাস পর আবার বিল মারস্টোন তাঁর তুর্কিস্তানের রাষ্ট্রদূতের কাছে লিখছেন ঃ

"আপনি সুলতানকে বারবার বোঝাতে থাকবেন যে, তিনি যদি ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে যেতে ও সেখানে পুনর্বাসনে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যোগান তাহলে তিনি বিরাট রকমের ফায়দা লুটতে পারবেন। সুলতান অচিরেই উপলব্ধি করবেন যে, ফিলিস্তিনের ইহুদীরা শীঘ্রই তার কাছে এক প্রকার প্রকৃত ও বাস্তব নিরাপত্তার দাবি জানাবে। দেখছেনই-তো ইংরেজ সরকার চাচ্ছে যে, এই নিরাপত্তার ভার সে নিজেই বহন করবে। কাজেই আমরা প্রস্তাব করছি যে, ঐ সকল ইহুদীর সামর্থ্য রয়েছে যে, তারা ইংল্যান্ডকে সুরক্ষা করার ইচ্ছা পোষণ করুক এবং তারা তাদের অভিযোগগুলো ইংরেজ সরকারের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে (আল-বাবুল আলী) স্থানান্তর করতে পারবে।"

গভীরভাবে চিন্তার বিষয় হলো— ঐ সময় ফিলিস্তিনে ইহুদী জনসংখ্যা ছিল সর্বাসাকুল্যে মাত্র ৩,২০০। লন্ডন তখন প্যারিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগুচ্ছিল। বিল মারস্টোন তখন নেপোলিয়নের পদচিহ্ন অনুসরণ করছিলেন মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে— ঐ অঞ্চলে যাদের বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল তারা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিল না।

॥ ৫ ॥

বিল মারস্টোন

"ব্রিটেন চাচ্ছিল ইহুদী প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স বারবার চাচ্ছিল 'আল্-কুদ্স'কে রাজধানী করে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে।"

—ফ্রান্সের সংসদে প্রদত্ত এক ভাষণে ফরাসী কবি আলফোঁস দ্য লামটিন

১৮৪০ সালে মুহাম্মদ আলী পাশার পরাজয়ের পর ইউরোপীয় শক্তি তাঁর ওপর দু'টি চুক্তি চাপিয়ে দিল। প্রথমটি ছিল মিসরের কর্তৃত্বে তাঁর ও তার উত্তরসূরিদের অধিকার সম্পর্কিত। এ চুক্তির প্রথম তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. শিল্পায়নের বড় ধরনের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা— যার প্রতি তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন।
২. মিসরীয় বাহিনীকে ছাঁটাই করে কেবল মিসরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানের জন্য যথেষ্ট এতটুকু সাইজে সীমিত রাখা।
৩. মিসরকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য অবাধ ও নিঃশর্তভাবে উন্মুক্ত করে দেয়া।

আর দ্বিতীয় যে চুক্তি বা অঙ্গীকারটি তার ওপর আরোপ করেছিল তার শিরোনাম ছিল খুবই অভিনব ঃ "সিরিয়ার পরিস্থিতি শান্ত করার (Pacification) লন্ডন চুক্তি।" এর ধারাগুলোর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল 'মুহাম্মদ আলীকে' সিরিয়া থেকে বের করে দেয়া কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল সেই চুক্তি যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ব্যাপক ইহুদী অভিবাসনের মঞ্চ সজ্জিত করা। এ ছাড়া প্রাচ্যের উসমানী খেলাফতের মালিকানার উত্তরাধিকারে রাজনৈতিক মতলব হাসিল করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশেষ করে সেই ভূমধ্যসাগরীয় পূর্ব কোণটি যেখানে মিসর ও সিরিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থান রয়েছে, তা হস্তগত করাই ছিল এর পেছনে বেশি কার্যকর।

এ পর্যায়ে রাষ্ট্রনায়কগণ তাদের রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রীদের প্রতি যে নির্দেশনা দিয়েছিল তার আলোকে যে সব ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হয়েছিল তার চেয়েও বেশি প্রকাশ পায় তাদের একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী বিল মারস্টোনের জামাতা ও ঘনিষ্ট বন্ধু লর্ড শাভসপেরী-এর স্মৃতিকথাই হলো সে সময়কার উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা আর মুভমেন্টের জানার মতো সবচেয়ে বড় দলিল। ২৪ আগস্ট ১৯৪০ সাল লর্ড শাভসপেরী তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন ঃ "এইমাত্র 'টাইমস' পত্রিকার শিরোনাম

পড়ে আমার একদিকে ভয় জাগল, অন্যদিকে খুশিও হলাম। আশঙ্কা হলো আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সময় হবার আগেই জানাজানি হয়ে গেল কিনা। কারণ তখনও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আরও সামর্থ্য সঞ্চয় করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা দরকার ছিল। এ সময় পাছে এ প্রকল্পের বিরোধী শক্তি ও পক্ষগুলো প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে! কিন্তু অন্যদিকে সংবাদ শিরোনামটি আমাকে সুখী করল এ জন্য যে, এটি সুস্পষ্টভাবে বলছে, 'সিরিয়ার পরিস্থিতি শান্ত করার লন্ডন চুক্তিটি' ইহুদীদের স্বদেশে ফিরে যাবার পথ সুগম করছে। এই হলো সেই সব চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা যেগুলো অনেক আলাপ-আলোচনার পর আমরা স্থির করে রেখেছিলাম।

বিল্ মারস্টোন আমাকে বলেছিলেন যে, "তিনি আমাদের ইস্তাম্বুলস্থ রাষ্টদূত লর্ড 'বনসনবে'-এর কাছে লিখেছেন যেন রশিদ পাশার সাথে সরাসরি সংযোগ (হট লাইন) খোলেন যাতে তিনি সুলতানকে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যোগাবার ব্যাপারে বুঝায় এবং ওখানে তার সুরক্ষায় আমাদের শক্তি সম্পর্কে তিনি যেন পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেন।"

১৮৪০ সালের ২৫ ডিসেম্বর শাভসপেরী তার রোজনামচায় লিখেছেন ঃ

"আমি বিল মারস্টোন-এর জন্য আমাদের প্রকল্পের একটি মেনিউট প্রস্তুত করা শুরু করেছি। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমি 'ইহুদীদের স্বদেশে ডেকে পাঠানো' (Recall) শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছি। আবার মনে হলো সম্ভবত'Recall' শব্দটি প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি মাত্রায় জোরালো হয়ে গেল! বরং শব্দটিকে পাল্টিয়ে 'পারমিশন' (Permission) শব্দটি ব্যবহার করাই শ্রেয়। কারণ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পরিকল্পনাটির কাজ সুস্পষ্ট হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টাইমস্-এর আজকের নিবন্ধটি বেশ চমৎকার! "এটি 'পঞ্চ বৃহৎশক্তির ছত্রছায়ায় ইহুদী জাতিকে তাদের বাপ-দাদার ভিটামাটিতে আবাদ করার' আমাদের পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা করেছে।"

লর্ড বিল মারস্টোন আরও বলেন ঃ "ফ্রান্সের অবশ্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রচেষ্টা চালানো উচিত যাতে আল-কুদ্সকে রাজধানী করে একটি খৃস্টান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।"

এই সকল চিন্তা-ভাবনা ছিল এমন কিছু বীজদানা যা বাতাসে বয়ে নিয়ে গেছে পূর্বভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চলে, তার উপত্যকায় আর সমভূমিতে— তার জনগণ ও রাজন্যবর্গের কাছে।

* এক দিকে থেকে এগুলো ছিল সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের বীজ তথা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশল— যা সব কিছুকেই ব্যবহার করে ছেড়েছে, এমনকি ধর্মীয় কিংবদন্তিকেও।

* অপরদিকে এসব ছিল আসলে 'পবিত্র ও সংরক্ষিত'-এ ধারণার বীজ যা এক সময় অঙ্কুরিত হবে; যখন ঐ অঞ্চল জেগে উঠবে এবং ইতিহাস সৃষ্টিতে একেকটি পক্ষ হবে। ইতিহাস তাদের হাতের খেলনা নয় যারা কেবল 'শক্তিকেই' ইতিহাস সৃষ্টির একমাত্র উপাদান মনে করে।

সংশ্লিষ্ট এলাকা মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বাসিন্দাদের সাথে তখন কেউ কোন যোগাযোগ করেন, তাদের মতামতও কেউ শুনতে চায়নি। কোন একটি পক্ষও তাদের সাথে সংলাপ করেনি এমনকি, মানচিত্র অঙ্কন বা সীমান্ত নক্সা আঁকার সময় তাদেরকেও কেউই সঙ্গে রাখেনি।

কারণ বায়ু কখনও জমীনকে জিজ্ঞাসা করে তার বয়ে নেয়া বীজ ফেলে না। অন্যরা কি ফেলছে তাও জিজ্ঞাসা করে না। এও শুধায় না যে তার অনুভূতি, চিন্তা বা উদ্দেশ্য কি বরং সে এক দুরন্ত শক্তি; তার যা আছে নিক্ষেপ করে আর দোআঁশ মাটি তা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় লুফে নেয়।

এটাই ছিল সেই মহা স্ট্রাটেজির শুরু। যা ছিল বড়াই বদ আর দূরদর্শী— নিজের মতলব হাসিলের জন্য লাগসই ফন্দি এঁটে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

একটি মানচিত্র তার জমিন খুঁজে ফিরছে !

"যদি ইতিহাসকে একটি ষড়যন্ত্ররূপে চিত্রায়ণ করা ভুল হয়ে থাকে,
তাহলে তাকে একটি কাকতালীয় ঘটনা বলা হবে
এর চেয়েও বড় ভুল।"

॥ ১ ॥

রোচিল্ড

"তোমরা মুহাম্মদ আলীকে শাম থেকে তাড়িয়েছ বটে কিন্তু তোমরা তার পিছনে যে শূন্যতা ছেড়ে এসেছ তা পুরাবার কেউ রইল না।"

— ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রোচিল্ড

গোটা সমাজের জন্য একটি মাত্র বিষয় বা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কৌশল হিসাবে নির্দেশ করা কঠিন। স্বভাবতই বিভিন্ন বিষয় বা উপাদান থাকে যারা কখনও কখনও একটি আরেকটির বিপরীত। এসব নিয়েই একটি ব্যাপক ভিত্তিক স্ট্রাটেজীর ধারণা বের হয়ে আসে যার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে পর্যায়ক্রমে তার বিভিন্ন দিককে বিন্যাস করা হয়। এ কারণেই প্রাচ্যে ব্রিটিশ রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য যে মিসর ও সিরিয়াকে আলাদা রাখা বা ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্রকে এতদুভয়ের মিলনের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তা বলা কঠিন।

বরং এর সাথে নিশ্চিতভাবে আরও অনেক উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল। যেমন ভারতবর্ষের সাথে সাম্রাজ্যের যোগাযোগের রুটগুলোর নিরাপত্তা বিধান, বাণিজ্যে জলপথগুলোর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা এবং ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও অর্থ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লন্ডনকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক হিসাবে প্রতিষ্ঠাও ছিল এই স্ট্রাটেজির অন্যতম দিক। এগুলো সবই ছিল জ্বলন্ত বাস্তবতা। তারপরও বলতে হবে, এতসব স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের মাঝেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সেই সময়টিতে মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে ব্যবধান রচনা এবং এ ব্যবধানের দেয়াল হিসাবে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল ব্রিটিশ রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। আর এ প্রক্রিয়া চলে আসছে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ্যে ও দৃঢ়পদভারে সেই ১৮৪০ সালের লন্ডন চুক্তির পদচিহ্ন ধরে ১৯১৭ সালের 'বেলফোর প্রতিশ্রুতি' ইস্যু পর্যন্ত।

১৯৪০ সালে সরাসরি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ব্রিটেনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল সিরিয়ার জমীনকে প্রস্তুত করা। কারণ তখন গোটা ফিলিস্তিন অঞ্চল ছিল শামের (বৃহত্তর সিরিয়ার) একটি প্রদেশ। ব্রিটেন সেই বিবেচনাতেই সিরিয়ার প্রতি নযর দিল।

এ প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 'বিল মারস্টোন' প্রথমেই যে কাজটি করেছিলেন তা হচ্ছে— তিনি দামেস্ক, হালব, আল-কুদ্স, বৈরুত ও হিফাতে অবস্থিত প্রতিটি ব্রিটিশ কন্স্যুলেটে গোপন পত্র প্রেরণ করলেন। তার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আমরা মুহাম্মদ আলীর পরাজয় ও তাকে সিরিয়া থেকে বের করার পর এখন তুর্কীদের সাথে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ আছি। এ ব্যাপারে আমরা তাদেরকে কখনও অপমানিত করব না। কিন্তু এ কারণে আমরা এ অঞ্চলে আমাদের রাজনৈতিক আবেদন বাস্তবায়নে বিরত থাকতে পারি না।

তুর্কীরা জানে, এই অঞ্চলে ইহুদীদের প্রতি তাদের কি কাজ করা উচিত। কিন্তু আমাদের অবশ্যই নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের গতিবিধি অনুসরণ করে যেতেই হবে, যাতে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, ওখানকার ইহুদীরা কোন রকম বৈষম্য বা নির্যাতনের শিকার না হয়। এখন আমাদের কাজ হলো যেন ইহুদীরা আমাদের ওপর আস্থাবান থাকে এবং তারা যেন নিশ্চিত হয় যে, ব্রিটিশ সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে তাদের সহায়তা করতে চায় এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে।

আমার মনে হয় যে, আমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে শামের সকল ইহুদীর জানা থাকা জরুরী। এমনকি ইংল্যান্ড ভিন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে যেসব ইহুদী আছে তাদেরও ওয়াকিবহাল থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণভাবে অস্ট্রীয়, ফরাসী ও ইউরোপীয় ইহুদীদেরও এটা জানা থাকা দরকার। তাদের মূল দেশীয় কন্স্যুলেট যদি তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা তাদের সহায়তার জন্য ব্রিটিশ কন্স্যুলেটের আশ্রয় নেয়ার অধিকার রাখে। তারা সবাই যেন নিশ্চিত জেনে রাখে যে, ইংল্যান্ড হচ্ছে ইহুদীদের সহায়।"

বিল মারস্টোনের এই নির্দেশনা তার প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শামে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ইহুদীদের মধ্যে এটা এতই মনোবল সৃষ্টি করল যে, আল-কুদ্স-এর ইহুদীদের পক্ষে তাদের পাদ্রী তখন রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে একটি 'অনিষ্টতা নিরোধক ওড়না' পাঠালেন। ১৮৪৯ সালে তাঁর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এটা হয়েছিল লন্ডনে রোচিল্ড পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত একটি ছোট্ট ইহুদী সম্মেলনের পর পরই। এ সম্মেলনে দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় ঃ

১. বিশ্ব ইহুদী কর্তৃক যে যেখানে আছে ইংরেজদের সহায়তা গ্রহণের ঘোষণা।
২. অন্যান্য অঞ্চলে চলমান প্রক্রিয়ায় ফিলিস্তিনে ইহুদী উপনিবেশ গড়ে ওঠার ব্যবস্থা করার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে প্রত্যাশা জ্ঞাপন করা।

এখানে 'অন্যান্য অঞ্চল' বলতে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় সরগরম ইউরোপীয় পুনর্বাসন আন্দোলনের দিকে। সে যুগ ছিল সশস্ত্র প্রত্যাবাসনমূলক অভিবাসনের যুগ। ইহুদীরা ফিলিস্তিনের বেলায়ও সে ধরনেরই ব্যবহার দাবি করছিল।

লর্ড সাফসপেরি তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন ঃ "আমি এলবারোন রোচিল্ডকে সাথে নিয়ে বিল মারস্টোন-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। এ সময় রোচিল্ড প্রচণ্ড রকমের আবেগ উচ্ছ্বসিত ছিল। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সামনে রাখা মানচিত্রের দিকে ইশারা

করে বিল মারস্টোনকে বললেন ঃ "আপনারা মুহাম্মদ আলীকে এইখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন (সিরিয়ার দিকে ইশারা করে)। কিন্তু আপনারা তার পরে একটি শূন্যতা রেখে দিলেন। মুহাম্মদ আলীর প্রস্থানের পর তুর্কীরা আবার সিরিয়াতে ফিরে এসেছে। অথচ সবাই জানে যে, সুলতান এক পরাজিত শক্তি। আপনাদের শক্তির কল্যাণেই কেবল তিনি দামেস্কে ফিরে আসতে পারলেন। কাজেই সিরিয়ায় তাঁর কর্তৃত্ব খুবই দুর্বল আর পরিস্থিতিও এলোমেলো। বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর মারমুখী। এ সময়টিতে সেখানে একটি শূন্যতা বিরাজ করছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এরপর রোচিল্ড তাঁর আলোচনায় এক নাটকীয় পটপরিবর্তন এনে প্রধানমন্ত্রীকে বললেন ঃ আপনি সেখান থেকে একটি অশুভ শক্তিকে বের করে দিয়েছেন সত্য, তবে সে শক্তিটি কর্মকাণ্ডকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত। এখন অনিবার্যভাবে আপনাদের অন্য কোন শক্তিকে সেখানে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে, যে পুরো কর্মকাণ্ডকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে। তবে তা বদ প্রকৃতির হবে না ..... ইহুদীদের একটি জাতীয় দেশ।"

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ সময় বিভিন্ন সূত্র থেকে সিরিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন রিপোর্ট সংগ্রহ করছিলেন। এর মধ্যে 'স্যার মূসা মন্টিফিউরি'ও ছিলেন। তিনি সে সময়ে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তাঁর সামাজিক কর্মতৎপরতার জন্য একজন সুপরিচিত ব্রিটিশ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবার প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। এর মধ্যে সাতবার ছিল তাঁর ফিলিস্তিন সফর। মন্টিফিউরি'র প্রাচ্যের প্রতি এই আগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের দ্বার উন্মুক্ত করায় কাজ করা। সে সময়ে যে একটি সাধারণ পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল তার প্রভাব লন্ডন পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। আর সেখান থেকেই এই ব্যক্তিটিও প্রভাবিত হয়েছেন।

এ অঞ্চলে মন্টিফিউরি'র প্রথম সফরেই মুহাম্মদ আলী পাশার সাথে মিসরে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল। এবং তখনই তিনি ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের বিষয়টি পড়েন। সে সময় ফিলিস্তিন ছিল সিরিয়ার একটি প্রদেশ হিসাবে তাঁরই অধীন। এ সময় মুহাম্মদ আলীর জবাব ছিল— মন্টিফিউরি'র লেখা ও তার স্ত্রীর নিয়মিত ডায়রি অনুসারে— "তিনি স্যার মূসা মন্টিফিউরি থেকে যা শুনলেন তা ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং ইউরোপে ইহুদীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু ইহুদী অভিবাসনের জন্য ফিলিস্তিনের দরজা খুলে দেয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি উসমানী খলিফার কর্তৃত্বাধীন।"

এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মিসরের মেধাবী গভর্নর তাঁর কাছে উপস্থাপিত বিষয়টিকে গভীর ষড়যন্ত্র হিসাবে ধরতে পেরেছিলেন। আর তাই বিষয়টিকে ইস্তাম্বুলের 'বড় দরজার' দিকে স্থানান্তর করে দিলেন।

বহু বিষয়ে তাঁর কর্মকাণ্ড ছিল এ ধরনের স্থানান্তরের বিপরীত। কিন্তু তখনকার প্রামাণ্য সূত্রগুলোতে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ নেই যে, মুহাম্মদ আলী আগেভাগেই

দুরভিসন্ধি জেনে গেছেন এবং ইস্তাম্বুলের দিকে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব ঠেলে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন।

মুহাম্মদ আলীর পরাজয়ের পর মন্টিফিউরি ও অন্যদের সামনে লন্ডনকেন্দ্রিকতা ছাড়া তেমন কিছু বাকি রইল না। বিশেষ করে ইস্তাম্বুল এমন একটি দরজায় পরিণত হলো— না সেটা ভেজানো, না তা খোলা। কারণ ইহুদী প্রেসার গ্রুপ চাইল, মুহাম্মদ আলীর পরাজয়ের সুযোগ ব্যবহার করে ফিলিস্তিনের দিকে ইউরোপীয় ইহুদী অভিবাসনের ঢেউ সৃষ্টি করতে। এটা দামেস্কে দুর্বলভাবে ফিরে আসা সুলতানের জন্য খুবই বিব্রতকর ছিল। (যেমনটি রোচিল্ড সাহেব বিল্ মারস্টোনের সাথে তার আলোচনায় মন্তব্য করেছিলেন)। আর এ দুর্বলতার কারণেই সুলতান তাঁর নিজ পরিষদেরই কিছু সদস্যের পক্ষ থেকে চাপের সম্মুখীন হন। যারা ব্যাপকভিত্তিক ইহুদী অভিবাসনের আশঙ্কা করছিলেন। এই চাপের পেছনে ছিল ইসলামী চেতনা এবং তাঁর পারিষদদের সাথে বিভিন্ন গভর্নর ও খোদ্ শামের আরবি ও ইসলামী চিন্তানায়কদের সম্পর্কের প্রভাব।

এ অঞ্চলে একটি ভ্রমণ শেষে মন্টিফিউরি আবার বিল মারস্টোন-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন— (লেডি মন্টিফিউরি'র রোজনামা অনুসারে) তিনি তাঁর ইস্তাম্বুল সফরের সময় লক্ষ্য করনে যে, ইহুদীদের প্রতি শাহী দরবারের (আল-বাবুল আলী), সাহসী অনুপ্রেরণা তাঁর চারপাশের 'সাম্প্রদায়িক শক্তি'র প্রভাবে শীতল হয়ে গেছে। তারা তাদের বুঝিয়েছে যে, চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ বিশ্বের সব ইহুদীই ফিলিস্তিনে ফিরতে প্রস্তুত নয়। এমন কি আগ্রহীও নয়। কাজেই সুলতানের জন্য ফিলিস্তিনের উপকণ্ঠে লাখ লাখ ইহুদীর আবির্ভাবের কোন আশঙ্কা নেই। আমরা আশা করছি এর চেয়ে অনেক কমসংখ্যক ইহুদীই এখানে আসতে চাইবে। আমরা তো কেবল ইহুদীদের বেলায় তা-ই প্রত্যাশা করি যেমনটি ইংরেজ, হাঙ্গেরীয়, জার্মান ও জাপানীদের বেলায় হয়েছিল— একটি দেশের লোক হয়ে সে দেশের মালিক হবে যার রাজধানী হবে 'আল্-কুদ্স।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের ঊষালগ্নে ইংল্যান্ডে ইহুদীদের সুরক্ষার বিষয়টি প্রায় চূড়ান্তরূপ লাভ করল। যখন সামরিক মার্চ পাস্টের ব্যান্ডের ছন্দ-লয়ে একাত্ম হয়ে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের সাথে সাথে সমুদ্র থেকে সমুদ্রে পার হয়ে গেল। এ সময় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ টমাস ক্লার্ক, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফিলিস্তিন ইহুদীদের জন্য' প্রকাশ করেন। একই সময় প্রখ্যাত কবি লর্ড বায়রন তাঁর হিব্রু গানের এক সম্পূর্ণ সিরিজ প্রকাশ করলেন। এর মধ্যে একটি নতুন গীতি-কবিতা বেশ প্রসার পেল।

> 'আবির্ভূত হোন, হে মহান ঈশ্বর!
> আপনার অপার শক্তি হোক ভাস্বর।
> উজ্জ্বল উষ্ণতা তার— দ্যুতি অনির্বাণ

আলোকিত করুক সব ইয়াকুব সন্তান।
ফিরিয়ে দিন এই সব সিংহশাবকদের
নিজ প্রতিশ্রুত সেই ভূমিতে ফের।
ফিলিস্তিনের পথের দিশা দিন তাহাদের
সেই তো তাদের স্বদেশ ভূমি— স্বপ্ন সাধের!

কিন্তু বিল মারস্টোনের মতো যারা সাম্রাজ্য বিনির্মাণে মশগুল বা রোচিল্ড-এর মতো নিজেদের ভার হাল্কা করার জন্য প্রাচ্যের ইহুদীদের ফিলিস্তিনে রফতানিতে আগ্রহী ইহুদী পুঁজিবাদী অথবা ওয়াশিংটনের মতো যারা সিরিয়া থেকে মিসরকে আলাদা করা তথা আফ্রিকাতেই মিসরী শক্তিকে অবরুদ্ধ করে রাখার পক্ষপাতী অথবা মন্টিফিউরি'র মতো দানবীর বা বায়রনের মতো কবিরাই কেবল ফিলিস্তিনের দরজা ইহুদী অভিবাসনের জন্য উন্মুক্ত করার দিকে সব বিষয়কে ধাবিত করেননি বরং বিভিন্ন ঘটনাবলীও এ দিকেই তাদের ক্রমবর্ধমান চাপ বৃদ্ধি করে চলেছিল। এ জন্যই দেখা যায়, সে সময় (১৮৫৪) আল-করম উপদ্বীপে যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল এবং এ লড়াই হাজার হাজার বলকান ইহুদীকে পশ্চিম ইউরোপের তাদের দীনী ভাইদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার দিকে ঠেলে দেয়। এভাবেই বিভিন্ন ঘটনা বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী, সামরিক ও আর্থিক স্ট্রাটেজির চাপের সাথে আরও কিছু শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। এছাড়া দানবীরদের স্বপ্ন আর কবিদের কল্পনা তো রয়েছেই।

ঘটনার অনিরুদ্ধ ধারা ব্রিটেনে চরম আকার ধারণ করল। নতুন প্রজন্মের ইংরেজ নেতৃত্ব তাদের পূর্বসূরিদের নীল-নক্সার চেয়ে কিছু কম গেল না। এ সময়ই ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর আসনে এমন দু'জন রাজনীতিক অধিষ্ঠিত হলেন যাঁরা ছিলেন প্রথম ও শেষ ইহুদী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। একজন হচ্ছেন গ্লাডস্টোন প্রট্যাস্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, অপরজন হচ্ছেন— ডিজরাঈলী। তবে উভয়ই ছিলেন জায়নিস্ট— ইহুদীবাদী।

প্রথমজন (গ্লাডস্টোন) খ্রিস্টীয় মতে শাব্দিক অর্থে জায়নিস্ট ছিলেন। অর্থাৎ যারা ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ফিলিস্তিনে ইহুদী প্রত্যাবর্তনকে ধর্মীয়ভাবে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়জন (ডিজরাঈলী) শব্দের ইহুদী অর্থে জায়নিস্ট ছিলেন। তবে ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও তার ইহুদীয়ত্ব ছিল বালির গভীরে প্রস্তরখণ্ডের মতো।

এই ডিজবাঈলী– যিনি তাঁর প্রথম জীবনে বই আর সাহিত্যকে শখ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন– তার গুপ্ত ভেদকে প্রকাশ করেছিলেন। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জবানীতে। যেমন তাঁর এক নায়কের মুখে প্রকাশ পাচ্ছে ঃ

"ইংল্যান্ডকে এর কোন রাজনীতিক একটি বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাব অফিসে রূপান্তর করতে চাইলেও আসলে ইংল্যান্ড-এর চেয়েও অনেক বড় ....। ইংল্যান্ডের রয়েছে একটি হৃদয়, একটি মনন। এ জন্যই ইংল্যান্ড এটা উপলব্ধি করেই ইহুদীদের পক্ষ নিয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, যে ইসরাইলের উন্মেষকে বিলম্বিত করে।

'ডিজরাঈলী' তার বালুচাপা পাথরকে কেবল তাঁর উপন্যাসের নায়কদের সামনেই ঝলসে উঠতে দেননি বরং একদিন তো তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী-গ্লাডস্টোনকে এও বলে ফেললেন— তাঁর লেখা অনুসারে ঃ

"আমি চাই আপনি এটা বুঝতে চেষ্টা করুন যে, যেসব রাষ্ট্রে ইহুদীদের প্রতি সদাচরণ করেছে কেবল তারাই এগিয়ে গেছে এবং সমৃদ্ধি লাভ করছে।" এ সময় বলকানে আল্-কারাম যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা ইহুদী শরণার্থী কাফেলাগুলো পশ্চিম ইউরোপের রাজধানীগুলোতে পৌঁছতে ছিল। তবে গ্লাডস্টোন বা ডিজরাঈলী— উভয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি কেবল ধর্মীয় চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাঁরা দু'জনই প্রথম শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন।

তাছাড়া উভয়ই সে সময় ফ্রান্সের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। এ সময় ফ্রান্স তার ফরাসী বিপ্লবের ডামাডোল থেকে কেবল বেরিয়ে এসেছে এবং সবেমাত্র নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অল্প কিছুদিন পরই তার পতনও ঘটে। তাছাড়া 'বোরবোন' প্রত্যাবর্তনের সমস্যাও তাদের বিফলতার পঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনে প্রবেশ করল। তিনি (৩য় নেপোলিয়ন) তখন ফরাসী ভূমিকার সূতাগুলো একত্রিত করতে শুরু করেছিলেন যার আওয়াজ বিশেষ করে মিসরে শোনা যাচ্ছিল।

তৃতীয় নেপোলিয়নই সুয়েজখাল খননের প্রকল্পে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী সম্রাজ্ঞী 'ইউগেনী'-ই খেদিভ 'ইসমাঈল'-এর সাথে প্রহরাধীন জাহাজে করে সর্বপ্রথম কাফেলা হিসাবে ১৮৬৯ সালে এই সুয়েজ খাল অতিক্রম করেন।

গ্লাডস্টোন ও ডিজরাঈলী— উভয়ের কাছে স্পষ্ট হতে লাগল যে, খেদিভ ইসমাঈলের আমলে মিসরে ফরাসী আধিপত্য দিন দিন বেড়ে চলেছে। এটা বহুলাংশে সত্য ছিল। যদিও এটা ফরাসী ইচ্ছায় হয়নি বরং এর বাস্তব কারণ ছিল অন্য একটি বাস্তবতা থেকে উৎসারিত। তা হচ্ছে মুহাম্মদ আলীর আমলে ফ্রান্সে প্রেরিত শত শত বৃত্তিধারী মিসরে ফিরে এসে প্রশাসনের বিশিষ্ট স্থানসমূহে জায়গা করে নিয়েছিল। স্বভাবতই তারা ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিত বিষয়াদিতে প্রভাবিত হয়েছিল এবং প্যারিসের জীবনে যে সংস্কৃতি অর্জন করেছিল তা তাঁদের মধ্যে পরবর্তীতে কাজ করছিল।

কিন্তু গ্লাডস্টোন ও ডিজরাঈলী উভয়েরই ছিল ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা। তারা শাম-এ যা ঘটছিল তার সাথে মিসরের চলমান ঘটনাবলীর যোগসূত্র খুঁজতেন। বিশেষ করে যখন সুলতানের শৌর্যবীর্যতে ভাটা পড়েছিল সেই দিনগুলোতে উসমানীর নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল বহু সিরীয় চিন্তাবিদ ও শিল্পী।

॥ ২॥

ডিজরাঈলী

"যথাশীঘ্র সম্ভব চুক্তি সম্পাদন করার জন্য স্বর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।"

—ডিজরাঈলীর প্রতি বারন রোচিল্ড

ইতিহাসকে ষড়যন্ত্র হিসাবে চিত্রিত করা যখন ভুল, তখন তাকে কাকতালীয় ঘটনা বলে চিত্রিত করা আরও বড় ভুল। বস্তুত ইতিহাস হচ্ছে কিছু চিন্তাচেতনা, কিছু পরিকল্পনা এবং জাতি ও সম্প্রদায়ের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা তথা স্বার্থের দ্বন্দ্ব, শক্তির সংঘাত এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের নিরন্তর প্রচেষ্টার নাম; যার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে উপকৃত হওয়ার আশা করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে মিসর ও তার আশেপাশে যে লাগাতার বড় বড় ঘটনা ঘটে চলেছিল, বিশেষ করে ফিলিস্তিনে— তাকে কখনই কাকতালীয় অসংলগ্ন ঘটনা বলা যায় না।

১৮৭৫ সালে সুয়েজখাল কোম্পানীর মিসরীয় অংশ ক্রয়ে ডিজরাঈলী সাহেব রোচিল্ডকে সাহায্য করেছিলেন। ঘটনার সূচনা হলো, যখন 'হেনরী ও বেন্‌হায়েম'— ইহুদী ধনকুবের ও খেদিভ ইস্‌মাঈলের অন্যতম করমদাতা— জানতে পারলেন যে, মিসরের গভর্নর সুয়েজখাল কোম্পানীতে তার অংশীদারী বিক্রি করতে চান এবং তিনি এমন একজন খরিদ্দারের খোঁজ করছেন যিনি তা গোপনে নগদ অর্থে ক্রয় করবেন। তিনি এও আশঙ্কা করছেন যে, তাঁর ঋণদাতারা যদি আগেই জেনে যান এবং কেনাবেচাটা যদি ব্যাংকিং উপায়ে সম্পন্ন হয় তাহলে তাঁর সেই সব ঋণদাতা— যাঁরা সংখ্যায় অনেক আগেভাগেই বিক্রিলব্ধ অর্থের ভাগ নেয়ার জন্য বুকিং করে রাখবে। এ সময় (এক পত্রিকার মালিক) ইহুদী ধনকুবের— 'গ্রিনউড'ও ততক্ষণে 'ও বেনহায়েম' থেকে এ ঘটনা জেনে যান। তিনি কালবিলম্ব না করে তখনই তৎকালীন ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী লর্ড ডেরবির নিকট চলে গিয়ে তাঁকে সংবাদটি দিলেন। মন্ত্রী তাঁকে সঙ্গে করে তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রী ডিজরাঈলীর অফিসে উপস্থিত হলেন। তিনি মনে করলেন যে, মিসরের ভূমিতে ইংরেজের পা রাখার এ হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। ডিজরাঈলী দ্রুত ভাবতে লাগলেন। তাঁর সামনে সমস্যা হলো— এই ক্রয়-বিক্রয় গোপনে হওয়া এবং নগদ অর্থ লাভ করার বিষয়ে খেদিভের আগ্রহ। কারণ এ দু'টি শর্তের কারণে তিনি

বাণিজ্য চুক্তিটি পার্লামেন্টে পেশ করতে পারবেন না। ডিজরাঈলীকে বেশি সময় চিন্তায় থাকতে হয়নি। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমাধান খুঁজে পেলেন। তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি লর্ড রাওটনকে পাঠিয়ে আলবারুন রোচিল্ডের কাছে এর সমাধান চাইলেন। রোচিল্ড লর্ড রাওটন-এর নিকট কয়েক দিন সময় চাইলেন। এর মধ্যে তিনি কিছু একটা করবেন।

চাহিদা ছিল ৪ মিলিয়ন পাউন্ডের। স্বর্ণ, ক্যাশ ও রেডি স্টক। প্রধানমন্ত্রী জানতেন যে, এমনকি রোচিল্ডও তাঁর ভাণ্ডারে এত বড় অঙ্কের অর্থ নগদ রাখেন না। তাছাড়া তিনি তাঁর পরিবারের (ফ্রান্স ও জার্মানীতে অবিস্থিত) সকল শাখার সম্মতি না নিয়ে এই অঙ্কের অর্থ লেনদেন করতে পারবেন না। এতদসত্ত্বেও ডিজরাঈলী অবাক হয়ে দেখলেন, পরদিন সকালেই রোচিল্ড তাঁর কার্যালয়ে আগেভাবেই এসে তাঁকে ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য বলছেন। তিনি এ সংবাদ দিতে এসেছেন যে, যথাশীঘ্র সম্ভব এই কেনাবেচার কাজ সম্পন্ন করার জন্য স্বর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। যাতে মিসরের খেদিভ তাঁর মত পাল্টাবার আগেই বা এই গোপন কারবারের খবর অন্যদের কাছে ছড়িয়ে পড়ার আগেই কাজ সারা যায়।

সুয়েজখালের স্রোতধারায় ফেনিল তরঙ্গমালা আছড়ে পড়তে লাগল এবং 'সিনাই'-এর চারপাশকে তা বানভাসি করে তুলল।

১৮৭৭ সাল। সুয়েজখালে 'খেদিভ'-এর হিসসা ব্রিটেন কিনে নেয়ার পর এক বছরের বেশি হবে না, রোচিল্ড পরিবার ফিলিস্তিনে ইহুদী আবাসনের জন্য ২২৭৫ ফাদ্দান আয়তনের এক প্রথম উপনিবেশ সৃষ্টির জন্য অর্থ যোগান দিল। এ ছিল যথেষ্ট বড় এক উপনিবেশ।

ঐ বছরই ব্রিটিশ সরকার সুলতানের কাছে এই অনুমতি চাইল যেন তিনি সাইপ্রাসে সামরিক বাহিনী অবতরণের অনুমোদন দেন। কারণ বৃহত্তর সিরিয়া উপকূলে কি ঘটছে তা দূর থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য এটা ছিল অনিবার্য সামরিক প্রয়োজন। এটা ছিল আল্-করম যুদ্ধোত্তর ব্রিটেন-তুর্কিস্তান 'সহযোগিতা' চুক্তি অনুসারে।

চুক্তিতে ইংল্যান্ড তার চাহিদা অনুযায়ী সুলতানের কাছে এ অঙ্গীকার করেছিল যে, তাঁর প্রাচ্য দেশীয় মালিকানা সে সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে। আর সাইপ্রাস হচ্ছে মিসর ও সিরিয়ার পরিস্থিতি অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য আদর্শ স্থান।

১৮৮২ সালে ইংরেজ সরকার মিসরে 'এক গ্রাম্য লোকের বিপ্লব' এর কারণে অস্থিরতার অজুহাতে হস্তক্ষেপ করল। ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার লর্ড ওয়লেসলিকে মিসর অধিকার ও গ্রাম্য বিপ্লব মূলোৎপাটনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এই ইংরেজ সিদ্ধান্তটি যে বিষয়ের ওপর টেক

লাগিয়ে গ্রহণ করা হলো তা হচ্ছে এক গ্রাম্য পাশা (জমিদার) মিসরের খেদিভ (গভর্নর)-এর আনুগত্য তথা সুলতানের অধিকার থেকে বের হয়ে বিদ্রোহ করেছে !(?)

একই বছর— ব্রিটেন কর্তৃক মিসর দখলের বছর— আল বারুন এডমন্ড রোচিল্ড প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পাইকারি অভিবাসনে সংঘটন করেন। এই প্রক্রিয়ায় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা ৮ হাজার থেকে বেড়ে ২৪ হাজারে গিয়ে দাঁড়াল।

একই সময় রোচিল্ড পরিবার ফিলিস্তিনের জমি কেনার জন্য বিরাট অঙ্কের চাঁদা সংগ্রহ শুরু করে। বাহ্যত এ প্রক্রিয়ার ব্যানার ছিল— 'প্রাচ্যে কৃষি উপযোগী জমিতে ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী'।

ব্রিটেনের দখলদারীর পরের কয়েক বছরে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের গতিতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তা ছিল চক্ষু কপালে ওঠার মতো। শুধু তাই নয়, সে সময় নতুন নতুন ইহুদীদের আবাসনের জন্য অগ্রিম উপনিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইংরেজের মিসর দখলের দশ বছরের মধ্যে নিম্নবর্ণিত উপনিবেশগুলো গড়ে উঠেছিল ঃ

১. কার্টরা উপনিবেশ, ৫০০ ফাদ্দান,
২. রেশন লিযিউন উপনিবেশ, ১১৮০ ফাদ্দান,
৩. রৌশ বিনা উপনিবেশ, ৩৮০০ ফাদ্দান (এভাবে লেখক কুড়িটি উপনিবেশ ও তাঁর আয়তন উল্লেখ করেন)।

এছাড়াও বহুসংখ্যক ছোট আয়তনের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এর মধ্যে একটি উপনিবেশ ছিল 'বিন ইয়াহুদা' ৩৫০ ফাদ্দান আয়তনের। এটা ছিল পূর্ব জর্ডানে অবস্থিত। অর্থাৎ ইহুদী আবাসনের পরিকল্পনা ও নীল নক্সায় পূর্ব ও পশ্চিম জর্ডানকে শামিল রাখা হয়।

১৮৯১ সালে আল বারুন, দি হেরস (অপর এক ইহুদী ধনকুবের) আল্ বারুন রোচিল্ড-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে কয়েকটি কৃষি প্রকল্পের একটি কোম্পানী গঠন করেন। এর পুঁজি ছিল ২ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং। এই প্রকল্পে অপর এক ইহুদী ধনকুবের— স্যার আর্নেস্ট ক্যাসেল অংশগ্রহণ করেন। যিনি বিশেষ করে মিসর কৃষি প্রকল্পগুলোতে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি 'ওয়াদ্দী কোম এম্বো' কোম্পানী করেছিলেন যার মালিকানায় মিসরের উঁচু এলাকায় কোম এম্বো শহরের উপকণ্ঠে বিশাল আয়তনের জায়গা-জমীন ছিল। কাজেই সুস্পষ্টত এই সকল ঘটনার সিরিজগুলো এমনি সম্পৃক্ত ছিল যে, তাকে অসংলগ্ন কাকতালীয় ঘটনা বলা যায় না। এ সময়কার নাট্যমঞ্চে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। যার ভাগ্যে ছিল ইহুদী আন্দোলনে এক বিরাট ভূমিকা রাখার। তিনি হচ্ছেন থিউডর হের্তুজাল। তিনি ভিয়েনায় জন্মলাভ করা এক সাংবাদিক। যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তখন।

বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ইহুদী আন্দোলনের সাথে তিনি সম্পৃক্ত হন। এসব সংগঠন ইহুদীদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করত, যদিও উপরে উপরে মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই কাজ করত যাতে প্রাচ্যের ইহুদীদের বিপুলসংখ্যায় ফিলিস্তিনে অভিবাসনের কাজ সহজ ও ত্বরান্বিত করা যায়।

এই ময়দানে হের্তুজাল একা ছিলেন না। এর আগেও চিন্তাবিদ ও ইহুদী ধর্ম প্রচারকদের একটি দল ছিল। যাঁরা তার চারপাশে থেকে একই মনোভাব পোষণ করতেন। যদিও তারা এটাকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশনা দিতে পারেননি বা স্পষ্ট করে বলতে পারেননি।

যেমন ধরুন, 'মোযেস হেস' সে সময় 'রোম ও আল্-কুদ্স' শীর্ষক একটি বই লিখলেন, শুধু এই প্রতিপাদ্য তুলে ধরার জন্য যে— "আমি একজন ইহুদী হিসাবে অনুভব করি যে, আমি এমন একটি জাতির সদস্য যে বড় দুঃখী, দুর্ভাগা ও ঘৃণিত এবং বিশ্বের জাতিগুলোতে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বহু দেশের ইহুদীরা এখন তাদের ইহুদীয়ত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।"

জার্মানীর ইহুদীরা চায় তাদের থেকে এমন সব কিছুকে ঝেড়ে ফেলতে যা তাদেরকে ইহুদীর পরিচয় এনে দেয়। ইউরোপীয় জাতিগুলো উপলব্ধি করে যে, ইহুদীরা তাদের এখানে বহিরাগত উজবুক।

প্রচারকদের প্রচারপত্রে আরও বলা হয় ঃ "ইহুদীরা এভাবেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে উজবুক হয়েই থাকবে।" আবার ধরুন, লিও বেন্সকর তাঁর 'স্ব-স্বাধীনতা' বইতে বলেছেন— "আমাদের অবশ্যই এ জাতির জন্য একটি দেশ খুঁজে পেতে হবে যাতে বিশ্বময় ঘুরে বেড়ানো থেকে নিষ্কৃতি পাই। আমাদেরকে 'ইহুদীর প্রাচীন ভূমিই' ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। কাজেই যে স্থানে আমাদের রাজনৈতিক জীবন মুষড়ে পড়েছে এবং স্থবির হয়ে গেছে— তার সাথে আমাদেরকে জড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধার হওয়া জরুরী নয়, বরং আমাদের অধিকার হচ্ছে একটি জমীনের দাবি, যে কোন জমীন– পৃথিবীর যে কোন একটি ভূখণ্ডই আমাদের দুস্থ ভাইদের জন্য যথেষ্ট। একটি ভূখণ্ডের মালিকানা আমাদের হবে, যেখান থেকে কেউ আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারবে না"।

এভাবে আরেকজনের কথা ধরা যাক —টমাস ক্লার্ক। ইনি মূল প্রতিপাদ্যের কিছুটা বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ভারত ও ফিলিস্তিন' বইতে বলছেন, (স্পষ্টত দু'টি দেশের সাথে সংশ্লেষ দেখিয়ে) "প্রয়োজনের আবেদন যখন নিজ সীমায় নিরাপদ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে তুর্কী রাজ্যকে বহাল রাখা, তাহলে এটা নিশ্চিত যে ব্রিটেনের ছত্রছায়ায় ইহুদীদের ফিলিস্তিনে যাওয়াটা তুর্কিস্থানকে তার নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। ব্রিটেন তার বিশালত্বের জন্য বাণিজ্যকে একটি কর্নার স্টোন মনে

করে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববাণিজ্যের তৎপরতার জন্য সবচেয়ে নিকট ও উত্তম পয়েন্ট হচ্ছে যেখানে তিনটি মহাদেশ মিলিত হয়েছে। আর যেহেতু ইহুদী জাতি মূলত একটি ব্যবসায়িক জাতি। কাজেই এ জাতিকে সর্বযুগের বৃহত্তম সে পথ জুড়ে বপন করাই হবে সবচেয়ে লাগসই এবং যুক্তিসঙ্গত। সিরিয়া অবশ্যই একটি ব্যবসায়ী জাতি পাবে। তাছাড়া সিরিয়া কখনও নিরাপদ হবে না যতক্ষণ না তারা এমন একটি স্বতন্ত্র সাহসী জাতির হাতে পড়বে যারা সদা সঞ্জীবনময়। আর এ বৈশিষ্ট্য তো ইহুদীদেরই রয়েছে"।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়, এডওয়ার্ড লর্ডফেজ মিটফোর্ড (ইনি অ-ইহুদী একজন ইংরেজ কূটনীতিক) ঐ সময়টিতেই লিখেছেন— যার নাম রেখেছেন—"শামে (বৃহত্তর সিরিয়ায়) ব্রিটিশ কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার জন্য ইহুদীদের পক্ষে আহ্বান", এখানে তিনি মূল উদ্দেশ্যকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে ব্যক্ত করেছেন— "আমরা যদি ফিলিস্তিনের আয়তনকে হিসাবে আনি তাহলে মনে হবে এটা খুবই ছোট; সকল ইহুদী আঁটবে না। বহু অভিনিবেশীর অভিবাসনের কারণে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। কাজেই ফিলিস্তিনে অভিনিবেশের পরিসর বিস্তারের আগে পুরো দেশটিকে তার নতুন জাতিকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে উসমানী সরকারকে বোঝাতে হবে যেন সকল 'মোহাম্মদী' অধিবাসীদেরকে উত্তর ইরাকের বিশাল জনশূন্য এলাকায় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়। সেখানে তারা তাদের পেছনে ফেলে আসা জমীন থেকে আরও বেশি ভাল জমীনের মালিক হতে পারবে"।

(উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর অধিকৃত এলাকা ও লেবাননে অবস্থানকারী ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের উত্তর ইরাকে প্রত্যাবাসনের কথা আবার নতুন করে উঠেছিল।)

কিন্তু হের্তুজাল— তাদের সকলের বিপরীতে সরাসরি তার মূল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। সম্ভবত হের্তুজালকে সরাসরি তার মূল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে এও সাহায্য করেছিল যে, ফিলিস্তিনের দিকে ইহুদী অভিবাসনের ঢেউ কারও কাছে গোপনীয় মনে হয়নি। কেবল শেষের দিকটাই এ ভূখণ্ডের দিকে নজর কাড়ল। কার্যত সমস্যার শুরু হলো ফিলিস্তিনের ওপর চাপ সৃষ্টিকারী ইহুদী অভিবাসী এবং আরব আদিবাসীদের মধ্যে। এ সমস্যাটি তখন অনেকের মনোযোগ আকৃষ্ট করল। এদের মধ্যে খোদ ইহুদী অভিবাসীদেরও কিছু লোক ছিল। 'আহাদ হা আম' লিখলেন (এই আহাদ হা আম' হিব্রু ভাষায়, এর অর্থ 'লোকদের একজন'। এটা ছিল প্রখ্যাত এক ইহুদী চিন্তাবিদের কলমী নাম। ইনি খুব প্রভাবশালী ছিলেন সে সময়। তাঁর আসল নাম ছিল আশের যাফী জেনযেবার্জ) তাঁর লেখা যেন আসন্ন সমস্যার সতর্ক ঘণ্টা ছিল। তিনি বলেছেন— "আমরা আমাদের চিন্তা, চেতনা ও আচার-আচরণে

এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যেন পুরো আরব জাতি বেদুঈন; মরু ময়দানে জীবনযাপন করছে— তাদের চারপাশে কি হচ্ছে তার বাস্তবতা দেখেও না, বুঝেও না। এটি একটি মারাত্মক ভুল। কারণ আরব, বিশেষ করে তাঁদের শহরবাসীরা আমরা ফিলিস্তিনে যা করছি তা দেখছে এবং উপলব্ধিও করছে। হ্যাঁ, তারা যে আমাদের কাজের বিপরীতে কোন কর্মকাণ্ড দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করছে না এবং প্রকাশ করতে চাচ্ছে যে, তারা কিছুই লক্ষ্য করছে না, তার কারণ আমরা এখন যা করছি এটাকে তারা তাদের ভবিষ্যতের প্রতি হুমকি হিসাবে দেখছে না। কিন্তু যখন অবস্থার বিবর্তন হবে এবং ফিলিস্তিনে আমাদের ভিড় শুরু হবে তখন আরবরা সহজে তাদের অবস্থান ছেড়ে দেবে না। ফিলিস্তিনে নতুন ইহুদী অভিবাসীরা তো ছিল 'তীহ'-এর ক্রীতদাস। হঠাৎ করেই তারা তাদের দেখতে পেল এক সীমাহীন স্বাধীনতার মাঝে। বরং এমন এক স্বাধীনতার মাঝে যেখানে শাসাবার কেউ নেই। এই আকস্মিক পরিবর্তন তাদের মনে স্বৈরাচারী মনোভাব এনে দিল যেমন হঠাৎ করে কোন ক্রীতদাস মালিক বনে যায়। তারা আরবদের সাথে বেশ শত্রুতা আর বেপরোয়াভাবে আচরণ করছে এবং তাদের অধিকারকে খুবই বীভৎস ও অযৌক্তিকভাবে দলিত করেছে। তদুপরি যথেষ্ট কারণ ছাড়াই তাদেরকে অপমানিত করে ছাড়ছে এবং এসব আচরণের জন্য আবার আত্মশ্লাঘাও করছে। তারা এমন আচরণ করছে যেন আরবরা ইতর জন্তু বিশেষ যারা তাদের চারপাশে কি হচ্ছে তা না বুঝেই পশুর মতো জীবনযাপন করছে"।

এ সময় এমন একজনের দরকার ছিল যে এই ঢাকনা আর পর্দা উন্মোচন করবে এবং স্পষ্ট ভাষায় এবং সরাসরি কাজে তা পরিষ্কার করে দেবে। কারণ আন্দোলন মাঝপথে বেশি সময় ধরে থমকে থাকতে পরে না। আর এটাই ছিল থিউডর হের্তুজাল-এর ভূমিকা।

॥ ৩ ॥

হের্তুজাল

"যে ফেরাউনেরা আমাদের চরম নির্যাতন করেছিল তাদের পুতেরা এখন আমার মতো ইহুদীর সাহায্য প্রার্থনা করছে!"

—মোস্তফা কামাল পাশার সাথে সাক্ষাৎকারের পর হের্তুজাল-এর উক্তি

অন্য সমসাময়িকদের মধ্যে হের্তুজাল-এর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি পুরো স্ট্র্যাটেজিক পরিস্থিতিকে ধাতস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে ইহুদী এ্যাকশন এখন পর্দা থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে। এ পর্দা ছিল মিশনারি কর্মকাণ্ড আর ব্রতচারী হিজরত। তিনি উপলব্ধি করলেন যে সরাসরি এবং শক্তি খাটিয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতার জগতে প্রবেশের সময় হয়ে গেছে।

হের্তুজাল তাঁর এই ভয়ানক খেলা শুরু করলেন একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে, যা পরবর্তীতে লেখকের বাড়তি কলেবরে— ইহুদী আন্দোলনের সংবিধানে পরিণত হয়েছিল। তিনি এটা প্রকাশ করেছিলেন 'ইহুদী রাষ্ট্র' নামে। এর প্রকাশনার পর ইহুদীদের মধ্যে এক বিরাট হৈ চৈ পড়ে গেল। যদিও তাদের অনেকে তার সে সময়কার চিন্তাধারাকে এক ধরনের রাজনৈতিক কল্পনাবিলাস মনে করেছিল।

হের্তুজালের বইতে যে যুক্তি ছিল তা মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি করত।

১। ইহুদীরা ইউরোপীয় সমাজে মিশে যায়নি।

২। যারা অচিরেই মিশে যাবে তারা কেবল ধনী ইহুদী। ইউরোপীয় সমাজ কেবল তাদেরকেই মিশে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করেছে। তারা কখনই প্রত্যাবর্তন করবে না।

৩। প্রাচ্য থেকে আগত দরিদ্র ইহুদীরা অচিরেই পশ্চিম ইউরোপে সুপ্রতিষ্ঠিত ধনী ইহুদীদের অস্থিরতা ও উপদ্রবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৪। পরিস্থিতি যখন ইহুদীদের প্রতিকূলে যায় তখন তারা বিপ্লবী প্রলেতারীয় হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন জেগে উঠে তখন তাদের সাথে অবিশ্বাস্য রকমের সম্পদের শক্তিও জেগে ওঠে।

৫। পশ্চিম ইউরোপের ধনী ইহুদীদের কর্তব্য হলো তাদের দারিদ্র্যদের ইউরোপের বাইরে অভিবাসনের ব্যয় নির্বাহ করা।

৬। ফিলিস্তিনই হলো একমাত্র স্থান যেখানে তারা যেতে পারে। কারণ কেবল তার নামটি উচ্চারিত হলেই ইহুদী জাতির মধ্যে ঐতিহাসিক স্মৃতিগুলো আনচান করে ওঠে এবং সাহসী কাজ আর আন্দোলনে তারা অনুপ্রেরণা লাভ করে।

এ ছিল হের্তুজালের বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি। তার সামনের দুটো দাঁত দেখা গেলেও ভেতরে ছিল আরও অনেক গোপন দাঁত— তাতে ইহুদী ধনাঢ্য ব্যক্তিদের যেমন আশ্বস্ত রেখেছিলেন তেমনি ইউরোপীয় শক্তিকেও। এ ছাড়াও হের্তুজাল একটি ওয়ার্ক প্ল্যান করেন যার তিনটি দিক রয়েছে ঃ

* একটি দিক হচ্ছে— ফিলিস্তিনের ওপর নামসর্বস্ব প্রদেশের কর্তৃত্বের অধিকারী সুলতানের সাথে সংলাপ, কারণ তিনি তখনও মুসলমানদের খলিফা।
* আরেকটি দিক হচ্ছে— ব্রিটেনের সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখা, কারণ ব্রিটেনই অন্যদের ছাড়িয়ে বেশ তৎপরতা ও শক্তিমত্তার সাথে খেলাফতের প্রাচ্য মালিকানার উত্তরাধিকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।
* আরেকটি দিক হচ্ছে— মিসরের কৌশলগত অবস্থান— যা হের্তুজাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনীতি অনুসরণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন।

উসমানী খেলাফতের দিকটি সামলাবার ক্ষেত্রে হের্তুজালের পরিকল্পনা ছিল সুলতান থেকে ফিলিস্তিন খরিদ করে নেয়া। এই পরিকল্পনার খবরটি প্রকাশ পেয়েছে হের্তুজালের রোজনামা থেকে। এখানে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে খুবই স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৫ জুন, ১৮৯৬। হের্তুজাল তাঁর ডায়রীতে লিখলেন ঃ "অচিরেই আমরা সুলতানকে ২০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং অফার দেব, যা দিয়ে তিনি তুর্কিস্তানের ভেঙ্গে পড়া আর্থিক অবস্থাকে চাঙ্গা করতে পারবেন। এর মধ্যে দু'মিলিয়ন হচ্ছে ফিলিস্তিনের বদলে। অবশিষ্ট ১৮ মিলিয়ন তিনি তুর্কিস্তানকে ইউরোপীয় প্রটেকশন থেকে মুক্ত করা এবং তাদের ঋণপত্র ক্রয়ে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।"

দু'মাস পর ইস্তাম্বুল সফরের সময় হের্তুজাল তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন ঃ "আজ জাভেদ বেগ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। ইনি মুখ্য গভর্নর (আস্-সদরুল আ'যম) রেফআত পাশা-এর পুত্র। আমরা জাভেদ বেগের সাথে সব ঠিকঠাক করলাম (সম্ভবত তাকে ঘুষ দিল)। জাভেদ বেগ আমাদের পরিকল্পনাকে গ্রহণ এবং এতে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র আপত্তি হচ্ছে, পবিত্র স্থানগুলোর দশা কি হবে। কারণ আল কুদ্স অবশ্যই তুর্কি প্রশাসনের অধীন থাকতে হবে। আমি তার অঙ্গীকার করলাম। আমি তাঁকে এ অঙ্গীকার করলাম যে, ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে আল্

কুদ্স তার বাইরে থাকবে। কারণ পবিত্র স্থানসমূহ বিশ্বের সকলের ধর্মীয় পীঠস্থান, কাজেই সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকতে হবে।

আমাকে জাভেদ বেগ প্রশ্ন করেছেন যে, ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এর সাথে খেলাফত রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হবে ? আমি তাদেরকে বলেছি যে, আমরা স্বাধীনতা দাবি করছি না, এমনকি এ ব্যাপারে চিন্তাও করছি না। তবে আমরা এমন একটি সম্পর্ক চাই যা আপনাদের সাথে মিসরের ছিল।"

এরপর হের্তুজাল ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন। কয়েক মাস পর তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন ঃ তারা আমাকে জানিয়েছে যে, আমার পরিকল্পনাটি সম্পর্কে সুলতান অবগত হয়েছেন। তবে তিনি ইহুদীদের কাছে ফিলিস্তিন বিক্রি করার ধারণার বিরোধিতা করছেন। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, যদি আমরা উপযুক্ত রূপরেখা ঠিক করতে পারি তাহলে এ চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমি সুলতানের পারিষদদের চিঠিপত্রের মাধ্যমে বুঝতে পারলাম যে, তাঁরা এমন একটি রূপরেখা চাচ্ছেন যেন মুখরক্ষা করা যায়। আমি ইস্তাম্বুলে একটি পত্র প্রেরণ করে বললাম, "আমাদের দল মহামান্য সম্রাটের নিকট ২০ মিলিয়ন পাউন্ডের ঋণ প্রদানের প্রস্তাব দিচ্ছে। এর প্রতিদানে তিনি ইহুদীদের নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি দেবেন ঃ

১. মহামান্য সম্রাট ইহুদীদেরকে তাদের পিতৃপুরুষের ভূমিতে ফিরে আসার জন্য একটি সম্মানজনক আমন্ত্রণ জানাবেন। সুলতানের এই আহ্বানে আইনগত শক্তি থাকবে। বিশেষ করে পূর্বাহ্নেই সংশ্লিষ্ট বড় দেশগুলোকে তিনি পত্র দিয়ে তা অবহিত করবেন।

২. ইহুদী অভিবাসীদের আন্তর্জাতিক আইনে সুপরিচিত স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, তাদের নিজেদের বিষয়ে নির্বাহী প্রশাসনের অধিকার থাকবে। এর মধ্যে বিচার, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩. ইহুদী ফিলিস্তিনে সুলতানের কি ধরনের সহায়তা বাস্তাবয়িত হবে তার রূপরেখা নিয়ে ইস্তাম্বুলে আলোচনা বৈঠক হবে।"

এরপর হের্তুজাল তাঁর ডায়রীতে লিখছেন ঃ "আমি সুলতানের সেক্রেটারি মাদহাত বেগের নিকট আমাদের পরিকল্পনাটি সম্পর্কে লিখলাম যাতে 'দি ফিল্ট' পত্রিকায় তা প্রকাশ করা হয়। আমি এ ইঙ্গিতও দিলাম যে, এটা প্রকাশের পথে আমরা সুলতানের সরকারকে সহায়তা করার জন্য এমন কিছু প্রচার ও প্রকাশের ব্যবস্থা নেব যাতে এ ব্যাপারে বিশ্বে তার ভাল দিকটি ফুটে ওঠে। এটা হচ্ছে

খেলাফতের খেদমতে ইহুদী সাংবাদিকতার প্রচেষ্টাকে কাজে লাগানোর একটি পদক্ষেপ। বিশেষ করে যদি সুলতান আমাদের অনুপ্রেরণা দেন এবং ফিলিস্তিনে ইহুদী জাতিকে আবাসনের প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাহলে আমরা তুর্কি অর্থনীতির সেবায় আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করব। আমাদের শত্রুরা সুলতানেরও শত্রু; যারা উসমানী খেলাফতকে দুর্বল করে তা শতধাবিভক্ত করে দিতে চায়, তারাই কঠিন শর্তের ঋণের মাধ্যমে তুর্কিস্তানের রক্ত চোষণ করতে চায়।

পক্ষান্তরে তুর্কিস্তানকে ঋণপ্রদানকারী ব্যাংকগুলোর অধিকাংশের মালিকানাই ছিল ইহুদীদের হাতে, যারা ফিলিস্তিনে ইহুদীবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্থ যোগান দিচ্ছিল এবং অচিরেই ফিলিস্তিনে অভিবাসী ইহুদীরা মহামান্য সুলতানের সৎ ও নিঃস্বার্থ প্রজা হিসাবে থাকবে, শুধু শর্ত হচ্ছে— যদি তাদেরকে নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষায় নিঃশর্ত অধিকার লাভ করে এবং কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ওখানকার জমি ক্রয় করতে পারে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করতে চাই যে, কখনই কারও কোন জমি জবরদখল করা হবে না। কারণ মালিকানা হচ্ছে একটি পবিত্র সংবিধান, যা কারও অবজ্ঞা করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, সুলতানের নিজস্ব খাস জমি যদি বিক্রি করতে চান তাহলে যে দাম নির্ধারণ করেন তার দাম অগ্রিম নগদে পরিশোধ করা যেতে পারে। মহামান্য সুলতান নিশ্চয়ই ইহুদী জাতির অর্থ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। বস্তুত তারা হচ্ছে স্বর্ণ, প্রগতি আর প্রাণময়তার নদী, যা তুর্কিস্তানের সেবায় সদাপ্রস্তুত।"

এ সময় সুলতান ইসলামী ও আরবি চাপের ভয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি এর প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতি উপলব্ধি করতে পারছিলেন।

পক্ষান্তরে ব্রিটেনের দিক থেকে হের্তুজালকে তেমন কষ্ট করতে হয়নি। কারণ এক্ষেত্রে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তি ছিল। সেখানে নিত্য পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি চাচ্ছিল কেবল দ্রুততা। লক্ষণীয়, ইংল্যান্ডের প্রতি হের্তুজালের চেষ্টা তদ্বির মিসর থেকে বেশি দূরে ছিল না। বরং বলা যায়, তার সাথে যোগাযোগটা ছিল কিছুটা সরাসরি। হের্তুজাল ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী (ল্যাসডাউন)-এর নিকট পত্র লিখলেন ঃ

"বর্তমানে পূর্ব ইউরোপ থেকে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো অভিবাসনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। যদি ফিলিস্তিনে যাবার জন্য শীঘ্রই দরজা খুলে না দেওয়া যায় তাহলে অচিরেই দেখতে পাবেন তাদের নারী-পুরুষ ও শিশুরা তাদের তল্পিতল্পা আর বাক্স-পেটরা নিয়ে লন্ডনের পূর্ব মহল্লায় আপনাদের সামনে এসে পড়েছে। তাদের কিছু সংখ্যক তো এখানে এসেই পড়েছে। আমরা এখানে তাদের বেশি লোক কামনা করি না। তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার স্থগিত রাখতে হবে। কাজেই

ইংল্যান্ডের জন্য মঙ্গল হচ্ছে যত শীঘ্র সম্ভব এ সমস্যার সমাধান করা। আর সমাধান তো তার হাতেই রয়েছে। তারা তো ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় কিছু জনশূন্য এলাকার মালিক। বিশেষ করে আরিশ ও সিনাই উপদ্বীপের মাঝখানের উপকূলীয় অঞ্চল। সুলতান এখনও আমাদেরকে ফিলিস্তিন বা তার অংশবিশেষ দেয়ার জন্য প্রস্তুত নন। এদিকে তুর্কির সাথে আলোচনা করতেও বিস্তর সময় লেগে যাবে। কিন্তু বিষয়টির কোন রকম সুরাহা করার লক্ষ্যে আমরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রত্যাশা করি যে, তাঁরা এমন একটি উপনিবেশ সৃষ্টি করার অনুমোদন দেবেন যেখানে সিনাই উপদ্বীপের সকল ইহুদী অভিবাসীকে একত্রিত করা যাবে, যেখান থেকে পরে তারা ফিলিস্তিনে যেতে পারবে। আমি 'বড় দরজা' (সুলতানের পারিষদবর্গ)-এর সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি, যাতে তোমাদের থেকে এই সন্দেহ দূরে রাখতে সক্ষম হই যে, আরিশ ও অন্যান্য স্থানে ইহুদী বসতি শুরু হচ্ছে সুলতানের সাথে শত্রুতামূলক কাজ হিসাবে।

পৃথিবীতে প্রায় ১০ মিলিয়ন ইহুদী রয়েছে। তারা হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে ব্রিটেনের প্রতি তাদের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য ঘোষণা করতে পারবে না। কিন্তু তারা ব্রিটেনের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের সম্পর্ক রেখে যায়, কারণ সে-ই তো তাদের জন্য ফিলিস্তিনকে অর্জন করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। এবং এ জন্যই ব্রিটেন কার্যত ইহুদী জাতির বাস্তব সহায় ও পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছে। ইংরেজের একটি মাত্র সিদ্ধান্তই তাদেরকে ১০ মিলিয়ন নিবেদিতপ্রাণ লোককে উপহার দিবে যারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে থেকে তাদের অভিভাবকত্বের জন্য ঋণী থাকবে। হয়তো কেউ তোমাদেরকে এ কথাও বলবে যে, তাদের কেউ কেউ তো নিছক ফেরিওয়ালার মতো বিক্রেতা। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, তাদের কেউ কেউ তো আবার ব্যাংকের মালিক, বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাংবাদিক এবং অন্যান্য বিরাট বিরাট পেশাজীবী ব্যক্তিত্বও রয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, অচিরেই ইংল্যান্ডের শৌর্যবীর্য আর কর্তৃত্বের জন্য দশ মিলিয়ন কর্মী কাজে লেগে যাবে।

ব্রিটিশ সরকারকে পরিতৃপ্ত হতে বেশি কার্য করতে হয়নি। তারা হের্তুজাল-এর যুক্তি প্রমাণগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিল। তারা এক দিকে সুলতানের দ্বিধাগ্রস্ততা প্রত্যক্ষ করছিল, অন্যদিকে লক্ষ্য করছিল ইহুদীবাদী আন্দোলনের তড়িঘড়ি সব কিছু হাতে পাবার উদগ্র আকুতি। তারা চাচ্ছিল, সাময়িকভাবে হলেও সিনাইতে যেন ইহুদীদেরকে একটু পা রাখার জন্য পথ করে দেয়, যাতে ইস্তাম্বুলে বসে সুলতান এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যাতে সবকিছু নির্ধারিত হয়ে যায়।

মিসরের বেলায়ও অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। মিসরীয় দিক সামলাবার উদ্যোগ গ্রহণ করার আগে হের্তুজাল একটি বড় দায়িত্ব সেরে নিলেন যার মাধ্যমে সে প্রায় আইনগত একটি ভিত্তি লাভ করল, যেখানে তার অবস্থান গ্রহণ করে তার কাজ চালিয়ে যাবে। তিনি একটি ইহুদী (Zionist) মহাসম্মেলন আহ্বান করলেন, যেখানে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের সহায়ক সকল সংশ্লিষ্ট শক্তিকে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। ২৯ আগস্ট, ১৮৯৭ তারিখে সুইজারল্যান্ড-এর বাথেল শহরে এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এই মহাসম্মেলনে চারটি প্রধান সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১. ইহুদীদের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে কৃষি ও শিল্পভিত্তিক উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা।
২. ইহুদী রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য ইহুদী জাতির সামগ্রিক প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ রাখার জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক ইহুদী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ করা।
৩. ইহুদী জাতির মধ্যে ইহুদী জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে তাদের আত্মায় আর অন্তঃস্থলে সেই জাগরণ সৃষ্টির জন্য কাজ করা।
৪. হিব্রু ভাষা ও সাহিত্য এবং হিব্রু সংস্কৃতি পুনর্জীবনের মাধ্যমে জায়নিস্ট লক্ষগুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা।

পক্ষান্তরে হের্তুজাল প্রথম যে মিসরীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের নেতা মুস্তাফা কামেল (পাশা), এ সময় মিসরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুস্তাফা কামেলই তখন হের্তুজালের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন যাতে মিসরের বিষয়ে তার সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে তাকে নিশ্চিত করতে পারেন। হের্তুজাল তার ২৪ মার্চ, ১৮৯৭ তারিখের ডায়রীতে লেখেন ঃ মুস্তাফা কামেল আমার সাক্ষাতে এলেন। তিনি তো মিসরী জাতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের চেষ্টায় রয়েছেন, যাতে ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

এই প্রাচ্য যুবক আমার মধ্যে একটি চমৎকার প্রভাব রেখে গেল। যেই ফেরাউনরা মিসরে আমাদের চরম নির্যাতন করেছিল তাদের বংশধর এখন ব্রিটিশের গোলামীর আযাব থেকে মুক্তির জন্য আজ ছটফট করছে। আজ সে আমার মতে ইহুদীর কাছে তার পথ খুঁজে নিয়েছে আমার সাহায্য চাইতে। যদিও আমি তাকে এটা জানতে দেইনি, আমি অনুভব করছি যে, এতে আমাদের ব্যাপারটাও উপকৃত হবে কারণ, ইংরেজ মিসর ছাড়তে বাধ্য হলে অচিরেই তারা ভারতে যাবার পথ সুয়েজ

খালের বদলে অন্যপথ খুঁজে নিতে বাধ্য হবে। কারণ মিসর ছাড়লেই এই খাল তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে অথবা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে। এতে করে নতুন ইহুদী ফিলিস্তিনই হবে ভারতের দিকে তাদের উপযুক্ত পথ— ইয়াফা থেকে পারস্য উপসাগর হয়ে ভারতে। হের্তুজাল তার সাথে মোস্তাফা কামাল-এর সাক্ষাৎকার ও বাথেল-এ অনুষ্ঠিত প্রথম জায়নিস্ট মহাসম্মেলনের পর মিসরের দিককার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্মতৎপর হলেন। তিনি এ প্রথমবারের মতো মিসরে ভগ্ন হৃদয়ে এলেন। ইউরোপীয় ইহুদীদের মধ্যে অনেকেই ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহের গুঞ্জন উঠালেন। এমনকি হের্তুজালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাক্স নোরডো-এর মতো লোকও ফিলিস্তিনের আশা বাদ দিয়ে ইহুদীদের জন্য অন্য একটি দেশ গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এহেন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রস্তাব উঠল। কেউ বললেন আর্জেন্টিনা আবার কেউ বললেন উগান্ডাকে বেছে নেয়া যায়। নোরডো-এর এই সংশয়ের পিছনে একটি আশ্চর্য ঘটনা রয়েছে। তিনি জায়নিস্ট মহাসম্মেলনের পূর্বে ইউরোপীয় কিছু দ্বিধাগ্রস্ত পাদ্রীকে (হাখাম) বুঝাতে চেয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে চাক্ষুষ সরেজমিনে ফিলিস্তিন দেখে আসার জন্য দু'সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠালেন। এরপর তারা ফিরে এসে সেখানকার পরিস্থিতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের সতীর্থদের কাছে সব বলবেন। চাই তা সেখানকার মূল বাসিন্দাদের সম্পর্কে হোক বা সেখানে বসতি স্থাপনকারী ইহুদীদের সম্পর্কে। কার্যতও দু'জন হাখাম ফিলিস্তিন সফর করলেন। কিন্তু তারা যা দেখলেন তা ছিল তাদের জন্য বিরাট বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের প্রথম ইঙ্গিত পেলেন নোরডোর কাছে প্রেরিত টেলিগ্রাম। তারা এখনও ফিলিস্তিনে, এ সময় ইঙ্গিতে তারা বলেছেন, "পাত্রী খুবই সুন্দরী, তার মধ্যে সকল আকর্ষণীয় গুণই রয়েছে। তবে সে ইতোমধ্যেই বিবাহিত।" নরডো এ ইশারাটি এভাবে বুঝলেন যে, ফিলিস্তিনে একটি জাতি আছে যারা এখানে বসবাস করছে। কাজেই হের্তুজালের ভাষ্য মতে যেটি "এমন ভূমি যার জাতি নেই, সে জাতির জন্য যার ভূমি নেই"— তেমন নয়।

যখন সে দু'জন হাখাম ফিরে এসে ভিয়েনাতে ম্যাক্স নরডো-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন তাদের মৌখিক প্রতিবেদন ছিল ফিলিস্তিন থেকে প্রেরিত তাদের টেলিগ্রামেরই অনুরূপ। তারা বললেন যে, ফিলিস্তিনে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই আরবি ফিলিস্তিন জাতি বসবাস করে আসছে। তারা সেখানে আবাদ করে আসছে এবং তাদের স্বদেশ বলে জেনে আসছে। ফিলিস্তিন আসলেও তাই। কাজেই যেসব ইহুদী ফিলিস্তিনে যেয়ে সেখানে বসতি স্থাপন করতে চায় তাদের সামনে

সেখানকার মূল অধিবাসীদের সাথে এক শক্ত লড়াই অপেক্ষা করছে। সেই মূল অধিবাসীরাই সে সুন্দরী বধূয়ার বৈধ ও জীবিত স্বামী।

তাদের প্রতিবেদনে আরেকটি প্রচণ্ড বিপদের ইঙ্গিত ছিল। তার কারণ হচ্ছে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী অভিবাসীরাই। উভয় হাখামই এই অভিবাসীদের আচার-ব্যবহারে মানসিক বিকারগ্রস্ততা লক্ষ্য করেছেন, যা সময়ের ব্যবধানে আরও বেড়ে যেতে পারে। বেড়ে যাওয়া বরং সুনিশ্চিত। এর কারণ হচ্ছে ইহুদী অভিবাসী যাতে নিঃশঙ্কচিত্তে এই প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে জন্য সে অন্যের অর্থাৎ ফিলিস্তিনীর অস্তিত্বকে অবশ্যই অস্বীকার করবে। যেমন কেউ পরকীয়া প্রেমে পাগল হলে অন্যের স্ত্রীকে একান্তভাবে পেতে তার স্বামী থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য এতই বেপরোয়া হয়ে উঠে যে শেষ পর্যন্ত তার স্বামীকে খুন করে ফেলে যাতে তার দেহ, মন, স্মৃতি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে।

সেই অবস্থাটিই তারা দু'জন প্রত্যক্ষ করলেন— একজন ফিলিস্তিনীর সাথে ইহুদী অভিবাসীর আচরণের ধরনে। হাখামদ্বয়ের বর্ণনা অনুযায়ী "তাদের আচরণে এতই ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে যা ফিলিস্তিনীদের প্রতি তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ও সহিংসতার সীমায় পৌঁছে গেছে যার কোন যুক্তিই নেই। তবু তারা অনর্থক প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। এর অবসান হতে পারে কেবল যদি উভয় পক্ষের মধ্যে এমন দূরত্ব রাখা যায় যে, একে অন্যকে দেখবে না বা কেউ কারো মুখের দিকে নজর করবে না।"

হের্তুজাল মিসরে এলেন। তাঁর প্রাথমিক গতিবিধিতে মনে হচ্ছিল যে, তিনি বুঝিবা ফিলিস্তিনে নিবিড় অভিবাসনের পরিকল্পনাটি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলেন। এবং আরীশকে কেন্দ্র করে সিনাইয়ে বড় বসতির পরিকল্পনা নিয়েই আপাতত সন্তুষ্ট থাকছেন, পরে এখান থেকে বিস্তারের চেষ্টা চালাবেন।

হের্তুজাল আরীশ এলাকা এবং তার চারপাশের দু'টি উপত্যকা পরিদর্শন করলেন এবং খেদিভ দ্বিতীয় আব্বাস হেলমীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর পরিকল্পনাটি নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করলেন। হের্তুজালের প্রকল্পটি ছিল আরীশ-এর চারপাশে ৬৩০ বর্গ মাইল এলাকা ভাড়া নেয়ার লক্ষ্যে। এ স্থানটিকে হের্তুজাল 'সমবেত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে লাফ দেয়ার' স্থান হিসাবে নির্বাচন করেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল যে, "জায়নিস্ট সংস্থা এটিকে নিরানব্বই বছরের জন্য লিজ নেবে এবং এটি সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকবে। এটি প্রত্যায়িত ও স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারের অধীনে সম্পাদিত হবে।" এ বিষয়ে খেদিভ-এর বড় কোন আপত্তি ছিল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। সম্ভবত খেদিভের সাথে হের্তুজালের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে প্রাধান্য পায় যে,

হের্তুজালের পরিকল্পনা অনুসারে ঐ এলাকার কৃষি ও বসতি থেকে খেদিভ কি পরিমাণে লাভবান হবেন তার ওপরই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, হের্তুজালের এই প্রকল্পের যে বিরোধিতা করেছিল সে ছিল মিসরে ব্রিটিশ কমিশনার 'লর্ড ক্রমার'। তাঁর আপত্তিটি ছিল মুখ্যত টেকনিক্যাল। তিনি এ ব্যাপারে নীলনদের পানি থেকে কি পরিমাণ পানি হের্তুজালের প্রকল্প বাস্তবায়নে লাগবে এ ব্যাপারে ইংরেজ প্রকৌশলীদের মতামতের ওপর নির্ভর করেন। ইংরেজ প্রকৌশলীগণের অভিমত হচ্ছে, হের্তুজালের প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পানির যোগান দেয়া কঠিন। কারণ তা মিসরের কৃষি আবাদে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। পরে ইংল্যান্ডের 'ল্যাঙ্কাশায়ারে' শিল্প কারখানাগুলো যে মিসরী তুলায় বাঁচিয়ে রাখছে তার উৎপাদনের ওপর প্রভাব ফেলবে!

অপরদিকে প্রতিনিয়ত খেদিভ আব্বাস হেলমীর সাথে বিরোধিতার কারণে লর্ড ক্রমার মিসরে খুব নাজুক পরিস্থিতি মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে কিছু লড়াইয়ে একটি বিশ্বযুদ্ধের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এটাও তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল যে, মিসর ও তার চারপাশের বর্তমান পরিস্থিতি এ মুহূর্তে এমন কিছু করার অনুকূলে নয়, পাছে তা তাদের জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় অনুভূতিকে নাড়া দেবে। এ সময় নজরকাড়া বিষয় ছিল এই যে, মিসরের কিছু পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে দৈনিক 'আল-মানার' যার মুখ্য সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু-এর শিষ্য শেখ রশীদ রেদা, এ সময় এমন কিছু খবর ও মন্তব্য প্রকাশ করে যাচ্ছিল যা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের লোভাতুর দৃষ্টি এবং দারুল ইসলামে এর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছিল। এ সকল সংবাদ ও মন্তব্য বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মনে হয় হের্তুজালের পরিকল্পনা প্রাচ্যের পরিস্থিতির সূচনালগ্নে জটিল অবস্থানের সামনে হোঁচট খেতে থাকে।

এখানে বলা যায় যে, ইহুদীবাদী জায়নিস্ট আন্দোলন যার পুরোভাগে রয়েছেন হের্তুজাল এ সময়ে বৈধ স্বত্বাধিকারী ফিলিস্তিনী জাতির সাথে কোন আলোচনাই করেনি।

ব্রিটেন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের অধিকার সম্পর্কে বুঝাতে চেষ্টা করেছে এবং চেয়েছিল সুলতানের মালিকানা থেকে ইহুদীদের জন্য গোটা একটা দেশ কিনে নিতে। একই সময় নিজের জন্য মিসরে একটু পা রাখার ঠাঁই পেতেও চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে কখনই অপর পক্ষের সাথে কোন আলোচনা করেনি যারা আসলে ফিলিস্তিন দেশের মালিক এবং সেখানে বসবাস করছে। সে সময় তাদের অস্বীকার করা তাদের জন্য অনিবার্যও ছিল। কারণ এই অপর পক্ষটির সাথে কোন আলোচনা করার অর্থই ছিল

তাদের আইনগত অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া। আর এ স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হলে তা হবে ফিলিস্তিনে জায়নবাদী দাবির প্রতি সরাসরি প্রত্যাখ্যান। পরবর্তীতে হের্তুজালের চিন্তাধারার ওপর প্রখ্যাত জায়নিস্ট নেতা নাহুম গোল্ডম্যান-এর মন্তব্য ছিল এ রকম ঃ

"হের্তুজাল ফিলিস্তিনে ইহুদী বসতি স্থাপনের ইস্যুটির দিকগুলোর দিকে নজর দিতে চাননি। তিনি কেবল দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন এ কথার ওপর যে, এটি "জাতি বিহীন ভূখণ্ডে, ভূখণ্ডবিহীন জাতির" ইস্যু। এটাকে তিনি এতই গরুত্ব দিয়েছেন যে, তিনি বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়াকে কেবল ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে ইহুদীদেরকে বহন করার উপায়-উপকরণের সমস্যাই মনে করতেন— যখন সুলতানের পক্ষ থেকে তাদের ভিসা রয়েছে আর ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে রয়েছে ভ্রমণের টিকিট।"

তৃতীয় অধ্যায়

উপকূল আর অভ্যন্তর

"আরব বিশ্বের যে কোন মানচিত্রের নিবিড় গবেষকের কাছে প্রতিভাত হবে যে, সেখানে একটি পাশ্চাত্য রাজনীতি সব সময় সক্রিয় রয়েছে— কিভাবে উপকূলকে অভ্যন্তর ভূভাগ থেকে আলাদা রাখা যায় ...। অনুরূপভাবে ভূমধ্যসাগর, উপসাগর ও মহাসাগরেও সক্রিয়। উপকূল অধিকাংশ সময় বিজয়ীদের জন্য অথবা তাদের সাথে থাকে। আর অভ্যন্তর ভাগকে সে এলাকার অধিবাসীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়।

— হাইকল

॥ ১॥

ম্যাকমোহন

"প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা সবাই গুপ্তচর অফিসারে বদলে গেল।"

—প্রথম মহাসমরে ব্রিটেনের অন্যতম গোপন কূটনৈতিক বাস্তবতা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরগুলোত আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের মানদণ্ড ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তিসমূহের রুটগুলো তাদের মাইলফলক ও লক্ষ্যস্থলকে প্রকাশ করে এগুতে লাগল। এ সব ছিল আসন্ন এক বড় ধরনের সংঘর্ষের সম্ভাবনার আলামত। দেখা যায়, ১৯০৪ সালে ব্রিটেন ফ্রান্স একটি মৈত্রীচুক্তিতে উপনীত হলো। একই সময়ে যখন জার্মানি দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়ে উপনিবেশ ভাগাভাগিতে তার প্রাপ্য হিস্সা দাবি করতে লাগল তখন এক বিশাল সামরিক শক্তি বিনির্মাণেও মশগুল হয়ে পড়ল।

তাছাড়া সে কিছু নতুন রাজনৈতিক ও সামরিক জোটের কথাও ভাবতে শুরু করল। এ সময় সে তুর্কিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কারণ তুর্কি শাসকরা তখন প্রাচ্যে ব্রিটিশ পরিকল্পনার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল। কারণ ইংল্যান্ড বহুবার মিসর ত্যাগের ওয়াদা করলেও নীল অববাহিকায় নিজ কদমকে মজবুতই করে চলেছিল। তদুপরি সুদানের ওপর থাবা বিস্তার করে চলেছিল। শুধু তাই নয়, সে তখন জোরেশোরে ফিলিস্তিনে বহুসংখ্যক ইহুদী উপনিবেশ স্থাপনে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল। একই সময়—বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সাথে মৈত্রীচুক্তির পর ফ্রান্সও এমন কিছু নড়াচড়া শুরু করল যাতে বৈরুত ও দামেস্কে সংশয়ের সৃষ্টি হলো। বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধের লাইনগুলো এবং এর মিত্ররা কিছুটা আগেভাগেই তাদের নালা খনন শুরু করে দিল। এই সব আলামতের প্রেক্ষিতে ইস্তাম্বুল দিন দিন বার্লিনের ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। প্রতিটি ইঙ্গিতই এই নির্দেশনা দিতে লাগল যে, নিকটপ্রাচ্যের এ অঞ্চলটি বাস্তবতার প্রহরের কাছাকাছি চলে আসছে যা তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিবে। কোন পর্যবেক্ষকের কাছেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না যে, অচিরেই এ অঞ্চল শক্তি ও আধিপত্যের বিশেষ স্থান হিসাবে নতুন মানচিত্র অঙ্কনের উদ্দেশ্যে এক ভায়াবহ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে। বাস্তবেও দেখা গেল যে, প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই কায়রো এই বিরাট সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেল। মিত্র শিবিরের মূল পক্ষদ্বয়— ব্রিটেন ও ফ্রান্স নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে প্রথম মুহূর্ত থেকেই সমঝোতা করে নিয়েছিল ঃ

১. যুদ্ধের প্রয়োজনে মুখ্যত প্রাধান্য দেয়া হবে ইউরোপের রণাঙ্গন বিশেষ করে সরাসরি জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিব্রতকর লড়াইকে। কারণ তাদের উভয়ের মত অনুযায়ী সেখানেই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে।
২. এ প্রেক্ষাপটে এ রাষ্ট্র দুটো অন্যান্য সেক্টরে জড়িত হওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। তারা তাদের তৎপরতাকে ইউরোপীয় ময়দানের বাইরেই সীমাবদ্ধ রাখবে— অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে যতদূর সম্ভব প্রতিরক্ষার সীমায়।
৩. যুদ্ধের পর জার্মানীর পরাজয়ের ক্ষেত্রে— দেশ দু'টি যে বিরাট পুরস্কারের অপেক্ষা করছে, তা হচ্ছে উসমানী খেলাফতের প্রাচ্যদেশীয় মালিকানা। বিষয়টি যেহেতু কিছুটা সংবেদনশীল। তাই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই নেয়া হবে, যাতে দু'দেশের হিসাব-নিকাশের গরমিলের কারণে সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি না হয়। কারণ এটাকে পুঁজি করে পাছে জার্মানী উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের চিড় ধরাতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে এই দুই প্রধান মিত্রের সমঝোতা বাস্তবতাকে আড়ালে রাখতে পারল না। পক্ষগুলোর রাজনৈতিক ও মানসিক পরিস্থিতির দৃশ্যমান ও অনুভূত বাস্তবতার আবেদন ছিল যেন তার সাথে সতর্কভাবে লেনদেন অব্যাহত রাখে। এই বাস্তবতা বেশ স্পষ্টভাবেই জানান দিয়ে যাচ্ছিল যে, এই মৈত্রী জোটের মধ্যে ব্রিটেনই হলো সবচেয়ে বড় পক্ষ। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল এ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির যুগ। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ জনগণের ক্ষেত্রে এটি ছিল শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উত্তরণের সময়। অথচ ফ্রান্স ছিল ঠিক তার বিপরীত অবস্থানে। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল তার জন্য ঘরে ও বাইরে কেবল বেদনাবিধূর। এরপর জার্মানীর মুকাবিলায় সত্তরের যুদ্ধে (১৮৭০) তার পরাজয় নেমে এলো। এ সময় একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে তার অপমৃত্যুই হতো, যদি না তার ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণাদি থাকত, যদি না ইউরোপে শক্তির ভারসাম্যের স্বার্থ থাকত— বিশেষ করে জার্মানীর মুকাবিলায়।

স্পর্শকাতরতার আবেদনে রাজনীতিকরা বাস্তবাতার সাথে যতই সতর্ক আচরণ করুক না কেন, সে তার নিজের মতোই কাজ করে যায়। এ জন্যই দেখা যায়, ব্রিটেন গোটা যুদ্ধে তার শক্তিমত্তা আর বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে গেলেও ফ্রান্স পেছনে পেছনে ব্রিটেনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব আত্মকেন্দ্রিকই ছিল।

এ সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশাসন ও সামরিক তৎপরতা উভয়ই ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনটি প্রভাবশালী কেন্দ্রের ওপর নির্ভর ছিল ঃ

১. প্রথমটি হচ্ছে লন্ডন কেন্দ্র ঃ এটা হচ্ছে সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং এখানেই পার্লামেন্ট, সরকার ও সিংহাসনের অবস্থান। সর্বোপরি, এখানেই হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ড। এ সময় সমর বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন সেই বিখ্যাত

'লর্ড কিচনার'। যিনি মিসরে ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর কমান্ডার থাকাকালীন সুদান দখলের কারণে খুব প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

২. দ্বিতীয়টি হচ্ছে— কায়রো কেন্দ্র ঃ তখন ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরে ব্রিটিশ রাজনীতির প্রধান কার্যালয় ছিল কায়রোতে। যুদ্ধ পরিস্থিতি ও যোগাযোগ মাধ্যমের ধরন-প্রকৃতির প্রেক্ষিতে এ সময় কায়রো কেন্দ্রের হাতে ছিল ব্যাপক কর্তৃত্ব। যুদ্ধের সূচনালগ্নে এ কেন্দ্রের শীর্ষব্যক্তি ছিলেন স্যার হেনরি ম্যাকমাহন।

৩. তৃতীয় কেন্দ্রটি ছিল দিল্লী কেন্দ্র ঃ দিল্লী তখন ভারত শাসনের সাথে সাথে এ অঞ্চলে ব্রিটিশ রাজনীতিরও দায়িত্বশীল ছিল। চীন সাগর থেকে আরব সাগর এবং চীন উপমহাদেশের সমুদ্রোপকূলীয় হংকং থেকে লোহিত সাগরের পারে এডেন পর্যন্ত এবং আরব উপদ্বীপের প্রবেশ পথ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এলাকা ছিল এ কেন্দ্রের অধীন।

ব্রিটিশ উপনিবেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রভাবে দিল্লী কেন্দ্রটি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে এমন এক স্বতন্ত্র ধাচের রাজত্বের উদ্ভব হয়েছিল যা ইতিহাসে আর দ্বিতীয়বার পাওয়া যায়নি। ইন্ডিয়ান সরকারের তখন যে নাম ছিল শুধু নিছক ঔপনিবেশিক প্রশাসন ছিল না বরং তা ছিল সাম্রাজ্য প্রশাসন। দুটোর মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, সাধারণত ঔপনিবেশিক প্রশাসন একটি উপনিবেশকে কাজে লাগোনা আর তার প্রশাসনের দায়িত্বই পালন করে থাকত। কিন্তু 'সাম্রাজ্য প্রশাসনের' ওপর দায়িত্ব ছিল রাজ্য ও আধিপত্যের বিস্তার ঘটানো। বাস্তবেও দেখা গেছে যে, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট কখনও কখনও সাম্রাজ্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণে লন্ডনের সরকার থেকেও বেশি শক্তিশালী ছিল। এজন্যই এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না যে, এমন কিছু ব্রিটিশ রাজনীতিক ও প্রশাসকের উদ্ভব হলো যারা ভারত সরকারের কাঠামোয় বড় হয়েছিল এবং শিক্ষা লাভ করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতে রাজার প্রতিনিধি ছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ।

যখন প্রথম মহাযুদ্ধ লেগে গেল তখন তুর্কিস্তান কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কয়েক মাস অপেক্ষা করল। তারপর জার্মানীর পক্ষ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। প্রবেশের আগে ইতস্তত করার মাসগুলোতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রগুলো এমন ব্যবহার অব্যাহত রাখল যেন তুর্কিস্তান যুদ্ধে প্রবেশ করবে অথবা তা থেকে বিরত থাকবে। মনে হচ্ছিল যেন উভয় অবস্থাতেই খেলাফতের প্রাচ্য মালিকানা যেন আসন্ন ভাগাভাগির জন্য উত্তরাধিকার সম্পদে পরিণত হয়ে গেছে— ইস্তাম্বুল তার অবস্থান যা-ই নির্ধারণ করুক না কেন।

এ সময় মিসরের নতুন কেন্দ্র এবং দিল্লীর পরাক্রমশালী কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল চরমে। উভয়ই তুর্কিস্তানের ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া

বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বেশি যোগ্য ও অগ্রাধিকারী মনে করতে লাগল। কায়রো কেন্দ্রের ধারণা হচ্ছে— সে শাম-এর নিকটে অবস্থান করছে। এখানেই রয়েছে ফিলিস্তিন ও হেজাব, এমনকি সম্ভবত ইরাকও। কাজেই এই দায়িত্ব পালনের সংশ্লিষ্টতা তারই সবচেয়ে বেশি। এদিকে দিল্লী কেন্দ্র মনে করছে যে, তার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও নজদ উপকূল পর্যন্ত আধিপত্যের অবস্থানে থাকার কারণে সে-ই সবচেয়ে পারঙ্গম পক্ষ। এ ব্যাপারে সে শেখ (পরবর্তীতে সুলতান ও বাদশাহ্) আবদুল আজিজ আল-সাউদসহ্ পূর্বদিকের বসরার নিকট পর্যন্ত উপকূলীয় অন্যান্য উপজাতি প্রধানের সাথে যোগাযোগও করেছে। তাছাড়া দিল্লীর এই সাম্রাজ্য কেন্দ্রটি পশ্চিম দিকে রাজ্য বিস্তার করতে করতে এডেন পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে। উল্লেখ্য, এটিকে ১৮৩৯ সালে দখল করা হয়। এটা দখল করা হয় শাম-এ মুহাম্মদ আলীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে মিসরের সীমানায় ফিরে যেতে বাধ্য করার সময়কার পরিস্থিতির সুযোগে।

তুর্কিস্তান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে এই সময়টিতে সংশ্লিষ্ট দুটি ব্রিটিশ কেন্দ্রে এই দায়িত্ব, প্রাপ্যতা ও অনুশীলন স্বভাবতই ছিল গোপনে গোপনে। অর্থাৎ যিনি এটা তত্ত্বাবধান করবেন বা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন তিনি কোন প্রকাশ্য ও পরিচিত রাজনীতিক দায়িত্বশীল ছিলেন না। বরং সে সময় দায়িত্বটি ছিল সিক্রেট সার্ভিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত দু'জন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের হাতে। এভাবে সে সময় ঐ এলাকায় সাম্রাজ্যের কাজ ছিল রাজনৈতিক গোপন তথ্য অনুসন্ধানী দুটি অফিসের ওপরই ন্যস্ত ঃ

কায়রো অফিসের দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল গিলবার্ট ক্লাইটন।

দিল্লী অফিসের পশ্চিমাংশে এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের মালিকানার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ছিলেন কর্নেল বেরসী কক্স। ভারত সরকার বেশি সময় অপেক্ষা করতে পারল না। দিল্লী অফিস প্রায়শ কাজ শুরু করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। সে চাচ্ছিল প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বসরাকে দখল করতে যাতে উপসাগরের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং যাতে তুর্কিস্তান কোন অবস্থাতেই উপকূলের শেখ শাসিত দেশ যেমন কুয়েত এমনকি হরমুজ প্রণালীতে তার আধিপত্য ফিরে আনতে সক্ষম না হয়। এদিকে দিল্লী অফিস বসরার কিছু বিশিষ্ট আরবি ব্যক্তিত্বের সাথে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিল। এদের পুরোধা ছিলেন সাইয়্যেদ তালেবুন নকীব। ইনি ছিলেন তুর্কি শাসন বিরোধীদের অন্যতম বলিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি ইরাকের স্বাধীনতা পাওয়ার লক্ষ্যে ব্রিটেনের সাথে সহযোগিতায় আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কায়রোয় অবস্থিত সাম্রাজ্য-কেন্দ্রের সে সাধ্য ছিল না যে মিসরের সামরিক কমান্ডের উপর্যুপরি দাবি সত্ত্বেও তা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তখন এখানকার জেনারেল কমান্ডার ছিলেন জেনারেল স্যার জন ম্যাক্সওয়েল।

জেনারেল ম্যাক্সওয়েল মনে করতেন যে, তুর্কিস্তান অচিরেই জার্মানীর সাথে যুদ্ধে প্রবেশ করবে। যুদ্ধ ময়দানে তার প্রথম পদক্ষেপ হবে ফিলিস্তিন থেকে সিনাই জুড়ে আক্রমণ রচনা করা যাতে সুয়েজখালে পৌঁছতে পারে এবং সেখানে ব্রিটেনের অস্তিত্ব, তারপর মিসরে ব্রিটেনের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য তুর্কী পদক্ষেপের আগেই কিছু করা অনিবার্য এবং সুয়েজখাল থেকে দূরে সম্ভাব্য তুর্কী হামলা মুকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু লন্ডনের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও সামরিক কমান্ডের অভিমত ছিল ভিন্ন। তার সার কথা ছিল— ফিলিস্তিনের কাছে ঘেষা আর বসরাতে অবতরণ এক কথা নয়। কারণ বসরা হলো দূরে, সেখানে ফ্রান্সের কোন কিছু চাওয়া-পাওয়ার নেই। কিন্তু যদি শামের সাথে (যার দক্ষিণাংশ হলো ফিলিস্তিন) সংশ্লিষ্ট কোন কাজের প্রশ্ন আসে তাহলে ফ্রান্সকে এই সন্দেহ দোলা দিবে যে, নিশ্চয়ই এমন কিছু পূর্ব-পরিকল্পনা রয়েছে যাতে মূল কাজ শুরু করার আগেই উসমানী খেলাফতের উত্তরাধিকারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'হাত রাখার' কোন ব্যাপার আছে। এতে তার চেতনায় নাড়া পড়তে পারে এবং ব্রিটেনের গুপ্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের দোলাচলের উদ্রেক হতে পারে। এটা ব্রিটেনের সাথে সংঘটিত সমঝোতার খেলাফও বটে। কারণ এ সমঝোতা চুক্তি অনুসারে উক্ত উত্তরাধিকারে ভাগবাটোয়ারা সম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার আগে কেউই ঐ পরিত্যক্ত হিস্যার দিকে আগেভাগে অগ্রসর হবে না। এছাড়া ফ্রান্স এ দাবিও করে বসতে পারে যে, নিকট-প্রাচ্যের কোন সামরিক ফ্রন্ট জয় করাও ঐ চুক্তির ধারা বিরোধী। কারণ অপারেশনের ইউরোপীয় মঞ্চের প্রতিই প্রথম প্রাধান্য দিতে হবে এবং জার্মানীর পরাজয় এনে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে বিষধর সাপের মাথাই হচ্ছে ভয়ঙ্কর, লেজের দিকটা তো সহজ ব্যাপার।

এই প্রেক্ষাপটে কায়রো কেন্দ্রে প্রেরিত লন্ডনের নির্দেশাবলী নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির আবেদন করছে ঃ

১. জেনারেল জন ম্যাক্সওয়েল প্রতিরক্ষা অবস্থানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন এবং ইস্তাম্বুল যদি যুদ্ধে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং হামলা শুরু করে দেয় তাহলে তিনি মিসর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

২. তুর্কিস্তানের ভূমিকা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত কায়রো অফিস (সিক্রেট সার্ভিস) সিরিয়ায় তুর্কি লাইনগুলোর পেছনে সম্ভাব্য অ্যাকশনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে যাবে।

এ সময় কর্নেল ক্লাইটন কায়রো কার্যালয়ের সাথে কিছু সংখ্যক সহকারীকে যোগ করলেন। তাদের কারও কারও দায়িত্ব নির্ধারিত হলো আধুনিক আরব ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা। এদের মধ্যে সবচেয়ে যশস্বী ছিলেন ক্যাপ্টেন লরেন্স

(যিনি পরবর্তীতে 'আরবের লরেন্স' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন)। তার পাশাপাশি অন্যরাও ছিলেন যারা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আরবি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন কর্নওয়ালিশ (পরবর্তীতে ইরাকে ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েছিলেন); হোজার্ট (ইনি পরবর্তীতে আরব বাদশাহ্দের নিকট স্থায়ী প্রতিনিধি হয়েছিলেন) ও গ্রোটরোড বেল (যিনি এক সময় ইরাকের মুকুটহীন রাণীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন সেখানকার ব্রিটিশ রাজনীতির গোপন শক্তি)। এখানে মন্তব্য করা যায় যে, তারা সকলেই এবং অন্যরা যুদ্ধের আগে মধ্যপ্রাচ্যে প্রত্মতাত্ত্বিক কূপ খননের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন।

তারা আরবদের জন্য বিপজ্জনক স্থানগুলোতে কাজ করত এবং জীবন যাপন করত। তারা সবকিছু বুঝত এবং আরবি ভাষায় কথা বলত বলে তারা আরবদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে মিশে থাকার যোগ্যতা রাখত।

ক্লাইটন-এর নেতৃত্বাধীন আরবি অফিসটি কেবল আরবি ও ইসলামিক পরিস্থিতি আবিষ্কারের কাজেই ব্যস্ত ছিল। আরবি ও ইসলামী বিশ্ব উসমানীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পতাকা তুলতে বিলম্ব করছিল শুধু এ কারণে যে তাদের চিন্তা-চেতনায় খেলাফতের ধারণাটি একটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। পক্ষান্তরে উসমানীদের ইউরোপীয় মালিকানা যেমন গ্রীক, বুলগেরিয়া ইত্যাদি দেশ বিপ্লব ও স্বাধীনতার আওয়াজ আগেই তুলেছিল। কারণ ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাদের সংঘাত ছিল সুস্পষ্ট। খলিফার প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রশ্নে চিন্তা ও কর্মে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক কখনও জড়িয়ে যায়নি।

বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব খলিফার প্রতি আনুগত্য এবং খেলাফতের প্রতি ধর্মীয় বিবেচনার বিষয়টিতে ব্যাপক অনীহা প্রত্যক্ষ করেছে। এই অনীহা আরও বেড়ে গেছে যখন স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে এবং খোদ রাজধানীতেই 'যুবতী তুর্কি' আন্দোলনের সেনাকর্মকর্তারা বিপ্লব ঘটাল, তারপর থেকে। এই পুনর্বিবেচনা ও তার পরিণতি শামে এসে একটি সীমায় কেন্দ্রীভূত হলো। বিশেষ করে মিসর তো ব্রিটিশ দখলদারীর কারণে খেলাফতের ছত্রছায়া থেকে বেশ কিছুটা দূরেই অবস্থান করছিল। যদিও কায়রো সে সময়টিতে শামের অনেক মুসলিম ও খৃস্টান বিপ্লবী ও চিন্তাবিদের আশ্রয়ের স্থান ও বন্দীশালা ছিল।

ক্লাইটনের নেতৃত্বে 'আরবি অফিসটি' চেষ্টা করে যাচ্ছিল যে গোলন্দাজ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ওয়ার লাইন আর বাঙ্কারের স্থান নির্দিষ্ট করার আগেই যেন বাস্তব ছবিটি পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়।

এই পূর্বাভাস পর্যবেক্ষণের কাজ ছাড়াও প্রাচ্যে ব্রিটিশ রাজনীতিতে একটি প্রশ্ন বার বার দেখা দিয়েছে যে, খলিফা যদি যুদ্ধে অংশ নিয়ে জেহাদের ঘোষণা দেন তাহলে ইসলামী ও আরব জাতির প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। কারণ এ জেহাদ হচ্ছে

অনিবার্যভাবে পালনীয় একটি ফরয কাজ— যদি কোন মুসলিম ভূখণ্ডে বিপদের হুমকি আসে বা তাদেরকে শত্রুপক্ষ গ্রাস করতে চায়। এই প্রশ্নের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন এই বাস্তবতা দেখা দিল যে ব্রিটিশ বাহনীতে উপনিবেশের সেনাদলও রয়েছে, যেখানে ভারতও শামিল আছে। আর ভারত বাহিনীতে প্রায় সিকি মিলিয়ন মুসলমানও রয়েছে। যখন মুসলমানদের খলিফা জেহাদের ঘোষণা দিবেন আর ব্রিটেন হবে শত্রুপক্ষ, তখন এই বাহিনীর ভূমিকা কি হবে ? মুসলিম ভারতে (পরবর্তীতে অখণ্ড পাকিস্তানে)-এর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ? এ ছাড়া এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দূরবর্তী অন্যান্য অঞ্চলও খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুল থেকে ঘোষিত জেহাদের ডাকে প্রভাবিত হতে পারে ?

ব্রিটেনের কৌশলগত চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষাপটেও বেশ অস্থিরতা বিরাজ করছিল যে, এ অবস্থায় ফিলিস্তিনে ইহুদী বসতিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; যদি তুর্কিরা জার্মানদের নিয়ে সুয়েজখাল অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় সিনাই অঞ্চলে বড় ধরনের হামলা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি স্বরূপ এসব বসতির চারপাশে একত্রিত হয়।

॥ ২॥

আযীয মিস্‌রী

আমি নূরী আস্-সাঈদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমার কাছে তাঁকে মনে হলো স্বপ্নচারী এক সেনা অফিসার; তাঁর সাম্যবাদের প্রতি ঝোঁক রয়েছে।

—স্যার বেরসি কক্স, নূরী আস্-সাঈদকে খুঁজে পাবার পর

যে সময় 'আরবি অফিসটিতে' আরবদের চিন্তা ও উদ্দেশ্য এবং আরব জাহানে সক্রিয় গ্রুপগুলোর গতিবিধি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছিল, ঠিক একই সময়ে মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী কিছু আরব মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ উদ্দেশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে যাচ্ছিল এবং তা অবশ্যই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে।

কিছু ব্রিটিশ দলিলপত্র— যেগুলোর কোনটির গোপনীয়তা নির্ধারণ করা হয় পচাঁত্তর বছর, কোনটির এক শ' বছর— এর মধ্যে ৪৬২৬১/২১/৭৩১ নম্বর ডুকমেন্টটির শিরোনাম ছিল— 'আযীয মিস্‌রী ও মিঃ আর এ এম রাসেলের মধ্যকার আলোচনা' মিসরে ব্রিটিশ কমিশনারের বাসভবনের প্রাচ্য উপদেষ্টার অফিসে সংঘটিত, তাং ১৬ আগস্ট ১৯১৪। এ দলিলটিতে তুর্কিস্তানের বাইরে মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী আরবী নেতৃত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল যে, এই নেতৃত্ব ব্রিটেনের সাথে সহযোগিতা করে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, আযীয মিস্‌রী পাশা মিসরের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তুর্কি বাহিনীর সেনা অফিসার হিসাবে এর কমান্ডের কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি আরব বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাদশাহ ফারুকের শিক্ষা-দীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে একই দায়িত্বে নিয়োজিত আহমাদ মুহাম্মদ হাসনাইন পাশার সাথে তার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল (তিনি এক সময় শাহী দেওয়ানের মুখ্য ব্যক্তি হয়েছিলেন)। এই আযীয মিস্‌রী পাশা ১৯৩৬ সালের চুক্তির পর মিসরী বাহিনীর মহাপরিদর্শক হয়েছিলেন। ইংরেজের সাথে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং জার্মানদের সাথে সহযোগিতার অভিযোগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বন্দীত্ব বরণ করেন। তাঁকে ২৩ জুলাই ১৯৫২ সালে মিসরে সংঘটিত 'মুক্তিসেনা আন্দোলনের' ভাবগুরু মনে করা হয়। যা হোক, এই আযীয মিস্‌রীর সাথে সাক্ষাতের পর মিঃ রাসেল যে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টটি লিখেছিলেন তার বিস্তারিত ছিল এ রকম ঃ

আজ ১৬ আগস্ট, কর্নেল আযীয মিস্‌রী আমার সাক্ষাতে এসেছিলেন। তিনি এমন ব্যক্তিত্ব, আরব বিশ্বে যার একটি বিশেষ মর্যাদার আসন রয়েছে। তাঁর বক্তব্য গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে তা যত্নের সাথে ভেবে দেখা দরকার। কারণ আযীয মিস্‌রী 'যুবতী তুর্কি বিপ্লবের' একজন বরেণ্য নেতা। তিনি তুর্কি বাহিনীর সেনা অফিসার হিসাবে উত্তমভাবে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তিনি নিজ চিন্তাধারায় স্থির বিশ্বাসী এক জাতীয়তাবাদী আরব অফিসার। তিনি এ বছরের গোড়ার দিকে (১৯১৪) একটি গোপন সংস্থা গঠন করেন। এর নাম 'জম্‌ইয়ত আল্‌-আহাদ' (অঙ্গীকার সংঘ)। এতে তুর্কি বাহিনীর কিছু আরব সহকর্মী অফিসার অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে, আরবের স্বাধীনতা এবং তা বাস্তবায়নের সংগ্রাম। আমরা বা তুর্কিরা এ দলটি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতাম না।

আমরা তো কেবল ইস্তাম্বুল আর দামেস্কে ভেসে বেড়ানো কিছু অসমর্থিত তথ্যের মাধ্যমে এর নামটি জানতাম। কিন্তু এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই সংস্থার প্রতি তুর্কি সরকারের আগ্রহ লক্ষ্য করছি। এর পরিণতিতেই আযীয মিস্‌রীকে বন্দী করা হয়। তারপর আমরা জানলাম যে, এপ্রিলে তাঁর বিচারের জন্য কোর্ট মার্শাল গঠন করা হয়েছিল, যা তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। কিন্তু উৎসাহী অফিসারদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং সে যে একজন মিসরী এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে তাঁর দণ্ডাদেশ কার্যকর না করে কেবল তাঁর স্বদেশ মিসরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে— যা আসলে ছিল একটা নির্বাসন।

এ প্রেক্ষাপট মনে রেখেই আজ আমি আযীয মিসরীকে অভ্যর্থনা জানাই। তিনি তাঁর দলটির লক্ষ্য সম্পর্কে আমার সাথে আলাপ করতে চাইলেন। কিন্তু 'অঙ্গীকার সংঘ' বা এর সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি। শুধু এটুকু জানালেন যে, তিনি অঙ্গীকার সংঘের নির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে আলোচক হিসাবে এসেছেন। তিনি চান তুর্কিস্তান এবং অন্য যে কোন বাইরের শক্তির আধিপত্য থেকে মুক্ত স্বাধীন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা উদ্‌ঘাটন করতে। তবে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রাখতে তাঁদের আগ্রহ রয়েছে।

আযীয মিস্‌রী তাঁদের পরিকল্পিত স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের সীমানা আমার সামনে তুলে ধরলেন। তিনি মানচিত্রের সীমারেখা টানলেন উত্তরে আলেকজান্দ্রিয়া সমুদ্রবন্দর (ভূমধ্যসাগরের উত্তর দিকে দক্ষিণ তুর্কিস্তান) ও পারস্য সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত 'মোসেল' প্রদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তিনি ও তাঁর সাথীরা মনে করেন যে, এই রাষ্ট্রের বক্ষস্থল হবে বাগদাদ, হেজাব, নজদ ও সিরিয়া নিয়ে গঠিত ট্রায়াঙ্গল (ত্রিকোণ)। তারা দক্ষিণ আরব উপদ্বীপ (ইয়ামেন ও আসির)-এর কথা ভাবছে না। কারণ এ অঞ্চলটি শক্তির

দ্বন্দ্বে শতধাবিভক্ত এবং এ অঞ্চল আযীয মিস্‌রী ও তাঁর সতীর্থদের পরিকল্পিত আরব প্রকল্পে ভূমিকা রাখতে অক্ষম। আমি আযীয মিস্‌রীকে প্রশ্ন করলাম, এই গোষ্ঠীর নেতা কে ? তবে তিনি এর উত্তরে পরিষ্কার কিছু বললেন না।

আযীয মিস্‌রী এই স্বাধীন আরব রাষ্ট্র পরিকল্পনায় খুবই আগ্রহী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সাধারণ আরব এখন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। তিনি এটাও বিশ্বাস করেন যে, অধিকাংশ সিরীয় খৃস্টান (লেবাননের) ও দ্রুয তাঁদের আন্দোলনকে সমর্থন করেন। সম্ভবত আযীয মিস্‌রী এই পয়েন্টে কিছুটা বাড়িয়ে বলেছেন। আযীয মিস্‌রী আমার সাথে আলোচনার সময় খোলাখুলিভাবে জানান যে, তিনি যা চাচ্ছেন তা হচ্ছে— আরব জাতির প্রতি শুভ কামনার ঘোষণা দিয়ে ব্রিটেন একটি বিবৃতি দিক এবং তারা মুক্তি ও স্বাধীনতার আবেদনে সাড়া দিয়ে বাস্তবে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলে ব্রিটেন নিউট্র্যাল থাকবে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম যে, তিনি আমাদের কাছে নৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি সক্রিয় কোন সাহায্য চান কিনা ! বস্তুগত কোন সাহায্য অর্থাৎ অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করলে তারা তা যথার্থ সম্মানের সাথে গ্রহণ করবেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি অস্ত্রশস্ত্র বা অন্যান্য সাহায্য ইরাকের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা অন্য কোন স্থিরকৃত স্থানে গোপনে সরবরাহ করার আবেদন জানান। এর বিনিময়ে আযীয মিস্‌রী আমাকে এ কথা বলার জন্য দায়িত্ব পেয়েছেন যে, স্বতন্ত্র আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ভারত, এমনকি পারস্যে আমাদের স্বার্থের প্রতি সম্মান জানানোর অঙ্গীকার করছে। এ ছাড়া দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের সাথে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

২৪ অক্টোবরে আযীয মিস্‌রী আবার এসে গিলবার্ট ক্লাইটনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যোগাযোগ করলেন। ইনি কায়রো অফিসের দায়িত্বশীল। এ সময় বিভিন্ন প্রমাণ এই ইঙ্গিতই দিচ্ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তুর্কিস্তান জার্মানদের কাতারে শামিল হয়ে যুদ্ধে প্রবেশ করা অত্যাসন্ন। ঐ দিনই 'ক্লাইটন' তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ

আমি আযীয মিস্‌রী বেগের আগেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যুদ্ধে প্রবেশ করলে তুর্কিস্তানকে আরবরা সমর্থন করার ইচ্ছা আছে কিনা! আমি আরও বললাম, এমন কিছু হলে গ্রেট ব্রিটেন— যে নাকি এতদিন আরবদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রেখে যাচ্ছিল, সে খুবই দুঃখিত হবে! তুর্কিদের এ ধরনের যে কোন শত্রুতামূলক পদক্ষেপের কারণে এ সম্পর্কের ওপর কোন প্রভাব পড়ুক তা ব্রিটেন কখনও চায় না। এরপর আমি সরাসরিই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম যে, আমাকে বলুন, আরব নেতৃবৃন্দের প্রতি ব্রিটিশ সরকার তার সদিচ্ছা কিভাবে নিশ্চিত করতে পারে।

আযীয বেগ ছিলেন চরম স্পষ্টবাদী। তিনি আমাকে বললেন যে, তাঁর এত সক্ষম আরব সংগঠন নেই। কারণ সাধারণ আরব ঝোঁক থাকবে অধিকতর শক্তিধরের

প্রতি— চাই সে যেই হোক। যেহেতু তুর্কিস্তান অধিকাংশ আরব দেশ শাসন করছে, কাজেই বিশাল আরব ভূভাগ তার কব্জায় থাকায় বাস্তবে সে-ই সবচেয়ে বড় শক্তি। কাজেই অনিবার্যভাবেই তারা তুর্কিদের দিকে ঝুঁকে পড়বে। বিশেষ করে তুর্কিস্তান যখন প্রভাব সৃষ্টিকারী ইসলামী দিকটি তুলে ধরে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।

এরপর আযীয বেগ বললেন— তবে দৃশ্যপট ভিন্নতর হতে পারে যদি তুর্কি আধিপত্য থেকে বের হয়ে আরব দেশগুলো স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ কোন আরব কর্মসূচির প্যাকেজ প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে পারে। আর এটা কেবল সম্ভব একটি সাধারণ আরব বিপ্লব সংগঠনের মাধ্যমে, যা আরবদের হিম্মত বাড়িয়ে দেবে। তাঁদের মনোবল শতগুণ বৃদ্ধি করবে এবং স্বদেশের স্বাধীনতা বাস্তবায়নে তাঁদের সকলের প্রয়াস সমন্বিত হবে।

আযীয বেগের ধারণা ছিল আরবগণ একটি ভাল সামরিক শক্তি গঠন করতে পারবে। এই বাহিনীর বীজদানা সরবরাহ করা যাবে তুর্কি বাহিনীতে নিয়োজিত আরব সৈন্যদের দিয়ে; বিশেষ করে ইরাকে অবস্থিত তুর্কি বাহিনীতে যারা আছে। এই বাহিনীর মধ্যে আরবি বিপ্লবের চিন্তাধারা প্রবহমান। আযীয বেগের আন্দাজ মতে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ১৫ হাজার সৈন্যকে একত্রিত করে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব। এরাই হবে আরবি বিপ্লবের বীজদানা। আর এই আরব বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হলে এটাই হবে কেন্দ্রস্থল যাকে ঘিরে গড়ে উঠবে আরবদের ধর্মীয় ও উপজাতীয় নেতৃত্ব। আযীয বেগ আরও বলেন— তাঁরা চায় না যে, ব্রিটিশ বাহিনী তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিপ্লবে সহযোগিতার জন্য তাদের দেশগুলোতে ঢুকে পড়ে। কারণ এতে এমন মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে যে, ব্রিটেন আরব বিশ্বকে তার মালিকানায় যুক্ত করতে চায়— তাদের স্বাধীনতা লাভে সহযোগিতার জন্য নয়।

মিঃ ক্লাইটন তার সাক্ষাৎকার রিপোর্টের সমাপ্তি টানেন এভাবে ঃ

আযীয বেগের মতো লোকের অবস্থান অনুযায়ী যথোপযুক্ত গুরুত্বসহকারে আমি তার কথা শুনলাম। কিন্তু আমি এটাকে কিছুই গণ্য করলাম না। কারণ তুর্কিস্তান এখনও যুদ্ধে প্রবেশ করেনি। এ সময়ে আমাদের যে কোন পদক্ষেপ প্রকাশ পেলে অপ্রত্যাশিত কিছু সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম যে, আমরা বিষয়গুলো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত যোগাযোগ রেখে যাব।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অফিসগুলোর আন্তঃসম্পর্কের স্বাভাবিক নিয়মেই 'অঙ্গীকার সংঘ'-এর প্রতিভূ কর্নেল আযীয বেগের সাথে মিঃ রাসেল ও মিঃ ক্লাইটনের যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ ভারতে পৌঁছে গেল। নভেম্বরের শেষ দিকে দিল্লী অফিসের প্রধান কর্মকর্তা কর্নেল বেরসি কক্স রাজার প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে একটি প্রতিবেদন লিখে পাঠালেন যা পরে লন্ডনে প্রেরিত হয়। এতে তিনি বলেন ঃ

আমরা ভারত সরকারে আরব জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এখন ব্রিটিশ বাহিনী বসরা দখল করে সেখানে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করেছে। কিন্তু স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে কোন প্রতিরোধ বা শত্রুতার মনোভাব দেখা যায়নি। বরং উল্টো এ এলাকাবাসী আমাদেরকে বন্ধু আর সাহায্যকারীর চোখেই দেখছে। এই বসরা অঞ্চলে এখন বলতে গেলে তুর্কি প্রশাসনের কোন নাম-নিশানাই নেই।

এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, গোপন আরবি সংগঠনগুলোর মতো এখানে ভারতেও কিছু সংঘ রয়েছে। স্বদেশী সংগঠনগুলো ভারতে বেশ কিছু অপরাধমূলক ধর্মঘট করেছে। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত সময়টিতে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমরা তাদের কার্যালয় বন্ধ করে দিয়েছি এবং তাদের প্রচারপত্র, সমাবেশ ও প্রতিবাদ বিক্ষোভ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি। এতে তারা সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রাজার প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের জীবনের ওপর হামলা চালায়। তাছাড়া এটাও ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে, কিভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের কাজে আরব জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা করব। অথচ ভারতে একই ধরনের সংগঠনগুলোকে আমরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। এ প্রেক্ষিতে আমাদের মত হচ্ছে, ভারতে নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা আরবদের স্বাধীনতার অঙ্গীকার দেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করি। নইলে সেটা ভারত উপমহাদেশেও সংক্রমিত হতে পারে। বেরসি কক্স-এর নোটটিকে যুক্তিপূর্ণ করে তোলার মতো একটি মন্তব্য করে লর্ড হার্ডিঞ্জ লন্ডনে একটি পত্র লিখলেন। যাতে আছে ঃ

"তিনি মনে করেন আরব জাতীয়তাবাদীরা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে ইরাকে প্রবেশ করবে। অথচ দু'নদীর (দজলা ও ফুরাত) মধ্যবর্তী ভূখণ্ডও ভারত সরকারের মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ অঞ্চলের ভাগ্যের ব্যাপারে কায়রোর নাক গলানোর অধিকার নেই।"

কায়রো অফিস এটাকে খণ্ডন করে লন্ডনকে লিখলো ঃ "এখানকার আরবি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ধারণা হচ্ছে বসরাতে ব্রিটিশ বাহিনী ছাউনি ফেলে লোহিত সাগরে প্রকাশ্য সামরিক মহড়া দেয়ায় আরবদের মনে এই ভাব দেখা দিয়েছে যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের ভূখণ্ডগুলোকে নিজ মালিকানায় যুক্ত করার উচ্চাভিলাস পোষণ করছে। এটা তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিপ্লবে সাধারণ আরব জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক হবে না।"

সম্ভবত ক্লাইটন ভাবলেন— আরব জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্যই যথেষ্ট নয়। তাই তিনি একটি সংক্ষিপ্ত তারবার্তাও লন্ডনে পাঠালেন। তাতে বলেছেন ঃ

আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে যদি কোন কাজ করার থাকে তাহলে এ সম্পর্কে আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। কারণ, আত্মীয়

বেগ মিসরী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কিন্তু যদি আমরা তার ও তার সহকর্মীদের কাজকে কঠিন করে তুলি তাহলে সে কাজটি করতে সক্ষম হবে না।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড গ্রে এর উত্তরে মিসরের ব্রিটিশ কমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমাহনের নিকট এক তারবার্তা পাঠান। ইনি আরব অফিস ও ক্লাইটন সম্পর্কে দায়িত্বশীল। এতে ছিল ঃ

আপনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আযীয মিসরীকে কোনরূপ নিশ্চয়তা দিয়ে প্রস্তাব পেশ করতে পারেন যে, আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আযীয মিসরীর চাহিদা মোতাবেক বাহিনী গঠনের কাজ শুরু করে দিতে পারেন। তার এখতিয়ারে ২০০০ পাউন্ড স্টার্লিং রেখে দিতে পারেন— যদি মনে করেন এতে কোন ফায়দা হবে। আপনি তাকে বলবেন তিনি যেন কায়রো অফিসের ব্রিটিশ কমিশনারের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। আপনি তাকে এ আশ্বাসও দিতে পারেন যে, অচিরেই আমরা আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবের মাত্রা অনুযায়ী সহযোগিতা দিয়ে যাব। আযীয মিসরীকে ক্লাইটনের সাক্ষাতে ডেকে পাঠানো হলো। ইনি তাকে জানালেন যে, ব্রিটিশ সরকার আরব জাতীয়তাবাদীদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

আযীয মিসরী প্রথম যে সাহায্যটি চাইলেন তা ছিল ইরাকে তুর্কি বাহিনীতে কর্মরত আরব সেনাকর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা। বিশেষ করে তাদের একজনের সাথে যিনি তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে তৎপর এক যুবক সেনা অফিসার। তার নাম নূরী আস-সাঈদ। নূরী আস-সাঈদ (যিনি পরবর্তীতে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন)-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, যার বাহিনী সে সময় বসরাতে কর্মরত ছিল। এ কারণেই ভারতে রাজার প্রতিনিধি এবং দিল্লী অফিস প্রধান বেরসি কক্সকে জানাতে হলো যে, এদিকে কায়রোতে আরব জাতীয়তাবাদীদের সাথে যোগাযোগ চলছে। কিন্তু ভারতে রাজার প্রতিনিধি অথবা দিল্লী অফিস প্রধান কেউই মিসরে ব্রিটিশ কমিশনার বা কায়রো অফিসের রাজনীতির সাথে একমত ছিলেন না। যাহোক বেরসি কক্স (দিল্লী অফিস প্রধান) ইরাকী যুবা সেনা অফিসার নূরী আস্ সাঈদকে খুঁজে পেলেন এবং তার সাথে বসরাতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে নিলেন। বেরসি কক্স এরপর তার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তার রিপোর্টে বলেন ঃ

আমি নূরী আস্-সাঈদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমার কাছে তাকে মনে হলো এক স্বপ্নচারী সেনা অফিসার; তার সাম্যবাদের প্রতি ঝোঁক রয়েছে। ইনি প্রায় পঁচিশ বছরের একজন যুবক। তিনি বুকে একটি অসুখে ভুগছেন। দেখতে তাকে ইউরোপিয়ান মনে করা হলো। তিনি আমাকে আরব প্রকল্পটির কথা বললেন, যাতে সে এবং তার সতীর্থরা অংশগ্রহণ করছেন।

এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো— আযীয মিসরী— যাকে আপনারা কায়রো থেকেই জানেন। তিনি বলেন যে, তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণভাবে আরব জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন। তিনি আমাদের বসরা দখলকে সমর্থন জানান, যদি তা আরবকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আরব অ্যাকশনকে অনুপ্রাণিত করার সূচনা হয়ে থাকে, যাঁরা আমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চান। তিনি আমাকে এ-ও জানালেন যে, তিনি (ইরাকে) জাভেদ পাশার বাহিনীতে চাকরিরত সকল আরব সেনা অফিসারকে প্রত্যাহারের ব্যাপারে সাহায্য করতে সক্ষম। এ ছাড়াও তাঁদের অনেকের সাথে সাথে ফোরাত উপত্যকায় বহু গোত্রপতির সহযোগিতামূলক বন্ধুত্বও অর্জন করতে সক্ষম হবেন। সামরিক অফিসার ও গোত্রপতিদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আরব বিপ্লবের নেতৃত্ব অচিরেই স্বাধীনতাকামী আরব জাতিগুলোর স্বপ্নকে বাস্তবায়নের দিকে টানতে পারবে।

আমার দিক থেকে বলতে পারি যে, আমি এ সকল চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনাকে বড় সংশয়ের চোখে দেখি। আমার মনে হচ্ছে এগুলো কল্পনাতাড়িত কিন্তু অবাস্তব চিন্তাভাবনা। আমি বিশ্বাস করি না যে, সামরিক অফিসার আর গোত্রপতি শেখগণ একসাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে পারবে। আরব সেনা অফিসার— যাদের মধ্যে নূরী আস্-সাঈদও রয়েছেন— এদের যে ধারণা— আমাদের বসরা অধিকার হচ্ছে আরবদের মুক্তির পটভূমি— এটা নিছক কল্পনা বিলাসী রুগ্ন আবেগ। কারণ আমরা তো ওখানে ছাউনি ফেলেছি ভারতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। এ লক্ষ্য অর্জিত হবে যদি ইরাককে ব্রিটিশ মুকুটের মালিকানায় যুক্ত করতে পারি। যা হোক, সাধারণভাবে আমি এ সকল আরবি প্রকল্পগুলোকে ভয় করি। বরং আমি আপনাদেরকে প্রস্তাব করব যে, পরিস্থিতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা অবধি আযীয মিসরী আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের প্রকল্পগুলো ফ্রিজআপ করে রেখে সম্ভব হলে তাঁকে মিসর ত্যাগ করতে নিষেধ করাই বরং শ্রেয়।

এই সময়ে লন্ডন থেকেও ভারত সরকারের আধিপত্য ও প্রভাব বেশি ছিল। আর তাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড গ্রে অবিলম্বে কায়রোতে এক সিদ্ধান্তমূলক টেলিগ্রাম পাঠালেন। তাতে ছিল ঃ

"বর্তমান সময়ে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত আযীয মিসরীকে নির্ধারিত অনুপ্রেরণা দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।"

॥ ৩॥

মার্ক সায়েক্স

"ভারতে রাজার প্রতিনিধিকে কে বলেছে যে আমরা স্বতন্ত্র একক আরবি সরকার চাই"

—ভারতে প্রধান ব্রিটিশ শাসনকার্তার এক স্মারকে ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রী এডওয়ার্ড গ্রে এর মার্কিং

তুর্কিস্তান যুদ্ধে প্রবেশের সাথে সাথে কায়রোস্থ সাম্রাজ্য কেন্দ্র আবার ব্রিটিশ নীতি নির্ধারণী প্রভাব ফিরে পেল। বাস্তবিকই কায়রো ১৯১৫ সালের শুরুতেই মিত্রদের জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রবর্তী নেতৃত্বে পরিণত হয়ে গেল। সহসাই বোঝা গেল যে, ব্রিটিশ স্ট্র্যাটেজি সুয়েজখাল অভিমুখে তুর্কি আক্রমণের যে আশঙ্কা করেছিল তা ঘটতে আর বেশি বাকি নেই। এ প্রেক্ষিতে মিসরে ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল ম্যাক্স ওয়েল নির্দেশ পেলেন যেন সম্ভাব্য তুর্কি হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এরপর যেন সিনাই থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত অঞ্চলে অগ্রগামী উদ্যোগের লাগাম ধরার জন্য প্রস্তুত থাকে।

এভাবেই প্রাচ্যে তুর্কি মালিকানার ভবিষ্যত আলোচনা আর সিদ্ধান্তের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া সম্ভাব্য তুর্কি হামলাকে মোকাবিলা তথা প্রতিহত করার প্রস্তুতিস্বরূপ মিসরে গোটা সাম্রাজ্য থেকে সামরিক শক্তি জড় হওয়ার প্রেক্ষিতে কায়রোতে রাজনৈতিক তৎপরতা বেশ জোরদার হলো।

১. কায়রো কার্যালয় এখন প্যারিসের সাথে লন্ডনের স্থাপিত জরুরী সমন্বয়ে একটি পক্ষ। পরিস্থিতি নিজে থেকেই অনিবার্য করে তুলেছে যেন ইউরোপের বাইরে একটি মঞ্চ স্থাপিত হয়। বাস্তবতার নিরিখেই এখন উসমানী খেলাফতের উত্তরাধিকার সম্পত্তি ভাগাভাগিতে সাধারণ রুটগুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা জরুরী হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে লন্ডন ও প্যারিস প্রধান প্রধান রুটগুলো সম্পর্কে নিম্নরূপ ঐকমত্যে পৌছে ঃ

* আরবদের নতুন মানচিত্রে উপকূল আর অভ্যন্তরভাগের মধ্যে অবশ্যই বিভক্তি সৃষ্টি করতে হবে। কারণ ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজেদের প্রভাব ও আধিপত্যকে ভূমধ্যসাগর ও তার আশপাশের বিস্তৃত উপকূলে তা ভাগাভাগি করে নিতে পারবে। কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ— যেখানে মরুভূমি আর বিভিন্ন গোত্র রয়েছে— তার ওপর আধিপত্য বিস্তার খুবই জটিল বিষয়। সেটা বরং

আরবদের জন্যই ছেড়ে দেয়া ভাল— যদি তারা তুর্কিদের পরাজয়ে সহযোগিতা করে।

* আরব ভূখণ্ডকে সাধারণভাবে ভাগ করা ছাড়াও আড়াআড়ি রেখায় বিভক্ত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় লম্ব রেখা উপকূলকে অভ্যন্তরভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। সীমান্ত রেখা মিসরকে সিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবে। (কারণ এখানে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্র হবে। বিল মারস্টোন থেকে ডিজরাঈলী এবং 'লয়েড জর্জ' পর্যন্ত এটাই ছিল ব্রিটিশ নীতি) এ ক্ষেত্রে ফ্রান্স চাচ্ছিল উত্তর সিরিয়া। সে মনে করে তার ঐতিহাসিক হক রয়েছে— বৈরুত, লেবানন পাহাড় ও তার চারপাশের এলাকাসহ শাম-এর দুই উপত্যকায়। এর মধ্যে দামেশ্‌ক, হেম্‌স, হলব, হুমাত ও মুসেল (উত্তর ইরাক)ও শামিল রয়েছে। পক্ষান্তরে ব্রিটেন চাচ্ছিল মিসর ও সুদানের পাশাপাশি 'দু'নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল' (ইরাক) ও উপসাগরীয় অঞ্চল। তাছাড়া তার চোখ ছিল ফিলিস্তিনের ওপর নিবদ্ধ। কারণ মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে ব্যবধান রচনার পরিকল্পনায় তা প্রয়োজন।

২. কায়রো কার্যালয় এসব মোটা সীমান্তরেখায় আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না। তার ধারণা লন্ডন প্যারিসকে তার প্রাপ্যের চেয়েও বেশি দিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া প্যারিস ব্রিটেনের মতলবকে সন্দেহের চোখে দেখত। এজন্যই সে কায়রোতে ফরাসী বিষয়ে আলোচনার জন্য একজন স্থায়ী বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে রেখেছে। তার নাম 'জর্জ বেকো'। এ জর্জ বেকো এসেই কায়রোতে এক বড় যোগাযোগ অফিস খুলে বসলেন। এখান থেকে তিনি শাম থেকে আগত বহু শরণার্থীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে লাগলেন। এদের মধ্যে অনেক খৃস্টান ব্যক্তিত্বও রয়েছে যারা উসমানীয় নির্যাতন থেকে পালিয়ে এসে সে সময় কায়রোতেই বসবাস করছিলেন। এছাড়াও তিনি তাদের কিছু নেতৃত্বের সাথে শলাপরামর্শ করে উসমানী কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পর উত্তর সিরিয়ায় ভবিষ্যৎ শাসনের নীলনক্সা প্রণয়ন করছিলেন।

৩. কায়রো কার্যালয় কার্যত তার অধিকার ও কর্তৃত্ব আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। এই সময় প্রথম বিবেচনায় তার সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল কিভাবে আরবের অভ্যন্তরে যোগাযোগ রাখা যায়। যদিও এ এলাকার ভাগ্য ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে লন্ডন ও প্যারিসের মধ্যকার সমঝোতা সম্পর্কে সে অবহিত ছিল।

"আযীয মিসরীর প্রকল্পটি ইতোমধ্যেই স্থগিত হয়ে গেছে। কিন্তু এর বিকল্পগুলো নিজস্ব প্রক্রিয়াতেই তার পথ খুঁজে নিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প ছিল এই যে, তুর্কিস্তান যেহেতু তার প্রাচ্য মালিকানাভুক্ত অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব জোরদার করার জন্য দ্রুত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, সে দেখল যে আরবের শেখ ও গোত্রপতিগণ— যাদের আনুগত্যের ব্যাপারে সংশয়ের দোলাচল ছিল— তারা অনেক

দূরে সরে গেছে। এদের মধ্যে ছিল মক্কার গভর্নর শরীফ হোসেইন বিন উন। তিনি ছিলেন পুতুল সরকার। কারণ যে শরীফ তুর্কিস্তানের প্রতি মনে মনে ঘৃণা পোষণ করতো আবার ভয় করতো, পাছে নিছক স্থানীয় কিছু কারণ দেখিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করে বসে কিনা— তিনিই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আমীর আবদুল্লাহকে মিসরে ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য গোপনে পাঠাচ্ছেন। যাতে মক্কার গভর্নরের প্রতি তুর্কিস্তানের যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের মোকাবিলায় ভারসাম্যমূলক সমর্থন লাভ করা যায়। আর এটা আরবের অভ্যন্তর ভাগের যে সব এলাকার ব্যাপারে প্যারিস-লন্ডন দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা হয়নি তার গুরুত্বের ব্যাপারে ব্রিটিশ পরিকল্পনার সাথে কোন না কোনভাবে মিলে যায়। তবে উপকূলের কথা আলাদা। সে সম্পর্কে চুক্তি হয়ে গেছে।

প্রথম দিকে কায়রো কার্যালয় আসীর-এর গভর্নর শরীফ ইদ্রিসী-এর সাথে যোগাযোগ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ভারত সরকার এবারও তার পথ আগলে দাঁড়াল। কারণ আসীর হচ্ছে এডেনের সাথে লাগোয়া প্রদেশ। ইতোমধ্যেই ভারত সরকারের বাহিনী এডেন দখল করে নিয়েছে।

৪. একই সময়ে মিসরে ইসলামী চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষক আরব জাতীয়তাবাদীরা আপোসহীন পত্রিকা 'আল-মানার'-এর সম্পাদক ইমাম মুহাম্মদ আবদুহুর শিষ্য শেখ রশীদ রেদার নেতৃত্বে কায়রো কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। তাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল খেলাফতকে টিকিয়ে রেখে এটাকে তুর্কি খলিফাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে মুসলিম খলিফাদের কাছে হস্তান্তর। তুর্কিস্তানের পরাজয়ের পর খেলাফতের ভাগ্য তখন বেশ বোঝা যাচ্ছিল। জনগণের সাধারণ অনুভূতি ছিল যে, খেলাফতের ভবিষ্যত সম্ভবত ব্যাপকভিত্তিক আরবি ইসলামী প্রজাতন্ত্র। তখন ব্রিটিশ সরকারের কাজ ছিল এই সকল আবেগ অনুভূতিকে এমনভাবে মোকাবিলা করা যাতে তাদের মন শান্ত থাকে এবং আরব বিশ্ব ও এর বাইরের মুসলমানরা আশ্বস্ত থাকে।

৫. এ সবকিছুর পরপরই ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড গ্রে মিসরে ব্রিটিশ কমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমাহনের নিকট একটি তারবার্তা পাঠান। এর হুবহু ভাষ্য নিচে দেয়া হলো ঃ

"আপনি যদি সমীচীন মনে করেন তাহলে এ ঘোষণা দেয়ার দায়িত্ব দেয়া গেল যে, মহামান্য সম্রাটের সরকার বিজয়ের পর তাঁর শর্তাদির মধ্যে এটাও শামিল করার কথা পুনর্বার জানিয়ে দিচ্ছেন যে, একটি স্বাধীন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে যার ওপর খেলাফতের দায়িত্ব বর্তাবে। ঐ ইসলামী রাষ্ট্রের কোন সীমানা সম্পর্কে আপনার এখনই কিছু বলার দরকার নেই। বরং আপনি কূটনীতির ভাষায় বলবেন যে, খেলাফতের ব্যাপারে কোন বহির্শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি মুসলমানগণ কোন আরবি খেলাফত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাঁর প্রতি মহামান্য রাজার পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদা পাবে।"

কায়রোয় এসব রেখা পরস্পর মিলিত হতে শুরু করল যখন এখানে আমীর আব্দুল্লাহ এসে তাঁর পিতা মক্কার গভর্নর শরীফ হোসেইন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি— কায়রো কেন্দ্রের কমিশনার ভবনের মধ্যে যোগাযোগের প্রথম চ্যানেল খুললেন। এতে মক্কার হাশেমীয়দের দিকে (অর্থাৎ শরীফ হোসেইন ও তাঁর পুত্রগণ বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ও ফয়সলের দিকে) যাত্রা শুরু হলো; যাতে ইসলামী খেলাফতের প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করা যায়। কায়রো কার্যালয়ের সাথে পরবর্তী যোগাযোগে শরীফ হোসেইন মুসলমানদের খেলাফত স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য ভাবী ইসলামিক আরব রাষ্ট্রের একটি মানচিত্র পেশ করলেন। কায়রো কার্যালয় তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ্য করল যে, শরীফ হোসেইনের পেশ করা মানচিত্রটি সেই চিত্রের সাথে মিলে যাচ্ছে যার কথা আযীয মিসরী ও শেখ রশীদ রেদা প্রমুখ নেতা বলতেন। যদিও প্রথমজন করতেন জাতীয়তাবাদী গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব আর দ্বিতীয়জন করছেন ইসলামী পক্ষের। এ সময় স্যার হেনেরি ম্যাকমোহন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড গ্রে লিখছেন ঃ

আরব বিষয়ক আমাদের সিনিয়র বিশেষজ্ঞ রোনাল্ড স্টোরস (নিকটপ্রাচ্য সম্পর্কে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও Orientations শীর্ষক প্রখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা)-এর মত হচ্ছে— শেখ রশীদ রেদা পেশকৃত চিন্তা-ভাবনার সাথে শরীফ হোসেইনের রূপরেখার সুস্পষ্ট মিল রয়েছে। বিশেষ করে প্রস্তাবিত স্বাধীন ইসলামিক আরব রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে। এতে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শেখ মক্কার শরীফের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। আর এসব রূপরেখা আযীয বেগের কথিত রূপরেখার চেয়ে বেশি দূরে নয়। বোঝা যায়, সকলের মধ্যে কোন না কোন প্রকারে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

শরীফ হোসেইন কায়রোতে পথম যে মানচিত্রটি পাঠিয়েছিলেন স্বভাবতই তা লন্ডন ও প্যারিসের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তির সাথে সঙ্গতিশীল ছিল না। কারণ ওটাতে মিসর ও সিরিয়ার মাঝখানটায় সেই (Horizontal) ড্যাসটি ছিল না। অনুরূপভাবে ওটায় আরব বিশ্বের উপকূল ও অভ্যন্তরভাগের মধ্যখানে সেই লম্বালম্বি ব্যবচ্ছেদগুলো ছিল অনুপস্থিত। শরীফ হোসেইনের মানচিত্রটি ছিল ফিলিস্তিনসহ বৃহত্তর সিরিয়া ও ইরাক এবং আরব উপদ্বীপ নিয়ে। তাছাড়া এ মানচিত্রটি মিসরকে শামিল করেনি। কারণ মিসরের অবস্থা ছিল আরব বিশ্বের বাকি অংশ থেকে যথেষ্ট ভিন্নতর একটি বিশেষ অবস্থা। এর রাজপরিবার— অর্থাৎ মুহাম্মদ আলীর পরিবার ছিল এ অঞ্চলে সে সময়কার গোত্রীয় শাসক পরিবারগুলোর মধ্যে অনন্য বৈশিষ্টমণ্ডিত।

যখন পরিকল্পনা আর মানচিত্রগুলো ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তখনই এবং যতটুকু ছড়িয়েছে তাতে বহু পক্ষ এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগল। সর্বপ্রথম যে উদ্বিগ্ন

হলো সে ছিল ভারত সরকার, যে কখনই একটি স্বতন্ত্র ইসলামিক আরবি সরকার চায় না—চাই তা ভারত উপমহাদেরশের পাশেই—ব্রিটিশপন্থীই হোক না কেন। কায়রোতে আরব বিশ্ব ও খেলাফতের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আলোচনা চলছে ভারত সরকার তার বিরোধিতা করার কারণ দেখাচ্ছে এই যে, তার বন্ধু নজদের শাসনকর্তা ইবনে সউদ তার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছেন। তিনি কোন অবস্থাতেই কস্মিনকালেও মুসলমানদের খলিফা হিসাবে শরীফ হোসেইনের বায়'আত গ্রহণ করবেন না বা তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করবেন না। একইভাবে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন আরব অঞ্চল যেমন ইয়ামেন ও আসীর-এর সুলতান ও শেখগণও তাঁকে কখনও গ্রহণ করবেন না।

ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী গ্রে এই তারবার্তার নিচে একটি মন্তব্য লিখলেন ঃ

ভারতে রাজার প্রতিনিধিকে কে বলেছে যে আমরা একটি স্বতন্ত্র একক আরব রাষ্ট্র চাই ? এই মন্তব্যটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর দ্বিতীয় আপত্তিটি ছিল প্যারিসের পক্ষ থেকে। কারণ প্যারিস উপলব্ধি করল যে ব্রিটেন তার সাথে কোন পরামর্শ না করেই আরব প্রাচ্যে বিভিন্ন যোগাযোগ, শলা-পরামর্শ আর বিন্যাস প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময় ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লাইম্যান শ' তাঁর ব্রিটিশ প্রতিপক্ষের নিকট দুটি বৃহৎ মিত্রের মধ্যে চুক্তি করার আহ্বান জানালেন। যাতে এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। পাছে চলমান যুদ্ধে কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য লন্ডন এ ডাকে সাড়া দিল। এবং ব্রিটিশ-ফরাসী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ কমিটি প্যারিসে বসে দুটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে উসমানী খেলাফতের উত্তরাধিকার 'ইনসাফমত' ভাগাভাগি করে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের নতুন মানচিত্র অঙ্কন করবেন। এই কমিটিতে ফ্রান্স তার লোক হিসাবে কায়রোর কনস্যুলার জেনারেল জর্জ বেকোকে মনোনীত করল। পক্ষান্তরে ব্রিটেন মনোনীত করল স্যার মার্ক সায়েক্সকে। ইনিই বেকো-এর প্রতিপক্ষ হিসাবে ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

এ সময়ও মধ্যপ্রাচ্যের মঞ্চে মার্ক সায়েক্স আবির্ভূত হয়ে তার ভূমিকা রাখার বিষয়টি ছিল কিছুটা বুদবুদের মতো। মার্ক সায়েক্স ইহুদী ছিলেন না। তিনি একজন ক্যাথলিক। ক্যাথলিক অর্থেই তিনি জায়নিস্ট ছিলেন। তবে বলা যায় ইহুদী প্রভাব ছিল তার ওপর প্রবল। কারণ তার মাতা হেনরিতা সায়েক্স বহু বছর ধরে প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাজনীতিক বেনজামিন ডিজরাঈলীর প্রেমিকা ছিলেন। এই ডিজরাঈলীই ছিলেন প্রথম ও শেষ ইহুদী, যিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। (লন্ডনে জেন রাইড লে' প্রকাশিত তার জীবনী গ্রন্থ- ১৯৯৫ দ্র.) হেনরিতা-এর পুত্র মার্ক ছিল ডিজরাঈলীর মনোযোগের পাত্র। আর এই ডিজরাঈলী প্রধানমন্ত্রীত্বে বা তার বাইরে সবসময়ই যথেষ্ট প্রভাবশালী রাজনীতিক ছিলেন। জায়নিজম বা ইহুদীবাদের ধারণার সাথে তার

ছিল খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তিনি ফিলিস্তিনে ইহুদী বসতি স্থাপনের ব্যাপারে কৃতসংকল্প ও সক্রিয় ছিলেন। কাজেই এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক যে, ডিজরাঈলীর বহু চিন্তাধারা মার্ক সায়েক্সের চিন্তা-চেতনায় পাকাপোক্ত হয়ে গেছে তার শৈশব আর যৌবন থেকেই।

যুদ্ধের আগে মার্ক সায়েক্স ব্রিটিশ কমন্স সভার সদস্য হন এবং বাস্তবিকই ইহুদী ও ইহুদীবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাদের অনেকের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ছিল। তাদের প্রথম ব্যক্তি হলেন– লর্ড রোচিল্ড। খোদ মার্ক সায়েক্সের বর্ণনা মতে, তিনি যুদ্ধ লাগার সাথে সাথে তার সৈন্যদলের সাথে যোগ দেন এবং ফ্রান্সে যুদ্ধের বাঙ্কারে বাঙ্কারে চলে গেলেন। ১৯১৫ সালের বসন্তের একদিনে (যুদ্ধ লাগার কয়েক মাস পরেই) মিসরে সাবেক ব্রিটিশ বাহিনীর অধিনায়ক ও তখনকার ব্রিটিশ বাহিনীর ইন্‌সপেক্টর জেনারেল লর্ড কিসিঞ্জার ফ্রান্সে যুদ্ধের ফ্রন্টগুলো আকস্মিক পরিদর্শনে আসতেন। এভাবে একদিন অগ্রবর্তী কমান্ডের কেন্দ্রস্থলে এলেন। সহসা তাঁর চোখ পড়ল মার্ক সায়েক্সের ওপর। মার্ক সায়েক্স তাঁর লিখিত ডায়রীতে লেখেন— যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনে তাঁকে দেখে লর্ড কিসিঞ্জার বিস্মিত হয়ে যান এবং তাঁর বিখ্যাত সেই অন্তর্ভেদী একটি দৃষ্টি দেন, তারপর কড়াভাবে বললেন— "সায়েক্স! তুমি এখানে কি করছ ? সায়েক্স কিসিঞ্জারকে উত্তর দিল— স্যার, আমার দায়িত্ব পালন করছি।" সাথে সাথেই কিসিঞ্জার তাকে বললেন—"এ যুদ্ধে তোমার স্থান এটা নয়, তোমার স্থান হচ্ছে প্রাচ্য অঞ্চল, সেখানে যাও। কিসিঞ্জার তাঁর নির্দেশকে আরও স্পষ্ট করে বললেন— আজ রাতেই তোমার ব্যাটালিয়নকে তোমার ডেপুটির কাছে হস্তান্তর করে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হও। সেখানে গিয়ে দেখবে কর্তব্য কাজ সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

মার্ক সায়েক্স লন্ডনে পৌছেই বুঝতে পারলেন যে, এখন তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে ফ্রান্সের সাথে সমন্বয় করে আরব প্রাচ্যের মানচিত্র অঙ্কন করা। এ ব্যাপারে উভয় শক্তির মধ্যে সম্পাদিত ভাগ-বাটোয়ারার চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সায়েক্স লন্ডন থেকে কায়রো চলে গেলেন। সেখান থেকে প্যারিসে ফিরে এলেন জর্জ বেকোর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। কারণ তিনিই তখন কায়রোতে ফরাসী কনস্যুলার জেনারেল। তাঁর সাথে আলোচনার পর উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি হলো। এটাই পরে 'সায়েক্স–বেকো' চুক্তি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করল।

তাঁরা দু'জনে যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তা রাশিয়ায় 'রুমানভ' বংশ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর 'সান বেত্‌স বার্জ' অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে অন্যতম গোপন তথ্য হিসাবেই গোপন ছিল। সেখানকার বলশেভিক রাষ্ট্র তার প্রামাণ্য দলিলপত্র ও মানচিত্রসমূহ প্রকাশ করে দেয়ার পর এটি আরব বিশ্বকে প্রবলভাবে নাড়া

দিল। এই ঝাঁকুনিতে যিনি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তিনি হচ্ছেন কায়রোর ব্রিটিশ কমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমাহন। এছাড়া কায়রো কার্যালয়ের সিক্রেট সার্ভিস বিভাগও বড়ই নাজুক পরিস্থিতির শিকার হলো। তখন এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিলেন গিলবার্ট ক্লাইটন। কারণ ওই সকল দলিল-প্রমাণে যা ছিল তার সাথে এমন অনেক বিষয়ে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য ছিল যা তখন শরীফ হোসেইন ও তাঁর দুই পুত্র বিশেষ করে আবদুল্লাহ ও ফয়সলের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আলোচনা চলছিল। বস্তুত সকল আরব পক্ষই অসচেতনভাবে ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিল। কারণ 'সায়েক্স-বেকো মানচিত্র' যে আসলে উপকূল ও অভ্যন্তরকে আলাদাভাবে ভাগ করে দিল, এ বিষয়টি না শরীফ হোসেইন বুঝতে পেরেছিলেন, না স্বতন্ত্র আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বা ইসলামী আরব খেলাফতের সমর্থক আরব জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থীরা কেউ বুঝতে পেরেছিলেন। কেউ বুঝতে পারেননি। এছাড়া এ মানচিত্রটি দৃঢ়ভাবে ফ্রান্সকে সিরিয়া অঞ্চল দিয়ে দিয়েছিল, যা শরীফ হোসেইন যেমন বিরোধিতা করছিলেন, তেমনি প্রতিজন আরব বিপ্লবীই এর বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়টিকে কায়রোস্থ ব্রিটিশ কেন্দ্রটিও অনুমোদন করছিল না। বিশেষ করে এর প্রধান কর্তাব্যক্তি— মিসরে ব্রিটিশ কমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমাহন। অনুরূপভাবে ক্লাইটনের অধীন সিক্রেট সার্ভিস (কায়রো কার্যালয়)ও এর ঘোর বিরোধী ছিল। মিসরে ব্রিটিশ বাহিনীর জেনারেল কমান্ডারও তাদের পক্ষে ছিলেন। এঁদের সবার অভিমত হলো— সিরিয়াতে ফ্রান্সের অবস্থানের কারণে তাঁরা সুয়েজ খালের এত বেশি নিকটে চলে আসবে যা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। এতে সে মিসরে ব্রিটিশ সরকারের সামনে সমস্যার জট পাকাতে সুবিধা পেয়ে যাবে। জেনে রাখা ভাল, স্যার হেনরি ম্যাকমাহনের ভাষায়— আজকের বন্ধু কাল তো শত্রুও হয়ে যেতে পারে। পরিস্থিতি বদলে গেলে মিত্ররা বিপরীত আচরণ করাবে তাও বিচিত্র নয়। মিসরে ব্রিটিশ কমিশনার ও কায়রো কার্যালয় এই চুক্তি সম্পর্কে খামোশ থাকার কারণ হচ্ছে তাদের কাছে এই চুক্তির ধারা (Text) ছিল গোপন রহস্য—যদিও তারা সাম্রাজ্যের দায়িত্বে ছিলেন। তাছাড়া শরীফ হোসেইন ও আরব জাতীযতাবাদ ও ইসলামী পক্ষগুলো সবাই এই চুক্তিকে তাদের সাথে খেয়ানত মনে করবে। এ সমস্যাটি সত্যিই বিব্রতকর। কারণ এটা ভয়াবহতা আরও বহুগুণে বাড়িয়েও দিতে পারে।

আশ্চর্য হলেও সত্য যে, কায়রোর ব্রিটিশ কমিশনার এই মর্মে শরীফ হোসেইনকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা পেয়েছেন যে, ধারণাকৃত মানচিত্রটি সম্পর্কে যে কানাঘুষা চলছে তা এখন প্রাচ্যকে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে ভাগাভাগি করার জন্য চুক্তিতে পরিণত হয়েছে তা নিছক মিথ্যা প্রচারণা মাত্র। এটা রাশিয়ায় নাস্তিক বলশেভিকরা কেবল 'আরব-ব্রিটিশ' বন্ধুত্ব নষ্ট করার জন্য প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

শরীফ হোসেইনকে কখনও কখনও সন্দেহ এসে দোলা দিয়ে গেলেও তিনি ব্রিটিশ সরকারের কথা বিশ্বাস করতে চাইতেন।

তিনি তখনও সে সব 'জেন্টলম্যান কমিটম্যান্ট'কে বিশ্বাস করতেন যা যুদ্ধকালীন বড় বড় শক্তি বন্ধুদের সাথে নিজেরাই ভঙ্গ করত। অথবা হতে পারে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা এতদূরই ছিল যা তিনি নিরীহ সহজ সরল গোত্রগুলো পরিচালনায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। আর যে সব জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী আরব ব্যক্তিত্ব তাঁকে তাঁদের পতাকা মনে করে তার নিচে থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তাঁর চারধারে একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের বিপর্যয় ছিল ব্যাপক। এ সময় আরেকটি বিরল ঘটনা এই বিপর্যয়কে আরও বহুগণে বৃদ্ধি করে দিল। সেটা হচ্ছে যখন জেনারেল লেনবের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিন সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক তখনই তুর্কিরা বৈরুতে ফরাসী কনস্যুলেট ভবন দখল করে নিল। এখানে তারা শরীফ হোসেইনের সাথে 'আরব বিপ্লব' আন্দোলনে সহযোগিতাকারী সিরীয় নেতাদের নামের পূর্ণ তালিকাটি পেয়ে গেল। অবিলম্বে তারা একটি সামরিক আদালত গঠন করে ঐ সব নেতাদের মধ্য হতে চৌদ্দ জনের মৃত্যু দণ্ডাদেশ জারি করল। এ আদেশ জারির কয়েকদিন পরই তা বাস্তবায়ন হতে লাগল। নতুন আরব খেলাফতের সাহায্যকারী বহু সিরীয় নেতা এই ফাঁসির দড়িতে ঝুলল। এতে এ ধরনের আরও বহু দণ্ডাদেশের ফলে বিপ্লবীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল এবং সামরিক অফিসার, ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের এই জাতীয়তাবাদী ধারার সাথে শরীফ হোসেইন ও তাঁর পুত্রদের গোত্রীয় নেতৃত্বের মধ্যকার সম্পর্কের টানাপড়েন দেখা দিল। আরব বিপ্লবীগণ এবং তাঁদের সিরীয় আস্তানাগুলোতে একটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তুর্কিরা সিরীয় নেতাদের নামের এই তালিকাটি অকস্মিকভাবে পেয়ে যায়নি বরং এ ছিল ফ্রান্সেরই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র যাতে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী শক্তি যারা সিরিয়ার ভাগাভাগির বিরোধিতা করছে এবং অখণ্ড আরব রাষ্ট্র দাবি করছে, তারা শেষ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে কায়রোর ব্রিটিশ অফিসটিও এইসব সন্দেহে শামিল ছিল। কিন্তু সে তা সত্ত্বেও শরীফ হোসেইনের সাথে তার যোগাযোগ পুরা করল, যেন এদিকে কোন কিছুই হয়নি।

॥ ৪ ॥

শরীফ হোসেইন

"সীমান্ত নিয়ে আলোচনার সময় এখনও আসেনি। এটা এখন সময়ের অপচয় মাত্র।"

—মিসরে ব্রিটিশ কমিশনার ম্যাকমাহন মক্কার শরীফের কাছে লেখা এক পত্রে

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, উপনিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমর বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ভারত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্রিটিশ প্রামাণ্য দলিল ও কাগজপত্রাদির যে কোন পাঠকই অনায়াসে উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন যে, ব্রিটিশ রাজনীতির নিয়ত বা পরিকল্পনায় এমন কোন লক্ষণই ছিল না যে, ঐসব অঙ্গীকার তারা আদৌ পূরণ করবে, যেগুলো ঠিকই পরবর্তীতে যুদ্ধের সময় নিজেই ভঙ্গ করেছিল। এ ক্ষেত্রে সব অঙ্গীকারই সমান ছিল তার কাছে। চাই তা 'সায়েক্স-বেকো' চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্সের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি হোক বা সে সময় যে সব অঙ্গীকার আরব বিপ্লবের সাথে করেছিল সেসব হোক। চাই শরীফ হোসেইন ও তার পুত্রদের সাথে হোক বা আযীয মিসরী ও রশীদ রেদা প্রমুখের সাথে হোক।

এর প্রমাণ হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে কারণে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তা হচ্ছে সমর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যবিবরণী— যেখানে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের সর্বোচ্চ কৌশলগুলো আলোচিত হয়েছিল। প্রধানত এইসব আলোচনার ভিত্তি ছিল সমরমন্ত্রী লর্ড কিচনার উপস্থাপিত প্রতিবেদন। ইনি একই সময়ে মিসরে সুদীর্ঘ সময় ধরে চাকরির সুবাদে প্রাচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

ব্রিটিশ সমর পরিষদের গোপন দলিলসমূহ (যেসব প্রামাণ্য কাগজপত্র মন্ত্রিসভার ১/২৭ নং বৈঠকের কার্যবিবরণী থেকে শুরু করে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের তারবার্তা নং ম. স. ৬৩৫৪৯ পর্যন্ত) যা যুদ্ধের বছরগুলোতে জমা হয়ে গোটা একটি আলমিরা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এগুলোর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠা। এ প্রেক্ষাপটেই ব্রিটেনের আসল পরিকল্পনা আর ইচ্ছার স্বরূপ নিম্নভাবে তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

১. ব্রিটেনকে অবশ্যই সিরিয়া উপকূলে ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে তুর্কি সীমান্তবর্তী আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত সক্রিয় আধিপত্য রক্ষা করে যেতে হবে। কারণ উত্তর আফ্রিকার মিসরীয় উপকূলে আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে পূর্ণ করার জন্য তা অনিবার্য প্রয়োজন। ব্রিটেন বড়জোর এতটুকু ছাড় দিতে পরে যে, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে

সিরিয়ার উত্তর উপকূলের একটি অংশ ফ্রান্সের জন্য রেখে দিতে পারে। তাছাড়া সিরিয়ার পুরো উপকূলটি দখল করলে ফ্রান্সের সাথে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আবার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্থান ব্রিটিশ কর্তৃত্বের আবেদনে সাড়া দিতে পারে। সমর পরিষদের আলোচনায় যে চিন্তা-ভাবনাটি বের হয়ে এসেছিল তা হচ্ছে— উপকূলীয় অঞ্চল বিভিন্ন জাতীয়তা আর নানান ধর্মের এক 'মোজাইক' যেন। এই পয়েন্টে লর্ড কিচনার এই উপকূলীয় মালার দানাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছেন— মুসলমানরা রয়েছে সেনাই-এ, ইহুদীরা ফিলিস্তিনের দক্ষিণ উপকূলে, খৃস্টানরা রয়েছে সিরীয় উপকূলের মধ্যভাগে আর কিছু অ-সুন্নী আরব গোত্র রয়েছে সিরিয়ার উত্তর উপকূলে। এছাড়া এই পাশাপাশি অথচ পরস্পর বৈরি মনোভাবের এই মোজাইক কোন না কোন প্রকারে ব্রিটেনের সাথে নিজের স্বার্থের সন্ধান পেয়ে যাবে। এতে দ্বৈতভাবে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে ঃ উপকূলীয় মোজাইকের উপর অভ্যন্তরভাগের চাপ কিছুটা হালকা হবে, একই সময়ে ব্রিটেনের স্বার্থের প্রশ্নে প্রয়োজনে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে অভ্যন্তরভাগে চাপ প্রয়োগেরও কিছু খিড়কি-দরজা খুলে দেবে।

২. প্রাচ্যের সকল ধর্মের পবিত্র স্থানগুলো ব্রিটেনের ছত্রচ্ছায়ায় থাকতে হবে। খোদ কিচনারের জবানিতে যে ভাষা পাওয়া যায়— যা তিনি সমর মন্ত্রণালয়ের আলোচনাকালে করেছিলেন তা ছিল এ রকম ঃ মক্কা ও মদীনায় মুহাম্মদীদের (সভার কার্যবিবরণীতে 'Mohametans' লেখা হয়েছিল) পবিত্র ভূমিসমূহ ইসলামী রক্ষণশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন থাকতে হবে। এমনি করে ইরাকের কারবালা ও নাজাদও ব্রিটেনের ছত্রচ্ছায়ায় থাকতে হবে। একই নীতি প্রযোজ্য হবে আল্ কুদসের কেয়ামত গির্জা প্রস্তর-গম্বুজ (কুব্বাতুস সাখরা) ও কাঁদানে দেয়ালের বেলায়। এতে করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিশ্ববাসী সকল ধর্মীয় পবিত্রস্থানের সুরক্ষক হিসেবে জানতে পারবে।

৩. ব্রিটেন একটি ইসলামী আরব খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথ করে দেয়ার কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে পারে। তবে তা এ শর্তে যে, যদি এমন একটি 'ইসলামী ঘরাণা' পাওয়া যায় যারা পরবর্তীতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার গ্যারান্টি দিবে, বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে সমর্থন যোগাবে। এটা বোধগম্য ছিল যে, সেই ইসলামী আরব রাষ্ট্রটি আরব জাহানের মরুময় অভ্যন্তরভাগেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী এ অঞ্চলটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য তথা তার প্রতিরক্ষার জন্য সব সময়ই গুরুত্ববহ থাকবে।

৪. ব্রিটেনকে 'দু'নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল' (অর্থাৎ ইরাক)-কেও তার কর্তৃত্বাধীন করতে হবে। কারণ এ অঞ্চল দিয়েই রাশিয়াকে ভারত সাগরে পৌঁছতে বাধা দেয়া সম্ভব। ব্রিটেনকে অবশ্যই তার তত্ত্বাবধানে যোগাযোগের রুটগুলো আরও বিস্তার

করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মোসেল থেকে বসরা পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথ— যাতে সাম্রাজ্যের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। এগুলো ছিল কৌশলগত বিভিন্ন রুট। আর তা বাস্তবায়নের পন্থাগুলো সম্পর্কেও ব্রিটিশ ডকুমেন্টগুলো একটি চিত্র তুলে ধরছে, বিশেষ করে ডকুমেন্ট নম্বর-২৭৬৮/ ৭৮৩-৩৭৯, এটিতে রয়েছে মিসরে ব্রিটিশ কমিশনার স্যার 'হেনরি ম্যাকমোহন' এবং কায়রো কার্যালয়ের প্রধান ব্রিগেডিয়ার গিলবার্ট ক্লাইটনের প্রতি প্রেরিত নির্দেশাবলী। এতে ছিল— "প্রাচ্যে ব্রিটিশ সমর কর্মকাণ্ডে সহায়তার ক্ষেত্রে আরবদের ভূমিকা রাখার সময় সমাগত। আমরা মনে করি এটা ফরাসী সংবেদনশীলতার প্রতি নজর না দিয়েই শুরু করে দেয়া সম্ভব। ফ্রান্স তো চায় আমরা ছোট-বড় সব ব্যাপারেই তাদের সাথে পরামর্শ করি। আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, আরবদের সাথে আমাদের যে বন্ধুত্ব রয়েছে তা ফ্রান্সের নেই। বরং আমাদের কিছুসংখ্যক বন্ধু তো ইস্তাম্বুলের সুলতানের শাসনের চেয়ে ফরাসী শাসনকে বেশি পছন্দ করে।

আমরা ইতিপূর্বের বর্ণনায় আযীয মিসরীর নতুন চিন্তাভাবনার কথা অস্বীকার করেছি। তেমনিভাবে আলোচনা করেছি তাদের চিন্তা-ধারণাকেও। যেমন নূরী আস সাঈদ, সাইয়্যেদ ফারুকী, হাসান খালেদ ও ড. মহবন্দর এবং শেখ রশীদ রেদার চিন্তা-ভাবনা।

আমাদের মনে হয় আযীয মিসরী কিছু শক্ত চিন্তা-ভাবনা লালন করছেন যা ভবিষ্যতে অনেক বেকায়দা সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই তার সাথে খুবই সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদের সহযোগিতা থেকে সটকে পড়তে পারে– এমন সুযোগ তাকে দেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে নূরী আস সাঈদকে কিছুটা ভারসাম্যপূর্ণ মনে হয়। যা তার সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারে আগ্রহ জাগায়। আর শেখ রশীদ রেদার ব্যাপারটা পরবর্তী সময়ের জন্য তুলে রাখা যায়।

উপরোক্ত সকলের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ বাঞ্ছনীয় মনে করি—

১. শেখদের সাথে সহযোগিতা উত্তম প্রমাণিত হয়েছে। কারণ তাদের চাওয়া-পাওয়া খুবই সামান্য ও সীমিত। তারা অন্যদের মতো অসময়ে বিস্তারিত জানার জন্য সময় নষ্ট করে না।

২. আমাদের সাথে যারা যোগাযোগ করছে তাদের সকলের সাথে একই রকম ব্যবহার করা জরুরী নয়। কারণ আরবদের যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে তাদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব যুক্তি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

৩. আমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোন বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করে না বসি। বিশেষ করে, আরবের স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে।

কারণ যুদ্ধের এ পর্যায়ে আমরা নিজেদেরকে সাধারণ কিছু ওয়াদার বেশি অন্য কিছুতে জড়াতে পারি না। বিস্তারিত যুদ্ধের পরেই হবে।

৪. বিপ্লবের কর্মকাণ্ড শুরু হলে আরব ব্যাটালিয়নগুলোকে তাদের নিজ দেশে নিয়োজিত রাখা ঠিক হবে না। কারণ স্বদেশের মাটিতে তাদের আনুগত্যের কোন গ্যারান্টি নেই। এ ক্ষেত্রে দিল্লীর সাথে আরও উত্তম সমন্বয় রাখাই শ্রেয়। কারণ লর্ড হার্ডিঞ্জ কিছু প্রধান প্রধান দায়িত্ব, বিশেষ করে যোগাযোগের প্রাণময় রুটগুলোতে দায়িত্ব পালনে ভারত বাহিনীর মুসলিম শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৫. এখানে লক্ষণীয় যে, এ অঞ্চলের কিছু সুনির্দিষ্ট স্থানে সামরিক অপারেশনে সময় ও শক্তি ব্যয় না করে তা অনায়াসে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আমরা ইরানের তুর্কী বাহিনী প্রধান খলীল বেগকে এক মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং-এর অফার দিয়েছিলাম, যাতে তিনি জেনারেল টাইউনস নেড-এর অধীন 'কৃত'–এ অবরুদ্ধ বিচ্ছিন্ন ব্রিটিশ সৈন্যদের ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেন। এটি একটি 'টেস্ট কেস' —যা অন্যান্য স্থানেও খাটানো যেতে পারে। এই সব নির্দেশনার হুবহু তরজমা— ঐ সময়কার প্রতিটি ব্রিটিশ সিরিজে বিক্ষিপ্ত ইশারা-ইঙ্গিতসহ এমন একটি আচরণ পদ্ধতি ফুটিয়ে তোলে যা দ্ব্যর্থহীনভাবে কিছু সাধারণ নীতিকে ফুটিয়ে তোলে—

* ব্রিটিশ সরকার প্রতিটি অঞ্চলে একা কাজ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। কারণ ব্রিটেন জানে যে, ফ্রান্সের কিছু ঐতিহাসিক কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে যা সে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে। যদিও মেনে নেয়ার মনোভাবই কাম্য। কারণ কখনও সময় এমন আসে যে, তখন অপেক্ষা অথবা চুপ করাই সবচেয়ে নিরাপদ। হয়তো অন্য সময় ব্রিটেন ওই জমীনে তার স্বার্থরক্ষা করে যা ইচ্ছা করতে পারবে। এর পর না হয় ভাবা যাবে কিভাবে সে ফ্রান্সের অনুভূতিকে শান্ত রাখতে পারে বা জর্জ বেকোর মতো তার প্রতিনিধিদের কোলটানা মনোভাবকে বশ করে ফেলতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে তার যুক্তি হলো এই যে, আরবরা ফ্রান্সকে চায় না, তাছাড়া মিত্রদের সাথে ওই আরবদের সহযোগিতা এখন খুবই জরুরী। এ প্রেক্ষিতে এখন ফ্রান্সের কাছে এটাই কাম্য, যেন সে তার মেজাজকে বশে রাখে এবং ব্রিটেনকে স্বাধীনভাবে তার কাজ করতে দেয়। সে তো যা করবে, যুদ্ধের প্রয়োজন এবং বিজয়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করবে।
* ব্রিটিশ সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিভাবে প্রথাগত পক্ষগুলো (সুলতানী সরকার, গোত্রসমূহ ও শেখগণ) আর আরব বিশ্বের নতুন পক্ষগুলো (সামরিক

কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ)-এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়। এ ধরনের বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা সৃষ্টি হবে। তখন ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই হবে তাদের সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক, তাদের আস্পায়ার।

* ব্রিটিশ সরকার এই বিভেদ রচনার মহড়া চালিয়ে যেতে পারে, একদিকে রাজত্ব আর প্রভাব-প্রত্যাশী প্রথাগত আরব শিবিরের অভ্যন্তরে। অপরদিকে মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী নতুন ধারার প্রতিনিধিত্বকারী আরব শিবিরের অভ্যন্তরে। উদ্দেশ্য একটাই— পরিস্থিতির পটপরিবর্তনে আর ঘটনাপ্রবাহের চাপে যেন প্রথাগত বা প্রাচীনপন্থী যেমন হাশেমী ও সউদীদের বিভেদটা আরও গভীর এবং তাদের শত্রুতা যেন আরও পাকাপোক্ত হয়। একই চাপে যেন নয়া শিবিরেও সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি হয় এবং তারা ক্রমেই পরস্পর দূরে সরে গিয়ে একে অন্যের শত্রু হয়ে ওঠে। কারণ এভাবে তারা অচিরেই বিভক্ত হয়ে পড়বে— একদল হবে আযীয মিসরীর মতো শক্ত ধাঁচের, যারা বিস্তারিত পূর্ব অঙ্গীকার আদায় করতে চাইছে, আরেক দল নূরী আস সাঈদের মতো নমনীয় প্রকৃতির, যারা যুদ্ধের পর বিস্তারিত নির্ধারণের আশায় এখনই সহযোগিতার বিষয়টি গ্রহণ করতে চায়।

* ব্রিটিশ সরকার এসব কিছুতে এখন কোন অঙ্গীকার বা গ্যারান্টি দেবে না, যাতে ভবিষ্যতে তার স্বাধীনতা শৃঙ্খলিত হয়ে না যায়। কাজেই যুদ্ধের পর ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কোন লিখিত অঙ্গীকার করবে না। কাজেই কোন একটি পক্ষের মাধ্যমে প্রচারিত কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা সে জন্য দায়ী করার কারও অধিকার থাকবে না। কারণ ঐ সবই হচ্ছে হয় রাজনৈতিক প্রচার প্রপাগাণ্ডা, নয়তো পরিস্থিতির অনিবার্য প্রয়োজন মাত্র। এই সবের বাস্তবতা এবং প্রকৃত মূল্যায়ন হবে কেবল বিজয় অর্জিত হবার পর। যখন আরব বিপ্লবের বাস্তব কাজের পর্যায় শুরু হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসতে লাগল তখন আরব বিশ্বের নতুন ধারা ছিল হেজাজের যুদ্ধময়দানগুলোতে এবং শাম ও ইরাকের বিভিন্ন স্থানে। তারা ছিল তখন শরীফ হোসেইন আর স্যার হেনরি ম্যাকমাহনের মধ্যে পত্রবিনিময় ও যোগাযোগ থেকে অনেক দূরে। একই সময় ইংরেজ তাদের চেয়ে শরীফ হোসেইনের পরিকল্পনার বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল বিপ্লব ও স্বতন্ত্র আরব রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতীয়তাবাদী পক্ষগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে। শরীফ হোসেইনের সাথে ব্রিটেনের অধিকাংশ যোগাযোগ হতো ব্রিটিশ লিয়াজো অফিসের কমান্ডার টমাস এডওয়ার্ড লরেন্সের মাধ্যমে, যাকে কায়রো অফিস থেকে মনোনীত করা

হয়েছিল। কায়রো অফিস ও হেজাজের আরব বিপ্লবের নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য লরেন্স শরীফ হোসেইনের দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র চেয়ে তৃতীয় পুত্র প্রিন্স ফয়সলকে বেশি পছন্দ করলেন। আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা ও বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী আরব বাহিনীর যোগাযোগের সার্কেলের সবচেয়ে ঘনিষ্ট এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান পুত্র ছিল। লরেন্সের মতে, আব্দুল্লাহ বেশি শিক্ষিত ও বুদ্ধিদীপ্ত ছিল বটে, কিন্তু তার ওপর ভরসা করা কঠিন ছিল। আর ফয়সল সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপে বলেছিলেন— "তার সাথে প্রথম সাক্ষাতেই আমি বুঝতে পারলাম যে, যাকে খুঁজতে আমি আরব মরুভূমিতে এসেছি, সেই লোকটিকে পেয়ে গেছি।"

লরেন্স সব সময় ফয়সলকে ফুসলাতো যেন তার যা শক্তি আছে তা নিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব অগ্রসর হয়ে আকাবা এবং সেখান থেকে দামেস্কে, তারপর ইস্কেন্দারুনে পৌঁছে যায়। (ইস্কেন্দারুন হচ্ছে আলেকজান্দ্রেতা, দক্ষিণ তুর্কীস্তানের সমুদ্র বন্দর।) যাতে তুর্কীরা পিছু হটার পথ খুঁজে না পায়।

লরেন্সের ধারণা ছিল, তুর্কি বাহিনীর ওপর ব্রিটিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়বে। ফয়সল বাহিনী পশ্চাতে কাজ করে যাবে যখন সামনের দিকে ব্রিটিশ বাহিনী তুর্কিদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।

পক্ষান্তরে দেখা গেল, প্রিন্স ফয়সলের বাহিনী যখন উত্তরে আকাবা'র দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হলো তখন তার সাথে মিসরীয় গোলন্দাজ বাহিনী যোগ দিল, যাকে কায়রো কার্যালয় আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিল এবং এখন ফসল বাহিনীর সাথে যুক্ত করে দিল।

এহেন পরিস্থিতিতে স্যার হেনরি ম্যাকমোহন মিসরে ব্রিটিশ কমিশনার শরীফ হোসেইন তাঁর নিকট এক পত্রে লিখলেন— "প্রতি— মহামান্য উচ্চ মর্যাদাবান ও উচ্চবংশীয় এবং অভিজাতদের সুযোগ্য বংশধর, গর্বিতজনদের মাথার মুকুট, মোহাম্মাদী বৃক্ষের শাখা, কুরাইশী আহমদী মহিরুহ, সুমহান উচ্চাসনের অধিকারী, সাইয়্যেদের পুত্র সাইয়্যেদ, শরীফের পুত্র শরীফ, রাজকীয় সম্মানের অধিকারী শরীফ হোসেইন, সকলের সাইয়্যেদ, আমীরে মক্কা মুকাররমা— যা জগতসমূহের কেবলা, নিবেদিতপ্রাণ মুমিনদের যাত্রাপথের মূল অভীষ্ট, সকল মানুষের বরকতের উৎসধারা।

সুবাসিত শুভেচ্ছার পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা ও সকল সংশয় বিমুক্ত নির্ভেজাল আন্তরিক তছলিম বাদ আরজ এই যে, আপনার পক্ষ থেকে ইংরেজদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি এবং সম্মানজনক অনুভূতি ও উপলব্ধি প্রকাশের জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। আমরা এটা জেনে আরও আনন্দিত হয়েছি যে, আপনি মান্যবর ও আপনার লোকজন একমত পোষণ করছেন যে, আরবের স্বার্থ ইংরেজেরও স্বার্থ, এর বিপরীতও উভয়ের ক্ষেত্রে সমান। আর এই

সম্পর্কের জন্য আমরা আপনাকে আপনার কাছে পৌঁছা মাননীয় লর্ড কিচনারের বক্তব্যকে আবারও নিশ্চিত করতে চাই.... । সেখানে আমরা আরব দেশসমূহ ও এর জনগণের স্বাধীনতার প্রতি আমাদের আগ্রহকে স্পষ্টভাবে বলেছি এবং আরব খেলাফত ঘোষণা সাথে সাথে তাকে স্বীকৃতিদানের পক্ষেও আমাদের অভিমত ব্যক্ত করেছি।

আমরা এখানে আবারও স্পষ্ট করতে চাই যে, গ্রেট ব্রিটেনের মহামান্য রাজা বরকতময় সেই নববী মহিরূহ থেকে পল্লবিত শাখা থেকে উৎকলিত একজন দৃঢ়চেতা আরবির হাতে খেলাফত ফিরিয়ে দেয়াকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তবে সীমান্ত আর বাউন্ডারির বিষয়টি নিয়ে এখনই আলোচনা করা মনে হয় অর্থহীন; এর সময় এখনও আসেনি। চলমান যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে এ ধরনের বিস্তারিত আলোচনা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।"

শরীফ হোসেইন ছিলেন তাঁর কাজে জলদিবাজ। তিনি সীমান্ত আর বাউন্ডারি আলোচনায় বেশি সময় ব্যয় করলেন না, যেমনটি করেছিল আরব জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী (যেমন, আযীয আল্ মিসরী, রশীদ রেদা প্রমুখ নেতা। যাহোক শরীফ হোসেইন স্যার ম্যাকমাহন–এর জবাব দিয়েছিলেন নিম্নরূপ ঃ

"প্রতি— সম্ভ্রান্ত সুজন মাননীয় রাজ প্রতিনিধি, তাঁর শৌর্য অব্যাহত থাকুক!) বাদ সমাচার। অতিশয় সম্মান ও মর্যাদার হাতে আপনার সর্বশেষ পত্রটি গ্রহণ করলাম। এর বক্তব্য আমাদের আরও বেশি আনন্দ ও স্বস্তি দিয়েছে। কারণ আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমঝোতা ও ঘনিষ্ঠতা অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা তিনি যেন উদ্দেশ্য হাসিলকে সহজ করে দেন এবং প্রচেষ্টাকে সফল করেন। নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যায় আমরা মান্যবরকে চলমান কর্মকাণ্ড ও প্রয়োজনের আয়োজন সম্পর্কে সদয় অবগত করছি। প্রথমত আমি মান্যবরকে জানিয়েছি যে, আমার একজন পুত্রকে শামে পাঠিয়ে দিয়েছি যেন সেখানকার প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে পারে.... দ্বিতীয়ত আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যথেষ্ট বাহিনীসহ মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়েছি যাতে শামে অবস্থানরত তার ভাইকে শক্তি যোগাতে পারে ... ।

এ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজনটি বর্ণনা করতে চাই ঃ প্রথম নিয়োগকৃত বাহিনীর বেতন, ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) পাউন্ড (স্বর্ণমুদ্রা) এবং অনুরূপ (সংখ্যক পাউন্ড) যা বিস্তারিত বলা নিষ্প্রয়োজন। উক্ত অর্থ যথাশীঘ্র সম্ভব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

দ্বিতীয়ত ২০,০০০ বস্তা চাল, ১৫,০০০ বস্তা আটা, ৩,০০০ বস্তা যব, ১৫০ বস্তা কফিদানা ও সমপরিমাণ চিনি ও প্রেরিত বস্তুর প্রত্যেক প্রকারের আলাদা ১০০ কার্টুন সরবরাহ করা প্রয়োজন।......... অর্থ অবিলম্বে পোর্ট সুদানের আমীরের নিকট প্রেরণ করা প্রয়োজন। আমার পক্ষ থেকে অচিরেই একজন কমিশনার সেখানে গিয়ে সাধ্য অনুযায়ী একবার বা দু'বারে সরবরাহ গ্রহণ করবে। লোকটিকে বিশ্বাস করার কোড চিহ্ন হলো ঃ "(T)"

॥ ৫ ॥

লরেন্স

তোমার তরবারিতে নয়, ইংরেজের তরবারিতে।

—আমীর ফয়সলের দামেস্কে প্রবেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে বাদশাহ আবদুল আযীয-এর সভা কবির কবিতা

আধুনিক আরব ইতিহাসের এই বিপজ্জনক বাঁকে আরবরা বিশ্বের সাথে এমন একটি শক্তি হিসাবে আলোচনা বা সংলাপ করতে পারেনি যার নিজ বসবাসের অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কোন ভূমিকা বা মতামত থাকতে পারে। সে সময় এটা খুবই দুঃখজনক ছিল যে, ভবিষ্যৎ নির্মাণে অংশগ্রহণের জন্য জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর যে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি থাকা দরকার ছিল তা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল।

অপরদিকে, শরীফ হোসেইন স্বতন্ত্রভাবে ব্রিটিশ সরকারের সাথে তাঁর ব্যাপারটি সামাল দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি একটি বিশাল ও জটিল সাম্রাজ্যের পরিকল্পনার সাথে কাজ করার মতো বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয় বা যথেষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ছিলেন অনবধান। তবে তিনি এক রকম উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন যে, এমন কি তাঁর সন্তানরাও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাজ করছে। ভিতরে ভিতরে শরীফ হোসেইন তার সাথে যথেষ্ট পরামর্শ ও সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়াই তাঁর পুত্র ফয়সলের এভাবে লরেন্সের সাথে শামে অগ্রসর হওয়াটা পছন্দ করেননি। তার আশঙ্কা হচ্ছিল যে, হয়ত ফয়সল নিজের জন্য সিরিয়াকে চাচ্ছে। একই সময় ফয়সলও প্রায়শ লরেন্স ও অন্যান্য ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের কাছে অনুযোগ করতেন যে, তাঁর পিতা আধুনিক যুগ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন না, কাজেই যুদ্ধোত্তর নয়া দুনিয়ার সাথে তাল মেলাতে তিনি সক্ষম নন।

এদিকে আমীর আবদুল্লাহও পিতার নীতির সাথে তাঁর সঙ্কোচকে গোপন রাখতেন না। তাছাড়া তিনি তাঁকে বাদ দিয়ে ছোট ভাই একা একা ইংরেজের সন্তুষ্টি অর্জন করছে— সে জন্য তাঁর অস্থিরতাকে প্রকাশ করা থেকেও সংযত থাকতেন না।

শামের বিষয়াদি গুছিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত ব্রিটিশ পরিকল্পনা অচিরেই ফিলিস্তিনের ওপর কেন্দ্রীভূত হলো, বিশেষ করে সেখানে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে— যাতে তা ব্রিটিশ স্ট্রাটেজির অনুকূলে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

এদিকে হঠাৎ করেই একই কায়রোতে সেই একই ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল যিনি 'সায়েক্স-বেকো' চুক্তির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইনি সেই স্যার মার্ক সায়েক্স।

এবার আসলেন আরব বিশ্বের বিভক্তি ও বিতরণের পরবর্তী কাজের আঞ্জাম দিতে। তার প্রথমটি হচ্ছে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের প্রতিশ্রুত দেশ সৃষ্টির প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ডকুমেন্ট নং-১৯৬৭৬৪-২৪৭৬/৩৭১ তাং ১২ জুলাই ১৯১৫ খৃঃ বর্ণনা করছে যে, মিসরে ব্রিটিশ জেনারেল কমান্ডার মাক্সওয়েল ফিলিস্তিনের ব্যাপারে স্যার হেনরি ম্যাকমোহনের সাথে আলাপ করেছেন। তিনি দীর্ঘ সময় চিন্তা করে একটি প্রস্তাব করেছেন যে, ফিলিস্তিনকে ব্রিটিশ ছত্রছায়ায় রাখা যেতে পারে। তার গতি হবে মিসরের মতোই। এরপর এর প্রশাসনিক দায়িত্ব মিসরের সুলতানের হাতে ন্যস্ত করা যেতে পারে। কারণ এ পরিস্থিতিতে দৃশ্যত আল্ কুদ্স একজন মুসলিম আমীরের অধীনে থাকা প্রয়োজন। মিসরের তৎকালীন সুলতান ছিলেন হুসেইন কামেল। তাঁকে স্থানীয় সমস্যাবলী এতই ব্যতিব্যস্ত রাখত যে, ধৈর্যের সীমা রাখাই ছিল দায়! একদিকে প্রাচ্যে আরব বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংঘাত, এতে সম্প্রতি মঞ্চে আবির্ভূত হাশেমী আর সউদীদের মধ্যে খেলাফত নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। জেনারেল ম্যাক্সওয়েল এই প্রস্তাবে আল কুদ্সের ওপর একজন (মিসরী) মুসলিম আমীর থাকার বিষয়কে গুরুত্ব দিলেন না। কারণ এটা হচ্ছে একটি ঢাকনা স্বরূপ যা অনায়াসে ব্যবস্থা করা যাবে। যেহেতু প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ভারসাম্য পরিবর্তন করা সম্ভব।

লরেন্স কেবল ফয়সলকে তার বাহিনীর সাথে নিয়ে গিয়ে আকাবার দিকে রওনা হলো, এরপর যাবে দামেস্কে। আমীর আবদুল্লাহ তার পক্ষ থেকে ভূমিকা রাখতে গিয়ে তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেও তাঁর পিছনে পিছনে ছুটল এবং উত্তর দিকে পূর্ব জর্ডানের আম্মান এলাকায় পৌঁছে গেল। সেখানে তিনি ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলেন জেদ্দা বা দামেস্কে কি ঘটে তা দেখার জন্য।

ভারত সরকার কায়রো কেন্দ্রের নীতিকে আদৌ পছন্দ করেনি। তার চোখে এই কেন্দ্রটি আর তার শক্তির উদ্ভব হয়েছে নিছক যুদ্ধ পরিস্থিতির সুবাদে। এটি এখন এমন সব পরকল্পনা আঁটছে যা ভারতের পরিস্থিতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এ সময় স্যার বেরসি কক্স (দিল্লী অফিস প্রধান) ব্রিটিশ হাশেমী সহযোগিতার পরিকল্পনায় তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার সকল অনুপ্রেরণা আর সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছিলেন নাজাদ-এর আমীর আব্দুল আযীয আল সউদকে। চোখের ইশারায় তাকে মুসলমানদের খেলাফতের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। কারণ তিনিই হচ্ছেন মরুবক্ষ থেকে উৎসারিত আদি আরব— যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান বা তুর্কি জীবন পদ্ধতিতে প্রভাবিত হননি— যেমনটি হয়েছেন ঐ সব হাসেমীগণ যাঁরা যৌবনের অধিকাংশ বছর কাটিয়েছেন ইস্তাম্বুলে। যেদিন ফয়সল তাঁর বাহিনী নিয়ে দামেশকের কমান্ডিং সাইট— উপত্যকায় পৌঁছলেন আর ইতোমধ্যে তার সাথে সিরিয়ার সেই সব অবশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশী

আন্দোলনকারী যোগ দিল যারা তাদের স্বপ্নের একটি ভগ্নাংশ অবশিষ্ট থাকতেও প্রত্যাশার মৃদু বাতাসে নিজেদের পাল তুলে দেয়। কারণ নাজাদ-এর সুলতান প্রকাশ্যে হাশেমীদের বিদ্রূপ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তার সভা কবি ফুয়াদ হামযাহ (যিনি পরবর্তীতে তুর্কিস্তানে তাঁর রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন) কবিতা লিখে ফয়সলের দামেস্ক প্রবেশকে প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন। কবিতার প্রথম পঙক্তিটি ছিল— এ রকম ঃ

তোমার নয়, তরবারিটি ছিল ইংরেজি/তাই দামেস্কে ঢোকা ছিল 'ইজি' আর 'ইজি'।

কারণ এ মুহূর্তে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসীদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি হবে না। এ সময় আল্-কুদসে মিসর সুলতানের প্রাদেশিক গভর্নরের পক্ষে সুনির্দিষ্ট আরবি জাতীয়তাবাদী আশা আকাঙ্ক্ষার আবেদনে সাড়া দেয়া যেতে পারে। যাতে শান্ত পরিবেশে ব্যাপকভিত্তিক 'মানুষ বদলের' কাজটি চলমান থাকতে পারে। এতে করে ইউরোপের অস্থায়ী শিবিরগুলোতে অপেক্ষমান হাজারো ইহুদী যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই তাদের প্রতিশ্রুত দেশে নির্বিঘ্নে চলে আসতে পারবে।

১৯০৪ সালের জুলাই মাসে থিওডোর হের্তুজালের মৃত্যুর পর ইহুদীবাদী আন্দোলন একটি কঠিন সময় অতিক্রম করেছিল। হের্তুজালের মৃত্যুর পর নতুন বছর জায়নিস্ট মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে সেখানে একজন নতুন নেতা নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ইহুদী আন্দোলন পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটি অল্প কয়েকজন সদস্যকে মনোনীত করল। এ অস্থায়ী কমিটির অনন্য সদস্য ছিলেন নাহম সকোলভ, হের্তুজালের সহচর, বন্ধু এবং কখনও কখনও সমালোচক। এই কমিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যাটি মোকাবিলা করে তা হচ্ছে ফিলিস্তিনের আরবরা এ সময় তাদের স্বদেশের আনাচে কানাচে প্রতিদিন দেখা দেয়া ইহুদী উপনিবেশের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে গেছে।

এ সকল উপনিবেশের অবস্থানগত গুরুত্ব পরিকল্পনাকে আরও ব্যাপক করে তুলেছিল। কারণ এগুলো ছিল ফিলিস্তিনের সবচেয়ে বেশি উর্বর জমি। যেগুলো বেচাকেনা হতো। তাছাড়া বিভিন্ন পথের সঙ্গমস্থলে হওয়ার কারণে এগুলো ছিল সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণকারী স্থান। এতে বোঝা যায়, প্রয়োজনে সামরিক এ্যাকশনের জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বাস্তবিকই ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত (১ম মহাযুদ্ধকালীন) সময়ে এখানে আরব ইহুদী রক্তাক্ত লড়াই সংঘটিত হয়। এই উত্তপ্ত যুদ্ধগুলোতে শত শত লোক হত ও নিহত হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহটি হয়েছিল 'আন-নাসেরাহ' এলাকায়।

যখন বিষয়টি সশস্ত্র সংঘাতে গড়ালো তখন উসমানী সংসদে আরব সাংসদগণ ১৯১১ সালের মার্চ মাসে একটি বিল উত্থাপন করলেন। এতে দাবি করা হলো—

ফিলিস্তিনে ইহুদীদের দলে দলে অভিবাসন বন্ধ করা হোক। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আগে সতর্কবাণী ও সাবধান বাণী শোনা যেতে লাগল পবিত্র ভূমির প্রতিটি গ্রাম আর শহরে।

'ফিলিস্তিন' পত্রিকা এ সময় তার বিখ্যাত সেই সম্পাদকীয় লিখল, যার প্রথম লাইনটি ছিল ঃ "ইহুদী অভিবাসীরা আমাদের ভূখণ্ডে দলে দলে ঢুকে পড়ছে এবং আমাদের দেশের গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে।"

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম বছরেই ইহুদী সম্মেলনের নির্বাহী কমিটি এবং তার তখনকার দায়িত্বশীল নাহম সকোলভ ঠিক করে ফেলেছেন যে তাঁদের সামনে এখনও দুটি কর্তব্য রয়েছে ঃ

১. প্রাচ্য ও পশ্চিম ইউরোপের বলকান থেকে আসা ইহুদী অভিবাসীদের জন্য অস্থায়ী ক্যাম্প সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করা এবং আপাতত সেখানেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করা যাতে ফিলিস্তিনে সংঘাত কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লে সেখানে তাদের স্থানান্তর করা যায়।
২. নির্বাহী পরিষদকে অবশ্যই যুদ্ধ ও 'সায়েক্স বেকো' চুক্তি অনুসারে নতুনভাবে মানচিত্র অঙ্কনের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। যাতে ফিলিস্তিনে তাদের যা হক আছে বলে মনে করে তা দাবি করতে পারবে এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পর তা অর্জনও করতে সক্ষম হবে।

যুদ্ধের আগে, যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ নীতি জানতো সে কী চায়, ভাবতো, সম্ভাবনাগুলো আলোচনা করত। একবার হয়তো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতো এরপর দৃঢ় প্রত্যয়ী হতো এবং কাজে এগিয়ে যেত। পুরনো ধ্যান-ধারণা তখনও বিরাজমান ছিল। তবে যুদ্ধের অব্যবহিত আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান কিছু সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এতে ছিল— "ইউরোপকে পুরনো বিশ্বের সাথে যে সেতুবন্ধন একসাথে যুক্ত রেখেছে এবং এতদুভয়ের সাথে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে সেই সেতুর ওপর শক্ত ও বিরল মানববন্ধন প্রতিষ্ঠা— সেটাই হবে আমাদের অব্যাহত দিশারী। এ কারণে এই অঞ্চলে বা সুয়েজ ক্যানেলের কাছাকাছি এমন একটি শক্তিকে অনিবার্যভাবে সেখানে বসাতে হবে যা সে সব দেশের বিপক্ষে থাকবে এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের বন্ধু হবে এবং তাদের স্বার্থকে বুঝে রাখবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদেরকে কোন উপায় খুঁজে বের করতেই হবে।

আর এ তো ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

যুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার স্যার হারবার্ট স্যামুয়েলকে অনুরোধ জানান যেন বিজয়ের পর ফিলিস্তিনের বিষয়ে কি হতে পারে তা ভেবে দেখতে। ইহুদী জায়নিস্ট হওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সদস্য হিসেবে হারবার্ট স্যামুয়েল

'ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ' শিরোনামে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ তারিখে একটি নোট লিখলেন। এতে তিনি দু'টি ফলাফলে উপনীত হলেন ঃ

১. ফ্রান্সের সাথে যে কোন চুক্তির অবস্থা যা-ই হোক না কেন, এই সকল চুক্তি থেকে ফিলিস্তিনকে অবশ্যই বের করে আনতে হবে। কারণ সুয়েজ খালের কাছে একটি অবস্থানে কোন বড় ইউরোপীয় রাষ্ট্রের আধিপত্য ঐভাবে বজায় থাকলে সাম্রাজ্যের (ব্রিটেনের) যোগাযোগ রুটগুলো প্রতিনিয়ত হুমকি ও আশঙ্কার সম্মুখীন হবে। সিনাইয়ের মরুবেল্ট তুর্কিদের বিরুদ্ধে একটি কৌশলগত প্রতিবন্ধক হিসেবে তার ভূমিকা রেখে যাচ্ছে বটে, কিন্তু শক্তিশালী একটি ইউরোপীয় দেশের সামরিক হামলার মুখে অবিচল থাকার জন্য তা যথেষ্ট নয়। "আমরা এটাও ধরে নিতে পারি না যে ফ্রান্সের সাথে আমাদের বিরাজমান সুসম্পর্ক সবসময় বজায় থাকবে।"

২. সাফল্যের সুযোগ ও ব্রিটিশ স্বার্থের গ্যারান্টি দিতে পারে এমন সমাধানটি হলো— ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অধীনে বড় একটি ইহুদী ঐক্যপরিষদ প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধের পর অবশ্যই ফিলিস্তিনকে ব্রিটিশ কব্জায় রাখতে হবে। তখন সেখানে ব্রিটিশ প্রশাসন ইহুদী সংস্থাগুলোকে জমি ক্রয়, কলোনী প্রতিষ্ঠা, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য সাহায্য পাবার বেলায় সুযোগ দিতে পারে এবং এরই ছত্রছায়ায় এ দেশে ইহুদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যেতে পারে।" এই সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রটেস্ট্যান্ট জগতে সুদূর বিস্তৃত ও গভীর সহানুভূতি রয়েছে যে, প্রাচীন নবুওতগুলো হিব্রু জাতিকে যে ভূমি দিয়েছিল তা সেখানে প্রত্যাবর্তন করুক।

জায়নিস্ট মহাসম্মেলন ও এর নির্বাহী বা ইউরোপের ইহুদীরা এর বিভিন্ন রাজধানীতে বিশেষ করে লন্ডনে তাদের প্রভাব সত্ত্বেও— এই সুযোগ ছাড়া আর কিছুরই অপেক্ষা করছিল না।

এভাবেই যথাসময়ে মঞ্চে আবির্ভূত হলেন স্যার মার্ক সায়েক্স। তিনি ডিজরাঈলীর কাছে যা কিছু শিখেছেন এবং রোচিল্ড পরিবার যা কিছু প্রভাব অর্জন করেছে— তা নিয়ে এলেন। সাথে রয়েছে সেই গৌরব— ফ্রান্সের সাথে সায়েক্স বেকো চুক্তির সকল কিছু গুছিয়ে এনে শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন।

হের্তুজালের মৃত্যুর পর জায়নিস্ট মহাসম্মেলন সংস্থার নির্বাহী পরিষদের প্রথম দায়িত্বশীল ছিলেন তখন নাহুম সোকোলভ। তিনি লিখছেন— "স্যার মার্ক সায়েক্সকে বিশেষ অভিবাদন জানানো আমার কর্তব্য। কারণ সেই নাজুক ও সংবেদনশীল সময়ে আমাদের কার্যক্রমকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন আমাদের দিশারী আত্মা ও চালিকা শক্তি। সায়েক্সই হচ্ছেন বাস্তবে আমাদের অধিকাংশ কাজের দায়ভার

গ্রহণকারী। তিনিই উপনিবেশ মন্ত্রণালয়, সমর মন্ত্রণালয়, সুপ্রিম কমান্ড ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জায়নিস্ট মহাসম্মেলন সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সাথে সমন্বয় সাধন করতেন।"

.... ইনিই ড. হায়েম ওয়াইজম্যানের সাথে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন— এস. বি. স্কট, প্রধান সম্পাদক, দৈনিক ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান। আমি তাকে ভুলব না, তিনি আমাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ও ব্রিটিশ নৌবহরের কমান্ডার ইন চীফ এডমিরাল জিলিকোর সাক্ষাতে। এখানেই প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে। তখন তিনি বলেছিলেন— "যদি আমরা জাতিগুলোকে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার না দেই— যার মধ্যে ফিলিস্তিনের ইহুদীরাও রয়েছে— তাহলে এ যুদ্ধ নিষ্ফল থেকে যাবে।"

॥ ৬ ॥

বেলফোর

"ভবিষ্যতে সুয়েজ ক্যানেলে আমাদের স্বার্থবিরোধী মিসরীয় প্রচেষ্টা হবে।"

—১৯২১ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে উত্থাপিত একটি নোট

এই ছিল তখনকার পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যার ভেতর বিখ্যাত সেই 'বেলফোর অঙ্গীকার' ঘোষিত হয়েছিল। এই অঙ্গীকারটি ছিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার বেলফোরের পক্ষ থেকে ইংরেজ ইহুদীদের নেতা ও জায়নিস্ট সংস্থার পৃষ্ঠপোষক লর্ড জেম্‌স রোচিল্ডের প্রতি লিখিত। এই অঙ্গীকারের ভাষ্য ছিল সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এ অঙ্গীকারের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২ নভেম্বর ১৯১৭

প্রিয় লর্ড রোচিল্ড

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে মহামান্যের সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে নিম্নবর্ণিত ঘোষণার কথা জানাচ্ছি। এটি ইহুদী ও জায়নিস্ট প্রত্যাশার সাথে সহানুভূতি স্বরূপ মন্ত্রীপরিষদে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়েছে। এর ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

মহামান্যের সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদী জাতির একটি জাতীয় স্বদেশভূমি (National Homeland) সৃষ্টির বিষয়টি সহানুভূতির সাথে দেখছে। এই লক্ষ্য অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণে সে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। স্পষ্টত এই ঘোষণা ফিলিস্তিনে বিদ্যমান ইহুদী সম্প্রদায়গুলোর নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারের বিরুদ্ধে কোন পক্ষপাতিত্ব করছে না। অনুরূপভাবে এটি অন্যান্য দেশে ইহুদীরা যে আইনগত ও রাজনৈতিক অবস্থায় আছে তার ওপর কোন প্রভাব ফেলবে না। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব যদি দয়া করে এই ঘোষণাটি জায়নিস্ট ফেডারেশনকে জানিয়ে দেন।

আপনার বিশ্বস্ত

আর্থার বেলফোর

বেলফোর অঙ্গীকার ইস্যুর সময়কার উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ছিল— যা ব্রিটিশ ডকুমেন্ট অনুসারে ৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭-এর মন্ত্রীপরিষদ বৈঠকের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে। (বেলফোর অঙ্গীকার অনুমোদনকালের আলোচনা এবং এটি ঘোষণার ভূমিকা হিসেবে এ বক্তব্য এসেছে)। কার্যবিবরণীতে রয়েছে—"সমরমন্ত্রী এরিয়েল ডেবরি মন্ত্রী

পরিষদকে অবহিত করেন যে, জায়নিস্ট মহাসম্মেলনের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে সাক্ষাৎ করে এই প্রস্তাব দেন যে, বিশ্বের ইহুদীরা মিত্রপক্ষের হয়ে রক্ত দিয়েও আত্মত্যাগ করতে আগ্রহী। 'ইহুদী কোর' নামে একটি ইহুদী বাহিনী গঠন করে তারা মিত্র শক্তির কাতারে থেকে যুদ্ধ করতে চায়। এভাবে বিজয় নিশ্চিত করতে তাদেরও একটি ভূমিকা রাখতে পারবে।"

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মন্ত্রীপরিষদে যে একটি ভোট এ প্রস্তাবের বিপরীতে যায় তা ছিল লর্ড মোন্টাগোর ভোট। তিনি তখন ভারত বিষয়ক মন্ত্রী। অথচ তিনিও ছিলেন একজন ইহুদী। তার বিরোধিতার প্রেক্ষাপট ছিল এই যে—ব্রিটিশ বাহিনীতে প্রায় চল্লিশ হাজার ইহুদী যুদ্ধ করছে। তাদের প্রতি এবং তাদের সুনামের প্রতি সুবিচার হবে না যদি একটি ব্রিগেডকে আলাদা করে 'ইহুদী কোর' নামে নামকরণ করা হয়।

লর্ড মোন্টাগের বিপক্ষ ভোট কোন কাজে এলো না। মন্ত্রিপরিষদ এই মর্মে একটি বিল অনুমোদন করল যে, "একটি ইহুদী কোর গঠন করা হবে যারা প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের মধ্যে থেকে একটি ইহুদী সামরিক শক্তি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে।"

যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর ভার্সাইয়ে শান্তি সম্মেলনের ডকুমেন্ট প্রস্তুতের সময় জায়নিজম আন্দোলন চাপ সৃষ্টি করে যে, সম্মেলনের সিদ্ধান্তের মধ্যে ফিলিস্তিনের উপর ব্রিটিশ ম্যান্ডেট থাকার বিষয়টির প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিশেষ করে এর সূচনাপর্বে 'বেলফোর অঙ্গীকার' থাকা ছাড়াও বাড়তি নিশ্চয়তাস্বরূপ এটাও থাকতে হবে যে, ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের মূল দায়িত্ব হলো ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য একটি জাতীয় দেশ সৃষ্টি করার জন্য কাজ করা। এ সবই হচ্ছিল মিসরের অনুপস্থিতিতে। তখন মিসর ছিল তার ১৯১৯ সালের বিপ্লবের ব্যতিব্যস্ত। ঐ বিপ্লবের মূল আবেদন ছিল মিসর থেকে ব্রিটিশ বাহিনী বহিষ্কার করে তার স্বাধীনতা ঘোষণা করা। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণী ব্যাপার হলো ফিলিস্তিনের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় মিসরের ওপর প্রধানত প্রভাব ফেলে— চাই এর নেতৃবৃন্দ তার সম্পর্কে অবহিত থাকুক অথবা সে সম্পর্কে কিছুই না জানুক।

ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার লর্ড লেনবে, যাঁর বাহিনী ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করে তুর্কিদের সেখান থেকে বের করে দিয়েছিল— তিনি মিসরের ব্রিটেনের কমিশনার হিসাবে নিযুক্তি পেলেন। সে সময় এ অঞ্চলের সাধারণ কৌশলগত পরিস্থিতি তাঁকে ব্যস্ত রেখেছিল। তিনি বেশ কিছু বৈঠক ডেকে এ সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ গৃহীত হয় যা কর্নেল রিচার্ড 'মাইনরটিজ হ্যাগেন' —মধ্যপ্রাচ্যের অপারেশন ডিরেক্টরের স্বাক্ষরে একটি মেনিউট হিসাবে রূপ লাভ করে। লেনবে ঐ স্মারকপত্রটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের কাছে পাঠিয়ে দেন। স্মারকলিপিটির ভাষ্য ছিল এ রকম ঃ

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

মার্শাল লেনবে আমাকে সিনাইয়ের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আপনার কাছে একটি ডিও লেটার লিখে পাঠাবার অনুরোধ করেন, এটি এমন একটি বিষয়ে যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে; কেবল বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই নয় বরং আগামী বছরগুলোর জন্যও বটে। বিষয়টি আমাকে একটু খোলাসা করে বলতে দিন ঃ আমাদের আরও বেশি কৌশল অবলম্বন করে চলতে হবে। আমরা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য ইহুদী জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির অনুমোদন দেব। কারণ ইতোমধ্যেই আমরা তুর্কি ফাঁস থেকে আরবদের মুক্ত করে ফেলেছি। এদিকে মিসরে আমরা চিরদিন থাকতে পারব না। সে জন্য সম্মেলন ইহুদী জাতীয়তাবাদ ও আরব জাতীয়তাবাদ— এ দু'টি নবজাতকের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকে সম্মেলন অসম্ভব মনে করছে। কারণ একটি থেকে আরেকটি কত দূরে। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাণময়তা আর কর্মতৎপরতা এবং দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মরুচারী জীবিকানির্ভর এবং অলস ও কর্মবিমুখ। অধিকন্তু ইহুদীরা তাদের বিক্ষিপ্ত অবস্থান সত্ত্বেও তাদের বন্ধুত্ব ও জ্ঞান-উপলব্ধির তীক্ষ্ণতায় অনন্য জাতি। তারাই তো ব্রিটেনকে অন্যতম উৎকৃষ্ট এক প্রধানমন্ত্রী— ডিজরাঈলীকে উপহার দিয়েছে। এখন থেকে আরব আর ইহুদীরা তাদের জাতীয়তার পঞ্চাশ বছরের জন্য সারথি হয়ে গেল। ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্রটি আগে হোক পরে হোক সমৃদ্ধ হতে যাচ্ছে এবং সার্বভৌমত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। আমার মনে হয়, মহামান্য রাজার সরকারের কিছু সদস্যও এই পর্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রয়েছেন।

অনুরূপভাবে আরব জাতীয়তাবাদ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হবে যে, মহাসাগর থেকে উপসাগর পর্যন্ত সার্বভৌমত্বের ডাক দেবে তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই দু'টি সার্বভৌমত্বের মধ্যে অনিবার্যভাবে সংঘাত সৃষ্টি হবে। যদি ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের প্রকল্পটি সফলতা লাভে সক্ষম হয় তাহলে জায়নিজম কেবল আরবদের দুর্দশার বিনিময়ে সম্প্রসারিত হবে। সে ক্ষেত্রে আরবরা ইহুদী-ফিলিস্তিনের শক্তি ও শৌর্য খতম করে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। এর অর্থ হচ্ছে— ব্যাপক রক্তপাত। ব্রিটেন এখন মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করছে, আমরা এখন একই সঙ্গে আরব ও ইহুদীদের বন্ধু হতে পারি না। আমি তাই প্রস্তাব করছি, ব্রিটেনের বন্ধুত্ব শুধু ইহুদীদের জন্য নিবেদন করা হোক। কারণ, এ জাতিই ভবিষ্যতে আমাদের পন্থী আন্তরিক এক বন্ধু হবে। তাছাড়া ইহুদীরা আমাদের কাছে বহু কারণে ঋণী। তারা আমাদের প্রতি এ কৃতজ্ঞতা রেখে যাবে। তারা হবে আমাদের সম্পদ। অথচ আরবরা হচ্ছে এর বিপরীত; তাদের প্রতি আমাদের অনেক খেদমত থাকা সত্ত্বেও তারা অচিরেই আমাদের সাথে নেতিবাচক আচরণ করতে শুরু করবে।

ফিলিস্তিন হবে মধ্যপ্রাচ্যের কর্নার স্টোন—শক্ত ভিত। এর একদিকে মুরুভূমি অন্য সীমান্তে সাগর। এর রয়েছে চমৎকার প্রাকৃতিক সমুদ্র বন্দর (হাইফা)। এটা হচ্ছে

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে সবচেয়ে উত্তম সমুদ্র বন্দর। এছাড়া ইহুদীগণ তাদের সামরিক যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে— যখন থেকে রোমকগণ এ এলাকা দখল করেছিল। পক্ষান্তরে আরবরা পরিচিত হয়েছে যুদ্ধে নির্মমতা আর লুটতরাজ, ধ্বংসলীলা ও হত্যাযজ্ঞ প্রীতির জন্য।

এখন আমি মিসরের তুলনায় ফিলিস্তিন সম্পর্কে একটু বলতে চাই। বিমান, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রের উন্নত সংস্করণ আবিষ্কারের ধারায় অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রই যুদ্ধের ফয়সালা করবে। এতে সাহস, শক্তি, নার্ভ আর ধৈর্যও ভূমিকা রাখবে। এ ক্ষেত্রে আমি মিসরকে ইহুদীদের জন্য এক সশস্ত্র শত্রু হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। আর যখন আরব ও ইহুদী— এ দু'টি জাতীয়তাবাদ সার্বভৌমত্বের পর্যায়ে উন্নীত হবে এবং ৪৭ বছর পর আমরা ১৯৬৮ সালে সুয়েজ খাল হারাব তখন ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্যে তার কেন্দ্রগুলোও খোয়াবে। কাজেই এই কেন্দ্রগুলো শক্তিশালী করার জন্য আমি সিনাইকে ফিলিস্তিনের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এই তো মাত্র ১৯০৬ সালের পূর্বে মিসর-তুর্কি সীমান্ত, উত্তরে রেফাহ থেকে সুয়েজ খাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন সিনাই অঞ্চলের পূর্ব দিকদ্বয় এবং দক্ষিণ দিকদ্বয় ছিল উসমানীয় খেলাফতের অধীনে হেজাব-এর একটি অংশ। ১৯০৬ সালের অক্টোবরে রেফাহ থেকে আকাবা উপসাগর অবধি বিস্তৃত রেখা পর্যন্ত মিসরকে সিনাই প্রশাসনের অধিকার দেয়া হয়। তবে তার মালিকানা কিন্তু তুর্কির হাতেই রয়ে গেল। এ এলাকাটি লর্ড লেনবে মিসরী বাহিনীর সাহায্য ছাড়াই ব্রিটিশ বাহিনীর মাধ্যমে দখল করে নেন। যার ফলে এর ভাগ্যও দখলদার ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের অধীন হয়ে গেল...। যদি সিনাইকে আমাদের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে আমরা মিসর ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি ব্যারিকেডের সুবিধা পাব এবং ব্রিটেনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র নিশ্চিত করতে সক্ষম হব। সাথে সাথে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের সাথেও সহজ যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হবে। তাছাড়া চমৎকার হাইফা বন্দরের সাথে ব্যাপক কৌশলগত ঘাটিও আমরা ইহুদীদের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে পারব।

এই সংযুক্তির আরেকটি ভাল দিক হচ্ছে— এতে আমাদের নেভিগেশনের পথ সুয়েজ খাল বন্ধ করার যে কোন মিসরীয় প্রচেষ্টাকে ভণ্ডুল করে দেয়া যাবে। তাছাড়া আমরা ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ খালও খনন করতে পারব। অধিকন্তু সিনাই এলাকাকে সংযুক্ত করলে আমাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ইস্যু মাথাচাড়া দেবে না, কারণ সেখানে বসবাসকারী মরুচারী বেদুঈনদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি নয়।

স্বাক্ষর

ম্যানারটেজ হেগেন

ইহুদীদের প্রশংসা আর আরবদের নিন্দায় বিভিন্ন বিশেষণ আর বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও কর্নেল ম্যানাটেজ হেগেনের নোটটি মনে হয় যেন তা ১৯২১ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত 'নোটের' চেয়ে ভবিষ্যতের নীলনক্সা হিসাবেই বেশি মানানসই।

এখানেও দেখা যায় স্থানীয়দের সাথে কোন সংলাপ বা যোগাযোগের অস্তিত্ব নেই। নয়তো ফিলিস্তিনে, যার সব ক'টা দরজা উন্মুক্ত হওয়ার আর বেশি বাকি নেই। আর নয়তো মিসরে, যার পূর্ব জানালাগুলো খেয়ালী বিধির তালুবন্দী হয়ে হাওয়ায় ঝুলছে।

॥ ৭ ॥

ফয়সাল

"ফিলিস্তিনে ইয়াহুদী অভিবাষণ উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।"

— ফয়সাল ও ওয়াইজম্যান চুক্তি

আরব জাতি তখনও এই বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা মহান আরব বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে, এবং তারা স্বাধীন বিবেচনায় মক্কার শরীফ ও তার পুত্রগণকে এর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নির্বাচন করেছে। এভাবেই সাইক্স্-বেকো চুক্তির পর বেলাফার গোষণাটি সেই সকল লোকের জন্য এক মারমুখি আঘাত হিসাবে এলো। যারা এই ধারণা পোষণ করত যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ওসমানী রাষ্ট্রের পতনের পরই অনিবার্যভাবে এমন একটি নতুন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে যা সমগ্র শাম, ইরাক ও হিজাজ অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

কিন্তু আশায় গুড়েবালি। এবার ভার্সাইকে আমীর ফয়সাল ও হায়েম ওয়াইজম্যানের মধ্যে এক নতুন চুক্তি হলো। এর মূল বিষয় ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. আরব রাষ্ট্র ও ফিলিস্তিন (!) ফিলিস্তিনের সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আন্তরিক সমঝোতা থাকতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে আরব ও ইহুদী এজেন্সী স্ব স্ব দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

২. চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষ আরব রাষ্ট্র ও ফিলিস্তিনের মধ্যে চূড়ান্ত সীমান্ত নির্ধারণ করবে।

৩. ফিলিস্তিন বিষয়ক দাপ্তরিক কাজকর্মের জন্য একটি গঠনতন্ত্র বা বিধিবিধান পণয়ন করতে হবে। যার মূল উদ্দেশ্য থাকবে ২ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখের বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি (বেলফোর প্রতিশ্রুতি) বাস্তবায়ন।

৪. ব্যাপক ভিত্তিতে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের প্রতি আগ্রহ ও প্রণোদনা জাগানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ আবাসন ও নিবিড় কৃষি কার্জের মাধ্যমে অভিবাসীদেরকে দ্রুত পুনর্বাসন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আরব কৃষক ও বর্গাধারীদেরকে তাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫. ধর্মীয় স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন জবরদস্তিমূলক আইন জারি করা যাবে না।

৬. ইসলামী পবিত্র ভূমিসমূহ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৭. জায়নিস্ট বিশ্ব সংস্থা প্রস্তাব করছে যে, একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ফিলিস্তিনে পাঠিয়ে সে দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পারে, এবং তার উৎকর্ষের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা নির্ণয় করে একটি রিপোর্ট পেশ করতে পারে।

জায়নিস্ট সংস্থা অচিরেই উল্লিখিত কমিটিকে আরব রাষ্ট্রের অধীনে রাখবে যাতে তারা আরব রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা যাচাই করতে পারে এবং তার উৎকর্ষ সাধনে সবচেয়ে উত্তম উপায়-উপকরণ সম্পর্কে তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। বিশ্ব ইহুদীবাদী সংস্থা আরব রাষ্ট্রকে সহযোগিতার জন্য তার সকল চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ জন্য তাকে ঐ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সকল উপায়-উপকরণ সরবরাহ করবে।

৮. চুক্তির পক্ষদ্বয় এই মর্মে ঐকমত্যে পৌঁছেছে যে, এই চুক্তির শামিল, সন্ধি সম্মেলনে গৃহীত সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ঐকমত্য, সমঝোতার সাথে কাজ করে যাবে।

৯. দু'টি বিবদমান পক্ষের মধ্যে কোন বিতর্ক সৃষ্টি হলে তার ফয়সালার জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট তা রুজু করতে হবে।

স্বা/- স্বা/—

ফয়সল ওয়াইজম্যান

এই চুক্তির সব ধারাই ছিল গোটা একটি মাইন ফিল্ড। দেখুন, এই চুক্তিতে ওয়াইজম্যান নিজেকে সমান মর্যাদায় ফয়সলের প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একজন আরব রাষ্ট্রের পক্ষে অন্যজন ইহুদী জাতির পক্ষে। 'আরব রাষ্ট্র' সম্পর্কিত বক্তব্যে এটিকে একটি বস্তু এবং ফিলিস্তিনকে আরেকটি আলাদা জিনিস হিসাবে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চূড়ান্ত সীমান্তও থাকবে যা উভয়পক্ষ সমর্থিত একটি কমিটি নির্ধারণ করবে। এ ছাড়া বেলফোর অঙ্গীকারের পতি সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ইহুদীদের অভিবাসনের হকও স্বীকার করা হয়েছে। অধিকন্তু কোন উদ্ভূত বিতর্কে ব্রিটিশ সরকারকে বিচারক মানা হয়েছে। ইত্যাদি.... ইত্যাদি।

তবে বোঝা যায়, ফয়সলের কিছু আরব উপদেষ্টা তাদের আমীরের স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুতকৃত এই চুক্তির ধারাসমূহে বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। এ জন্যই দেখা যায়, ফয়সল যখন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য বসলেন তখন নিজ হাতে একটি গ্যারান্টি ক্লজ লিখেছিলেন। তাতে ছিল ঃ "উল্লিখিত ধারাগুলোতে আমি এই শর্তে অনুমোদন দিচ্ছি যে, আরবরা তাদের স্বাধীনতা অর্জন করবে। তবে যদি তাদের উদ্দেশ্যে কোন রকম পরিবর্তন বা নড়চড় হয় তাহলে এই চুক্তিতে উল্লিখিত কোন

শব্দের সাথেও আমার কোন দায় দায়িত্ব থাকবে না। সেক্ষেত্রে এ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে, এর কোন আইনগত ভিত্তি বা মূল থাকবে না। এ ক্ষেত্রে আমি কোনভাবেই দায়ী থাকব না।"

স্বাক্ষর

ফয়সল

তবে তার এই গ্যারান্টি ক্লজের কোনই কার্যকারিতা ছিল না। কারণ এই দলিলে আমীর ফয়সল কার্যত ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সকল প্রস্তুতিকে গ্রহণ করেছেন।

হাশেমী আমীরদের মধ্যে বাকি থাকলেন আব্দুল্লাহ। তিনি তো তাঁর ওপর ফয়সলকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য ব্রিটিশ নীতির প্রতি আগে থেকেই নাখোশ ছিলেন। এইবার তিনি তাঁর সহোদর ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, সে তাঁর সাথে এবং পিতার সাথে বেয়ানত করেছে এবং তাদের অজ্ঞাতসারে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও পক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছে। ধারণা করা হয় যে, লরেন্সই তাঁকে পিতা ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিলেন।

হায়েম ওয়াইজম্যানের নেতৃত্বাধীন বিশ্ব জায়নিস্ট মহাসম্মেলন এখন বিভিন্ন পন্থায় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে লাগল। আমীর ফয়সলের সাথে সম্পাদিত চুক্তির কয়েকমাস পরেই লন্ডনে খোদ ওয়াইজম্যান প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ঃ ইহুদী রাষ্ট্র আসছে। কিন্তু তা কেবল অঙ্গীকার আর রাজনৈতিক ভাষ্যের মাধ্যমে কখনই বাস্তবায়িত হবে না। বরং তা ইহুদী জাতির ঘাম আর অশ্রুতেই কেবল অর্জিত হতে পারে। এটাই হচ্ছে রাষ্ট্র নির্মাণের একমাত্র পথ। হ্যাঁ, 'বেলফোর অঙ্গীকার'। সে তো কেবল একটি চাবিস্বরূপ। হতে পারে তা এক স্বর্ণালী চাবি। কিন্তু যে চাবি দিয়ে ফিলিস্তিনের দরজাগুলো খুলবে এবং আমাদের সুযোগ এনে দেবে তা হচ্ছে সেখানে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আমাদেরকে তারা (অর্থাৎ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো) জিজ্ঞাসা করেছিল, আমরা কি চাই ? আমরা জবাব দিয়েছিলাম যে, আমরা চাই ফিলিস্তিনে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাতে সে দেশটি প্রবৃদ্ধি অর্জন করার সাথে সাথে বিরাট সংখ্যক ইহুদী অভিবাসীকে সেখানে জায়গা দিতে পারে। এভাবে আমরা সেখানে অবশেষে এমন একটি সমাজের উদ্ভব ঘটাতে পারব যা হবে সে রকম এক ইহুদী ফিলিস্তিন, যতটা ইংরেজি হচ্ছে ইংল্যান্ড বা যতটুকু আমেরিকান হচ্ছে আমেরিকা।

ফিলিস্তিন কি ভবিষ্যতে একটি ইহুদী রাষ্ট্র হবে, না কি হবে না। এর ভবিষ্যৎ কিসের ওপর নির্ভর করবে। এর সীমা কে নির্ধারণ করে দেবে ? তা কি অত্যাসন্ন নাকি সুদূর পরাহত ?

"আমি আপনাদের বলতে চাই, তা নির্ভর করছে আমাদের নিজেদেরই ওপর। অবশ্য তা বহুলাংশে নির্ভর করছে বড় বড় দেশের ওপর। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর বিশেষ করে ব্রিটেনের সাড়া পাওয়া নির্ভর করছে আমরা কতটুকু চাপ সৃষ্টি করে যাব তার ওপর। আর চাপ সৃষ্টি করতে পারা নির্ভর করছে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি ও আমাদের ভাণ্ডারের পূর্ণতার ওপর। সাথে সাথে আমাদের জানতে হবে আমাদের এখন কি করণীয়। যাতে আমরা এ জাতিকে তার দেশে নিয়ে যেতে পারি।"

ব্রিটিশ সরকারের ওপর ওয়াইজম্যানের নির্ভরশীলতা ছিল যথার্থ। ভার্সাই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বলে এ সরকার ফিলিস্তিনে প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল। কারণ ঐ সিদ্ধান্তের ডালিতে 'বেলফোর ওয়াদার' প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার কালবিলম্ব না করে ফিলিস্তিনে একজন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করে। আর তিনি ছিলেন খোদ হার্বার্ট স্যামুয়েল— জায়নিস্ট ইহুদী মন্ত্রী, যিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সেই বিখ্যাত স্মারকলিপির জন্য সুপরিচিত। যাতে তিনি সুপারিশ করেছিলেন যে, যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করার এটা হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। হার্বার্ট স্যামুয়েলই হলেন ফিলিস্তিনের গভর্নর জেনারেল। তার দায়িত্ব ছিল— তার ধারণা অনুসারে এবং 'বেলফোর অঙ্গীকার' অনুসারে ইহুদী রাষ্ট্র সৃষ্টির কাজ করা। এটাই ছিল তার সরকারের নীতি।

এদিকে বৃহত্তর আরব বিপ্লবের আগুনও নিভে যেতে লাগল। এরপর এর কাতারে দলছুট শুরু হলো। সৃষ্টি হলো পারস্পরিক দূরত্ব। কাজেই যে আরবগণ ব্রিটেনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্র শক্তির সাথে ছিল তাদের জন্য কিছু দেবার মতো ব্রিটেনের কিছুই ছিল না। প্রকৃত পক্ষে সে তো বিভিন্ন জাতির সাথে কোন সহযোগমূলক কাজ করেনি এবং কোন দায়-দায়িত্বের সাথে নিজেকে জড়ায়নি। তার দায়িত্ব ছিল কেবল হাশেমী আমীরদের প্রতি। কাজেই তাদেরকে কিছু বিনিময় দেওয়ার তাগিদ অনুভব করুন। হয়তো ভেবেছিল যে, কিছু বদলা চুকিয়ে দিলে পরিবার ও গোত্র ভিত্তিক কিছু ভারসাম্যও সৃষ্টি হবে। আর এটা ব্রিটেনের স্বার্থ বাস্তবায়নেও বেশ সাহায্য করবে। এ প্রেক্ষাপটে সে সময়কার উপনিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল কায়রো এসে আরব রাষ্ট্রের অবশিষ্ট অংশ হাশেমীদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে একটি সম্মেলন করলেন।

তখনও শরীফ হোসেইন হেজাযে বসে, তার অমতে পুত্রগণ নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হন্যে হয়ে ফেরার জন্য আফসোস করে কাঁদছিলেন। কারণ লরেন্সের শলা ধরে ফয়সল গেল শামে। দামেশকে ঢুকেছিলেন আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশায়। কিন্তু ফরাসীরা 'সায়েক্সবেকো' চুক্তির ধারা অনুযায়ী তাদের হক অনুসারে তাকে সেখান থেকে বের করে দিল। এই দিকে আমীর আব্দুল্লাহ আবার উত্তরে উপযুক্ত সুযোগের অন্বেষণে বের হলেন। তার কাফেলা আম্মান (পূর্ব জর্ডান)-এ পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করে কোনদিকে মোড় নেয় লক্ষ্য রাখতে লাগল।

এদিকে চার্চিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কায়রো সম্মেলনে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো ঃ ব্রিটিশ উপনিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী মিস্টার উইনস্টন চার্চিল ১২ থেকে ১৪ মার্চ ১৯২১ পর্যন্ত কায়রোতে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে একটি সাধারণ সম্মেলন করেন। তার সাথে এ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন স্যার বেরসী কক্স (ভারত কার্যালয়ের প্রতিনিধি) ও স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল (ফিলিস্তিনে নিযুক্ত গভর্নর জেনারেল)। এ ছাড়া সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন মেজর লরেন্স, মেজর ক্লাইটন (সামরিক ও রাজনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা) ও মিস্টার কর্নওয়ালিশ এবং মিস গার্টরুড বেল (উপনিবেশ মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা বিভাগ)। সম্মেলন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ইরাকের সিংহাসন (সিরিয়ার গদিচ্যুত বাদশাহ) আমীর ফয়সলকে প্রদান করা হলো....। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে পূর্ব জর্ডানের এমারত (Amirdom) শরীফ হোসেইনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরীফ আব্দুল্লাহকে দেওয়া হলো।

আমীর আব্দুল্লাহ এই ভাগাভাগিতে নিজেকে মজলুম মনে করলেন। কারণ তার ছোটভাই তার কাছ থেকে ইরাকের সিংহাসন নিয়ে গেল। আর সে বড়ভাই হয়েও পূর্ব জর্ডানের এমারত ছাড়া তার জন্য কিছুই রইল না। তার উচ্চাভিলাষ তাকে প্রবোধ দিতে লাগল যে, কোন একদিন আসবেই যখন পরিস্থিতিই তাকে সিরিয়ার সিংহাসনে বসার পথ করে দেবে। কিন্তু বর্তমানে তার স্বপ্ন ফিলিস্তিনের দিকে নিবদ্ধ হলো। সম্ভবত সে গভীরভাবে অনুভব করল যে— ঐ অঞ্চলে এ সময়কার সবচেয়ে সক্রিয় ও কর্মতৎপর জায়নিস্ট আন্দোলনই হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রধান ভাগ্য নিয়ন্ত্রক পক্ষ। এভাবেই তিনি দৃষ্টি ও যোগাযোগ জর্ডান নদীর ওপারে বিস্তার করলেন। এদিকে তেলআবিবে ইহুদী এজেন্সীর সাথে গোপন যোগাযোগের চ্যানেল খুললেন। তিনি তাদের নেতাদের কাছে একটির পর একটি চিঠি পাঠিয়ে তাদের কাছে সহযোগিতা চাইতে থাকলেন যেন জর্ডান নদীর উভয় তীরকে মিলিয়ে পূর্ব জর্ডান ও ফিলিস্তিনের সমন্বয়ে একটি একক রাজ্য সৃষ্টি করা হয়। এর বিনিময়ে তিনি তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিবেন যে তিনি এই রাজ্যে ইহুদীদেরকে স্বায়ত্তশাসন ও তাদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিবেন।

সে সময় যে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আমীরের পত্রাবলী তেলআবিবে চালাচালি হতো তিনি হচ্ছেন— বেন্‌হাস রোটেনবার্গ। তিনি জর্ডান নদীতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মালিক। কিন্তু ইহুদী এজেন্সীর নেতারা এর জবাবে পাল্টা প্রস্তাব পাঠালেন যে, তিনি যেন তার নিজস্ব সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের তত্ত্বাবধানে নিরত থাকেন। এতে তারা প্রভূত আয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এর বিনিময়ে তিনি যেন ইহুদী অভিবাসন ও বসতি স্থাপনের প্রকল্প সমূহের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের বিরোধিতাকে হাল্‌কা করার জন্য তার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে সহযোগিতা দেন।

॥ ৮ ॥

লয়েড জর্জ

"আপনি আল্-কুদসও নিতে পারেন.... এতে আপনি খুশী তো ?!"

—ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে

প্রাচ্যের আরব জাতিগুলো ছিল এক করুন দশায়। কারণ, যে সিরিয়া ছিল বৃহত্তর আরব বিপ্লবের সূতিকাগার সে-ই আজ এক নিদারুন হতাশাগ্রস্ত। পরে কয়েক মাসের জন্য যখন আমীর ফয়সলকে দামেশ্‌কের বাদশা হিসেবে ডাকা হলো তখন কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিল। এরপর তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিরিয়া থেকে বের করে দেওয়া হলো, যাতে 'সায়েক্সবেকো' চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ফরাসী বাহিনী সেখানে প্রবেশ করতে পারে। এরপর সিরিয়া ভূখণ্ড থেকে চারটি প্রদেশ খসিয়ে নেওয়া হলো যাতে ফরাসী ম্যান্ডেটের অধীনে আরেকটি রাষ্ট্র হিসেবে লেবাননকে পূর্ণতা দেওয়া যায়।

এদিকে আরেকটি বিরক্তিকর দৃশ্যপটের পর ফয়সলকে সিংহাসনচ্যুত করা হলো। এ যেন এক প্রকার থানায় নিয়ে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ। বস্তুত দৃশ্যপটটি ঘটেছিল ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়— 'কে ডোরাসিয়া'তে। এখানে আমীর ফয়সল গিয়েছিলেন এ অভিযোগ জানাতে যে, তাকে ভার্সাইতে সন্ধি সম্মেলনের সামনে উপস্থিত হয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে কেন বারণ করা হয়েছে।

তার সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে যে সাক্ষাৎ করেছিল তিনি হচ্ছেন মসিও জানজুত, মন্ত্রণালয়ের এশিয়া বিষয়ক সহকারী পরিচালক। তাদের দুজনের মধ্যে নিম্নোক্ত আলোচনা চলে ঃ (ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পেশকৃত লরেন্স লিখিত নোট অনুসারে যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রার নং ৯৭/৬০৮, ফাইল নং ৭-৪৪৫-এ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।)

ফয়সল ঃ আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাকে সন্ধি সম্মেলনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার অধিকারী প্রতিনিধিদের তালিকা থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা হলো ?

জুত ঃ এটা তো আপনার সহজেই বোঝার কথা। তারা আপনাকে উপহাস করেছে। ইংরেজ আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে। যদি আপনি আমাদের সাথে অবস্থান গ্রহণ করতেন তাহলে আমরা আপনার কিছু ব্যবস্থা করতে পারতাম।

আমরা এখানে আপনাকে একজন সম্মানীয় অতিথি হিসেবে স্বীকার করি, কিন্তু এমন অতিথি যার সাথে শান্তি সম্মেলনের কোন সম্পর্ক নেই। ভুল তো আপনিই করেছেন। কারণ আপনি বেকো-এর অনুমতি না নিয়ে বিনা নোটিশে এখানে এসে পড়েছেন। আপনি ভুল পরামর্শের শিকার। আপনাকে যে সব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাতে আপনার কোন ফায়দা হবে না।

ফয়সল ঃ দামেশকে জেনারেল লেনবে আমাকে জানিয়েছেন যে, ব্রিটিশ ও ফরাসী উভয় সরকার আমার বাহিনীকে একটি যোদ্ধা পক্ষ হিসেবে স্বীকার করে।

জুত ঃ এটি একটি মিথ্যা কথা। আমরা সিরিয়াতে কোন আরব বাহিনী সম্পর্কে কিছুই জানি না।

ফয়সল ঃ জেনারেল লেনবে মিত্রবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। তখন আমার বাহিনী তার নেতৃত্বাধীন ছিল। তিনিই আমাদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তিনি দামেশ্কে আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি আমাদেরকে যোদ্ধাপক্ষ হিসেবে গণ্য করেন। আমি তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম।

জুত ঃ এটিই তো আপনার সমস্যা। আপনার বোঝা উচিত, আপনি যদি ফ্রান্সের বন্ধুত্ব চান, তাহলে আমরা যা বলছি তা মেনে নেওয়াই শ্রেয়।

ইরাকী জনগণ দেখলেন— তারা তুর্কি আধিপত্যের বদলে এখন ব্রিটিশ প্রতিনিধিত্ব পেল এবং বৃহত্তর আরব রাষ্ট্রের ধারণা থেকে তাদের খসিয়ে নেওয়া হলো। তারা অসীম ধৈর্যের বদলে যে স্বাধীনতার আশা করেছিল তা আর তাদের দেওয়া হচ্ছে না। এরপর হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখল যে, বাগদাদে একটি সিংহাসন সৃষ্টির প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে, যার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাদশাহ্ ফয়সলকে তার সকল খেদমত এবং সিরিয়ার সিংহাসন হারানোর পর তার যে দুরাবস্থা হয়েছে তার জন্য তাকে কিছু প্রতিদান দেওয়া। ফয়সল সিরিয়ার পর ইরাক নিয়ে সন্তুষ্টি ছিলেন না। লরেন্স তাকে বুঝাতে ছিলেন যে, ইরাক হচ্ছে সিরিয়া থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ তথ্যটি পাওয়া যায় খোদ লরেন্সের হাতে লেখা একটি চিঠিতে, যা তিনি লিখেছিলেন— 'আরব অফিসে' কর্মরত তার সহকর্মী গ্রেফজ-এর কাছে। গ্রেফজ তার স্মৃতিকথার ৩১ পৃষ্ঠায় এ চিঠির উল্লেখ করেন। তিনি পত্রে এভাবে বুঝালেন ঃ

ইরাকই হবে আরব স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র— সিরিয়া নয়। বাগদাদই হবে মূল ঘাটি— দামেশক নয়। এখন সিরিয়ার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫ মিলিয়ন আর ইরাকের অধিবাসীর সংখ্যা তিন মিলিয়ন। কিন্তু ভবিষ্যতে সিরিয়ার অধিবাসীর সংখ্যা কখনো ৭ মিলিয়নের বেশি হবে না। ততদিনে ইরাকের লোকসংখ্যা ৪০ মিলিয়নে পৌঁছে যাবে। আর এটা হবে, বেশি নয়— বিশ বছরের মধ্যেই।

এদিকে হেজাযের জনগণ পরিস্থিতির পট পরিবর্তনগুলো অনুসরণ করে যেতে লাগল। শেখদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আর সংঘাত দেখে তারা বেশ উপভোগ করতে থাকল। এ অবস্থায় শরীফ হোসেইন কিছু সময়ের জন্য ভগ্ন হৃদয়ে ভারাক্রান্ত সময় পার করতে ছিলেন। তার কাছে প্রস্তাব-পরামর্শ আসতে লাগল যে, তিনি তার পুত্র শরীফ আলীর পক্ষে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে যেন কেবল 'রাজপিতা' হিসেবেই তার ভূমিকা সীমিত রাখেন। কিন্তু সুলতান আব্দুল আযীয আলে সউদ এ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। হঠাৎ তিনি ভ্রাতৃবাহিনী নিয়ে নজদ থেকে দ্রুতবেগে অভিযান চালিয়ে হেজায অধিকার করে নিয়ে পরবর্তীতে 'রাজকীয় সৌদী আরবের' ঘোষণা দেন।

মোটামুটি এই যখন অবস্থা এ সময় আধুনিক আরব ইতিহাসের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দৃশ্যপটের অবতারণা হলো। কীভাবে আরবদের ভাগ্য নির্ধারিত হলো এই দৃশ্যপটই তার ব্যাখ্যা আর চিত্রায়ণের জন্য যথেষ্ট।

এই দৃশ্যপটের নায়ক ছিলেন– ব্রিটিশ মন্ত্রীপরিষদের সচিব লর্ড হাঙ্কি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লিমন শ'-এর মধ্যে সরাসরি সংলাপে ইনি নিজে ভূমিকা রাখেন। ১৯১৯ সালের পহেলা ডিসেম্বর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্য ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ও ইতালীর প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে পৌঁছলেন ঃ উভয়ই ফরাসী দূতাবাস ভবনে সাক্ষাৎ করলেন। তাদের মধ্যে লর্ড হাঙ্কিও সরকারীভাবে নিয়োজিত ছিলেন— আলোচনার মেনিউট প্রস্তুত করার জন্য।

লর্ড হাঙ্কির মেনিউট অনুসারে— প্রথমেই ফরাসী প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, ব্রিটিশ সরকার কিছু ফরাসী কর্মকর্তার কোন কোন আচরণে বিতৃষ্ণ। ব্রিটেন মনে করে— তারা অনেক সময় যুদ্ধের সবচেয়ে বড় মিত্র ব্রিটেনের সাথে ব্যবহারে গ্রহণযোগ্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। এ সময় ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ক্লাইমেন শ' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ, তিনি মনে করেন যে চূড়ান্ত সমন্বয় ও আনুষঙ্গিক কিছু প্রয়োজন এখনো বাকি রয়েছে। উভয়ের মধ্যে সংলাপ শুরু হয়ে নিম্নরূপে তা চলল (এখানে লর্ড হাঙ্কি যেভাবে তার সমঝোতা স্মারকে রেকর্ড করেছেন সেভাবে হুবহু তুলে ধরা হলো। এ ডকুমেন্টটি মন্ত্রীপরিষদের দলিল নং ১৪/১১৬ তাং ১ ডিসেম্বের, ১৯১৯ ইং)

ক্লাইম্যান শ' ঃ আমি চাই আমাদের মধ্যে বড় ধরনের কোন বিতর্ক না থাকুক। আমাদের সামনে এখনো যে পরিস্থিতি রয়েছে তাতে আমাদের অব্যাহত বৈঠক প্রয়োজন। আমাদের মিত্রশক্তি যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সফল হয়েছে, কাজেই শান্তির অভিজ্ঞতায় বিফল হওয়া আদৌ যুক্তিসঙ্গত হবে না।

এরপর ফরাসী প্রধানমন্ত্রী তার ব্রিটিশ সহকর্মীকে প্রস্তাব দিলেন ঃ আসুন না, আমরা আমাদের বিষয়গুলোকে সরাসরি নিজেরাই সুরাহা করে ফেলি! আপনিই বলুন, এখন আমরা একসাথে আলোচনা করার জন্য কি বিষয় গ্রহণ করতে পারি ?

লয়েড জর্জ ঃ আসুন, আমরা ইরাক ও ফিলিস্তিনের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা শুরু করি।

ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমেরিকান কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলো আরবদের অধিকারে এক মৃত্যুভয়াল আঘাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। যে আরব রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধের দিনগুলোতে বিজয় নিশ্চিত করার দুর্বার কামনায় তাদের যা কিছু ছিল সবই মিত্রবাহিনীর খেদমতে উজাড় করে দিয়েছিল। তারা এখন আটলান্টিক অঙ্গীকারে ঘোষিত নীতিমালার বিরোধী এইসব সিদ্ধান্তের ফলে উপলব্ধি করতে লাগল যে, আসলে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আরবদের ক্ষতি করে ইহুদীদেরকে ছাড় দেওয়া কোনভাবেই গ্রহণ করা যায় না। অথচ আমরা দাবি জানিয়ে আসছি যে, যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ফিলিস্তিনে আরবদের অধিকারকে কেন বিবেচনায় রাখা হয়।

সিরীয় বিদেশ মন্ত্রী, যিনি আমাকে এই সিদ্ধান্ত হস্তান্তর করলেন, তিনি আরো বললেন যে, সংসদে যে অনুভূতি ও মত প্রকাশ করা হলো এতে তার সরকারও অংশগ্রহণ করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আমেরিকান সরকার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবেন এবং মনোযোগ ও দায়িত্বশীলতার সাথে বিষয়টি সুরাহা করবেন।

তখন পর্যন্ত আমেরিকান বাহিনী ইহুদী ও জায়নিস্ট প্রেসার গ্রুপগুলো থেকে দূরে ছিল। স্বভাবতই তা আরবদের কাতারেও ছিল না। কিন্তু যে একক উপাদানটি তখনো তাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তা ছিল 'সামরিক প্রয়োজনীয়তা'। এ কারণেই আমেরিকান বাহিনী ফিলিস্তিনের দিকে ইহুদী অভিবাসনের দরজা উন্মোচনে শঙ্কিত ছিল। অবশ্য এর কিছু নিজস্ব কারণ ছিল— ডকুমেন্টগুলোই বলে দিচ্ছে তা ঃ

ডকুমেন্ট নং ২৬৪৪–২/ নং ০১/৮৬৭

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহকারী 'লং'-এর নিকট সমরমন্ত্রীর সহকারী জন ম্যাকলের প্রেরিত স্মারক। তারিখ ঃ ওয়াশিংটন ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪।

আপনার সাথে আমার টেলিফোন আলাপের প্রেক্ষিতে আমি এতদসাথে একটি স্মারকের কপি প্রেরণ করছি যা চীফ অব জয়েন্ট জেনারেল স্টাফ্স জেনারেল মার্শাল-এর নিকট কংগ্রেসের কিছু সদস্যের সাথে সাক্ষাৎকারের ভূমিকা স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

স্মারক

অবাধ ইহুদী অভিবাসনের জন্য ফিলিস্তিনের দরজা উন্মুক্ত করার ব্যাপারে গৃহীত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে আমাদের উপর বিরাট দায়িত্ব বর্তিয়েছে। তাছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই সব সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় দেশ (National Homeland) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দেওয়া বেলফোর অঙ্গীকারের পরিবর্তে সুস্পষ্ট অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। সে অভিবাসীরা এখন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা তুলছে।

ফিলিস্তিন ব্যাপারে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে যা কিছু রয়েছে তা এখন আর ও ইহুদীদের মধ্যে টেনশন বাড়িয়ে তুলছে মাত্র। উভয় পক্ষই এখন বিস্তর অস্ত্র-শস্ত্রের অধিকারী। এদিকে হাইফা, আল্-কুদ্স ও তেলআবিবে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগী সংস্থা ইহুদী আভিবাসন অফিসগুলোতে কয়েকটি বোমা হামলার ঘটনাও ঘটে গেছে। অথচ এখন আমেরিকার স্বার্থেই টেনশন বাড়া ভাল নয়। এ প্রেক্ষিতে আমাদেরকে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে ঃ

১. এ অঞ্চলে এখন মিত্র শক্তির কব্জায় বিপুল সামরিক শক্তি রয়েছে। তারা এগুলোকে এখন অন্য ময়দানে চালান করে দিতে চায়। তারা এখন এ অঞ্চলে তাদের দায়-দায়িত্ব গুটিয়ে আনতে চায় এবং উত্তর ইতালীর মতো অন্যান্য ময়দান ও বিভিন্ন অপারেশনকে অগ্রাধিকার দিতে চায়।

২. আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনী কেবল ফিলিস্তিনে নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বেই বিদ্যমান। ভূমধ্যসাগরের চারপাশে ও উত্তর আফ্রিকার ইসলামী বিশ্বে ফিলিস্তিন বিষয়টি একটি বিশেষ স্পর্শকাতরতায় গিয়ে ঠেকেছে। মরক্কোর গোত্রগুলোর মধ্যে এখনই বেশ অস্থিরতা বিরাজ করছে। যদিও এ সকল অস্থিরতার সাথে ফিলিস্তিনের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু জার্মান প্রচার প্রপাগাণ্ডা এই আগুন উসকে দেওয়ার সুযোগ হিসেবে এটাকে ব্যবহার করতে পারে।

৩. আমাদের কর্মতৎপর যোগাযোগ রুটগুলো পুরো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলেই নিরাপদে চলছে। এ অবস্থায় ফিলিস্তিনে ইহুদী স্বার্থের প্রতি আমেরিকার আগে ভাগেই ঝুঁকে পড়ার বিষয়টি প্রকাশ হলে এই পথ বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

৪. রাশিয়াতে আমাদের কৌশলগত সাপ্লাইরুটগুলো হচ্ছে– পারস্য উপসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের ভেতর দিয়ে। এই সব অঞ্চলেই মুসলমানদের বাস। ইহুদীদের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেলে আমাদের সাপ্লাইগুলো সহিংস সমস্যার মুখে পড়বে।

৫. ইউরোপে যে কোন অপারেশনের জন্য নিকটপ্রাচ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে পাইপলাইনগুলো জীবনী ধমনীর মতো

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোতে কোন বিপদ বা অস্থিরতার ঝুঁকি নেওয়া সঠিক হবে না।

৬. আমি আমাদের সামনের সমস্যাগুলোকে অতিরঞ্জিত করতে চাই না। কিন্তু আমি জানি, আমরা সৌদী আরব থেকে ভূমধ্যসাগরে তেলের পাইপ লাইন স্থাপনের ব্যাপারে সৌদী আরবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছি। আমার ভয় হচ্ছে, জায়নিস্ট প্রকল্পের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্বের কথা জানতে পারলে সৌদীদের সাথে আমাদের আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

আমি বিষয়টি সমাজে অবহিত করতে চেয়েছি। আপনার দৃষ্টিতে আরো কোন উপযুক্ত পয়েন্ট থাকলে তা যোগ করার জন্য আমি প্রস্তুত।

—স্বাক্ষর

জন ম্যাকলে

বাদশাহ্ আব্দুল আযীয আলে সউদ মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের সাথে যোগ দিলেন, অনুরূপভাবে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রও যোগ দিয়ে আরব অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করল। এভাবেই আরব ঐকমত্যের দিকে এটি মোড় নিল। ডকুমেন্টের ভাষা চলছে ঃ

ডকুমেন্ট নং ২২১৫/ ৮৬৭ ন- ০১

সৌদী আরবস্থ ভারপ্রাপ্ত মিনিস্টার মূস-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট তারবার্তা। জেদ্দা ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪, সকাল ১১.০০ টা।

প্রিয় মন্ত্রী,

অর্থমন্ত্রী আবদুল্লাহ্ আস্-সুলাইমান একটি তারবার্তা নিয়ে আমার সাক্ষাতে এলেন যাতে ফিলিস্তিন বিষয়ে বাদশাহ্ ইবনে সৌদ-এর পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ রয়েছে। তিনি আমাকে নিম্নরূপে তা পড়ে শোনালেন ঃ

আমেরিকান মন্ত্রী জেদ্দায় দেখা করে জানালেন যে, আমরা যেসব খবর শুনলাম এতে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। অচিরেই সকলের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। আমাদের বিশ্বাস, ফিলিস্তিন সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া অবাঞ্ছিত। এতে অনুভূতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং নানা গুঞ্জনের সৃষ্টি করবে। আমরা তাকে অনুরোধ করছি তিনি তাঁর সরকারকে জানিয়ে দিবেন যে, আরবদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব এখন সে নিজেই প্রমাণ করতে হবে এবং বন্ধু রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র তার শুভ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।

ডকুমেন্ট নং ২২১৭/ ৮৬৭ নং ০১

বৈরুতের কন্সুলেট জেনারেল ওয়াডসওয়ার্থের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট তারবার্তা। বৈরুত ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪, দুপুর বারটা।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সলীম তুক্‌লা আমাকে ডেকে নিয়ে একটি স্মারকলিপি আমাকে হস্তান্তর করেন, এতে তিনি জায়নিস্টদের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এতে লেবাননের সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভাষ্যও ছিল, যাতে পবিত্রভূমির ভাগ্য নিয়ে লেবাননবাসীর গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। নেবাননের খৃস্টান ও মুসলমান উভয় জাতির উপর ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিপদ চাপার কথাও উল্লেখ রয়েছে। স্মারক ভাষ্যের একটি কপি এতদসাথে সংযুক্ত করে আপনাকে প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত
ওয়াড্‌সওয়ার্থ

ক্লাইম্যান শ' ঃ তাহলে খোলাখুলি বলুন, আপনি কি চান?

লয়েড জর্জ ঃ আমি মোসেল চাই, যদিও আপনারা এ অঞ্চলের দাবি তুলেছেন। তবে আমরা মনে করি এটা হবে চুক্তি অনুসারে আমাদের প্রাপ্য হিস্‌সা— দক্ষিণ ইরাকের সম্পূর্ণিমা।

ক্লাইম্যান শ' ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি মোসেল নিবেন। আমরা আপনাদের জন্য এটা ছেড়ে দেব। আর কিছু আছে?

লয়েড জর্জ ঃ হ্যাঁ, আমি আল্‌-কুদ্‌সও চাই। আপনারা আমাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছেন। আপনারা ফিলিস্তিনকে দক্ষিণ সিরিয়া মনে করে তার স্বত্ব দাবি করছেন।

ক্লাইম্যান শ' ঃ আপনি আল্‌-কুদ্‌সও নেন....। এবার খুশি হলেন তো?

লয়েড জর্জ ঃ এটা ভাল হয়েছে।

ক্লাইম্যান শ' ঃ বিশোঁ (ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) মোসেল এর জন্য আমার সাথে কিছু সমস্যা করতে চাইবে। এ ব্যাপারে আশা করি আপনি আমাকে সহযোগিতা দেবেন।

লয়েড জর্জ ঃ আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

ক্লাইম্যান শ' ঃ আমাদের সামনে কোন ঝামেলা না রেখে উত্তর ফিলিস্তিন আমাদের জন্য ছেড়ে দিন। আমি কেবল লেবাননের খৃস্টান এলাকাই বুঝাতে চাচ্ছি না বরং সিরিয়ার অভ্যন্তরভাগও চাচ্ছি, যেমন— দামেশ্‌ক, হলব, হেম্‌স ও হুমাত।

লয়েড জর্জ ঃ এইসব এলাকায় আমাদের কোন বিশেষ স্বার্থ নেই। আপনারা যদি এসব এলাকাকেও একক ফরাসী শাসনের অধীনে নিয়ে নেন, এতে আমরা কোনই আপত্তি করব না।

উভয়ের মধ্যে আলোচনা এখানেই শেষ হয়ে গেল। কারণ এ সময় ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী ফরাসী দূতাবাসের অভ্যর্থনা কক্ষে তাদের সাথে যোগ দিলেন। এদিকে ফিলিস্তিনের আরব জাতি তাদের উপর নেমে আসা বিপর্যয়ের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

তাদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জমিজমাগুলো হয় কিনে, না হয় জবরদখল করে তাদেরকে সেসবের মালিকানা থেকে ছিন্নমূল করা হচ্ছিল। অভিবাসনের বাঁধভাঙ্গা ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়ছিল তাদের সারা দেশে। উপনিবেশী বসতি কেবল প্রতিষ্ঠিত আর বিস্তার লাভ করে চলেছিল প্রতিদিন। আর এসব হচ্ছিল এমন সব পন্থায় যা হচ্ছে আসলে ধোকাবাজি আর সহিংসতার মিশ্ররূপ অথবা ঘুষের সাথে জবরদস্তির মিশাল। এ সময় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের প্রতিভূ বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কেবল এমন একটি সরকারী নীতিই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছিল যা থেকে কোন বিবেচনা বা কারণেই এতটুকু এদিক-সেদিক করছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, সেই সব দিনগুলোতে ফিলিস্তিনে যা চলছিল তা ছিল দুটি স্নায়ুর মধ্যে সংঘাতের ক্লাসিক্যাল নমুনা ঃ সুশৃঙ্খল ও কৃতসংকল্প পশ্চিমীদের স্নায়ু আর এ দিকে নিয়তি নির্ভর দুর্বলচেতা প্রাচ্য স্নায়ু।

এ সময় কিছু করুণার আর্তি আকৃতিই ছিল একমাত্র উপায়। এ আর্তি নিবেদন করা হতো জাতিপুঞ্জ (লীগ অব নেশনস)-এর দরবারে অথবা ব্রিটিশ সরকারের কাছে অথবা ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের নিকট। কিন্তু এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার সময় কই; তাদের সকলের উপর অর্পিত দায়িত্ব একটাই— 'বেলফোর অঙ্গীকার' বাস্তবায়ন।

যদি কেউ এখন ফিলিস্তিনের মুসলিম অথবা খৃস্টান অধিবাসীদের পক্ষ থেকে জাতিপুঞ্জ বা ব্রিটিশ সরকার বা ফিলিস্তিনে নিয়োজিত ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের নিকট পেশকৃত সে সব দরখাস্তের বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে তাহলে তা তাকে খুবই হতাশ করবে। যেমন ধরুন, মুসলমানদের একটি আরবি দরখাস্তে প্রথমত যে বিষয়ে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ঃ "ইহুদী অভিবাসীরা বলশেভিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। কারণ তাদের অধিকাংশই এসেছে রাশিয়া থেকে। তাদের কমিউনিটি ধ্যান-ধারণা প্রচার-প্রসার ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তারা তাদের বসতিগুলোতে (কিউবোটস) সেই সব আদর্শ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।"

"ইহুদী অভিবাসীরা খুবই দুর্বিনীতি, তারা আরব অধিবাসীদের সাথে নির্দয় ও অহঙ্কারী আচরণ করছে।"

"ইহুদী বসতি স্থাপনকারীরা ফ্রি স্টাইলে আচরণ করে যাচ্ছে। তাদের যুবক-যুবতীরা শালীনতার সীমাছাড়া পোশাকে রাস্তায় বের হয়। একে অপরের বাহুবন্দী, বগলবন্দী হয়ে গান গাইতে গাইতে চলাফেরা করে, আদব আর সম্ভ্রমের নীতির বরখেলাফ আচার-ব্যবহার করে থাকে।"

"ইহুদী বসতি স্থাপনকারীদের উপনিবেশগুলোতে অবাধ জীবনাচার চলছে, যা দেখলে কপাল ঘেমে যায়।"

এমনি করে খৃস্টানদের পক্ষ থেকে যেসব দরখাস্ত পেশ করা হতো তার একটি নমুনা দেখতে পাই ফিলিস্তিনের গভর্নর জেনারেল— জেনারেল ওয়াটশন-এর নিকট পেশ করা একটি আবেদনে ঃ

"আমরা শাসকের প্রতি অনুগত জাতি। ব্রিটিশ সরকার ছাড়া আর কোন সরকারের সাথে আমাদের স্বার্থের মিল পড়ে না। আমরা এলাকাবাসীকে বুঝিয়েছি যে, আমাদের দেশের আবাদ ও উন্নতির ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন সরকারই সর্বোত্তম। ইহুদীরা যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। আমাদের অবস্থার জন্য খুবই আফসোস হয়; তাদের মতো আমরাও হতে পারিনি বলে আমাদের কান্না আসে! বিশেষ করে আমরা তো সে জাতি যারা তাদের শাসকদের আনুগত্য করে, ভালবাসে।"

পরবর্তী পর্যায়ে— তিরিশের দশকের প্রথম দিকে ফিলিস্তিনীরা বুঝতে পারল যে, অনুকম্পা প্রত্যাশী আবেদন-নিবেদনই যথেষ্ট নয়, তাই তারা 'ফিলিস্তিন উচ্চ পরিষদ' সৃষ্টি করে 'বিশ্ব ইহুদী পরিষদের' মোকাবিলা করার ভিত রচনা করল। কিন্তু ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত এই পরিষদের উচ্চনির্বাহী কমিটির সভাগুলোর কার্যবিবরণী এই ইঙ্গিত বহন করে না যে, তখন এই পরিষদ ফিলিস্তিনে চলমান ঘটনাবলীর মোকাবিলায় কোন উপযুক্ত রূপরেখা খুঁজে পেয়েছিল। শুধু ঐ সালের নির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী থেকে এতটুকু জানা যায় যে, ফিলিস্তিনের ইহুদী এজেন্সীর কাছে লেবাননী, সিরীয় ও ফিলিস্তিনীসহ কিছু আরব ধনাঢ্য ব্যক্তি কর্তৃক তাদের কিছু ভূমি বিক্রয়ের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে এক কার্যবিবরণীর রেকর্ডে নিম্নবর্ণিত উত্তপ্ত আলোচনা হয়।

সৈয়দ জামাল আল-হুসাইনী ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য যিনি এখন আমাদের মধ্যেই রয়েছেন, তিনি ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাথে দেখা করে ইহুদীদের কাছে ভূমি বিক্রির ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হন। তখন হাইকমিশনার তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন যে, আপনাদের প্রতিনিধিত্বকারী বহু লোকই তো ইহুদীদের কাছে তাদের জমিজমা বিক্রি করছে, তাহলে আর এ নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করছেন কেন?

জনাব উনি আব্দুল হাদী ঃ হ্যাঁ, এ ঘটনা আমার সাথেই হয়েছে। আমি হাইকমিশনারকে বলেছি— "আমাদেরকে অর্থ দিন এবং ফরাসী সরকারের অনুমোদনের নিশ্চয়তা দিন, তাহলে আমরা প্যারিসের সব জায়গাজমি কিনে নিই।"

হাইকমিশনার আমাকে উত্তরে বলেছেন— কেবল কৃষকরাই জমি বিক্রি করছে না বরং আসলে যারা বিক্রি করছে তারা সবাই বিত্তবান।

শেখ সবরী আবেদীন ঃ আমি প্রস্তাব করছি, যারা ইহুদীদের কাছে তাদের ভূমি বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা ইসলাম ধর্মের গণ্ডি থেকে বের করে দেই। আমি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রমাণ করতে প্রস্তুত রয়েছি যে, যে ব্যক্তি তার জমি ইহুদীর কাছে বিক্রি করবে সে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন পাওয়ার অধিকার হারাবে, মৃত্যুর পর তার জানাযার নামাযও পড়া যাবে না।

জনাব আব্দুল লতীফ সালাহ ঃ "আমি এই প্রস্তাবকে জোর সমর্থন জানাচ্ছি এবং এর সাথে যোগ করতে চাই যে, আমরা ফিলিস্তিনের মসজিদে মসজিদে এমনকি সকল ইসলামী দেশে এই ঘোষণা দেব যে, ব্রিটেন আমাদের ওপর জুলুম করছে। আমরা বদদোয়া করব যে, এই জালিমদের ওপর যেন এর চেয়ে বড় জালিম চড়াও হয়। আমরা খৃস্টান দেশগুলোকেও আহ্বান জানাব যেন তারা তাদের গির্জায় অনুরূপ দোয়া করে। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, ম্যানডেটরি গভর্নমেন্টের পর তাদের মত পাল্টাতে বাধ্য হবে।"

১৯৩৬ সালের আগমনের সাথে সাথে ফিলিস্তিন জাতি যুগসন্ধিক্ষণের কঠিন বাস্তবতার কাছাকাছি এগুতে শুরু করল। হঠাৎ করেই যেন আল্ কুদসের মুফতী আলহাজ আমীন আল হুসেইনীর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে বিপ্লবের আগুন দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

যে অপকর্মটি বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দিল তা হচ্ছে ১৬ এপ্রিল ১৯৩৬ সালে 'বেতাহ্ তাকফাহ' উপনিবেশের সন্নিকটে এক ফিলিস্তিনীর হত্যা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধের জাতীয় কমিটি গঠিত হলো। ফিলিস্তিনের সকল দল সম্মিলিতভাবে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। এর পরই গঠিত হলো উচ্চ আরব প্রতিরোধ কমিটি যার সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হলো আল কুদসের মুফতী আলহাজ্ব আমীন আল হুসেইনীর ওপর। শুধু ধর্মঘটেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকল না। সশস্ত্র প্রতিরোধের কাজও শুরু হয়ে গেল। এর নেতৃত্ব দিলেন শেখ ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসাম! যিনি বিপ্লবের লড়াইয়ে শাহাদাতবরণ করেন। ইন্তিফাদাহ্ ঘটনাবলী প্রসঙ্গে নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিক থেকে তার নাম প্রায়শ উচ্চারিত হয়ে আসছে। এই বিপ্লব ছিল ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের জন্য এক নির্মম আকস্মিকতা। একইভাবে সেখানকার জায়নিস্টদের বসতি আন্দোলনেও এ ছিল এক আকস্মিক আঘাত। যদিও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মিসর ও মাল্টা থেকে বিপুল সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের আগুন প্রতিদিনই ছড়িয়ে পড়ছিল, একে আর কোনভাবে সামলানো যাচ্ছিল না।

এদিকে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, বিপ্লবের কারণগুলো খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি প্রেরণ করা হবে। লর্ড বেল-এর নেতৃত্বে এই কমিটি এসে একটি সুপারিশ ইস্যু করলেন যে, ফিলিস্তিনকে দু'ভাগ করে ইহুদী রাষ্ট্র আর আরব রাষ্ট্র করা যেতে পারে। আরব রাষ্ট্রকে পূর্ব জর্দানের সাথে মিলিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে শর্ত থাকবে যে জর্দান নদীর উভয় তীরে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটর শাসন বহাল থাকবে। ফিলিস্তিনের বিপ্লবী নেতৃত্ব এই ভাগাভাগিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল। বরং দাবি করল যে একটি স্বাধীন ও একক ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে ইহুদী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৈধ অধিকার ও অন্যান্য সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

পুরো তিন তিনটি বছর ধরে এই বিপ্লব ফিলিস্তিনকে প্রকম্পিত করে রেখেছিল। ফিলিস্তিন জাতি এ সময় বিভিন্ন লড়াইয়ে পাঁচ হাজার শহীদ উপহার দিয়েছিল। এই বিপ্লবের ঘটনাবলীতে নজরকাড়া বিষয়ের মধ্যে ছিলেন আরবের তিনজন বাদশাহ ও আমির। একজন হচ্ছেন— সৌদী বাদশাহ, আরেকজন হচ্ছেন ইরাকের বাদশাহ, অপরজন হলেন পূর্ব জর্ডানের আমির। তাঁরা চলমান বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করে উচ্চ আরবি পরিষদের প্রতি আহ্বান জানালেন যেন, সাধারণ ধর্মঘট স্থগিত রেখে ব্রিটেন সরকারকে সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের সুযোগ দেয়া হয়। উচ্চ আরব পরিষদ এ ডাকে সাড়া দিল এবং ধর্মঘট তুলে নিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কিছুই করল না। এতে বিপ্লবের আগুন আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে উঠল। সে ১৯৩৮ সালে লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করল। এতে কিছু আরব রাষ্ট্রের সাথে এই প্রথমবারের মতো মিসরও যোগ দিল। ব্রিটিশ সরকার সম্মেলনের পর ১৯৩৯ সালে ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে তার ধ্যান-ধারণা ব্যাখ্যা করে এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করল। ব্রিটিশ উপনিবেশমন্ত্রী ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড তখন যে সমাধান পেশ করলেন তা ছিল এ রকম ঃ দশ বছরের ট্রানজিট পিরিয়ডের পর ফিলিস্তিনের শর্তাধীন স্বাধীনতা। পাঁচ বছরের জন্য ফিলিস্তিনে প্রতিবছর ১৫,০০০ অভিবাসী ইহুদীকে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। এদিকে, ইহুদী সংস্থাগুলো যে যেখানে আছে ফুঁসে উঠল। তারা তাদের সশস্ত্র ভূমিকাকে আরও নিবিড় করে তুলল। এদের মধ্যে কয়েকটি গ্রুপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আরবদের ওপর ব্যাপক হামলা শানানোর দাবি তুলল। তারা চাইল ফিলিস্তিনের প্রতি ইঞ্চি ভূমি থেকে তাদের মূল্যোৎপাটন করে দিতে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল ছিল তখন ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, ইহুদী আন্দোলন আদি অধিবাসীদের সাথে অর্থাৎ ফিলিস্তিনীদের সাথে কখনও আলোচনা করেনি।

ইহুদীবাদী আন্দোলনের নেতারা প্রথমদিকে কেবল ব্রিটেনের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছে; রোচিল্ড, বিল মারস্টোন-এর সাথে পরবর্তীতে পুরো দেশটি ক্রয় করার ব্যাপারে এক রকম আলোচনা হয়েছিল সুলতান আব্দুল হামিদের সাথে হের্তুজালের। তারপর বেলফোর অঙ্গীকারের প্রস্তুতি উপলক্ষে তারা ব্রিটেনে আলোচনার জন্য এসেছিল। বেলফোরের সাথে রোচিল্ড। এর পর হাশেমী আমিরদের সাথে এক ধরনের আলোচনার অভিজ্ঞতা হাসিল করেছিল ফয়সলের সাথে ওয়াইজম্যান। কিন্তু ফিলিস্তিনীদের সাথে একেবারেই আলোচনা সংঘটিত হয়নি। তাদের সাথে আলোচনার প্রচেষ্টা হলেই তা হতো অপর পক্ষের স্বীকৃতি— যার অস্তিত্বই অস্বীকার করা জরুরী। আর মিসরের ব্যাপারে বলা যায়, তাকে বিচ্ছিন্ন করে

রাখা, তাকে সিনাই অথবা সুয়েজ খালের ওপাড়ে অবরোধ করার জন্য তো তার সাথে আলোচনা করার প্রশ্নই ওঠে না। মিসর নিজেও তার বিরুদ্ধে আঁটা ষড়যন্ত্রের কিছু টের পায়নি তখন। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার স্বার্থও কারও ছিল না। এমনকি কথায় কথায় যে আলাপ করার আহ্বান করা হয়ে থাকে তাও না; আলোচনা-সংলাপ অর্থে তো দূরের কথা। সাধারণভাবে এ উৎসাহের প্রভাব সীমিত ছিল কেবল কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্ব আর কয়েকটি সমাবেশের ওপর। কখনও কখনও হয়ত গণমানুষের আবেগ অনুভূতি তুলনামূলক কিছুটা ব্যাপকতর হয়েছিল।

কিন্তু এই সাধারণ অবস্থাটি সে সকল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে স্বাভাবিক ছিল না যার কারণেই মিসর আরব জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থাটি সে সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল অনেক কার্যকারণের যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে। এসব কার্যকারণ তখন তাদের প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল। প্রভাব বলয় একটির ওপর আরেকটি, সময়ে সময়ে পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী হামলাউত্তর সময়ে মিসরকে অনেকটা অস্ত্রোপচারের মতো কেটেকুটে কয়েকটি টুকরো করা হয়েছিল। এখানে নেপোলিয়নের দখলদার বাহিনী ঢুকে তাকে পুবের অবশিষ্ট আরব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এমনকি এই আক্রমণের আগেই উসমানী রাষ্ট্রের দুর্বলতা এবং মামলুকী শাসনের জানকান্দানীর সময় এর নিয়ন্ত্রণসীমা পতনপর থাকায়— এ দুটো কারণে বিভিন্ন আরব প্রদেশের সাথে লেনদেন ও যোগাযোগের তৎপরতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমনি এক সময়ে নেপোলিয়ন এসে মিসরকে বন্দী করে রাখাল।

সিরিয়াতে মুহাম্মদ আলীর প্রকল্প ধ্বংস করে দেয়ার পর মিসরের উচ্চাভিলাসী শাসক তাঁর প্রদেশে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকলেন। তার প্রকল্পটিকে মার দেয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল মিসরকে সিরিয়া থেকে তথা গোটা আরবপ্রাচ্য থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। আর এই ষড়যন্ত্র আরও পাকাপোক্ত হলো যখন মিসরের মাটি আর চেতনাকে দখল করার পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ মিসরে ইংরেজ আধিপত্য বাড়তে লাগল। এ সময় আরও অনেক নতুন নতুন পক্ষ গজালো যাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে মিসরকে প্রাচ্য থেকে আলাদা রাখার ক্ষেত্রে নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ঃ

'ইসমাঈল'-এর যুগে নীলনদের উৎস আবিষ্কারের মিশনগুলো মিসরের দৃষ্টি দক্ষিণে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এ সময় তারা এ ধারণাও দিতে সফল হয় যে, তার ভবিষ্যৎ আর নিরাপত্তা ওদিকেই— অন্য কোথাও নয়।

এ সকল ভৌগোলিক আবিষ্কারের সাথে সাথে মিসরের ফেরাউনী প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ঐতিহাসিক আবিষ্কারের কাজও চলেছিল। এর প্রভাবে মিসরের দৃষ্টি তার পুরনো ইতিহাসের দিকে নিবদ্ধ হলো। এতে তার মধ্যে এমন একটি ধারণা ঢুকিয়ে

দেয়া হলো যে, তার ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে পিরামিড, মন্দির আর বিনোদন কেন্দ্রগুলোর ঐতিহ্যের মধ্যে।

উনবিংশ শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত এবং বিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মিসর তার স্বদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে দুই কান পর্যন্ত ডুবেছিল। তারা দাবি করে যাচ্ছিল যে, ব্রিটেন অবিলম্বে মিসর ও সুদানের জমীন থেকে বের হয়ে যায়।

এ সময় সাধারণ জনজীবনের অঙ্গনে আবির্ভূত রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তথা বিভিন্ন দল জাতীয়তাবাদী বিষয়টি নিয়েই ছিল ব্যস্ত। বাস্তবে তা অতিক্রম করতেও সক্ষম ছিল না। তারা এটা উপলব্ধিও করতে পারছিল না যে তারা নিজ দেশের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারলে এটা তাদেরকে আরও বেশি শক্তি এনে দিতে পারত। এই চিন্তার বন্ধ্যাত্বের জন্য মিসরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও কিছুটা দায়ী। কারণ এ আন্দোলন প্রধানত নির্ভর করেছিল জমিদার ও কৃষিক্ষেত্রের মালিকদের ওপর যারা স্বভাবতই নিজেদের সীমাতেই নিজেদের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখাতে অভ্যস্ত। এ সীমা থেকে বের হয়ে অন্যের দিকে তারা আদৌ যেতে আগ্রহী হয় না; বিশেষ করে যদি ধারণা জন্মে যে, এই 'অপর ব্যক্তি' অনেক দূর থেকে হলেও যদি এক সরিষা পরিমাণও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, বা স্বার্থে ভাগ বসাতে চাইতে পারে, বিভিন্ন শক্তি ও পক্ষের মধ্যে বিভেদ বা চিড় ধরাতে পারে। সম্ভবত আব্দুর রহমান আজ্জাম এক সময় সা'দ যগলুলের কাছে এলে তিনি যে বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন এটা তার ব্যাখ্যা হতে পারে। আজ্জাম যখন সা'দ যগলুলকে আরব দেশগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করছিলেন তখন সা'দ যগলুল তাকে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "শূন্য যোগ শূন্য সমান সমান কত ? বলতো আজ্জাম ?"

চতুর্থ অধ্যায়

মিসর আবার ময়দানে ফিরে এসেছে

এমনকি যারা বিশ্বাস করেন যে প্রথমত মিসর, দ্বিতীয়তও মিসর, শেষেও মিসর, তাদের জানা উচিত যে, সক্ষম ও শক্তিশালী মিসর কখনই তারা সীমান্তের অভ্যন্তরে নয়। মিসরের কোন আশা নেই, নিরাপত্তা নেই—গতকালও ছিল না, আজও নেই, আগামীকালও থাকবে না— যদি সে থাকে তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার রাজনৈতিক সীমার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। যদি আমরা অহংবোধের কথা বলি আর আমাদের পরিচয়ের দিকটিকে ছেড়েও দিই তাহলেও আত্মঅহঙ্কারী মিসরকে অবশ্যই হতে হবে আরবি। এটা কেবল ইতিহাসের নির্দেশই নয়, এটা তারও আগে ভবিষ্যতের নির্দেশ।

॥ ১॥

বাদশাহ্ ফুয়াদ

"শূন্য+শূন্য = কত, আজ্জাম ?"

—সা'দ যগলুল পাশা বলেছিলেন আব্দুর রহমান আজ্জাম পাশাকে

১৯৩৮ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিন সম্মেলনে মিসরের আবির্ভাব ও অংশগ্রহণ ছিল মিসরের রাজনীতি তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য মোড়। এই সম্মেলনটি হয়েছিল ফিলিস্তিন ও আশপাশের আরব জাহান কাঁপানো ১৯৩৬-এর বিপ্লবের ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে। এ ছাড়া সম্মেলনটি ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধ্যালগ্ন— যুদ্ধ লেগে যাবার সম্ভাবনাগুলো পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে, যখন প্রায় স্থির বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ববর্তী বিশ্বযুদ্ধের মতো এ যুদ্ধেও মধ্যপ্রাচ্যই হবে এর অন্যতম প্রধান ময়দান।

এ সময় বিশেষ দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয় ছিল, '৩৮-এর সেই লন্ডন সম্মেলনে মিসরীয় প্রতিনিধি দলটি, যা ছিল সে সময়কার সম্ভব সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের ডেপুটেশন। কারণ এর প্রধান ছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আলী মাহের পাশা। ইনি বিপ্লবপূর্ব মিসরের অন্যতম বিশিষ্ট রাজনীতিক। আলী মাহের প্রধানমন্ত্রী হওয়া ছাড়াও বাদশাহর শক্তিশালী লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ফারুক তখনও কেবল একজন বালক— যিনি বছর খানেক আগে পিতা বাদশাহ ফুয়াদের পর সিংহাসনে বসেছেন। বলতে গেলে তাঁর আমলের প্রথম প্রভাত কেবল অতিক্রম করছিলেন। বালকটি তখনও শুনছেন আর বুঝতে ও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছেন মাত্র। ইনসাফের কথা হলো তিনি তখন বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাবনায় বিভোর ছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল প্রাচ্যের প্রতি সেই উজ্জ্বল ও মজবুত অবস্থান... আরব প্রাচ্য বা তারও ওধারের চিন্তা।

মিসর ১৯৩৮ সালের ফিলিস্তিন সম্মেলনে অংশ গ্রহণের পূর্বে মানবিক, সাংস্কৃতিক ও শিল্পগত পর্যায়ে আরব প্রাচ্যের কাছাকাছিই ছিল। এমনকি 'তালাআত হারব' কর্তৃক 'মিসর ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে অর্থনৈতিক পর্যায়েও বোধ হয় কিছুটা কাছাকাছি অবস্থানে উঠে আসতে পেরেছিল। ইনি খুব শীঘ্রই সিরিয়া ও লেবাননে তার ব্যাংকিং তৎপরতা বিস্তার করেন— কিন্তু এগুলো ছিল রাজনৈতিক পর্যায় থেকে বেশ দূরে। হ্যাঁ। ঐ অঞ্চলে মিসর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন যে কিছু জনপ্রিয় স্লোগানের মাধ্যমে কিছুটা প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, সেটুকু ছাড়া। তবে এটা নিজস্ব ঐতিহাসিক

যোগাযোগের শক্তিতে বলীয়ান কোন আবেগ থেকে উৎসারিত প্রভাব ছিল না। যদিও এই ঐতিহাসিক যোগাযোগের শক্তি, এর কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট চেতনা না থাকলেও এটা কাজ করে যায়। সত্যি বলতে কি, আরব জাহান তার পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে, মিসর সম্পর্কে এত বেশি খবর রাখে যা মিসর নিজেও জানে না। তাই দেখা যায়, মুহাম্মদ আলীও তার বিরাট সাফল্যের যুগ থেকে নিয়ে ইসমাঈল ও তার উজ্জ্বল আলোর যুগ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে 'আরাবি ও সা'দ যগলুল' এ দু'টি বিপ্লব পর্যন্ত প্রাচ্যের আরব জাতি কায়রোকেই তার সুসভ্য রাজধানী মনে করত। কিন্তু সম্পর্কের পথে একদিকের তৎপরতা ছিল বেশি প্রবল। কারণ আরবরাই সব সময় মিসরে আসত অথচ মিসর তাদের কাছে কদাচিৎই যেত। সম্ভবত মিসর এমন এক বা একাধিক বিষয়ে ব্যস্ত ছিল যার কারণে আরব জাহানের অন্যত্র কি হচ্ছে তা তার জানার ফুরসত ছিল না।

হয়ত কোন কোন সময়ে এমন কিছু আলামত প্রকাশ পেয়েছে যাতে একজন মিসরী আরব জাহানের চারদিকে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে একটু সজাগ হয়েছিল বটে। কিন্তু এসব হলো, এক ধরনের মানবীয় সময় সন্ধিক্ষণ যা হঠাৎ প্রকাশ পেত আবার সমান দ্রুতলয়ে তা উবে যেত। এ ধরনের অবস্থা হতো নির্দিষ্ট কিছু উপলক্ষে। এর সর্বশেষটি ছিল ১৯৩৬ সালের বিপ্লবের উত্তপ্ত দিনগুলোতে ফিলিস্তিনের জন্য উৎসাহের একটি ঢেউ। এক্ষেত্রে আরেকটি দূরত্বও ছিল, যার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে তেমন নজরে না এলেও তার প্রতিক্রিয়া ছিল ব্যাপক ও অপ্রতিরোধ্য। সেটি হচ্ছে মিসরী ধ্যান-ধারণা উত্তরে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে একটি সেতু বিস্তার করে ফেলেছিল। তারা মেনে নিয়েছিল যে, এই হচ্ছে জ্ঞান, সংস্কৃতি আর উজ্জ্বলতার পথ।

মিসরী ধ্যান-ধারণা তার চারপাশে পূর্ব-পশ্চিমে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেনি। সে তার দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল সমুদ্রের ওপারে ইউরোপের স্বপ্ন-বিভোর হয়ে। বিশেষ করে প্যারিসের দিকে। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল শেখ রেফাআহ্ রাফে আত্-তাহ্তাবীর সফর দিয়ে। তিনি মোহাম্মদ আলীর প্রথম মিশনের সাথে গিয়েছিলেন। যখন ফিরলেন, সাথে নিয়ে এলেন ভল্টেয়ার, রুশো ও মোন্তেসকিউ-এর চিন্তাধারার কিছু আলোর ছটা। এই সব আলোক ছটা মিসরে উজ্জ্বল সার্চলাইটে পরিণত হলো, যা মুহাম্মদ আলী যুগে ইউরোপে প্রেরিত শিক্ষা মিশনের দলগুলোর মাধ্যমে তার বৃত্ত প্রসারিত করতে থাকল। এরপর ইসমাঈলের আমলে এ ধারা নতুন করে শুরু হলো। তাঁর যেন লক্ষ্যই ছিল— ভৌগোলিক বাধা আর ইতিহাসের প্রতিবন্ধনের দিকে না তাকিয়ে মিসরকে ইউরোপের একটি টুকরোতে পরিণত করা।

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে দেখা গেল মিসরে বিশিষ্ট সব চিন্তাবিদ তথা রাজনীতিক হচ্ছেন ইউরোপীয় সংস্কৃতি, বিশেষ করে ফরাসী সংস্কৃতির শিষ্য। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো— এইসব ইউরোপীয় সংস্কৃতির শিষ্যরা এই সংস্কৃতির

বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শিক্ষায়তনে ভাগ হয়ে আছে। সে সময় এই সংস্কৃতির এমনই অবস্থা ছিল। তখন এর পতাকাবাহীরা এটা মোটেই আমল দেননি যে, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কার্যকারণগুলো বিশ্বের অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তখন অনুপস্থিত ছিল; তা হচ্ছে— আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক বিবর্তন সব সময় বিজয়ী হয়ে থাকে। যা হোক, সেই সব বুদ্ধিজীবী তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁরাই ছিলেন প্রগতির বরপুত্র— কোন না কোনভাবে তাঁরাই পশ্চাৎপদতা আর ঔপনিবেশিক মান্ধাতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছিলেন।

এভাবেই বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নিয়ে তিরিশের দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মিসরে বেশ কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক দল ও মতের উদ্ভব হয় ঃ

লিবারেল মতাদর্শ ঃ লিবারেলিজমের বিভিন্ন রং ও ছায়ার বৈচিত্র নিয়েই একটি সাধারণ লিবারেল মতাদর্শ ছিল এখানে। এটিই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক মাতাদর্শ। এ আদর্শেরই ধারক ছিল তৎকালীন বৃহত্তম রাজনৈতিক দল— 'আল ওয়াফ্দ'। এর কর্ণধার ছিলেন জমিদার শ্রেণী ও তাঁদের সন্তান ও পরিবারের শিক্ষিত সদস্যগণ। এদের অধিকাংশই ছিলেন যাঁরা আইন অধ্যয়ন করেছেন এবং আইন ব্যবসা করেছেন। সাধারণত যাঁরা আইন ব্যবসা করেন তাঁরা নিজেদেরকে কোন না কোন 'ধারায়' ব্যস্ত রাখেন— চাই তা লিখিত 'ধারা' হোক বা বাস্তব ধারা। এ প্রেক্ষিতেই দেখা গেল যে, এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই নিজেদেরকে স্বদেশের স্বাধীনতার 'ধারা'য় ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এ থেকে কখনও বের হয়ে যাননি।

এদিকে আরেকটি মতাদর্শ ছিল আদর্শ সাম্যবাদ বা মার্কসবাদ নামে। এটি ছিল তার প্রাথমিক বিপ্লবের ধাঁচে। তবে এ মতাদর্শটি মিসরে কেবল সীমিত গণ্ডিতে কিছু শিক্ষিত লোকের মধ্যেই প্রচারিত ছিল বলে তা ছিল প্রভাব বিস্তারকারী থেকে দূরে। সে সময় এটি মিসরের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা হতে অনেক দূরবর্তী অবস্থানে থেকে তার প্রচার শুরু করেছিল। এ কারণেই সাম্যবাদের নানান ধরনের মাঝে এই মতাদর্শটি ছিল প্রান্তিক অবস্থানে, যা জাতীয় অগ্রগতিতে প্রবেশের বিকল্পহীন তোরণ—'স্বাধীনতার দাবি'র প্রেক্ষাপটে সকল অগ্রগণ্য বিষয় থেকে অনেক দূরের বিষয় ছিল। আরেকটি মতাদর্শ ছিল ডারউইন-এর থিওরিভিত্তিক বস্তুবাদী আদর্শ।

বস্তুবাদী তাদের এতদূর নিয়ে গিয়েছিল যে, যে কোন বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ডের সাথে এদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। শুরু থেকেই ধর্মীয় শিখণ্ডিদের সাথে তাদের ধাক্কা লাগে। এসব অবিচল পাহাড়ের শক্ত পাথরে লেগে তাদের দাবিগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ভুল তাদের এমনভাবেই পেয়ে বসেছিল যে, তাদের দাবির দুর্বোধ্যতার জন্য তারা মানুষকে ভর্ৎসনা করত অথবা এ জন্য নিজেদের প্রতি দোষারোপ করত না।

এই সকল মতাদর্শের পাশাপাশি ইসলামী মতাদর্শও ছিল। তবে তা সীমাহীনভাবে আরব জাতীয়তাবাদের সাথে মিশে ছিল। এই মিশ্রণের কারণ ছিল খেলাফতের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং এর সাথে কোন না কোনভাবে আরব বিপ্লবের চিন্তাধারার সাথে সংযোগ। স্বভাবতই শেখ রশীদ রেদা ছিলেন এই মতাদর্শের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তাঁর অভাবে এ আন্দোলনের ভূমিকাও ঝিমিয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'আল-মানার'-এর প্রভাব যতটুকু সঙ্কুচিত হয়েছিল এ আন্দোলনেও ততটা ভাটা লক্ষ্য করা গেছে।

যা হোক, এই সকল দল ও মত সবই একটি ইস্যু নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আর তা হচ্ছে মিসরের সীমার ভেতরেই স্বাধীনতার দাবি। পাশাপাশি সুদানের সাথেও এক ধরনের সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু এ সময় একটি মৌলিক বিষয় সবাই ভুলে গিয়েছিল, যা স্বাধীনতার আগেই দরকার ছিল। আর তা হচ্ছে, আত্মপরিচয়। কারণ কোন সৃষ্টিই যতক্ষণ পর্যন্ত জানতে না পারে যে, সে কে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক করতে পারে না।

মিসর তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে সব সময় ছিল, ডঃ জামাল হামদানের মতে, স্থলদেশ— জলদেশ নয়। স্থল রাষ্ট্রের অর্থ হচ্ছে, সিনাই হয়ে এশিয়ার দিকে তার যে রাস্তা সেটিই হচ্ছে তার সভ্যতার গঠন ও রূপায়ণে অন্য যে কোন পথ থেকে বেশি ক্রিয়াশালী ও প্রভাবশীল এ পথ ধরেই এসেছিল সব হিজরত যুদ্ধ-বিগ্রহ আর বিভিন্ন ধর্ম। এ পথ ধরেই তার মানবীয় ও সভ্যতাগত গঠন ও রূপায়ণের অধিকাংশ উপাদান এসেছিল।

সম্ভবত কোন কোন চিন্তাবিদ উপলব্ধি করেছিলেন যে, আত্মপরিচয়ের জন্য শিকড়ের প্রয়োজন। তাদের সহজ পছন্দ ছিল ভূমধ্যসাগরের পরিচয়। এটা ছিল সে সময়ে আত্মপরিচয়ের বিষয় গ্রহণযোগ্য চিন্তাগুলোকে সমন্বয়ের একটি প্রক্রিয়া। বোধহয় ডঃ ত্বহা হুসেইনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মিসরে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ' হচ্ছে এ ধরনের চিন্তাধারার সমন্বয়ের উত্তম প্রকাশ। এছাড়াও একটি উপদল ছিল, যারা ইতোপূর্বেই উল্লিখিত সকল দলমত থেকে ভিন্ন। এ দলটি সীমারেখার বাইরে প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল। সত্যিকার অর্থে তারা একটি ভিন্ন দিকে তাদের হৃদয় ও অনুভূতিকে চালিত করেছিল। এটাই ছিল এ দলের ভূমিকা— চাই সে সচেতনভাবে সেদিকে অগ্রসর হয়েছে অথবা বিশ্লেষণ বা শিকড় সন্ধানে বেশি মনোযোগ না দিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আবেগের আবেদনে সেদিকে পা বাড়িয়েছে। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সাহিত্যিক, কবি আর শিল্পীদের পথ। তারা সবাই রেশম গুটির মতো, রেশমের সূতা বুনেছে বড় খাসা করে কিন্তু প্রাচ্যে তা ছিল প্রায় অদৃশ্যমান। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন ও ইরাকে। হঠাৎই দেখা গেল যে, এইসব সূতা লৌহশক্ত পুলের মতো হয়ে গেল। পরিশেষে বলা যায়, এই উপদলটি সে সময়ে একটি

রাজনৈতিক দলের পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল তার চেয়ে কিছু বেশি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়।

এ সময় খেলাফতের প্রতি বাদশাহ্ ফুয়াদের উচ্চাভিলাষের প্রেক্ষাপটে একটি আরব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেল কিন্তু তা দ্রুতই মিলিয়ে যায়। বোঝা যায়, এ সময় বাদশাহ্ও জেনে গেছেন যে, সুলতান হুসেন কামেলের নিকট আল্-কুদ্সে একজন মুসলিম আমীর নিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল। এ ছাড়া তিনি মনে করেছিলেন যে, খলিফা নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় তিনিই সবচেয়ে বেশি যোগ্য— চাই হাশেমীদের মধ্যেই হোক বা সৌদীদের মধ্যে। কিন্তু ইংরেজগণ ১৯১৯ সালের বিপ্লবের পর তাদের মত বদলিয়ে ফেলে।

তারা এই বিপ্লবের আগে সুলতান হুসেন কামেলের সময় তাকে আল্-কুদসের আমীর বানাবার চিন্তা করেছিল। তখন তাদের কাছে মিসরকে মনে হয়েছিল শান্ত ও অনুগত অভয়ারণ্য। তাদের আমীরকে সহজেই আল্-কুদস শহর ও তার আশপাশের দায়িত্বও দেয়া যেতে পারে। তার ছত্রছায়ায় কোন বড় ধরনের উচ্চবাচ্য ছাড়াই ফিলিস্তিনে আরব ও ইহুদীদের সংখ্যাগত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কিন্তু ১৯১৯ সালের বিপ্লব এই সব আন্দাজকে পাল্টে দিল এবং প্রকাশ করে দিল যে, যেমনটি ভাবা হচ্ছিল মিসর তেমন শান্ত, অনুগত ও সংরক্ষিত অভয়ারণ্য নয়। বস্তুত খেলাফতের জন্য বাদশাহ্ ফুয়াদের চেষ্টা শুরুর আগেই স্থগিত হয়ে গেল। এরপর তো কয়েক মাস যেতে না যেতেই পুরো খেলাফতের বিষয়টি তিন প্রত্যাশী পরিবারের ক্ষেত্রেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল, সময়ের ব্যবধানে তা একেবারে মিলিয়ে গেল।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সে সময় খেলাফতে বিষয়টি মিসরের লিবারেল গ্রুপে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। তবে এ অস্থিরতার কারণও ছিল। কারণ একদিকে দেখা গেল, বাদশাহ ফুয়াদ ধর্মকে রাজনীতির সাথে মিশিয়ে ফেলতে চাইছেন। এ ছিল এক ভয়ানক খেলা। অন্যদিকে মুসলমানদের খেলাফতের দাবি তুলে বাদশাহ্ মিসরে নিজের অবস্থান ও আধিপত্যকে আরও পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এ ছিল আরও ভয়ানক খেল।

আল্-কুদস ও আশপাশের এলাকায় একজন মিসরী আমীর নিয়োগের বিষয়ে ইংরেজগণ তাদের মত বদলানোর পর এবং তৎকালীন মিসরে বৃহত্তম জনমতপুষ্ট লিবারেলপন্থীদের অপছন্দের প্রেক্ষিতে বাদশাহ্ ফুয়াদ নিজে থেকেই খেলাফতের বিষয়টি বাদ দিয়ে দিলেন এবং সা'দ যগলুল ও মোস্তফা নাহ্হাসের চাপের মুখে সাংবিধানিক অধিকারের দাবিতে তিনি মিসরে তাঁর ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করতে লাগলেন।

এভাবেই রাজনৈতিক ও সরকারীভাবে প্রাচ্যের দিকে মিসরের আর যাওয়া হলো না। এরপরই তার আকাশে নানা বর্ণের খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াতে থাকল। এ সময় আর ভাল করে চিন্তা করা বা দৃষ্টি দেয়ার যথেষ্ট ফুরসত ছিল না।

॥ ২॥

বাদশাহ্ ফারুক

"বিষয়বস্তুকে অনুভব না করে আমি কারও ছবি আঁকতে পারি না।"
—ব্রিটিশ সেনাকর্মকর্তা সিমন এলওয়াইজ তার সাথে রাণী ফরিদা'র সম্পর্কে সাফাই গাইতে গিয়ে উপরোক্ত কথা বলেন

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি মিসরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। যদিও প্রতিটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই বাহ্যত একটির সাথে অপরটির কোন সংযোগ পরিলক্ষিত হয়নি। তবুও এক প্রকার আন্তঃসংযোগের প্রতিটি পরিবর্তনকে একটির সাথে আরেকটি গেঁথে রেখেছিল ঃ

এক সময় জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রায় তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল এবং মিসর ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পাদিত ১৯৩৬ সালের চুক্তি ছিল এ চূড়ান্ত পর্যায়েরই ইঙ্গিতবহ। মোটকথা স্বাধীনতাকামী প্রথম প্রজন্ম বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হতে এক সময় ব্রিটেনের সাথে যে কোন সমাধানকে কবুল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। কেবল তাতে 'স্বাধীনতা' আর 'নিস্ক্রান্ত' শব্দগুলোর উল্লেখ থাকলেই হলো, এমনকি যদি বিষয় দু'টির উল্লেখ সংশয় আশ্রয়ী অবয়বেও আসে।

এদিকে ১৯১৯-এর বিপ্লব উত্তর পরিমণ্ডলে এক উচ্চাভিলাষী যুব প্রজন্ম বেড়ে উঠল, যারা ১৯৩৫ সালের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছিল, যে আন্দোলন বিভিন্ন দলীয় কনভেনশনাল নেতাদের একটি জাতীয় প্লাটফরমে এনে ইংরেজদের সাথে আলোচনায় নিবন্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে মিসরে, বলা যায় 'অর্ধ বিপ্লবই' একটি টগবগে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। কিন্তু এই টগবগে জলন্ত পরিবেশটি ১৯৩৬ সালের চুক্তির স্বাক্ষরের পর সহসাই নিভে গেল। এদিকে তালআত হরব-এর বিরাট এডভেঞ্চার 'মিসর ব্যাংক' ও তার কোম্পানীগুলোর কাঠামো বিনির্মাণে সফল হয়। এতে এক ধরনের উপলব্ধি ছড়িয়ে পড়ে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করার মতো অনেক কিছু রয়েছে। ন্যূনতম পক্ষে একজন বিশিষ্ট মিসরী তো বাস্তবে প্রমাণ করে ছাড়ল যে প্রবৃদ্ধি করা সম্ভব; মিসরীরা তা পারে।

১৯৩৬ সালে বাদশাহ্ ফুয়াদ ইন্তিকাল করেন। ইতালীয় সংস্কৃতিতে প্রভাবিত এবং তৎকালীন ইতালীর 'আলে সাফুই' রাজপরিবারের চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠজন—বাদশাহ্ ফুয়াদের শাসন, সময়ের ব্যবধানে এবং জাতীয় আন্দোলনের চাপের মুখে অনেকটা

রাজা-বাদশাহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিজয় লাভের উদাহরণ 'আলে-বুর্জিয়া' শাসনের দিকেই ফিরে যায়।

এদিকে বাদশাহ্ ফুয়াদের পর তার উত্তরাধিকারী যুবরাজ ফারুক সিংহাসনে বসেন। ইনি এ সময় মেধাদীপ্ত এক সুদর্শন বালকমাত্র। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তিনি তখনও অপরিপক্ক। কিন্তু তার বাল্যকাল সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শূন্যতা পূরণে সক্ষম। যা হোক তার বাল্যকাল মিসরকে এমন একটি উপলব্ধি এনে দিল যে, তারা নতুন অঙ্গীকারের খুব কাছাকাছি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়— ইতালীতে ফ্যাসিবাদ, জার্মানিতে নাজি বাহিনী ও রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে দ্রুত পটপরিবর্তন করে ইউরোপে এক বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কার দিন গুনছিল। এ ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য হবে তার অন্যতম যুদ্ধময়দান। এ থমথমে পরিমণ্ডল মিসরে আশা আর আশঙ্কার মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। এই পরস্পর বিরোধী উপলব্ধি থেকে এমন বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যার কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন— বিজলীর চরম আর বজ্রের আওয়াজ। এই চার্জ দেয়া সাধারণ পরিমণ্ডলে কিছু কিছু আলামত আশার সঞ্চার করেছিল ঃ বাদশাহ্ ফুয়াদ তাঁর পুত্র ফারুকের তত্ত্বাবধানের জন্য যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছিলেন, যিনি ব্রিটেনে তাঁর অসমাপ্ত শিক্ষা সফরে সহগামী হয়েছিলেন— তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আযীয মিসরী (পাশা)। ইনি হচ্ছেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের সাথে যোগাযোগ আর আলোচনার জন্য আরব বিপ্লবের প্রথম দিককার পক্ষ থেকে প্রথম প্রতিনিধি। তিনিই স্বতন্ত্র আরব রাষ্ট্রের শর্ত আরোপ করেছিলেন যে শর্তটি ইংরেজগণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে তারা বাদ দিতে চেষ্টা করেছিল। তার পরিবর্তে তথা অন্যান্য জাতীয়তাবাদীর পরিবর্তে তারা হাশেমী ও সৌদী আমীরদের সাথে লেনদেন করাই শ্রেয় মনে করেছিল। এসব আমীর তখন আরব বিশ্বের দুর্দিনে মুকুট আর সিংহাসনের অফার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

বাদশাহ্ ফুয়াদ ঠিক আযীয মিসরীকেই কেন বেছে নিলেন এটার কারণ জানা নেই। তবে নিজের জন্য ইসলামী আরব খেলাফতের আশাহত বাদশাহ্ বুঝি বা নিজের পুত্রের বেলায় সে স্বপ্ন দেখেছিলেন। আযীয মিসরীকে নির্বাচন করে সম্ভবত এমন একটি সেতু রচনা করতে চেয়েছিলেন যার ওপর দিয়ে প্রজন্ম পরম্পরায় এই স্বপ্ন আর ধ্যান চলমান থাকবে। হয়ত বা তাই। হয়ত এর অন্য কারণও থাকতে পারে। এর মধ্যে হতে পারে, বৃদ্ধ বাদশাহ্ চেয়েছিলেন— আগামী নতুন যুগের ধ্যান-ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁর পুত্র যেন সঠিক পরিচর্যা পেয়ে বেড়ে ওঠে। তাই হয়ত চেয়েছিলেন যেন তাঁর তরুণ পুত্র তাঁর সাহচর্যে থেকে এবং তাঁর আঙুল ধরে অগ্রসর হয়। হয়ত বা তাই। এমনও হতে পারে যে, বাদশাহ্ ফুয়াদ চেয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র

একটি সুদৃঢ় সামরিক প্রশিক্ষণ পাক; ভেবেছিলেন, আযীয মিসরীই তাকে সে প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন এবং এভাবে অভ্যস্ত করে তুলবেন। হয়ত বা তাই।

কিন্তু বাদশাহ্ ফুয়াদ যে ভুলটি করলেন তা হচ্ছে— আযীয মিসরীকে ইংল্যান্ডে তাঁর পুত্রের প্রথম সহচর করার সাথে সাথে তার অপর এক বিশ্বাসভাজন আহমদ মুহাম্মদ হাসনাইনকে দ্বিতীয় সহচর নির্বাচন করা। কারণ তাদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও চিন্তার ক্ষেত্রে ছিল বিরাট বৈপরীত্য। কারণ প্রথমজন তরুণ আমীরের জন্য চাইতেন প্রতিশ্রুতিশীল এক কঠোর জীবন অথচ অপরজন চাইতেন তার স্বাচ্ছন্দ্য আমুদে জীবন।

বালক যুবরাজের জীবনে এই দুই বিপরীতমুখী ব্যক্তির উপস্থিতি তার মধ্যে এক ধরনের বৈপরীত্যের জন্ম দেয় যার জন্য পরবর্তীতে তিনি যেমন ভুগেছিলেন— তার সাথে মিসরও ভুগেছিল খুব। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি তরুণ বাদশাহ্র মধ্যে আযীয মিসরীর প্রভাব সুস্পষ্ট হলো। এ সময় ১৯৩৬ সালের চুক্তি পরবর্তী সেই ভীষণ আশা-নিরাশার দোলাচল পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য মনোনীত হলেন— 'আলী মাহের (পাশা)'। ইনি দল-নিরপেক্ষ রাজনীতিক ছিলেন। তার চারপাশ ঘিরে ছিল এমন কিছু ব্যক্তি যাদের মনে করা হতো 'সময়ের সুযোগ্য লোক'। সত্যি সত্যিই সময় এভাবেই তাদেরকে প্রকাশ করা হতো। এ ব্যক্তিদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিলেন যাঁরা মিসরের জাতীয় পরিচয় আর তাঁর ভবিষ্যতের প্রতি নিবদ্ধ করেছিলেন দীঘল দৃষ্টি। এদের অধিকাংশই ছিলেন প্রাচ্যপন্থী এক্ষেত্রে আযীয মিসরীর পক্ষে ছিলেন— আব্দুর রহমান 'আযযাম' মুহাম্মদ আলী আলূবাহ, সালেহ হারব ও মাহমুদ আযমী-এর মতো আরও অনেকে। এ সময় প্রাচ্যের প্রতি তাদের চিন্তাগুলো ছিল অনির্দিষ্ট।

অন্যদের কর্মতৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। যেমন, মুহাম্মদ আলী আলূবাহ্ (পাশা), আব্দুর রহমান 'আযযাম পাশা'। বন্দীদশা, বরখাস্ত আর অবরোধের একই দশা ঘটল অনেকের বেলায়। যেমন, আহম্মদ হোসেন, ফাত্হী রেদওয়ান, নূরুদ্দীন তার্রাফ ও শেখ হাসান আল্ বান্না। যুদ্ধের সময় ইংরেজদের কাছে মনে হলো সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে প্রাচ্য কেন্দ্রের ধারক-বাহকগণ। সে সময়ও ব্রিটিশ রাজনীতি তার প্রথাগত লাইনের সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাজ করে যাচ্ছিল— মিসরকে আফ্রিকাতে এমনভাবে বিছিন্ন করে রাখতে হবে যাতে প্রাচ্যের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তার কোন প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ করতে না পারে। একই সময়ে পরিস্থিতির চাপে এবং ঐতিহাসিক সত্যের গভীর উপলব্ধি থেকে মিসরের প্রাচ্যপন্থী বলয়টি সুস্পষ্টভাবে তার ভবিষ্যতের দিকচক্রবালটি দেখতে লাগল। ইতিহাস আবার নিজের পথ করে নিল— এমন সব লোকেরই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যারা তার বিপরীত ধারায় কাজ করে যাচ্ছিল।

এক কথায় বলতে গেলে স্বয়ং সেই ইংরেজরাই আবার আরব আন্দোলনের কাজ শুরু করার জন্য লাইসেন্স প্রদান করল। এভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যা ঘটেছিল বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে তাই আবার ভিন্নতর পন্থায় ফিরে এলো।

দুই পতাকার সেই ফয়সালাকারী যুদ্ধ, যা হিটলারের সুয়েজখাল হয়ে সিরিয়া-ইরাক এমনকি তারও ওধারে পৌঁছার স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছিল। এ লড়াইয়ের আগে চলমান যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অনিবার্য প্রয়োজনে গোটা আরব প্রাচ্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার এক পূর্ণাঙ্গ সদস্য এক ব্রিটিশ মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত হলো, যিনি মধ্যপ্রাচ্যেই থাকতেন। যুদ্ধ-পরিস্থিতির কারণে যাতায়াত ও যোগাযোগ মাধ্যমের সমস্যার কারণে এই মন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্যের এ অঞ্চলে রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই কার্যত প্রশাসকে পরিণত হলেন।

এ যুদ্ধের ভিতর দিয়ে একটি বিরাট বাস্তবতা বেরিয়ে এলো, যদিও তা কেউ ইচ্ছা করে আনেনি। তা হলো, ফোরাত অববাহিকা থেকে নীল নদের অববাহিকা পর্যন্ত— যার মাঝখানে রয়েছে সিরিয়া— এ অঞ্চলটি হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের মিসরীয় পাঁজরের একটি পূর্ণাঙ্গ পাঁজর— একটি একক ইউনিটে পরিণত হয়ে গেল। এর রয়েছে কিছু যৌথ বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক সম্পূরণ, যা বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। এর রয়েছে এমন নিরাপত্তাগত গুরুত্ব যা তার আবেদনগুলো থেকে আলাদা করা মুশকিল। তাছাড়া রয়েছে অবিচ্ছিন্ন স্বার্থ ও অনন্য এক সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য। এছাড়াও এর ভারকেন্দ্রও একটি— কায়রো, যার বদল পাওয়া ভার।

ঠিক এ সময় কবি, শিল্পী আর লেখকদের বোনা রেশমী সুতার প্রকৃত ধাতবের পরিচয় পাওয়া গেল। হঠাৎ করেই যেন সেই রেশমী সুতাগুলো লোহার সেতুতে পরিণত হয়ে গেল। সেই স্থায়ী অবস্থানকারী ব্রিটিশ মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃত্ব এ অঞ্চলের প্রতিটি বিষয়েই তাদের খবরদারি বিস্তার করে চলল— উৎপাদন, সাপ্লাই, যাতায়াত, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সব কিছুতে। পাশাপাশি যুদ্ধে জার্মানী, ইতালী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ তো রয়েছেই।

আর এটা সম্ভব হবে না, যদি না তার সাথে, তার আগে ও তার পেছনে খোদ এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা থাকে। এর ভেতর-বাহিরে যা হচ্ছে এর সাথে একটা যোগাযোগ অবশ্যই থাকা চাই-ই। বিশেষ করে সেখানে আগে থেকেই ঘাঁটি রয়েছে, আরও হচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন বস্তুর শক্তিতে একটি সেতুবন্ধন পাকাপোক্ত হয়ে আছে। মোট কথা যুদ্ধের বছরগুলোতে চাই এ অঞ্চলের কাছাকাছি স্থানেই লড়াই হোক বা সামরিক বাহিনী দূরবর্তী অন্য ময়দানে থাকুক— মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলটি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে। এগুলো ছিল কোন জটিলতা বা ব্যবধান ছাড়াই পরস্পর সম্পৃক্ত। কারণ, এগুলো ছিল অভিন্ন কৌশলগত নাট্যমঞ্চের ওপর অবস্থিত।

সম্ভবত ব্রিটিশ সরকার অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই সব ঘাঁটি আর সেতুকে এখতিয়ার দিয়েছিল যেন এগুলো বিভিন্ন বাস্তবতা উদঘাটন, বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন

এবং বিভিন্নপন্থী আন্দোলনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের ভূমিকা রাখতে পারে। অবশ্য ব্রিটেন এটা করেছিল তার নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনেই। এর অনেক কিছুই ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরই পুনরাবৃত্তি। তবে ব্রিটিশ সরকার আশা করেছিল যে, মধ্যপ্রাচ্য কোন অংশীদার ছাড়া কেবল ব্রিটেনের পক্ষেই কাজ করে যাক। সে ভেবেছিল যে ফ্রান্স আরও একবার এই অঞ্চলে ভাগাভাগিতে অংশ নিয়েছিল, সে এই ভাগাভাগি থেকে তখনই বের হয়ে গেছে। যখন ১৯৪০ সালে হিটলারের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জেনারেল বেটান-এর নেতৃত্বে এক ফ্যাসিবাদী শাসন। পাশ্চাত্যে ফ্রান্সের পতনকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে ব্রিটেন প্রাচ্যে তার সম্পত্তির দিকে হাত বাড়াল সিরিয়া ও লেবাননের দিকে। ফ্যাসিবাদী সরকারের অনুগত প্রশাসনকে সেখান থেকে বের করে দিল এবং জেনারেল (জাম্বো) ওয়েলসনের কমান্ডে একটি বাহিনী সহযোগে মুক্ত বৈরুত ও দামেস্কে প্রবেশ করল।

কিন্তু পাশ্চাত্য যুদ্ধের অনিবার্য প্রয়োজনে ফ্রান্সের সাথে শান্তি আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তখন ফরাসী নেতা ছিলেন 'দ্য গল'। এ সময় তিনি তাঁর সরকারসহ লন্ডনে শরণার্থী ছিলেন।

স্বাধীন ফ্রান্স আন্দোলন ও তার নেতা 'দ্য গল'-এর গ্রহণযোগ্যতা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে এবং সময় আসলে ইউরোপে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার আশায় ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স তথা দ্য গলকে আবার সিরিয়া ও লেবাননে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিল। কিন্তু সমস্যা হলো 'দ্য গল' তাঁর অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্ব এবং ফ্রান্সের বিশালতার কল্পনায় বিষয়টিকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সিরিয়াসলি গ্রহণ করেন এবং কার্যত সিরিয়া ও লেবাননে তার প্রশাসনকে একটি শাসক কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য করেন। এদিকে ব্রিটেন সিরিয়া ও লেবাননে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছিল। পরিস্থিতির এই অনিরুদ্ধ ও দ্রুত পট পরিবর্তন তাদেরকে ফ্রান্স থেকে মুক্তি লাভের ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দেবে বলে ভাবল।

আবার গোয়েন্দা বিভাগের এক ব্রিটিশ জেনারেল কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি জেনারেল সেবার্জ। তিনি শামের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ শুরু করলেন। এ সময় হঠাৎ কিছু সময়ের জন্য জেনারেল দ্য গল তাঁর স্নায়ুবিক শক্তি হারিয়ে ফেললেন। তিনি ফরাসী গভর্নর জেনারেলকে (ডিসেম্বর ১৯৪৩-এ) অনুমতি দিলেন যেন দামেস্ক ও বৈরুতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের বন্দী করে দূরের জেলখানা আর দুর্গগুলোতে পুরে রাখে।

এদিকে ব্রিটেনও ফরাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে সক্ষম হলো না। এভাবে সে আরব গণআন্দোলনকে তার নিজের প্রতিক্রিয়া নিজের মতো করে প্রকাশ করার জন্য ছেড়ে দিল। তবে এ সময় মিসরের প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা নাহ্হাস কায়রো থেকেই ফরাসী

ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের নেতৃত্ব দিলেন। যখন এ অঞ্চলের দিকচক্রবাল থেকে যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন আর বেশি দূরে নয় এই অজুহাত দেখিয়ে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে এক ডোজ চাপ দিল, সাথে সাথে দ্যা গল পিছু হটতে বাধ্য হলো। সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতার ঘোষণা জারি করলেন। এ অঞ্চলকে ঘিরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘাত ও কোন্দলকে বাদ দিলে এ ছিল জাতীয়তাবাদী শক্তির এক ভাল অভিজ্ঞতা।

ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী এন্থোনী এডেন কমন্স সভায় দাঁড়িয়ে ১৯৪২ সালের বসন্তে ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধের পর ব্রিটেন আরব জাতিসমূহের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য বাস্তবায়নে তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখবেন। এডেন-এর জবানে এই প্রথম স্পষ্ট ঘোষণায় ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী মিসরের প্রতি ইঙ্গিত করেনি। বরং তাকে ছাড়াই আরবদের কথা বলেছেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই আন্তুনী এডেন আবার কমন্স সভায় দাঁড়িয়ে তাঁর ঘোষণাটি উল্লেখ করেন। এবার তিনি আরব বিশ্বের সাথে মিসরকেও যোগ করেন। এটা উনস্টন চার্চিল-এর মন্ত্রিসভায় ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রীর কোন স্বতঃপ্রণোদিত দয়ার দান ছিল না। বরং তা ছিল নতুন কিছু বাস্তবতার ডাকে অনিবার্য সাড়া। এই বাস্তবতা প্রতিদিনই স্পষ্ট থেকেই স্পষ্টতর হচ্ছিল এবং প্রতিদিনই তার জন্য নতুন জমীন অর্জন করে যাচ্ছিল। যুদ্ধের সমাপ্তিতে ইউরোপের লড়াইগুলো শেষ হওয়ার আগে মুস্তফা নাহ্হাস পাশা আরব মিসরের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন— যা সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতার লড়াইয়ে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল। এখন তিনি আরব লীগের ভিত্তি স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছেন। এই নাহ্হাস পাশাও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলেন। মিসরের অভ্যন্তরেই নানান রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পক্ষের উন্মেষ হয়েছিল এবং একটার ওপর একটা জড়ো হয়েছিল। এরই মধ্যে প্রাচ্যকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা পায়। তিনিই আলাপ-আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ সালের শরতে 'আরব লীগের অঙ্গীকারে' স্বাক্ষর করেন। ছন্দপতনের বিষয়টি ছিল এই যে, তিনি আরব লীগ অঙ্গীকারে সই করলেন অথচ পরদিনই তার বহিষ্কারের ঘটনাটি ঘটল।

দ্বিতীয় কারণটি হলো, যুদ্ধ পরিস্থিতি আল-ওয়াফ্দ-এর নেতৃত্বের ধরনেও প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এই শক্তিশালী দলের শক্তি কেন্দ্র এখন প্রথম দিককার কঠিন বছরগুলোতে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষিত শ্রেণী থেকে বড় জমিদারদের নিকট হাত বদল হলো যারা সব সময়ই একটি মাঝামাঝি সমাধানেই আগ্রহী ছিলেন, যাতে তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা পায়। এতে তারা মূল ওয়াফ্দ আন্দোলন ও এর রাজনৈতিক ও

সামাজিক ধারা থেকে সরে পড়ল। যুদ্ধের বছরগুলো আর এর পরিস্থিতি আরও একটি স্থানে তার কাজ একটু বেশি করেছিল। সেটা হলো রাজপ্রাসাদ— যা ছিল বেশ কিছু বছর ধরে মিসরীয় রাজনীতিতে প্রাচ্যনীতির ব্যাঙ্কার।

যে বাদশাহ্ ফারুককে যুদ্ধের সূচনায় দেখা গিয়েছিল এক জাতীয়তাবাদী প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ, যুদ্ধের শেষে তাঁকে দেখা গেল আরেক লোক। বস্তুত তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনে অনেক সুস্পষ্ট কারণ ভূমিকা রেখেছিল।

৪ ফেব্রুয়ারির মতো আরেকটি ঘটনার প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। এখানে তিনি বড় অপমানের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার মাইলস ল্যাম্বসন (পরবর্তীতে লর্ড কিলার্ন) এমন ব্যবহার করেছিলেন যেন একটি দুষ্ট বালক তার মুখে এক টুকরো মিষ্টি পাওয়ার যোগ্য নয় বরং পাছায় লাথি পাওয়ার যোগ্য। এ ছিল এক তিক্ত অভিজ্ঞতা যা থেকে স্বদেশী গ্রুপগুলোর প্রতি তার গভীর ঘৃণা জন্মেছিল। আল্-ওয়াফ্দ পার্টি ছিল এই স্বদেশী আন্দোলনেরই তৎকালীন মুখপাত্র। এ ছাড়া বাদশাহ্ একজন মানুষ হিসাবে কিছু ব্যক্তিগত কষ্টেরও সম্মুখীন হন। কারণ তাঁর মা রাণী নাযলী তাঁর সচিবালয় প্রধান আহ্মদ হাসনাইনের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যদিও তা ঢাকার চেষ্টা হিসাবে পরবর্তীতে প্রথাগত বিবাহও সম্পন্ন হয়। এ ছিল বাদশাহ্র অহঙ্কারে এক আঘাত।

আসলে যা হয়েছিল, রাণীমাতা ছিলেন সামান্য ভারসাম্যহীন ব্যক্তিত্ব। এর একটি নজির হচ্ছে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলোতে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করবেন। নাযলী তাঁর সাথে আমেরিকায় বসবাসকারী দুই কন্যা ফায়েয়াহ ও ফাদিয়্যাহ'র উপর প্রভাব ফেলেছিলেন। উভয়ই ক্যাথলিক খৃস্টান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এর চেয়েও জঘন্য ছিল যে, কেবল তাঁর মা-ই তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বরং তার স্ত্রী ফারীদাহও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। (যদিও এ ব্যাপারে রোষ উদ্রেককারী চিত্রায়ণ না করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাদশাহ্ ফারুকের বিপর্যয়ের আড়ালে এ স্ক্যান্ডালগুলো যে কতদূর প্রভাব ফেলেছিল তা তুলে ধরাই উদ্দেশ্য ছিল)। তিক্ত সত্য হলো, প্রাসাদের প্রামাণ্য কাগজপত্র আর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ডকুমেন্টগুলো যুবক বাদশাহ্ আর তার যুবতী স্ত্রীর অস্থির সম্পর্কের কাহিনীতে ভরা।

বাহ্যত মনে হয়, উভয়ের মধ্যে বয়সের সমতা ফারীদাহ্র মধ্যে তার চেয়েও বেশি পরিপক্ক একজনের অভাববোধ জাগিয়ে তুলেছিল। আর তাই তিনি ওয়াহিদ ইউস্রা পাশার প্রেমে পড়ে যান। সে ছিল বাদশাহ্র চাচাতো ভাইয়ের মতো। (বরং তার চেয়েও খারাপ। কারণ তার মা বেগম শোয়েকার ছিলেন বাদশাহ্ ফুয়াদেরই প্রথমা স্ত্রী)।

কিন্তু যা মনে হয়, রাণী ফারীদাহ্র সমস্যাটি ছিল আরও গভীর। কারণ প্রাসাদের প্রমাণাদি এবং ব্রিটিশ দূতাবাসও পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রামাণ্য কাগজপত্র অনুসারে তিনি ব্রিটিশ সেনা অফিসার ক্যাপ্টেন সিমন এলওয়াইস-এর সাথেও অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি যুদ্ধের আগে ছিলেন এক প্রতিশ্রুতিশীল চিত্রশিল্পী। মিসরে তার চাকরির সুবাদে তিনি বড় বড় পরিবারের সাথে পরিচিত হন। এভাবে তিনি কিছু বড় ব্যক্তিত্বের ছবিও এঁকে ফেলেন। এর মধ্যে রয়েছে বেগম নাহিদ সের্রি-এর চিত্র। তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী হোসেইন সের্রি-এর স্ত্রী। একই সময়ে তিনি ছিলেন রাণী ফারীদাহর স্বামী। এভাবেই সিমন এলওয়াইস সর্বপ্রথম রাণীর তেলচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করেন।

এরপর সে অজুহাত দেখাল যে, প্রাসাদের ভিড় তাঁর মনোযোগ নষ্ট করে দেয়। তাই তিনি ছবিটির বাকি কাজ সম্পন্ন করার জন্য রাণীকে তাঁর চিত্রাঙ্কন স্থলে ডেকে আনলেন। এরপর দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের বিবর্তন ঘটল। যখন সম্পর্কটি প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্বয়ং এই অফিসারের সাথে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করলেন। এ সময় অফিসারটির উন্নাসিকতা এতদূর গড়াল যে, সে বলেই ফেলল— "সে ছবির বিষয়কে সরাসরি অনুভব করা ছাড়া কোন ছবি আঁকতে পারে না।" এরপর ২৪ ঘণ্টার ভিতর এ সেনা অফিসারকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। (এ গল্পটির বিস্তারিত রয়েছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সেন্ট এন্টিনিউ কলেজ লাইব্রেরীতে রাখা লর্ড কিলার্ন-এর হাতে লেখা ডায়েরীতে।) মনে হয় বাদশাহ্ ফারুক তাঁর প্রথম বিবাহে যা ঘটেছিল তার জন্য শেষ বয়সে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মারা গেছেন। ফারীদাহ্র গর্ভজাত তিন মেয়ে— ফারিয়াল, ফাযেয়াহ ও ফাদিয়্যাকে উভয়ের মধ্যে যা ঘটেছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর ফলে এই তিন কন্যা তাদের মায়ের সাথে সম্পর্ক এমনভাবেই বিচ্ছিন্ন করল যে, তার মৃত্যুশয্যায়ও তার সাথে সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সম্ভবত তাঁর এইসব পারিবারিক দুঃখ-বেদনার পাশাপাশি কিছু অসম্পূর্ণতার কারণও ছিল যা তাঁর ব্যক্তিত্বে ঝটিকার মতো এসে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অথবা সম্ভবত কাস্সাসীন গ্রামে যে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে তার মাথার আঘাতটি ছিল দুরারোগ্য, সেটাও একটা কারণ হতে পারে। তারপর চূড়ান্ত বাস্তবতা হচ্ছে, দুঃখজনক হলেও এই যে, মিসরের এই বাদশাহ্ যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথমদিকে ছিলেন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এক জাতীয়তাবাদী যুবক তিনিই যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে হয়ে গেলেন থলথলে চর্বির একটি পিণ্ড, যে শুধু মর্যাদা আর সুখ খুঁজে ফিরছেন, অথচ এ দুটোর কোন চিহ্নই খুঁজে পাচ্ছেন না। মিসরের তরুণ বাদশাহ্ ছিলেন একটি অঙ্গীকার। কিন্তু সে অঙ্গীকার তার ওয়াদা খেলাফ করেছে!

যা কিছুই হোক না কেন, একথা সত্য যে, মিসরই আরব লীগে স্বাক্ষর করেছিল কেবল বিভিন্ন বিষয়ের শক্তিতে, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা নাহ্হাস এমন অবস্থায় ছিল না যে ভবিষ্যতের জন্য কোন পরিকল্পনা করতে পারে। আর যুবক বাদশাহ্— যাকে রাজত্বের প্রথম বছরগুলোতে স্বপ্ন তাড়িয়ে ফিরেছে— তার সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি তাকে স্বপ্ন হারাতে বাধ্য করেছিল কিনা। সেটা আলাদা কথা।

এভাবেই মিসর দেখল সে আরব বিশ্বে প্রবেশ করছে। তখনও সে তার পদক্ষেপ সম্পর্কে আস্থাবান ছিল না। সেটা ছিল তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতির বাস্তব প্রভাব। হয়ত এক্ষেত্রে আরও কিছু কার্যকারণও সক্রিয় ছিল।

॥ ৩॥

রাব্বি হায়েম নাহুম

"খৃস্টানরা আল-কুদ্‌সকে ছেড়ে রোমে চলে গেল। মুসলমানরা তা ছেড়ে চলে গেল মক্কায়। কেবল ইহুদীরাই তার জন্য কেঁদেছে।"

— বাদশাহ্ ফারুক-এর প্রতি প্রধান রাব্বি হায়েম নাহুম আকেন্দ

মিসরকে তার আরব পরিচয় থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিতে যেসব বাড়তি বিষয়াদি কাজ করেছিল তার মধ্যে ছিল একটি ইহুদী লবির শক্তিশালী অস্তিত্ব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ফিলিস্তিনে ইহুদীবাদী (জায়নিস্ট) প্রকল্প আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে ইহুদী লবির ভূমিকাও ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং তারা মিসরে ব্রিটিশ দখলদারীকে কোননা কোনভাবে সমর্থন যুগিয়ে যেতে লাগল।

প্রাচীন যুগ থেকেই মিসরে একটি ইহুদী লবি ছিল। কিন্তু খেদিভ ইসমাঈলের যুগ পর্যন্ত এবং সরাসরি ব্রিটিশ দখলদারীর আগ অবধি মিসরে ইহুদীদের সংখ্যা সাত হাজারের বেশি ছিল না। এরা কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় কেন্দ্রীভূত ছিল। কায়রোতে একটি সনাতন ইহুদী মহল্লা ছিল। এটি ছিল কায়রো শহরের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্রের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত একটি কর্মব্যস্ত মহল্লা। আলেকজান্দ্রিয়াতে ইহুদীদের কয়েকটি দল ছিল যাদেরকে ভূমধ্যসাগরীয় সমাজের একটি অংশ ধরা যায়। এদের অধিকাংশ পরিবারই হলো স্পেনে ক্যাথলিকদের প্রত্যাবর্তনে যেসব মুসলিম ও ইহুদী সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এরা পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত প্রায় পূর্ণ বৃত্তের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এদের অনেকেই আবার মিসরের মাধ্যমে প্রাচ্যের সাথে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সোনালী যুগে— জানুয়া, ফিনিসিয়া ও ফ্লোরান্সা-র মতো ইতালীয় শহরগুলোর সাথে ব্যবসায়িক এজেন্ট ও দালাল হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। কিন্তু মিসরে ব্রিটিশ দখলদারী শুরু হওয়ার সাথে বেশ কিছু ইহুদী এখানে আসতে শুরু করল। এভাবে এক পরিসংখ্যানে দেখা গেল যে, মিসরে ইহুদীদের সংখ্যা হঠাৎ করেই ব্রিটিশ পূর্ব সময়ের ৭ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৭ সালে ৩৮,৬৩৫–এ উন্নীত হলো। এভাবে বৃদ্ধি পেতেই থাকল। ১৯২৭ সালের পরিসংখ্যানে আশ্চর্যজনকভাবে দেখা গেল, মিসরে ইহুদীদের সংখ্যা এরও প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল। সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ৬৩,৫৫০ জন। আর যেহেতু মিসরে অভিবাসী ইহুদীদের

অধিকাংশই এসেছিল বিভিন্ন আরব দেশ থেকে (যেমন, মরক্কো) বা ইসলামী দেশ থেকে (যেমন, তুর্কিস্তান) যে কারণেই মিসরের জীবনযাত্রার সাথে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে মিশে যাওয়াটা ছিল খুবই সহজ ব্যাপার। এটা আরও সহজ হয়েছিল এজন্য যে মিসরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাথাওয়ালারা অধিকাংশই হচ্ছে অন্য দেশের বংশ থেকে উৎসারিত। এভাবেই মিসরে ইহুদীরা দ্রুত সাধারণ জীবনের অন্যতম সুতায় পরিণত হয়ে গেল। বিশেষ করে অর্থনৈতিক তৎপরতা এবং সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে। এ সময়েই কাতাবী, মুসেরী, মেন্‌শাহ্‌, শেকুরিল, সেওয়ার্স, রুলো ও সাসুন ইত্যাদি ইহুদী পরিবার আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং নাম কুড়িয়েছিল।

যখন ১৯০২ সালে থিওডর হের্তুজাল বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে মিসরে এসেছিলেন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র অথবা সিনাই অঞ্চলে সামরিক সমাবেশের স্টেশন, তখন তিনি প্রথমত তাঁর যোগাযোগের জন্য নির্ভর করেছিলেন কিছুসংখ্যক ইহুদী পরিবারের সাথে, বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়াতে, এখানেই খোদ হের্তুজাল একটি জায়নবাদী সংস্থা গঠন করেছিলেন, যারা তার সফরের পর এই সব পরিকল্পনার প্রতি আহবান জানানোর দায়িত্ব তুলে নিতে পারে। এর পর তারা মিসরে জায়নবাদী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করবে। এ সকল সংগঠন ও তাদের শাখাগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত বেশ সক্রিয় ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাশিয়া থেকে বিপুল সংখ্যক ইহুদী অভিবাসী ফিলিস্তিনে পৌঁছাবার চেষ্টা করে। যেহেতু সে সময় ফিলিস্তিন তুর্কীদের শাসনাধীন ছিল তাই ইহুদী এজেন্সী সেই সব অভিবাসীকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠায়। সেখানে এডগার সোয়ার্সের নেতৃত্বে একটি ইহুদী লবি তাদেরকে স্বাগত জানায় এবং পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। ১৯১৫-এর ডিসেম্বর মাসে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছা ইহুদীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১,২৭৭ জনে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের মিসরে প্রবেশের সুব্যবস্থা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সে চাইল, মিসরী অনুমোদন তাদের এই সিদ্ধান্তকে আরও জোরদান করুক। এ সময় এডগার সোয়ার্স মিসরের সুলতান হুসাইন কামেল ও প্রধানমন্ত্রী হুসাইন রুশদী পাশাকে বুঝিয়ে সেই সব অভিবাসীদের মিসরে প্রবেশ ও বসবাসের অনুমতি লাভের দায়িত্ব নেন। বাস্তবিকই সুলতান ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ই তা অনুমোদন করেন এবং এই মর্মে নির্দেশ জারি হয় যে, আলেকজান্দ্রিয়ার আল্‌-কেবারী অঞ্চলে তাদের স্বাগত জানাবার জন্য বিরাট শিবির স্থাপন করা হোক।

সেই সব অভিবাসীদের আল্‌-কেবারী শিবিরে সময় নষ্ট হয়নি। ইহুদী সম্প্রদায় সেখানে তাদের জন্য কিছু অর্থপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঃ

* হিব্রু ভাষা ও ইহুদী ইতিহাসের নিবিড় শিক্ষা দেওয়া হয়।

* .ক্রীড়ার ছলে সেখানে প্রথম থেকেই লাগাতার সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে থাকে।
* তারপর সেখানে জায়নিস্টদের ভর্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ভ্লাদিমির জাবুতনস্কীর মতো বড় বড় ধর্মপ্রচারক সেখানে কাজ করছিল।

ব্রিটিশ ডকুমেন্ট অনুযায়ী দেখা যায়, জুলাই ১৯১৬-এ মিসরের ইহুদী সর্দার মূসা কাতাবী পাশা ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল মাক্সোয়েলের সাক্ষাতে যান। তিনি তার কাছে আবেদন জানান যে, ফিলিস্তিন ও পরে শামে তুর্কীদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নেওয়া জেনারেল লেনবের বাহিনীর হয়ে কয়েকটি ইহুদী ব্যাটালিয়ন গঠনে যেন অনুমতি দেন। জেনারেল মাক্সোয়েল এতে সম্মতি দেন এবং জেনারেল লেনবের-এর বাহিনীতে ইহুদী ব্যাটালিয়নগুলোকে সংযুক্ত করার সুযোগ করে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অধিকন্তু তাদেরকে তাদের ক্যাপে দাউদ তারকা (ডেভিড স্টার) লাগাতেও অনুমতি দেন, যাতে তারা যে ইহুদী ব্যাটালিয়ন তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়।

এ তো ছিল সূচনা। এরপর মিসরের ইহুদী পাঠাগারগুলো সম্ভবত কোন পরিকল্পনা ছাড়াই ইচ্ছেমত বিভিন্ন সার্ভিসে প্রতিযোগিতা করতে লাগল, যেন এটাই ইহুদী জাতির ভবিষ্যতের ইস্যু।

ফিলিক্স মিনশা নামের এক বিশিষ্ট ইহুদী একটি সাধারণ মহাসম্মেলনের ডাক দিলেন, এতে মিসরের প্রত্যেকটি ইহুদী সংঘ শামিল হল। ফিলিক্স মিনসা কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে সমন্বিত একক সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশই মূল লক্ষ্য ছিল ঃ

* ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র রচনার প্রক্রিয়াতে সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।
* মিসরের মধ্যমে ফিলিস্তিনে অভিবাসনের সংগঠিত আন্দোলনকে সুসংহত ও সাহায্য করার লক্ষ্যে চাঁদা সংগ্রহ।
* ফিলিস্তিনে একটি হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা এবং এ উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করা। (আল্-কুদ্সে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল পরিপ্রেক্ষিত)।
* ফিলিস্তিনে একটি আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য রিপোর্ট পেশ এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা (এটাই ছিল আল্-কুদ্সে হাদাসা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পূর্ব প্রস্তুতি)।

ইহুদী পরিবারগুলোর জায়নবাদী কর্মতৎপরতা এবার এক মারাত্মক মোড় নিল। ১৪ আগস্ট ১৯১৮ তারিখে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিলিস্তিনভিত্তিক সকল ইহুদী সংস্থার এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভার সভাপতি হলেন হায়েম ওয়াইজম্যান। এই ওয়াইজম্যানের প্রচেষ্টা এবং বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থার প্রচেষ্টায় (যার সভাপতিও ছিলেন ওয়াইজম্যান) সে সময় 'বেলফোর কমিটমেন্ট' ঘোষিত হয়।

মনে হয় ইহুদী লবিগুলোর এই ক্রমবর্ধমান কর্মতৎপরতায় কায়রোর ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রধান রাব্বি— রাফায়েল হারুন বিন সীমন টেনশনে পড়েন। যে কারণে তার ও মিসরের ইহুদী পাঠাগারগুলোর বড় বড় গোত্রপতিদের সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এই সংঘাতের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ১৯২১ সালে মিসরে প্রচারিত একটি বিবৃতিতে দেখা যায়— "মিসরের ইহুদী সম্প্রদায় পরিষদ ও রাব্বি রাফাঈল হারুন বিন সীমোনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হলে রাব্বি তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, তার জীবনের শেষ পর্যন্ত আল্-কুদসেই নির্জন জীবন যাপন করবেন।"

এ কারণে মিসরের ইহুদী সম্প্রদায় পরিষদ অন্য একজন রাব্বি নির্বাচন করলেন। তিনি হচ্ছেন– হায়েম নাহুম আফেন্দী। ইনি ছিলেন ইস্তাম্বুলের রাব্বি। তিনি মিসরে এলেন, এখানে তার জন্য বিরাট ভূমিকা অপেক্ষা করছে, তিনি এই ভূমিকা পালনে যোগ্যও বটে। ইনি ছিলেন মেধাবী এবং প্রাচ্যের ভাষাগুলো সম্পর্কে বিশাল ব্যুৎপত্তির অধিকারী।

রাব্বি হায়েম নাহুম আফেন্দী এখানে আসার মাস ছয়েকের মধ্যেই বাদশাহ্ ফুয়াদের বন্ধু ও উপদেষ্টা বনে গেলেন। তুর্কী ডকুমেন্টে পাওয়া তথ্য অনুসারে 'মিসরী খেদিভগণের' অধিকার ও স্বত্বাদি সম্পর্কে একটি সমীক্ষা প্রস্তুতের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তার ওপর। এটা ছিল খেলাফত ও আলে উসমান থেকে তার উত্তরাধিকারের বিষয়ে বাদশা ফুয়াদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে। এরপর হায়েম নাহুম আফেন্দী তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি মিসরের সিনেটে সদস্যপদ লাভ করলেন। পরবর্তী পদক্ষেপে তিনি আরবি ভাষা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য হয়ে গেলেন। মিসরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের একজন প্রভাবশালী বন্ধু হতেও দেরি হলো না। প্রাসাদের ভিতরে ও বাহিরে সমভাবে তার বিচরণ চলল।

অবশ্য হায়েম নাহুম আফেন্দীর এই ভূমিকা পালনে পরিস্থিতিও ছিল তার অনুকূলে।

* এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইহুদী ইউসুফ কাতাবী পাশা কয়েকটি মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী ছিলেন।
* আরেকটি উদাহরণ হলো— কিছু সংখ্যক ইহুদী কংগ্রেস ও সিনেটের সদস্যপদ লাভ করেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন— রিনিয়া কাতাবী বেগ ও ডি বেচতু বেগ।
* এমনি করে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ইউসুফ কাতাবী পাশার স্ত্রী অবলীলায় রাণী নাযলী'র সিনিয়র সোহেলী হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন দক্ষিণ আফ্রিকার ওজওয়াল্ড ফেনী নামক একজন ইহুদী বিজ্ঞাপনের একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন যা অনেক ইংরেজি ও ফরাসী পত্রিকা প্রকাশ করে। এর মধ্যে

ছিল ইজিপশিয়ান মেইল, ইজিপশিয়ান গেজেট ইত্যাদি। এই অরিয়েন্টাল এ্যাড কোং মিসরের বিকাশমান বিজ্ঞাপন বাজারে পুরো আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। এ জন্য মিসরের জাতীয় পত্র-পত্রিকার ওপর এর বিশেষ প্রভাব ছিল।

এ সবের পাশাপাশি রাজপ্রাসাদে ইহুদীদের একটি বড় লবিং ছিল। কারণ মাদাম সোয়ার্স বাদশাহ্ ফুয়াদের প্রেমিকা ছিলেন। এ বিষয়টি ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যার বেরসী লরেন লক্ষ্য করে একাধিকবার তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করে লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন।

মিসরের ইহুদীদের স্বপ্ন ছিল ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে এ থেকে যে, মিসরের ইহুদী সম্প্রদায় ফিলিস্তিনে একটি উপনিবেশ সৃষ্টির জন্য অনুদান সংগ্রহ শুরু করে। এগুলো নেয়া হয় অভিবাসী বসতি স্থাপনকারীদের নামে। এই উপনিবেশটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ৩০ হাজার মিসরী পাউন্ড ব্যয়ে। এটি ১৯৩৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। তখন এর নাম দেয়া হয় 'কাফার জুদিয়া'— ইহুদী পল্লী। মিসরী ইহুদীদের বিক্ষিপ্ত বাসনা তখনও প্রধান রাব্বি নিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি জানতেন, মিসরে ইহুদীদের সংবেদনশীল অবস্থানের কথা। কারণ তাঁর মতে, এ তো একটি আরব দেশ অথচ রাব্বি তো কেবল ফিলিস্তিনেই ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অধিকার স্বীকার করেন। তবে তিনি সকল পক্ষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। তাঁর এই সতর্কতা এ পর্যায়ে ছিল যে, মোসেরী পাশাকে অনুরোধ করেন যেন বড় ইহুদী অর্থ যোগানদাতা লিউন কাস্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জায়নিজম আন্দোলনের জন্য অনুদান সংগ্রহের কাজে কিছুটা ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হন। কারণ এটা পাছে মিসরে ইহুদীদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। যার এখন কোন প্রয়োজন নেই।

দু'টি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে হায়েম নাহুম আফেন্দীর নির্দেশনায় মিসরে ইহুদীদের প্রভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। তাদের কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে এটা প্রমাণ করেছিল যে, তারা বিশাল যোগ্যতা ও কর্মচাঞ্চল্যের অধিকারী। বিদেশীদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি তাদের এক রকম নিরাপত্তা বিধান করেছিল, যা তাদের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করে। যেমন অনেক অভিবাসী ইহুদী, যারা বেশ অর্থকড়ির মালিক হওয়ার পর তাদের সুযোগ এসে গেল যে, আইনের সামনে বিদেশীদের জন্য প্রদেয় সুবিধাদির সুযোগ গ্রহণ করে ফরাসী, ইতালীয় বা স্পেনিশ পাসপোর্ট সংগ্রহ করে। তারা অন্যদের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও বিদেশীদের সুযোগ-সুবিধা পেত। এভাবেই মিসরের অর্থ ও শিল্প কোম্পানীগুলোর প্রশাসনিক বোর্ডের ৩৯ ভাগ আসন ইহুদীরা দখল করে নেয়। এটা ছিল তাদের নাগরিক জনসংখ্যা অনুপাতে শত শত গুণ বেশি। তাদের সকল আর্থিক আধিপত্যের ভিত্তিতে তাদের কিছু পরিবারের অংশগ্রহণের

মাধ্যমে মিসরেই তারা একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করল। এসব কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে চেকোরিল ও মুসেরীর নাম ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষ কিছু কৃষি কোম্পানীর ওপর তাদের প্রায় পুরো আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যে 'ওয়াদী কোম এম্বো কোং' 'আরাদীল বুহাইবা কোম্পানী' ও 'শেখ ফাদলুল্লাহ কোম্পানী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিশাল আয়তনের অর্থনৈতিক প্রভাবের বদৌলতে তারা মিসরের সে সব রাজনীতিকের একটি বলয়কে তাদের চারপাশে জমায়েত করতে সক্ষম হলো, যারা অন্যদের চাইতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে একটু বেশি সংশ্লিষ্ট। সে সময় এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইসমাঈল সেদকী পাশা, যিনি কয়েকবার অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং মিসর শিল্প ফেডারেশনের প্রায় স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। এ প্রেক্ষিতে বলা চলে, সে সময়ে মিসরী-ইহুদী একটি উচ্চশ্রেণীর অবির্ভাব ঘটেছিল। যারা সামাজিক জীবনে এক সুস্পষ্ট ও সক্রিয় প্রভাব ফেলে চলেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফিলিস্তিনের ইহুদীরা যে 'আল-হাবিমা' যাত্রাদল গঠন করেছিল তারা কায়রোতে বিভিন্ন মৌসুমে কাজ করত।

এমনিভাবে ইহুদী সঙ্গীত দল ফিলহারমোনিয়াও মিসরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, এটি পরবর্তীতে হিব্রু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইসরাইলের প্রথম অর্কেস্ট্রায় পরিণত হয়।

তিরিশের দশকে মিসর লীগের জৌলুসের সময় আল্-কুদসের নতুন হিব্রু লীগের সাথে তার বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই লীগের পরিচালক ডঃ মাজেন্স তাঁর সহকর্মী মিসর লীগের পরিচালক লুত্ফী সাইয়্যেদ পাশাকে লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দাওয়াত দেন। লুত্ফী সাইয়্যেদ এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁর পক্ষে ডঃ তোহা হোসেন অংশগ্রহণ করে সেখানে 'প্রথম ফুয়াদ" লীগের বক্তব্য পেশ করেন।

যুদ্ধের বছরগুলোতে এবং এর অব্যবহিত পরেও যখন ইউরোপে সফর ছিল নিয়ন্ত্রিত এবং পণ্য আমদানি ছিল প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধ, তখন চেকুরেল মার্কেটের মালিক সেলভাতুর চেকুরেল গর্ব করতেন যে, তিনি ইউরোপের সবচেয়ে আধুনিক ফ্যাশনের মূল্যবান পোশাক নিয়ে আসেন। তখন তাদের অনেকেই জার্মানদের ফরাসী দখলের পর প্যারিস থেকে তাদের কারবার বোরডো ও মাদ্রিদে স্থানান্তর করেন। এদিকে তৎকালীন কায়রোর তিন শক্তিধর মহিলা—রাণী নাযলী (রাণীমাতা), লেডি কিলার্ন (ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী) ও বেগম যয়নব আল ওয়াকীল (মুস্তফা নাহহাসের স্ত্রী) সবাই তাঁদের জন্য তাঁর আমদানিকৃত পোশাকই পরতেন। এমনিভাবে রাজপরিবার ও উচ্চশ্রেণীর অনেক মহিলা তাই করতেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, যুদ্ধের বছরগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিক ছুটি কাটানোর স্থান ছিল আল কুদসের বাদশাহ দাউদ হোটেল। ১৯৪৫ সালের নববর্ষ রাত উদ্যাপনের সময় উৎসবের অডিটরিয়ামের

বিশেষ চেয়ারগুলো বুকিং করা থাকত মিসর থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য, যাতে তাঁরা আল কুদসে নতুন বছরের সূচনা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে মিসরে জায়নবাদী ইহুদী তৎপরতা চরমে পৌঁছল। এ সময় বড় ইহুদী পরিবারগুলো হিটলারের জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ থেকে পালিয়ে আসা ইহুদীদের জন্য নতুন করে শিবির স্থাপন করল। এভাবে আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মতো এই শিবিরগুলোর কাজ ছিল সাময়িক আশ্রয় প্রদান। কিন্তু সহসাই এগুলো পরিণত হয়ে যায় হিব্রু ভাষা ও ইহুদী ইতিহাস শিক্ষা এবং সামরিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসাবে। ঠিক একইভাবে আবার ইহুদীদেরকে কয়েকটি ব্যাটালিয়নে রিক্রুট করা হয়, যা অন্য আরও কিছু ইহুদী ইউনিটের অন্তর্ভুক্তিতে ব্যাপ্তি লাভ করে।

ইউরোপ থেকে আসা ইহুদীদের পর্যায়ক্রমিক অন্তর্ভুক্তিতে এক বিশাল বাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করে। এর জন্য পশ্চিম মরুভূমির আরব টাওয়ার এলাকায় সদর কার্যালয় স্থাপন করা হয়। এদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব নেন কর্নেল ওয়ার্ড উইংগেট— ইনি নানা কনভেনশনাল যুদ্ধে প্রধান ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ। এ ধরনের যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে নগরযুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ।

যেহেতু দ্বিতীয় মহাসমরের প্রেক্ষাপটে মিসর আবারও লড়াইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ময়দানে পরিণত হলো, কাজেই মিত্র সৈনিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য ইহুদীদের স্বেচ্ছাসেবার দাবিটি ছিল খুবই মুখরোচক এবং মিসরে ইহুদী ও জায়নিস্ট কর্মতৎপরতা চাপানোর এক চাল। ব্রিটিশ লবির কিছু মহিলাও এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বেশ সরগরম ছিলেন। তবে এদের সংখ্যা ছিল সীমিত। এ কাজে মিসরী সমাজের কিছু মহিলাও জড়িত ছিলেন। কিন্তু এ সব স্বেচ্ছাসেবা প্রথাগত কারণে কিছুটা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদী সমাজের মহিলাদের জন্য এ ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতাই ছিল না।

এই প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত ইহুদী (জায়নবাদী) সামাজিক কর্মতৎপরতা যে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল তা কল্পনা করাও কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এক মিসরীয় প্রিন্সেস (নাঘলী হালীম) 'হাচুমির হাতসাঈর' এর যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য তার মানসুরিয়া রোডে অবস্থিত কৃষিক্ষেত্রটি দিয়ে দিয়েছিলেন। এই 'হাচুমির হাতসাঈর' হচ্ছে ফিলিস্তিনে উপনিবেশী বসতিগুলোর পাহারাদারদের সংগঠন।

প্রতিনিয়ত এই ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টায় একটি বিচ্ছিন্ন সময় ছিল। এ সময়টি ছিল যখন দুই পতাকার 'রোমেল' বাহিনীগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হলো। দেখা গেল, মিত্র বাহিনী তা বন্ধ করতে একেবারেই অক্ষম। ফলে ইহুদীরা সুদানের দিকে ভেগে পালাল; সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে দৌড়াল, যাতে বিশাল জার্মান বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলতে না পারে। এ সময়টিতে ধনী ইহুদীরা

তাদের মিসরী বন্ধুদের কাছে মাটির দামে তাদের রিয়েল এস্টেট ও সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে দিয়েছিল। যেমন ধরুন, ইহুদী এজেন্সীর সম্পত্তি পরবর্তীতে যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং— তখনকার মুদ্রামানে তা মিসরী পাশাদের কাছে বিক্রি হয়েছিল যে দামে তা সর্বসাকল্যে দু লাখ পাউন্ডের বেশি হবে না।

কিন্তু মিসরে 'রোমেল' আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এতে পালিয়ে যাওয়া ইহুদীরা আরও বেশি আগ্রহ ও কর্মোদ্দীপনা নিয়ে কায়রোতে ফিরে এলো। মিসরের পাশাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য এমনও ছিলেন যারা ইহুদীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে প্রস্তুত ছিলেন, যদিও তাঁরা তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কিছুই ফেরত দেয়নি।

এভাবে ১৯৪৩ সালে মিসরে আবার 'জেনারেল জায়নিস্ট জে ইউনিয়ন' নামে জায়নিস্ট সংস্থা পুনর্গঠিত হলো। এর বৈঠকে যোগ দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডেভিড বেন গোরিয়ন, ইসহাক বিন যাফি (যিনি পরবর্তীতে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন)।

এই একই সময়ে মেজর আবা ইবান কায়রোস্থ ব্রিটিশ বাহিনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুখপাত্রে পরিণত হন। এই আবা ইবান (যিনি পরবর্তীতে ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন) ইনি ছিলেন একজন আরব প্রাচ্যবিদ (ওরিয়েন্টালিস্ট)। তিনি সে সময় ব্রিটিশ বাহিনীতে চাকরির পাশাপাশি মিসরের বড় লেখকদের বেশ কিছু গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এঁদের মধ্যে তাওফীক আল্ হাকীমও রয়েছেন, যার দু'টো বই 'ইবান' অনুবাদ করেছিলেন 'আওদাতুর রূহ' ও 'শাহেরজাদ'। সর্বোপরি, বাদশাহ্ ফরুক সে কাজটিই করে বসলেন যা ইতোপূর্বে তাঁর পিতা করেছিলেন— নিজের জন্য এক ইহুদী প্রেমিকা গ্রহণ করলেন ঃ ইনি এরিন কিউনিল্লি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, সে সময়টিতে মিসরে ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতারা মিসরের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে ব্যস্ত। তাদের যুবকরা কিন্তু তখন মিসরে কমিউনিস্ট আন্দোলনে পুরোপুরি মশগুল। এ সময় মিসরে তিনটি সক্রিয় কমিউনিস্ট আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে।

'হাদতু' আন্দোলন (স্বদেশ মুক্তির গণতান্ত্রিক আন্দোলন)। এর নেতৃত্বে ছিলেন পুঁজিবাদী শ্রেণী থেকে আগত এক ইহুদী— হেনরি কোরিয়েল।

আরেকটি ছিল 'এস্কারা' আন্দোলন (প্রখ্যাত 'লেনিন' পত্রিকার নাম অনুসারে স্ফুলিঙ্গ)। এর নেতৃত্বে ছিলেন হেলেন শোয়াতেজ (জার্মান বংশোদ্ভূত ইহুদী)।

আরেকটি আন্দোলন ছিল। 'তালি' আতুত্ তাবাকাহ আল 'আমেনা' (মজদুর শ্রেণীর জাগরণ)। এর নেতৃত্বে ছিলেন– র‍্যামন দুয়েক (মিসরী ইহুদী)।

এভাবেই ইহুদীরা (জায়নবাদী ও অজায়নবাদী ধারাসহ) মিসর সমাজের উচ্চ শ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার করার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী ছিলেন। যদিও

এদের ভিত্তি ছিল মেহনতী মানুষের মধ্যে। এই উচ্চ শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী তথা চূড়া ও ভিত্তিমূলের মাঝখানে মিসরী সমাজে ছিল অনেক ধরনের আন্তঃযোগাযোগ ও প্রভাব। উদাহরণস্বরূপ এ সময় শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কিছু ইহুদী ব্যক্তিত্ব বিশিষ্টতা অর্জন করেন যারা মিসরের তথ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে অসামান্য অবদান রাখেন।

উদাহরণস্বরূপ আরো বলা যায়, মুসেরি পরিবার 'ইসরাইল ম্যাগাজিন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এটি একই সময়ে তিনটি ভাষায় প্রকশিত হতো ঃ হিব্রু, ফরাসি ও আরবি ভাষায়। মিসরী সাংবাদিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তখন বেশ কিছু ইহুদীও ছিল। 'আল আহরাম' পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের পরেই সবচেয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন হায়েম এডাগম্যান। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। অনুরূপভাবে দৈনিক 'আল মিসরী' পত্রিকার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন ঈলী পোলিতী। ১৯৪৪ সালে 'আখবারুল ইওম' (আজকের খবর) প্রতিষ্ঠালগ্নে এর লন্ডনস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা ছিলেন জন কেমশী (বিখ্যাত 'মোশাদ'-এর দায়িত্বশীল ও পরবর্তীতে ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড কামশী'র চাচাতো ভাই।) অনুরূপভাবে নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতা ছিলেন জোয়েভ লেভি। পরে জানা গেল যে, তিনি ইহুদী এজেন্সীর আওতায় গোয়েন্দা তৎপরতা সংগঠনের এক বিশিষ্ট লোক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে ইহুদীদের এ উপলব্ধি এলো যে, ফিলিস্তিনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় হয়ে গেছে, কারণ মিসরে জায়নিস্ট সংস্থাগুলোর ফেডারেশন এখন আরও বেশি দুঃসাহসিকভাবে তৎপর হয়েছে। তারা অনুভব করে যে, জায়নবাদী স্বপ্ন এখন যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। ফেডারেশন অব জায়নিস্ট অর্গানাইজেশন, ইজিপ্ট, ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আলেকজান্দ্রিয়ায় এক বিরাট মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। এটি হয়েছিল এক বড় তুলা ব্যবসায়ী— আলবের বোয়ানো'র বাড়িতে। এই সভার সংগঠক ছিলেন এলি বোলতে (তৎকালীন আলেকজান্দ্রিয়াস্থ 'আল মিসরী' পত্রিকা অফিসের পরিচালক), সম্মেলনে মূল বক্তা ছিলেন ডঃ ফিলেক্স এলিটম্যান— যিনি এ সময় ফেডারেশনের সভাপতি হয়েছিলেন। এই এলিটম্যান-এর উদ্বোধনী বক্তব্যে ছিল একটি সতর্কীকরণ ঃ "ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় সমাগত। যদি তারা তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় তাহলে তা যুদ্ধ করে হলেও বাস্তবায়ন করে ছাড়বে।" তখন এর প্রতি আলেকজান্দ্রিয়ার পুলিশ হুকুমদার-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন এ পদে ছিলেন মেজর জেনারেল জর্জ গেজ পাশা। তিনি মিসরস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড কিলার্ন এবং দূতাবাসের প্রাচ্য বিষয়ক কাউন্সিলর স্যার ওয়াল্টার স্মার্ট-এর দৃষ্টি আর্কষণ করে পত্র লেখেন যে, মিসরে জায়নবাদী তৎপরতা মনে হয় গ্রহণযোগ্য সীমা অতিক্রম করছে। এতে ফিলিস্তিন সমস্যায় মিসরী ইহুদীদের জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তাদের

এহেন তৎপরতা এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যা মিসর জাতির অনুভূতিতে এমনকি জায়নবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনাকাঙ্ক্ষিত বটে। পরিশেষে এই তৎপরতা মিসরে ব্রিটিশ সরকারের জন্য অনেক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু জায়নবাদী ফেডারেশন এই অপতৎপরতা বন্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বিষয়টি এ পর্যন্ত গড়াল যে, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে তারা প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা নাহ্হাসের নিকট আবেদন পেশ করল যেন এই ফেডারেশনকে মিসরস্থ ইহুদী জাতির দায়িত্বশীল হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়। নাহ্হাস পাশা তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হাসান রেফআতকে নির্দেশ দিলেন যে, মিসরের জায়নিস্ট ফেডারেশনের নেতাদের ডেকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, মিসর সরকার তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে, বরং তাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এ সময়টিতে নাহ্হাস পাশা 'আরব লীগ' প্রতিষ্ঠার কাজে মশগুল ছিলেন। তিনি তখন আলেকজান্দ্রিয়া এন্থোনিয়াডিস প্রাসাদে আরব সরকার প্রধানদের এক সম্মেলন আহবান করেছিলেন। আরব লীগ অঙ্গীকারের ভাষ্য চূড়ান্ত করে তাতে স্বাক্ষর করার জন্যই ছিল এই সম্মেলন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, জায়নিস্ট ফেডারেশনকে অনুষ্ঠানিক ওয়ার্ক পারমিট না দেয়ার যে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নাহহাস নিয়েছিলেন তার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তারা এভাবে যে, ফিলিস্তিনের 'স্টার্ন' উপদলের সাথে শলা করে এই অঙ্গীকার স্বাক্ষর দিবস পালনের দিন 'এন্থোনিয়াড্স' প্রাসাদ উড়িয়ে দেয়ার আয়োজন করেছিল।

এই অপারেশনের মূল হোতা ছিল– স্বয়ং জাবুতেনস্কি। আর এই তৎপরতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ যোগানদাতা ছিলেন মিসরের এই ইহুদী পুঁজিপতি— লিওন কাস্ট্রো (নীলনদের উপকূলে 'জিযাহ' এলাকায় যার বাড়িটি ছিল পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের বাসভবন)।

আরব লীগ অঙ্গীকার স্বাক্ষর দিবসে এন্থোনিয়াড্স প্রাসাদ ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্রটি শেষতক কামিয়াব হয়নি। অচিরেই 'স্টার্ন' সংগঠনটি অন্য এক লক্ষের দিকে মোড় নেয়, এতে তারা সফলও হয়। সেটা ছিল মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড ওয়াল্টার মোয়েনের আততায়ীর হাতে নিহত হওয়া। তাঁকে হত্যা করার কারণ ছিল তিনি ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে এক লাখ ইহুদীর অভিবাসনের প্রকল্পটির বিরোধিতা করেন।

এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বিষয় ছিল এই যে, লর্ড মোয়েন যামালেক এলাকায় যে ভাড়া বাড়ির গেটে নিহত হন তার মালিকও ছিলেন এক ইহুদী মিলিয়নিয়ার— দাউদ আডাস।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় ঃ

মিসরীয় ইহুদীরা কি ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার দাবি করেছিল ? তারা কি কল্পনাও করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত পরিণতি এতদূর পৌঁছাবে, যেখানে আজ মিসরের সাথে সম্পর্ক গিয়ে পৌঁছেছে ? প্রশ্নটি খুবই বিব্রতকর। কারণ এর উত্তর নিশ্চিতভাবেই প্রায় অসম্ভব। হয়ত বাস্তবতার নিকটতম মন্তব্য হবে যে, মিসরের ইহুদীরা ফিলিস্তিনের ইহুদী অভিবাসনের চিন্তাটির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল বটে, কিন্তু তারা মিসরেই জীবন যাপনকে পছন্দ করত। সেই জীবনকে অন্য কিছুতে পরিবর্তিত করতে চায়নি তারা। এমনকি প্রতিশ্রুত ভূমিতেও নয়। এদের অবস্থাটা অনেকটা ইউরোপের অধিকাংশ ইহুদীর মতোই ছিল। তাদের মূল মনোযোগ ছিল কিভাবে অভিবাসী ইহুদীদেরকে সাহায্য করা যায়। কিন্তু তারা চায়নি কোন জায়গায় এরা তাদের সাথে জড়িয়ে যাক। বরং তারা যেখানে আছে সেখানেই জীবন যাপনকে শ্রেয় মনে করত। সম্ভবত কিছু মিসরীয় ইহুদী একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং মিসরে তাদের জীবন যাপনের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেনি। আরব রাষ্ট্রটি তাদেরকে এমন জীবনমান দিয়েছিল যা পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাবার চিন্তাও তারা করতে পারেনি।

যখন মিসরের আরব জাতিসত্তার পরিচয় সুস্পষ্ট হতে লাগল তখন অধিকাংশ মিসরীয় ইহুদী প্রাণপণে চেষ্টা করল যাতে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতিকে কমিয়ে রাখা যায়।

এ সময় রাব্বি নাহুম আফেন্দী বাদশাহ্ ফারুকের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিলেন এবং রাজকীয় সচিবালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হাসান ইউসুফ পাশার সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। বরং স্বয়ং বাদশাহ্ ফারুকের সাথেও তিনি কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। এই সব সাক্ষাতের একটিতে প্রধান রাব্বি রাজাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আল-কুদস হচ্ছে ইহুদীদের হক। খৃস্টানরা আল-কুদসকে ফেলে রোমে চলে গেছে, মুসলমানরা তাদের কেবলা বা দিক পরিবর্তন করে মক্কার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। কেবল ইহুদীরাই চিরজীবন তা হারানোর বেদনায় কেঁদে যাচ্ছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যখন প্রধান রাব্বি অনুপস্থিত থাকেন তখন পরিস্থিতি শান্ত করার কাজ বর্তায় বাদশাহ্র ইহুদিনী প্রেমিকাদের ওপর। চাই সে হোক এরিন কিউনেল্লী অথবা অন্য এক ইহুদী লাবণ্যময়ী যার ভাগ্যের তারকা তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তার বিচিত্র সম্পর্কের গুণে— তিনি ছিলেন ইউলেন্ডা হামির। তিনি একই সময় এক বিশিষ্ট আরব রাজনীতিককেও তার প্রেমের ফাঁদে ফেলেছিলেন। তিনি ছিলেন মিস্টার তাকিউদ্দীন আস-সুল্হ। সে সময় তিনি ছিলেন আরব লীগ-এর সহকারী মহাসচিব। (তিনি তখনও বিয়ে করেননি।)

বিখ্যাত মোসেরী ও কাতাবী পরিবারদ্বয় মিসরের বিশিষ্ট রাজনীতিকদের সাথে বৈঠকের আয়োজন করেন। এতে অংশ গ্রহণ করেন ডেভিড বেন গোরিয়ন (ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) ও নাহুম গোল্ডম্যান (বিশ্ব জায়নিস্ট পরিষদের সভাপতি) এবং ইলইয়াহু সাসুন (ইহুদী এজেন্সীর প্রাচ্যবিষয়ক উপদেষ্টা)।

একই সময়ে ডঃ মাজেন্স রেক্টর, হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমধ্যসাগরীয় সমাজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে অংশগ্রহণ ও গবেষণার আহবান জানিয়ে মিসরের চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক সামাজকে ডাক দিয়ে যেতে থাকলেন। ঘটনাক্রমে এ সময় 'হারারে পরিবার' আল কাতের আল মিসরী (মিসরী লেখক) পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন ডঃ ত্বহা হোসাইন। এটা বড়ই বালখিল্যতা যে, এখনও কেউ কেউ মনে করেন যে, ডঃ ত্বহা হোসাইন ইহুদীদের দোসর ছিলেন। বরং সত্য কথা হচ্ছে— ইতিহাসের অনিরুদ্ধ ঘটনার এটাই নিয়ম— আরবি সাহিত্যের এই প্রাণ পুরুষ এ বিশ্বাসের দিক থেকে সহযোগী ছিলেন যে, মিসর ভূমধ্যসাগরীয় সমাজের অন্তর্গত। চাই তাদের সাথে ব্যক্তিগত ঐকমত্য অথবা মতবিরোধ যাই থাকুক। ডঃ ত্বহা হোসাইন এই বিষয়টি তার গুরুত্বপূর্ণ বই 'মিসরীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ' মোস্তাক বেলুস সাকাফাহ আন মাসরিয়াহ বিধৃত করেছেন। ইনসাফের খাতিরে এটাও বলা দরকার যে, হারানো পরিবার নিজেও আন্তরিকভাবেই এ ধারণা পোষণ করত যে, ফিলিস্তিন সমস্যার সাথে মিসরের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ তার বড় পরিচয় হচ্ছে এটি ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতির ধারক। তাদের এ চেতনায় কোন ষড়যন্ত্র ছিল না।

একই সময়ে এটাও ঠিক যে, তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি ও এগুলোর নেতারা ছিলেন সবাই ইহুদী। এরা চাচ্ছিল অন্য এক শ্রেণী বৈষম্যগত অবস্থান থেকে যে কোন সোচ্চার আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে। তাদের যুক্তি ছিল— মূল সংঘাত হচ্ছে মিসরী পুঁজিপতি ও ইহুদী পুঁজিপতিদের মধ্যে। তাদের অসহায় শিকার হচ্ছে ফিলিস্তিনের 'তীহ' প্রান্তর থেকে ফিরে আসা অভিবাসী আর তাদের সাথে মিসরের শ্রমিক শ্রেণী।

কাজেই এ দুটি শ্রেণীর উচিত বিশ্ব পুঁজিপতিদের সাথে আঁতাত করা এই সব স্থানীয় পুঁজিপতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

কিন্তু মূল সমস্যাটি ছিল, এই সব প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, কোম্পানী, বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রকাশনার ভূমিকা অথবা কমিউনিস্ট উপদলগুলোর কর্মকাণ্ড থেকেও বেশি জটিলতর বিষয়।

॥ ৪ ॥

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট

"আমেরিকাই হচ্ছে প্রতিশ্রুত ইসরাইল—ফিলিস্তিন নয়।"

— নতুন বিশ্বের দিকে ধাবিত প্রাথমিক অভিবাসীদের উচ্চারিত স্লোগান

ইতিহাসের নজরকাড়া চমক ছিল এই যে, যখন আরব বিশ্বে মিসরের ভূমিকা বিকাশমান এবং সে নিজেই তার স্বরূপ সন্ধানে আরবের সাথে তার জাতিসত্তা ও ভূমিকাকে উপলব্ধি করতে শুরু করল। ঠিক সে সময়ে আমেরিকা একই ধরনের অভিজ্ঞতার পথে প্রবেশ করছিল। দেখা গেল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, বিশ্বে সেও তার ভূমিকা রেখে যাবে। এতদিন এই দায়িত্ব নিতে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল। এতদিন সে ধারণা করছিল যে, পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর আর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন নির্জনতাতেই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত।

সে সময় মিসরের ইহুদীরা নতুন নতুন ফন্দি আটছিল কিভাবে মিসরের পরিচয় ও ভূমিকা রাখার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যায়, ঠিক সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীরাও দলমত নির্বিশেষে সেই একই প্রভাব বিস্তারকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

বিভিন্ন কারণে জায়নিস্ট আন্দোলন গোড়া থেকেই ইউরোপের ওপর বড় বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল। এর একটি কারণ ছিল— সে সময় ইউরোপই ছিল আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের পাদপীঠ। এর চিন্তাধারাও ছিল মূলত ফরাসী বিপ্লব উৎসারিত। যেখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সাম্যের বিধানই ছিল মূলমন্ত্র। এটা জায়নিজমেরই কিছু চিন্তার সাথে মিলে যায়। এর সাথে যোগ হয় নেপোলিয়নের ভূমিকা এবং তার 'ইহুদী পাতা' এরপর আসে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের ভূমিকার কথা, যা আসলে নেপোলিয়নের 'ইহুদী পাতা'র উপরই ভিত্তিশীল। এরপর তো ব্রিটেন হয়ে গেল ইহুদীদের সহায়, সহায়তাকারী, এমনকি ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক। আর তা বেলফোর অঙ্গীকারের ভাষ্যেই রয়েছে। এটিই ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণার বাস্তব ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিছু দূরবর্তী অবস্থানে ছিল। এ সময় কিছু বৈষয়িক কারণে ইউরোপে কি হচ্ছে তা থেকে আমেরিকার ইহুদীরা দূরে পড়েছিল। এ সকল বৈষয়িক কারণ ছিল মূলত এ রকম ঃ

আমেরিকা অভিমুখী প্রথম দিককার ইউরোপীয় অভিবাসীরা ছিল এ্যাংলো সাক্সোনিয়ান বংশোদ্ভূত। তাদের অভিবাসনের মূল অনুপ্রেরণা যদিও আর্থিক কিন্তু সেখানে বাইবেল প্রভাবিত প্রচণ্ড ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিল। বাইবেল অনুযায়ী মসীহ্ ঈসাকে শূলে চড়ানোর জন্য ইহুদীরাই দায়ী। বস্তুত নতুন দুনিয়ায় হিজরতকারী সেসব প্রাথমিক অভিবাসীদের সংস্কৃতির একটি অংশই ছিল ইহুদীবাদের ঘৃণা করা। প্রাথমিক অভিবাসী কাফেলাগুলো দক্ষিণ আমেরিকাতেই গিয়েছিল। এজন্য এই ভূখণ্ডটি এ্যাংলো সাক্সোনিয়ানদেরই আবাসভূমি হয়েছে।

প্রথম এ্যাংলো সাক্সোনিয়ান অভিবাসীদের পরেই ইহুদী অভিবাসীর ঢেউ শুরু হলো। বিশেষ করে আমেরিকাগামী অভিমুখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিবাসী ঢেউয়ের অধিকাংশই ছিল পূর্ব ইউরোপ থেকে, যার প্রধান উপাদান ছিল ইহুদী। এই সব অভিবাসী স্রোতে আসা ইহুদীরা শহর নগর আর উপকূলেই তাদের অবস্থানকে সীমিত রাখে। কারণ ইহুদীরা তাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে সব সময় অর্থ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলোর কাছাকাছি থাকে। এগুলোর কেন্দ্রই হচ্ছে শহর নগর আর সমুদ্র বন্দর। কাজেই গভীরে গিয়ে দূরাঞ্চলের লোকালয়ে বিপদের সম্মুখীন হওয়া তাদের কাজ নয়। এতে এ মহাদেশের আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে সংঘাত লেগে যেতে পারে।

যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ব ইউরোপ থেকে নিবিড় অভিবাসী স্রোত শুরু হলো তখন প্রাচ্যের বিপুল সংখ্যক ইহুদী অভিবাসী ধরে নিল যে, সেই প্রতিশ্রুত জমীন হচ্ছে আমেরিকা— ফিলিস্তিন নয়। এভাবেই হের্তৃজালের দিনে জায়নিস্ট আন্দোলন এ সময় সন্দেহে পড়ল যে আমেরিকার জমীন জায়নিস্ট পরিকল্পনার সহযোগী হওয়ার বদলে প্রতিদ্বন্দ্বী কি না। বদলী স্থান হিসাবে আমেরিকার জন্য জায়নিস্ট সংস্থার উদ্বেগ ও অস্থিরতা বেড়ে যায়। কারণ যারা আগে ভাগে আমেরিকায় পৌঁছেছিল তারা তাদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের লিখতে লাগল যে, নতুন মহাদেশ দেখে যাও। এ তো আসলে সেই প্রতিশ্রুত ইসরাইল। এ অবস্থা জায়নিস্ট পরিকল্পনা থেকে কেড়ে নিচ্ছিল, দিচ্ছিল না। কারণ যে সব ইহুদী আমেরিকা চলে গিয়েছিল তারা ফিলিস্তিনে ফিরে আসার চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। বরং তারা অন্যদেরকে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে আসার দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিল।

আমেরিকা সমাজ যে প্রাণচাঞ্চল্য অর্জন করেছিল তার সহজাত পরিণতিতেই এ ছিল যেন ইতিহাসের মালা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নতুন এক সমাজ। এখানে সুযোগ উন্মুক্ত, শ্রেণী-বৈষম্য তখনও ছিল অপরিবর্তিত। এ সময় পূর্ব ইউরোপ থেকে অভিবাসী ইহুদীদের বড় একটি সংখ্যা নতুন বিশ্বের সম্প্রদায়গুলো ওপরে জাগতে শুরু করেছে। বিশেষ করে অর্থ, শিল্প ও তথ্য-ক্ষেত্রগুলোতে। নতুন বিশ্বের এই সামাজিক

গতিময়তা শক্তি তাদের সবাইকে প্রভাবশালী সব প্রকাশ্য সুযোগ দিয়েছিল। এখানে ইউরোপের মতো তা প্রকাশ পেলে এর কর্তাদের তা লুকানো, দায়িত্ব অস্বীকার বা ওজরখাহী করার কোন প্রয়োজন নেই। ঐ সকল আমেরিকান ইহুদী সব সময় তাদের সংখ্যা বাড়ার প্রত্যাশা করত, যাতে নতুন দুনিয়ায় এক ধরনের প্রতিযোগী শক্তি বৃদ্ধির মতো তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারে। কারণ এ 'উন্মুক্ত সুযোগ'-এর মহাদেশে অন্য গোত্র, বর্ণ, ও ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যে নিজের জন্য একটি স্থান করে নেয়া ছিল সবারই স্বাভাবিক কামনা।

এ সময় জায়নিস্ট আন্দোলন এবং বিশ্বের শক্তিসমূহের মানদণ্ড যাদের জানা দরকার তাদের সবার কাছে এ বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অচিরেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বের হবে বিশ্ব নেতৃত্বের শীর্ষে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করেই। চাই অর্থনৈতিক দিক থেকে হোক বা সামরিক অথবা যুদ্ধোত্তর পর্বে মানচিত্র অঙ্কনে আধিপত্য বিস্তারসহ ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেই হোক। পরিবর্তিত এই বিশ্বের নতুন নিয়ন্ত্রক সত্যের জন্য জায়নিস্ট আন্দোলন তৈরি হচ্ছিল সে তখন থেকেই। এ ক্ষেত্রে অটোমেটিক এবং যৌক্তিকভাবেই সে নিজের জন্য যা উপায় বের করে নিয়েছিল তা ছিল— ফিলিস্তিনে ইহুদী স্বদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সেতু পারাপার হবে আমেরিকার ইহুদীরাই। ইউরোপের কোল থেকে আমেরিকার কোলে গিয়ে আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ করতে হবে।

স্পষ্টত আমেরিকান ইহুদীরা বেশ কিছু কারণে প্রস্তুত হয়েই ছিল। তারা জার্মানীতে ইহুদীদের ওপর কি যাচ্ছে তার কিছু কিছু জানতে শুরু করেছিল। এরপর ইউরোপের অধিকাংশ এলাকাই যখন যুদ্ধের বছরগুলোতে নাৎসী বাহিনীর দখলে চলে যায়, তখনকার নাজুক অবস্থাও তারা জানতে পেরেছিল। এ বিষয়ে যুদ্ধের আগে থেকেই তিরিশ দশকের অভিবাসী কাফেলাগুলোর মাধ্যমে যথেষ্ট খবরাখবর তাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। এই অভিবাসী স্রোত আমেরিকা উপকূলে বয়ে নিয়ে এসেছিল বালবার্ট আইনস্টাইন মডেলের এমনকি শেষে হেনরী কিসিঞ্জার মডেলের ইহুদীদের। এ ছাড়াও যুদ্ধের ধোঁয়াশার ওধারে কি চলেছিল তার খবরাখবরও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীদের মধ্যে কিছুটা অপরাধবোধ ধারণের অনুভূতি পয়দা হলো। তারা ভাবল, তারা হয়ত ইউরোপের জায়নিস্ট আন্দোলনের সাথে ক্রমবর্ধমান আমেরিকার জায়নিস্ট আন্দোলনের প্রায় পরিপূর্ণ একাত্মতার মাধ্যমে কিছুটা পুষিয়ে দেয়া যেতে পারে।

ইউরোপের জায়নিস্ট আন্দোলন আমেরিকান ইহুদীদের কাছে কেবল চাঁদা সংগ্রহের সভা-সমিতিই প্রত্যাশা করেনি, সে চেয়েছিল যেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি

বহন করে বা ইসরাইলী পরিকল্পনার পেছনে দায়িত্বভারের বড় অংশ বহন করুক। এটা তারা করতে পারে রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করে অথবা অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারণে ইউরোপীয় জায়নিস্ট আন্দোলন তার আমেরিকান সহকর্মীর প্রতি অনেক শ্লোগান বা উক্তি করেছিল। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি উক্তি ছিল এই রকম ঃ "ইউরোপের ইহুদীরা ইহুদী রাষ্ট্র লাভের অঙ্গীকার– 'বেলফোর অঙ্গীকার' অর্জন করে দিয়েছে এবং সে রাষ্ট্র প্রায় প্রতিষ্ঠার কাছাকাছি অবস্থানে এসে পৌঁছেছে, এখন আমেরিকান ইহুদীদের দায়িত্ব হলো বাকি পথ অতিক্রম করার জন্য দুটি লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে বাস্তবায়ন করা– ১. প্রতিশ্রুত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা। ২. আরবদের কাছ থেকে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি আদায় করা। কারণ এ রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য সেটিই হচ্ছে একমাত্র গ্যারান্টি। কেননা যদিও শক্তিশালী পক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষের ওপর এ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে সক্ষম তবুও এতে করে বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হবে না বরং এর আইনগত ভিত্তি ও বৈধতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন সেই দুর্বল পক্ষ স্বয়ং এ বাস্তবাতার স্বীকৃতিকে পেশ করবে। চাই তা চাপের মুখেই বলুক না কেন।

এদিকে 'বালটিমোর' সম্মেলনটিই ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার জায়নিস্ট সংস্থাগুলোর মিলনকেন্দ্র। নিউইয়র্কের এই ছোট্ট হোটেল 'বাল্টিমোর'কে ১৯৪২ সালের ৯ মে থেকে ১১ মে পর্যন্ত সময়ের জন্য ইউরোপীয় জায়নিস্টদের সাথে আমেরিকার জায়নিস্টদের মিশে যাওয়ার জন্য ঠিক করা হয়েছিল। এই মিলনের মধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রকল্পের পেছনে দুটি শক্তি এক হয়ে গেল। এভাবেই এই প্রকল্পটি বিশ্বের নতুন পরাক্রমী শক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে এগুতে লাগল।

ইউরোপের এই ইহুদীবাদী (জায়নিস্ট) আন্দোলনের সাথে আমেরিকার ইহুদীবাদী আন্দোলন (যার মধ্যে দ্রুত জায়নিজমের জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছিল।)–এর এই মিলন ছিল সাধারণ ইহুদী ও ইসরাইলী ইতিহাসে এক বিপজ্জনক মিলন। কারণ উভয় আন্দোলনেরই ছিল কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য।

* ইউরোপীয় ইহুদীবাদী (জায়নিজম) সংস্থায় ছিল প্রথমত এমন একদল উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি যারা দীর্ঘদিন দর্শন ও ইতিহাস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তা থেকে যা প্রয়োজন নিংড়ে নিয়েছেন এবং তাদের মতামতগুলো রোজনামচায় লিখে রেখেছিলেন, বিভিন্ন বই-পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাছাড়া এতে শামিল ছিল এমন কিছু বড় পুঁজিপতি যারা পর্দার আড়াল থেকে চুপচাপ কাজ করে যাওয়াকে পছন্দ করতেন। এদের অনেকেই ছিলেন বড় ব্যাঙ্কার যারা চাইতেন যে তাদের প্রভাব যেন আলো থেকে দূরে থাকে। এই দুটি দল (সংস্কৃতিবান ও

পুঁজিপতি)-এর সাথে রাজনীতির সম্পর্ক ছিল সংগোপনে অধিকাংশ সময়ই পরোক্ষভাবে। তাদের গোপন যোগাযোগ চলত ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীদের সাথে আর ইস্তাম্বুল বা কায়রোর সুলতানদের সাথে।

* পক্ষান্তরে আমেরিকার ইহুদীবাদীরা (জায়নিস্টরা) ছিল আরেক ধরনের। তাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি কখনও বিভিন্ন দর্শনের সামনে থমকে দাঁড়ায় না। তারা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় কিছুটা সৃষ্টিশীল। তারা শিল্প, তথ্য ও প্রকাশনার ক্ষেত্রগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে জনগণের ওপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম ছিল।

অধিকন্তু আমেরিকান সমাজ তাদেরকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে কাজ করারও সুযোগ দিয়েছিল। আমেরিকা ও ইউরোপের ইহুদীদের মধ্যকার এই ভিন্নতা খোদ বেন গোরিয়নও প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি তাঁর ভাষ্যে বলেন— "ইউরোপীয় ইহুদীরা বর্ণবৈষম্যের আশঙ্কা করলে নিজেদের অনুভূতি গোপন রাখতে অভ্যস্ত ছিল, পক্ষান্তরে এর ঠিক বিপরীতে আমেরিকার ইহুদীরা যদি অনেক দূর থেকেও বৈষম্যের মতো সামান্য কিছু অনুভব করত তাহলেই উচ্চকণ্ঠে চিৎকার জুড়ে দিতে সদা প্রস্তুত ছিল।"

বাল্টিমোর মহাসম্মেলনে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ছয় শ' লোক অংশগ্রহণ করে। হায়েম ওয়াইজম্যান, ডেভিড বেন গোরিয়ন ও নাহুম গোল্ডম্যানও এতে উপস্থিত ছিলেন। শুরু থেকে এ পর্যন্ত জায়নবাদী প্রকল্পের কি কি বাস্তবায়িত হয়েছে তা সম্পর্কে আমেরিকার ইহুদীদেরকে একটি পরিপূর্ণ ধারণা দেয়াই ছিল এদের দায়িত্ব। আমেরিকান ইহুদীদের মধ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জনজীবনে প্রভাবশালী বেশ কিছু বিশিষ্ট ইহুদী এতে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে লিওন গিলম্যান, লুইস লেবস্কি, ইসরাইল গোল্ডস্টাইন এবং রাব্বি আবাবা হেলেল সেলফার প্রমুখ ব্যক্তি ছিলেন। এরপর এই সম্মেলন বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা নিবিড় রাজনৈতিক ও মিডিয়া অভিযানের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। বস্তুত 'বাল্টিমোর ঘোষণা' ছিল ইউরোপে জায়নিস্ট আন্দোলন যতটুকু সফল হয়েছে তাকে দৃঢ় করা। সেই বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হিজরত করা থেকে শুরু করে 'বেলফোর ওয়াদা' পর্যন্ত এবং সেখান থেকে উত্তরণ লাভ করে পরবর্তী পর্যায়ে কার্যত রাষ্ট্র পরিকল্পনার ভিত্তিমূল রচনা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে যা কিছু হয়েছে তার সবই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে মহাসম্মেলনটি যুদ্ধক্ষেত্রে ইহুদী বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসা করতে ভুলেনি, যাদের মাধ্যমেই প্রতিশ্রুত ইহুদী রাষ্ট্র যুদ্ধোত্তর জগত গড়ার কাজে অবিসংবাদিত অধিকার অর্জনে সক্ষম হয়।

এ তো ছিল পেছনের কথা। বাল্টিমোর ঘোষণা এরপর ভবিষ্যতের কথায় চলে গেল— তার অষ্টম ধারার সূচনায় এক প্রভাবশালী ঘোষণা দিয়ে বলল—"এই যুদ্ধ

অবসানের পর নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাটির ছত্রছায়ায় ইহুদী জাতির সাথে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে। আর এটা কেবল মাত্র ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে। এভাবেই 'তীহ' প্রান্তরে হারিয়ে যাবার সুদীর্ঘ দু'হাজার বছর পর আবার ইহুদী জাতি তাদের বৈধ ও ঐতিহাসিক অধিকার ফিরে পেতে পারে।

এরপর এই মহাসম্মেলন অদূর ভবিষ্যতের জন্য তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে, যার দায়িত্ব অন্যদের চাইতে আমেরিকান ইহুদীদের ওপরই বেশি বর্তায়।

১. কোন স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক পক্ষ থেকে কোনরূপ শর্তারোপ ছাড়াই ফিলিস্তিনের অভিবাসনের জন্য ইহুদীদের সামনে হিজরতের দরজা খুলে দেয়া।
২. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জায়নিস্ট সমাজকে সাহায্য করা; প্রয়োজনে এই লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট আর্থিক, রাজনৈতিক, সামরিক সাহায্য প্রদান।
৩. নতুন গণতান্ত্রিক বিশ্ব বিনির্মাণে প্রতীক্ষিত ইহুদী রাষ্ট্রকে একটি অংশ মনে করা। কারণ এই নতুন বিশ্বের নেতৃত্ব অবিসংবাদিত ভাবেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই থাকবে।

এই মহাসম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু ইহুদী ভোট দেয়। তারা আশঙ্কা করে যে 'বাল্টিমোর' কর্মসূচি আমেরিকার ইহুদীদেরকে যুদ্ধের পর বড় ধরনের সমস্যায় ফেলে দিতে পারে। কারণ এ অঞ্চলে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ প্রকল্পের সংঘাত নিশ্চিতভাবেই বেধে যাবে। সেই আলামত এখনই সুস্পষ্ট। এ ধরনের ক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায়— ফিলিস্তিনের ইহুদীদের সাথে বিশ্বের সব ইহুদী মিলিত হয়ে আরবদের সাথে এক সুদীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ফলে দুই শ' বছরের অনুপস্থিতির পর আবার ফিরে আসার যে কোন দাবিই প্রত্যাবর্তনকারীদের ওপর ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক— এ কাজ অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে যে পুরনো ভূমিকে সাফ করে, কুড়িয়ে-কাচিয়ে নিজেদের জন্য জায়গা করে নিতে হবে। কারণ দু'শ বছর আগে তাদের ছেড়ে যাওয়া জায়গাটি নতুন জাতি ও সম্প্রদায়ে ভরপুর হয়ে গেছে। যারা এখন সে দেশের আদি অধিবাসী তাদের সাথে এই স্বদেশের সকল সূতা জড়িয়ে গেছে।

কিন্তু সংরক্ষণবাদী ও বিরোধী ভোটগুলো হাওয়ায় ভেসে গেছে। কারণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ সমাবেশে বাল্টিমোর সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়। তারা বেশ উদ্দীপনা নিয়েই সমাবেশ ত্যাগ করে— তা বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয়ে।

এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট নিজেকে চতুর্থ বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে চলেছেন। যা ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এই নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী

উইন্ডল ওয়েলকি। ইনি ছিলেন বহুল প্রচারিত এক নতুন থিওরীর প্রবর্তক যা তিনি তার 'এক বিশ্ব' শীর্ষক গ্রন্থে অবতারণা করেন। এই দর্শনের মোদ্দা কথা ছিল—"বিশ্ব এখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর একটি অভিন্ন আন্তর্জাতিক গ্রামে বেরিয়ে এসেছে।" ওয়েলকি-এর এই আহ্বান বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এদিকে হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয় লাভ করতে আর বেশি বাকি নেই। এ সময় সন্ধিক্ষণে রুজভেল্ট তার নির্বাচনী প্রচারণাকে জোরদার করার জন্য প্রতিটি ভোট, প্রতিটি প্রভাবশালী উপায়-উপকরণ তথা সর্বাত্মক আর্থিক সহযোগিতার মুখাপেক্ষী ছিলেন।

রুজভেল্ট এ সময় কিছু সংখ্যক ইহুদী ব্যক্তিত্বের কাছে সাহায্য চাইলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন স্টেফেন ওয়ায়েজ (প্রখ্যাত রাব্বি— প্রধান ইহুদী ধর্মযাজক), ফিলিক্স ফ্রাঙ্কফুটার (ইনি সাংবিধানিক উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন), বার্নাড পারুখ (তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা) ও হেনবী মোরগান্টাও (তিনি তাঁর অর্থ ও কোষাগার মন্ত্রী)। সম্ভবত এটাই ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, যেখানে ইহুদীরা তাদের সুশৃঙ্খল সুসংগঠিত ভূমিকা রাখে।

বলা যায়, রুজভেল্ট তখন দুটি পরস্পর বিরোধী প্রভাবের নিচে পড়েন ঃ

— একদিকে নির্বাচনে ইহুদী শক্তির ঋণ তার সামনে উপস্থিত হয়।

— অপর দিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞগণ ও পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর মালিকদের একটি গ্রুপ মধ্যপ্রাচ্যের যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ও পেট্রোলিয়ামগত স্বার্থাদির গুরুত্বের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর সবই হচ্ছে আরব দেশ। রুজভেল্ট তখন নিজের জন্য একটি মধ্যপন্থা বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এটা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ ইহুদীদের নির্বাচনী ঋণ কোন প্রেসিডেন্টের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এর বহুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্য পর্যন্ত ব্যপৃত ছিল। এ ছিল 'জায়নিস্ট লবি' নামের প্রভাবশালী ইহুদী বলয়ের সূচনা। ('লবি' আসলে প্রাসাদ বা বড় হোটেলের প্রবেশ-দ্বার। এখান দিয়ে রাজনীতিবিদগণ যাওয়া আসার পথে মধ্যস্থতার লোকজন দু'একটি বাক্য তাদের কানে কানে বলে প্রভাবিত করে থাকে। সেখান থেকেই এই ইহুদী 'লবি' কথাটির প্রচলন।)

তার প্রথম লড়াই ছিল ইহুদী অভিবাসনের জন্য ফিলিস্তিনের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া, যাতে ইস্‌রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

এভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জায়নিস্ট লবি হয়ে উঠল এক অভিনব বৈশিষ্ট্য এমনকি আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনে সুপরিচিত 'প্রেসার গ্রুপগুলো'র মধ্যেও।

এর আগে আমেরিকায় কিছু প্রেসার গ্রুপ ছিল; তারা এসেছিল ইউরোপ থেকে। এরা নতুন বিশ্বে অভিবাসী সম্প্রদায়, যারা গিয়েছিল তাদের পুরোনো বর্ণ ও বংশের

সাথে কিছুটা সম্পর্ক ও আত্মপরিচয় রেখে যেতে। এদের মধ্যে ছিল 'আয়ারল্যান্ড প্রেসার গ্রুপ'। এদের কেন্দ্র ছিল ম্যাচাসুয়েট্স রাজ্য। আরেকটি ছিল 'ইতালীয়ান প্রেসার গ্রুপ'। এদের কেন্দ্র ছিল কেলিফের্নিয়া রাজ্য। ..... এভাবে অনেক। কিন্তু ইহুদী প্রেসার গ্রুপ ছিল এক ভিন্ন অস্তিত্ব। তারা এমনই এক দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে যাদের কেউ আমেরিকায় অভিবাসী হয়ে আসেনি। যাদের থেকে কেউ কখনো অভিবাসী হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যাবে না। কেউ সে দেশের ভাষা জানে না। এমনকি এই অভিবাসীদের দাদার দাদাও সে দেশ তাদের চোখেও দেখেনি, এ সম্পর্কে তারা কিছূ স্মরণও করতে পারবে না!

॥ ৫ ॥

মুস্তফা নাহ্‌হাস

"নাহাস পাশাকে বলুন, আমি ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র সম্পর্কে নিঃশর্তভাবে কিছু বলিনি"
—মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাঁর কায়রোস্থ্ চার্জ দ্যা এফেয়ার্সের প্রতি নির্দেশনা

যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীবাদী জায়নিস্ট গ্রুপগুলো সর্ব প্রথম যে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় তা ছিল ইহুদী অভিবাসনের জন্য ফিলিস্তিনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়ার লড়াই। তারা চেয়েছিল যে, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল দিনগুলোতে ব্রিটিশ নীতি যে অভিবাসী সীমা নির্ধারণ করে রেখেছিল তা উঠিয়ে দিতে। এরপর বাস্তবে এই ভয়াবহতা ঘটুক। তাও তারা চেয়েছিল। আমেরিকার আনুষ্ঠানিক নীতি এই সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের যুক্তিগুলো মেনে নিয়েছিল[১]। কিন্তু ইহুদীবাদী জায়নিষ্ট গ্রুপগুলো এই ঘটমান সুযোগকে কোনভাবেই হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিল না। আমেরিকার নীতি এটাকে কিভাবে গ্রহণ করবে তার তোয়াক্কা তাদের নেই। আসলে মূল লক্ষ্যে কারোই তেমন ভিন্নমত ছিল না। মতবিরোধটা ছিল কেবল সময়ের দাবি অনুযায়ী কি পদ্ধতিতে তা অর্জন করা যায় তা নিয়ে। এ সময় আমেরিকার পদক্ষেপ ছিল কিছু দ্বিধাগ্রস্ত। এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হবে হোয়াইট হাউস ও আমেরিকান বিদেশ মন্ত্রণালয়ের ১৯৪৪ সালের দলিল প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করলে ঃ

ডকুমেন্ট নং ২৩৭৩

(আমেরিকান সহকারী বিদেশমন্ত্রী) এডলফ পার্ল-এর নোট

তাং ঃ ২৮ জানুয়ারি, ১৯৪৪

প্রিয় মন্ত্রী,

এই নোটের সাথে দুটি সিদ্ধান্ত নং ৪১৮ ও ৪১৯-এর টেক্সট্‌ পাঠানো হলো। এ দু'টি সিদ্ধান্ত যথারীতি কংগ্রেস ও সংসদে প্রেরিত হলো। সেগুলোর মূল ভাষ্য ছিল এরকম ঃ

কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে এই আবেদন করতে হবে, যেন সে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঐ দেশটিতে উপনিবেশ স্থাপন এবং তাতে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার তাদের অধিকার থাকবে।

নিম্ন-পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন ম্যাকর ম্যাক এবং সংখ্যালঘু নেতা যোশেফ মার্টিন আমাকে টেলিফোনে এই প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং উভয়েই তা আপনার কাছে পেশ করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

—স্বাক্ষর
এডলফ পার্ল

ডকুমেন্ট নং ২১৮৭

সহকারী বিদেশমন্ত্রী এডলফ পার্ল ও ব্রিটিশ এসাইন্ড মিনিস্টার স্যার রোনাল্ড ক্যাম্পবেল-এর মধ্যকার আলোচনার স্মারক ঃ

তাং ঃ ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৪

রোনাল্ড ক্যাম্পবেল আমাকে দেখতে এলেন এবং আমার সাথে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের দরজা খুলে দেয়া এবং ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলাপ করেন। তিনি আমার সাথে আলোচনা শুরু করলেন এই বলে যে, ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার আইনগত আধিপত্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে চায় না। সে শুধু চায় এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যে, সিদ্ধান্তগুলোর মূল বিষয় কিছু দায়-দায়িত্ব এনে দেয়, এর মধ্যে সামারিক দায়-দায়িত্বও রয়েছে। এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত আমেরিকার চাওয়া পাওয়ার সাথে সঙ্গতিশীল হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জানা থাকা দরকার যে এতে কি ধরনের বোঝা চাপাবে।

—স্বাক্ষরিত

ডকুমেন্ট নং ৭৪৪

সমরমন্ত্রী হেনরি স্টোসনের পক্ষ থেকে সিনেটর কনলি, সভাপতি, সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির নিকট প্রেরিত নোট ঃ

তাং ঃ ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ ইং

প্রিয় সিনেটর কনলি!

ফিলিস্তিনের দুয়ার অবাধ ইহুদী অভিবাসনের জন্য খুলে দেওয়া বিষয়ে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ভাষ্য সংবলিত আপনার পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমি এ বিষয়ে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এ সিদ্ধান্তটি সমর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত।

কারণ এখন থেকে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে যে কোন সংঘাতের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে বড় সামরিক বাহিনী প্রস্তুত রাখতে হবে। অথচ জার্মানীর বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের অনিবার্য প্রয়োজনে এই বাহিনীকে এখন আরও বেশি প্রভাবশালী যুদ্ধ প্রবাহের ময়দানগুলোতে মোতায়েন করতে হবে।

—স্বাক্ষরিত
হেনরি স্টেমসন

এ সময় ওয়াশিংটনে ঘটমান বিষয়াদি সম্পর্কে কিছু কিছু আরব দেশ সচেতন হতে শুরু করল এবং এর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে লাগল। ডকুমেন্টের ভাষ্য অনুসারে তখন ঘটনাগুলো এভাবে ঘটে চলেছিল ঃ

ডকুমেন্ট নং ২১৯৩/ ০১ ন ৮৬৭

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সচিব এডওয়ার্ড স্টেটনিউস ও দু'জন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী (Minister Pleni-potentiory) মিসরে মাহমুদ হাসান পাশা ও ইরাকে আলী জুদাতের মধ্যকার সাক্ষাৎকার স্মারক ঃ

তারিখ ঃ ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

প্রিয় মিনিস্টার,

মিসরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মিনিস্টার ও ইরাকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মিনিস্টার-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁরা আমার সাক্ষাতে এলেন। তাঁদের সাথে আমার সাক্ষাৎকার পঁচিশ মিনিট স্থায়ী হয়। মিসরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মিনিস্টার ফিলিস্তিন সমস্যার ব্যাপারে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তাঁর সরকারের দারুণ উদ্বেগ প্রকাশ করে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি আমাকে জানান যে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তিনি বেশ কয়েকবার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি তাঁর কাছেই শুনেছেন তিনি ইহুদী অভিবাসনের দরজা খুলে দেয়াসহ সকল ফিলিস্তিনী বিষয় যুদ্ধের পরের জন্য মুলতবি রাখার তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কংগ্রেসের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে এখন নতুন উপাদান যোগ করল। এদিকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা নাহ্হাস পাশা এ বিষয়ে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছেন।

এদিকে মিসরী সহকর্মীর সাথে যোগ দিয়ে ইরাকী মিনিস্টার পীড়াপীড়ি করে বলছেন যেন ইহুদী অভিবাসনের জন্য ফিলিস্তিনের দ্বার উন্মুক্ত করার বিষয়টি আলোচনা যুদ্ধের পরের জন্য তুলে রাখতে হবে। আমার পক্ষ থেকে উভয় মহোদয়কে ব্যাখ্যা করে বলেছি যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোর্ডেল হল বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিষয়টি অনুসরণ করে যাচ্ছেন। আমরা বিষয়টিকে এভাবে মূল্যায়ন করছি যে, তারা দুজন কেবল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে প্রকাশ করল।

—এডওয়ার্ড স্টেটনিউস

ডকুমেন্ট নং ২১৮৫ /০১ ন ৮৬৭

বাগদাদের ভারপ্রাপ্ত মিনিস্টার (Minister Pleni-Potentiory) লুই হেন্ডারসন -এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট তারবার্তা ঃ

বাগদাদ ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪; সন্ধ্যা ৭টা।

প্রিয় মিনিস্টার ,

গতকাল প্রধানমন্ত্রী নূরী আস্-সাঈদ পাশা আমাকে ডেকে বললেন, তিনি খুবই কৃতার্থ হবেন যদি আমি আমার সরকারকে অবহিত করি যে, আমেরিকার রাজনীতিতে

জায়নিস্ট গ্রুপগুলো যে চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে তাতে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান জায়নিস্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আমেরিকার সিদ্ধান্ত সংগঠনকারী দায়িত্বশীলদের ওপর ভর করতে পারে। এতে আরবদের সাথে সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এমনকি তা 'আটলান্টিক অঙ্গীকার' ও জাতিসংঘ সনদে ঘোষিত নীতিমালাতেও আঁচড় লাগতে পারে। নূরী আস্-সাইদ বিশিষ্ট সিনেট সদস্যদের ওপর জায়নিস্ট প্রভাবের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এটা সিনেটর ওয়াগনার ও সিনেটর টাপেট এবং সিনেটর বার্কলের বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছিল। বহুল প্রচারিত সেই বিবৃতিতে তাঁরা সবাই ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সমর্থন করেন। এ প্রেক্ষিতে নূরী পাশা বলেন— এ ধরনের বিবৃতির কারণে আমেরিকার প্রতি শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টি করবে। এই অনুভূতিকে নাজী প্রপাগাণ্ডা কাজে লাগাতে পারে। তিনি বার্লিন বেতার থেকে নিজ কানে শুনেছেন যে আরবি ভাষায় তারা এ নিয়ে আরব বিশ্বকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দারুণভাবে ক্ষেপিয়ে তুলছে। নূরী পাশা আরও বলেন যে, কংগ্রেসের কাউকে প্রভাবিত করার মতো আরবদের হাতে কোন উপায় উপকরণ নেই, যা জায়নিস্ট গ্রুপগুলোর হাতে আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে তিনি আশা করেন যে, সে কিছুটা ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

–লুই হেন্ডারসন

ডকুমেন্ট নং ২২০৯/ ন ০১/ ৮৬৭

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত দামেস্কের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স ফারিয়েল-এর টেলিগ্রাম ঃ

দামেস্ক ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪; দুপুর ২টা।

সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে তার অফিসে ডেকে সিরীয় সংসদে গৃহীত একটি প্রতিবাদী সিদ্ধান্তের পত্র প্রদান করেন, যা সংসদ নেতা ফারেস আল্-খুরীর তরফ থেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল। এটা আমেরিকার কংগ্রেসের প্রতি প্রতিবাদলিপি। এর ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমেরিকান কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ আরব স্বার্থ ও অধিকারের ওপর এক মৃত্যু-ভয়াল আঘাতের রূপ নিয়েছে। বিজয় নিশ্চিত করতে মিত্র-শক্তির সেবায় যে সকল আরব দেশ তাদের সম্পদ ব্যয় করেছিল তারা এখন এই সকল সিদ্ধান্তকে খেয়ানত হিসেবে দেখছে, কারণ এগুলো আটলান্টিক চুক্তিতে ঘোষিত নীতিমালার বিরোধী।

আরবদের ক্ষতিগ্রস্ত করে ইহুদীদেরকে সুবিধাদি দেওয়া কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চাই যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ফিলিস্তিনে আরব-অধিকারকে হিসাবে রাখতে হবে।

সিরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত আমাকে দেওয়ার সময় আরও বলেন— তার সরকার সিরীয় পার্লামেন্টে যে মতামত ও অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তার অংশীদার। তিনি আশা করেন যে, আমেরিকা সরকার এই সব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং বিষয়টি দায়িত্বশীলতার সাথে সুরাহা করবে।

সে সময় পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী ইহুদী ও জায়নিস্ট প্রেসার গ্রুপগুলোর প্রভাব থেকে দূরে ছিল। স্বভাবতই তারা আরবদের কাতারেও ছিল না। কিন্তু সেখানে একটাই তাদের প্রভাবিত করত তা হচ্ছে সামরিক প্রয়োজন। তখন মার্কিন বাহিনী ফিলিস্তিনের দিকে ইহুদী অভিবাসনের দরজাগুলো খুলে দেওয়ার ব্যাপারে ভীত ছিল— সেটাও ছিল কিছু নির্দিষ্ট কারণে। ডকুমেন্টগুলো তা প্রকাশ করছে ঃ

ডকুমেন্ট নং ২৬৪৪-২/০১ ন ৮৬৭

সহকারী সমরমন্ত্রী জন ম্যাকলে'র পক্ষ থেকে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী লং-এর নিকট স্মারক ঃ

ওয়াশিংটন ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪।

আপনার সাথে আমার টেলিফোনে আলাপের প্রেক্ষিতে আপনার বরাবর এখন একটি স্মারক পাঠাচ্ছি, যা আমি জেনারেল মার্শাল (চীফ অব জয়েন্ট ওয়ার স্টাফ)-এর নিকট উত্থাপন করেছি যাতে তিনি কিছুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্যের সাথে দেখা করতে পারেন।

স্মারক

অনির্দিষ্ট সংখ্যক ইহুদী অভিবাসনের জন্য ফিলিস্তিনের দরজা খোলার ব্যাপারে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে আমাদের ওপর বিরাট দায়িত্ব বর্তাবে। এ ছাড়া প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই সকল সিদ্ধান্ত 'বেলফোর প্রমিজে'র সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ঐ প্রমিজে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য জাতীয় দেশ (National Homeland) সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে অথচ এখনকার এই সিদ্ধান্তসমূহে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে যা রয়েছে এতে ফিলিস্তিনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। উভয়ই এখন প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী। ইতিমধ্যে হাইফা, আল-কুদ্স ও তেল আবীবে ব্রিটিশ সরকারের আওতাধীন ইহুদী অভিবাসন অফিসগুলোতে বোমা হামলা হয়ে গেছে। কাজেই এখন উত্তেজনা বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী হবে। আমাদের কয়েকটি বিষয় বিবেচনা রাখতে হবে ঃ

১. এ অঞ্চলে এখন মিত্রবাহিনীর বিরাট সামরিক শক্তি রয়েছে। মিত্রপক্ষ এখন এগুলো অন্য ময়দানে সরিয়ে নিতে চায়। তারা এ অঞ্চলে তাদের দায়-দায়িত্ব হালকা করতে প্রয়াসী। তারা বরং উত্তর ইতালী ও অন্যান্য অপারেশন এলাকার মতো অন্য সেক্টরগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে চায়।

২. আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনী কেবল ফিলিস্তিনে নয়– গোটা ইসলামী বিশ্বেই বিদ্যমান। ভূমধ্যসাগর ঘিরে এবং উত্তর আফ্রিকা জুড়ে ইসলামী বিশ্বে ফিলিস্তিন ইস্যুটি একটি বিশেষ সংবেদনশীলতায় পৌঁছেছে। এদিকে মারাকেশের (মরক্কোর একটি প্রদেশ) গোত্রগুলোর মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছে। যদিও এই সকল অস্থিরতার সাথে ফিলিস্তিনের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তবে জার্মান প্রপাগাণ্ডার কারণে ইস্যুটিতে আগুন উস্কে দিতে পারে।

৩. আমাদের প্রাণময় যোগাযোগ রুটগুলো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে নিরাপদে আছে, এ ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনে ইহুদী স্বার্থের দিকে আগেভাগেই আমেরিকার ঝুঁকে পড়ার কারণে এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিতে পারে।

৪. রাশিয়াতে আমাদের কৌশলগত সাপ্লাই রুট পারস্য উপসাগর ও মধ্যপ্রাচ্য হয়ে বিস্তৃত। এই গোটা অঞ্চলেই মুসলমানরা বাস করে। আমাদের ইহুদী প্রীতি প্রকাশ পেলে আমাদের সাপ্লাই শত্রুতামূলক হামলা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

৫. ইউরোপ আমাদের যে কোন অপারেশনের ঘাঁটি হিসেবে দূরপ্রাচ্য আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এ ছাড়া ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে পাইপ লাইনটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণময় ধমনী —এটা কোন অস্থিরতার হুমকির সম্মুখীন হতে দেয়া যায় না।

৬. আমি আমাদের সমস্যাগুলোকে বাড়িয়ে বলতে চাই না। তবে আমি জানি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পেট্রোল লাইন স্থাপনের ব্যাপারে সৌদী আরবের সাথে আমাদের যোগাযোগ চলছে। আমি ভয় করছি, পাছে জায়নিস্ট পরিকল্পনার প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্বের কথা প্রকাশ পেলে সৌদীদের সাথে আমাদের আলোচনা বানচাল হয়ে যায়।

আমি আপনাকে বিষয়টি অবহিত করলাম। আপনি কোন পয়েন্টে কিছু যোগ করতে চাইলে আমি তা করতে প্রস্তুত রয়েছি। –স্বাক্ষর

জন মেকলে

বাদশাহ আব্দুল আযীয আলে সউদ মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের সাথে যোগ দিলেন। অন্য আরব রাষ্ট্রগুলোও এর সাথে যোগ দিয়ে আরব অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করল যাতে আরবদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডকুমেন্টের ভাষা চলেছে ঃ

ডকুমেন্ট নং ২২১৫ /০১/ ন ৮৬৭

সৌদী আরবে অবস্থানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত মিনিস্টার (মুস)-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি তারবার্তা ঃ

জেদ্দা ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪; সকাল এগারটা।

প্রিয় মন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আব্দুল্লাহ সুলাইমান আমার সাক্ষাতে এসেছেন। তিনি ফিলিস্তিন বিষয়ে বাদশাহ ইবনে সাউদ-এর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তারবার্তা নিয়ে এসেছেন। এটা তিনি আমাকে নিম্নরূপ পড়ে শুনিয়েছেন ঃ

"জেদ্দায় আমেরিকান মন্ত্রী সাক্ষাৎ করেন, তাকে তিনি জানান যে, যে সব সংবাদ আমরা শুনলাম তা আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এটা সকলের জন্যই খারাপ প্রভাব ফেলবে। আমাদের বিশ্বাস ফিলিস্তিন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া এখন প্রত্যাশিত নয়। এতে আবেগতাড়িত হয়ে বাক-বিতণ্ডা হবে। আমরা তাকে অনুরোধ করলাম যেন তার সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, আরবদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব এখন প্রমাণিত হতে হবে এবং বন্ধুপ্রতীম যুক্তরাষ্ট্র তার শুভকামনায় বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।"

ডকুমেন্ট নং ২২১৭/০১/ ন ৮৬৭

বৈরুতে নিযুক্ত কনস্যুলার জেনারেল ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি তারবার্তা ঃ

বৈরুত ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪; দুপুর ২টা।

আমাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সালিম টিক্‌লা ডেকে পাঠিয়েছেন এবং একটি স্মারক আমাকে দেন যাতে জায়নিস্টদের পক্ষে সিদ্ধান্ত সমূহের কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে লেবাননী পার্লামেন্টের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভাষ্যও রয়েছে, যাতে পবিত্র ভূমির ভাগ্য সম্পর্কে লেবাননীদের আগ্রহকে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে তা লেবাননের খৃস্টান ও মুসলমানদের উভয়ের জন্যই হুমকি সৃষ্টি করবে বলা হয়েছে। স্মারকটির ভাষ্য অত্রসাথ সংযুক্ত করা হলো।

—স্বাক্ষর

ওয়ার্ডসওয়ার্থ

ডকুমেন্ট নং ৩৪৪-৩/ ০০ ন ৮৬৭

পূর্ব জর্ডানের আমীর— আমীরে আব্দুল্লাহ'র পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট পত্র ঃ

আম্মান ঃ ৩ মার্চ, ১৯৪৪

মহামান্য প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট

ফিলিস্তিন ও তাতে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কংগ্রেসে যা চলছে তা আমাদের মনে গভীর হতাশা এনে দিয়েছে এবং তা সমগ্র প্রাচ্যেই সংক্রমিত হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে এ ইস্যু সম্পর্কে কংগ্রেস পুরোপুরি অবহিত নয়। আমি আশা করি আপনার

প্রতি এবং আমেরিকান জাতির প্রতি আমাদের বিরাট মর্যাদাবোধ ও ভালবাসা আপনি স্বরণে রাখবেন। আমি এই বিষয়গুলোর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এজন্য যে, আমার দেশটি ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী দেশ। তদুপরি এ দেশ জাতিসংঘের একটি বিশ্বস্ত বন্ধু।

–স্বাক্ষর

আমীর আব্দুল্লাহ

এ সময় আমেরিকান জায়নিস্ট লবি সমন্বিত আরব চাপ অনুভব করতে লাগল। তারা এটাও উপলব্ধি করল যে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় উভয়ই আরব দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে উঠতে লাগল— যদিও তার কারণ ভিন্ন হোক। এ প্রেক্ষাপটে ৯ মার্চ ১৯৪৪ তারিখে জায়নিস্ট আন্দোলনের দু'জন নেতা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাক্ষাতে হোয়াইট হাইজে গেলেন এবং তার সাথে তারা কথা বললেন। এরপর তারা যখন বের হলেন তখন তাদের হাতে একটি বিবৃতি ছিল— যা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রচারের জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। হোয়াইট হাউজের গেটে তারা ঘোষণাও করল। রয়টারের তারবার্তা অনুসারে ওয়াশিংটনে প্রকাশিত সে বার্তার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

দুজন ইহুদী রাব্বি ড. স্টিফেন ওয়াইজ ও ড. আবাহিলল সেলফার ফিলিস্তিনী জায়নবাদী আন্দোলনের প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে নিম্নবর্ণিত বিবৃতি প্রকাশের অনুমতি দেন ঃ

"আমেরিকার সরকার ১৯৩৯ সালে লন্ডনে প্রকাশিত শ্বেতপত্রের আদৌ অনুমোদন করেননি, যাতে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের সীমা নির্ধারিত আছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তার সন্তোষ প্রকাশ করছেন যে, ইহুদী শরণার্থীদের জন্য ফিলিস্তিনের দ্বার এখন উন্মুক্ত হবে। যখন মধ্যপ্রচ্যের বিষয়ে বিবেচনার সময় আসবে তখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় দেশ স্থাপনের দাবিদারদের ব্যাপারে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা হবে। এই লক্ষ্যকে আমেরিকা সরকার ও জনগণ গভীর সহানুভূতির সাথে দেখছেন। অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে লক্ষ লক্ষ ইহুদীর বিপর্যয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার ও কল্যাণের দৃষ্টিতে দেখবে।"

যা আশা করা হচ্ছিল—এই বিবৃতিতে আরব বিশ্বে উদ্বেগের আওয়াজ উঠল। মিসরই প্রথম নড়ে উঠল। প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা নাহ্হাস নিজেই কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত মিনিস্টার কের্ক-কে ডেকে এনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দুই রাব্বি স্টেফেন ওয়াইজ ও আবা হেলেল সিলভার-এর মাধ্যমে যে বিবৃত দিয়েছেন তাতে তাঁর

উদ্বেগের কথা এবং মিসর জাতির বিব্রতবোধের কথা জানালেন। নাহ্হাস পাশা ওয়াশিংটনে নিযুক্ত মিসরী ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে তার এই উদ্বেগের কথা মার্কিন সরকারকে জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ডকুমেন্ট নং ২৩০৪ / ৮৬৭ ন ০১

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্ররিত মিসরী ভারপ্রাপ্ত মিনিস্টার মাহমুদ হাসান পাশা'র স্মারক ঃ (এর এক কপি প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে প্রেরিত হয়)

তাং ঃ ১৪ মার্চ, ১৯৪৪

স্যার,

প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা নাহ্হাস পাশা ফিলিস্তিনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট-এর জবানে ঘোষিত বিবৃতির বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদটি আপনার নিকট পৌঁছানোর জন্য অত্র মিশনকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই অবয়বে এবং এই মর্মে ঘোষিত বিবৃতিটি মিসর জাতির অনুভূতিতে তথা গোটা আরব বিশ্বের অনুভূতিতে এক প্রচণ্ড আঘাত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থেকে এ বিবৃতির ব্যাখ্যা পেলে প্রধানমন্ত্রী কৃতার্থ হবেন।

ডকুমেন্ট নং ২২৫৫ /৮৬৭ ন ০১

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মিসরস্থ ভারপ্রাপ্ত মিনিস্টার কের্ক-এর নিকট তারবার্তা ঃ তাং ঃ ১৫ মার্চ ১৯৪৪, রাত ন'টা।

প্রেসিডেন্টকে লেখা প্রধানমন্ত্রী নাহ্হাসের পত্রের জবাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ করে জানিয়ে দিন যে ঃ

১. তাঁকে পরিষ্কার করে বলুন যে, প্রেসিডেন্টের বিবৃতিটি ছিল বেলফোর অঙ্গীকার অনুসারে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য একটি 'জাতীয় স্বদেশ' সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র' সম্পর্কে এ বিবৃতিতে কিছু বলা হয়নি।

২. তাঁকে এ-ও জানিয়ে দিতে পারেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার পক্ষ থেকে ১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্রে কোন অনুমোদন দেয়নি।

৩. নাহ্হাস পাশাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করতে পারেন যে, এ সরকার আরব ও ইহুদীদের সাথে পূর্ণ পরামর্শ না করে ফিলিস্তিন সম্পর্কে তার নীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনবে না।

—স্বাক্ষর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ডকুমেন্ট নং ২২৯৯ / ৮৬৭ ন ০১

মিসরে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত মিনিস্টার কের্ক-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট তারবার্তা ঃ (প্রেসিডেন্টের দপ্তরে অনুলিপি প্রেরিত)।

কায়রো ঃ ২৯ মার্চ, ১৯৪৪; বিকেল চারটা।

প্রিয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী,

আমি নাহ্‌হাস পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এজন্য হতাশা ব্যাক্ত করলেন যে, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজ বিবৃতিটি ইহুদী নেতাদের মাধ্যমে প্রকাশ করার বিষয়টি অনুমোদন করলেন। তবে তিনি এটা জেনে স্বস্তিবোধ করছেন যে, এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলতে পারে এমন বড় ধরনের সিদ্ধান্তগুলো আরব ও ইহুদীদের সাথে পরামর্শ করে গ্রহণ করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আরব দেশগুলোতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে এমন বিবৃতি প্রকাশ থেকে সকল পক্ষ বিরত থাকবেন। আরব জাতিগুলোর দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। কাজেই প্রকাশিত বিবৃতির মতো প্রেসিডেন্ট বা কংগ্রেসের কোন বিবৃতি প্রকাশিত হলে সাধারণভাবে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। তিনি আমার কাছে কয়েকবারই বলেন যে, তিনি স্বীকার করেন— ইউরোপে ইহুদীদের উপর নির্যাতন চলেছিল। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না যে, কেন তাদের নির্যাতনের বদলা ফিলিস্তিনীদের সার্বভৌমত্বের অধিকারের বিনিময়ে চুকাতে হবে।

অচিরেই এ সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে আপনার নিকট প্রেরণ করা হবে। তবে নাহ্‌হাসের জবাবের মূল প্রতিপাদ্য এটাই।

–স্বাক্ষর

কের্ক

জায়নিস্ট আন্দোলন ওয়াশিংটনে কেন্দ্রীভূত হলেও ম্যান্ডেটরী গভর্নমেন্ট ব্রিটেনের সাথে তার ভূমিকা চালিয়ে যাচ্ছিল তখনও। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ে তার অবস্থানের একটি মূল্য রয়েছে। কারণ তখনও পর্যন্ত সে-ই তো ফিলিস্তিনের দুয়ারে খাড়া দ্বাররক্ষী। লন্ডনের গুরুত্বের আরেকটি কারণ হলো—এটি হচ্ছে বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশনার উৎস। যার গুরুত্ব আছে বৈ কি। এ পর্যায়ে বিভিন্ন ডকুমেন্ট গল্পের পরিসমাপ্তির খবর দিচ্ছে ঃ

ডকুমেন্ট নং ৬৪৪-১২/ ৮৬৭ ন ০১

নিকটপ্রাচ্য ও আফ্রিকা বিষয়ক দপ্তরের পরিচালকের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত স্মারক ঃ

ওয়াশিংটন ঃ ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

মন্ত্রী মহোদয়,

বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থার সভাপতি ডঃ হায়েম ওয়াইজম্যান ওয়াশিংটনের রাব্বি সেলফার-এর নিকট যে চিঠি লিখেছেন তার একটি কপি আমাদের হস্তগত হয়েছে। এর মধ্যে ডঃ ওয়াইজম্যান ও বিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল-এর মধ্যকার আলোচনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।

এই স্মারকটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. ব্রিটিশ সরকার এখন ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছেনি। খুব সম্ভব তারা জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধাবসানের পর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

২. জায়নিস্টদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী চার্চিল-এর অনুপ্রেরণা সকলের জানা। যদিও তার কিছু মন্ত্রী এর বিরোধিতা করছেন। তবে তিনি মনে করেন যে, তিনি ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যৌথভাবে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সক্ষম।

৩. প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বিশ্বাস করেন যে, ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া তিনি ওয়াইজম্যানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আগামী দশ বছরের মধ্যে দেড় লক্ষ ইহুদীকে ফিলিস্তিনে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে সম্মত হয়েছেন।

৪. এ প্রেক্ষিতে ডঃ ওয়াইজম্যান এখন রাব্বি সেলফারকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান ঃ

ক) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট-এর প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ— যেমন, পারুখ, মোরগান্টা, ইউগেন মায়ের (ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার মালিক ও তাঁর বর্তমান স্ত্রী ক্যাথারিন গ্রাহাম-এর পিতা) ও ফিলেক্স ফ্রাঙ্কফুর্টার এবং বেন কোহেন (প্রখ্যাত আইনজীবী)— তাঁদেরকে এখনই প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে লোহা গরম থাকতেই মারার চেষ্টা করতে হবে এবং তাঁকে কমপক্ষে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের দ্বার নিঃশর্তভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়ে রাযী করাতে হবে।

খ) এরপর আমেরিকান কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডক্টর লাইডার মিল্ক প্রণীত আমেরিকান প্রকল্পটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এটা ফিলিস্তিনের পণ্য উন্নয়নের বিষয়ে প্রণীত। কারণ ইহুদীদের সাথে সহযোগিতার মধ্যেই আরবদের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে এ মর্মে আরবদের বুঝ দেওয়ার জন্য 'উন্নয়নই' হচ্ছে প্রবেশ দ্বার।

আমি আশা করি এ বিষয়গুলোকে আপনি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবেন, বিশেষ করে ফিলিস্তিনকে ভাগ করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ইচ্ছা সম্পর্কিত বিষয়টি।

–স্বাক্ষর

মূরে

॥ ৬ ॥

এলিয়ানূর রুজভেল্ট

"জায়নিস্টদের যে কোন ধরনের সহযোগিতা করা আল্লাহর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।"

—বাদশাহ আব্দুল আযীয আল সউদ —উইনস্টন চার্চিলের সাথে এক আলোচনাকালে

যখন কামানের গর্জন থেমে গেল, ট্যাঙ্কগুলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরে গেল, ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যের যুদ্ধ ময়দানগুলোতে তখন এতদিন যুদ্ধের কারণে থেমে যাওয়া উন্নয়ন ও আন্তঃক্রিয়াশীল বিষয়গুলো আবার স্বচ্ছন্দের গতি পেল। এমনিভাবে যে লাইম লাইট ছিল এতদিন গোপনীয়তা ও আভরণের জন্য নীল রঙে ঢাকা এখন সেই দীপ্ত প্রদীপের কিরণ এ অঞ্চলের রাজনৈতিক মঞ্চে নিবদ্ধ হলো। সকল শক্তি এখন গতিশীল। প্রতিটি শক্তিই এখন আরদ্ধ বস্তু লাভের প্রত্যাশায় সবচেয়ে উপযুক্ত স্থানটির নিকটবর্তী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ নাটকের কিছু দৃশ্য ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আবার কিছু নিছক ভাগ্যের ফের। এর মধ্যে কিছু তো ছিল নিশ্চিতভাবে পরিকল্পিত নীলনক্সার তফসিল আবার কিছু বিষয় মনে হয়েছে অপ্রত্যাশিত ঘটনপ্রবাহের ঘূর্ণাবর্তে ছিটকে পড়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছে কেবল। বাহ্যত ময়দানে তিনটি শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল যারা প্রস্তুত হয়েছিল হয় পাতানো ভূমিকা পালন করতে নয়ত নিজের জন্য আটা ভূমিকা রেখে যেতে। এই শক্তিগুলো ছিল ঃ

১. প্রথম শক্তি ছিল— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি। এর আর্থিক সম্পদ আর সামরিক শক্তি তাকে দিয়েছিল যুদ্ধোত্তর বিশ্বের নেতৃত্বের অধিকার। খুব সম্ভব যুক্তরাষ্ট্র নিজেও এই দায়িত্ব নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু শক্তি! তার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সে তার বাহককে যোগ্য আসনে নিয়ে যাবেই চাই সে অনিচ্ছায় হোক আর পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই হোক।

যা হোক, সমুদ্রের ওপাড়ে সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলটি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই আকর্ষণের মূল কারণ ছিল তেল সম্পদ। আমেরিকান শক্তি তখন শক্তি প্রয়োগের চর্চায় পূর্ণ সংস্কৃতি লাভ করেনি। এজন্যই মধ্যপ্রাচ্যের অঙ্গনে তথা তেল সম্পদের ময়দানে তার প্রবেশটা মনে হয়েছিল যেন কোম্পানীগুলোর সাথে সরাসরি

সন্ত্রাসী ধাক্কাধাক্কির কাজ। মনে হচ্ছিল যেন সে যুদ্ধ জয়ের পর মালে গনিমতে অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী এক বাহিনী। কাজেই অনিবার্যভাবেই এই সম্পদের মালিকদের সাথে তার সংঘাত লেগে যায়। আর কেউ নয়— স্বয়ং ব্রিটেন— যে নিজেকে যুদ্ধের মূল শরীক মনে করে এবং আমেরিকার আগেই এখানে এসেছিল; নিশ্চয়ই এমন শত্রু নয় যার সম্পদকে মালে গনিমতের মতো বৈধ ভাবা যায়। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে সচেতন হয়ে গেল। কাজেই এই সম্পদের দেশে যারা আদি অধিবাসী সেই আরবদের সাথে কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী আর খোশামোদী ভাব দেখাতে লাগল। তাদের বোঝা ও জানার স্বল্পতাকে ঢাকার জন্য তোষামোদীর আশ্রয় নিল। আচার-ব্যবহারে এমন ভাব দেখাল যেন কোন পর্যটক অজানা কোন দেশ সম্পর্কে সে দেশের কিংবদন্তীর কথা শুনে থাকে। সেটা রাজনীতির চেয়ে যেন ফোক্‌লোরের বেশি ঘনিষ্ট, তেমন ভাবই তখন দেখিয়ে থাকে।

তবে আরবদের সাথে সম্পর্কের বৈষয়িক দিকটি বলতে গেলে তখনও আমেরিকান নীতির প্রাথমিক ধারণা সমীক্ষা পর্যায়েই ছিল। অবশ্য আমেরিকান চিন্তা-ভাবনা থেকে পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা দূরে ছিল না। কারণ কৌশলগত চিন্তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয় নয়। কারণ কৌশল নিয়ন্ত্রিত হয় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ইত্যাদি স্থায়ী অবস্থানের প্রেক্ষাপটে। তবে তা যুগের পরিবর্তনে পুনর্বিন্যস্ত হতে পারে।

২. এই অঙ্গনে প্রবেশমান দ্বিতীয় শক্তিটি ছিল— বিশ্ব জায়নিষ্ট আন্দোলন। তাদের উপলব্ধি তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা ভাবতে লাগল— স্বপ্নের বাস্তবায়ন অত্যাসন্ন; যদি এখন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তা আর ফিরে না-ও আসতে পারে। এ জীবনে আর দেখে যেতে না-ও পারে।

এ সময় জায়নিস্ট আন্দোলন তাদের একটি সামর্থ্যের সাথে আরেকটিকে বেঁধে দিয়েছিল চাই আমেরিকা-ইউরোপের রাজনৈতিক প্রভাবের গুপ্ত গোড়াঘরে অথবা স্বয়ং ফিলিস্তিন ভূমিতেই হোক। ভূমিতে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে লাগল— চাই অভিবাসী ধারায় অথবা বসিত গড়ে অথবা সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। এ সময় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল অর্ধ মিলিয়নের কাছাকাছি। ইহুদী এজেন্সীতে অন্তর্ভুক্ত নেতারা বিশেষ করে তাদের প্রধান ব্যক্তি ডেভিড বেনগোরিয়ন উপলব্ধি করলেন যে, ইউরোপ থেকে যে বড় অভিবাসী ঢেউগুলোর অপেক্ষা করা হচ্ছে তা কখনও বাস্তবায়িত হবে না। যদি না ফিলিস্তিনে এমন ইহুদী জাতীয় রাষ্ট্র হয় যা কিনা উত্তর আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো নতুন বিশ্বের প্রতি হাতছানিকে উপেক্ষা করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে।

যখন বেন গোরিয়নকে ফিলিস্তিন নিয়ে তার তড়িঘড়ি পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তাকে নাহুম গোল্ডম্যান-এর পর্যায়ের ব্যক্তিরা বলেছিলেন যে, তিনি সব বিষয়গুলোকে একেবারে পাড়ে নিয়ে যাচ্ছেন; অথচ ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসন এখনও একটি রাষ্ট্র গঠনের মতো উপযোগী সাইজে পৌঁছেনি। তখন তিনি এর জবাবে বলেছিলেন— বাস্তবে একটি রাষ্ট্র না থাকলে অভিবাসন উপযুক্ত পর্যায়ে কখনও পৌঁছুতে পারবে না।

৩. তৃতীয় শক্তিটি ছিল— মিসরী শক্তি এবং এর প্রাচ্য-ভূমিকা। এখানে রাজনীতির আগে আপনার চোখে পড়বে এর শিল্প-সাহিত্য আর চিন্তাধারা। এটা মিসরের স্বতন্ত্র রাজনীতিকদের মাঝেই প্রাচ্য বিদ্যায়তন তুলে ধরেছে— সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু কোন দল তা তুলে ধরার আগেই। এই প্রাচ্য স্কুলের কিছু রাজনীতিক যেমন আযীয মিসরী, আলী মাহের, আব্দুর রহমান আযযাম প্রমুখ নেতার প্রভাবেই বাদশাহ্ ফারুক এই দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। হ্যাঁ, সবশেষে মোস্তফা নাহ্হাসের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তা অনুশীলন করে। তিনিই সিরিয়া ও লেবাননের সাথে সংহতির লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। অবশেষে তিনিই আরব লীগ অঙ্গীকারে তার স্বাক্ষর করেন।

আসল সমস্যাটি ছিল— মিসর যুদ্ধের উত্তাল উতোরল থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিল তখন মনে হলো এ যেন এক জাহাজ যার পাল গেছে ছিঁড়ে, তক্তা খসে পড়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং ঘূর্ণিকবলিত হয়ে তার ইঞ্জিন গেছে নষ্ট হয়ে।

* পাল ছিল আল্ ওয়াফ্দ পার্টি। চলার পথে সত্য অথবা অসত্যের দ্বারা পাল ছিঁড়ে গেছে। এর শুরু হয়েছিল ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২-এর সতর্কীকরণের পর তার মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছিল পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোকাররম উবাইদ পাশা প্রণীত কালো পুস্তিকা (কৃষ্ণপত্র) প্রকাশের পর। এই পুস্তিকাটিই দলকে শতধা বিভক্ত করে দেয়।
* এর তক্তা ছিল রাজপ্রাসাদ। এর শক্তি এলোমেলো হয়ে গেল যখন যুদ্ধকালীন সময়ে বাদশাহ ফারুকের ব্যক্তিত্বে কিছু পরিবর্তন ঘটাতে তার পরাক্রম অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল। যার জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক, চারিত্রিক ও শারীরিকভাবেও পুরোপুরি স্থূল ও নতজানু হয়ে পড়েছিলেন।
* জাহাজের পেটে বসানো ইঞ্জিনটি ছিল ব্রিটিশ দখলদার শক্তি। সেটাও অসাড় হয়ে পড়ল যখন জাতীয়তাবাদী জোরওয়ার ঢেউ আছড়ে পড়ল তাতে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দাবি ছিল স্বাধীনতা এবং মিসরের প্রতি ইঞ্চি জমীন থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর বহিষ্কার।

১৯৪৫ সালে অনিরুদ্ধ ধারায় একটার পর একটা তোলপাড় করা ঘটনা ঘটে যেতে লাগল। রুজভেল্ট ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চিল ও স্তালিনের সাথে অংশগ্রহণের পর

মিসরে এলেন। এখানে তিনি আমেরিকান ডেস্ট্রয়ার ক্রেজার 'কোয়েন্সি'তে আরোহণ করেন। একটি ছিল তখন সুয়েজ খালের মধ্যবর্তী লোনাপানির হ্রদগুলোতে ভাসমান। এখানেই তিনি বাদশাহ্ আব্দুল আযীয আলে সউদ (পেট্রোলিয়ামের সবচেয়ে বড় শেখ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সাথে আলাপ করেন; আবার তাঁর কাছ থেকে শোনেন। মিটিং থেকে বের হয়ে রুজভেল্ট বাদশাহ্ আব্দুল আযীয সম্পর্কে মন্তব্য করেন— 'মহান বন্য'। এরপর রুজভেল্ট ক্রুজার কোয়েন্সির পিঠে বাদশাহ্ ফারুক (সক্রিয় আরব ভূমিকা পালনে আহূত দেশ)-এর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বাদশাহ্ ফারুক-এর সাথে বৈঠক শেষে বের হয়ে বলেন— এ তো দেখি 'বর্ণচোরা প্রাচ্য দাস'।

এই সবকিছু বলা ও শোনার পর রুজভেল্ট স্বদেশে ফিরে এলেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে গ্রাস করল। তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। সফরকারী আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে তাঁর দুঃখ ও বেদনার স্তূপ মেলে ধরলেন যা তিনি ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড কিলার্ন-এর স্বৈরাচারী আচরণে পেয়েছেন এবং তিনি যে তাঁর ওপর মন্ত্রণালয়গুলো চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। রুজভেল্টের অভিমত ছিল যে, যুদ্ধোত্তর সময়ে 'প্রাচ্যের বর্ণচোরা দাসটির' উপর অপমানজনক চাপ প্রয়োগের আর কোন কারণ নেই। বাদশাহ্ ফারুক যা চেয়েছিলেন তা তিনি পেয়েছেন। তার মাথার উপর লর্ড কিলার্ন-এর উপস্থিতির দুশ্চিন্তা দূর হলো। এর পর তিনি নাহ্হাস পাশাকে বরখাস্ত করলেন এবং আহমাদ মাহের-এর নেতৃত্বে নিজের পছন্দসই মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই সংসদ ভবনের ফেরাউনী হলে তিনটি বুলেটের আঘাতে তিনি নিহত হলেন। তার ডেপুটি মাহমুদ ফাহমী নাকরাশী তার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

আহমদ মাহের আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার আগে এক বড় সমস্যায় পড়েছিলেন। এ সময় জায়নিস্ট সংস্থা 'ইর্ষ্টান' তার দু'জন সদস্যকে পাঠিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী ব্রিটিশমন্ত্রী লর্ড মোয়েনকে হত্যা করেছিল। এভাবেই দেখা গেল জায়নিস্ট এ্যাকশন সহিংস পর্যায়ে প্রবেশ করল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, এখন থেকে বুলেট দিয়েই দরজা খুলতে থাকবে। এই সহিংসতা শুরু করার জন্য বিশেষ করে মিসরকেই বেছে নিল। কারণ যুদ্ধ অবসানের পর আরব আন্দোলনের নের্তৃত্ব দেয়ার যোগ্য পাদপীঠ হিসাবে তাকে ঘিরেই বিরাট স্বপ্ন রচিত হচ্ছিল।

এরপর ব্রিটেনে নির্বাচন চলল। দেখা গেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিংবদন্তীর নায়ক উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদ হারালেন। তার লেবার পার্টির ডেপুটি 'ক্লিমেন্ট আটলে' তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। মনে হয় ব্রিটিশ ভোটাররা তাদের সচেতনতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, সামরিক যুদ্ধে বিজয় অর্জনের ধাপ শেষ হয়ে গেছে।

এখন সামাজিক অধিকার পুনর্বণ্টনের অবধারিত সময়। লেবার পার্টি মন্ত্রিসভা গঠন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিলেন আর্নেস্ট বেকেনকে। তাঁর চিন্তায় সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ। ব্রিটেন এখন তার পুরনো উপনিবেশ— প্রধানত ভারতের সাথে এক ধরনের নতুন সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এই সব অনিরুদ্ধ পবির্তনসমূহের ফলে ১৯৪৫ সালের শুরুতেই এ অঞ্চলে রাজনৈতিক খেলার নীতিতে ভিন্নতা এল। খেলোয়াড়রাও বদল হলো এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও গেল বিগড়ে। এখন উদিত হলো নয়া প্রভাব বলয় আর নবতর সম্পর্ক।

সব কিছুই বিক্ষিপ্তভাবে এগুচ্ছিল একটি পরিণতির দিকে। বিভিন্ন পক্ষ একে অন্যের প্রতিটি কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল।

১. এ সময় আরব লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসর ছিল এর পুরোধা। কিন্তু এখন সে আর তার নেতৃত্ব দিতে সক্ষম রইল না। ব্রিটেনই এ আরব লীগ গঠনের সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র হলো এ অঞ্চলের দিকে আগুয়ান আগামী শক্তি। এখানে সে তেল সম্পদ ইত্যাদির অন্বেষায় রয়েছে।

২. যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত অগ্রসর হলেও মধ্যপ্রাচ্যের জন্য নতুন নিয়মের জাল বিস্তার করে চলেছে। সে তার চলমান অবস্থায় এমনকি অনিচ্ছায়ও ব্রিটেনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে। যা কোন কোন ক্ষেত্রে ধাক্কাধাক্কির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যেমনটি ঘটেছিল সৌদি আরব ও উপসাগরীয় এলাকার তেল সুবিধাদি অর্জনের ক্ষেত্রে।

৩. ব্রিটেন তার প্রতি আরোপিত এই ঠ্যাঙানি নীতিতে কিছু সময় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। সাময়িকভাবে এটাকে মেনে যাবে নাকি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবে। কারণ এখন একটা আশা আছে যে, 'ইংরেজিভাষী জাতিসমূহের ঐক্য' বা 'ব্রিটিশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য' এ ধরনের কোন দাবির আশ্রয়ে তার কাছে কিছু সহমর্মিতা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার দৃপ্ত অগ্রযাত্রায় এতই অনমনীয় যে, কে তার পায়ে পিষ্ট হচ্ছে তার পরোয়া করছে না। হ্যাঁ, সে মাঝে মাঝে যদি বেদনার্ত চিৎকার শুনতে পায় তাহলে 'সরি' বলে এগিয়ে যেতে থাকে।

৪. আমেরিকার নীতিতে আসল বিপর্যয় হচ্ছে— যে সময়টিতে আমেরিকার শক্তিটি মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করেছিল ঠিক একই সময় সন্ধিক্ষণে ইহুদী লবিটি পৌঁছে গিয়েছিল আমেরিকা প্রশাসনের সে সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যেখান থেকেই মূলত সিদ্ধান্ত আসে। এমনকি ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতেও তাদের পদচারণা ছিল অবাধ। অর্থাৎ যখন যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে পৌঁছে গেল তখন তার ওপর অবলীলায় ইহুদী প্রভাব ভর করে আছে। এমনই একটি ভয়ঙ্কর

পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যখন আরবদের কাছে আমেরিকার অনেক স্বার্থ অপেক্ষা করছে। এতদসত্ত্বেও আরব বিরোধী লবির চাপের মুখে আমেরিকার সিদ্ধান্তগুলো ছিল একেবারে খোলামেলা।

৫. তখন ফ্রান্সের অবস্থা ছিল অনেকটা ক্রুদ্ধ দৈত্যের মতো। পূর্ব আরবে তার আবাদকৃত ভূমি হারালো, আর তাই স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল সৃষ্টির জন্য ফুৎকারে ব্যস্ত। একই সময়ে সে কিছু স্থানে তার অবস্থান সুদৃঢ় করার চেষ্টারত ছিল। পশ্চিম আরব বিশেষ করে আলজিরিয়ায় চিরদিনের মতো তার আবাস স্থাপনে সে ছিল কৃতসংকল্প।

৬. এদিকে ইহুদীবাদী জায়নিস্ট আন্দোলন তখন ফিলিস্তিনের অভ্যন্তর ভাগে, তার চারপাশে এমনকি দূর থেকেও সহিংসতা, ধোঁকাবাজি, তোষামদী; বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাকার সকল উপায়ে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল— ইতিহাসের বিরল সুযোগকে কাজে লাগিয়ে। কারণ তখন আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত ছিল অস্পষ্ট, আঞ্চলিক সিদ্ধান্ত ছিল দ্বিধাগ্রস্ত আর জমীনও এমন লোকদের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল যারা ছিল ভাষার লালিত্য ও শব্দের প্রাঞ্জলতায় নয়— দুর্দান্ত কাজ আর দুঃসাহসিকতার অধিকারী।

আবারও দলিল-দস্তাবেজই এ পর্যায়ের বর্ণ ছায়াকে তুলে ধরছে ঃ

দলিল নং ২৪৫-১/....ন ৮৬৭

পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টেটনিউস-এর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর নিকট প্রেরিত স্মারক ঃ

তাং ঃ ৪ জানুয়ারি, ১৯৪৫

প্রেসিডেন্ট

আমি কিছু তথ্য পেয়েছি যে, জায়নিস্টগণ ফিলিস্তিনের উন্নয়নের লক্ষে লাউডার মিল প্রকল্প গঠনের ব্যাপারে আপনাকে অনুরোধ করবে। এ প্রকল্পটির বিস্তারিত বুলেটিন ডঃ ওয়াল্টার ক্লে-এর 'প্রত্যাবর্তন ভূমি ফিলিস্তিন' শীর্ষক গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। আমেরিকান কৃষি মন্ত্রণালয়ের লাউডার শিল্প প্রকল্পটির প্রস্তাবনা হচ্ছে— তুনাইসী অববাহিকা প্রকল্পের মতো জর্ডান অববাহিকায় একটি প্রকল্প হাতে নেয়া। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে— ফিলিস্তিনকে ৪ মিলিয়ন ইহুদী অভিবাসী ধারণ ক্ষমতার উপযোগী করে তোলা।

আমি ভেবেছি পূর্বাহ্নেই আপনার এটা জানা প্রয়োজন।

–স্বাক্ষর

এডওয়ার্ড স্টেটনিউস

ডুকমেন্ট নং ৫৪৫-১ ... ব ৮৯০

সৌদি আরবে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উইলিয়াম এডে কর্তৃক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত টেলিগ্রাম ঃ

জেদ্দা ঃ ৫ জানুয়ারি, ১৯৪৫

আবদুর রহমান আয্যাম পাশা (তৎকালীন মিসরের আরব বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পরবর্তীতে আরব লীগের প্রথম মহাসচিব) আমাকে জানিয়েছেন যে, যখন আরব লীগ গঠনের খসড়া প্রটোকল প্রকল্পে স্বাক্ষরের জন্য বাদশাহ্ আবদুল আযীযের নিকট উপস্থাপন করা হলো তখন তিনি দু'টি বিষয়কে প্রাধান্য দেন।

১. প্রয়োজনে সশস্ত্র প্রতিরক্ষার লক্ষে আরব দেশগুলোর মধ্যে একটি সামরিক জোট গঠন জরুরী হয়ে পড়েছে।
২. জায়নিস্টদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনী আরবদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অঙ্গীকার লাভ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে তারা অস্ত্র দিয়েই আরবদের সমর্থন দিয়ে যাবে এ অঙ্গীকারও নিতে হবে। বাদশাহ আবদুল আযীয তখন আয্যামকে আরও বলেন, ফিলিস্তিন আরবের অধিকার রক্ষায় তিনি যুদ্ধ ময়দানে শাহাদাতবরণকে সম্মানের সাথে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত।

আমার মনে হচ্ছে, প্রচারমাধ্যমগুলো ফিলিস্তিনের ব্যাপারে জায়নিস্ট দাবি-দাওয়ার প্রতি আমেরিকার সমর্থনকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করছে। আমি আমেরিকা সরকারের মাধ্যমে জায়নিস্টদের সমর্থনে পদক্ষেপ গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেই। এ ধরনের কিছু ঘটলে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ডাকে প্রেরিত হবে।

–স্বাক্ষর
উইলিয়াম এডে

ডকুমেন্ট নং ৩০৪৫-১/-৮৬৭ ন ০১

মিসরী ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গোজেফ ক্রু-এর মধ্যকার আলোচনার স্মারক ঃ

তাং ঃ ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৫

আজ অপরাহ্ণে মিসরী ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাহমুদ হাসান পাশা আমার সাক্ষাতে এসেছেন। তিনি প্রথমে শুরু করে বলেন যে, এ যাত্রা তিনি আমাদের দু'দেশের সম্পর্কিত কোন বিষয় আলোচনা করার জন্য আসেননি, বরং তিনি ফিলিস্তিন বিষয়ে আলাপ করতে এসছেন। এটা তার ধারণায় পৃথিবীর এক বড় ভয়ানক অভিশাপ। তিনি আশঙ্কা করছেন যে, এ নিয়ে এ অঞ্চলে অচিরেই ব্যাপক এক যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ফিলিস্তিন একটি আরব মুসলিম-খৃস্টান দেশ হিসাবে থাকতে হবে, এখানে ইহুদীদের স্বাভাবিক অধিকার থাকতে পারে যা এ দেশের ভবিষ্যতে কোন প্রভাব ফেলবে না। তিনি মনে করেন ফিলিস্তিন বিষয়ে আলোচনার

সময় সমাগত। তার বিশ্বাস এভাবে অনেক কিছুই বাস্তবায়ন সম্ভব। মাহ্মুদ হাসান পাশা আরও বলেন, মিসর একটি ছোট দেশ। এটি প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহমর্মিতা ও নৈতিক সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। মিসরীরাও জানে যে, যুক্তরাষ্ট্র কোন লোভী রাষ্ট্র নয়। অন্য অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারেও তার আগ্রহ নেই।

–স্বাক্ষর
গোজেফ ক্রু

ডকুমেন্ট নং ১৪৫-২/৮৬৮ ন ১

সৌদী আরবে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উইলিয়াম এডে'র পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত স্মারক ঃ (ইয়ালটা শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণরত মন্ত্রীর নিকট তা স্থানান্তর করা হয়।)

তাং ঃ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫

বাদশাহ আব্দুল আযীয গতকাল আলোচনায় সংশ্লিষ্ট আমেরিকান সেনা অফিসারদের অভ্যর্থনা জানাবার সময় অবিশ্বাস্য রকমের বিবৃতি দেন। তার এ বিবৃতিকে বাস্তবে আরব বিষয়ে নেতৃত্বের এক দুঃসাহসিক নীতির ঘোষণা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এটা ব্রিটিশদের কাছ থেকে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট পৌঁছেছে তার সাথে অসঙ্গতিশীল। তারা বলেছিল যে, বাদশাহ ফিলিস্তিনী আরবদের সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। বাদশাহর বিবৃতিটি ছিল নিম্নরূপ— আরব জাতি দু'টি হুমকির সম্মুখীন। প্রথমত সিরিয়ার উপর ফরাসী চাপ দ্বিতীয়ত ফিলিস্তিনের উপর ইহুদী চাপ। আমরা আশা করেছিলাম যে, মিত্ররা সিরিয়ার স্বাধীনতাকে দেয়া তাদের স্বীকৃতির মর্যাদা রাখবে। যদি মিত্রপক্ষ ফরাসীদের আচরণে বুদ্ধি-বিবেচনা ফিরিয়ে এনে দেয়, যাতে সিরীয়রা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে পারে। আর আপনারা তো প্রতিটি জাতির স্বার্থে এ জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন, তাহলে সেটাই হবে আমাদের আজকের প্রত্যাশা। অন্যথায় আরবরা নিজেরাই সিরিয়াকে সহায়তা দিয়ে যাবে। আর ফিলিস্তিন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো আমেরিকা ও ব্রিটেনের সামনে দু'টির একটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার রয়েছে ঃ হয় শান্ত ও নিরীহ আরব জাহান অথবা রক্তে ডোবা ইহুদী রাষ্ট্র।

আমরা আমেরিকার কাছে আমেরিকার প্রথাগত ইনসাফের ভিত্তিতে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান চাই। যদি পবিত্র কুরআনে চরমভাবে অভিশপ্ত এ ইহুদী জাতির প্রতি আমেরিকা ঝুঁকে পড়ে তাহলে এ কারণে আমেরিকা আমাদের সাথে বন্ধুত্ব হারাবে এবং অচিরেই এর জন্য লজ্জিত হবে। যা হোক, এখন কোন্‌টি পসন্দ করবে এটা আমেরিকার ব্যাপার। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানালাম। আমি আশা করি আপনারা এ বিষয়টি আপনাদের সরকারকে জানিয়ে দেবেন।

–স্বাক্ষর
উইলিয়াম এডে

ডকুমেন্ট নং ১৪৫-২/৮৬৭ ন ০১

(প্রাগুক্ত প্রামাণ্য স্মারকের বিষয়ের সাথে মিলের কারণে দুটোর নম্বর একই) সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গোজেফ ক্রু-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত স্মারক।

তাং ঃ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫

আমার সাক্ষাতে ডঃ স্টেফেন ওয়াইজ (বিশ্ব জায়নিস্ট পরিষদের সভাপতি) ও ডঃ নাহুম গোল্ডম্যন, মিস্টার হারমেন ও ডঃ হায়েম গ্রীনবার্গ এসেছিলেন। রাব্বি ওয়াইজ, তাৎক্ষণিকভাবে একথা বলে আলোচনার সূত্রপাত করেন "ইহুদীদের সামনে ফিলিস্তিনের দরজা উন্মুক্ত করতে হবে।" তিনি ও তার সতীর্থরা এটা জানেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইয়াল্টা সফরে যাবার আগে তাকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে, এতে তারা তাদের সাথে কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায় (বিখ্যাত সেই শীর্ষ সম্মেলনে রুজভেল্ট চার্চিল ও স্তালিনের সাথে মিলিত হন)।

তারা স্থির বিশ্বাস করেন যে চার্চিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আশা করেছেন স্তালিন যদি ইহুদী বিরোধী কোন অনুভূতি প্রকাশ করেন তাহলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তা দৃঢ়তার সাথে তাদের পক্ষে অবস্থান নেবেন।

–স্বাক্ষর

গোজেফ ক্রু

ডকুমেন্ট নং ২২৪৫-২/৮৯০ ফ ০০১

সৌদি আরবে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উইলিয়াম এডে'র পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত স্মারক ঃ

জেদ্দা ঃ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫

স্যার,

আপনার সদয় অবগতির জন্য আলোচনা তারবার্তা নং ৮৯ তাং ২১ ফেব্রুয়ারি প্রেরিত হলো। মিঃ চার্চিলের সাথে বাদশাহ্ আব্দুল আযীযের বৈঠক সম্পর্কে বাদশাহর নিকট যা শুনেছি তা আপনাকে জানাচ্ছি ঃ

বাদশাহ গতকাল আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন যে মধ্যাহ্নভোজের পর একটি বৈঠকে ফিরে যাই, যেখানে তিনি ও আমি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকবেন না। বরং তিনি চান এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীও যেন না থাকে। বাদশাহ আমাকে বললেন, তিনি চান তাঁর ও মিঃ চার্চিলের মধ্যকার আলোচনাটি বিস্তারিত যেন আমার সরকার অবহিত হয় (মিসরের তিক্তহ্রদে বাদশাহ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাথে বৈঠকের পর 'ফিউম' এ দু'জন বৈঠকে মিলত হন)। বাদশাহ্ তাঁর উক্ত বৈঠকের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রায় হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

চার্চিল গভীর আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে আমার সাথে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি যেন কর্কশভাবে ছড়ি ঘুরিয়ে আমাকে বললেন, "ইংল্যান্ড আমাকে বিশ বছর ধরে আর্থিক সমর্থন ও সাহায্য দিয়ে এসেছে, সে আমার রাজত্ব স্থিতিশীল করতেও সাহায্য করেছে এবং এর প্রতি প্রতিটি লোলুপ দৃষ্টি ঠেকিয়েছে। যেহেতু ব্রিটেন আমাকে আমার কঠিন দিনগুলোতে সহযোগিতা করেছিল। তাই সে এখন ফিলিস্তিনের ব্যাপারে আমার সহযোগিতা চায়। তিনি মনে করেন, ফিলিস্তিনে ইহুদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আরব জাগরণের নায়কদের দমাতে আমি যেন শক্তিধর আরব নেতা হিসাবে আমার ক্ষমতা প্রমাণ করি। চার্চিল আমাকে (বাদশাহকে) বলেন, আমার উচিত মধ্যপন্থী আরবদের নিয়ে জায়নিস্টদের সাথে যেন আমি মাঝামাঝি সমাধানে আসি। তিনি আমার কাছে আশা করেন, আমি যেন ইহুদীদের জন্য ছাড় দেয়ার বিষয়টি গ্রহণ করার ব্যাপারে আরব জনমত তৈরি করতে সহযোগিতা করি।

আমি এর উত্তরে চার্চিলকে উত্তর দেই, আমি কখনও ব্রিটেনের বন্ধুত্ব ও অবদানের কথা অস্বীকার করিনি। বন্ধু হিসাবে আমি মিত্রপক্ষকে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সম্ভব সকল সহযোগিতা দিয়েছি। আমি তাঁকে বলেছি, এখন আমাকে যে প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে এটা ইংল্যান্ডে বা মিত্রপক্ষ কাউকে সহযোগিতার জন্য নয়। অথচ বিষয়টি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ও সকল মুমিন মুসলমানের জন্য এক খেয়ানতের কাজ। আমি যদি এ কাজ করি তাহলে আমার শরাফতকে হারাব এবং আমার আত্মাকে ধ্বংস করব। অন্যকে বোঝানো তো দূরের কথা, আমি নিজেও জায়নিস্টদের কোন ছাড় দিতে রাজি নই। আমি যদি তা করতে রাজিও হই, তাহলে সেটা ব্রিটেনের সহযোগিতার জন্য হবে না বরং এটা তার ওপর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ জায়নিস্টদের যে কোন পক্ষ থেকেই সমর্থন করা হোক তা রক্তপাতই ডেকে আনবে। এতে আরব বিশ্বে এক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেবে। এটা কখনও ব্রিটেনের স্বার্থের অনুকূল হবে না।

বাদশাহ্ আমাকে বললেন, এই পয়েন্টে এসে মনে হলো, চার্চিল তাঁর মোটা লাঠিটি ওপর থেকে নামালেন। এ সময় তিনি তাঁর ভূমিকা পালনের সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসন বন্ধ করার জন্য তাঁকে নিশ্চয়তা দেয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। কিন্তু চার্চিল কোন অঙ্গীকার করাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

–স্বাক্ষর

উইলিয়াম এডে

ডকুমেন্ট নং ৫৪৫-৩/৮৬৭ ন ০১

কর্নেল হ্যারোল্ড হোস্কেন্স (কায়রোয় আমেরিকান আলোচনার এটাশে এবং সিরিয়া, লেবানন, সৌদি আরব, ইরাক, ইরান ও ইথিওপিয়ায় আমেরিকান লিগেশনের

মধ্যে সম্পর্ক-সমন্বয় তত্ত্বাবধানকারী। যা মনে হয় মধ্যপ্রাচ্যে বাস্তবে তাঁর মূল দায়িত্ব ছিল গোয়েন্দাগিরির কাজ।) কর্তৃক মিঃ পল এলেং, পরিচালক, নিকট প্রাচ্য ও আফ্রিকা এফেয়ার্সের নিকট প্রেরিত স্মারক ঃ

তাং ঃ ৫ মার্চ, ১৯৪৫

প্রিয় পল,

আপনি আমাদের সাক্ষাতের সময় আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, গত শনিবার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাথে আমার মধ্যাহ্নভোজের সময় কি কথা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ আপনাকে পাঠাতে।

মধ্যাহ্নভোজটি ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। সেখানে প্রেসিডেন্ট ও মিসেস রুজভেল্ট, এলিয়ানূর রুজভেল্ট এবং মিসেস পটেগার ছাড়া কেউ ছিলেন না। ফিলিস্তিন সম্পর্কে যা কথা হলো তার সারসংক্ষেপ জানাচ্ছি। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়াল্টা সম্মেলনে ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কে কিছু আলোচনা হলো কি না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট উত্তর দিলেন 'পুরোপুরি নয়।' এরপর প্রেসিডেন্ট বললেন— "মিস্টার চার্চিল জায়নিস্টদের প্রতি বরাবরের মতোই বেশ সন্তুষ্ট। এবার তো তিনি অনুরোধ করলেন ইহুদীদেরকে কেবল ফিলিস্তিন নয়, লিবিয়াও দিয়ে দিতে।" প্রেসিডেন্ট বললেন, তিনি ইবনে সৌদের সাথে চার্চিলের কথাবার্তার দিকে ইঙ্গিত করেন, যিনি প্রচণ্ড বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, এটা উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের প্রতি একটি বড় জুলুম।

আলোচনার এই বিন্দুতে এসে মিসেস এলিয়ানূর রুজভেল্ট অনুপ্রবেশ করে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অংশে জায়নিস্টরা নতুন যেসব কাজ করেছে তার দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি তাঁকে সমর্থন করলাম। প্রেসিডেন্ট বললেন— এটা হয়ত ফিলিস্তিনের উপকূলীয় এলাকায় সত্য হতে পারে, কিন্তু আমি যখন ইয়াল্টা সফর শেষে (বাদশা আব্দুল আযীয ও বাদশাহ্ ফারুকের সাথে বৈঠক করে) যুক্তরাষ্ট্রের দিকে প্লেনে ফিরছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরভাগ শুষ্ক ও পাথুরে জমীন। মিসেস রুজভেল্ট জবাব দিলেন— "জায়নিস্ট আন্দোলন মনে করে, তারা সব কিছুই করতে সক্ষম— এমনকি ফিলিস্তিনের ব্যাপারে আরবদের সশস্ত্র মোকাবিলাও।" প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর স্ত্রীকে সমর্থন করে বললেন— সেটা হবে হয়ত। কিন্তু তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ফিলিস্তিনকে ঘিরে রয়েছে প্রায় ১৫-২০ মিলিয়ন আরব। তাঁর ধারণা, দূরভবিষ্যতে এ সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। আমার পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টকে জানালাম যে, জায়নিস্ট আন্দোলন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছে। কারণ আমি তাঁর নিকট ১৯৪৩ সালে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করি। যেখানে আমি বলেছি যে, জায়নিস্টরা ফিলিস্তিনে তাদের রাষ্ট্র কায়েম করতে পারবে না, তা রক্ষা করতেও পারবে না। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সিদ্ধান্তের সাথে তিনি একমত কি-না। উত্তর দিলেন— 'পুরোপুরি'।

আমি ইহুদীদের ব্যাপারে স্তালিনের মতামত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন— স্তালিন তাঁকে বলেছেন যে, আমি ইহুদীদের বন্ধুও নই, শত্রুও নই। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, "স্তালিন ইহুদীদের জন্য সে রকম ভয়ঙ্কর শত্রু নয়, যতটুকু এখানে অনেকেই আমাদের সামনে চিত্রিত করতে চায়"।

–স্বাক্ষর

হ্যারোল্ড হোস্‌কেন্স

ডকুমেন্ট নং ১০৪৫-৩/৮৬৭ ন ০১

বাগদাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লুই হেন্ডারসনের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট টেলিগ্রাম ঃ

বাগদাদ ঃ ১০ মার্চ, ১৯৪৫

ইরাকের ভাবী শাসক (Prince Regcent) আমীর আব্দুল্লাহ্ আমাকে একটি মুখবন্ধ খাম দিয়েছেন, যার মধ্যে প্রেসিডেন্টের বরাবর একটি পত্র রয়েছে। তিনি পত্রের একটি আনঅফিসিয়াল অনুবাদ আমাকে দিয়েছেন।

তত্ত্বাবধায়ক শাসক (Prince Regent) আমাকে জায়নিস্টদের বিপদ সম্পর্কে বলছিলেন। সংক্ষেপে তিনি যা বলেন ঃ আরবরা বিশ্বাস করে যে, ইহুদীরা প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ফিলিস্তিনকে চায়, যাতে তারা আরব বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। তাদের ভবিষ্যৎ মতলব হচ্ছে আশপাশের সকল আরব দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। স্বভাবিকভাবেই এই দুরভিসন্ধির মোকাবিলা করার অধিকার আরবদের রয়েছে। আরবরা (তত্ত্বাবধায়ক শাসকের বিশ্বাস মতে) ফিলিস্তিন হারিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত ঐক্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না। কারণ ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান আরব ঐক্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি ফিলিস্তিন কোন অনারবের হাতে চলে যায়।

যে সকল আরব তাদের ঐক্যের গুরুত্বে বিশ্বাসী তারা কখনও তাদের ভৌগোলিক অবিচ্ছিন্নতা থেকে ফিলিস্তিনকে খসিয়ে নেয়াকে মেনে নেবে না। যেমনটি তারা তা শুক্রুপক্ষের হাতে পড়াকেও কখনও মেনে নেব না। এরপর প্রিন্স রিজেন্ট আমাকে বললেন— "আরবরা ব্যষ্টি হোক আর সমষ্টি হোক, তারা ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎকে তাদের জীবন-মরণের বিষয় মনে করে"। উপরোক্ত বক্তব্যটি হলো প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা পত্রের বিষয়সংক্ষেপ। অচিরেই যথাশীঘ্র সম্ভব কূটনৈতিক ব্যাগে মূল পত্রটি আপনার নিকট প্রেরণ করছি।

–স্বাক্ষর

লুই হেন্ডারসন

১৭ মার্চ ১৯৪৫ তারিখে 'নিউইয়র্ক টাইমস্' নিচের খবরটি পরিবেশন করে ঃ রাব্বি ওয়াইজ গতকাল হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। পঞ্চাশ মিনিট স্থায়ী এই বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আমাকে তাঁর ভাষায় দেয়া নিম্নবর্ণিত বিবৃতিটি তাঁর পক্ষে প্রকাশ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন ঃ

"আমি পূর্ববর্তী বৈঠকগুলোতে জায়নিস্ট সম্পর্কে আমার অবস্থান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। এখনও আমার পূর্বের অবস্থানে কোন পরিবর্তন আসেনি। আমি অচিরেই যথাশীঘ্র সম্ভব এই জায়নিস্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাব।"

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ভাষায় ঘোষিত উপরোক্ত বিবৃতির মূল পাঠ ছিল এরকম ঃ "আমেরিকান সরকার ১৯৩৯ সালে লন্ডনে প্রকাশিত শ্বেতপত্রটি আদৌ অনুমোদন করেনি, যেখানে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনকে সীমিত রাখা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আনন্দের সাথে ঘোষণা করছেন যে, ইহুদী শরণার্থীদের সামনে অচিরেই ফিলিস্তিনের দুয়ার খোলা হচ্ছে। যখন মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আসবে তখন যারাই ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় রষ্ট্রের দাবি করছেন তাঁদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যের প্রতি আমেরিকার সরকার ও জনগণ গভীর সহানুভূতির সাথে দৃষ্টি দিচ্ছে। এখন পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে লাখ লাখ ইহুদীর দুর্দশার প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার ও মঙ্গলের ধারণা পোষণ করা দরকার।" নতুন করে জায়নিস্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এই নিশ্চয়তা প্রদান আরব বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। হোয়াইট হাউসের বিরুদ্ধে আরব রাজধানীগুলোতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু এই শোরগোল তার লক্ষ্য অর্জন করেনি বা কোন প্রভাবও ফেলতে পারেনি। কারণ হঠাৎ করেই রুজভেল্ট মারা গেলেন।

॥ ৭॥

ট্রুম্যান

"হজ্জ মৌসুমের পর অবধি অপেক্ষা করুন..... ।"

— আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি ব্রিটিশ পরারাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শ

প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন এ ছিল এক নতুন খোলা পৃষ্ঠার মতন। কিন্তু এ নতুন পৃষ্ঠা কেবল বর্ণ আর শব্দের জন্য নয়— কিছু অংশ ছিল কালিমা লেপনের জন্যও। হ্যারি ট্রুম্যান সম্পর্কে প্রামাণ্য নথিপত্র কি বলে দেখুন ঃ

ডকুমেন্ট নং ১৩৪৫-৪/৮৬৭ নং ১

পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টেটনিউস-এর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট প্রেরিত স্মারকঃ

তাং ঃ ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৫

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

একটি জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জায়নিস্ট নেতা অচিরেই আপনার কাছ থেকে ফিলিস্তিনে আন্দোলনের কর্মসূচির সহায়ক কিছু অঙ্গীকার আদায়ের চেষ্ট করবে। স্বভাবতই, আপনি অবশ্যই উপলব্ধি করছেন যে, ইউরোপে ইহুদীদের ওপর যে নির্যাতন চলেছে তার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণ তাদের প্রতি অতীব সহানুভূতিশীল। উভয়ই চায় তাদের এ নির্যাতনের প্রভাব যেন কিছুটা লাঘব করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে ফিলিস্তিন সমস্যাটা বেশ জটিল বটে। এটি এমন কিছু বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যা ইউরোপের ইহুদীদের বেলায়ও ছিল। যদি আপনার সাথে এ ধরনের কোন চেষ্টা করা হয় সে ক্ষেত্রে আমি আশা করি, আপনার প্রতিক্রিয়া হবে—আপনি বিশেষজ্ঞদের থেকে এ ব্যাপারে কিছু কাগজপত্র চাইবেন যাতে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এতে আপনি নিজের অবস্থান নির্ধারণে কিছুটা সময়ও পাবেন।

– আপনার বিশ্বস্ত

এড্ওয়ার্ড স্টেটনিউস

ডকুমেন্ট নং ২০৪৫-৬/৮৬৭ নং ১

ইভান উইলসন, নিকটপ্রাচ্য বিষয়ক কার্যালয়ের প্রধানের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত স্মারক/বিষয় ঃ তাঁর সাথে বিশ্ব জায়নিস্ট মহাসম্মেলনের নির্বাহী কমিটির

চেয়ারম্যান ডঃ নাহুম গোল্ডম্যান-এর বৈঠক। এতে উপস্থিত ছিলেন নিকটপ্রাচ্য বিষয়ক কার্যালয়ের মিস্টার হেন্ডারসন, মিস্টার মেরইয়াম ও মিস্টার উইলসন। তাং ২০ জুন ১৯৪৫ খৃঃ।

মিস্টার গোল্ডম্যান অত্র কার্যালয়ে মিস্টার হেন্ডারসনকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আসেন। এই সুযোগে তিনি ফিলিস্তিন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের অভিপ্রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে ইতস্তত করার ফলে জায়নিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব যে বিপজ্জনক অবস্থা মোকাবিলা করছে তাও অত্র কার্যালয়কে অবহিত করেছেন।

তিনি বলেছেন যে, প্রায় পাঁচ কি তারও বেশি বছর ধরে জায়নিস্ট নেতৃত্ব যেমন— ডঃ ওয়াইজম্যান, রাব্বি ওয়াইজ এবং স্বয়ং তিনি নিজ জাতিকে নসিহত করে আসছেন যেন তাঁরা তাদের ফিলিস্তিন দাবির ব্যাপারে মডারেট নীতি অনুসরণ করে। তবে এখন ফিলিস্তিনের ইহুদী সমাজ এমন এক সংকল্প, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির চেতনায় বিভোর যে, জায়নিস্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে ঐ জমীনে যে কোন বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁরা বদ্ধপরিকর। এখন ফিলিস্তিনের ইহুদী সমাজের রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ষাট হাজার সশস্ত্র সৈনিক। তারা এখন তাদের অধিকার রক্ষায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তারা এবং তাদের নেতৃত্ব এখন জায়নিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে নতজানু নীতির জন্য অভিযুক্ত করছে। তিনি নিজেও (অর্থাৎ ডক্টর গোল্ডম্যান) যখন ফিলিস্তিনে ছিলেন তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক বলতে শুনেছেন।

ডক্টর গোল্ডম্যান ভয় করছেন যে, যদি দ্রুত অগ্রসর না হওয়া যায় তাহলে জায়নিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে যে সব মধ্যপন্থী আছেন— যাদের মধ্যে স্বয়ং হায়েম ওয়াইজম্যানও রয়েছেন— তাঁরা তাদের অবস্থান থেকে বিতাড়িত হবেন।

—স্বাক্ষর

ইভান উইলসন

ডকুমেন্ট নং ২৭৪৫-৬/৮৬৭ নং ০১

নিকটপ্রাচ্যের কার্যালয়ের ইভান উইলসন-এর সাথে জায়নিস্ট নেতৃত্বের কয়েকজনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে স্মারক ঃ

তাং ঃ ২৭ জুন, ১৯৪৫

ডঃ গোল্ডম্যান সপ্তাহকাল পূর্বে আমাদের সাথে সাক্ষাতের পর আবার ফিরে এলেন। এবার তাঁর সাথে রয়েছেন— মিস্টার ডেভিড বেন গোরিয়ন, ফিলিস্তিনে ইহুদী এজেন্সি প্রধান। তাঁর সাথে রয়েছেন ইহুদী এজেন্সীর মিস্টার এলিয়াসর ক্যাবলান। তাঁরা সবাই এসেছেন আমাদের সাথে ফিলিস্তিন বিষয়ে আলোচনা করতে। এদের মধ্যে মিস্টার ডেভিড বেন গোরিয়ন ছিলেন খুবই বেপরোয়া। তিনি বলে ফেললেন— পশ্চিমা সরকারগুলো ইহুদী জাতির বৈধ অধিকারকে পিছিয়ে দিচ্ছে কেবল কায়রোর

কিছু মিসরী পাশা আর মরু আরবের কিছু বেদুইন গোত্রপতির খোশামদী করার জন্য। বেন গোরিয়ন অনুরোধ করেন যেন আমরা ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দেই যে, জায়নিস্ট আন্দোলন তার সাথে কোন গোল বাধাতে চায় না। কিন্তু ফিলিস্তিনে তাদের অধিকার আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব না করাই বাঞ্ছনীয়।

–স্বাক্ষর

ইভান উইলসন

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকার জায়নিস্ট আন্দোলন সরাসরি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট পৌঁছে গেল। মাধ্যম ছিলেন— এলি জেকবসন। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ট্রুম্যান কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর রুজভেল্ট তাঁকে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। এ সবের আগে 'ম্যানসুতা'তে এলি ছিলেন লোহালক্কড়ের দোকানে ট্রুম্যানের পার্টনার। সেই সময় ট্রুম্যান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনের মাথার ওপর থেকে এক নির্দেশ জারি করলেন যে, এক লাখ ইহুদীকে ফিলিস্তিনে অভিবাসনের অনুমতি প্রদান করা হলো। বাদশাহ আব্দুল আযীয তার কাছে এক পত্র প্রেরণ করে এই সিদ্ধান্তে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কেননা এটি তাঁর পূর্বসূরি রুজভেল্টের দেয়া অঙ্গীকারের খেলাফ। ঐ অঙ্গীকারে বলা হয় যে, ফিলিস্তিন সঙ্কটের এক সরাসরি পক্ষ হিসাবে আরবদের সাথে যোগাযোগ না করে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে আদৌ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অফিসিয়ালী এর উত্তর দিয়েছিলেন যে, এ ধরনের কোন-অঙ্গীকারের অস্তিত্বের কথা তিনি জানেন না। বাদশাহ আব্দুল আযীয প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে এর উত্তরে যা লেখেন তা নিম্নরূপ ঃ

ডকুমেন্ট নং ৩৪৫-১০/৮৬৭ নং ০১

বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন সৌদীর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের নিকট প্রেরিত পত্র। তাং ২৫ শাওয়াল ১৩৬৪, মোতাবেক ২ অক্টোবর ১৯৪৫। জেদ্দাস্থ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পক্ষ থেকে— পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সল আমাকে ডেকে নিয়ে একটি পত্র অর্পণ করেন, যা তাঁর পিতার কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বরাবর প্রেরিত। বাদশাহর পত্রটির মূল ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

হে মহামান্য,

আমাকে জানানো হয়েছে যে, ১৬ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে বহির্বিশ্বের রেডিও স্টেশনগুলো আপনার একটি বিবৃতি প্রচার করেছে। আমি সৌদী আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছিলাম যেন আমেরিকার লিগেশন (রাষ্ট্রদূত)-এর সাথে যোগাযোগ করে আপনার বক্তব্যের একটি কপি সংগ্রহ করে। এটাতে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হই। কিন্তু এরপরই আপনার উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকার একটি বিবৃতি প্রকাশিত হলো, যাতে আপনি বলেছেন— আপনি আপনার কাগজপত্র খুঁজে দেখেছেন কিন্তু

আপনার পূর্বসূরি আমাদের প্রিয় বন্ধু প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক আমাদের কাছে পেশকৃত কোন অঙ্গীকার পাননি। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমাদেরকে উল্লিখিত অঙ্গীকারটি দিয়েছিলেন ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ তারিখে আমার সাথে আলোচনায়। এটা তিনি ৫ এপ্রিল ১৯৪৫ সালে প্রেরিত এক পত্রে পুনর্ব্যক্ত করেন।

মান্যবর,

আমাদের ধারণা, আপনার উল্লিখিত বিবৃতিটি বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে আমরা আশা করি আপনি আসল বিষয়টি আমাদের অবহিত করবেন। অথবা আমাদেরকে উক্ত পত্রটি খুঁজে বের করে প্রকাশ করার অনুমতি দিবেন। আপনার দেশ হক ও ইনসাফের রক্ষায় যুদ্ধে প্রবেশ করেছিল। আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে, বিজয়ের পর আপনারা একটি দেশ থেকে তার জনগণকে তাড়িয়ে দেবেন। কেবল সশস্ত্র শক্তির সহায়তায় অপরাপর জাতিকে সে স্থানে স্থলাভিষিক্ত করতে!

–স্বাক্ষর

আব্দুল আযীয

২রা নভেম্বর ছিল বেলফোর অঙ্গীকারের বার্ষিকী। সেদিন আমেরিকা সরকারের আচরণে সমগ্র কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল চলেছিল। মিসরে আমেরিকার চার্জ দ্য এফেয়ার্স এ দিনের ঘটনাবলীর বিবরণ জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট লেখেন ঃ

ডকুমেন্ট নং ৩৪৫-১১/৮৮৩০০

মিসরে নিয়োজিত চার্জ দ্য এফেয়ার্স লিওন-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত তারবার্তা ঃ

কায়রো ঃ ৩ নভেম্বর, ১৯৪৫

আজ কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার পথে পথে বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত ছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে কিছুসংখ্যক দোকানপাটে আক্রমণ চালানো হয়েছে। বিদেশী মালিকানার কিছু দোকানপাটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ফাহমী আননাকরাশী পাশা (যিনি আহমদ মাহের পাশা আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন) আক্রান্ত স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। বাহ্যত মনে হয় সরকার এই বিক্ষোভ মোকাবিলায় কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আমাকে ব্রিটিশ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 'বিগিন্যান্ড বোকের' বলেছেন যে, ব্রিটিশ দূতাবাসও বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছে। এমনকি ব্রিটিশ দোকানপাট মালিকদের পক্ষ থেকেও বেশ কিছু দরখাস্ত পেয়েছে। এদের ক্ষতি ছিল ব্যাপক।

ব্রিটেনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বোকের আরও বলেছিলেন যে, তাকে এই নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে যেন আজই নাকরাশীর সাথে দেখা করার চেষ্টা নেয় এবং এসব বিক্ষোভ মিছিল ঠেকানোর জন্য সংকল্প প্রকাশের অনুরোধ করেন। আমরা এও শুনেছি যে, সরকারের কিছু এজেন্সির সাথে শ্রমিক সংগঠনগুলোর কিছু যোগাযোগ রয়েছে এবং আরব বিষয়ে মিসরের ভূমিকার সমর্থনে কিছু বিক্ষোভ মিছিল বের করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানানো হয়। আল আজহার ও কায়রো ভার্সিটির ছাত্ররা আজও তাদের ধর্মঘট অব্যাহত রাখে। আমরা 'লিগেশনে' বসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে ১২০টি টেলিগ্রাফ পেয়েছি।

–স্বাক্ষর
লিওন

ডকুমেন্ট নং ৩৪৫-১১/৮৮৩০০

(এ দলিলটি প্রাগুক্ত ডকুমেন্টের এপেনডিক্স বিধায় এই নম্বর ও তারিখ বহন করছে)। আলেকজান্দ্রিয়ায় কনস্যুলেট জেনারেল ডুলিটল-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত তারবার্তা।

আলেকজান্দ্রিয়া ঃ ৩ নবেম্বর, ১৯৪৫

বেলফোর অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে আহূত গতকালের ধর্মঘটটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে পালিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এটা ব্যাপক সহিংসতায় পরিণত হয়। গোলযোগ সৃষ্টিকারী দাঙ্গাবাজ দলগুলো বিবৃতিগুলোকে কিছুটা নমনীয় বা মডারেশন করা। তাঁর মতে এ মাসেই মক্কায় হজ মৌসুম শুরু হচ্ছে। এটা ১৪ নভেম্বর চূড়ান্ত রূপ ধারণ করবে। এই বিশাল ইসলামী সমাবেশকে আমাদের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠার সুযোগ দেয়ার দরকার কি! যদি এমন কিছু বিবৃতি প্রকাশ পায়, যা আরব বিশ্ব তাদের বিরোধী মনে করে, তাহলে বিক্ষোভ হতে পারে। আপনি তো জানেন, সম্প্রতি মিসরে প্রচণ্ড রকমের খারাপ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছিল। এরচেয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ মিছিল হয়েছিল শামের শহরগুলোতে। এতে বোঝা যায় যে, আরব বিশ্বের জনমতের একটি শক্ত ভিত রয়েছে।

–স্বাক্ষর
হ্যালিফ্যাক্স

ডকুমেন্ট নং ৬৪৫-১১/৮৬৭ ন ০১

ওয়াশিংটনস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত স্মারক ঃ

ওয়াশিংটন ঃ ৬ নভেম্বর, ১৯৪৫

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেফেন এই মর্মে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান যে, ফিলিস্তিনে জায়নিস্ট বাহিনী পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধভাবে সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছে। এতে এ

দেশের সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ প্রচণ্ড চাপের নিচে পড়ছে। স্পষ্টত জায়নিস্ট আন্দোলন সব বিষয়কে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সম্প্রতি ডক্টর ওয়াইজম্যান ও তাঁর সাথে মিস্টার শারটুক (শারেট) পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেফেনের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বাহু ধরে টান মারার পরণতির প্রতি দৃঢ়তার সাথে উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাদের খোলাখুলি জিজ্ঞেস করেছেন, তারা কি বিষয়টিকে সশস্ত্র শক্তি দিয়েই মিটিয়ে ফেলার অভিপ্রায় পোষণ করছে নাকি ? কারণ সাম্প্রতিক আচরণে তো তাই মনে হয়। কারণ আরব অঞ্চলগুলোতে এমনকি ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর পরিচালিত ইটপাটকেল, লাঠিসোটা নিয়ে এসে কন্স্যুলেট ভবনের আশপাশের এলাকার ওপর হামলা চালায়। পুলিশ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে গুলি চালায়, এতে ১০ জন লোক মারা যায়; আহত হয় প্রায় ৩০০ লোক। আমি শুনেছি, বিক্ষোভকারীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিত মিসরীয়দের দ্বারা মিছিল করে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এরা আল ওয়াক্ফ পার্টির লোক। বিকাল পাঁচটার আগে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলেছিল ইহুদী, গ্রীক আর্মেনীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয় নির্বিশেষে অনেক দোকানপাটে। আলেকজান্দ্রিয়া সমুদ্র বন্দরে আমেরিকান ইপিজেড ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুরূপভাবে ৪টি আমেরিকান সামরিক লরির কাফেলার ওপর হামলা চালিয়ে দু'জন সৈনিককে আহত করা হয়। আমেরিকান পাসপোর্টধারী ডক্টর কেটাসের ডিসপেনসারিও গুড়িয়ে দেয়া হয়। এমনি করে আমেরিকান নেভিগেটর ক্লাব ভবনের জানালাও ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। আমরা এখন পরিস্থিতি অনুসরণ করে যাচ্ছি।

–স্বাক্ষর

ডোলিটল

ডকুমেন্ট নং ৫৪৫-১১-৮৬৭ ন ০১

ওয়াশিংটনস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত স্মারক ঃ

তাং ঃ ৫ নভেম্বর, ১৯৪৫

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার বেফেন থেকে একটি প্রস্তাব পেলাম, এটি তিনি আপনার নিকট পেশ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। তা হচ্ছে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সেখানে ইহুদী অভিবাসনের সমর্থনে দেয়া আক্রমণগুলো সুসংগঠিত ও পূর্ব পরিকল্পিতভাবেই হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এগুলো এমন বাহিনী করছে যাদের উদ্দেশ্য ভালভাবেই বোঝা যাচ্ছে। তাদেরকে মিস্টার বেফেন লিখিতভাবে এ-ও বলেছেন, "আপনারা যে পরিস্থিতি এবং স্নায়বিক আবহাওয়া মোকাবিলা করছেন তার গতি-প্রকৃতি আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। এতদসত্ত্বেও আমি শক্তি প্রয়োগ করে

সব বিষয়কে ধাবিত করাকে সমর্থন করতে পারি না। কারণ এগুলো এমন জটিলতায় জট পাকাবে যা আপনাদের আদৌ প্রয়োজন নেই।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এতদ্‌সাথে আপনাদের জন্য ফিলিস্তিনে বর্তমান সশস্ত্র জায়নিস্ট বাহিনীর সাইজ সম্পর্কে একটি বিবরণ পাঠিয়েছেন। তার সার সংক্ষেপ এ রকম ঃ

১. ইহুদী এজেন্সির নির্দেশনার জন্য নিয়োজিত 'আল-হাজানা বাহিনী'; এতে এখন প্রায় ৬০ থেকে ৮০ হাজার সশস্ত্র সৈন্য রয়েছে। এদের মধ্যে 'বালমাখ' বাহিনী বা কমান্ডো ইউনিট রয়েছে, যাদের সংখ্যাই হচ্ছে ছয় হাজার।
২. আরও বেশি কঠোর স্বার্থবাদী বাহিনীও রয়েছে, এ হচ্ছে এরগনন জেফে লইমে বাহিনী। এতে রয়েছে প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার যোদ্ধা।
৩. এছাড়াও স্টাম অনুগত সন্ত্রাসী গ্রুপের ইউনিটগুলোও রয়েছে। এ হচ্ছে ত্রাস সঞ্চারী অপারেশনে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েক শ' সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এক দুর্ধর্ষ বাহিনী।

॥ ৮ ॥

বেফেন

"আমি তাওরাত কিতাব ভালভাবে পড়ে দেখেছি, তাতে কোথাও এ ইঙ্গিত পাইনি যে, ফিলিস্তিনের মালিকানা লাভ করা ইহুদীদের জন্য জরুরী।"

— নাহুম গোল্ডম্যানের উদ্দেশ্যে— অর্নেস্ট বেফেন।

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ প্রামাণ্য দলিলদস্তাবেজ প্রথম পাঠেই এই ধারণা হয় যে, লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী ক্লাইম্যান্ট আটলে'র নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিন সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে রক্ষণশীল সরকার ছিল এর ব্যতিক্রম। চার্চিলের যারপরনাই জায়নিজম প্রীতি ছিল সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই সকল প্রামাণ্য নথিপত্র ধীরে ধীরে পড়লে প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তব অবস্থা এর চেয়ে ছিল জটিল। কারণ জায়নিজমের প্রভাব রক্ষণশীল দলের শীর্ষে (ব্যক্তিগতভাবে উইনস্টন চার্চিল ব্যতীত) যতটুকু ছিল তার চেয়ে শ্রমিক দলের ভিত্তিমূল আরও বেশি প্রভাবিত। হয়ত বাহ্যত মনে হবে যে, শ্রমিক দলে শক্তিশালী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেষ্ট বেফেন-এর নীতি অন্য মেরু গ্রহণ করে চলেছিল। কিন্তু আসলে এ ছিল অভিন্ন লক্ষ্যে পৌছার ভিন্ন পথ।

বস্তুত বেফেনের সামনে কিছু বিবেচ্য বিষয় ছিল যা তার আচার-আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ঃ

১. নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন ফিলিস্তিন সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালার আগে তার চারপাশ জুড়ে থাকা আরব দেশগুলোর পরিস্থিতির একটা সুরাহা করে ফেলা। আর এগুলো হচ্ছে— জর্ডান, ইরাক, মিসর। এগুলো যুদ্ধপূর্ব বিন্যাস অনুযায়ী দু'এক ডিগ্রী কম বেশি ব্রিটিশ প্রভাববলয়ের আওতায়ই রয়েছে।

পূর্ব জর্ডান ঃ ব্রিটিশ সহায়তায় ১৯২২ সালে আব্দুল্লাহকে আমির হিসাবে নিয়োগের পর থেকেই।

ইরাক ১৯৩০ সালে সম্পাদিত চুক্তির সাথে জড়িত........। এটা সহায়তাপুষ্ট হওয়ার থেকেও বেশি ঘনিষ্ট সম্পর্ক। মিসর ১৯৩৬ সালের চুক্তির জন্য এখন সঙ্কুচিত চিত্ত, যা এখন 'কোন বিষয় নয়'– এ পরিণত হয়েছে—তৎকালীন এক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ লুতফী আস্ সাইয়্যেদ পাশার ভাষ্য অনুসারে।

রেফেনের মূল্যায়ন ছিল— ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার আগে এই ত্রিদেশীয় ব্যাপারে সহজতর থেকে শুরু করে কঠিনতম দিয়ে শেষ করা।

তাঁর ধারণা ছিল যে, পূর্ব জর্ডান, ইরাক ও মিসরের সাথে সম্পর্কের সুরাহা না করে যদি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে একটার মধ্যে আরেকটা ঢুকে ফিলিস্তিন সঙ্কটকে আরও ব্যাপক ও জটিল করে তুলবে। পরবর্তীতে এই তিন দেশের সাথে প্রতীক্ষিত সংলাপ ও আলোচনাকে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে জটিল সমস্যায় পরিণত করে ফেলবে।

২. আর্নেস্ট বেফেন তাঁর দৃষ্টিতে আরেকটি আসন্ন বিপদ দূর করতে চেয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রায় জবরদখলকারীর মতো মধ্যপ্রাচ্যে ঢুকে পড়ছে। এটা শ্রমিক দলের ব্রিটিশ সরকারকে এমনভাবে প্রকাশ করছে যেন সে আমেরিকার পরাক্রমের কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে। যদি এখন তার বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তাহলে এটা দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলবে যা আপাতত ব্রিটেনের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে না। কারণ দেশটি যুদ্ধ থেকে এই প্রত্যাশা নিয়ে বের হয়েছে যে, আমেরিকার বিভিন্ন সহযোগিতায় তার ভার কিছু হালকা হবে। এ ব্যাপারে আর্নেস্ট বেফেন অনুভব করলেন যে, এ অঞ্চলের যে সব দেশ ব্রিটেনের সাথে তাদের বিষয়গুলো সমাধা করতে চায় জর্ডান, ইরাক ও মিসর— তারা এখন ব্রিটিশ-আমেরিকা বৈপরিত্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খেলা জুড়ে দিয়েছে। এ সকল দেশের সাথে যদি সত্বর কোন নতুন বন্দোবস্তে উপনীত হওয়া না যায় তাহলে আমেরিকার এই জবরদখল বেকার হয়ে পড়বে, এতে এমন সব নতুন নতুন জটিলতা সৃষ্টি হবে যা বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে আদৌ সহনীয় নয়।

৩. অপরদিকে আর্নেস্ট বেফেন প্রত্যক্ষ করছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে জায়নিস্ট আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তাই তিনি এর লাগাম যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিতে চাননি, যে কিনা মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী নয়। বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যকে এমনিভাবে আক্রমণ করে বসবে "যেমনি একটি ষাড় কাঁচের দোকান, সাজ-সজ্জা ও চিনামাটির তৈজসপত্রের দোকানে তেড়ে এসে ঢুকে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় অচিরেই সে দোকানে যা কিছু আছে সব ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে"। এ সময় বেফেন আশা করছিলেন যে, অচিরেই ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে ব্রিটেনের পৃষ্ঠপোষকতায় নয়— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়, যা তিনি আদৌ চান না। পাশাপাশি তিনি এও ভয় করছিলেন যে, ইহুদী রাষ্ট্রটি পুরো ফিলিস্তিন দখল করে বসে কিনা। তাহলে এটা তাকে ব্রিটেনের প্রত্যাশিত অবস্থার চেয়েও বড় কিছু দিয়ে দেবে। কারণ ব্রিটেন তো চেয়েছিল এমন এক ভাগাভাগি যার মাধ্যমে যখন যে ভারসাম্য সৃষ্টির সুযোগ তার হাতে থাকে।

একটি শতাব্দীরও বেশিকাল ধরে ব্রিটেনের কৌশলগত ভাবনা ছিল কিভাবে মিসর ও সিরিয়ার মাঝে দূরত্বের দেয়াল সৃষ্টি করা যায়, যাতে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব

কোণের দু'টি পাঁজরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিচ্ছিন্ন দেয়াল এমন কোন স্বতন্ত্র শক্তিকে মালিক বানিয়ে করতে চাননি যারা অধিকাংশ ওয়াশিংটনের ওপরই নির্ভর করবে, অথচ লন্ডনকে পাত্তাই দেবে না। এভাবে ঐ শক্তি পুরো অঞ্চলের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক বনে যাবে অথচ সব সময় ব্রিটিশ নীতির তোয়াক্কা করবে না।

বেফেন জায়নিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ধৈর্যধারণ করার জন্য বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং তাঁর সাথে তাদের বেশ কয়েকবার বৈঠকও হয়। জায়নিস্ট নেতা নাহুম গোল্ডম্যান তার 'ইহুদী বিপর্যয়' শীর্ষক গ্রন্থে স্মৃতিচারণ করেন যে, ১৯৪৬ সালে বেফেনের সাথে তাঁর এক বেঠকে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে সরাসরি এ প্রশ্ন করে বললেন ঃ "আসলে তোমরা ফিলিস্তিনে চাচ্ছটা কি ?" গোল্ডম্যান জবাব দিলেন ঃ "আমরা খোদ্ ফিলিস্তিনটাই চাই।" বেফেন বললেন ঃ "আমি কি বুঝব যে, আপনারা গোটা ফিলিস্তিনই চাচ্ছেন ?" গোল্ডম্যান মাথা দুলিয়ে ইতিবাচক সায় দিলেন।

বেফেন বলেন— আপনারা কি ব্রিটিশ সরকারের কাছে এটা আশা করেন যে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটি কেবল ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের বিনিময়ে ছেড়ে আসবে।

গোল্ডম্যান জবাব দিলেন ঃ তার ভাষ্যমতে— পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় .... কেন নয় ? তখন বেফেন মৃদু হেসে বললেন ঃ

—কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্ট তো তা বলে না। আমি তো তাওরাত কিতাব ভালভাবে পড়ে দেখেছি, কিন্তু সেখানে কোথাও এ ইঙ্গিত পাইনি যে, গোটা ফিলিস্তিনের মালিক বনে যাওয়া ইহুদীদের অধিকার।

গোল্ডম্যান জবাব দিলেন ঃ "আমিও তাওরাত কিতাব পড়েছি, সেখানে এমন কোন প্রমাণ পাইনি যে, গোটা ফিলিস্তিনের মালিক ব্রিটিশ সরকার বনে যাওয়ার কোন অধিকার আছে।"

ঠিকই বেফেন পূর্ব জর্ডানের সাথে তাঁর নতুন নীতির চাল শুরু করে দিলেন। মার্চ ১৯৪৬-এ নতুন চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। এ চুক্তিটি ব্রিটিশ সরকার ও জর্ডানের মধ্যে সহায়তা চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হলো। চুক্তি অনুসারে 'পূর্ব জর্ডান আমিরাত' এ নামটি পুনর্বিন্যাস করে রাখা হলো— 'জর্ডান হাশেমী রাজতন্ত্র'। এর বাদশাহ হলেন আব্দুল্লাহ, এখন আর কেবল আমির থাকলেন না। এ সময় এ কাজটি করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহ আব্দুল্লাহকে এভাবে প্রস্তুত করা, যাতে তিনি ফিলিস্তিনের আরব অংশটি নিয়ে নেন। কারণ অচিরেই ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদী অংশে বিভক্ত করা হবে। যেহেতু ভাগাভাগির লাইনে পূর্ব ও পশ্চিম জর্ডানের মিলিতরূপে আবির্ভাব ঘটবে এমন এক আরব রাষ্ট্রের যে ব্রিটেনের সহায়তায় জীবনের সকল উপকরণ লাভ করবে।

ব্রিটিশ নীতি তার পুরনো ধারা— আরব বিশ্বের উপকূলকে অভ্যন্তর ভাগে থেকে আলাদা রাখাকে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার প্রেক্ষিতে এ মত পোষণ করত যে, ফিলিস্তিন উপকূলের অধিকাংশ এলাকা ইহুদী রাষ্ট্রের মধ্যে চলে যাবে। আর ফিলিস্তিনের অভ্যন্তর ভাগের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভম হয়ে পড়বে। এ প্রেক্ষিতে আম্মানের প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং নিজেকে তার মালিকানায় সংযুক্ত— এটাই হবে সবচেয়ে উত্তম চাল। তাছাড়া নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পারে জর্ডান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আরব বাহিনীর মতো মোটামুটি ধরনের একটি সেনাবাহিনী যদি ব্রিটিশ জেনারেল গ্লোব পাশা বা অন্য কোন অধিনায়কের অধীনে রাখা যায় তাহলে ব্রিটেন ইসরাইলী কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পাবে। এতে করে সে বেশি স্বার্থপর হয়ে ব্রিটিশ কৌশলের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। এ ছিল বেফেনের প্রথম ও সহজ পদক্ষেপ!

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে ইরাকের পালা এলো। এ সময় ইরাকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৯৩০ সালের চুক্তিটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। মিস্টার বেফেন তখন বাস্তবিকই ইরাকের প্রধানমন্ত্রী সালেহ জাবেরের সাথে আলোচনায় প্রবেশ করলেন। উভয় পক্ষ একটি চুক্তির সূত্রে উপনীত হলো। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা চলল। ইরাকের সাধারণ পরিস্থিতি তখন খুবই অস্থির ছিল। কারণ এ আরব দেশটি বাদশাহ প্রথম ফয়সালের মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্থান-পতনে নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে। এরপর বাগদাদের আয-যহুর প্রাসাদের অভ্যন্তরে এক রহস্যময় গাড়ি দুর্ঘটনায় যুবরাজ গাজীর নিহত হওয়ায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এরপর আসে সামরিক অভ্যুত্থান। নেতৃত্ব দেন বাকর সেদকী। এরপর আসে যুদ্ধের পরিস্থিতি। সহসাই দেখা গেল সাইয়্যেদ রশীদ আলী কিলানীর নেতৃত্বে বিপ্লবের জোয়ার বইতে লাগল। বিপ্লবের শুরু হয়েছিল ব্রিটেনের বিপক্ষে এবং জার্মানীর ঘনিষ্ঠতায়। এতে ইরাক ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণের শিকার হলো। এর প্রথম দলটি ছিল জেনারেল গ্লোব পাশার নেতৃত্বাধীন জর্ডানী আরব বাহিনী, এরপর বিপ্লব ব্যর্থ হলো এবং হাশেমী পরিবারের ইরাকী শাখা পরিস্থিতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে বাগদাদে ফিরে এলো।

নূরী আস-সাঈদ (পাশা) আযীয মিসরীর সেই পুরনো বন্ধু— ইরাকে হাশেমীদের বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। তিনি ছিলেন বৃটেনের নতুন ব্যবস্থার সমর্থক, যা ১৯৩০ সালের চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু ইরাকের জাতীয়তাবাদী বিরোধী দল সব সময় তার অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত। এ জন্যই বেফেন নূরীকে সাঈদ ভিন্ন এমন একজনের সাথে আলোচনা চালাতে হলো, যিনি দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পছন্দ করেন, যাতে কোন সংশয়ের সৃষ্টি না হয়। সেটা ছিল সন্দেহে পড়ার সম্ভাবনাময় এক উদ্বেগাকুল অভিজ্ঞতা!

এরপর তৃতীয় পদক্ষেপের সময় এলো। এবার মিসর! ১৯৩৬ সালের চুক্তির বদলে নতুন ব্যবস্থা বিন্যাসের পালা। মিসর যখন বের হয় তখন সেখানে বিপ্লব চলছিল। এর দাবি ছিল স্বাধীনতা এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বিদেশী বাহিনীর বহিষ্কার। সর্বোপরি মিসর তার আরব পরিচয়ের খোঁজ পেয়ে গেছে। সে তার জাতির পরিমণ্ডলে নিজের ভূমিকা সম্পর্কেও হয়েছে সচেতন।

এ দিকে প্রাচ্য ধারার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এর চেয়ে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কেউ কেউ ফিলিস্তিনে চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। কেবল সেখানে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমস্যাই নয়; বরং তার একটি অংশ হিসাবে একটি প্রচেষ্টা চলে আসছে যেন মিসরকে বিচ্ছিন্ন রেখে তাকে প্রাচ্যেই বন্দী করে রাখা হয়।

মিসরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও মতবাদের সমন্বয়ে বিরাট শক্তি সঞ্চয় করে এক ব্যাপক জাতীয় ফ্রন্টের মতো গঠন করে যা গোটা মিসর জাতির শক্তিকে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়— দুটি দাবিতে জাতীয় স্বাধীনতা মিসরী মুকুটের অধীনে সুদানের সাথে ঐক্যের ভিত্তিতে। তারপর ফিলিস্তিন সমস্যা এ দেশটি একটি আরব প্রতিবেশী এবং প্রাচ্যের করিডোর।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে 'নাকরাশী' মন্ত্রণালয়ের পতন ঘটল এবং ইসমাইল সেদকী পাশার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হলো। তিনিই ইংরেজদের সাথে আলোচনার জন্য জাতীয় কমিটি গঠন করেন (অবশ্য এটাকে আল্ ওয়াক্দ পার্টি বয়কট করে)। এরপর সেদকী পাশা ১৯৩৬ সালের চুক্তির বদলে নতুন চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য আর্নেস্ট বেফেনের সাথে আলোচনা-সংলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

আলোচনা কমিটি ভাগ হয়ে গেল, দেখা দিল বেশ কিছু ভিন্ন মত। কেবল ইসমাইল সেদকী পাশাই চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প থাকলেন। 'সেদকী'-বেফেন চুক্তি পরিকল্পনা-শীর্ষক নামের অধীনে সুতা বুনতে লাগলেন। কিন্তু এই চুক্তি পরিকল্পনা চলার পথে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হয়। এখানে হয়ত এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার দাবিটি সুস্পষ্টভাবে ফিলিস্তিন সমস্যার সাথে জড়িয়ে যায়। সম্ভবত এও জেনে রাখা দরকার যে, ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী লর্ড মোয়েন যামালেক এলাকায় তার নিজ বাসভবনের সামনে অততায়ীর হাতে নিহত হওয়া এবং তাঁর হত্যাকারীরা প্রকাশ্য আদালতের সামনে এসে দাঁড়ানো মিসরকে এই সুযোগ দিল যে অভ্যন্তর থেকেই ফিলিস্তিনে জায়নিস্টদের মতিগতি বুঝে ফেলল।

যা ঘটল, তা হচ্ছে লর্ড মোয়েনকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত দু'জন যুবক আদালতের সামনে দাড়িয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার ব্যাখ্যা দিল যা তাদের কায়রোস্থ

ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রীকে গুপ্ত হত্যায় প্রণোদিত করেছিল। আর এ বিষয়টি তখন গোটা মিসর অনুসরণ করে যাচ্ছিল, গুরুত্বসহকারে দেখছিল এবং শুনছিল।

বাদশাহ ফারুক দ্রুত অগ্রসর হয়ে নিজেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্মুখভাগে রাখতে চাইলেন। যদিও কিছু সংখ্যক বিশ্লেষক মত প্রকাশ করেন যে, বাদশাহর এই দ্রুত অগ্রসর হওয়ার পেছনে তাঁর জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসের চেয়ে নিজস্ব স্বার্থ কাজ করেছিল বেশি; তবুও বলা যায় যে এ যুক্তিটি প্রচণ্ড আবেগতাড়িত। যথার্থ নয়।

বাদশাহ্‌র সমালোচকগণ মনে করেন যে, বাদশাহর এক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পেছনে তার এই আগ্রহ কাজ করেছে যেন তিনি তাঁর হারানো সুনাম প্রতাপ ভাবমূর্তি এমনকি সরাসরি প্রাকৃতিক অর্থে এবং চেহারা বিগড়ে যাওয়া থেকে নিজের ইমেজ পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। হয়ত এর কিছু কিছু সত্য বটে, কিন্তু এটাকে পরখ না করে ঢালাওভাবে বলা আদৌ সঠিক নয়।

বাদশাহর সমালোচকগণ আরও মনে করেন যে, যতই হোক না কেন কোন মানুষকে তাঁর চারপাশের প্রতিবেশ ও পরিমণ্ডল সম্পর্কে অনুভূতি ও ভাবলেশহীন বলে প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন। আর যদি মানুষটি ঐ দেশের বাদশাহ্ হয়ে থাকেন তাহলে তো ঐ পরিমণ্ডলের সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা যথেষ্ট তীব্র হওয়া স্বাভাবিক। যদিও বলা হয় যে, এটি নীতি ও আদর্শের দিক থেকে জনসংযোগের দিকেই বেশি ঘনিষ্ট ছিল। চাই বাদশাহর অনুভূতি গভীর থাক আর লোক দেখানো— উভয় অবস্থাতেই তার ভূমিকাটি একটি সত্যকে প্রতিফলিত করে যে, তিনি এমন একটি লক্ষ্যের সামনে ছিলেন যেখানে তার জাতির লক্ষ্য এসে মিলেছে। অন্তত অধিকাংশ লোক সে লক্ষ্য উদ্দেশ্যে প্রভাবিত ছিল।

যা হোক, বাদশাহ ফারুক যে তাঁর নীতিকে প্রাচ্যমুখী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা ছিল প্রাচীন মিসরী ইতিহাসের জাগরণের সময়গুলোর প্রতিধ্বনি যা আধুনিক যুগেও অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের সর্বশেষ অভিজ্ঞতাটি ছিল তাঁর মহান পিতামহ মুহাম্মদ আলীর। বাদশাহ্ ফারুক তার প্রথম পদক্ষেপ শুরু করেছিলেন প্যারিস থেকে।

ফিলিস্তিনের মুফতি ও ১৯৩৬ সালের বিপ্লবের নেতা আলহাজ্ব আমীন আল হুসেইনী প্যারিসে আত্মগোপন করেছিলেন। সেখানে গিয়েছিলেন অনেক ক্লান্তিকর দীর্ঘ সফর শেষে। বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর যখন তাকে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা জারি হলো তখন তিনি ফিলিস্তিন থেকে পালিয়ে ইরাকে চলে যান। সেখান থেকে ইরানে; সেখান থেকে তুর্কিস্তান, সেখান থেকে ইতালী ও জার্মানী চলে যান। তার সর্বশেষ আশ্রয়ের দেশটি যখন যুদ্ধে পরাজিত হলো তখন তিনি গোপনে প্যারিস চলে যান।

প্যারিসে আলহাজ্ব আমীন আল্ হুসেইনী আঁচ করলেন যে, ফরাসী রাজধানীতে মিসরীয় দূতাবাস তাকে নিঃশব্দে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাষ্ট্রদূত যাদের ধারণা করলেন যে তারা নির্বাচনে সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে সে সব আরব শরণার্থীদের মাধ্যমে তিনি তাঁর খোঁজ নিচ্ছিলেন। সে সময়কার রাষ্ট্রদূত ছিলেন মাহমুদ ফখরী পাশা। বাদশাহ্ ফারুকের পিতার পক্ষের বোন প্রিন্সেস ফাওকিয়াহের স্বামী ছিলেন তিনি। ফখরী শেষতক মুফতিকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎও করলেন এবং বললেন— বাদশাহ্ ফারুক তাঁকে মিসরে স্বাগত জানাচ্ছেন— এত ফিলিস্তিনের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশী আরব দেশ। আলহাজ্ব আমীন ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান। যখন তাঁকে স্বাগত জানানোর কথা বলা হলো তখন তিনি একটি মন্তব্য করেন যে, তিনি বাদশাহ ফারুকের আমন্ত্রণকে তাঁর শিরে ও হৃদয়ে রেখেই এই আশা করছেন যে তাঁর মিসরে অবস্থান যেন তাঁর বাদশাহী বা সরকারের জন্য বিব্রতকর হয়ে না দাঁড়ায়।

আশ্চর্যের কথা হলো, প্যারিসে ইহুদী এজেন্সীর দালালরা এখানে আলহাজ্ব আমীন আল হুসেইনীর গোপন আস্তানা খুঁজে ফিরছিল, তারা এখন ফখরী পাশার সাথে তার সাক্ষাৎকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে হাইজ্যাক করার ফন্দি আঁটল। তারা চেয়েছিল তাকে ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে একেবারে খতম করে দেবে। কিন্তু ফিলিস্তিনের মুফতি নিজের ব্যবস্থা করে নিতে সক্ষম হলেন। তিনি মার্সেলিয়ায় পৌঁছে সেখান থেকে একটি জাহাজে করে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে গেলেন, সেখানে রাজকীয় গার্ড বাহিনীর একজন অফিসার তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন।

বাদশাহ্ বিষয়টি তাঁর সরকার ও প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল সেদকী পাশার অজ্ঞাতসারেই করে যাচ্ছিলেন। মজার বিষয় হলো (রাজকীয় সচিবালয়ের সচিব হাসান ইউসুফ-এর নিজ আওয়াজে রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যের ভাষা অনুযায়ী), প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বিষয়টি তার বন্ধু রেনিয়া কাতাবী বেগের মাধ্যমে জেনে গিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন ইহুদী সম্প্রদায়ের এক দিকপাল এবং শিল্প-কারখানা ঐক্য পরিষদে সেদকীর বহু সহকর্মী। তিনি জানতে পেরেছেন যে, "ফিলিস্তিনের মুফতি গোপনে মিসরে পৌঁছেছেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে প্রাসাদ অবগত আছে।"

মুফতির বিষয় নিয়ে সেদকী পাশা বাদশাহ্র সাথে এক বৈঠকে উচ্চবাচ্য করেন। ঐ বৈঠকে ব্রিটিশ-মিসর আলোচনার নেতৃত্বদানকারী লর্ড স্টান্সজেট-এর সাথে আলোচনার ফলাফল পেশ করছিলেন। দৃশ্যত বাদশাহ যেন তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া সংবাদে চমকে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল অস্বীকার। যেন তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। কিন্তু তিনি বৈঠকের শেষ দিকে এসে সেদকী পাশাকে বললেন, তিনি কামনা করেন যেন কথাটা সত্যি হয়। মুফতি সাহেব মিসরে আশ্রয় নিয়ে থাকলে

এতে তিনি কোন অসুবিধা দেখছেন না। যদি আলহাজ্ব আমীন আল হুসেইনী এই অধিকার কামনা করেন তাহলে তিনি তা তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করবেন।

সেদকী পাশা বাদশাহ্‌র কাছে তার মতের ভিন্নতা প্রকাশ করলেন। এর সার কথা হলো আমাদের জন্য ভাল হবে, প্রথমে শান্ত পরিবেশে ইংরেজদের সাথে আলোচনা সেরে নেয়া। আরব বিষয়গুলো নিয়ে মিসরে যে সাধারণ পরিস্থিতি বিরাজমান তাতে তার জড়িত হওয়া নিষ্প্রয়োজনীয় ঝামেলা। এতে ইহুদীরা বিব্রত বোধ করবে; অথচ তারা মিসরে এবং পৃথিবীতে ধন-সম্পদের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। দৃশ্যত মনে হলো, বাদশাহ্ যখন তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন অনুপ্রেরণা পেলেন না তখন বিষয়টি গোপন রাখাই শ্রেয় মনে করলেন। তিনি আশঙ্কা করলেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেদকী পাশা সত্য ঘটনা জেনে ফেলতে পারেন। সে সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও ছিলেন। এ প্রেক্ষিতে বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেন যেন মুফতি সাহেব তাঁর আনশাচ এলাকার ফার্মে তাঁর মেহমান হিসাবে আগমন করেন। আলহাজ্ব আমীন সেখানেই গেলেন।

এরপর বাদশাহ্ ফারুক তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাঁর আনশাচে অবস্থিত ব্যক্তিগত খামারে প্রথম আরব মহাসম্মেলন আহ্বান করলেন। সে সময় কোন রকম নড়াচড়া করার মতো ক্ষমতা যেসব আরব দেশের ছিল, তারা সবাই এই ডাকে সাড়া দিল। এগুলো হচ্ছে— সৌদী আরব, ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডান। ২৮ মে, ১৯৪৬-এ এই সম্মেলন থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হলো, যাকে বলা যেতে পারে ফিলিস্তিনে চলমান ঘটনাপ্রবাহের ওপর প্রতিক্রিয়ার প্রথম যৌথ আরব এ্যাকশনের শুরু।

মহাসম্মেলনের প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল— "ব্রিটিশ আমেরিকান কমিটির সুপারিশগুলো প্রত্যাখ্যান করা। এই সুপারিশগুলোতে ইহুদী অভিবাসনের জন্য ফিলিস্তেনের দরজা উন্মুক্ত করার ব্যাপারে ইঙ্গিত ছিল।"

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল— "আরবের বাদশাহ্ ও প্রেসিডেন্টগণের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা যে, তাঁরা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও তার আরব পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে তাঁরা বদ্ধপরিকর।"

বাদশাহ্ ও প্রেসিডেন্টগণের তৃতীয় সিদ্ধান্ত ছিল— "ফিলিস্তিনের সকল শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী একটি জাতীয় সংস্থা গঠন করা যাতে তারা সবাই অভিন্ন প্রক্রিয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে। এবং এমন যে কোন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিবাদ থেকে দূরে থাকবে যাকে পুঁজি করে জায়নিস্ট আন্দোলন তার আড়ালে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে।"

'আনশাচ' সম্মেলনের সারমর্ম ছিল— মিসর প্রাচ্যের দিকে নিবদ্ধ হতে শুরু করেছে। কেবল ভূমধ্যসাগর আর তার ওধারেই তার কাজের গণ্ডি সীমাবদ্ধ থাকল না,

মিসরীয় মুকুটের অধীনে সুদানকে তার সাথে যুক্ত করাই কেবল তার লক্ষ্য থাকল না বরং সুস্পষ্টভাবে সে এখন ফিলিস্তিনকে গুরুত্ব দেয়ার দিকে মোড় নিল। সিনাই থেকে আরও বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সে এখন জড়িয়ে গেল। সে এখন এই সংশ্লিষ্টতার গভীরতা উপলব্ধি করতে শুরু করল। অনুভব করতে লাগল এর ঐতিহাসিক শেকড় আর ভবিষ্যতের দূরভিসারী লক্ষ্য। এই মূল চেতনা আরও বেশি জোরদার হলো তখন, যখন মুফতিয়ে আল-কুদস আলহাজ্ব আমীন আল-হুসেইনীর নেতৃত্বে ফিলিস্তিন-বিষয়ক আরব উচ্চ সংস্থা গঠিত হলো এবং মিসরেও এ সংস্থার একটি কার্যালয় স্থাপিত হলো।

বাদশাহ্ ফারুক আরব শীর্ষ সম্মেলনের 'আনশাচ' সভায় শেষ মুহূর্তে এক নাটকীয় ছোঁয়া যোগ করেন। বৈঠক শেষ হওয়ার ঠিক আগে বাদশাহ্ সম্মানিত অতিথিদের জানান যে, আলহাজ্ব আমীন আল-হুসেইনী স্বয়ং আনশাচে অবস্থান করছেন। তিনি প্রস্তাব করছেন যে, সবাই তাঁকে দাওয়াত দিয়ে এখানে স্বাগত জানাবেন, এটা হবে ফিলিস্তিনী জনগণের সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ। এতে কেউ আপত্তি তুললেন না, কারণ চমক সবাইকেই গ্রাস করে ফেলেছিল। আসলেও কারও কোন আপত্তি ছিল না। এমনকি বাদশাহ আব্দুল্লাহ— যাকে মুফতি সাহেব তাঁর শত্রু বলে জানতেন, তিনিও কোন আপত্তি তুললেন না। সাথে সাথে আলহাজ্ব আমীন আল হুসেইনী ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সবাই তাঁর সাথে করমর্দন করেন। মনে হলো ঐ মুহূর্তটি যেন একান্তই তাঁর ও ফিলিস্তিনের। পরবর্তীতে বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্ বলেছেন— তিনি মুফতিকে দেখার প্রথম লগ্ন থেকেই বিভিন্ন ঘটনার অপয়া হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তিনি এও বলে ফেলেন যে, "এই ব্যক্তিটি যে দেশেই আবির্ভূত হয় সেখানেই বিপদ নেমে আসে।" তিনি ফিলিস্তিন বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, বিপ্লব ব্যর্থ হলো। গেলেন ইরাকে, সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রশীদ আলী জিলানীর আন্দোলন, যাকে ইংরেজ আঘাত করল। বাগদাদ থেকে বের হয়ে তেহরান গেলেন, দেখা গেল ইরানের শাহ্ রেজা খান তাঁর সিংহাসন হারাচ্ছেন। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসনে প্রেরিত হলেন। ইরান থেকে বের হয়ে ইতালী গেলেন। দেখা গেল মুসলিনীর পতন হলো। তাঁকে বন্দী করে তাঁর লাশ কসাইয়ের শিকে টাঙ্গিয়ে রাখা হলো। তারপর সে যখন বার্লিনের দিকে রওয়ানা হলো, দেখা গেল জার্মান বাহিনী পরাজিত হচ্ছে। হিটলার আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে......।

এরপর মুফতি মিসরে গেলেন। বাদশাহ্ চুপ থাকলেন, তাঁর মুখপাত্র বললেন ঃ

কিন্তু তিনি যখন মিসরে আসলেন তখন কিছুই ঘটল না। কিন্তু বাদশাহ্ নির্দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ

–"আরে বাপু, মিসরে কলেরা এলো!" ওই সময় বাস্তবিকই মিসরে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।

মুফতির মিসরে আগমনে শুধু যে বাদশাহ আব্দুল্লাহ একাই অস্থির ছিলেন তা নয়; সেদকী পাশাও এতে বিব্রত বোধ করছিলেন। কারণ বিষয়টি বাদশাহ ফারুক তাঁর কাছে গোপন রেখে এখন একটা চমক দিয়ে দিলেন। এছাড়াও আরেকটি কারণ ছিল যে, তিনি তার বেশ কিছু ইহুদী বন্ধুকে জানিয়েছিলেন, মুফতি এখন মিসরে নেই, যেমনটি তাঁরা শুনেছিলেন।

নজর কাড়ার মতো আরেকটি বিষয় ছিল এই যে, মুফতির মিসর আগমন সম্পর্কে সেদকী পাশা তাঁর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন যে ঃ যদিও মিসর সরকার তার দেশে অবস্থানের জন্য জনাব আমীন আল্-হুসেইনীকে অনুমতি দিয়েছেন তবুও একই সময়ে সরকার আশা পোষণ করছে যে, এ বিষয়টিকে মুফতি সাহেব নিছক সৌজন্য হিসাবে দেখবেন। যা কেবল ভদ্রতা প্রকাশের জন্য করা হয়েছে এটা সর্বজনবিদিত যে, বর্তমানে মিসর তার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ প্রেক্ষিতে শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যেই তার তৌফিক ও সফলতা কামনা করি। নিঃসন্দেহে মান্যবর মুফতি তা মূল্যায়ন করবেন।

সরকারী ভাষ্যে প্রধানমন্ত্রীর অনুভূতি প্রতিফলিত হলেও বাদশাহ্র চিন্তা-চেতনা প্রতিবিম্বিত হয়নি।

ডেভিড বেন গোরিয়ন-এর নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনের জায়নিস্ট আন্দোলন ও ইহুদী এজেন্সীর কাছে এক বৃদ্ধ আরব বাদশাহ্র কাহিনী থেকে বেশি কিছু ছিল। ইরাকী প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের সাথে এমন এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বসে আছে যা তিনি কার্যকর করতে অক্ষম। এদিকে মিসরীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর অজ্ঞাতসারে মুফতি সাহেবের মিসরে আগমনে শিহরিত। মনে হচ্ছিল যেন ইহুদী সংস্থা মিসরের পট-পরিবর্তনগুলো অনুসরণ করে যাচ্ছিল এবং উপলব্ধি করতে পারছিল যে, এ সংঘাতে মিসরের প্রবেশ এ দ্বন্দ্বের ভারসাম্যে অবশ্যই নতুন কিছু পরিবর্তন সাধন করে ছাড়বে। কারণ মিসর নিজ শক্তিতেও এক অসামান্য বিপদ। তাছাড়া তার আরব প্রভাবের প্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধ আরব ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশে এক সহযোগী শক্তি হতে পারে।

পরিশেষে যখন মিসর স্বাধীনতা লাভ করল এবং স্বাধীনতা উত্তর সময়ে প্রবৃদ্ধির পথে পা বাড়াল তখন সে আরব বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শক্ত এক ঘাঁটি উপহার দিতে সক্ষম। এ প্রেক্ষিতেই ১৯৪৬ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কায়রোতে ইহুদী ও জায়নিস্টদের নজিরবিহীন কেন্দ্রীভূত হতে দেখা গেল।

আনশাচ সভার দু'দিন পরেই রাব্বি হায়েম নাহুম আফেন্দী বাদশাহ্ ফারুক-এর সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী হলো। এই সাক্ষাৎকারের কোন কার্যবিবরণী বা লিখিত কাগজ পত্র নেই। কিন্তু একটি রেকর্ড বইয়ের সাক্ষাৎ অনুযায়ী রাজকীয় সচিবালয়ের সচিব হাসান ইউসুফ পাশা বর্ণনা করছেন যে, রাব্বি বাদশাহ্র কাছে তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

পাছে মিসর ফিলিস্তিন সঙ্কটের প্রতি ঝুঁকে পড়ে কিনা। তিনি মত প্রকাশ করলেন যে, তিনি সেখানে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেন না। বরং তিনি মনে করেন যে, ইহুদী অভিবাসনের বিপক্ষে মিসরের অবস্থান যেন ইহুদীদের উপর নাজী বাহিনীর সকল নির্যাতনের অস্বীকার করারই নামান্তর।

রাব্বি এ উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন যে, মিসরের এ ঝুঁকে পড়াটা বাদশাহ্‌র ইহুদী প্রজাদের পক্ষ থেকে একটি শত্রুতার ঢেউ সৃষ্টি করবে। অথচ তারা সব সময়ই তার সিংহাসন ও দেশের জন্য (যা তাদেরও দেশ) খুবই আন্তরিক। আর তিনি হচ্ছেন 'সকলেরই সহযোগী'। আর বিশেষ করে ইহুদীরা তাঁর ও ইতোপূর্বে তাঁর পিতার সাথে তার খেদমতে এবং দেশের জন্য তাদের অনুগত্য ও ভালবাসার প্রমাণ রেখে এসেছে।

বাদশাহ্ ফারুক তাঁর ইহুদী প্রজাদের ব্যাপারে তাঁর দায়িত্বের কথা এভাবে প্রকাশ করেন যে, তারা বা মুসলমান বা কিবতীদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই এবং তিনি এ আগ্রহও প্রকাশ করেন যে, মিসরীয় ইহুদীরা ফিলিস্তিনী ইহুদীদের জন্য তাদের প্রভাব খাটাবে যাতে আরবদের বিরুদ্ধে তাদের এ মারমুখী ভাবটা কিছুটা শিথিল করে। তিনি এও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ফিলিস্তিনে কোন সংঘাত ঘটলে তার সরকার আরব অনুভূতির বাইরে থাকতে পারবে না।

১৯৪৬ এর গোটা গ্রীষ্মকাল ধরেই ইলইয়াহু সাসুন— ইহুদী এজেন্সীর আরব বিষয়ক উপদেষ্টা (এবং মোশে সাসুন-এর পিতা যিনি পরবর্তীতে কায়রোতে ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত ছিলেন), মিসরে প্রায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ বিভাগ (রাজনৈতিক পুলিশ) কর্তৃক রাজকীয় সচিবালয়ে পেশকৃত রিপোর্টগুলোর আলোকে দেখা যায় যে, ইলইয়াহু সাসুন মিসরের প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল সেদকী পাশার সাথে বৈঠক করেন। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু সংখ্যক মিসরী রাজনীতিকের সাথেও বৈঠক করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন— মাহমুদ ফাহ্‌মী আন্-নাকরাশী পাশা, তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা। তিনি এ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথেও বৈঠক করেন। এ ছাড়াও রেনিয়া কাতাবী বেগ— তাঁর গৃহে বেশ কিছু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত ও জননেতাদের সাথে তাঁর বৈঠকের ব্যবস্থা করেন।

ইলইয়াহু সাসুন রাজকীয় সচিবালয়ের সচিব হাসান ইউসুফ পাশার সাথে তিন-চারটি বৈঠক করেন। তিনি এসব বৈঠকে ওয়াইজম্যান, বেন গোরিয়ন প্রমুখ জায়নিস্ট নেতার পক্ষ থেকে বাদশাহ্ ফারুককে লেখা পত্রাবলী তার কাছে হস্তান্তর করেন। এমনকি বেন গোরিয়ন স্বয়ং কায়রোতে এসে ইমাদুদ্দীন সড়কে ছোট বেনসনে উঠেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহ্ ও যাদের জন্য প্রযোজ্য— তারা যেন মিসরীদের থেকে এমন সব কথাবার্তা শোনেন যাতে মিসর ও তার জাতির প্রতি ফিলিস্তিনের ইহুদী এজন্সীর শুভাকাঙ্ক্ষা নিশ্চিত হয়।

ইনসাফের খাতিরে বলতে হয় যে, সে সকল মিসরী নেতৃবৃন্দ ইল্‌ইয়াহুন সাসুনের সাথে বৈঠক করেছিলেন তারা কেউ কোন ব্যাপারে জড়িত ছিলেন না। তাদের কাউকে জায়নিস্টদের সাথে সহযোগিতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ এ সংগঠনটি তখনো মিসরের সাধারণ চেতনায় প্রকাশিত ছিল না। সরকার বা জনগণ কারো কাছেই নয়। এ ছাড়াও প্রতিনিয়ত মিসরের ইহুদীদের বিষয় বলে জানা বিষয়গুলোর সাথে জায়নিস্ট আন্দোলনের বিষয়গুলো মিশে যেতে লাগল। এছাড়াও তখন মনে হচ্ছিল মিসর ফিলিস্তিন সঙ্কটে তার ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ফিলিস্তিন জাতির দুর্দশা লাঘবে সে অবদান রাখতে পারে।

নাহ্‌হাস পাশা ছিলেন এ মতেরই সমর্থক। আল্‌হাজ্ব আমীন আল্‌-হুসেইনী লিখেছেন ঃ তিনি যখন নাহ্‌হাস পাশার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন তখন তার কাছে এ কথা শুনে চমকে উঠলেন ঃ "আরে ভাই, আপনারা কেন আপনাদের ওখানকার ইহুদীদের সাথে বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করে আমাদের সবাইকে এ মগজের ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছেন না।"

আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, এ সময়ে মিসরের যত নেতা ও রাজনীতিকের সাথে ইহুদী এজেন্সীর প্রতিনিধিদের যোগাযোগ হয়েছে তা ছিল বোধগম্য একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই। অভিযোগ করে বলছি না— কেবলমাত্র একজনের বেলাতেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য নয়, তিনি হচ্ছেন— ইসমাঈল সেদকী পাশা প্রধানমন্ত্রী; যার সম্পর্কে বলা যায় যে, তার ব্যক্তিগত স্বার্থাদি তার দায়িত্বের সাথে মিশে গিয়েছিল। হয়তো-বা সেদকী পাশার বাড়তি কিছু সুবিধা ছিল যা অন্যদের ছিল না। সম্ভবত, তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তিনি ফিলিস্তিনের ইহুদীদের মন জয় করতে পারবেন— এই শর্তে যে, ইহুদীরা তাদের চেষ্টা ও ব্রিটেনে তাদের প্রভাব খাটিয়ে মিসর ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। সে সময় সেদকীর ভবিষ্যৎ ও অতীত উভয়টিই সেদকী-বেফেন আলোচনার সাফল্যের সাথে জড়িত ছিল।

সেদকী তো আর ব্রিটিশ নথিপত্র পড়ার জন্য বেঁচে নেই, যেগুলো এখন প্রকাশ করছে যে, কিভাবে ইহুদী আন্দোলন ও বিশ্বব্যাপী জায়নিজম তাদের চূড়ান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছিল যেন মিসর ও ব্রিটেনের মধ্যে কোন নতুন অঙ্গীকার সম্বলিত চুক্তি না হয়। অন্যথায় সেটাই হবে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েমের আগে উভয় দেশের মধ্যকার সকল বিষয়ের মূলসূত্র। জায়নিস্ট নেতৃত্ব— বিশেষ করে সে সময়কার প্রথম নেতা— ডেভিড বেন গোরিয়ন মনে করতেন— "মিসরের সাথে ব্রিটেনের যে কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়াই এই নীতিকে জোরদার করবে যে, ইহুদীদেরকে কেবল ফিলিস্তিনের কিছু অংশ দেওয়া হবে— তাদের আশা অনুসারে গোটা ফিলিস্তিন নয়।"

তাছাড়া ডেভিড বেন গোরিয়ন চাচ্ছিলেন— সুয়েজখালের ঘাঁটির ভবিষ্যৎ নিয়ে মিসর-ব্রিটেন আলোচনা ছন্দপতনগুলোকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটেনকে এটা বুঝাতে যে, ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত ভাবী ইহুদী রাষ্ট্র সব সময় তার সাথে এমন এক চুক্তি করতে প্রস্তুত যা তাকে এ অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুবিধা দিবে, যাতে তারা সুয়েজ খালের সুরক্ষা করতে পারবে এবং মিসরের পাশে এমন এক আত্মীয়ের গ্যারান্টি দিবে যে সব সময় মিসরের স্বাধীনতা এবং তার প্রভাব ও কর্মকাণ্ডের সীমান্তে অনবরত চাপ সৃষ্টিকারী একটি উপকরণ হিসেবে কাজ করে যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শক্তির মালিক কে ?

যে শক্তির মালিক সে-ই সত্যের মালিক।
বিজয়ীরাই ইতিহাস তৈরি করে
আর তা লেখেও তারাই!

॥ ১ ॥

বেন গোরিয়ন

"আমি খবই দুঃখিত কারণ তোমরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে কয়েকটি ঘণ্টার ফুরসত দিতেও অস্বীকার করেছ।"

— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যানকে পাঠানো এক গোপন টেলিগ্রামে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লাইমন্ট আটলে

বেন গোরিয়নের ধারণায় ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কবেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তার সামনে সমস্যা একটাই ছিল— কখন এর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হবে ? এ রাষ্ট্র ঘোষণার পর এর নিরাপত্তা বিধানও তার কাছে কোন সমস্যা মনে হয়নি, কারণ এর প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার গ্যারান্টির জন্য তিনি আগেভাগেই সক্ষম এক বাহিনী তৈরি করে রেখেছিলেন। একমাত্র সমস্যা হলো ঃ কোত্থেকে শুরু করা যায় ?

সে সময় থেকেই বেন গোরিয়নের যুক্তি ছিল যে, রাষ্ট্রটির প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ বাধিয়ে রাখাটা বাঞ্ছনীয় নয় বরং এর স্থায়িত্ব ও শক্তির জন্য গ্যারান্টি হলো শান্তি অবস্থা বিরাজ করা। এখানে সমস্যা একটাই— কিভাবে আরব বিশ্বকে রাজি করানো যায় ?

বেন গোরিয়ন জানতেন যে, এই 'কখন'-এর উত্তর কেবল যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে......। আর 'কোথা থেকে শুরু করা যায়' ? এর উত্তর লুক্কায়িত রয়েছে এক লড়াইয়ে যা প্রথমত ও প্রধানত কেন্দ্রীভূত হবে মিসর আর জর্ডানে.....। আর 'কিভাবে' ?-এর উত্তর রয়েছে আরবদের একথা স্বীকারের মধ্যে যে, তাদের কাছে সত্যি সত্যি কোন স্বীকৃতি চাওয়া হচ্ছে না; কেবল তার ভাষ্যমতে– "অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লেনদেন করে যাওয়া— কোন সীমা বা প্রতিবন্ধকতা অথবা কোন রকম শর্ত ছাড়া।"

১৯৪৬, ১৯৪৭ ও ১৯৪৮-এর স্পর্শকাতর বছরগুলোতে প্রতিপক্ষের রুটগুলো নির্দিষ্ট হতে থাকল। এর প্রতিটি পক্ষ তার অগ্রাধিকারের সীমানা নির্ধারণ করে নীলনক্সা আকার চেষ্টায় ছিল।

১. ব্রিটেন এক হতাশাব্যঞ্জক লড়াইয়ে জড়িয়ে গেল। স্যার হ্যারোল্ড বেলী— তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেষ্ট বেফেন-এর কার্যালয়ের পরিচালক, যিনি পরবর্তীতে মিসরে দু'বার ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন— এই মিস্টার বেলীর ভাষ্য অনুযায়ী, দিনের পর দিন এ লড়াই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছিল ঃ

"আমরা এ জলোচ্ছ্বাসের সামনে দরজা খুলতে পারি, তবে একটা সময় আসবে যখন আমরা উপলব্ধি করব যে, দরজা খুলে দেয়া এক, আর পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা আরেক।" যে ব্রিটেন "ফিলিস্তিনী ইহুদী রাষ্ট্র প্রকল্পের সূচনা করেছিল সহসাই সে প্রকল্পের ওপর আধিপত্যের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল।"

বস্তুত যে কারণে এই প্রকল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার সুযোগ থেকে ব্রিটেন বঞ্চিত হলো এবং ফিলিস্তিনে ইহুদীদের প্রবেশ, অভিবাসন থেকে বন্যার রূপ পরিগ্রহ করল তা হচ্ছে চূড়ান্তপর্বে পাশ্চাত্য নেতৃত্ব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর হয়ে যাওয়া।

২. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের চাবি তার হস্তগত করে কেবল ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি দেশ মাত্র নয়— পুরো অঞ্চলটির প্রতি তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সে এমনই সময়ে এ অঞ্চলে প্রবেশ করল যখন সে সোভিয়েত ইউনিয়েনের সাথে বৈশ্বিক মোকাবিলায় ব্যস্ত, এ সময় যার যা-ই ইচ্ছা থাকুক না কেন তার অনিবার্য প্রয়োজনে সবাইকে বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে।

অধিকন্তু সে যখন এ অঞ্চলে অগ্রসর হল তখন যুক্তরাষ্ট্রে জায়নিস্ট আন্দোলনের প্রভাব তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের শিরা-উপশিরায় প্রবহমান, যদিও তার স্বার্থ নিহিত ছিল আরব জমীন তথা আরব জাতিসমূহের মধ্যেই। আর এটা ছিল এক সক্রিয় বিবেচ্য বিষয় যাতে আমেরিকান সিদ্ধান্ত তার স্বার্থের ক্ষেত্রে এক সংঘাতের সৃষ্টি করে। এই প্রেক্ষাপটেই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ও জেদ্দাস্থ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্নেল এডে'র মধ্যকার সেই বিখ্যাত সংলাপটি হয়েছিল।

এডে চেয়েছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট গৃহীত নীতি যে আমেরিকার স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এতে ট্রুম্যান সুস্পষ্ট জবাব দেন ঃ "ম্যানুসুতাতে কি আরবদের ভোট আছে যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমাকে দিবে বা আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে ?" এডে স্বাভাবতই নেতিবাচক জবাব দেন। ট্রুম্যান জেদ্দাস্থ তার চ্যার্জ দ্য এফেয়ার্সের যুক্তি খণ্ডনেও এ কথাই বলেন ঃ "ম্যানুসুতা রাজ্যে ইহুদীদের ভোট রয়েছে!"

(এখানে ইতিহাসের আরেকটি গোপন কথা উল্লেখ করা যায়— প্রখ্যাত লেখক গোর ফিডেল তাঁর বই "ইহুদী ইতিহাস......তিন হাজার বছরের গ্লানি"-এর ভূমিকায় বর্ণনা করেন যে, "তিনি সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি'র কাছে শুনেছেন যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য তাকে মনোনীত করার সময় টের পেলেন যে, তার পূর্বসূরি রুজভেল্টের অধিকাংশ বন্ধুই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তারা তার সাফল্যের সম্ভাবনায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল।" তাঁর মনোবল খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল, এ সময় একদিন জায়নিস্ট আন্দোলনের এক কর্মতৎপর সদস্য তার নির্বাচনী প্রচারের সময় একটি রেল স্টেশনে এসে তাকে একটি

ব্রিফকেস দিল। ওটার মধ্যে নগদ দু' মিলিয়ন ডলার ছিল। সে এটাকে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে তার অংশগ্রহণ হিসাবে গণ্য করার আশা পোষণ করে।" 'ফিডেল' বর্ণনা করেন— কেনেডি পরবর্তীতে তাকে বলেছিলেন—"এভাবেই ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণার পূর্বেই আমরা তাকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলি, এরপর ট্রুম্যানের যুক্তির সাথে আরেকটি উপাদান যুক্ত হলো— যদিও এর কারণ নিয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে। সেটা হচ্ছে যে, ইসরাইল কিনা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া নিজের প্রতিষ্ঠা বা রক্ষায় সমর্থ ছিল না, সে-ই প্রমাণ করল যে সে এ অঞ্চলে আমেরিকান নীতি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়নকারী সক্ষম বন্ধু।

ইসরাইল ততদিনে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করে নানামুখী সীমান্তের বিস্তৃত নীল নক্সা একে ফেলেছিল ঃ

রাষ্ট্রের সীমানা ঃ তার বাহিনীর শক্তি যতদূর পৌঁছায় সে অনুসারে ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকবে (বেন গোরিয়নের ভাষ্যমতে)।

নিরাপত্তার সীমা ঃ এরপর এটি আরও বিস্তৃত হবে, যাতে ভবিষ্যতে এর নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ যে কোন বিপদের মোকাবিলা করা যায়, চাই সে বিপদ তার বর্তমান সীমানার নিকটেই হোক বা দূরে।

স্বার্থের সীমানা ঃ এ সীমানা বিস্তৃত হবে পেট্রোল ও পানির উৎসসমূহ, সব বাণিজ্যিক বাজার, যোগাযোগ রুট এবং সফর ও স্থানান্তরের স্বাধীনতা ইত্যাদি পর্যন্ত। ফিলিস্তিন জাতি এ সময় কঠিন সঙ্কটে ছিল। কারণ সংঘাতের জমীন ছিল তাদের স্বদেশ। ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার সমাপ্তি পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিপ্লবে তারা তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে।

তারা দেখল যে, সংঘাতের শক্তি তাদের সামর্থ্যের চেয়ে বড়। এটি ঘটছে এমন সময় যখন ফিলিস্তিন বিষয়ে অন্যান্য আরব দেশের মনোযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে— আরব ঐক্যের ধারণার প্রবৃদ্ধি ও আরব লীগের প্রতিষ্ঠার সাথে তাল মিলিয়ে এটা প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে।

ফিলিস্তিন জাতিকে তখন এই ধারণায় পেয়ে বসেছিল যে, তাদের বিষয়টি বুঝি বা আরব বিষয়ে পরিণত হলো। কাজেই সে এখন ভবিষ্যতের গোটা বিষয়ের অংশবিশেষ মোকাবিলা করতে পারে। কারণ গোটা বিষয়টি হচ্ছে সবচেয়ে বড়, কাজেই অংশটি নিশ্চিত করা যাবে। কিন্তু গোটা আরব বিষয়টি আদৌ সম্পূর্ণ বা সুবিন্যস্ত ছিল না, এমনকি মোকাবিলার দুরভিসারিতা সম্পর্কেও এতটুকু সচেতন ছিল না।

মিসর, ইরাক ও সৌদী আরবের শাসক ও বাদশাহী পরিবারগুলো পরস্পর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিল, বিভিন্ন চিন্তাধারার সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিজেদের

সিংহাসন মজবুত করার কাজেই ছিল সচেষ্ট। এ ছাড়াও প্রভাবশালী আরব রাষ্ট্রগুলো (যেমন— মিসর, সিরিয়া, ইরাক) প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল নিজ নিজ স্থানীয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত বলয়ে কিছুটা পারস্পরিক দূরত্ব রেখে। প্রথমত, তারা পাশ্চাত্য শক্তি থেকে স্বাধীনতা চায়।

আরব জাতিগুলো এ অঞ্চলের বিরুদ্ধে কি পরিকল্পনা আঁটা হচ্ছে বা এর বিপদ কি এ সম্পর্কে আদৌ কিছু জানত না। এর সাথে আরও দু'টি কারণ যুক্ত হয়েছিল। (ক) এই প্রথমবারের মতো আরব জাতি পুরো অঞ্চলটির কৌশলগত পর্যায় নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। (খ) এই পথমবারের মতো আরবদের মনে পড়ল যে সশস্ত্র শক্তির আশ্রয় নিতে হতে পারে। তাদের কৌশলগত ও সামরিক যুগ অনেক আগেই পুরনো হয়ে গেছে।

আশ্চর্য হলেও সত্য, এটা ছিল প্রায় আব্দুর রহমান আয্যামের ভাষ্য। তিনি আরব লীগের মহাসচিব থাকাকালীন ১৯৪৬ সালে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োজিত ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্বশীল ব্রিগেডিয়ার ক্লাইটনের সাথে আলাপ করে বলেছিলেন ঃ "এই প্রথমবারের মতো আমরা এ নিয়ে চিন্তা করছি এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মতো কাজ করছি, আসলেও তো আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র নই, বরং কয়েকটি 'প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্র'!

সকল পক্ষের জন্য তখনও জরুরী সঙ্কট ছিল ইহুদী অভিবাসীদের সামনে ফিলিস্তিনের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া। একদিকে ইহুদী এজেন্সী চাচ্ছিল দু'লাখেরও বেশি ইহুদীর জন্য দরজা খুলে দেয়া, যারা যুদ্ধের পর পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন সামরিক শিবিরে পড়েছিল। ইহুদী এজেন্সী যে ধরনের ইহুদীদের কামনা করছিল তারা ছিল ঠিক সে ধরনেরই। তাদেরকে মনে করা হচ্ছিল এমন সব কাঁচামাল যাদের ওপর ভিত্তি করে নতুন রাষ্ট্রটি ঘোষণা দেয়ার সময় দাঁড়িয়ে যাবে। কারণ এরা সবাই হচ্ছে ইউরোপীয় এবং এদের অধিকাংশই হচ্ছে শিক্ষিত ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ— যাদেরকে ইউরোপের দখলদার নাজী শাসকরা ভয় দেখিয়েছিল বা তাড়িয়ে দিয়েছিল। সকল জায়নিস্ট সংস্থা ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সাল— এ দু'বছর ধরে তাদেরকে ইহুদী রাষ্ট্রের সেবার জন্য উপযুক্ত ও প্রস্তুত করার কাজে বিরাট প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে।

তাদেরকে এ বিশ্বাসে বদ্ধমূল করেছে যে, তাদের মূল স্বদেশে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, এমনকি জার্মানীর পরাজয়ের পরেও। কারণ তাদের বিরুদ্ধে এখনও অনুভূতি খুব তীব্র, যদিও নাজী আমলের পর এখন তা সুপ্ত ও চাপা অবস্থায় আছে। ঠিকই পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেকস্লোভাকিয়ার শরণার্থীরা অভিবাসনের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং জায়নিস্ট রাষ্ট্রের খেদমতে তাদের জ্ঞান ও প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি হয়েই ছিল। তারা ভাবত যে, এই রাষ্ট্র তাদেরকে চিরদিনের জন্য মুক্ত করে দেবে।

বেন গোরিয়নের মতে, রাষ্ট্রের ঘোষণাটি এমন সময় হওয়া বাঞ্ছনীয় যখন ফিলিস্তিনে বর্তমানের চার লক্ষাধিক ইহুদীর বদলে কমপক্ষে ছয় লাখ ইহুদী বিদ্যমান থাকে। ট্রুম্যান একলাখ ইহুদীর অভিবাসনের জন্য দরজা উন্মুক্ত করার ওয়াদা করেছেন, তবে তাঁকে আরও বেশিতে রাজি করানোর জন্য চাপ দেয়া হয়েছিল, তারা এখন প্রস্তুত। এ সময় ব্রিটেন অভিবাসনের দরজা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিল, পুরো না খুলে আধোভেজা রাখতে চেয়েছিল— যাতে ফিলিস্তিনে তার বাহিনী অধিবাসীদের মধ্যে যৌক্তিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়। যদি হঠাৎ করে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে তাহলে সকল ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়বে। সকল আরব যে কোন অভিবাসনের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাদের মতে, ফিলিস্তিনে যে সংখ্যক ইহুদী আছে তাতেই যথেষ্ট। এর চেয়ে একটুও বেশি হলে তা নিশ্চিতভাবে ফিলিস্তিনের আরব বৈশিষ্ট্যে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

অভিবাসনের সমূহ বিপদের মোকাবিলায় আরবরা সিরিয়াতে সরকার প্রধান পর্যায়ে এক সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা সুনির্দিষ্টভাবে এ অভিবাসনের সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করবেন এবং ফিলিস্তিনে এ অভিবাসনের জোয়ার বন্ধের ব্যাপারে বর্তমানে কি করতে সক্ষম তা নির্ধারণ করবেন।

কার্যত এই সম্মেলন দামেস্কের সন্নিকটে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্র ব্লোদানে ১৯৪৬ সালের ১২-১৮ জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ঃ

১. একটি আরব উচ্চ কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটি ফিলিস্তিন সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করে যাবে এবং এ বিষয়ে আলহাজ্ব আমীন আল হুসেইনীর নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিন বিষয়ক উচ্চ আরব সংস্থার সাথে সমন্বয় করে যাবে।

২. ফিলিস্তিনে ইহুদী সশস্ত্র দলগুলোকে নিরস্ত্র করে তাদের দল ভেঙ্গে দেয়ার দাবি জানানো, কারণ এটাই আরব অধিবাসীদের ওপর এ দলগুলের নির্যাতন বন্ধের সফল উপায়।

৩. একটি আরব ফান্ড গঠন, যাতে সকল আরব দেশ অংশগ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনীদের সাহায্য করা হবে এবং যে কোন ফিলিস্তিনী জমীন কিনে নেয়া হবে, যাতে তা ইহুদীরা কিনতে না পারে। তবে ব্লোদান সম্মেলন এই সব ঘোষিত সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আরও কিছুসংখ্যক গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, যা আবশ্যিকভাবে কার্যকর করতে হবে, যদি ইহুদী অভিবাসনের জন্য ফিলিস্তিনের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য আরও জোরেশোরে উচ্চারিত হয় এসব গোপন সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল এ রকম ঃ

১. আরব দেশগুলো অচিরেই যে সকল দেশকে যে কোন সুবিধা দেয়া থেকে বিরত থাকবে, যারা অভিবাসনকে সমর্থন করে।
২. আরব দেশগুলো সাহিত্যিক নিষেধাজ্ঞাস্বরূপ নিজ নিজ দেশে এ সকল দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মিশনগুলোর কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেবে।
৩. আরব দেশগুলো অবিলম্বে এ সকল দেশকে নিজ ভূখণ্ডে যে সকল সুবিধা প্রদান করেছে তা প্রত্যাহার করে নেবে।
৪. আরব রাষ্ট্রগুলো অচিরেই জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের কাছে এই অভিবাসন বন্ধের আবেদন জানাবে, কারণ এটা তাদের নিরাপত্তার জন্য সুস্পষ্ট হুমকি।
৫. এর পর আরব রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিন জাতিকে অস্ত্র-সজ্জিত করবে, যাতে তারা নিজেদের প্রতিরক্ষায় সক্ষম হয় এবং সবাই তাকে সর্বাত্মক উপায়ে সাহায্য করবে।

১৯৪৬ সালের 'ব্লোদান সম্মেলনে' মিসরের প্রতিনিধিত্ব ছিল এমন এক পর্যায়ের যা কোন আরব বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মিসরের ইতিহাসে নজিরবিহীন। যদিও প্রধানমন্ত্রী সেদকি পাশা এ সম্মেলনে নিজে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেননি, কারণ তিনি (সেদকি-বেফেন চুক্তির লক্ষ্যে) ব্রিটেন-মিসর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তার মন্ত্রণালয়ে অংশগ্রহণকারী সকল দলের নেতারাই মিসর-প্রতিনিধিদল হিসাবে ব্লোদান সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মিসরীয় প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল যাঁদের সমন্বয়ে, তাঁরা হচ্ছেন— সা'দীয়ীন দলের সভাপতি মাহমুদ ফাহ্মী আন-নাফরাশী পাশা, ডঃ মোহাম্মদ হুসাইন হাইকাল পাশা, সভাপতি, আহরার দাস্তুরীয়ীন দল; মোকাররম উবাইদ পাশা, সভাপতি, আল কুতলা দল ও হাফেজ রমাদান পাশা, সভাপতি, জাতীয় পার্টি। এঁদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আবদুর রায্যাক সানহুরী পাশা— ইনি হচ্ছেন আইনের দিকপাল, যিনি আরব বিয়য়ে একটি রেফারেন্সে পরিণত হয়েছিলেন।

সে সময় মিসরে বলাবলি হচ্ছিল যে, সেদকি পাশা ঐ নেতাদের ব্লোদান-এ পাঠিয়েছেন যেন তাঁরা ফিলিস্তিন সঙ্কট নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এদিকে তিনি মুক্ত পরিবেশে ইংরেজদের সাথে আলাপ চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এটা যথার্থ ছিল না। যদিও কিছুটা সত্যতা থেকে খালিও ছিল না।

আসলে সেদকি পাশা তার কোয়ালিশন সরকারের শরীক দলগুলোর নেতাদের অবর্তমানে লর্ড স্টান্সজেট (ব্রিটিশ আলোচক প্রতিনিধিদলের নেতা)-এর সাথে আলোচনা করার জন্য বসেছিলেন না বরং তিনি এ সুযোগ গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনের ইহুদী এজেন্সীর প্রতিনিধিদের সাথে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকের

জন্যও তিনি বসেছিলেন না বরং এ সময় ইলইয়াহু সাসুন গোপনে মিসরে পৌঁছেন এবং সেদকি পাশা তাঁর সাথে রেনিয়া মোসেরির বাড়িতে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেন। যেখানে রাব্বি হায়েম নাহুম আফেন্দি কমপক্ষে একবার অংশগ্রহণ করেন। এ সকল বৈঠকে সেদকি পাশা ইংরেজদের সাথে তাঁর অবস্থানে ইহুদীদের সমর্থন লাভের চেষ্টাই করেছিলেন। এর বিনিময়ে তিনি ফিলিস্তিনের যৌক্তিক সংখ্যক ইহুদী অভিবাসনে চোখ বুজে থাকার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সেদকি পাশা যে সংখ্যা পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে (অভাবলুক) প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা হচ্ছে ৫০ হাজার ইহুদী অভিবাসী। এটা সাসুনের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। কিন্তু রাব্বি হায়েম নাহুম আফেন্দি এতটুকু অফারেই ফিলিস্তিনের ইহুদী এজেন্সীকে রাজি করাতে তাঁর প্রভাব খাটাতে প্রস্তুত ছিলেন।

সম্ভবত এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ইলইয়াহু সাসুন সেদকি পাশা থেকে বর্ণনা করেন যে, এই সকল বৈঠকে তিনি ফিলিস্তিনের ভাগাভাগিকে কবুল করে নেয়ার ক্ষেত্রে মিসর সরকারের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করেছিলেন। এতেই ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বোঝা যায়। সাসুনের মতে সেদকি পাশা যা বলছেন, বাদশাহ্ ফারুক তা অবহিত আছেন। যা হোক তিনি অচিরেই অনুকূল আবহাওয়া ও শুভাকাঙ্ক্ষী প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করবেন এবং সাসুন তাঁর মতামত জানাবেন অথবা বাদশাহ্ ফারুক ও ডঃ হায়েম ওয়াইজম্যান-এর মধ্যে আবেদীন প্রাসাদে একটি সরকারী সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করবেন।

মিসরের বিশেষত প্রামাণ্য দলিলাদি এ ধরনের কোন ইঙ্গিত বহন করে না। কিন্তু এটা ভাবাও মুশকিল যে, ইলইয়াহু সাসুনের মতো যোগ্য লোক এ ধরনের বিপজ্জনক একটি বিষয়ে এ রকম বানিয়ে কথা বলবেন। সম্ভবত সেদকি পাশা এই ভেবে সাসুনকে কিছু বাড়িয়ে বলেছেন, যাতে ইংরেজদের সাথে তাঁর আলোচনা সফল হওয়ার জন্য ইহুদীরা সক্রিয়ভাবে নাক গলায়।

ব্লোদান সম্মেলনে আগত এত উচ্চ পর্যায়ের মিসরীয় প্রতিনিধিদল কোন কিছুই জানত না যে, প্রধানমন্ত্রী কি করছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মোকাররম উবাইদ পাশাই ছিলেন ব্লোদান সম্মেলনে মিসরীয় আগত প্রতিনিধিদলের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টবাদী ও তেজদীপ্ত। সম্ভবত এ বিষয়ে মিসরীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনিই ছিলেন সবচাইতে সচেতন। তিনি জানতেন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মর্ম কি ? 'ব্লোদানে'র কার্যবিবরণী ইঙ্গিত করে যে, মোকাররম পাশা ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আরব দেশগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগে জটিলতা সৃষ্টি করবে, এগুলোর সীমান্তে বিরাট সমস্যার জন্ম দেবে, এমনকি এগুলোর অগ্রগতির পথে প্রচেষ্টাকেও বেকার করে দিতে পারে। (এজন্যেই জাতীয়তাবাদী নেতারা ইহুদী রাষ্ট্রকে বলেছিলেন– '... আরব দেশগুলোর সামর্থ্য অনবরত চুষে নেয়ার স্পঞ্জ')।

ইতিহাসের সত্যগুলো প্রতীক্ষায় থমকে দাঁড়ায়নি বরং সিদ্ধান্ত, চেষ্টা আর স্লোগান ইত্যাকার বিষয়গুলোর দিকে নজর এড়িয়ে সে তার আপন ধারায় পথ খুঁজে নিয়েছে। ডকুমেন্টগুলোই সেই সব গোপন ভেদ ফাঁস করে দিচ্ছে ঃ

ডকুমেন্ট নং ২৫৪৬-৬/৮৬৭ ন ০১

সৌদী আরবে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ক্লার্ক-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত তারবার্তা ঃ

তাং ঃ ২৫ জুন, ১৯৪৬

ব্লোদান-এ আরব লীগের বিশেষ সম্মেলন শেষে আবদুর রহমান আযযাম কায়রোতে ফিরে আসার পর এখানে তিনি মিস্টার রেফস চাইল্ডস (সৌদীতে নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী— যিনি জেদ্দা আগমনের পূর্বে মিসরীয় রাজধানীতে ছিলেন)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বলেন যে, আরব লীগ সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ফিলিস্তিন— যাকে তারা আরব দেশ বিবেচনা করেন তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে একটি সমাধানে পৌঁছার লক্ষ্যে এ দেশে মেন্ডেটরি রাষ্ট্র হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলোচনা সংলাপের দ্বার উন্মোচন করতে চায়। তারা এ মর্মে ব্রিটিশ সরকারের বরাবর একটি স্মারকপত্রও প্রেরণ করে দেন। তাদের মত হচ্ছে— এ সঙ্কটে প্রথম ধারাকে অবশ্যই কিছু একটা করতে হবে— সে ধারাটি হচ্ছে— ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসন। কারণ তারা ইউরোপের ইহুদীদের বাসস্থান আবিষ্কারের বোঝা বহন করার জন্য এই আরব দেশটিকে বেছে নেয়ার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।

—স্বাক্ষর
ক্লার্ক

ডকুমেন্ট নং ২৯৪৬-৬/ ৮৬৭ ন ০১

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলী'র পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যানকে প্রেরিত তারবার্তা ঃ

তাং ঃ ২৬ জুন, ১৯৪৬ (অতীব গোপনীয় ও একান্ত ব্যক্তিগত; প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত)

আপনি অবগত আছেন যে, ফিলিস্তিনের জায়নিস্ট দলগুলো অভিবাসন বিষয়ে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জায়নিস্ট মিলিশিয়াদের অপারেশন বেড়েই চলেছে। এর সর্বশেষ নিদর্শন হচ্ছে ৬ জন ব্রিটিশ সেনাকর্মকর্তাকে ছিনতাই করে নেয়া।

মহামান্য রাজার সরকার এই মর্মে চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, এ অবস্থায় চুপ থাকা কঠিন। আল কুদ্সের হাই কমিশনারকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি ব্রিটিশ প্রশাসনের আয়ত্তে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

গ্রহণের নিমিত্ত তাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আমার জানা মতে হাইকমিশনার ২৯ জুন তার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করবেন। তার সামনে এ বিষয়ে যে বিষয়গুলো গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে অনুসন্ধান ও প্রমাণ সংগ্রহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য ইহুদী এজেন্সীর অফিসগুলো দখল করে নেয়া, যে সব ডকুমেন্টে অবৈধ অভিবাসন সংগঠনের কাজ করা এবং এর জন্য সশস্ত্র সহায়তার প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য আমরা ইত্যবসরে সর্বাত্মক উপায়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে এ সঙ্কটের একটি রাজনৈতিক সমাধান বের করা যায়। যাতে এ থেকে সৃষ্ট জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিছু কিছু ব্যবস্থা 'হাজানাহ্'-এর সামরিক কমান্ডকেও শামিল করবে (হাজানাহ্ হচ্ছে ইহুদী এজেন্সীর অনুগত প্রতিরক্ষা শক্তি)। এই সংগঠনের বাইরের যে কোন পক্ষকেও শামিল করতে পারে।

—স্বাক্ষর

ক্লিমেন্ট এ্যাটলী

যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী ও জায়নবাদী প্রেসার গ্রুপগুলো এই দৃশ্যপট থেকে দূরে বা ভাবলেশহীনভাবে থাকেনি, বরং দ্রুত লাগসই হস্তক্ষেপ করেছে। ডকুমেন্ট সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে ঃ

ডকুমেন্ট নং ৭৩৪৬/৮৬৭ নং ০১

হোয়াইট হাউস থেকে ইস্যুকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ

তাং ঃ ২ জুলাই, ১৯৪৬

বিজ্ঞপ্তির ভাষ্য ঃ

অদ্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ফিলিস্তিনের ইহুদী এজেন্সীর নির্বাহী পরিষদের কিছু আমেরিকান সদস্যের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। তারা হচ্ছেন ঃ রাব্বি স্টিফেন ওয়াইজ, ডঃ নাহুম বোল্ডম্যান, মিস্টার লুইস লেবস্কী ও রাব্বি আবা হেলেল সেলফার।

ইহুদী এজেন্সীর প্রতিনিধিগণ প্রেসিডেন্টের কাছে ফিলিস্তিনে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। প্রেসিডেন্ট ইহুদী এজেন্সীর প্রতিনিধিগণের নিকট ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে জানান যে, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আগাম কিছু আন্দাজ করতে পারেননি।

প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে, ফিলিস্তিনের সকল ইহুদী নেতৃবৃন্দকে তাৎক্ষণিকভাবে ছেড়ে দেয়া হবে। প্রেসিডেন্ট তার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, ইউরোপ থেকে তথায় এক লাখ ইহুদী অভিবাসীর জন্য ফিলিস্তিনের দরজা উন্মুক্ত করা নীতিতে কোন প্রভাব ফেলবে না।

এই বৈঠকের প্রেস বিজ্ঞপ্তি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো উল্লেখ করেনি। তবে ১৯৪৬ সালের আমেরিকান ডকুমেন্ট-এর ৬৪৫ পৃষ্ঠায় এগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে। তবে সার

সংক্ষেপ হচ্ছে— প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ফিলিস্তিনে এক লাখ ইহুদীর অভিবাসনের আর্থিক ব্যয় কোথা থেকে নির্বাহ করা যায় তা নিয়ে ভাবছিলেন। এতে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার লাগতে পারে (সে সময়কার ডলার মূল্য অনুযায়ী, যা আজকের মূল্যমানের দশগুণের সমান)। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা দেন যে, যুক্তরাষ্ট্র একাই তাদের পরিবহন খরচ বহন করবে। একই সময়ে ইহুদী নেতৃবৃন্দ জানান যে, তাদের কাছে ২৫০ মিলিয়ন ডলার রয়েছে পুনর্বাসনের জন্য, কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। এতে কেবল আংশিক কাজ করা যাবে।

ডকুমেন্ট নং ৮৪৬-৭/৮৬৭ ন ০১

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পক্ষ থেকে বাদশাহ আবদুল আযীয আল সউদের নিকট পত্রঃ

তাং ঃ ১৩ জুলাই, ১৯৪৬

মান্যবর,

আমি আপনার পত্র পেয়ে আনন্দিত; যে পত্রটি আমাদের বন্ধু এবং আপনারও বন্ধু— আপনার সরকারের নিকট প্রেরিত আমাদের সাবেক রাষ্ট্রদূত কর্নেল উইলিয়াম এডে'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। আমি যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও সৌদী সরকারের মধ্যে বিদ্যমান অব্যাহত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে গভীরভাবে সম্মান করি। ইউরোপে বিতাড়িত ইহুদীদের মানবিক সমস্যাটি যে আপনি বুঝতে পেরেছেন তা কর্নেল এডে'র কাছে পৌঁছেছে। এখন তাদের ফিলিস্তিনে যাওয়াতে আপনার উদ্বেগের কথাও আমাকে অবহিত করা হয়েছে। আমি আমার আন্তরিক বিশ্বাসের কথা আবারও জানাতে চাই যে, এক লাখ ইহুদী ফিলিস্তিনে গেলে তা আরবদের অধিকার বা স্বার্থে প্রভাব ফেলবে না এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যেও কোন অসুবিধা দেখা দেবে না।

—স্বাক্ষর
হ্যারি ট্রুম্যান

ডকুমেন্ট নং ১৭৪৬–৮/ ৮৬৭ ন ০১

আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস পেরোসের পক্ষ থেকে রাব্বি স্টেফেন ওয়াইজের নিকট প্রেরিত পত্র ঃ

প্যারিস ঃ ১৭ আগস্ট, ১৯৪৬

প্রিয় ডঃ ওয়াইজ,

আপনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, আমি যেন প্যারিসে অবস্থানকালে মিস্টার নাহুম গোল্ডম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করি, তিনি ফিলিস্তিন বিষয়ে কিছু প্রশ্নে আমার সাথে দেখা করতে চান। আমিও তাঁর সাথে দেখা করতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আমি এ বিষয়ের চ্যানেল থেকে বেশ দূরে অবস্থান করছি। কারণ সাম্প্রতিক সুদীর্ঘ বছর ধরে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ব্যক্তিগতভাবে নিজেই ফিলিস্তিন সম্পর্কিত যাবতীয়

বিষয়ের দায়িত্বভার নিয়েছেন। এ বিষয়ে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সরকারদ্বয়ের মধ্যকার যোগাযোগ সরাসরি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার এ্যাটলী'র মধ্যেই হয়ে থাকে— আমার ও মিস্টার বেফেনের মধ্যে নয়।

—স্বাক্ষর
জেম্‌স পেরোস

ডকুমেন্ট নং ১২৪৬-৯/৮৬৭ ন ০১

উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম ক্ল্যাটনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট প্রেরিত স্মারক ঃ

তাং ঃ ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

প্রেসিডেন্ট,

রাব্বি ওয়াইজ ও তার সাথে আরও কিছু সংখ্যক জায়নিস্ট নেতার মত হচ্ছে, আপনি যেন ফিলিস্তিনের বিভক্তি ও তাতে ইহুদী অভিবাসনের দরজা খোলার ব্যাপারে তাৎক্ষণিক বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, এটা ব্রিটিশ সরকারের আরও যৌক্তিক অবস্থান গ্রহণে সহায়ক হবে।

—স্বাক্ষর
উইলিয়ন ক্ল্যাটন

ডকুমেন্ট নং ১০৪৬-১০/৮৬৭ ন ০১

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী'র পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট প্রেরিত তারবার্তা ঃ

তাং ঃ ৪ অক্টোবর, ১৯৪৬ (অতীব গোপনীয় ও জরুরী)

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

গতকাল দুপুর রাতের পর আমি ফিলিস্তিন সম্পর্কে আপনার বিবৃতির পরিকল্পনাটি পেলাম এবং আপনার পত্রও পেলাম। এর উত্তরে আমি আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে লিখে পাঠিয়ে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম যেন ঘোষণাটি প্রকাশে কিছু বিলম্ব করা হয়— এমনকি কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও। যাতে অন্তত আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে পারি। কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই ঐ কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘোষণা বিলম্বিত করা আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে পাঠানো আপনার জবাব পেলাম। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনি এমন একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন যে দেশ বর্তমানে ফিলিস্তিন বিষয়ক প্রশাসনের দায়ভার বহন করে চলেছে। জেনে রাখুন, আপনার এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে ফিলিস্তিন প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। এ ধরনের তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয়ার কারণ সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা জানার জন্য গভীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছি।

—স্বাক্ষর
এ্যাটলী

জায়নিস্ট আন্দোলন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েমের ব্যাপারে সব সময়ই তড়িঘড়ি করছিল। আর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিজেও ছিলেন এর সামনে আর পেছনে।

আগে থেকেই রাষ্ট্রের নাম ঠিক করা ছিল— 'ইসরাইল'। এর পতাকার ডিজাইনও আগে থেকেই চূড়ান্ত করা ছিল; উপরে-নিচে দু'টি নীল ডোরা, সাদা গোলাকৃতির জমীনের মাঝখানে দাউদের তারকা। অনেক আরবই ইসরাইলী পতাকার এই ডিজাইনের অর্থ ও ভেদ বুঝতে পারেনি। কিন্তু ফিলিস্তিনের ইহুদীরা ইঙ্গিত বুঝে ফেলেছিল এবং বার্তা গ্রহণ করে নিয়েছিল। পতাকার উপর-নিচে দু'টি নীল ডোরা হচ্ছে ঐ দু'টি নদী যার মাঝখানে তাদের প্রতিশ্রুত জমীন রয়েছে— পূর্বের বড় নদী–ফোরাত, পশ্চিমের বড় নদ নীল। এটাই হচ্ছে ঐ তৌরাতের ভাষ্য যা হাইকালে সোলাইমান পতনের ৬শ' বছর পর বাবেল-এ বন্দী ও নির্বাসিত থাকার সময় ইসরাইলী ধর্মযাজক রাব্বি বা হাখামেরা লিখে গিয়েছিল।

"সেদিন ইব্রাহীমের সাথে প্রভু তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— তোমার বংশধরদের জন্য মিসরের নদ থেকে বড় ফোরাত নদী পর্যন্ত এই ভূখণ্ডটি দেয়া হলো।" (সৃষ্টিতত্ত্ব – ১৮ ঃ ১৫)

এভাবেই মত আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, এই রাষ্ট্রের কোন নির্ধারিত সীমার মানচিত্র থাকবে না। সম্ভবত আধুনিক বিশ্বে এটাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্র যার প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় সে ভূখণ্ডের সীমারেখা ভূ-প্রকৃতিতে কোথাও নির্ধারিত ছিল না। কারণ, যদি প্রতিশ্রুতিটিই হয় কিংবদন্তি সঞ্জাত, তাহলে রাজনৈতিক মানচিত্র যে কোন ব্যাখ্যা ও তফসীরের সাথে সংশোধন ও পরিবর্তনযোগ্য হয়ে যায়।

॥ ২॥

মোশে শার্তুক

"আরবদের ভয় করার কোন কারণ নেই, তারা তো দুস্থ-দুর্বল।"
— জাতিসংঘে নিযুক্ত আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধির প্রতি হায়েম ওয়াইজম্যান

ব্রিটেন, আমেরিকা ও ইসরাইলের দলিলপত্র এখন সবই হাতের নাগালে; এগুলোই ১৯৭৪ সাল জুড়ে গোপনে কি হচ্ছিল তা জানার জন্য যথেষ্ট। এই দলিল-দস্তাবেজ সূক্ষ্মভাবে পাঠ করলে তিনটি বাস্তবতা বেরিয়ে আসে ঃ

১. প্রথম বাস্তবতা হচ্ছে— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার প্রেসিডেন্ট ও সরকারসহ সম্পূর্ণতই ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়ে গিয়েছিল। এ পথে অপেক্ষমান সব কঠিন সমস্যা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তারা এ পথ বেছে নিয়েছিল। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসনের দ্বার উন্মুক্ত করা এবং সেখানে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অনমনীয়ভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন, কোন কিছুরই তোয়াক্কা করলেন না। বলা চলে, তার নির্বাচনী স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাই ছিল তার মূল চালিকাশক্তি। তবে একই সময়ে সন্দেহাতীতভাবে এটাও সত্য যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাকি ম্যাকানিজমও প্রেসিডেন্টের পদানুসরণ করে গিয়েছিল। এটা কেবল তার চাপের মুখেই হয়নি বরং এর পাশাপাশি বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থার ফলশ্রুতিও কাজ করেছিল— যা বিভিন্ন কৌশলগত মতাদর্শের জন্ম দিয়েছিল। এই মতাদর্শের জন্য সবচেয়ে সুযোগ করে দিয়েছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবেদন। সম্ভবত যখন ব্রিটেন থেকে হস্তান্তরিত হয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের উত্তরাধিকার আমেরিকার হাতে পড়েছিল তখনই আমেরিকান নীতি সহসাই আবিষ্কার করে ফেলেছিল যে, নেপোলিয়ন ও তারপর বিল মার্স্টনের যুক্তি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা সিরিয়া থেকে মিসরকে বিচ্ছিন্ন রাখাকে শ্রেয় মনে করতেন। এরপর সম্ভব হলে আফ্রিকার আরবদের প্রাচ্য আরব থেকে বিছিন্ন রাখতে চেয়েছিলেন।

২. দ্বিতীয় বাস্তবতা হচ্ছে— ফিলিস্তিনকে ভাগাভাগি করার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অলঙ্ঘনীয় সিদ্ধান্ত নং-১৮১, তাং ২৯ নভেম্বর ১৯৪৭ জারি হলো। এটা এমন পরিমণ্ডলে হয়েছিল যা 'লেক সাক্সেস'কে ঝড়ো হাওয়ার মতে তাণ্ডবে উন্মাতাল করে রেখেছিল। নিউইয়র্কের এখানেই জাতিসংঘের সদর দফতর অবস্থিত। কারণ সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ এমন রকমারি চাপের শিকার

হয়েছিলেন, যা বাহ্যত মোকাবিলা করার মতো ছিল না। ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত অনুমোদনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠাতা লাভের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোমর বেঁধে নামা হয়েছিল।

অনেক কথা প্রচারিত আছে, যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রপতিকে হুমকি দেয়া হয়েছিল এবং প্রতিনিধিদেরকে দেয়া হয়েছিল মোটা অঙ্কের ঘুষ। বড় বড় আমেরিকান কোম্পানী ভোটের দিক পরিবর্তনে বাধ্য করার জন্য হস্তক্ষেপ করেছিল। এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত হচ্ছে লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে 'ফায়ার স্টোন' রাবার কোম্পানীর ঘটনা, যাতে তিনি ভাগাভাগির ভোটে তার দেশের 'না' কে 'হ্যাঁ'-তে পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। ফলত ভাগাভাগির সিদ্ধান্তটি উপযুক্ত সমাধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া না হয়ে এটা হয়েছিল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত হাসিল করার কাজ।

৩. তৃতীয় বাস্তবতা হচ্ছে— আরবরা এ সময় এ ধরনের মোকাবিলায় নিজেদের অবস্থানকে কভারেজ দেয়ার মতো প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে ছিল বাস্তবে প্রায় নগ্ন। এই ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত ইস্যু হওয়ার অল্প কয়েক সপ্তাহ পর আরব বিশ্বকে মনে হলো যেন চলচ্ছক্তিহীন এক বিশাল দেহ। যখন নড়াচড়া করতে চাইল তখন প্রথমেই দেখা গেল যে নড়াচড়া যে স্নায়ু কেন্দ্র থেকে প্রকাশ পাবে সেটাই তার নিয়ন্ত্রণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

শুরু হলো ১৯৪৮ সাল। এ বছরেই ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো। তখন পরিস্থিতি এলোমেলো। দরজার নাট-বল্টুতে ঢেকে গেছে সারা অঙ্গন। পদক্ষেপগুলো ইত-বিক্ষিপ্ত। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে যখন ফিলিস্তিন বিভক্তির পক্ষে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো; ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য স্থান করে দেয়ার প্রয়োজনে ফিলিস্তিন থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়া ছাড়া সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। এভাবে প্রত্যেকেই দেখল তার সামনে এক নির্দেশ এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে সবাই নিজ নিজ স্টাইলে এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মোকাবিলা করছে। এই সব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আসলে ব্যাপক তালগোল মাত্র। ডকুমেন্টগুলোই এর জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করছে।

ডকুমেন্ট নং ৪৭-/২ জ

ওয়াশিংটনস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরিত স্মারক ঃ

তাং ঃ ৫ জানুয়ারি, ১৯৪৮ (অতীব গোপনীয়)

১. মিস্টার বেফেন (ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ও মিস্টার মার্শাল, আমেরিকান বাহিনীর সাবেক চীফ অব ওয়ার স্টাফ, যাকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী করার জন্য মনোনীত করেন— এ দু'জন ১৯৪৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর লন্ডনে এক বৈঠকে

আলোচনাকালে মিস্টার বেফেন তাঁর মত প্রকাশ করেন যে, ফিলিস্তিন সম্পর্কে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আরব সরকারগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাশার চেয়েও খারাপ, যদিও আরব বিশ্বে নিয়োজিত ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ আরব সরকারগুলোকে 'সুবিবেচক' বানাবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। মিস্টার বেফেন বলেন যে, তিনি অচিরেই লন্ডনে এক এক করে সকল আরব রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে সমঝে চলার সবক দেবেন।

ব্রিটিশ সরকার আশঙ্কা করছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকায় অচিরেই তাদের হাত থেকে লাগাম ফসকে যাবে, এতে সেখানে ব্রিটিশ ও আমেরিকান স্বার্থাদি বিপদের সম্মুখীন হতে পারে, এতে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নই ফায়দা লুটবে।

২. দৃষ্টিভঙ্গিটিকে আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য বলতে হয়, মিস্টার বেফেন ইঙ্গিত করেন যে, ব্রিটেনের আস্থাভাজন বেশ কিছু আরব রাজধানীতে নিয়োজিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতগণ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। এর মাধ্যমেই তারা জানতে পেরেছে যে, ফিলিস্তিন থেকে ব্রিটিশ তার বাহিনী প্রত্যাহার করার ইচ্ছায় আরবদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল।

(ক) সকল আরব দায়িত্বশীল এই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, তারা ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহারের পূর্ববর্তী সময়টিতে তাদের সাথে যে কোন সংঘাতকে এড়িয়ে যাবে, কিন্তু তারা এও ভেবে কুল পাচ্ছে না যে, এই বিপদ থেকে তারা কিভাবে বাঁচবে, যখন অন্যরা এই দোষারোপ করবে যে, ফিলিস্তিন বিভক্তির বিরোধিরা কেবল চড়া চড়া কথামালার মধ্যেই সীমিত থাকছে।

(খ) সকল আরব সরকার এ বিশ্বাস করে না যে তারা ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করার জন্য তার দেশবাসী থেকে যথেষ্ট স্বেচ্ছাসেবীকে বাগাতে সক্ষম হবে। এমনকি এ ভাষ্য মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ খাশাবাহ পাশা, ইরাকী উপ-প্রধানমন্ত্রী, লেবাননী প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ আস্ সুল্হ, সিরীয় প্রধানমন্ত্রী জামিল মারদম এবং জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী সামির রেফাই পাশা প্রমুখের জবানেও উচ্চারিত হয়েছে। ইহুদীরা তাদের আচরণে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে কিনা সে ব্যাপারে একটা স্পষ্ট অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। কেউ যদি তাদেরকে প্রভাব বিস্তারকারী নসিহত করত, তাহলেও হতো। এই মত প্রকাশ করেছিলেন মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সৌদীআরবের পররাষ্ট্র সচিব ইউসুফ ইয়াসিন। স্পষ্টত এই উদ্বেগ জন্ম নিয়েছে ফিলিস্তিনের আরবদের ওপর উপর্যুপরি ইহুদী আক্রমণের কারণে, এতে আরবদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সকল আরব দায়িত্বশীলেরই প্রকাশ্য তিক্ততা বিরাজমান ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি ছিল আরও বেশি। বিশেষ করে আমেরিকা সরকারের বিরুদ্ধে এই তিক্ততা প্রকাশ পায় তাদের ডলার কূটনীতির কারণে। লক্ষণীয়

যে, কেউ কেউ ব্রিটেনের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর পক্ষেও মত প্রকাশ করেছিল। সম্ভবত এটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে দিয়ে খেলার পাঁয়তারা। নিশ্চিতভাবে এই পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় বিরূপ প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লেবাননের প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ আস্ সুল্‌হ্ ব্রিটিশ সরকারকে আরবদের সাথে বন্ধুত্ব জোরদার করার আহবান জানান এবং ব্রিটেনের সাথে ইরাক ও মিসরের চলমান সংলাপের প্রতি ইঙ্গিত করেন। অনুরূপভাবে তিনি পূর্ব জর্ডানের সাথে চুক্তির মূল্যকেও খাটো করে দেখিয়ে বলেন, ফিলিস্তিনই যদি হারাতে হয় তাহলে এই চুক্তির কি দাম আছে ?

(গ) ব্রিটেনের সাথে সমঝোতার পক্ষে সাধারণ আগ্রহের আলামত সুস্পষ্ট। আরব নেতৃবৃন্দ আশঙ্কা করছেন যে, এই সহযোগিতা ছাড়া সব কিছু তাঁদের হাত থেকে ফসকে যাবে। এই নেতাদের কেউই কিন্তু এখনও খোলাসা করে বলেননি যে তারা আসলে আমাদের কাছে কি কামনা করে। তবে তাদের সকলের মূল প্রতিপাদ্য এই ভাষ্য বের হয়ে আসে— "আমাদের সাহায্য করার জন্য তোমাদের কি কিছুই করার সামর্থ্য নেই ?

(ঘ) এ অনুভূতির বহিপ্রকাশ ঘটেছে নূরী আস্ সাঈদ ও সালেহ জাবর (ইরাকের দুই প্রধানমন্ত্রী)-এর সাথে আলাপ-আলোচনায়। রাজকীয় সচিবালয় প্রধান তাহ্‌সীন কাদরীই ছিলেন আরাধ্য বিষয় প্রকাশে বেশি স্পষ্টবাদী। তিনি বাগদাদে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে বলেছেন— "তিরিশ বছর ধরে ব্রিটিশ সরকারই আমাদের বলে দিত যে আমরা কি করব, কেমন আচরণ করব। আমরাও উভয় দেশের স্বার্থে কাজ করে গেছি। এইবারই প্রথম আপনারা আমাদেরকে শান্ত থাকার নসিহত ছাড়া কিছুই বলছেন না। অথচ ভারপ্রাপ্ত বাদশাহ্ (রিজেন্ট) ও সরকার এর চেয়ে বেশি কিছু কামনা করে। অন্যথায় 'শত্রুরা' এটাকে আমাদের ওপর চাপ বৃদ্ধির একটা সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

(ঙ) এ ছাড়া আরও কিছু বিষয় আছে যা সাধারণ ভূমিকায় প্রভাব ফেলতে পারে। সেগুলো বিবেচনায় আনা বাঞ্ছনীয়। এর মধ্যে রয়েছে, জর্ডান সরকার ফিলিস্তিনের আরব অংশটি নিজের জন্য অর্জনের প্রতিই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছে এবং সে এ বিশ্বাসও পোষণ করছে যে, এ বিষয়ে ইহুদীদের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছতে সক্ষম হবে। কিন্তু সে চাপের মুখে সাধারণ আরব জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাধ্য।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান জানতেন তিনি কি চান। তিনি এও জানতেন যে, অন্যরা কি চায়। তাদের প্রত্যেকের সীমাও তিনি জানতেন; ডকুমেন্ট তো তা-ই বলে ঃ

ডকুমেন্ট নং ৪৪৮-২/ ৭১১০৯০-জ

ইরাকে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার সাথে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের পরিচালক লুই হেন্ডারসনের নিকট লেখা স্মারক ঃ

তাং ঃ ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ (অতীব গোপনীয়)

বিষয় ঃ প্রেসিডেন্টের সাথে সংলাপ

আপনি অবগত আছেন যে, আমি সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী এডমিরাল সোয়ের্স-এর মাধ্যমে তাঁর নিকট একটি স্মারক পেশ করেছি। এটা বৈঠকের পূর্বেই করেছি, যাতে আমার আলোচনার বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই তাঁর জানা থাকে। এডমিরাল সোয়ের্স সেটাই চেয়েছিলেন। ঠিক দুপুরের সময় প্রেসিডেন্ট আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমরা ১৫ মিনিট আলাপ করলাম। প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেন যে, তিনি আমার পাঠানো পেপারটি পড়েছেন এবং মন্তব্য করলেন,

"মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিই এখন তাঁকে ব্যস্ত রাখছে।"

আমি তাঁকে বললাম যে, আমি সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই জানতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার ফিলিস্তিন বিভক্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে কোন বাহিনী পাঠাবার চিন্তা করছেন কিনা। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেন যে, তিনি জাতিসংঘের মাধ্যমে কাজ করাকেই উত্তম মনে করেন।

প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, ঠিক এ কথাটিই তিনি আমীর ফয়সল, ইয়ামানের আমীর এবং ইরাকের রিজেন্টকে বলেছেন। ইনি তাঁর সাথে পুরো দু'ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন।

প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, তিনি ইরাকের মনোনীত বাদশাহ (রিজেন্ট)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, ফিলিস্তিনের মতো অপরাপর দেশের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার বদলে নিজ দেশ ইরাকের বড় বড় প্রকল্পের প্রতি মনোযোগ দেয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন— তাঁদের কাছে দজলা ও ফোরাত অববাহিকার উন্নয়নের মতো প্রকল্প রয়েছে যেগুলো আরবদের তেলের অর্থে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। কারণ ইরাকের উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিবারই যোদ্ধারা এতে প্রবেশ করেছিল; সেই প্রথম তৈমুর লং থেকে নিয়ে অন্যরা পর্যন্ত। তারা তাদের চলার পথে সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। যুদ্ধবাজরা সবসময় তা-ই করে থাকে। তবে আমাদের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট বলেন— ইতিহাসে এই প্রথম যোদ্ধাদের নীতি হচ্ছে বিনির্মাণের দিকনির্দেশনা দেয়া।

আমি প্রেসিডেন্টকে বলেছি যে, ফিলিস্তিনে বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে ইরাকের দৃষ্টি অন্যদিকে সরানো কঠিন হবে। আজকের আরবরা আমাদের কাছে একটি প্রশ্নের

সুস্পষ্ট জবাব চায়, তা হচ্ছে আমরা কি জায়নিস্টদের চাপকে কবুল করে আমেরিকান বাহিনী বা জাতিসংঘ বাহিনী প্রেরণ করে এই বিভক্তির সিদ্ধান্তকে জোর করে বাস্তবায়ন করব কিনা। প্রেসিডেন্ট জবাব দিলেন— আমরা এগুলো কিছুই করব না, তবে তারা এই ভাগাভাগির জটিলতায় অস্ত্র ব্যবহার করবে না এই নিশ্চয়তা না দেওয়া পর্যন্ত আমিও এই গ্যারন্টি দিতে পারি না যে, কিছুই করব না। আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম যে, আমি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারছি এবং তাকে প্রস্তাব দিলাম যে, এটা যেন তিনি মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োজিত সকল মিশন প্রধানকে জানিয়ে দেন। প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন— "আরবদের কাছে আইনগত যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

—স্বাক্ষর

ওয়ার্ডসওয়ার্থ

ডকুমেন্ট নং ৩/ ফিলিস্তিন র ব ৫০১

সৌদী আরবে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত চাইল্ডস-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত তারবার্তা ঃ

তাং ঃ জেদ্দা ১৩ মার্চ, ১৯৪৮

আয্যাম পাশা অদ্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ্র সাথে আম্মানে সাক্ষাৎ শেষে জেদ্দায় আগমন করে আমাকে জানিয়েছেন যে, সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে, আরব লীগ-এর মহাসচিব হিসাবে আয্যাম পাশা একটি সাধারণ সতর্কীকরণ পত্র প্রেরণ করবেন যেন এমন কোন বিবৃতি প্রকাশ না করা হয় যাতে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য হুমকি হিসাবে বিবেচনা করতে পারে। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ফিলিস্তিন নিয়ে সংঘাতটি আসলে নাগরিক ও বেসামরিক সংঘাত। কাজেই আরব দৃষ্টিকোণ থেকে কাউকে এমন সুযোগ দেয়া যাবে না যাতে ফিলিস্তিনে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করতে পারে। আমি আপনার তারবার্তা নং ৭৬ তাং ১লা মার্চ-এর মর্ম অনুযায়ী তাকে বিষয়টি অবহিত করেছি। আয্যাম পাশা তাৎক্ষণিকভাবে সিরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট তারবার্তা লিখলেন যেন তিনি এমন কোন বিবৃতি প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন যা হুমকির সামান্যতম ব্যঞ্জনাও বহন করে।

—স্বাক্ষর

চাইল্ডস

চূড়ান্ত মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে, ইহুদী এজেন্সীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক দায়িত্বশীল (পরবর্তীতে ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তারও পরে এর প্রধানমন্ত্রী) মোশে শার্তুকই আমেরিকার পরিমণ্ডলে দিকনির্দেশনার লাগাম টেনে ধরে রেখেছেন। তিনি তখন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে কর্মতৎপর ছিলেন।

ডকুমেন্টই সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ

ডকুমেন্ট নং ২৬৪৮-৩ /৮৬৭ ন ০১।

ফিলিস্তিনে ইহুদী এজেন্সীর মিস্টার মোশে শার্তুক ও মিস্টার ইল্ইয়াহু এবেস্টেন-এর সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনা স্মারক ঃ

তাং ঃ ২৬ মার্চ, ১৯৪৮

মিস্টার শার্তুক মন্ত্রীর বৈঠকের আহবানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মন্ত্রী মহোদয় উভয়কে এখানে ডেকে আনার পেছনে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। মন্ত্রী বললেন, তিনি একটি বৈঠকের ব্যাপারে ইহুদী এজেন্সীর মতামত জানতে চান যে, উচ্চ আরব সংস্থা ও এ এজেন্সীর মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। যাতে ফিলিস্তিনে সহিংস কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় বা শান্তি স্থিতিশীলতা আনা যায়। মিস্টার শার্তুক প্রশ্ন রাখেন যে, তাঁর ব্যবহৃত দুটি ভাষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা হোক। এ দুটি হচ্ছে ঃ 'সহিংস কার্যকলাপ বন্ধ' অথবা 'শান্তি' । মন্ত্রী বললেন যে, তিনি চান প্রথমে 'অস্ত্রবিরতি' তারপর একটি 'শান্তি চুক্তি'। মিস্টার শার্তুক জবাব দেন যে, ইহুদী এজেন্সীর অবস্থান সুস্পষ্ট ইহুদী জাতি কখনও ফিলিস্তিনে শান্তি চুক্তিতে একমত হবে না যখন ফিলিস্তিনে বহির্শক্তি বিদ্যমান এবং সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন সাপ্লাই অনুপ্রবেশ হচ্ছে। শার্তুক আরও বলেন যে, তিনি বহির্শক্তি বলতে ম্যান্ডেটরি ব্রিটিশ বাহিনীকে বুঝাচ্ছেন না বরং বুঝতে চাচ্ছেন সিরিয়া, লেবানন, পূর্ব জর্ডান ও ইরাক থেকে ফিলিস্তিনে প্রবেশকারী কিছু সংখ্যক আরব স্বেচ্ছাসেবীকে। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী ইরাকী গ্রুপের দিকে ইঙ্গিত করেন যারা আল কুদ্সের সন্নিকটে পানি স্টেশনের কাছে শিবির গড়েছে।

মন্ত্রী তাঁকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র রক্তপাত বন্ধ করতে চায় এবং পক্ষগুলোর মধ্যে এক প্রকার সমন্বয়ে পৌঁছার চেষ্টা করছে।

মিস্টার শার্তুককে তিনি প্রশ্ন করতে চান যে, তিনি যে সব আরব স্বেচ্ছাসেবীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তাদের পরিচয় কিভাবে জানা সম্ভব ? শার্তুক জবাব দিলেন, "তিনি জানেন না কিভাবে তাদের চিহ্নিত করা যায়। কারণ তাদেরকে আরব অধিবাসীদের থেকে আলাদা করা মুশকিল।" মন্ত্রী এবার সরাসরি মিঃ শার্তুককে প্রশ্ন করেন, "যদি শান্তি চুক্তির শর্তের মধ্যে ফিলিস্তিন থেকে যে কোন আরব সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবীকে প্রত্যাহারে শর্ত থাকে তাহলে ইহুদী এজেন্সী সে শান্তি চুক্তি মেনে নিতে প্রস্তুত কি না ?"

মিস্টার শার্তুক জবাব দিলেন যে, "তা যথেষ্ট নয়, কারণ আরবরা এ শান্তি চুক্তিকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে এমন একটি বাহিনী গঠন করবে যেখানে যে কোন সময় লোক যুক্ত হতে থাকবে, যাদের সাথে আরও বেশি অস্ত্র থাকবে, এতে তাদের

তৎপরতা আরও বেড়ে যাবে। তারা 'হাজানাহ'-এর বাহিনী শান্তি চুক্তি অনুসরণ করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে এবং তারা আক্রান্ত হবে না এ নিশ্চয়তায় নিশ্চিন্তে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকবে।"

মিস্টার শার্তুক আরও বলেন যে, নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে শান্তি চুক্তি গ্রহণ করার জন্য তিনি ইহুদী এজেন্সীকে সুপারিশ করতে প্রস্তুত রয়েছেন ঃ

সব ধরনের সন্ত্রাসসহ সকল সামরিক অপারেশন বন্ধ করা। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশকারী সকল সশস্ত্র ব্যক্তিকে প্রত্যাহার। যে কোন অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সক্ষম একটি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সীমান্তে প্রতিষ্ঠা।

ইহুদী এজেন্সীর এই অধিকার সংরক্ষণ যে এই শান্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কোন কাজ দেখামাত্র সে তার মোকাবিলা করবে। মিস্টার শার্তুক মত প্রকাশ করেন যে, "আগামী ১৫ মে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে বিভক্তি সিদ্ধান্ত অনুসারে তার জন্য নির্ধারিত অংশে প্রশাসনিক দায়িত্ব বহন করার মতো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মসূচি ইহুদী এজেন্সী প্রস্তুত করেই রেখেছে।"

মন্ত্রী মহোদয় মিস্টার শার্তুককে "ফিলিস্তিনের ইহুদী উপনিবেশগুলোর আত্মরক্ষার প্রস্তুতি" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। শার্তুক জবাব দেন- "এই সব উপনিবেশ চিরদিনের জন্য আত্মরক্ষায় প্রস্তুত।" মন্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "যদি এমন হয় যে ইহুদীরা অনুভব করল যে, পাল্লা আরবদের স্বার্থের দিকেই ঝুঁকছে এবং ব্যাপক লড়াই শুরু হলো এবং আরব স্বেচ্ছাসেবীরা ঢুকে পড়ছে; তখন কি হবে" ? মিস্টার শার্তুক বলেন, "বিশ্বের আনাচে-কানাচে থেকে বিরাট সংখ্যক ইহুদী স্বেচ্ছাসেবীও আসবে এবং তারা জানে যে, এতে বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, এ অঞ্চলে আগ্রহী শক্তিগুলোর গভীরভাবে তা ভেবে দেখা দরকার।"

এরপর মিস্টার শার্তুক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগলেন যে, এ সরকার এখন এক দল আরব শেখ ও মিসরী পাশার ওপর নির্ভর করছে।

ডকুমেন্ট নং ১৫৪৮-৪/ ফিলিস্তিন ব ব ৫০১

যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি ওস্টান-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি প্রেরিত তারবার্তা ঃ

তাং ঃ ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৮ (জরুরী)

গতকাল অপরাহ্নে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ডঃ হায়েম ওয়াইজম্যান আমাকে ডেকেছিলেন। আমার সাথে ছিলেন রাষ্ট্রদূত জেসব। সেখানে আবা ইবানকেও পেলাম। আমাদেরকে ডঃ ওয়াইজম্যান বললেন, তিনি বুঝতে পারছেন না যে, ফিলিস্তিনে চলমান বিষয়গুলো সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র কেন দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি স্বগতোক্তি করলেন— "এই ইতস্তত করার কারণ কি ? এটা কি আরবদের ভয় ? সেটা কি

পেট্রোল ? সেটা কি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয় ?" ডঃ ওয়াইজম্যান নিজেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন— "আরবদের সম্পর্কে বলব যে, তাদেরকে ভয় করার কোন কারণ নেই, তারা তো দুস্থ-দুর্বল। আর আরবদের তেল তো তারা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া কারও কাছে বিক্রি করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ বলব, আমরা কি এ আশঙ্কা করছি যে, তারা তাদের পেট্রোলিয়াম রাশিয়ার কাছে বিক্রি করবে ? যদি রাশিয়ার কাছে বিক্রি করেই বা তাহলে ঐ সব রুবেল দিয়ে তারা কি করবে ?

ডঃ ওয়াইজম্যান এবার বলেন, "আপনারা কি আশঙ্কা করছেন যে, ইহুদী রাষ্ট্রটি অচিরেই রাশিয়া দ্বারা প্রভাবিত হবে"? আবার তিনিই এর জবাব দিলেন— "এই ধরনের প্রভাবের ভয় করার কোন কারণ নেই। বলশেভিক আমলারা সেই ১৯২০ সাল থেকেই ইহুদী বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে একটু পা রাখার জায়গা পেতে চেষ্টা করেছে। এতে তারা একেবারেই ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে।"

এরপর ডক্টর ওয়াইজম্যান আসলেন এ বিষয়ে যে ইহুদী রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র কি পরিমাণ সাহায্য করতে পারে। আমরা সাধারণভাবে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলেছি, তবে কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নেইনি।

—স্বাক্ষর
ওস্টান

ডকুম্যান্ট নম্বর ২২৪৮-৪/ ৮৬৭ ন ০১

আল-কুদসে নিয়োজিত আমেরিকান কনসাল জেনারেল মিস্টার ওয়াসন-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত তারবার্তা ঃ

আল-কুদ্স ঃ ২২ এপ্রিল, ১৯৪৮

সাধারণ জায়নিস্ট সম্মেলনে প্রকাশিত বিবৃতির ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

জায়নিস্ট আন্দোলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করে এবং সমগ্র ইহুদী জাতির সমর্থনের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, ফিলিস্তিনে ম্যান্ডেটরি ব্যবস্থা ও বিদেশী শাসনের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ইহুদী রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র এর দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ইহুদী জাতি তাদের দেশে যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করবে তাতে থাকবে সকল অধিবাসীর মধ্যে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্য। এতে তার ধর্ম, বর্ণ, সেক্স ও কোথা থেকে এসে অভিবাসী হয়েছে এর প্রতি নজর দেয়া হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি দেশ বানানো যাতে আমাদের জাতির যারাই শরণার্থী হয়ে এখানে জমায়েত হয়েছে তারা সবাই যেন আশ্রয় লাভ করতে পারে। এমন রাষ্ট্র যাকে সৌভাগ্য আর জ্ঞান এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ইসরাইলের নবীদের স্বপ্ন তাকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

আজ যে মুহূর্তে আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, আমরা ইহুদী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা পার্শ্ববর্তী এলাকার আরব রাষ্ট্রগুলোতে বসবাসকারী সকল আরবকে

আহবান জানাচ্ছি তারা যেন আমাদের ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করে এবং শান্তির লক্ষ্যে আমাদের সহযোগিতা করে।

—স্বাক্ষর

ওয়াসন

এতসব সত্ত্বেও অরবরা এ মুহূর্ত পর্যন্ত সমঝোতার জন্য প্রস্তুত ছিল। এটা ছিল বেশ কিছু কারণে। প্রথমত তারা আসলে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর তাদের লক্ষ্য স্থির করে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিল না। ঐতিহাসিক দলিল সেই সাক্ষ্যই দেয় ঃ

ডকুমেন্ট নং ২৫৪৮-৪/ ফিলিস্তিন ব ব ৫০১

জাতিসংঘে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ওস্টান-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত তারবার্তা ঃ

নিউইয়র্ক ঃ ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৮

প্রসকাউর (সভাপতি, আমেরিকান ইহুদী কমিটি) মিসরী প্রতিনিধি ফৌজি বেগ-এর সাথে দুটি বৈঠক করেন। (এখানে ডঃ মাহমুদ ফৌজিকে বোঝানো হয়েছে, ইনি সে সময় নিরাপত্তা পরিষদে মিসরীয় প্রতিনিধি ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মিসরের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হন) ফৌজি বেগ বৈঠক দু'টিতে যথেষ্ট আগ্রহের সাথে এই ধারণাটি গ্রহণ করেন যে, আরব ও ইহুদীদের মধ্যে যোগাযোগকে উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়; যাতে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি শাসনের সমাপ্তির সাথে সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য শন্তিচুক্তির ব্যবস্থা করা যায়। ফৌজি বেগ বলেন— তিনি কায়রো থেকে এমনকি সম্ভবত তার ইশারা অনুসারে আরব লীগের পক্ষ থেকেও দায়িত্ব পেয়েছেন যাতে ইহুদী প্রতিনিধি ও মাধ্যমদের সাথে বৈঠক করে প্রত্যেকের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন, তবে তার পক্ষ থেকে কোন চূড়ান্ত অঙ্গীকার দিবে না।

—স্বাক্ষর

ওস্টান

ডকুমেন্ট নং ২৬৪৮-৪/ ৮৬৭ ন ০১

কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ব্যাঙ্কনে টাক-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত তারবার্তা ঃ

কায়রো ঃ ২৬ এপ্রিল, ১৯৪৮ (গোপনীয়)

ব্রিটিশ ম্যান্ডেন্ট শেষ হলে ফিলিস্তিনে আরব বাহিনীগুলো প্রবেশের পরিকল্পনা নিয়ে কায়রোতে এখন আলোচনা হচ্ছে। ইরাককে এ ব্যাপারে বেশি উৎসাহী মনে হচ্ছে। মিসরী সূত্রগুলো মারফত আমার জানা মতে মিসরী সরকার এর বিরোধী মনে হয়। নাকরাশী পাশা (মাহমুদ ফাহ্মী আন্ নাকরাশী, তৎকালীন মিসরী প্রধানমন্ত্রী) নিম্ন বর্ণিত পয়েন্টে বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন ঃ

১. এ ধরনের এ্যাকশনে মিসরের অংশগ্রহণ জাতিসংঘে প্রস্তাবিত তার বিষয়টিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তিনি নিজেই তার দেশ থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর বহিষ্কারের অনুরোধ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করেছেন।
২. মিসরীয় বাহিনী এখন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়েই ব্যস্ত রয়েছে। একটা ভয় রয়েছে যে, আল ওয়াফদ পার্টি কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া সেনাবাহিনী সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে, এমন উদ্বেগও বিরাজমান সর্বশেষ আশঙ্কা রয়েছে যে, নতুন করে মিসরী পুলিশী ধর্মঘট হতে পারে। আবশ্য বর্ধিত বেতনের দাবিতে তারা ইতোপূর্বে দু'সপ্তাহের ধর্মঘট করেছিল।
৩. মিসরী বাহিনী যথেষ্ট অস্ত্র-সজ্জিত বা প্রস্তুত নয়। কাজেই ফিলিস্তিনে কোন অংশগ্রহণ আসলে কোন প্রভাবই ফেলতে পারবে না। তাছাড়া ব্যাপকভাবে ধারণা করা হতো যে, ইহুদীদের হাতে মিসরী বাহিনী পরাস্ত হওয়ার যে আশঙ্কা নাকরাশী পাশা পোষণ করেন তা তার দাবিকে চরম আঘাতের সম্মুখীন করে ছাড়বে (যখন নিরাপত্তা পরিষদে মিসর ইস্যুটি উত্থাপন করে ইংরেজদের বহিষ্কার দাবি করেন)। মনে করা হবে যে, মিসর কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য ছাড়া নিজেই নিজের ও সুয়েজ খালের প্রতিরক্ষায় সক্ষম।
৪. নাকরাশী পাশা ফিলিস্তিনীদের সহায়তায় আরব বাহিনীর অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়ার ব্যাপারে শঙ্কিত। কারণ এতে ফিলিস্তিন জাতির আরব পরিচয়ের বিশ্বাসে ছেদ ফেলবে।

ইরাকের প্রিন্স রিজেন্ট আব্দুল্লাহ এখানে ছিলেন এবং তাঁর সাহচর্যে ছিল ইরাক বাহিনীর কিছুসংখ্যক সেনা অফিসার। স্পষ্টত তার উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহ্ ফারুকের ওপর প্রভাব বিস্তার করা, যাতে ফিলিস্তিনের প্রতিরক্ষায় আরব বাহিনীগুলোর অংশগ্রহণের ব্যাপার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থন যোগায়। সম্প্রতি আম্মানে অনুষ্ঠিত আরব লীগের সামরিক কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়। বোঝা যায়, এ সময় ইরাকী রিজেন্ট বাদশাহ্ ফারুককে এ যুক্তি প্রদর্শন করে অনুপ্রাণিত করে যে, অন্যান্য আরব রাষ্ট্র থেকে মিসরের ভূমিকা কম হওয়া উচিত নয়, অন্যথায় সে আরব বিশ্বে তার মর্যাদা ও শৌর্যবীর্য হারিয়ে ফেলবে।

—স্বাক্ষর

ব্যাঙ্কনে টাক

ডকুমেন্ট নং ২৮৪৮-৪/ ৮৬৭ ন ০১

মিসরে নিয়োজিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ব্যাঙ্কনে'র পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত তারবার্তা ঃ

কায়রো ঃ ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৮

মনে হচ্ছে, আরব রাষ্ট্রগুলো তাদের বাহিনীসমূহের ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে পাঠাবার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অযযাম পাশা ও অন্যান্য ওয়াকিবহাল মহল থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, বিষয়টি এখনও দ্ব্যার্থহীনভাবে চূড়ান্ত হয়নি এবং কয়েকটি বিষয়ের আগে হবেও না।

১. ইবনে সউদের অনুমোদন এবং সিরিয়া ও লেবাননের সরকারদ্বয়ের অনুমোদন।
২. যদি বোঝা যায় যে, স্বেচ্ছাসেবীরা ফিলিস্তিনী অধিবাসীদের রক্ষায় সক্ষম তাহলে তাদেরকে সুযোগ দেয়া।
৩. যদি আরব বাহিনীর রিইনফোর্স এবং তাদের প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়। আয্যাম পাশা আজ বৈরুত, দামেশক, আম্মান ও রিয়াদের উদ্দেশ্যে সফরে বেরিয়েছে। তার লক্ষ্য হচ্ছে পরিস্থিতি বোঝা এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে সমন্বয় সাধন করা। অনুরূপভাবে বাদশাহ ফারুকের প্রতিনিধি হেলমী হুসেইন বেগও একটি বার্তা নিয়ে বাদশাহ্ ইবনে সউদের উদ্দেশ্যে রিয়াদ রওনা হয়ে গেছেন। (এডমিরাল হেলমী হুসেইন বেগ ছিলেন বাদশাহী যুগে বিভিন্ন স্থানে সফর করার দায়িত্বে নিয়োজিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো তাকে এত উচ্চ পর্যায়ের সূক্ষ্ম বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া।)

আরব দেশগুলোর মধ্যে কি ধরনের চুক্তি হয়েছে তা এখনও সুস্পষ্ট নয়। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা মতে— জর্ডান, ইরাক ও সিরীয় বাহিনীগুলো লেবাননী ইউনিটগুলোর সমর্থনপুষ্ট হয়ে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। তবে মিসরের অংশগ্রহণ থাকবে আর্থিক সাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৫ মে তারিখে ম্যান্ডেট শষ হওয়ার পর পরিস্থিতি পরিষ্কার হলে পরে তারা বুঝে-শুনে পা বাড়াবে।

ইরাক ও জর্ডানের প্রতিনিধি দল অনুরূপভাবে মিসরী প্রতিনিধিগণও জনমতের চাপকে হালকা করার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণকে সমর্থন করছে। ১৫ মে'র আগে সরকারী বাহিনী প্রবেশের ব্যাপারে মিসর সরকার এখনও বিরোধিতা করছে। এমন কোন প্রমাণ নেই যে, আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, ১৫মে তারিখে পরিস্থিতি পরিষ্কার হওয়ার আগে মিসরী বাহিনী কখনই ফিলিস্তিনে প্রবেশ করবে না মর্মে আমাকে দেয়া নিশ্চয়তা থেকে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। এখানকার ব্রিটিশ দূতাবাসকে জানানো হয়েছে যে, মিসর বাহিনী আরিশ-এর দিকে অগ্রসর হওয়া নিয়ে যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। এটা শুধু জনমতকে শান্ত রাখার কৌশল, যাতে তারা সন্তুষ্ট থাকে যে, মিসর সাধারণ আরব এ্যাকশন থেকে পিছিয়ে নেই। মিসর বাহিনীর ওয়াকিবহাল মহল আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, ২৭ এপ্রিল আরিশের পথে মিসরীয় সৈন্য

বোঝাই দুটি ট্রেন কায়রো ছেড়ে গেছে। এতে রয়েছে কিছু সংখ্যক কমান্ডার এবং আর্টিলারি গান সজ্জিত এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য। আর আছে পদাতিক দল। পুরো কন্টিনজেন্টের সদস্য সংখ্যা এক হাজার এক শ' সৈন্য মাত্র।

আযযাম পাশা কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান দূতাবাসের প্রথম সচিব মিস্টার ফিলিপ আয়ারল্যান্ডকে বলেছেন— "ফিলিস্তিনের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ ইঙ্গিত বহন করে যে, যেখানে ১৪ মে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণার সাথে সাথে সেখানকার ইহুদীরা একটি বাস্তবতা নিয়ে বিশ্বের মোকাবিলা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এরপরই তাঁর বাহিনী আরব রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত ভূমিতেও যতদূর সম্ভব ঢুকে পড়বে। এটাই ফিলিস্তিনে আরব বাহিনী প্রবেশের ব্যাপারে তাঁর মত পরিবর্তন করেছে। তিনি অনুভব করছেন যে, এ বিষয়টি শেষতক জাতিসংঘ থেকে সকল আরব রাষ্ট্রের প্রত্যাহার পর্যন্ত গড়াবে।

— স্বাক্ষর
ব্যাঙ্কনে টাক

ডকুমেন্ট নং ৩০৪৮-৪/ ৮৬৭ ন ০১

মিসরে নিয়োজিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ব্যাঙ্কনে টাক-এর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত তারবার্তা ঃ

কায়রো ঃ ৩ এপ্রিল, ১৯৪৮

আরব লীগের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি পেয়েছি। এতে আল্ কুদসের পবিত্র স্থানসমূহকে ফিলিস্তিনে জায়নিস্ট বাহিনীর সামরিক অপারেশন থেকে রক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

এই স্মারক পবিত্রস্থানগুলোকে যে কোন সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করার প্রস্তাব করছে। আল-কুদসের অভ্যন্তরে যে কোন সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ রাখার বিষয়টি সকল পক্ষ মেনে চলবে।

অরব লীগ এসব পবিত্রস্থানকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষ বাহিনীর জন্য অর্থায়নে তার প্রস্তুতির কথা জানান।

—স্বাক্ষর
ব্যাঙ্কনে

সব সরকার তখন খুবই বিচলিত অবস্থায় ছিল। তবে এই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সামনে তারা অত্যন্ত বড় ধরনের আত্মসংযম অনুশীলন করছিল।

॥ ৩॥

নাকরাশী পাশা

"আমরা কিভাবে এমন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে পারি যার প্রতিষ্ঠার ঘোষণাই এখন পর্যন্ত হয়নি।"

— আমেরিকান প্রেসিডেন্ট-এর উপদেষ্টার সাথে এক সংলাপে আমেরিকার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আরর জনগণ তাদের সরকারগুলোর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। আরব লীগের মহাসচিব আব্দুর রহমান আযযাম পাশার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে বলেই মনে হলো। তাঁর ধারণা ছিল যে, ইহুদীরা অচিরেই আরব ও গোটা বিশ্বকে এক কঠিন বাস্তাবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তাদের জন্য নির্ধারিত ভাগে তাদের রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করবে। এরপর সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

ইহুদী এজেন্সী সহসাই সরকারে পরিণত হয়ে গেল। এই এজেন্সীর 'আল-হাজানাহ' নামে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল। এ বাহিনীটি ছিল আরবদের ধারণা এমনটি কল্পনার চেয়েও অনেক বড়। এ বাহিনীটি ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত অঞ্চল তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম ছিল। এরপর সে ফিলিস্তিনে আরব রাষ্ট্রের ভূমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যও তৈরি ছিল।

পক্ষান্তরে ফিলিস্তিন জনগণ ছিল নিরস্ত্র; কেবল আরব সাহায্যের অপেক্ষায়। অবশ্য কিছু সংখ্যক আরব স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ফিলিস্তিন ভূমিতে পৌছেও গেল। উত্তরে সিরিয়া ও ইরাক দক্ষিণে মিসর থেকে এওয়াজ ও বিরে সাব্আ ও বেথেলহাম পর্যন্ত অংশে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তাদের বীরত্ব সত্ত্বেও বিশেষ করে এডমিরাল আহ্মদ আব্দুল আযীয-এর নেতৃত্বাধীন মিসরী বাহিনী— আল হাজানাহ বাহিনীর সামনে টিকে থাকার মতো অবস্থায় ছিল না। এই বাহিনী অচিরেই ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ভারাক্কি পদক্ষেপ ফিলিস্তিনের ময়দানের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আরব সামনে আর কিছুই করার এখতিয়ার ছিল না। স্পষ্টতই আরব রাষ্ট্রগুলো কেবল তাদের এ্যাকশন সীমিত রাখছিল কেবল ফিলিস্তিনের আরব অংশগুলোতেই। যাতে এ অংশকে ইহুদী বাহিনীর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখা যায় বা তাকে রক্ষা করা যায়। এর বাস্তব অর্থ হচ্ছে— যদিও তা আইনগত নয়— আরব রাষ্ট্রগুলো ভাগাভাগির সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং কেবল তার সীমাতেই তাদের এ্যাকশন চালাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

আরব রাষ্ট্রগুলো তাদের বাহিনীগুলোর জন্য একটি হাইকমান্ড গঠন করেছিল যাতে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে তাদের এ্যাকশনের স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলকে সমন্বয় করতে পারে। জর্ডানের বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ নিজেই এই হাই কমান্ডের দায়িত্ব নেবেন বলে মত রাখা হয়। এর কতকগুলো বাস্তব কারণ ছিল ঃ

১. জর্ডান হচ্ছে ফিলিস্তিনের বক্ষস্থল থেকে সবচেয়ে কাছের আরব দেশ। কাজেই তার বাহিনী সহজেই ফিলিস্তিনের গভীরে জীবনময় অঞ্চলগুলোতে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে।
২. বাদশাহ্ আব্দুল্লাহর অধীনেই ছিল যুদ্ধের জন্য এক রকম সুসজ্জিত অন্যতম আরব বাহিনী। কারণ ইংরেজরা যে আরব বাহিনী গঠন করেছিল এবং স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলো এর কমান্ডে রেখেছিল এবং এর কমান্ডার নিয়োজিত করেছিলেন প্রখ্যাত কমান্ডো জালূব পাশাকে, এই বাহিনীই ছিল অন্যান্য আরব বাহিনী থেকে উত্তম অবস্থায়।
৩. এ পরিস্থিতিকে আরেকটি বাস্তবতা সহায়তা করেছিল যে, মিসর এমনকি একদম শেষ দিকেও যুদ্ধে প্রবেশে তার মনস্থির করতে পারছিল না। কাজেই যদি ধরেও নেই যে, তার বাহিনী প্রস্তুত ছিল তবুও তার ও যুদ্ধ ময়দানের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান।
৪. সম্ভবত এসব কারণের সাথে আরেকটি কারণ যুক্ত হয়েছিল। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র বাদশাহ্ আব্দুল্লাহর নিয়তে সন্দেহ পোষণ করত। তারা ভাবত যে, তার লক্ষ্য হয়তবা ফিলিস্তিনকে তার রাজ্যভুক্ত করা। ধারণা করা হয়েছিল যে, আরব বাহিনীর অধিনায়কত্ব যদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ গ্রহণ করেন তাহলে সুস্পষ্ট আরব আস্থার মাধ্যমে তিনি তার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষকে চরিতার্থ করতে লেগে পড়বেন। এ জন্য তাকেই শেষ পর্যন্ত সকল আরব বাহিনীর কমান্ডার মনোনীত করা হলো।

বাদশাহর অধীন হাই কমান্ডের আওতায় আরব বাহিনীর জেনারেল কমান্ড ছিল। এর ভার ছিল ইরাকী মেজর জেনারেল ইসমাঈল সাফ্ওয়াত পাশার ওপর ন্যস্ত। এই কামান্ড কাগজে বেশ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এটা যে বাস্তবায়ন অসম্ভব তা তারা নিজেরাও আগে থেকে জানত।

কারণ, প্রকৃতপক্ষে অবশিষ্ট আরব বাহিনীর ওপর কমান্ডার জেনারেল সাফ্ওয়াত পাশার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারণ এই সকল বাহিনী সব সময় নিজ নিজ সরকারের নিয়ন্ত্রণেই ছিল যাদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব হিসাব-নিকাশ। এগুলো ঐকমত্যের চেয়ে ভিন্নমতই বেশি পোষণ করত। ইসমাঈল পাশাও এমন এক সেনাকর্মকর্তা ছিলেন যিনি যুদ্ধের ময়দানে থেকে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করেননি। অথচ তিনি কেবল

জ্যেষ্ঠতার জোরে এত উচ্চপদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। সে সময় আরব বাহিনীগুলোর অবস্থাই এমন ছিল। তাছাড়া তাকে এমন নিরাপদ অফিসার হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল, যার চিন্তা-চেতনা তার মানচিত্রের সীমা অতিক্রম করবে না। আসলে ইসমাঈল সাফ্ওয়াত পাশা তার নেতৃত্বকে অনুশীলন করার আগে তা হারিয়ে ফেলেন। যুদ্ধ লাগার সপ্তাহখানেক আগেই একটি ঘটনা ঘটল। তিনি কায়রোর যে পুরনো শেবরাদ হোটেলে থাকতেন সেখান থেকে বের হয়েছিলেন যেন আরব লীগের সামরিক কমিটির একটি বৈঠকে যোগ দেয়ার আগে একটু হালকা আমেজে শহরতলীতে বেড়িয়ে আসবেন। এ সময় উজবেকিয়া প্রাচীরের কাছে জেনারেল সাফওয়াত লক্ষ্য করলেন যে, পথচারীদের ছোট্ট একটি দল একটি লোককে ঘিরে রয়েছে। সে তাদের সাথে 'তিন তাসের' খেলা খেলছে। আরব বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল তাদের সাথে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন কি হচ্ছে। মনে হয় খেলাটি তাঁকে বেশ আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি তাতে অংশ নিলেন। দশ মিনিটেই জেনারেল সাফ্ওয়াত পাশা শুধু তাঁর সাথে আনা সব নগদ অর্থ খোয়ালেন। প্রায় দু'শ ছিয়াশি পাউন্ড। সাফওয়াত পাশা শুধু তাঁর অর্থ হারিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। বরং 'তিন তাসের' খেলুড়ের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন যা শেষ পর্যন্ত উজবেকিয়া পুলিশ বিভাগ পর্যন্ত গড়ায়। এতে আরব বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল সামরিক কমিটির বৈঠকে হাজির হতে ব্যর্থ হলেন। যখন তিনি বলম্বে সভাস্থলে পৌঁছলেন, ততক্ষণে সেখানে তার জুয়ার শিকার হওয়ার ঘটনার বিস্তারিত পৌঁছে গেছে। এটা ছিল অপমানের অগ্রদূত।

মোটামুটি পরিস্থিতির বাস্তবতা ছিল এই যে, বাদশাহ আব্দুল্লাহ হাই কমান্ডের দায়িত্ব পালন করেছেন তার পাশে কোন ময়দানের কমান্ডার জেনারেল ছাড়াই যিনি যৌথ আরব বাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনকে সমন্বয় করতে পারতেন। বাস্তবে এই দায়িত্ব জেনারেল গ্লোব পাশা আর তাঁর চীফ অব জেনারেল ওয়ার ষ্টাফ ব্রিগেডিয়ার ব্রড্হাস্ট-এর হাতেই সম্পন্ন হয়। এ সময়কার অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আরব সামরিক এ্যাকশনের চাবিকাঠি কিছু সংখ্যক ইংরেজ অফিসারের হাতে থাকায় বাদশাহ্ খুবই বিরক্ত বোধ করেন। ১৯৯৮ সালের ১২ মে, বুধবার নাকরাশী পাশা মিসরী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এক গোপন বৈঠকে সাংসদদের ফিলিস্তিনের লড়াইয়ে অংশগ্রহণে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানান। মিসরীয় প্রধানমন্ত্রী তার মূল অবস্থান থেকে একেবারেই ঘুরে গেলেন। কারণ প্রথম দিকে তিনি তাঁর নিকট যৌক্তিক কতকগুলো কারণে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট লেখা পত্রে ইতোপূর্বে সেসব কারণের উল্লেখ করা হয়েছে।

কয়েক দিন পর ১২ মে তারিখে নাক্রাশি পাশা বিরোধী ভূমিকা থেকে পাল্টে গিয়ে সমর্থকের ভূমিকায় ফিলিস্তিনের যুদ্ধে মিসর বাহিনীর অংশগ্রহণে ব্রতী হলেন। এ

ব্যক্তির প্রতি ইনসাফ করে বলতে হবে যে, তিনি এটা করেছিলেন ইহুদী রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছাড়াই। এর পাশাপাশি বাদশাহ্ ফারুক তাঁর প্রতি প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছিলেন যেন মিসর অন্যান্য আরব দেশ থেকে পিছে পড়ে না থাকে এবং আরব বিশ্বের বিশেষ করে প্রাচ্য অঞ্চলে তাঁর মর্যাদা না হারায়।

১৯৪৮-এর ১২ মে সে একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের সভাপতিত্বে হোয়াইট হাউসেও একটি বৈঠক হয়। এ বৈঠকে প্রেসিডেন্টের সাথে উপস্থিত থাকেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আচেসন, সহকারী মন্ত্রী লভেট এবং হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ক্লার্ক ক্লিফোর্ড, ডেভিড নেইলস, ম্যাথিও কোনেলী। এ ছাড়াও ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের দু'জন বিশেষজ্ঞ ফ্রেজার ওয়েলকিন্স ও রবার্ট ম্যাকলেনটুক।

ডকুমেন্ট নং ১২৪৮-৫/ বব ফিলিস্তিন ৫০১ অনুসারে বৈঠকের ধারাবিবরণী ছিল এ রকম ঃ প্রেসিডেন্ট আলোচনার সূচনায় বললেন, আমি এই বৈঠক এজন্য ডেকেছি যে, ১৫ মে ফিলিস্তিনে সম্ভাব্য ঘটনাবলী আমাকে অস্থির করে তুলেছে। তখন মিস্টার লভেট ঘটনাবলীর বিস্তারিত তুলে ধরতে লাগলেন এবং এক পর্যয়ে ৮ মে'র ঘটনাবলীর ওপর জোর দিতে লাগলেন, ঐ দিন ইহুদী এজেন্সীর প্রতিনিধি মিস্টার মোশে শার্তুক এসেছিলেন। সেদিন (৮ মার্চ) শার্তুকের সাথে ডঃ এবেস্টেন এসে মন্ত্রীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পেশ করলেন। মিস্টার শার্তুক বলেন —"উপনিবেশ বিষয়ক ব্রিটিশমন্ত্রী স্যার আর্থার ক্রেচ গোঞ্জ তাঁকে আফিসিয়ালি জানিয়েছেন যে, জর্ডানের বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ ১৫ মে তারিখে তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিনে আরবদের জন্য নির্ধারিত অংশগুলোতে প্রবেশ করবেন। ব্রিটিশ যোগাযোগ মন্ত্রীর মতে, বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্র এই অঙ্গীকারে আশ্বস্ত হওয়া যায় এই বাস্তবতার আলোকে যে, জর্ডান বাহিনীকে কমান্ড দিচ্ছে ব্রিটিশ সেনা অফিসারগণ এবং অর্থায়নও করছে ব্রিটিশ সরকার। শার্তুক আরও বলেন— ফিলিস্তিনের ইহুদী এজেন্সীর পক্ষ থেকে একটি পত্র তাঁর হস্তগত হয়েছে, এতে বলা হয়— জর্ডানী আরব বাহিনীর ওয়ার স্টাফ-এর সদস্য কর্নেল গোল্ডে ইহুদী এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ করেন একটি বার্তা পৌঁছে দিয়ে। তা হচ্ছে আব্দুল্লাহ এবং ইহুদী এজেন্সীর মধ্যে খেপ ভাগাভাগি করা যেতে পারে। বাদশাহ্ কেবল ফিলিস্তিনের আরব অংশে প্রবেশ করবে এবং এ দেশের অবশিষ্ট অংশ ইহুদী মালিকানায় ছেড়ে দেবে।

আলোচনার এ পর্যায়ে মিস্টার ক্লার্ক ক্লিফোর্ড অনুপ্রবেশ করেন। (এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই সেই ক্লার্ক ক্লিফোর্ড যিনি পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক আরব ব্যাঙ্কের জালিয়াতির অন্যতম হোতা ছিলেন! কিন্তু আরব যেন তাকে ছাড়া আর কাউকে পেল না যে, তাদের আমেরিকাস্থ আর্থিক প্রকল্পগুলোকে পরিচালনা করবে।)

ক্লার্ক ক্লিফোর্ড তিনটি পয়েন্ট তুলে ধরলেন। প্রথম পয়েন্ট ঃ কোন বিদেশী বাহিনী ছাড়াই কার্যত ফিলিস্তিনের বিভক্তি ঘটে গেছে।
দ্বিতীয় পয়েন্ট ঃ মিস্টার ক্লিফোর্ড প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানান যে, ১৫ মে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ফিলিস্তিনের ইহুদী রাষ্ট্রকে সরকারী স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হোক। তাঁর মতে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের আগেই স্বীকৃতি ঘোষণা করতে হবে। তৃতীয় পয়েন্ট ঃ প্রেসিডেন্ট আগামীকালই তাঁর সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেবেন যে, ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে তিনি কৃত সংকল্প।

মিস্টার ক্লিফোর্ড প্রেসিডেন্টের ঘোষণার একটি ভাষ্যও পেশ করেন। এর ভাষা নিম্নরূপ ঃ "আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি যেন তিনি জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে এই মর্মে অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যদের আগাম স্বীকৃতি অর্জন করে।"এতে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার লেভেট আপত্তি তুলে বলেন— "তা হবে ঘোড়ার আগে গাড়ি বাঁধা, যার কোনই প্রয়োজন নেই । কারণ জাতিসংঘ কিভাবে এমন একটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে যার প্রতিষ্ঠার কথা এখনো ঘোষিতই হয়নি।"

প্রেসিডেন্ট ঘোষণার খসড়া অনুমোদন করলেন ঃ "আমি ২৯ নভেম্বর তারিখে গৃহীত জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে সহানুভূতির সাথে দেখছি। যখন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষিত হবে তখন যুক্তরাষ্ট্র এ রাষ্ট্রের প্রতি তার স্বীকৃতি দেবে বলে মনে করি।"

এরপর পরবর্তী আমেরিকান ডকুমেন্ট নং ১৪৪৮-৫/৮৬৭ ন ০১ আসছে। এতে রয়েছে ঃ

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ১৯৪৮-এর ১৪ মে অপরাহ্ন ৫.৪৫ টায় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান-এর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ক্লার্ক ক্লিফোর্ড-এর একটি বার্তা পেল। এতে রয়েছে ঃ

"প্রেসিডেন্ট জানতে পেরেছেন যে, আজ অপরাহ্ন ৬ টায় 'ইসরাইল' নামে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হবে। (অর্থাৎ ক্লিফোর্ডের বার্তার ১৫ মিনিট পরেই।) প্রেসিডেন্ট আমাকে অনুরোধ করেন, যেন এর প্রতিষ্ঠার ঘোষণার সাথে সাথেই এ রাষ্ট্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির বিষয়টি জাতিসংঘের ডেপুটেশনকে জানিয়ে দেয়া হয়।" পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত প্রেসিডেন্টের বার্তায় ক্লিফোর্ড আরও জানান ঃ (ইতিমধ্যে রাষ্ট্রদূত ডেন রাসেক এই বার্তা পেয়ে গেছেন। ডেন রাসেক পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট কেনেড়ীর সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন।)

"এটাই প্রেসিডেন্টের কামনা, আমি আপনাকে জানিয়ে দিলাম।"

প্রায় একই ঘটিকায় মিসরের সংসদে এবং হোয়াইট হাউজে ঘটমান বিষয়গুলোর তুলনায় আম্মানে আরও বেশি বিস্ময়কর দৃশ্যপটের অবতারণা হয়। এ সময় জর্ডানের রাজধানী আম্মানে এসে পৌঁছেন গোল্ডামেয়র (ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী) — ইহুদী এজেন্সীর প্রতিনিধি।

তিনি জর্ডানের বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্র সাথে পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেদুইন পুরুষের পোশাকে গোপনে এখানে পৌঁছেন। এটা ছিল আরব বাহিনী ফিলিস্তিন সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ার একটু আগে শেষ প্রহরের বৈঠক, ইহুদী এজেন্সীর আগে থেকেই দুটি দেশকে হিসাবে রাখতো ঃ জর্ডান, কারণ আরব বাহিনী ফিলিস্তিনের খুবই কাছাকাছি। বরং এর একটি ব্রিগেডতো আল-কুদসের দিকে লেনবে ব্রিজের স্থানগুলোতে কার্যত এ্যাকশন শুরু করে দিয়েছিল। এর আওতায় 'আরিহা' অঞ্চলও ছিল। দ্বিতীয় যে দেশকে হিসাব করত তা হচ্ছে মিসর। কারণ অবশিষ্ট আরব বিশ্বে এর রাজনৈতিক ওজন এবং সাহিত্যিক ও নৈতিক প্রভাব ছিল সমীহ করার মতো। তাছাড়া মিসরীয় ভূখণ্ডে ইসরাইলের ধর্মীয় বা কিংবদন্তি কোন দাবিও ছিল না। তাছাড়া মিসরের সাইজও ছিল ফিলিস্তিনের চারপাশের প্রাচ্য দেশ থেকে আলাদা একটি শক্তি। এই 'সাইজ'ই একটি শক্তি, তাই ইসরাইলের সাথে সংঘাতে যেতে চায় না।

জর্ডান ও বাদশাহ আব্দুল্লাহ প্রসঙ্গে বলা যায়, ইহুদী এজেন্সী তার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পর্ক রেখে গেছে। তিনিও তাদের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ১২ মে আম্মানে গোল্ডামায়ার-এর গোপন সফরটি ছিল বাদশাহ আব্দুল্লাহ ও মোশে শার্তুকের মধ্যকার গুরুত্বহীন বৈঠকের সমাপ্তিকা।

বাদশাহ্ আর শার্তুকের মধ্যকার বৈঠকটি ছিল ১২ এপ্রিল, অর্থাৎ গোল্ডামেয়রের সফরটির ঠিক একমাস পূর্বে। ঐদিন (১২ এপ্রিল) বাদশাহ্ তার একান্তজনদের বলেছিলেন যে, তিনি বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ উবাইদাহ্ বিন জাররাহ্'র মাকাম বা পদচিহ্নবাহী দাঁড়াবার স্থানটি জিয়ারত করতে চান। মেজর জেনারেল আব্দুল্লাহ আত-তেল্ল, আল কুদস অঞ্চলের জর্দানে কমান্ডার যার এলাকায় এই বৈঠক হয়েছিল— তিনি বর্ণনা করেন যে বাদশাহ আল্‌গোর এলাকায় তার এক বন্ধুর খামারবাড়িতে পৌঁছলেন, এরপর গাছগাছালির ভেতর দিয়ে 'রোটেনবার্গ' বিদ্যুৎ প্রকল্পের কলোনীতে হেঁটে গেলেন। সেখানেই তার প্রতীক্ষায় ছিলেন মোশে শার্তুক — যিনি মধ্যাহ্ন ভোজের দস্তরখানে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মনে হয় আলোচনা কোন সন্তোষজনক ফলাফলে পৌঁছেনি। এরপর যোগাযোগ ঝুলে থাকল — পরবর্তীতে গোপনে আম্মানে এক বৈঠকের শর্তে। কিন্তু শার্তুক নিউইয়র্কে ডেপুটেশনে গেলেন এবং ইহুদী এজেন্সী তার বদলে স্বেচ্ছা এ দায়িত্ব পালনের জন্য গোল্ডামায়ারকে অনুমোদন করল।

১২ মে, বাদশাহী এক লোকের ড্রাইভিংয়ে আল গোর-এর একই খামারবাড়িতে একটি গাড়ি এসে পৌঁছল। এখানেই একমাস আগে বাদশাহ্র সাথে শার্তুকের বৈঠক হয়েছিল। ন'টায় গোল্ডামায়ার রুমাল, একাল (মাথার দাড়ি) ও আবা (জুব্বা) পরে ঐ

গাড়ির পেছনের সিটে বসেন এবং সেখান থেকে আম্মানের এক প্রান্তে বাদশাহ্‌র এক বাড়ি অভিমুখে রওনা দেন। রাত এগারোটা। জেনারেল আব্দুল্লাহ আত-তেল এর বর্ণনা অনুসারে— গোল্ডামায়ারের বিচলিত ছিলেন এবং বাদশাহ্‌র হুকুমে প্রস্তুত নৈশভোজ গ্রহণ করেননি। বাদশাহ তাঁর অস্থিরতা দেখে তাঁর অনুভূতিকে শান্ত করার জন্য কোমল ব্যবহার করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ইহুদী এজেন্সীর সর্বশেষ প্রস্তাব পেশ করতে লাগলেন। সেটা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. মহামান্য বাদশাহ্ ইহুদীদের সাথে সন্ধি স্থাপন করবেন এবং এ ফিলিস্তিনে মোটেই কোন বাহিনী প্রেরণ করবেন না।
২. বিভক্তি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফিলিস্তিনের আরব অংশে শাসন করার জন্য বাদশাহ্ তাঁর একজন গভর্নর পাঠাবেন।
৩. এর বিনিময়ে ইহুদী এজেন্সী ফিলিস্তিনের আরব অংশকে হাশেমী মুকুটের অধীন ছেড়ে দিতে রাজি আছে।

জেনারেল আব্দুল্লাহ তেল্ বর্ণনা করেন, বাদশাহ্ প্রথম শর্ত মানতে পারবেন না বলে জানান, কারণ তা আরব ঐকমত্যের বিরোধী দৃশ্যপটের বর্হিপ্রকাশ ঘটাবে। তার পরিবর্তে বাদশাহ্ অঙ্গীকার করলেন যে, তাঁর বাহিনী ও ইহুদী বাহিনীর মধ্যে সংঘাত ঘটবে না। উভয় বাহিনী বিভক্তি রেখার ভেতরেই অবস্থান গ্রহণ করবে। গোল্ডামেয়র বাদশাহ্‌র মত গ্রহণ করলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর অঙ্গীকার নিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো একজন সাধারণ আরব, কোন তথ্যাদি ছাড়াই তার নিজস্ব উপলব্ধি থেকে অনুভব করল যে, বাদশাহ্ আব্দুল্লাহর প্রকাশ্য ভূমিকা তাঁর গোপন ভূমিকা থেকে ভিন্ন। 'আরিহায়' পরের দিন— গোল্ডামায়ারের সাথে বৈঠকের পরবর্তী ভোরে যখন ঐ অঞ্চলে শিবির স্থাপনকারী একটি সেনাদলের প্যারেড প্রত্যক্ষ করছিলেন, এরা আল কুদ্স রক্ষায় যাবে, তখন অত্যাশ্চর্য এক দৃশ্যপটের অবতারণা হলো।

সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! বিস্তৃত আরিহা সমবৃমি। 'আল খান আল্ আহ্মার' লালখান টিলাগুলো দূর থেকে মনে হতে লাগল যেন রূপকথার কাহিনী ভারাক্রান্ত এক রহস্যের অচলায়তন। জর্ডানী সেনাদল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধের দামামা বাজছে! সুউচ্চ মঞ্চে বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ দণ্ডায়মান, তাঁর পেছনে জেনারেল গ্লোব পাশা আর তার ইংরেজ সমর অধিনায়কগণ। বাদশাহ্ এক অন্ধ বৃদ্ধ ইমামকে অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাঁকে এবার বললেন ঃ "মৌলবী সাহেব! সেনাবাহিনীর উদ্দেশে ওয়াজ করুন!" তখন বৃদ্ধ অন্ধ মৌলবী সাহেব (শেখ) মঞ্চে বাদশাহ্‌র পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, তিনি কিছু দেখতে পান না, কিন্তু উপলব্ধি করত পারেন সব। কিছু সময় চুপ থাকলেন, সকলের দৃষ্টি ও শ্রবণেন্দ্রীয় তাঁর সাথে আটকে থাকল। এরপর তিনি জোরে চীৎকার দিয়ে বললেন ঃ "হে সেনাদল! আহা, তোমরা যদি আমাদের হতে!"

॥ ৪ ॥

বেন গোরিয়ন-২

"আরব লীগ আসলে কোন লীগই নয়, এর সিদ্ধান্তগুলো কোন সিদ্ধান্তই নয়"

— আরব লীগের বৈঠকসমূহ সম্পর্কে এলইয়াহু সাসুনের কাছে বাদশাহ আব্দুল্লাহ মন্তব্য

মিসরের প্রতি জায়নিস্ট আন্দোলনের অবস্থান ছিল যেন বৈদ্যুতিক তারে বিপরীত চার্জ দেয়া অবস্থা। এটা ছিল পুরনো ও নতুন কিছু কারণে প্রেক্ষিতে ঃ

ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তিগত কারণই ছিল মুখ্যত। কারণ মিসরই হলো সেই শত্রু যে কিনা ইহুদীদেরকে নীলনদের উপকূল থেকে সাহারা মরুভূমির 'তীহ্' প্রান্তরে হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও এ ব্যাপারে অনেক কিছুই বলার আছে, তবে বিভিন্ন ঘটনাকে অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিচারকে প্রধান্য না দিয়ে বরং বোঝা দরকার যে, শেষ পর্যন্ত যে কোন ঘটনার মূল বিপদ হলো সে ঘটনার নায়কদের ভূমিকাই; তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিই। যদি ইহুদী ঐতিহ্যের সকল ব্যর্থতার জন্য মিসরই কেবল শত্রু হয়ে থাকে তাহলে কার্যত সে শত্রু। কারণ যতকিছুই করুক, বর্তমানে এমন শক্তি হয় না যে, উত্তরাধিকারকে একেবারে মিটিয়ে ফেলবে বা ধোঁয়াশায় পরিবর্তিত করে ফেলবে। হয়ত তা কেবল কল্পনার আলৌকিক কাণ্ডকারখানা হতে পারে। কারণ জায়নিস্টদের সকল দাবি কল্পনায় রূপান্তরিত হতে পারে। যার সাথে বর্তমান বা ভবিষ্যতের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এর সাথে যোগ করা যায় আরেকটি কারণ, জায়নিস্ট পরিকল্পনাটি মূলত ভিত্তিশীল ছিল শাম থেকে মিসরকে বিচ্ছিন্ন রাখার কৌশলের ওপর। এ পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত মিসরের ঐতিহাসিক শক্তি ও দৃঢ়তার মুখোমুখি হয়। মোকাবিলা করে মিসরের জাগরণ, অথবা তার হোঁচট খাওয়া বন্ধুর পথ অথবা সঙ্কোচ ও পশ্চাৎপদতার সব কার্যকারণগুলোর সমন্বয়ে গড়া আধুনিক মিসরের সামর্থ্যকে। আর তা যদি সত্য হয় সেটা সত্যিই— তবে ফিলিস্তিনই হলো সেই সেতু যার মাধ্যমে মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে বন্ধন রচিত হতে পারে। আর যদি আবশ্যক হয়— যাকে নোপোলিয়ন ও বিল মারস্টন এবং তাদের পরবর্তীরা আবশ্যকীয় মনে করেছিলেন যে, এই সেতু সময়ের ব্যবধানে প্রাচীরে রূপান্তরিত হোক সে ক্ষেত্রেও এ বাধা প্রাচীরের মধ্যে একটি বিপদ লুকায়িত থাকবে— সেটা হচ্ছে মিসর। কারণ তার পূর্বাংশে রয়েছে সংঘবদ্ধ ও মজবুত এক মানব গোষ্ঠী যারা বর্তমান সংখ্যা আর সম্ভাব্য গুণগত মানে ফিলিস্তিনের ইহুদী প্রকল্পকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে— হয় মোকাবিলা করে অথবা তাকে ঠেকিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে দক্ষিণের মিসরীয় মানবগোষ্ঠী তা করতে সক্ষম নয়। কারণ ফিলিস্তিনের পাশে উত্তর ও পূর্ব অংশ ছিল সংখ্যা ও সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা এবং কখনও কখনও বর্ণগত ভিন্নতার কারণে অসংলগ্ন। সেখানে সব সময়ই গণ্ডগোল লেগেই থাকে। এদিকে অনায়াশেই ইহুদী প্রকল্প কাজে লাগাতে পারে এবং এর খোলা ফুটো গলিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এভাবে ফিলিস্তিনের জায়নিস্ট প্রকল্পের হিসাব নিকাশে এ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক বৃহৎ শক্তিগুলোর নীতির প্রতি প্রথম মনোযোগ ও গুরুত্ব পেত। এরপরেই ছিল মিসরের গুরুত্ব।

ফিলিস্তিনে জায়নিস্ট প্রকল্পের দায়িত্বশীল জায়নিস্ট সংস্থাগুলো আগেভাগেই আরব-ইসরাইল সংঘাতে মিসরকে স্বেচ্ছায় টেনে আনতে প্রস্তুত ছিল না। এছাড়া অকারণে তাকে উত্যক্ত করতেও চায়নি। মিসরের প্রতি এই সতর্কতা অবলম্বনের পেছনে কিছু বিষয় কাজ করেছে ঃ

মিসরে ইহুদীদের কোন ধর্মীয় বা কিংবদন্তিগত দাবি নেই। মিসরের সাইজ ও সামর্থ্যের দিক বিবেচনা করে তাকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয় মনে করা হয়েছিল। তাছাড়া মিসরে একটি বড় ইহুদী সমাজ ছিল। মিসরের এই ইহুদী সমাজ এমন এক স্থানে তৎপর ছিল যারা জায়নিস্ট প্রকল্পভূমির খুবই নিকটে। এছাড়া মিসরে গুরুত্বপূর্ণ একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছিল যারা উত্তর ভূমধ্যসাগরের ওধারে দৃষ্টি ফেলত কিন্তু পূর্বে সিনাইয়ের ওধারে দৃকপাত করত না।

এসব কারণে একটি বিরল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল যাতে পুরনো শত্রুকে কাজে লাগিয়ে নবতর প্রকল্প বাস্তবায়ন। তবে খুব বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির সাথে তার সঙ্গে আচরণ করতে হবে।

ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ইহুদী এজেন্সী একসাথে তিনটি অপারেশনে মশগুল ছিল ঃ এলাকার বাইরের কাজ ছিল বিশ্বব্যাপী— বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ভূখণ্ডের ভেতরের কাজ ছিল স্বয়ং রাষ্ট্র প্রকল্প। এ পর্যয়ে মূল ভূমিকা ছিল এ ভূমিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শক্তির মাধ্যমে নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি। এর মধ্যে রয়েছে বাদশাহ্ আবদুল্লাহকে ব্যস্ত রাখা এবং তাঁর জন্য বেমানান ছোট্ট রাজ্যের সাথে ফিলিস্তিনে আরব রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত ভূমিকে তাঁর রাজ্যে যুক্ত করার তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগোনো।

এরপর ছিল তৃতীয় কাজ ঃ

মিসরের রাজনৈতিক তার পর সামরিক অবস্থার বিবর্তনকে অনুসরণ করে যাওয়া। অনেকেই জানত না যে, ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রকল্পের বাস্তব প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড বেন গোরিয়ন নিয়মিত দিনলিপি লিখে যাচ্ছেন। তিনি সারাদিন যেসব ঘটনার

সাথে জড়িত থাকতেন, রাতে কলমের আঁচড় না লাগিয়ে ঘুমাতে যেতেন না, তাতে যত বেশি দেরি পর্যন্ত জাগতেই হতো না কেন। (এটি ১৯৮১ সালে হিব্রু ভাষায় বই আকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৯৩ সালে আরবি সংস্করণ বের হয়।)

পরবর্তীতে বেন গোরিয়নের ডায়েরির কথা প্রকাশ পায়। বেন গোরিয়ন ডায়েরি লেখার বিষয়টি অস্বীকার করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু হাঙ্গেরিয়ান ইহুদী লেখক আর্থার কোস্টলার ('মধ্যাহ্নের মর্যাদায় অন্ধকার' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক) বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজে দেখেছেন, বেন গোরিয়ন তাঁর সাথে কথা বলার সময় তাঁর খাতায় লিখতেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো বেন গোরিয়ন তাঁর ডায়েরি লেখার কথা অস্বীকার করতে চাইলেন। এরপর বিষয়টি পরিষ্কার হলো, বেন গোরিয়ন স্বীকার করলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তা প্রকাশে তাঁর বাধা নেই জানালেন। এভাবে বেন গোরিয়ন যে চলমান ঘটনাবলী লিখে গেছেন তা আজ আমাদের সামনে বিস্ময়কর চিত্র তুলে ধরছে— কীভাবে ইহুদী নেতৃত্ব একই সঙ্গে তিনটি সেক্টরে অপারেশন চালিয়ে গিয়েছিল ঃ আমেরিকা, ফিলিস্তিন... ও মিসর এ তিনটি সেক্টরে।

সোমবার, ১ ডিসেম্বর, ১৯৪৭-আল কুদ্‌স

আজ অপরাহ্ন তিনটায় আমি হাই কমিশনার জেনারেল এলেন কানিংহাম-এর সাথে একটি বৈঠক করি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি বিভক্তির সিদ্ধান্তে সুখী? আমি তাকে বললাম, আমি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আবার তাঁকে ও তাঁর সরকারকে আহ্বান জানিয়েছি যেন সৌহার্দ্যের মধ্য দিয়ে আলাদা হয়ে যাই। আমি আরবদের বিরুদ্ধে বা তাদের ক্ষতি করে কিছুই চাইনি। আমরা কখনও এমন কাজ করব না। আমাদের উদ্দেশ্য ভাল। আপনারা যদি চান এ দেশ থেকে নিঃসঙ্কোচে চলে যেতে পারেন অথবা আমাদের আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমেও যেতে পারেন, এটাই আমরা চাই। আমি তাঁকে বললাম ঃ আমার কাছে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে ঃ

"কোন অস্থিরতা (সহিংসতা) ঘটলে নষ্ট হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় আপনারা ভূমি মালিকানার দলিলগুলোকে ফটোকপি করছেন, আমরা সেগুলোর একটি কপি চাই।" তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন,"অধিবাসীদের স্বার্থে সকল দলিল যথাস্থানেই থাকবে। তারা তো কেবল নেগেটিভ ফিল্ম ফটো করছে এতে অনেক খরচ পড়ছে, পাঁচ হাজার পাউন্ড।" তাকে পশ্ন করলাম ঃ এখান থেকে আমাদের জন্য একটি কপি বের করা যায় কিনা ? বললেন ঃ "জিজ্ঞাসা করে দেখব।" আমি দ্বিতীয় বিষয়ে কথা বললাম। সেটা হচ্ছে খাদ্য উপকরণ ভাণ্ডারে সংরক্ষণ বিষয়ে। তাকে বললাম ঃ "এটা নিশ্চিত যে, আপনারা সীমিত পরিমাণ খাদ্যই রেখে যাচ্ছেন যা স্বল্প সময় চলতে পারে, যেহেতু আমরা জানিনা কি ঘটতে পারে, সে জন্য আমরা একটি বড় গুদাম তৈরি করতে চাই। আমরা কিছু পরিমাণ খাদ্য বিশেষ করে আটা ও চিনি আমদানি করতে চাই। তিনি উত্তর দিলেন— "এ ব্যাপারে পরামর্শ করা হবে।"

জ্বালানী সম্পর্কে আমি লক্ষ্য করলাম যে, জ্বালানী কোম্পানীগুলো এখন রেশন কার্ডে বিক্রির আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বললেন, আমি এর কারণ জানি না, কিন্তু কোম্পানীগুলোর অবস্থা এখন এরকমই। আমি তাঁকে বললাম, যদি সরকার আমাদের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত না করে তাহলে আমরা কোম্পানীগুলোর সাথে আমাদের বিষয়টির একটি সুরাহা করব।

আমি আবারও তাঁর সাথে ফিলিস্তিনের ব্রিটিশ বাহিনীর সম্পত্তি বিক্রিয় বিষয়টি উত্থাপন করি; এর মধ্যে তাঁবু ও চোপায়াও রয়েছে। আমি তাকে এও বললাম যে, আমরা সব কিছু পাইকারী কিনতে চাই। আশা করি এ ব্যাপারে তিনি সুপারিশ করবেন।

তাঁকে আমি আরও বললাম, নতুন প্রেক্ষাপটে আমরা তেলআবিবে একটি স্বতন্ত্র বেতার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তিনি বললেন— আমরা তোমাদের অচিরেই সরকারী রেডিওর সামর্থ্য দিব। আমি বললাম, এতে আমাদের বেতার তো নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বললেন, অবশ্যই যতক্ষণ আমরা আছি, এখানে আমরাই শাসক। আমি বললাম, আমরা চাই তেলআবিবে একটি ইহুদী বেতার কেন্দ্র। বললেন, আরবরা এ ধরনের কোন দাবি জানায়নি। যদি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তারাও একই জিনিস দাবি করবে। বললাম, আরবরা দরখাস্ত না করার কারণে আমাদের শাস্তি দেয়া উচিত নয়। যা হোক, নাবলুসে যদি আরব বেতার কেন্দ্র হয় তাহলে আমাদের কিছু যায় আসে না। তিনি বললেন— তিনি বিষয়টি দেখবেন।

এরপর আরও কিছু ভয়ানক বিষয়ের দিকে গেলাম। গতকাল ৭ জন ইহুদীর নিহত হওয়ার বিষয়। আমরা চাই প্রতিটি প্যাসেঞ্জার বাসে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা রক্তপাত বা প্রতিশোধ চাই না, বরং চাচ্ছি প্রতিরক্ষার সামর্থ্য। তিনি বললেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন। তিনি বিষয়টি নির্বাহী পরিষদে উত্থাপন করবেন। আমি ইহুদী পুলিশের জন্য পিস্তল ও কার্তুজ এবং সাঁজোয়া গাড়ি কেনার লাইসেন্স চাইলাম। .....

সন্ধ্যার আগে তেলআবিব পৌঁছলাম। মোশে শার্তুক নিউইয়র্ক থেকে ফোনে কথা বললেন। তিনি আমাকে ইঙ্গিত করলেন যে, তাঁরা আমাদের সাথে লন্ডনে আলোচনা করতে চান। তিনি বললেন, তিনি লন্ডন হয়ে এখানে উপস্থিত হবেন। তাঁকে সামরিক প্রস্তুতির কথা বলেছিলাম, তিনি এ কারণে ওয়াশিংটন সফর করবেন। ....

২ ডিসেম্বর, ১৯৪৭

দলের সদস্যগণ উপস্থিত হলেন। আরব সমস্যা মোকাবিলার পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পড়েছে বেনহাস নাফুনের ওপর। নতুন জাতীয় সঙ্গীত রচনা করবেন মোশে হালেফী। ইয়াকুব ডোরি প্রস্তাব করেন আরব ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে

অপারেশন চালাতে। পানির ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করার প্রস্তাবও করেন। ইসরাইল গ্যালিলি তা সমর্থন করেন।

মোশে আফারবুখ আজ যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন, আমি তাকে অনুরোধ করলাম যেন আমাদের কাছে আরও আধা মিলিয়ন পাউন্ড পাঠিয়ে দেন। স্লোমো গোর চাচ্ছেন ৪৪. ৮৮৪ পাউন্ড যাতে রসায়ন বিজ্ঞানী ড. আশার শেফাইগারের সহযোগিতায় তার রসায়নিক অস্ত্র ব্যবস্থাপনা অফিসে উৎপাদন শুরু করতে পারে।

—সাফাদ থেকে ইউসুফের কাছে প্যার্টস এসেছেন। সেখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আরবরা ইহুদী পল্লীগুলো থেকে বের হয়ে আসছেন।

ইউরোপে বর্তমানে অভিবাসীদের মধ্য থেকে উপযুক্ত সেনা অফিসার ও জেসিও নির্বাচনের লক্ষ্যে পর্যালোচনা বৈঠক হলো। যেমন জার্মানী ও অস্ট্রিয়াতে রয়েছে অফিসার ২৬৪, সৈন্য ২০৫৪, ফ্রান্স ও উত্তর আফ্রিকা— অফিসার ২৮৮, সৈন্য ১০৮০+২০০+২৩৮ জনর‍্যাঙ্কের । হাঙ্গেরিয়ায় ২৪৩ অফিসার ও সৈন্য (ক) পদে ১৫০, (খ) পদে ৯০০ জন। চেকোস্লাভাকিয়ায় অফিসার ৪৫ আর সৈন্য (ক) পদে ১৯৮। রুমানিয়ায় ৫০ অফিসার, সৈন্য ৭০+খ র‍্যাঙ্কে ৭০০। রুমানিয়ায় সামরিক ট্রেনিং স্কুলে সবসময় ৮০-১২০ জন গ্রুপ লিডারকে ৬০ সপ্তাহের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে।.

ইসরাইল গ্যালিলি বলেন, এটসেলের কামান্ডিং অফিসারদের সাথে কোর্টেস আলাপ করেছেন। তিনি চান আমাদের থেকে দূরে আলাদা বাহিনী হিসাবে থাকতে যাতে তারা সীমান্তে তৎপর থেকে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয় (অন্তত যতক্ষণ না আমরা নিজেরা কিছু করি)।

১১ ডিসেম্বর, ১৯৪৭

সালফেন (ইনি ইসরাইলে সামরিক শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠাতাদের একজন) আমাকে জানিয়েছেন যে, এ সপ্তাহে ২০০ হ্যান্ড মেশিনগান প্রস্তুতের কাজ শেষ হবে। আর এ মাসে দু'লাখ ৫০ হাজার বুলেট তৈরি হয়ে যাবে। তাছাড়া তারা ৩ ইঞ্চি মর্টার উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। ৫০০০ স্টেনগানও উৎপাদন করবে। ৬০ হাজার মাইলজ বোমা উৎপাদনও প্রায় সমাপ্তির পথে। আমরা অচিরেই আমেরিকা থেকে ৫ টন ব্লাসটেড লাভ করব। ইতালী থেকেও সাড়ে তিন টন পাব। এক মিলিয়ন কার্তুজ বানাতে ২ টন ব্লাস্টেডের প্রয়োজন হয়। ইতালী থেকে সোয়া তিন টন TNT (ডিনামাইট) অচিরেই পৌঁছে যাবে। আমেরিকা থেকে পৌঁছবে ২৫০ টন। অর্থায়ন কমিটি সোয়া এক মিলিয়ন ডলার যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্য ট্রান্সফার করেছে।

—স্লোমো গোর আমাকে জানিয়েছেন যে, কোরেট কারখানায় অচিরেই ডিসেম্বরের শেষ দিকে কাজ শুরু হবে। জানুয়ারির মধ্যেই ৩ টন উৎপাদন করবে তারপর প্রতিমাসে ৪ টন করে উৎপাদিত হবে। সম্ভবত তারা নাইট্রোজেন এ্যাসিড

ছাড়াই ডিনামাইট উৎপাদনে সক্ষম হবে। এটা এখনও গোপনীয়। কাঁদানে গ্যাসের কারখানায় আল-কুদসের লোকেরা উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। তারা আগামী মাস নাগাদ ৬ হাজার বোমা বানিয়ে ফেলবে। এরপর প্রতিদিন তিন হাজার মাইন বানাবার ব্যবস্থা নিয়েছে।

— ইলইয়াহু সাসুন ধরে নিয়েছে যে, আরব নেতৃত্বের বিরোধীরা এখন আর নেই আজরা ড্যানিন তা মানতে চান না। বিরোধিতা আছে, তা এখন ক্রোধের ঝঞ্ঝা প্রশমিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এর বাহিনী এখন আরব সেনানিবাসে পঞ্চম বাহিনীর মতো যেমন ছিল তেমনিই ঘাপটি মেরে আছে। বাদশাহ্ আবদুল্লাহ কখনও আরব লীগের চাপের মুখে নতি স্বীকার করবেন না। উদ্ধার বাহিনীর কমান্ডার কাওকাজী আমাদের দু'জন প্রতিনিধির সাথে বৈঠক করতে আগ্রহী। —আমি মিনা ম্যারি জের, ইসরাইল গ্যালেলী ও এলইয়াহু সাসুনের সাথে লাঞ্চ করলাম। ইতালী থেকে ৫০০ মেশিনগান ও ১৭০ টি জার্মান বন্দুক, কোয়ার্টার মিলিয়ন থ্রীনট থ্রী কার্তুজ, ৩ লাখ নাইন মি. মি. বুলেট, ৩ লাখ পিস্তলের ছোট সাইজের বুলেট এসে পৌঁছেছে। এ ছাড়াও বার্ন মেশিনগানের জন্য বিপুল গোলাবারুদ ও বেশ কিছু দূরবীণ এসে পৌঁছেছে। তদুপরি তারা ক্রয় করেছে ছোট আকারের অর্ধ মিলিয়ন বুলেট (৩৭ হাজার ডলার), সাড়ে তিন টন T.N.T (২৬ হাজার ডলার), সাড়ে তিন টন ব্লাস্টেড (১৫ হাজার ডলার), যোগাযোগ যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি (৬০ হাজার ডলার), এম্যুনিশনের নতুন রিকুইজিশনও দিয়েছে (এক লাখ ডলারের)।

—রাব্বি হায়েম নাহুম (মিসরের ইহুদী যাজক) হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মাজেন্সের সাথে টেলিফোনে কথা বলে তাকে মিসর যেতে অনুরোধ করেন। তাঁর কাছে ৯ ডিসেম্বর একটি বার্তা পাঠান। এতে শান্তি সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট ছিল। আমি মাজেন্সকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এটা কি সংলাপ বুঝায় ? আমি তাকে বললাম আমরা মিসরের সাথে আনুষ্ঠানিক অথবা বেসরকারীভাবে আলোচনা করতে চাই। তবে সমান মর্যাদার পক্ষ হিসাবে।

—যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রয় সমন্বয়কারী ইহুদা আরজী তিনটি কনস্টেলেশন বিমান ও ১০টি সি-৪৬ বিমান ক্রয় করেছেন।

আল-কুদস

সোমবার, ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৭ —

আমরা আরব উচ্চ কমিটির টেলিফোন আলোচনা গোপনে শুনেছি। মসজিদ আকসা, ডঃ খালেদী ও আরও কিছুসংখ্যক ব্যক্তির টেলিফোনও শুনেছি। মনে হচ্ছে বহু লোক জড়ো হয়েছে। তবে কথাবার্তায় বোঝা যায়, তাদের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই।

আমরা পত্রিকা, টেলিফোন আলোচনা ও আরবদের মাধ্যমে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে দেখা যায় আরব লীগ ১৭টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সাসুন এর নয়টিই জানে। হয়ত পূর্ব জর্ডানের একজন লোক থেকে জানতে পারব যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হয়েছে। পূর্ব জর্ডান এতে একমত হয়েছে কিনা। আরব উচ্চ কমিটির অবশ্যই ভরাডুবি হবে। টাইগার দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে এ মর্মে চুক্তিতে পৌঁছেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০ জন বৈমানিক ও ক্রু এবং আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ১৫ জন ম্যাকানিককে প্রশিক্ষণ দিবে। কারণ তারা মহাযুদ্ধে এয়ার ফোর্সে সার্ভিস দিয়েছিল।

—সোয়া বারোটায় সাসুন বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্র এক প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকার শেষে ফিরে এলেন। ঐ প্রতিনিধি কিছুক্ষণ পূর্বেও তাঁর সাথে ছিল। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিল যে, আমাদের সাথে বৈঠকে কি বলবে ? বাদশাহ্ তাঁকে বলেছিলেন, তাঁদেরকে বল, আরব লীগ কোন লীগই নয়, এর সিদ্ধান্তও আসলে কোন সিদ্ধান্ত নয়। বাদশাহ্র উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলল যে, তারা আরব লীগের বৈঠকে প্রস্তাব করেছে যেন পাশ্চাত্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কিন্তু এ তো বাজে কথা। ইবনে সউদ কি আমেরিকানদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে ? এক আরব দেশ আরেকটির চেয়ে বেশি দেখাতে চায়। যেমন ইরাক ও পূর্ব জর্ডান উভয়ই সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব দিল, তবে পূর্ব জর্ডান জাতিসংঘ থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দিল।

আরব লীগের বৈঠক শেষে যে বিবৃতি প্রকাশ পেল তা ছিল আরব ব্যর্থতাকে ঢাকার প্রয়াস মাত্র। পূর্ব জর্ডান কোন সিদ্ধান্তই অনুমোদন করেনি। বাদশাহ্র প্রতিনিধি সাসুনকে অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরলেন। মিসর প্রকাশ্যে ঘোষণা করল যে, সে কেবল অর্থ, প্রচার ও রাজনৈতিক সহায়তা দিবে। কিন্তু কোন সৈন্য বা অস্ত্র নয়। হতে পারে স্বেচ্ছাসেবীদের অনুমতি দেবে। লেবানন বলল যে, সে ৫০০ বন্দুকের বেশি দিতে পারবে না। সিরিয়ার ছিল অন্য হিসাব। সৌদীআরব কিছু ডলার দিবে।

সাসুন বাদশাহ্র প্রতিনিধিকে আরব বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তর দিল বাদশাহ্ চাচ্ছেন আপনাদের পত্রিকাগুলো আরব বাহিনী সম্পর্কে হৈচৈ শুরু করবে এবং এর অবস্থান থেকে সরিয়ে নেয়ার দাবি করবে। এ সময় তারা এর সাথে সংঘর্ষে যাবে না। নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বাহিনীকে কাবু করার শক্তি তো ইংরেজদের হাতেই রয়েছে।

আমি একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করি। কিভাবে মিসর ও সিরিয়ার মুদ্রাকে মার দেয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। সমস্যা হলো, তা কিভাবে সম্ভব ? সিরিয়ার মুদ্রা সম্পর্কে শামউনীর ধারণা যে, এটা সম্ভব। কারণ ফ্রান্স সিরীয় মুদ্রাকে কভার করবে।

বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি, ১৯৪৮

আজ আমার বাসায় মুক্ত সৈনিক সংঘের একটি প্রতিনিধি দল আমার সাক্ষাতে এসে আমাদের সাথে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তারা প্রশ্ন রাখেন যে, তাদেরকে কেন ডাকা হলো না। সংখ্যা ১২,২৫০।

—আমাদের এ্যাকশনে বড় ধরনের মার দেয়ার কৌশলের ওপর নির্ভর করা উচিত। এটা একাধারে গুলি ছোড়ার বিষয় নয়। বরং সফল বড় ধরনের শক্ত আঘাত হানার বিষয়। যদি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর স্বেচ্ছাসেবীরা আমাদের প্রচণ্ড আঘাত হানার খবর পায় তাহলে তারা এখানে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

—বাদশাহ্ আবদুল্লাহর ভূমিকা আমাকে অবাক করছে। কারণ, তার সাথে সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রেই আরব বাহিনীর বিষয়টি উঠে আসছে। জর্ডানের সর্বমোট বাজেট হলো ৭৫০ হাজার পাউন্ড। কিন্তু আরব বাহিনীর বাজেট হলো আড়াই মিলিয়ন পাউন্ড। ইংরেজরাই এই অর্থ যোগান দিচ্ছে। এখন ইংরেজ চলে গেলে আরব বাহিনীকে কে অর্থায়ন করবে ? একটি খবর পেলাম যে, এ বাহিনী আরব লীগের পক্ষে তার কাজ চালিয়ে যাবে। বাদশাহ্ এ বাহিনীকে ৬ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আরব লীগের কাছে ডেপুটেশনে দিবে, যেমনি দিয়েছিল ইংরেজদের কাছে। এ বাহিনীর বিষয়টি আসলে অস্পষ্ট।

১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৮

—নাকাবে আমাদের বাহিনীতে এখন ১২০০ সদস্য রয়েছে, এছাড়াও বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ ইউনিটগুলোতে রয়েছে ৫০০ সৈনিক। নাকাবকে আরও সুরক্ষিত করে সেখানে অস্থায়ী আবাস গড়ে তুলতে হবে। এমনকি এমন স্থানেও— যা আমাদের ভূমি নয়। (নাকাব মিসরের লাগোয়া)।

নাকাবের মরুভূমি যদি আমরা অধিকারে না রাখি তাহলে তেলআবিব সুদৃঢ় হবে না। নেকাব তো ঈলাতের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

১৯ জানুয়ারি, ১৯৪৮

—আমাদের প্রতিনিধি বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরেছেন। বাদশাহ্ খুবই হতোদ্যোম হয়ে পড়েছেন, কারণ আমরা তাকে বুঝতে চেষ্টা করছি না, এবং আমরা তাকে এ মর্মে অভিযুক্ত করছি যে, হয়তো সে আরব লীগের সমর্থন যোগায়। তার ভূমিকা আগের মতোই রয়েছে ঃ

১. তিনি জর্ডান বাহিনীকে ইহুদীদের আক্রমণ করতে দিবেন না।
২. ব্রিটিশরা এ দেশে থাকা পর্যন্ত তিনি কোন হস্তক্ষেপ করতে পারছেন না।
৩. এখন পর্যন্ত ইংরেজগণ তার সাথে কোন কথা বলেনি। কিন্তু এ মাসের ২৪ তারিখে তার লোকজন এবং আমাদের বন্ধুরা আলোচনার জন্য লন্ডনে যাবেন। সেখানে ইসরাইল ভূমির ভবিষ্যতের ব্যাপারটি উত্থাপন করা হবে।
৪. অচিরেই তার প্রতিনিধিগণ লন্ডনে বিভক্তির প্রতি সমর্থনের ভূমিকা রাখবে। কিন্তু এমন বিভক্তি হতে হবে যা তাকে অপমানিত করবে না।
৫. তিনি বলেন— আমরা হয়ত সীমা সংশোধনে বাধ্য হব।

বাদশাহ্ আমাদের অনুরোধ করেন, যেন আমরা আমেরিকা থেকে তার জন্য কিছু সাবসিডি নিয়ে দেই। তিনি তার পক্ষ থেকে আমেরিকানদের একথা বলার জন্যও আমাদের দায়িত্ব দেন যে, তিনি বিভক্তিতে রাজি আছেন এবং তার দেশকে শান্ত রাখতেও প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি কেবল ইংরেজদের সাথে জড়িত থাকতে চান না। আমরা বাদশাহ্কে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা তাকে সমর্থন দিব এবং তার গোটা দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে কিছু ঋণ পেতে সাহায্য করব। আমরা তা আমাদের ইসরাইল রাষ্ট্রের তহবিল থেকে, নিজেরাই তা দেব।

বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৮

—জর্জ হাকীম— রোম-এর ক্যাথলিক আর্চ বিশপ হচ্ছেন বাদশাহ্ ফারুকের বন্ধু। ডেভিড হাকুহেন হাকীমের সাথে তার সফরের পূর্বে আলাপ করে প্রস্তাব দেন, যেন তিনি বাদশাহ্ ফারুকের কাছে আমাদের ভূমিকা ও অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।

২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

আমি ঈলাতের একটি পূর্ণাঙ্গ নক্সা প্রস্তুত করার জন্য বললাম। আমাদেরকে তা নিতেই হবে। ঈলাতে দু'টি সমস্যা আছে ঃ

(ক) সুয়েজ খাল পার হওয়ার আগে ও পরে মিসরের আঞ্চলিক পানিতে আমাদের চলাচল থাকতে হবে।

(খ) ঈলাতের প্রবেশপথের প্রস্থ হচ্ছে দু' মাইল। সেখানে পৌঁছতে হলে মিসর বা সৌদী আরবের আঞ্চলিক পানি অতিক্রম করতে হবে।

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

সাসুন আজ আমাদের বৈঠকে উপস্থিত হতে পারবেন না। কারণ তার নিকটবর্তী বন্ধু বাদশাহ্র দরবারের দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে কায়রোতে পৌঁছেছেন। তিনি তিনটি বিষয়ে জানতে চান।

(ক) ইংল্যান্ড ইহুদী কমিউনিস্টদের ভয়াবহতা সম্পর্কে আরব দেশগুলোকে চাপের মধ্যে রাখছে।

(খ) ইংল্যান্ড আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট হয়ে চাচ্ছে যে, আরব দেশগুলো এই ঘোষণা দিক যে, বৃহদশক্তিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেলে তারা এ্যাংলো-সেক্সোনী পক্ষেই যোগ দিবে।

(গ) ইংল্যান্ড ও আমেরিকা আরব বিশ্বের সাথে রাজনৈতিক আঁতাতের বদলে অর্থনৈতিক মৈত্রীচুক্তি করতেই আগ্রহী।

সোমবার, ৩১ মার্চ, ১৯৪৮

ড. এ. এন. ফোক (আরব বিষয়ক আমেরিকান বিশেষজ্ঞ)-এর মতে, আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ধ্বংস ও গোলযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ

করে ইরাক, মিসর ও সিরিয়া। মিসরের সেচ বাঁধগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে। মিসরের তুলার গোডাউনগুলোকে পুড়িয়ে দিতে হবে। এমনি করে ইরাকের খেজুরের স্টোরগুলোও ধ্বংস করে দিতে হবে। এ সকল দেশের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে ইসরাইল ভূমির বাইরে তেল পাম্পগুলোতে আঘাত হানতে হবে। আরব অঞ্চল জুড়ে আর্থিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে আমরা এটাকে বাড়িয়ে দিতে থাকব। আরবরা মুদ্রা জাল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের আগেই কাজটি সেরে নেব।

২০ এপ্রিল, ১৯৪৮

—সাসুনকে দাওয়াত দিলাম। বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্র পজিশন প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরব বাহিনীকে ব্যবহার করা যে, খুবই দরকার এ ব্যাপারে সবাই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। আরব লীগ দেখল যে আরব গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন আঘাতের সম্মুখীন হচ্ছে এবং সবাই একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর অনিবার্য প্রয়োজন সম্পর্কে একমত। আরব বাহিনীটি হচ্ছে সেই বাহিনী। আরব লীগ একটি সুশৃঙ্খল নিয়মিত বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও পূর্ব জর্ডান থেকে সৈন্য বাহিনী উপস্থিত হওয়ার কথা, মিসর থেকেও হয়তো বা প্রতীকী কিছু ফোর্স উপস্থিত হওয়ার কথা।

—আবদুল্লাহর বিশ্বাস, এ বাহিনীর সবাই বেশি দিন অবিচল থাকবে না। তিনি একাই তার উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা করতে সক্ষম। কারণ তিনি একাই তাঁর দেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় একটি বাহিনীর মালিক।

হাজানাহ বাহিনী আরব স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি যেসব আঘাত হেনেছে এতে মুফতি সাহেবকেও আঘাত করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা একা আমাদের মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। মুফতি সাহেব এখন পুরোপুরি আরব লীগের উপর নির্ভরশীল। আরব লীগও বুঝে ফেলেছে যে, এটা কেবল স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ নয় বরং এর সাথে নিয়মিত বাহিনীর ভারি অস্ত্রও ব্যবহার করার দরকার আছে যেমন— ট্যাঙ্ক ও বিমান।

২ মে, ১৯৪৮

—আজ সকালে তেলআবিবে ফিরলাম। শ্লোমো রাবিনোভেচও ফিরলেন। (পরবর্তীতে এ নামটি পরিবর্তন করে 'শামির' রেখেছিলেন এবং '৮০-এর দশকে প্রধানমন্ত্রী হন)। যেশের-এ এসে শ্লোমো সাহেব আরব বাহিনীর কর্নেল গোল্ডে ও মেজর ফোকার-এর সাথে দেখা করলেন। আরব বাহিনীর অফিসার তাঁর সাথে আলোচনা করতে চাইলেন। তিনি আরব বাহিনীর অধিনায়ক গ্লোব পাশার পক্ষে কথা বললেন। তাঁরা চাচ্ছেন যুদ্ধ ছাড়াই একটি সমাধান বের করার লক্ষ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে। তারা প্রশ্ন রাখলেন, আমরা কি পুরো দেশটাই দখল করতে চাই

কিনা। উত্তর ছিল এ রকম যে, সীমান্তের বিষয়টি তো রাজনীতিকদের ব্যাপার। তবে আমাদের বাহিনী গোটা দেশই দখল করতে সক্ষম। তারা আরও জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি হাইফার পর আল্-কুদ্স আক্রমণ করব কিনা ? উত্তর দেয়া হল যে, আল্ কুদ্স হচ্ছে হিব্রু শহর। তারা বলল যে, আরব বাহিনী আমাদের সাথে সংঘাত চায় না তবে তাদের এ খেয়ানত ঢাকার জন্য তারা কি করবে ? তাদের প্রশ্ন করা হলো— তাদের কাছে কি ধরনের রাজনৈতিক নির্দেশনা রয়েছে ? তাদের উত্তর ছিল অস্পষ্ট।

৭ মে, ১৯৪৮

কমান্ডারের সাথে বৈঠক। ইয়েগাল ইয়াদীন-ইয়েগাল আ-লোন। সব দেশে কেবল সামরিক অবস্থা নিয়েই আলোচনা। সিদ্ধান্ত হলো মিসরে একটি পর্যবেক্ষক ইউনিট পাঠানো হবে সিনাইয়ের দিকে মিসরের প্রতিটি রাস্তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

১৩ মে, ১৯৪৮

কমান্ডারের বৈঠক। গ্রানুফেস্কির কাছে টেলিটাইপ করা হয়েছে যাতে বিমানের জন্য ১ মিলিয়ন ৭ লাখ ডলার ক্রেডিট খোলা হয়। বৈঠক চলাকালে বাদশাহ্ আব্দুল্লাহর সাথে বৈঠক শেষে গোল্ডামায়ার উপস্থিত হন। আমি তার দিকে নজর রাখলাম যেন সংক্ষেপে একটা ধারণা দেয়। তিনি আমাকে একটি কার্ড দিলেন যাতে লেখা আছে ঃ "তার সাথে আমার বৈঠক ছিল অন্তরঙ্গ পরিবেশে। তিনি খুবই উদ্বিগ্ন এবং তার চেহারা খুবই বিষণ্ন। আমাদের মধ্যে যা হয়েছে তার সবই স্বীকার করেন। এর অর্থ, তিনি কেবল আরব অংশটুকুই নিবেন। কিন্তু এখন এটা পাঁচের এক ছাড়া কিছু নয়।"

'নাকাব' অঞ্চলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আলোচনা করলাম যে, 'বীরে ছাব্আ' অঞ্চলটি অধিকারে নিয়ে আসা আবশ্যক কিনা। সেটা কি বিভক্তির ম্যাপ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বাইরে কিনা ? লড়াইয়ের গতিবিধিই তা ঠিক করে দেবে।

১৫মে, ১৯৪৮

আজ রাত আমাকে তারা দু'বার জাগিয়েছে। একটার সময় জাগাল এ কথা জানাতে যে, ট্রুম্যান ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফের সাড়ে চারটার সময় তারা জানাল যে, আমাদের আমেরিকার লোকেরা চাচ্ছেন যে, আমি তৎক্ষণিকভাবে রেডিওতে কিছু বলি। আমি যখন রেডিওতে কথা বলছি তখন একটি বিমান আক্রমণ হলো। আমি ইথারে বললাম ঃ তারা তেলআবিবে বোমা ফেলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মিসরী একটি জাহাজ এখন 'আল মাজদাল'-এর কাছে অনেক সৈন্য বহন করে এনেছে। মনে হয় ইংরেজরা মিসরীয়দেরকে উত্তরে না যেতে অনুরোধ করেছে। আজ সকালে সেনাবাহিনীর রেডিও থেকে একটি খবর দেয়া হয় যে, আজ সকালে একটি মিসরী বাহিনী আমাদের সীমান্তে ঢুকে পড়বে।

২৪ মে, ১৯৪৮

নাকাবে প্রচণ্ড চাপ। সেখানে মিসরের একটি আর্টিলারি ব্যাটালিয়ন রয়েছে। তাদেরকে সেখানকার দীর্ঘসময় ধরে বসবাসকারী ইখওয়ানুল মুসলেমীনের লোকেরা সাহায্য করছে। 'বীরে ছাব্আ'তেও মিসরীরা রয়েছে। সুইডেন, ইরাক, ফালুজা ও মুনশিয়াতে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। আমরা তাদের প্রতি আক্রমণে জোর দিয়েছি। তারা তাদের অবস্থানে সুদৃঢ় রয়েছে। আমরা ম্যাকলেককে কারমাল ব্রিগেডের কমান্ডার হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার কাজ হলো সূর, সিদা ও বৈরুতে বিমান হামলা করে দক্ষিণ লেবানন দখল করা। আমরা সমুদ্র থেকেও বৈরুত আক্রমণ শুরু করছি।

ইয়েগালকে দায়িত্ব দিয়েছি পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে সিরীয় বাহিনীকে আঘাত হানার। আমাদের বিমান বাহিনীর উচিত আম্মানে বোমা ফেলা।

আরব মৈত্রীর মধ্যে লেবাননই হচ্ছে দুর্বল কড়ি। কারণ সেখানে মুসলমানদের কর্তৃত্ব হচ্ছে কৃত্রিম। তাই সহজেই তাকে কাবু করা যাবে। লেবাননে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দরকার। এর দক্ষিণ সীমান্তে হবে লিতানী নদী। আমরা এ রাষ্ট্রের সাথে একটি চুক্তি করব।

আমরা আরব বাহিনীকে খতম করে দেব। এতে সিরিয়ার পতন ঘটবে। যদি মিসর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস দেখায়, তাহলে আমরা বোরসাঈদ, আলোকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে বিমান হামলা করব। এভাবেই আমরা যুদ্ধ শেষ করব এবং মিসরের সাথে, আসূর-এর সাথে এবং আরমানীদের সাথে আমাদের বাপ-দাদাদের হিসাব চুকিয়ে নেব।

॥ ৫ ॥

বার্নাডট

"ইহুদী রাষ্ট্রটি মধ্যপ্রাচ্যে মিসরের অবস্থান গ্রহণ করতে চায়"।

— মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণ, ১৯৪৮ সাল

ফিলিস্তিন যুদ্ধ সম্পর্কে কাগজে অনেক কালি ঝরেছে, এমনকি বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যত রক্ত ঝরেছে তার চেয়েও বেশি। এই যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জেনারেল আব্দুল্লাহ আত্-তেল্ল-এর ডায়েরী। ইনি ছিলেন আল্-কুদসে জর্ডান বাহিনীর কমান্ডার। এছাড়া রয়েছে আরব-ইসরাঈল সশস্ত্র যুদ্ধের প্রথম রাউন্ড সম্পর্কে জেনারেল হাসান আল বদরী'র বিশ্লেষণ। এ সবই হচ্ছে সে যুদ্ধের প্রামাণ্য তথ্যসূত্র। তবে যুদ্ধের ময়দান বা তারও পেছনের সাধারণ দৃশ্যের কিছু বর্ণনা এইসব ঘটনাবলীর সেই সব মুহূর্তের চিত্রায়ণে বেশি পারঙ্গম ঃ

বিশেষ করে মিসর— যে কিনা যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরব পক্ষ ছিল— এই ভেবে যুদ্ধে গেল যে, সে শুধু ফিলিস্তিন জাতির পক্ষে লড়ছে। তার দুর্দিনে পাশে থাকছে। তার এই ভূমিকা পালনের পেছনে কাজ করেছে ভ্রাতৃত্ব ও পড়শীর বন্ধন। কিন্তু অনেকের মনেই তখন একথা জাগেনি যে, দূরবর্তী ও নিকট অতীত ইতিহাসের দিকে ফিরে গিয়ে মহাকৌশলগত সত্যকে আবিষ্কার করবে। আর তা হচ্ছে— যুদ্ধটিই ছিল আসলে মিসরের জন্যই, যাতে পরিকল্পনা মাফিক তাকে তার পরিমণ্ডলে অবরোধ করে রাখার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ না হয়; যেন সাহারার ওধারে সিনাইতেই তার ভূমিকা, কর্মকাণ্ড ও জীবন অবরুদ্ধ করে না রাখতে পারে।

সে সময়কার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীই (ডিসিশন মেকার) জানা ছিল না যে, পড়শী দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের একটি সীমা থাকে, কিন্তু স্বয়ং নিজ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। প্রথমত নিশ্চিতভাবে একথা বলা যায় যে, আরব রাষ্ট্রগুলো হঠাৎ করে দেখল যে তাদের নিজেদেরকেই রাজনৈতিক কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। এ সময় তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নসিহত ও পরামর্শ চাইছে যা স্বয়ং ঐ সকল পক্ষের দিকেই ফিরে যাচ্ছে। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ব্রিটেনও যুক্তরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করছে।

আমি বলতে চাচ্ছি যে, সে সময় আরবদের কোন যোগ্য রাজনৈতিক বা সামরিক নেতৃত্ব ছিল না যা যুদ্ধ ও এর উপায়-উপকরণ এবং আবেদন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখত। তারা জানত না এর উদ্দেশ্য কি বা কিভাবে তা পরিচালনা করতে হয়, বরং অধিকাংশ নেতৃত্বেরই কোন বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত অথবা ধারণাগত ভিত্তিও ছিল না যা দ্বারা অন্তত ঠিক-বেঠিক কোন অভিজ্ঞতার চর্চা করতে পারে। এইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েও কিছু দক্ষতা অর্জন করতে পারত যার দ্বারা ব্যয়ের কিছু বদলা মিলত।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে আরেকটি বিষয়। আরবরা সংখ্যাধিক্যেই বিভোর ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, তারা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কারণ তখন মাত্র ৫ লাখ ইহুদী মোকাবিলায় তারা ছিল প্রায় চল্লিশ মিলিয়নেরও বেশি। এ থেকেই তাদের একটা ধারণা ছিল যে, মানুষের সমাবেশে বেশির পক্ষই জয়ী হয়। কিন্তু তা সঠিক ছিল না, এমনকি সংখ্যার হিসাবেও তা সঠিক ছিল না। কারণ সে ক্ষেত্রে সঠিক পরিসংখ্যানের প্রয়োজন।

কারণ যখন আরবরা তাদের সব ময়দানে মোট ৩৭ হাজার সৈন্য মোতায়েন করেছিল তখন ফিলিস্তিনের ইহুদী এজেন্সী সমাবেশ ঘটিয়েছে ৮১ হাজার যোদ্ধার। ইসরাইলী বাহিনীর সেনা অফিসারদের অধিকাংশই ছিল যারা বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীতে সার্ভিস করেছিল। তাদের সৈনিকদের অনেকের অবস্থাও ছিল অভিন্ন। অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও ছিল একই অবস্থা। বিমানের ক্ষেত্রেও আরবদের ছিল সব মিলিয়ে অনুর্ধ ৩০টি বিমান, যেখানে ১৯৪৮-এর জুন মাসের শুরুর দিকে ইহুদী এজেন্সী ৭৮টি বিমান সংগ্রহে সক্ষম হয়। আরব বাহিনীগুলো ফিলিস্তিনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক নির্দেশনা পায়নি— যদি ধরেও নেই যে, ঐ সময় তার বাহিনীগুলোর জন্য নির্দেশনা দেয়ার মতো যোগ্য নেতৃত্ব বা কর্তৃপক্ষ ছিল। এ সকল বাহিনীর নিকট যা ছিল তা হচ্ছে “ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার নির্দেশ মাত্র”। এগুলো ছিল “ফিলিস্তিন আরব রাষ্ট্র” ধরে নিলে তার অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিভক্তি রেখার প্রেক্ষাপটেই। এই সকল বাহিনীকে যেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সেখানেই তারা গিয়েছে মাত্র। যাওয়ার পথে তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত গোলার দিকে তারাও গুলি চালিয়েছে। এ ধরনের একটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিসরী বাহিনী গাযার দিকে যাওয়ার সময় ‘কেফার দ্রুম’ ও ‘দের সানীদ’ উপনিবেশগুলোর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, কিন্তু এ বাহিনী গাযার উত্তরাঞ্চলে পৌঁছে সেখানেই থেমে থাকে। এর চেয়ে দূরে যাওয়ার হুকুম ছিল না। আরব বাহিনীগুলো বিশেষ করে মিসরী বাহিনীর যে পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন ছিল তা নির্বিঘ্নে যোগান দেয়া হচ্ছিল না। অথচ এ সময় কেবল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সৈন্যদের স্থানান্তর পর্যায়ে না থেকে ঐসব স্থানে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

বাদশাহ্ ফারুক ইংরেজদের সাথে রহস্যময় সম্পর্কের মাধ্যমে কোন প্রকারে সুয়েজ ক্যানেলের ব্রিটিশ ঘাঁটি থেকে কিন্তু অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাবারুদ হাসিলের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয়।

সম্ভবত তার কিছু সামরিক অফিসার বন্ধু তাকে এ মর্মে বুঝিয়েছে যে তারা সুয়েজ ক্যানেল এলাকার ঘাঁটি থেকে গোপনে কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ বের হতে দেখলে চোখ বুজে থাকতে সক্ষম। অথচ আসলে বিষয়টি ছিল সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় একটি সিদ্ধান্ত যাতে বিভক্তি রেখার বাইরে ইহুদী রাষ্ট্র বিস্তৃতির পথে জটিলতা সৃষ্টি করা যায়। এতে ব্রিটেনের জন্য এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুবিধা হয়ে যাবে। এ অঞ্চলে ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ উন্মুক্ত রাখা। এ ঘাঁটিগুলো হচ্ছে— মিসরে সুয়েজ খালের ঘাঁটি, জর্ডানে যারকা ঘাঁটি এবং ইরাকে হেবানিয়া ঘাঁটি। অপরদিকে ইংরেজদেরকে মিসরের মাটি থেকে বহিষ্কারের দাবি থেকে মিসরের জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে নিবদ্ধ করা। এভাবে মিসর জড়িয়ে যাবে আর ব্রিটেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

বাদশাহ্ ফারুক ও তার সমর মন্ত্রী মেজর জেনারেল হায়দার পাশা দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটি অনুসরণ করেণ তা হচ্ছে ইউরোপে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য মিশন পাঠানো, বিশেষ করে ইতালীতে। ওখানকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বেকার সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা। এগুলো দেশে ফিরে এলে যুদ্ধরত বাহিনী এগুলো আবার বহন করার উৎসাহ দেখাবে। এ সকল অস্ত্রশস্ত্রের অধিকাংশই বহু বছর ধরে খালি জায়গায় অথবা পরিত্যক্ত গোডাউনে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। এগুলো এখন প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। এ ব্যাপারটি পরবর্তীতে 'নষ্ট হাতিয়ারের কিস্সা' হিসাবে প্রচার পায়।

ফিলিস্তিনের যুদ্ধ এমন রূপ পরিগ্রহ করেছিল যেন দূর দূর স্থানে বিচ্ছিন্ন কিছু আগুন। এরপর নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীর যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে তা রহিত হয়ে যায়। এ ছিল বিভক্তি সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। এরপর আবার নতুন করে গুলি বিনিময় হয়। তিনি আবার আসেন এবং গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী— কাউন্ট বার্নাডট (সুইডেনের বাদশাহ্র চাচাত ভাই) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, দক্ষিণ ফিলিস্তিনের 'নাকাব' অঞ্চলটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে শামিল থাকা জরুরী। কিন্তু ইসরাইল তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা কাউন্ট বার্নাডটকে আল কুদসে গুলি করে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই হত্যাকারীদের মধ্যে ছিল ইসহাক শামির— পরবর্তীতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি সে সময় অর্গান (আরাজন) সন্ত্রাসী দলের অঙ্গ দল 'লেহী আন্দোলনের' একজন যুদ্ধবাজ ছিলেন। এই একই দল ফিলিস্তিন যুদ্ধের তিন বছর আগে কায়রোতে ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী লর্ড মোয়েনকে হত্যা করেছিল।

আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীর হত্যার পর ঘটনার উত্তরণ এই হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদ প্যারিসের 'শায়ু' প্রাসাদে এক জরুরী বৈঠক ডাকেন।

১৯৪৮ সালের শরতে নিরাপত্তা পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশনের পাশাপাশি আরব-ইহুদী সরাসরি যোগাযোগ চলতে থাকে। সেখানে মিসরীয় প্রতিনিধি দলের প্রধান— সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মদ আহমদ খাশাবাহ্ পাশা 'ইলইয়াহু সাসুন'-এর সাথে দু'টি বৈঠক করেন।

এদিকে কায়রোতে রাব্বি হায়েম নাহুম আফেন্দী বাদশাহ্ ফারুকের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। বাদশাহ্ তার সচিবালয়ের সচিব হাসান ইউসুফ পাশাকে প্যারিসে পাঠান। তাঁর সাথে ছিল তাঁর ভগ্নিপতি তথা বাদশাহ্র সামরিক উপদেষ্টা এডমিরাল ইসমাঈল শিরিন বেগ। তাঁদের সাথে যুক্ত হন রাষ্ট্রদূত আব্দুল মুন্য়েম মোস্তফা। মিসরের এই রাজকীয় প্রতিনিধি দল ইলইয়াহু সাসুনের সাথে বৈঠক করেন। ইনি তাঁর সাথে একজন ইসরাইলী সেনা অফিসারকে নিয়ে এসেছিলেন। (সম্ভবত ডেয়ান বা 'আ-লোন) তারা তিনটি নিষ্ফল বৈঠক করেন।

মিসর তখন 'নাকাব' ও তার গুরুত্বের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। হয়তবা আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীর রিপোর্টটি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এতে তিনি আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সীমার ভেতর 'নাকাব' থাকার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। 'নাকাব' অঞ্চল ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে মিলনে মিসরের ভয়ের কতকগুলো কারণ ছিল ঃ

১. ইহুদী রাষ্ট্রটি 'নাকাব' পর্যন্ত বিস্তৃত হলে তা লোহিত সাগর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এতে ইহুদী রাষ্ট্রটি ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তাতে ইসরাইলের অবস্থান হবে মিসরের সমান— দুই সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল। আর এ অঞ্চলটি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগত চাবি অঞ্চল।

২. এই অবস্থান মিসরকে অবশিষ্ট আরব দেশগুলো থেকে স্থলভাগে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে।

৩. নাকাবকে আবাদ করার ক্ষেত্রে সেখানে ইহুদী ঘনবসতি সৃষ্টি হবে। যারা মিসর সীমান্তের কাছে ও টাচে বসবাস করবে। এতে নতুন সংঘাতের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৪. এছাড়া ইহুদী ঘনবসতি ফিলিস্তিনের মতোই বেশ কিছু উপনিবেশে কেন্দ্রীভূত হবে। এটা মিসরে কমিউনিস্ট জীবনপ্রণালীর সাদৃশ্য স্টাইল। মিসরের দৃষ্টিতে এটা একটি বিপদের হুমকি। কারণ সেখানে থেকে কমিউনিজমের জীবাণু এদিকে ছড়াতে পারে।

মিসর-ইসরাইল যোগাযোগ ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ ইসরাঈল নাকাবকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে অনড় ছিল। যদিও এটা ছিল আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী নিহত কাউন্ট বার্নাডট-এর প্রতিবেদনের খেলাফ।

এভাবেই প্যারিসের 'শায়ু' প্রাসাদে ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার পর সবাই নিজ এলাকায় ফিরে এল এবং ফিলিস্তিনে গুলি বিনিময়ের ময়দানগুলোতে নিয়োজিত হল।

এ ছিল একটি পক্ষের স্বাভাবিক বিষয় যে জানে সে কি চায় এবং তা পাওয়ার জন্য থাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দ্বিতীয় পক্ষটি বিলম্বে তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার কিছুটা হলেও রক্ষা করার জন্য দৌড়ে গেল। শান্তির প্রচেষ্টা আর আলোকিত রাজধানী— প্যারিসে অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠকগুলোতে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুর্ঘটনার চাকা অবিরামভাবে ঘুরতেই থাকল !

॥ ৬ ॥

আ-লোন

"আমাদেরকে নাকাব দিয়ে দিন; ইসরাইলকে একটি ছোট ঘিঞ্জি রাষ্ট্র বানাবেন না।"
— আমেরিকান প্রেসিডেন্টের প্রতি এক পত্রে ইসরাঈলী মন্ত্রিপরিষদ

মধ্যপ্রাচ্য এবং তার কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পদের প্রতি গুরুত্ব আরোপকারী আন্তর্জাতিক পক্ষগুলো ফিলিস্তিনের ঘটনাবলীকে অনুসরণ করে যাচ্ছিল। তারা জানত যে, এ দেশটি এখন এ অঞ্চলের ইতিহাসে চূড়ান্ত ফয়সালার মুহূর্তটির সম্মুখীন। এখন এ ভূখণ্ডে যুদ্ধের ময়দানে যা চলছে এটাই এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে এবং এমন একটি নতুন মানচিত্র অঙ্কন করবে যা 'সায়েক্স বেকো' মানচিত্রের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ সায়েক্স-বেকো মানচিত্রটি অঙ্কন করেছিল সীমান্তের চিহ্ন। পক্ষান্তরে যুদ্ধের পর এখানে যে মানচিত্র প্রকাশ পেতে যাচ্ছে তা অঙ্কন করবে শক্তি ও প্রভাবের কেন্দ্রসমূহকে।

আরব ও ইহুদীদের সামরিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিভিন্ন রাজধানীতে সূক্ষ্ম অনুসরণের বিষয়বস্তু। ওয়াশিংটন ছিল এ ক্ষেত্রে প্রথম। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক সম্প্রতি উদ্ভাবিত সিআইএ হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তৎপর ম্যাকানিজম। বিশেষ করে আরবের পেট্রোল সম্পদকে পূর্বাহ্নেই গ্যারান্টিড করাকেই তার প্রত্যক্ষ কাজের অধীনে রাখা হয়েছে।

২৭ জুলাই তারিখে সিআইএ এজেন্সী যুদ্ধের গতিবিধির ওপর একটি রিপোর্ট লেখে (প্রমাণ্য দলিল নং ৪৮-৩০/ ৩৮/ঝ গোপনীয়)। এটি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা। এতে রয়েছে ঃ এখন যেসব লড়াই চলছে এর বেশিরভাগই হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ লড়াই, কিছু লক্ষ্যহীন এলোমেলো সংঘাত। যদিও এগুলো একটার পেছনে আরেকটা ঘটেই যাচ্ছে।

নিশ্চিতভাবে ইসরাইল এসব লড়াইয়ে সফল হয়েছে। অনুরূপভাবে সে যুদ্ধবিরতির সময়গুলোতে দারুণভাবে উপকৃত হয়েছে। আমাদের প্রাপ্ত সকল তথ্যসূত্র অনুযায়ী ইহুদীরা তাদের শক্তি প্রমাণ করেছে। এর মাধ্যমে তারা এখন ফিলিস্তিন থেকে সকল আরব বাহিনীকে বের করে দেয়ার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক আঘাত হানতে সক্ষম। ইহুদী বাহিনীর শক্তি ইতোপূর্বেকার সকল আন্দাজকে ছাড়িয়ে গেছে। লক্ষণীয়, এই ছোট্ট উদীয়মান রাষ্ট্রটি তার সাংগঠনিক দিক থেকে তার চেয়ে বড় ও

প্রাচীন প্রতিষ্ঠানিক অবস্থাসম্পন্ন দেশের চেয়েও অগ্রগামী হতে পেরেছে। এটা আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য নিম্নবর্ণিত মূল্যায়নটিই যথেষ্ট। এতে দেখা যাবে একদিকে আরব দেশগুলো কি সাইজের বাহিনী মোতায়েন করতে পেরেছে, অন্যদিকে ইসরাইল রাষ্ট্র কতদূর সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল ঃ

বিভিন্ন আরব দেশের স্বেচ্ছাসেবী সব মিলিয়ে আরব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ফিলিস্তিনের ২৭০০০, তার কাছে ১৯৮০০। সর্বমোট ৪৬৮০০।

এবার আসা যাক ইসরাইলী বাহিনীর সাইজ সম্পর্কে। তাদের সবাই ছিল ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরেই। তারা ছিল নিম্নরূপ ঃ

বহিনী	ফিলিস্তিন	ফিলিস্তিনের নিকটে	সর্বমোট
জর্ডান	৬০০০	৪০০০	১০০০০
ইরাক	৯০০০	১০০০	১০০০০
মিসর	৫০০০	৮০০০	১৩০০০
সিরিয়া	১০০০	১৫০০	২৫০০
লেবানন	–	১৮০০	১৮০০
সৌদী আরব	৩০০০	–	৩০০০

ভ্রাম্যমাণ আঘাতকারী বাহিনী ১৭০০০, অর্ধ-ভ্রাম্যমাণ বাহিনী (স্থানীয় অপারেশনের জন্য) ১৮০০০, প্রতিরক্ষা বহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৫০০০০। আরাজন (অর্গান) বাহিনী ১২০০০, স্টার্ন দলগুলোর সদস্য সংখ্যা ৪০০ থেকে ৮০০।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইসরাইল তার বাহিনীর সাইজ ৯৭৮০০ যোদ্ধা পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এভাবে যুক্তরাষ্ট্র তার আবেগ ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কার করল যে, প্রকৃত শক্তির হিসাব-নিকাশ সংখ্যা ও সাইজ থেকে ভিন্নতর জিনিস। তাও এমন এক অঞ্চলে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে প্রচুর স্বার্থ।

আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সী সিআইএ-এর বিশ্লেষণ অনুসারে যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তার প্রেক্ষিতে সহজাতভাবেই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পক্ষ থেকে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল-এর প্রতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে নির্দেশ জারি হলো ঃ

প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল-এর প্রতি স্মারক ঃ

১. আপনি অবগত আছেন যে, আমি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য অব্যাহতভাবে আমার সমর্থন দিয়ে আসছি। যুক্তরাষ্ট্র এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।

২. আমি বিশ্বাস করি যে, ফিলিস্তিনের নতুন রাষ্ট্রটির প্রতি আমেরিকার জোরালো সমর্থন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে নিস্তরঙ্গ করতে সহায়ক হবে এবং বিশ্ব শান্তিকেও আরও স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

৩. বর্তমানে আমরা আমাদের আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য কেবল পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে দেয়ার জন্যই যত্নবান, যাতে কমিউনিজমের প্রসার রোধ করতে সক্ষম হই। আমি মনে করি, একই সময়ে ইসরাইলকেও একই কারণে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া প্রয়োজন।

আমি লক্ষ্য করছি যে, আমাদের অনুসরণ করে ১৪টি রাষ্ট্র ইসরাইলকে বাস্তব স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। এটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। নিশ্চয়ই এটাও ছিল মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বেশ সহায়ক।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে আমি নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া তা অনুসরণ করে যেতে চাই ঃ

(ক) তাৎক্ষণিকভাবে ইসরাইলের প্রতি আমাদের আইনগত স্বীকৃতি প্রস্তুত করে তা ঘোষণা করে দিন।

(খ) বিস্তারিত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ইসরাইলকে ঋণদানের ব্যবস্থা নিন।

(গ) ইসরাইল জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে তাকে সাহায্য করার বাস্তব প্রক্রিয়া গ্রহণ করুন।

আমি এখন এখানে বসে আমাদের পক্ষ থেকে ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানের ঘোষণাটি প্রস্তুত করছি। আপনার মতামতের জন্য সহসা এটা আপনার নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঋণের বিষয়ে এবং জাতিসংঘে ইসরাইলের সদস্যপদ লাভে সম্মত করানোর ব্যাপারে কি সব বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছেন তা আমাকে অবশ্যই জানাবেন। হ্যারি ট্রুম্যান নাকাবের বিষয়টি দুটি কারণে ঝুলন্ত বিষয় ছিল ঃ

প্রথমত, বার্নাডট রিপোর্ট— যা তখন পর্যন্ত বিশ্বাঙ্গনে প্রস্তাবিত মানচিত্র ছিল— তা আরবদেরকেই নাকাব এলাকা দিয়ে জর্ডানের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছে।

দ্বিতীয়ত, নাকাব এ মুহূর্ত পর্যন্ত মিসরীয় বাহিনীর অধিকারে রয়েছে। এ বাহিনীটি 'বেত জুবরেন' (জর্ডানী রুটগুলোর সাথে যোগাযোগ রেখে) থেকে নিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় 'আল-মাজদাল' অঞ্চল পর্যন্ত লাইনে কাজ করছে। এদিকে ইসরাইল 'নাকাব' এলাকাটি আরবদের নিকট থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য সম্ভব সব কিছু করার জন্য প্রস্তুত ছিল, চাই সে এলাকাটি বাদশাহ আবদুল্লাহর প্রস্তাবিত প্রদেশ হোক বা তাতে মিসরী বাহিনী অবস্থান করুক। অথচ নাকাবই হচ্ছে ফিলিস্তিন, মিসরী বাহিনীর মূল কেন্দ্র। ১৯৪৮ সালের ৪ অক্টোবর ইসরাইলে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ম্যাকডোনাল্ড— যিনি ইহুদী রাষ্ট্রের ব্যাপারে খুবই উদ্যোগী একজন ছিলেন এবং তাঁকে

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচিত করেন— তিনি তেলআবিব থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করেন, সেখান থেকে তা হোয়াইট হাউসে চলে যায়। রিপোর্টটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

তারবার্তা নং ৪৪৮-১ বব/৫০১

(গোপনীয় ও অতিজরুরী)

প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে।

নোক্স যখন এখানে ছিলেন তখন ইসরাইলী নেতৃবৃন্দসহ তার সাথে সাক্ষাৎ করি (এই নোক্স হচ্ছেন আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী যাঁকে পরিস্থিতি মূল্যায়নে জরুরীভিত্তিতে তেলআবিব পাঠানো হয়েছিল)। তাদের মূল চিন্তা ছিল নাকাব এবং ভবিষ্যৎ এবং জর্ডানের সাথে তার সংযুক্তি। তাদের মতামত ছিল নিম্নরূপ ঃ

ইসরাইল হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী বন্ধু। এমন এক বন্ধু যে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পাশ্চাত্যের বন্ধু। তাকে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করেছিল। বন্ধুটি এখন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। কাজেই এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি ফলপ্রসূ লগ্নি বিবেচিত হতে পারে।

আরব রাষ্ট্রগুলোর সব ক'টিই বেশ দুর্বল। তাছাড়া এগুলোর নীতি সদা পরিবর্তনশীল। পাশ্চাত্য বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাদের বন্ধুত্বের প্রমাণ মেলা ভার। প্রমাণ থাকলে একটাই, তা হচ্ছে— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরবদের ভূমিকা। তবে তাও কিন্তু পাশ্চাত্যমুখী ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রের এমন কোন নীতিকে সমর্থন করা উচিত নয় যার ফলে 'নাকাব' অঞ্চলটি জর্ডানকে দিয়ে দিতে হয়। যদি যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের কোন নীতিতে জড়ায় তাহলেও সে আরবদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না, কিন্তু তা ইসরাইলের শক্তিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং এতে রাষ্ট্রটি হবে একটি ছোট্ট ও ঘিঞ্জি দেশ; সব সময়ই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাদের তিক্ত অনুভূতি কাজ করবে। যদিও ইসরাইলের নেতৃত্ব সব সময় নাকাবকে ইসরাইলের সাথে সংযুক্ত করার অনমনীয় মনোভাব পোষণ করে আসছে। তবুও বার্নাডট রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এটিকে জর্ডানের সাথে সংযুক্ত করার পক্ষে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত আসারও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মিসর বাহিনীর নাকাবে অবস্থান এক জ্বলন্ত বাস্তবতা– তাদের মোকাবিলা করতে হবে এবং পরিবর্তন করতে হবে অনুরূপভাবে। বেন গোরিয়ন নির্দেশ দিয়েছে যেন মিসরী বাহিনীকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে তা দখলের জন্য ইসরাইলী সামরিক শক্তিকে তথায় কেন্দ্রীভূত করা হয়।

ভৌগোলিকভাবে নাকাব অঞ্চলটি ছিল যেন একটি উল্টো ত্রিকোণ। তার মাথাটি নিচের দিকে দক্ষিণে 'ঈলাত'-এর ওপর ভর করে আছে। তার ভিত্তি হচ্ছে ওপরের

দিকে দুটি বাহু বিস্তার করে আছে— উত্তরে 'বেত জুবরেইন' ও 'আল-মুজদাল' এবং মধ্যখানে 'বেত জুবরেন' থেকে আল-মাজদালের পথটি কৌশলগত কেন্দ্রভূমির দিকে কেন্দ্রীভূত। এখানেই রয়েছে 'আল-ফালূজা' ও 'ইরাক-আল-মুনশিয়া' এবং 'ইরাক সুইদান'। এ অঞ্চলটি ছিল ষষ্ঠ পদাতিক ব্যাটালিয়নের দায়িত্বে। এর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এডমিরাল সাইয়্যেদ ত্বহা এবং পরিকল্পনা ও অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর ওয়ার স্টাফ মেজর জামাল আবদুল-নাসের।

এই কেন্দ্রভূমি (ইরাক-সুইডেন, ইরাক আল-মুনশিয়া ও ফালূজা)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ আগেভাগেই শুরু হয়ে যায়। ডেভিড বেন গোরিয়নের ডায়েরির উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে এই সব আক্রমণের কাসুন্দি। ঐ সময়কার রোজনামচার প্রতিটি পৃষ্ঠায় এই বিষয়টির উল্লেখ ছিল— কোন ব্যত্যয় ছাড়াই ঃ

১১ জুন, ১৯৪৮

অপারেশন ফ্রন্ট লাইনের খবর। 'ইরাক সুইডেন' থানায় আমাদের অক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে।

২৫ জুন, ১৯৪৮

নাকাবে মিসরী লাইনের দক্ষিণে জাতিসংঘের বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের কলোনীগুলোতে সাহায্য সরবরাহ নিয়ে যে বহরটি নাকাবে যাওয়ার কথা ছিল তাদেরকে মিসরী বাহিনী আসতে নিষেধ করেছে। —সাপ্লাই বহরটি তার ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। তাঁরা জানিয়েছেন যে, মিসরীরা এই বহরকে বাধা দিয়ে শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।

৪ জুলাই, ১৯৪৮

আমি ইয়েগাল ইয়াদীন-এর সাথে পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা সম্পর্কে মতবিনিময় করি। বোমারু বিমানগুলো রাতে ২০ হাজার ফুট উপরে থেকে কায়রোতে বোমা হামলা করবে। এরপর 'কুনাইতেরাহ্' ও দামেশকের উপর বোমা বর্ষণ করে হের্তুজেলিয়াতে অবতরণ করবে।

—এই সকল অপারেশন 'নাকাব'-এর স্বার্থে সহায়ক হবে। (পৃ. ৪৪৩)

২৮ জুলাই, ১৯৪৮

আজ রাতে দক্ষিণে 'গ্যাস' অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। এতে আল-ফালূজা ও ইরাক আল্ মুনশিয়াতে আক্রমণ চালানো হয়। এ অপারেশনের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। আমাদের বাহিনীর ৮ জন হত এবং অনেকে আহত হয়। শামউন আফিদান প্রস্তাব করেন যে, আজ রাতে আরেকটি আক্রমণ চালানো দরকার। তবে ফালূজার পূর্বের অংশে। আমি এটাকে সমর্থন করতে পারি না। কারণ এটা তো নাকাবের পথ নয়। তারা ফালূজাতে আবার আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করবে। (পৃ. ৪৮৪)

২ আগস্ট, ১৯৪৮

নাকাব বাহিনীর অধিনায়ক নাহুম সারেগ আমার কাছে এসেছিলেন। মিসরীরা গত ১০ দিন ধরে (৯-১৮ জুলাই) চেষ্টা চালিয়ে গেছে নাকাবকে চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দিতে। কিন্তু তারা সফল হয়নি। মিসরীরা প্রথম থেকেই কেবল নাকাবকে চায়নি, গোটা

—মিসরীরা নিঃসন্দেহে আমাদের মোকাবেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী। নাকাবে তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। তারা একক নেতৃত্বের অধীন কাজ করে। তাদের যোগাযোগ নেটওয়ার্কও বেশ ভাল। নাকাবে অবস্থিত আমাদের কলোনীগুলো বিরাট কষ্ট ও টেনশনের সম্মুখীন। (পৃ. ৪৮৭)

৬ অক্টোবর, ১৯৪৮

ফ্রন্ট লাইনের অধিনায়কদের সাথে জেনারেল স্টাফদের বৈঠক। আমি দক্ষিণের অবস্থানটি তুলে ধরলাম। জর্ডান, ইরাক ও সিরীয়দেরকে যুদ্ধের জন্য না ক্ষেপিয়ে মিসরীদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করার সম্ভাবনাকে ইয়াদীন নাকচ করে দেন। এটা করতে হলে আমাদের অনেক বড় বাহিনীর প্রয়োজন হবে।

—সন্ধ্যা। আজ আমরা সরকারে ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষণার পর থেকে নিয়ে সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বিস্তারিত আলোচনার পর সরকার আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে যে, মিসরী ফ্রন্টিয়ারদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য নাকাবকে জবরদখল করতে হবে। আমরা বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্কে জানিয়ে দেব যে, আমরা তার আরব বাহিনীর সাথে সংঘাতে যাব না সেও যেন আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। (পৃ. ৫৬৫)

৭ অক্টোবর, ১৯৪৮

আজ আমি ও জেকোব ডোরী এবং ইয়েগাল ইয়াদীন দক্ষিণের লড়াই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দক্ষিণে আমাদের সম্ভব সবচেয়ে বড় শক্তিতে আঘাত হানতে হবে। যাতে আমরা অল্প কয়েকদিনের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাস্তবায়ন করতে পারি। গোটা মিসরী বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দিতে হবে। (পৃ. ৫৬৬)

৮ অক্টোবর, ১৯৪৮

মোশে শার্তুক থেকে চারটি মূল্যবান প্রমাণ্য দলীল পাওয়া গেছে। (মোশে শার্তুক নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে যোগদানের জন্য এখন প্যারিসে রয়েছেন)। এর একটিতে রয়েছে ইল্ইয়াহু সাসুন-এর একটি পরিকল্পনা। এতে তিনি মিসরের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তির জন্য মিসরীদের কাছে প্রস্তাব দেন। মিসরীরা ইসরাইল ভূমির পশ্চিমাংশকে মিসরের সাথে সংযুক্ত করতে চায় দুটি উদ্দেশ্যে ঃ

১. ইসরাইলের সাথে কোন সশস্ত্র সংঘাতের সময় তারা তাদের মাটিতে নয়—ইসরাইলের ভূমিতেই যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবে।

২. নাকাবকে পূর্ব জর্ডানের সাথে না মিলিয়ে বা এটিকে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত না করে সমাধান বের করাও একটি উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, মিসরী সহকারী হাই

কমিশনার আবদুল মুনয়েম মোস্তফা যিনি সাসুনের সাথে যোগাযোগ রেখে থাকেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি বালাত-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হাসান ইউসুফের একটি তারবার্তা পেয়েছেন। এতে তিনি অনুরোধ করেন যেন ইল্ইয়াহু সাসুনের পরিকল্পনাটি জাতিসংঘে নিযুক্ত মিসরী ডেলিগেটের অধীন সামরিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের কাছে পেশ করেন। সহকারী সাহেব তিনজন উপদেষ্টার সাহায্য নিয়ে থাকেন। দুজন সামরিক, একজন রাজনৈতিক। মিসর নাকাবকে গাযার সাথে চায়। মিসর ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে যে কারণে ভয় করে তা হচ্ছে আঞ্চলিক সম্প্রসারণ— অর্থনৈতিক আধিপত্য — কমিউনিজমের প্রভাব বিস্তার।

—আমি এ মর্মে অনুরোধ জানিয়ে মোশে'কে তারবার্তা পঠিয়েছি যে, দেশের কোন অংশ মিসরের সাথে সংযুক্ত করার বিরোধিতা করা জরুরী। মিসর আমাদের পাশে সবচেয়ে বড় রাজ্য। আমাদের দেশে তার প্রবেশ আমাদের পুরো অস্তিত্বের জন্য বিপজ্জনক। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলগণ আমার সাথে একমত হয়েছেন। ৫৬৮ পৃ......

১৭ অক্টোবর, ১৯৪৮

গতকাল অপরাহ্নে তারা খবর দিল যে, শত্রুপক্ষ মর্টার শক্তি বৃদ্ধি করে ফালূজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইরাক আল্-মুনশিয়ার অভ্যন্তরে কয়েকটি ট্রাক প্রবেশ করেছে। মেজর জেনারেল উওয়াইদীদ আজ রাতে আল্ জলিল থেকে দক্ষিণে বের হয়েছেন। আক্রমণ অপারেশনের জন্য দু'টি ব্যাটালিয়নকে নির্দিষ্ট করা হবে। এ রাতই হবে সম্ভবত ফয়সালাকারী রজনী।

ইয়াকুব ডোরির সাথে বাবেয়ার ফ্রন্টিয়ারে গেলাম। আমরা প্রথমে ইয়েগাল আ-লোনের কমান্ড পরিদর্শন করলাম। আমরা এক সাথে শামউন আফিদানের কমান্ড এলাকায়ও গেলাম। এর পর সবাই মিলে ৮ম ব্রিগেডের কমান্ডার ইসহাক সাদিয়ার অফিসে গেলাম। এ ব্রিগেডটি ছিল উত্তর নাকাবের একটি আরব শস্যক্ষেত্র।

আক্রমণের সূচনায় আমরা ইরাক আল্ মুনশিয়ার সামনে ৪টি হোচেকস্ ট্যাঙ্ক খোয়ালাম। এতদ্সত্ত্বেও ব্যাটালিয়নের মনোবল অটল ছিল। আমি যেখানেই গিয়েছি একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি ঃ "আমাদের কাছে কতক্ষণ সময় আছে ?" ইয়েগাল আ-লোন মনে করেন, দক্ষিণের দায়িত্বটি সম্পন্ন করতে আমাদের দু'সপ্তাহ লাগবে। ইনফর্মারদের তথ্যসূত্রে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী লড়াইগুলোর পর মিসরীয়দের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। মিসরীয়রা এখন পরিখায় আশ্রয় নিয়ে সবখানেই উত্তম স্থানে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। তাদের কাছে প্রচুর মর্টার রয়েছে।

৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

ডঃ র‍্যালফ পাঞ্চ (বার্নাডট নিহত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী) এসেছিলেন। মিসর সরকারের প্রধানমন্ত্রী নাকাববাসীর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেন। আমি নাকাবের ওপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখি। আমি ব্যাখ্যা করে বোঝাই

যে, আমাদের জন্য লোহিত সাগরে বের হবার পথ হিসাবে নাকাবের মূল্য কত। আরবদের জন্য তো যথেষ্ট মরুভূমি রয়েছে। তাদের তো নাকাবের প্রয়োজন নেই। পাঞ্চ বেসরকারীভাবে বলেছেন যে, তিনি আমার অবস্থানটি বুঝতে পেরেছেন এবং তার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তার অবস্থানটি বেশ সমস্যাসঙ্কুল।

৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

ইলইয়াহু সাসুন প্যারিস থেকে ফিরেছেন। তাঁর কথা অনুযায়ী শান্তির কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রিয়াদ আস্-সুলহ (লেবাননের সরকার প্রধান, সুন্নী মুসলমান) আমাদের পক্ষে কাজ করতে প্রস্তুত। লেবাননের কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। আঞ্চলিক কোন উচ্চাভিলাষও নেই। কারণ যুদ্ধের বোঝা তাদের ওপর খুবই ভারি। কিন্তু তারা তা থেকে একলা বের হয়ে আসতে চায় না। এ জন্য তারা চায় যেন সবাই বের হয়ে আসে। রিয়াদুস সুলহের কোন উন্নতির সুযোগ নেই। লেবাননে একজন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ পদে তিনি পৌঁছে গেছেন, তাছাড়া লেবাননের বাইরেও তাঁর কোন আশা নেই। সিরিয়াতে এখন উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজমান। সেখানে কঠোর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিসরের অবস্থাও উত্তপ্ত। ইখওয়ানুল মুসলিম সংগঠনের তৎপরতা নিষিদ্ধ করে তাদের নেতাকে বন্দী করা হয়েছে। তাদের কিছু সদস্য ইসরাঈল ভূমিতে লড়াই করছে। নাকবাসীর পতন হলে নাহ্হাস পাশার নেতৃত্বে আল্-ওয়াফ্দ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘোষণা আসে যে, নাকবাসী হতাশ করেছে। এখন তাদেরকে ভুল শুধরে নিতে হবে এবং যথাযথভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।

আমি ইয়াফা থেকে ফিরে সাসুনের সাথে নতুন করে আলোচনা শুরু করলাম। আমরা গাযার ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। ভৌগোলিক যুক্তির নিরিখে 'গাযা' ইসরাইলের মধ্যেই থাকার কথা। বাদশাহ আবদুল্লাহকে সেখানে একটি উন্মুক্ত সমুদ্র বন্দর দেয়া যেতে পারে। সাসুন মনে করেন, মিসর এখন পূর্ব জর্ডানের সামরিক শক্তিকে ভয় করছে। সে তার পড়শী হতে চায় না।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মিসর কি ইসরাইলকে ভয় পায় না ? সাসুন জবাব দিলেন, ইংল্যান্ড কখনও গাযাকে এমনি ছেড়ে যাবে না। এবং আবদুল্লাহকে দিয়ে দেবে। অর্থাৎ নিজেকেই। কারণ সুয়েজ খাল কয়েক বছর পর মিসরের কাছে হস্তান্তরিত হবে। তাকে রিয়াদুস সুল্হ জানিয়েছেন যে, ব্রিটিশরা আরব রাষ্ট্রগুলোর কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দেয়ার অঙ্গীকার করেছে। আমি নাকাব থেকে মিসরীয়দের তাড়িয়ে দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ইয়েগাল ইয়াদীনের কাছে প্রস্তাব রাখি। এর কোন বিকল্প নেই। বাদশা আবদুল্লাহর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য সাসুনকে দায়িত্ব দিয়েছি।

॥ ৭॥

সাসুন!

"আপনার সাথে আলোচনা স্বাগত জানাই।"

— বাদশাহ্ আবদুল্লাহ, ডেভিড বেন গোরিয়নকে লেখা এক পত্রে

বেন গোরিয়নের চিন্তা চেতনায় তার পদক্ষেপের বিষয়টি ছিল সুসংহত। তিনি চাচ্ছিলেন মিসরীদের চরম আঘাত হেনে নাকাব ও ফিলিস্তিন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিতে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিঃশঙ্ক হতে চেয়েছিলেন। তারপরই তিনি তাঁর মহা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যার মাধ্যমে আশা করেছেন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। এতে কেবল যে বিভক্তি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট অংশেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন তা নয় বরং তার চেয়ে অনেক বিস্তৃত এলাকা পদানত করবেন, যেখানে ইসরাইলী বাহিনী পৌঁছে গেছে বা পৌঁছা সম্ভব।

মিসরীদের প্রতি চরম আঘাত হানার কারণ সম্পর্কে বলা যায়, তা তার দৃষ্টিভঙ্গিতে কয়েকটি কারণেই হচ্ছে ঃ

মিসর সেই যুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকেই ময়দানের প্রধান বাহিনী হয়ে আছে। এটা সত্য যে, তার বাহিনীর সাইজ অনুযায়ী ফিলিস্তিনে তাঁর সেনাদল ছিল না। কিন্তু ময়দানে মিসর অব্যাহতভাবে পড়ে থাকলে এক সময় তাকে আরও ব্যাপক প্রস্তুতি নিতেই হবে। যৌক্তিক দিক থেকেও তা সমর্থিত।

প্যারিসে তাঁর প্রতিনিধিদল বিশেষ করে সাসুন বাদশাহ ফারুক ও মিসর সরকারের সাথে যোগাযোগের সকল প্রচেষ্টা চালান সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক ফল লাভ হয়নি। কারণ আল মাজদাল থেকে বেত জুব্রেন পর্যন্ত মিসরী বাহিনী এখনও নিজ নিজ স্থানে অনড় অবস্থায় রয়েছে। তার বিরুদ্ধে ইরাক আল-মুনশিয়া, ইরাক সুইদান ও আল ফালূজার সব কয়টি লড়াই ব্যর্থ হয়েছে ফলত নাকাব যা তাঁর মতে যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার— তা এখনও মিসরের হাতেই রয়ে গেল। যখন প্যারিসে কূটনীতির মাধ্যমে সাম্প্রতিক ইরাক আল্ মুনশিয়া, ইরাক সুইদান ও আল্ ফালূজার যোদ্ধাদের বীরত্বের কিছু বিনিময় দিতে চাইল তখন মিসরের অবস্থান ছিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার এবং ফিলিস্তিনের অবস্থা খারাপের দিকে পতন হওয়ার পর বিষয়টিকে একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হিসাবে অনুভব করতে লাগল। ভাবতে লাগল যে, ভুল হোক শুদ্ধ হোক মিসরের ফ্রন্ট লাইনে তা সুধরে নেয়া সম্ভব। বিশেষ করে যখন নাকাব এখনও মিসরীদের আধিপত্যের ভিতর রয়েছে।

বেন গোরিয়নের অনুমান ছিল যে, মিসরকে পরাজিত করতে যদি এই চরম আঘাত সফল হয়ে যায়, তাহলে ইসরাঈলের সাথে মিসরের চুক্তি করা ছাড়া তার সামনে আর কিছুই থাকবে না। আর তা-ই যদি হয় তাহলে অবশিষ্ট আরব রাষ্ট্রগুলো তার সাথে যোগ দিবে। বরং এদের কেউ কেউ আগাম ইঙ্গিত পেলে তাদের আগেই এসে চুক্তি করবে।

কিন্তু সে সময় যে রেড সিগন্যালটি বেন গোরিয়নকে এহেন পরিস্থিতিতে ভাবিয়ে তুলেছিল তা ছিল এই যে, মিসর আরব লীগের বৈঠক শেষে ঘোষণা করল যে, "সকল ফিলিস্তিন জনসাধারণের" জন্য আরব সরকার প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচন করেন আহমদ হেলমী পাশাকে। এই প্রেসিডেন্ট তাঁর ফিলিস্তিনী মন্ত্রিসভা গঠন করে গাযাতে অস্থায়ী সদর দফতর স্থাপন করেন। যদিও বেন গোরিয়ন এ সরকারের অন্তঃসারশূন্যতাকে বুঝতে পেরেছিলেন তবুও নাকাবে মিসর বাহিনীর উপস্থিতির সাথে সাথে গাযায় এই সরকারের অব্যাহত থাকা হয়ত বা দুয়ে মিলে বর্তমান নাজুক সূতাগুলোকে শক্ত সুতায় পরিণত করে দিতে পারে। এমনকি কোন একদিন এটা হয়ে যেতে পারে প্রচণ্ড ও দুর্ভেদ্য। বেন গোরিয়ন এও জানতেন যে, ইহুদী রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা এখন আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট হয়ে তার চরম শিখরে রয়েছে।

তিনি স্বয়ং ছোট-বড় অনেক বিষয়েই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সমর্থনের খেই পরীক্ষা করে নিয়েছেন। এজন্য দেখা যায় যখন ইসরাইলীরা তার কাছে অভিযোগ করেছিল যে, নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী আমেরিকান প্রতিনিধিদল প্যারিসে আরব প্রতিনিধি দলগুলোর সাথে আলোচনা করছে— এর মধ্যে মিসরী প্রতিনিধিদলও রয়েছে। তাদের সাথে এমন ভাষায় কথা বলছে যার মধ্যে নতুন অবস্থানের সত্যগুলো পরিস্ফুট হচ্ছে না। তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর পরারাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট একটি প্রেসিডেন্সিয়াল নির্দেশ জারি করেন ঃ

প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আমাদের প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ প্যারিসে কোন প্রকার প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করছি এবং আমার অনুমতি ছাড়া যেন অন্যান্য প্রতিনিধিদলের সাথে কোন গোপন যোগাযোগ না করা হয়। আমি চাই, তারা তাদের যোগাযোগের সময় প্রকাশ্যে বা সরাসরি যা বলবে তাঁর সারবত্তা আমার অনুমোদনের জন্য পেশ করা হোক।

—স্বাক্ষর
হ্যারি এস ট্রুম্যান

একই সময় আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় বাদশাহ্ ফারুকের সাথে যোগাযোগ রাখাতেও বেন গোরিয়ন অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সকল যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তার প্রতি লক্ষ্য না করেই বেন গোরিয়ন এই মুহূর্তে মিসর-আমেরিকা বৈঠক হওয়াটাও চাচ্ছে না। কারণ এতে আমেরিকার উপর প্রভাব বিস্তারে আরব-ইসরাইল প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মোচন করবে। সে চায় আমেরিকার সাথে কেবল ইসরাঈলই সম্পর্ক রেখে যাবে।

বস্তুত বাদশাহ্ ফারুকের সাথে আমেরিকার যোগাযোগ ছিল একটি শূন্য বৃত্তে ঘূর্ণায়মান। মিসরে নিয়োজিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টগুলো পড়লে তাই মনে হয়। এর মধ্যে একটি রিপোর্ট ছিল তারবার্তা নং ৯৪৮-১১/ব ব ১০৫, তাং ৯ নভেম্বর, ১৯৪৮-এ। এটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

আমার বিশ্বাসের প্রেক্ষাপট ঃ

১. বর্তমানে বাদশাহ্ ফারুকই হলেন মিসরী নীতি নির্ধারণের একমাত্র পক্ষ।
২. যদি মিসর শান্তির পক্ষে ঝুঁকে তাহলে তার পিছে পিছে আরব রাষ্ট্রগুলোও তল্পি গুটিয়ে চলে যাবে।
৩. যদি নাকাব সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে মিসর সরকারের পতন ঘটবে এবং তা অনেক হতাশাব্যঞ্জক পরিণতি বয়ে নিয়ে আসবে।

এই প্রেক্ষাপটে আমি আমাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ সম্পর্কে আমার ধারণা সংক্ষেপে তুলে ধরছি ঃ আমার মনে হচ্ছে যে, নাকাব ইস্যুকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে এ সম্পর্কে বাদশাহ ফারুক সচেতন আছেন। তিনি এ থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছেন। আমার বিশ্বাস ইসরাইলী সরকারের সাথে সরাসরি আলোচনা তিনি করতে প্রস্তুত। আমাকে দায়িত্ব অর্পণ করলে আমি বাদশাহ্কে জানিয়ে দিতে প্রস্তুত যে, যুক্তরাষ্ট্র শান্তির প্রয়াসী। তাই সে তাকে সমস্যা সমাধানে পৌঁছার যে কোন পদক্ষেপে তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আমি খুবই কৃতার্থ হব যদি আমি এ দায়িত্ব পালনের জন্য আপনার নিকট থেকে নির্দেশনা পাই।

বাদশাহকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে আমি প্রস্তাব করছি, পূর্বের ন্যায় আমরা অবিলম্বে মিসর সরকারের সাথে একটি সহযোগিতা চুক্তিতে প্রবেশ করি, বিশেষ করে ফুলব্রাইট প্রোগ্রাম অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা তা করতে পারি। যখন মিসরের যুবকেরা কৃষি, প্রকৌশল ও প্রশাসন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাবে, তখন তারা পরবর্তীতে কেবল তাদের দেশেরই সেবা করবে না বরং তারাই হবে তাদের দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীর দৃঢ়মূল ভিত্তি।

এরপর আমরা কোন এক সময় মিসরী সেনা অফিসারদেরকে আমেরিকান বাহিনীর স্কুলগুলোতে কিছু প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানের বিষয়টি ভেবে দেখতে পারি। এ

বিষয়টিকে বাদশাহ্ ফারুক বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আমি বাদশাহ্র চাচাতো ভাই ও যুবরাজ আমীর মুহম্মদ আলীর সাথে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। গত শনিবারে আমাদের আলোচনায় তিনি তিনটি জরুরী শর্তের ওপর জোর দেন ঃ

১. আল্ কুদ্সকে হস্তান্তর

২. ইসরাইল রাষ্ট্র থেকে কিছু সংখ্যক রুশ কমিউনিস্ট ইহুদীকে বহিষ্কার করা। কারণ তারা ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্য যেমন আপদ, তেমনি আরবদের জন্যও বিপজ্জনক।

৩. যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রস্তাবিত আঞ্চলিক সীমার গ্যারান্টি।

আমি যুবরাজকে বলেছি, কোন গ্যারান্টি দেয়ার বিষয়টি আমাদের হাতে নেই। এ অধিকার কেবল জাতিসংঘের রয়েছে। যদি সে ব্যর্থ হয়, আমরা সবাই ব্যর্থ। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানকার সবাই চায় যে, যে কোন সমাধানে আমেরিকান সিল মারা দরকার। এ পয়েন্টগুলোই বেন গোরিয়ন হিসাবে রেখেছিলেন, যখন তিনি মিসরের প্রতি চরম আঘাত হানার পরিকল্পনা করছিলেন।

আর বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্র ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার প্রতি তার আগ্রহের কারণ সুস্পষ্ট। তা হচ্ছে, বেন গোরিয়ন ভয় করছেন যে, মিসরের সাথে যখন বড় ধরনের সংঘর্ষ বেঁধে যাবে তখন সাধারণ আরব জনমত সহজেই তার পক্ষে যাবে। হয়ত এ কারণে বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্র প্রতি এমন চাপ আসবে যে, তিনি তাঁর মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন না। ফলে তিনি তাঁর বাহিনীকে মিসরের ভার লাঘবে কাজে লাগাতে বাধ্য হবেন। এমনকি বাদশাহ্ যদি নাও চান সেক্ষেত্রেও ইসরাইলকে সতর্ক থাকতে হবে যে, যে কোন সময় বাদশাহ্ তাঁর বাহিনীকে নিয়ে ঢুকে পড়তে পারেন। এতে ইসরাইলী বাহিনী দু'টি যুদ্ধ ময়দানকে মোকাবিলা করতে হবে।

ইসরাইল জানে, বাদশাহ্ এ ধরনের পরিস্থিতিতে পৌঁছতে চান না। এ ক্ষেত্রে ইসরাইল তাকে সাহায্য করে যাবে যাতে তিনি অপেক্ষার ভূমিকায় থাকতে পারেন। যদি এটা আবদুল্লাহর জন্য সম্ভব হয় তাহলে ইসরাইলী কমান্ডের সাধারণ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে কেবল কিছু রিজার্ভ ফোর্স রেখে দিলেই চলবে। চাই বাদশাহ্ এন্তেজার করতে পারুক, আর না-ই পারুক। এর অর্থ হচ্ছে, ইসরাঈল হাত উজাড় করে সকল শক্তিকে কেবল তার কাঙ্ক্ষিত চরম আঘাতই ব্যবহার করবে না। হ্যাঁ, যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে নিশ্চিত হয় তাহলে ভিন্ন কথা। এ কারণেই বেন গোরিয়ন সে সময় ইলইয়াহু সাসুনকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেন বাদশাহ্ আবদুল্লাহর সাথে নতুন করে যোগাযোগ শুরু করে।

বাদশাহ্ আবদুল্লাহ তাঁর ভূমিকার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এবার আরেক নতুন কারণে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন, তা হচ্ছে ফিলিস্তিনের জাতীয় সরকার গঠন করে

তার সদর দফতর গাযায় স্থাপন। একে প্রতিহত করার জন্য তিনি ফিলিস্তিনের শহরগুলো থেকে তাঁর কিছু অনুগত লোক নিয়ে আরিহা'য় এক সম্মেলনের ডাক দিলেন। সেখানেই জর্ডানের উভয় তীরে তাকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নেয়ার অঙ্গীকার (বয়াত) নেয়া হয়। পূর্ব তীরে তো তার মূল আমিরাত ছিলই, এর ওপর পশ্চিম তীরের বাকি ফিলিস্তিনকেও যোগ করলেন।

এদিকে মিসর আবদুল্লাহ্‌র এই উভয় তীরের অঙ্গীকার গ্রহণের চিন্তাকে নিন্দা করে ব্যাপক মিডিয়া হামলা চালায়। এতে তিনি যথেষ্ট কোণঠাসা হয়ে যান। তাদের মতে, আবদুল্লাহ পশ্চিম তীরকে তার রাজ্যে সংযুক্ত করাতে ইসরাইলের প্রত্যাশিত ফিলিস্তিন বিভাজনই ঘটেছে। বরং বিভক্তি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীমায়িত আরব রাষ্ট্রটিও খণ্ডিত হয়ে গেল। সাসুন এবার তাঁর প্রথম পদক্ষেপ নিলেন। এ সম্পর্কে আল-কুদ্‌স এলাকার জর্ডানী কমান্ডার মেজর জেনারেল আবদুল্লাহ্ আত্-তেল্ল লেখেন ঃ

১০/১২/৯৮ তারিখে শুক্রবার অপরাহ্ন চারটার সময় আন্তর্জাতিক শান্তি পর্যবেক্ষক প্রধান টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন— কর্নেল ডায়ান আল্-হারাম এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার সাক্ষাৎ চান।

তখন আমি বৈঠকের জন্য নির্ধরিত স্থান 'বাব-আল-খলীল' এলাকার দিকে রওনা হই। যখন আমি সেখানে পৌঁছি, দেখি ডায়না অপেক্ষা করছেন; তাঁর সাথে রয়েছে সে এলাকার নিয়োজিত একজন পর্যবেক্ষক। ডায়না এগিয়ে এসে বললেন যে, তিনি একজন বড় ইহুদী ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে মহামান্য বাদশাহ্ বরাবর একখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পত্র নিয়ে এসেছেন। তখন আমি তাঁর কাছ থেকে পত্রটি গ্রহণ করলাম এবং অঙ্গীকার করলাম যে, পত্রটি নিরাপদে বাদশাহ্‌র নিকট পৌঁছাব। তিনি আবারও পত্রটির গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দিয়ে বলেন যে, স্বয়ং বাদশাহ্ ছাড়া এ পত্র যেন কেউ না খোলে। এরপর আমরা যে যার পথে চলে আসি। কিন্তু আমি নিকটতম আলোর পয়েন্টে পৌঁছার সাথে সাথে পত্রটিতে কি আছে জানার জন্য প্রচণ্ড অন্তরতাড়া অনুভব করলাম। কারণ আমি বিভিন্ন বিষয়ের গতি-প্রকৃতি দেখে বাদশাহ্ আবদুল্লাহর নিয়ত নিয়ে এমনিতেই সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম। তাই পরিণতির দিকে তোয়াক্কা না করেই পত্রটি খুলে ফেললাম। এর সিলিং ওয়াক্স (মোহরের সূতা) আমার সহযাত্রী রইস কুসাইয়্যেম মুহাম্মদের সামনেই খুললাম। পত্রটি সাসুনের নিজ হাতে আরবি ভাষায় লেখা। তিনি এ ভাষা ভালই রপ্ত করেছিলেন। এর ভাষ্য ছিল এ রকম ঃ

আমার মহান মান্যবর!
যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক,
আশা করি মহোদয় সুস্থ আছেন,
আল্লাহ তা'আলা তা অটুট রাখুন।

মহোদয়!

আমি আজ প্যারিস থেকে আল-কুদসে ফিরেছি খুবই স্বল্প সময়ের জন্য— শুধুমাত্র আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য, যদি আপনি অনুগ্রহ করে সে নির্দেশ দেন। আমি জটিল বিষয়গুলোর সমাধানে সহযোগিতা করতে চাই এবং আপনার ও আমাদের প্রিয় এই দেশে প্রত্যাশিত শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাই। এহেন পরিস্থিতিতে আমার সাক্ষাৎ ও আলোচনার জন্য আপনার একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাবার জন্য অনুরোধ করছি। যে লোকটি বন্ধু শওকত পাশাকে সাথে নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয় (ইনি বাদশাহ আবদুল্লাহ্র ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং ইসরাইলীদের প্রতি বহুবার তার দূত) এবং সে ব্যক্তি যৌথ ইস্যুর ব্যাপার আন্তরিক একজন হওয়া প্রয়োজন।

আশা করছি সে ব্যক্তি যথাসম্ভব শীঘ্রই এসে পৌঁছবেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে শনিবার সকালে হলে খুব ভাল হয়, কারণ আমার সময় খুবই কম এবং আমাকে যথাশীঘ্র সম্ভব প্যারিসে ফিরে যেতে হবে। যাক, আমি আশা করছি পরিস্থিতি অনুকূল হলে আমি কোন এক সুবর্ণ সুযোগে মহামান্যের দরবারে গিয়ে সাক্ষাৎ করব। ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করছি, যে ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে আসছেন তিনি সকল ব্যাপারে মহোদয়ের অনেক মন্তব্য ও মতামত সহকারে আসবেন যাতে তার আলোকে আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মহান প্রভু আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

আপনার বিশ্বস্ত
ইলইয়াস সাসুন
আল-কুদ্স
শুক্রবার, ১০/২/১৯৪৮

(লক্ষণীয় ইলইয়াহু সাসুন বাদশাহর সাথে যোগাযোগের সময় 'ইলইয়াস সাসুন' লিখতেন। কারণ এটি একজন নবীর নাম যা আরবিতে 'ইলইয়াস'। সম্ভবত একটু ঘনিষ্ঠতা দেখানোর জন্যই তা করতেন) জেনারেল আবদুল্লাহ তেল্ল তাঁর উপাখ্যান শেষ করেন এভাবে ঃ

"আমি ১১/১২/১৯৪৮ ইং তারিখে শনিবার সাত সকালে 'শোনার' উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম এবং ঠিক আটটার সময় মাহামান্য বাদশাহর সাথে বৈঠকে বসলাম। পত্রটিকে নতুন খামে পুরে পোস্টাল লাল মোহর লগিয়ে রেখেছিলাম। এখন তাঁর হাতে তুলে দিলাম। পত্রটি পাঠ শুরু করতেই বাদশাহর কপালের বলি রেখাগুলো যেন হেসে উঠল, গোটা আবয়ব খুশিতে ঝলমল করে উঠল। তারপর পত্রটি আমাকে পড়তে দিলেন। এরপর তিনি একটু সময়ের জন্য বাইরে গিয়ে তাঁর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার শওকত সাতিকে সাথে নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি চিঠিখানা ভাঁজ করে এক কথায় বললেন—

"পাশা ! আল কুদ্‌স গিয়ে সাসুনের সাথে সমঝোতার জন্য তার সাথে দেখা করুন....। আবদুল্লাহ বেগ (জেনারেল আবদুল্লাহ আত-তেল্ল স্বয়ং) আপনাকে টেকনিক্যাল বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।"এরপর একটি সাদা কাগজ নিয়ে আসার জন্য ডেকে পাঠালেন এবং সাসুন পৌঁছাবার জন্য ডাক্তারকে ডিকটেশন দিতে লাগলেন ঃ আপনার সাথে আলোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই।

জেনে রাখুন, যে কোন একক আলোচনা যদি ফলপ্রসূ না হয়, সেটা পরিণতিতে আরব দিক থেকে অনেক দুর্দশা বয়ে নিয়ে আসবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগুলোর দিক থেকে, যা আপনার ধারণারও বাইরে। আরিহা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে।

(এ সিদ্ধান্তের আলোকে তাকে পূর্ব জর্ডান ও পশ্চিম তীরের বাদশাহ হিসাবে অভিষেক করার কথা।)

সাক্ষাৎ হলো। এ সাক্ষাতের পুনরাবৃত্তিও হলো। কারণ সাসুন বাদশাহর পত্রটি প্রথম পাঠের পরই মত দিলেন যে, তিনি তেলআবিবে বেন গোরিয়নের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবেন।

দ্বিতীয় সাক্ষাতে এবার সাসুন ডিকটেশন দিচ্ছেন, ডাক্তার শওকত সাতি লিখেছেন। এখানে বেন গোরিয়ন বাদশাহর চিঠির জবাব দিচ্ছেন। জবাবটি ছিল নিম্নরূপ (বেন গোরিয়নের উদ্ধৃতিতে সাসুনের জবানীতে) ঃ "ডেভিড বেন গোরিয়ন ও মোশে শার্তুক-এর পক্ষ থেকে মহামান্য বাদাশাহর প্রতি শুভেচ্ছা।"

শুভেচ্ছা শেষেই জবাবের পয়েন্টগুলোর শুরু ঃ

১. যদি আমাদের মহামান্য মহোদয় আরিহা সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে আগ্রহী হন, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমাদের ধারণা এগুলো যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়নই হবে উত্তম। যাতে বাস্তবতার সামনে এর বন্ধু ও দুশমনদের দাঁড় করিয়ে দেয়া সম্ভব হয়। এই বাস্তবতার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলো গুরুত্ব আরোপ করছে, তা আমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখেছি।

২. এ সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে আমরা আশা করব যে, ইহুদী পক্ষকে এর ভালমন্দে জড়াবে না। এটা বলাই যথেষ্ট হবে যে, তিনি যতদূর সম্ভব উদ্ধার করতে চান এবং ফিলিস্তিনী আরব জাতির মধ্যে সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে চান।

৩. বাদশাহর নির্দেশে সাসুন বেন গোরিয়নকে লেখা চিঠিতে আরও বলেছিলেন ঃ মহোদয়কে পরামর্শ দেব যে, আনুষ্ঠানিক দীর্ঘ শান্তি অবস্থাকে তিনি স্থায়ী শান্তি হিসাবে ঘোষণা দেবেন। এটা তাঁর বাহিনীকে সব ময়দান থেকে প্রত্যাহারে সহায়ক হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো ব্যবহারে সক্ষম হবেন।

৪. যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে এই যুদ্ধবিরতি বা শান্তি ঘোষণা দিতে সমস্যা হবে বলে মনে করেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের সাথে গোপন চুক্তি করতে পারেন। এক্ষেত্রে আমরা তাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, তার সকল ফ্রন্টের কেন্দ্রগুলোতে আমরা কোন ক্ষতিসাধন করব না। আলোচনায় শেষ পর্যন্ত আমরা এটিকে যথাযথ সম্মান দেখাব, এমনকি এতে যদি দীর্ঘ কয়েক মাসও লেগে যায়।

৫. আমরা মহোদয়কে পরামর্শ দেব, তিনি যেন সীমান্ত থেকে সকল ইরাকী বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এদের স্থলে জর্ডানী বাহিনীকে কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি যদি তা করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমরা এসব এলাকার কোন মন্দ স্পর্শ করব না। অন্তত আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তবে যদি ইরাকী বাহিনী তার কেন্দ্রগুলোতে থেকে যায় তাহলে আমরা আশঙ্কা করছি কোন একদিন এর সাথে আমাদের সংঘর্ষ লেগে যেতে পারে।

৬. মহোদয়কে পরামর্শ দেব, তিনি যেন দক্ষিণ আল-কুদ্স ও আল খালীল (নাকবে অঞ্চল) থেকে মিসরী বাহিনী প্রত্যাহারে তার চেষ্টা চালান। এতে এ বাহিনীর অবস্থানের কারণে যে কোন সময় রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাঁচা যাবে।

৭. মহোদয়কে পরামর্শ দেব যেন, আমাদের মধ্যকার বিষয়গুলোর মধ্যস্থতা করার ব্যাপারে বিদেশীদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেন। বরং আমাদের মধ্যকার সরাসরি আলোচনাকে প্রাধান্য দেন। কারণ এটা আমাদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বেশি ফলপ্রসূ।

যদি মহোদয় উপরোক্ত সাতটি পয়েন্টে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমরা বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রপাগাণ্ডা করে আরিহা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পক্ষে জনমত গড়ে তুলব।

সাসুন প্রেরিত প্রস্তাবগুলো বাদশাহ্ অনুমোদন করেন। শোনাহ্'তে তাঁর ও সাসুনের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। সেখানে 'আমাদের কানা বন্ধু'ও উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ্ আবদুল্লাহ মোশে দায়ানকে এ বিশেষণেই উল্লেখ করতেন।

বেন গোরিয়ন আস্থাবান ছিলেন যে, মিসরকে চরম আঘাত হানার সুবর্ণ মুহূর্ত এসে গেছে। পরিস্থিতি মূল্যায়নে তার হিসাব-নিকাশে সামরিক দিকের সাথে রাজনৈতিক দিকটিও অনুকূলে আছে। তার আন্দাজ ছিল যে, মিসর এখন অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে। এ সময় প্রচণ্ড আকস্মিক আঘাতের মুখে অসহায় হয়ে পড়বে এবং তার সিদ্ধান্ত থাকবে অকার্যকর। তিনি কমান্ডারদের বৈঠকে এর কারণগুলো উল্লেখ করেন।

সেখানে তিনি 'ইখওয়ানুল মুসলিম দলে'র কর্মতৎপরতায় উদ্বুদ্ধ ক্রমবর্ধমান টেনশনের ইঙ্গিত করেন। এ ছাড়া কয়েক মাস পূর্বেকার পুলিশ ধর্মঘটের কারণে একটি চাপা সংশয় বিরাজমান। ইসরাইলী বাহিনীর অপারেশন ও গোলন্দাজিতে উচ্চ ক্ষমতার মোকাবেলায় মিসরীয় বাহিনীর মধ্যে সাধারণ হতবল অবস্থা বিরাজমান। এ ছাড়া মিসরের জনসাধারণের অধিকাংশের মধ্যে একটি তিক্ত অনুভূতি ছড়িয়ে আছে। উপাখ্যানের বাকি অংশ বেন গোরিয়নের ডায়েরী থেকে পূর্ণ করা যেতে পারে ঃ

২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

অপরাহ্ন চারটায় নাকাবে এ অপারেশন হোরিফ (মুক্তি) শুরু হবে। বিমানবাহিনী গাজা, খান ইউনুস ও আরিশ-এ আক্রমণ করবে। নেভাল ফোর্স গাজা ও খান ইউনুসে গোলাবর্ষণ করবে। পদাতিক বাহিনী ভোরে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে গাজা লাইনে কাউন্টার আক্রমণ করবে। দক্ষিণে আসল আক্রমণ শুরু হবে ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার।

জেনারেল র‍্যালি (সিনিয়র শান্তি পর্যবেক্ষক)— শাল্‌ওয়াহকে জানিয়েছেন যে, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসরীরা শান্তি আলোচনায় বসবে না। র‍্যালির জবাবে কিছু নির্দেশনা জারি করেছি যে, এ অবস্থায় সরকার নিজের প্রতিরক্ষা ও শান্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

শুক্রবার, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

আমি অপারেশন বিভাগে গিয়ে ফ্রন্টলাইনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলাম। আমাকে জানানো হলো যে, ইয়েগাল ইয়াদীন 'বীরে সাব্‌আ'র দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে। দক্ষিণে ফ্রন্টের কমান্ডের সাথে টেলিফোনে আলাপ করলাম যেন তারা পথে অপেক্ষা করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।

তাদেরকে বললাম, 'অপারেশন হোরিফ' বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবরুদ্ধ মিসরী পকেটকে ফালূজাতে ধরাশায়ী করতে হবে। তারা আত্মসমর্পণ করা পর্যন্ত ফালূজাতে বেরহম গোলাবর্ষণ করতে হবে।

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

নির্দেশনা অনুযায়ী ফালূজার সামনে ৮টি ৬ ইঞ্চি মর্টার, ৮টি ১২০ মি.মি. মর্টার, ৪টি ৭৫ মি.মি. মর্টার, একটি ১০৫ মি.মি. মর্টার, ৫০ মি.মি-এর একটি এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মর্টার, ৬৫ মি.মি.-এর ৪টি মর্টার এবং অতিরিক্ত আরও ১৬টি মর্টার গতকাল এসে পৌঁছেছে (কেবল গতকাল কেন এলো ?)। গোলাবর্ষণ শুরু হলো। আলেকজান্দ্রা কমান্ডে তৃতীয় ব্রিগেড যত অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব কাজে লাগানো হয়েছে। ফালূজার ওপর তিনবার বিমান আক্রমণ চালানো হয়েছে। নৌবহর এ্যাকশন চালিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র থেকে গাজা ওরেফহাকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করেছে। পোর্ট সাঈদ পর্যন্ত অনুসন্ধানী ট্রিপ দিয়ে এসেছে।

সোমবার, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪

অপরাহ্ন ৪টার সময় অপারেশন শাখা থেকে খবর পৌঁছল যে, এওয়াজা আমাদের হাতে চলে এসেছে। আল এওয়াজার বিরে আসলুজ রোডও প্রায় আমাদের দখলে। তারা বিশ্বাস করছে যে, সন্ধ্যা নাগাদ পুরোটাই আমাদের দখলে চলে আসবে।

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

তারা আমাদের জানাচ্ছে যে, ইরাক আল মুনশিয়া আমাদের দখলে এসে গেছে। কিন্তু ফালূজার মিসরীরা চাপ সৃষ্টি করছে। দশটা বিশ মিনিটের সময় জানানো হলো যে, আমাদের বিমানগুলো ঘণ্টাখানেক আগে ফালূজাতে আক্রমণ শানিয়েছে।

পূর্ব ফ্রন্টের কমান্ডার শ্লোমো শামির হাজির হলেন। ইরাকী কিছু ইউনিটের পক্ষ থেকে তাঁর ফ্রন্টের ওপর কিছু কিছু হামলা হয়েছে। আমি তাদেরকে বলছি দক্ষিণে অপারেশন শুরু না হলে তারা যেন অবশ্যই তাদের কামনা-বাসনাকে সংযত রাখে। আমাদের সিদ্ধান্তের বাইরে অন্য কোন লড়াইয়ে আদৌ জড়াব না। ফালূজার পতন ঘটলে গাজার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

ঈগল আল্লোন আমাকে জানালেন যে, দক্ষিণে পরিস্থিতি বেশ ভাল। মিসরী বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন। আল-কাসীমাতে কিছু ফোর্স রয়েছে। তবে তাদের সংগঠিত হতে বেশ সময় লেগে যাবে। উত্তর গাজা থেকে আরীশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় সুশৃঙ্খল সাতটি ব্যাটালিয়ন রয়েছে। এর মধ্যে ১২ ব্যাটালিয়নও আছে। এটি মিসর থেকে আসা নতুন ব্যাটালিয়ন।

১৯৪৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সকালে মিসরী ফ্রন্ট অতিশয় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়। ইসরাইলী বাহিনীর এ্যাটাকিং ফোর্স ঈগল আল্লোনের কমান্ডে কাসীমা থেকে মিসরী সীমান্তের অভ্যন্তরে দ্রুত ঢুকে পড়ে। আরীশ বিমানবন্দরের অভিমুখেই যাচ্ছিল। এতে করে গাজা উপত্যকায় মিসর বাহিনীর প্রধান শক্তি তার হেডকোয়ার্টার ও আরীশ রিফহায় অবস্থিত রিজার্ভ ফোর্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

অবস্থাটা কেবল বিপজ্জনকই ছিল না, বরং এটা ছিল অপমানজনকও বটে। কারণ বেন গোরিয়ন মিসর আক্রমণের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। বাদশাহ ফারুকের অস্থিরতা তখন চরমে। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তাঁকে অনুরোধ করেন যাতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট তার এ আহ্বান পৌঁছে দেন যে, মিসর ভূমির অভ্যন্তরে ইসরাইলী বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে ঠেকানোর জন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করেন।

এরপর বাদশাহ ফারুক ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত রোনাল্ড ক্যাম্পবেলকে ডেকে তাঁর কাছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটার্নী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেস্ট বেফেনের কাছে লেখা

পত্র হস্তান্তর করেন। আমেরিকান ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতগণ তাদের দূতাবাসে ফিরতে না ফিরতেই তাদেরকে আবার প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ডেকে পাঠানো হলো। এরপর উভয়কে লেঃ জেনারেল মুহাম্মদ হায়দর পাশা (সমর মন্ত্রী) ডেকে পাঠালেন।

এ পরিস্থিতির সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ দিকটি ছিল এই যে, তখন মিসরী নেতৃত্ব— চাই তা রাজপ্রাসাদেই হোক বা প্রধানমন্ত্রীর অফিস অথবা সমর মন্ত্রণালয়ে তা ছিল খুবই আত্মকেন্দ্রিক।

মিসরী প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের বৈঠকের সময় সবচেয়ে বিব্রতকর মুহূর্ত ছিল যখন প্রধানমন্ত্রী একটু সময়ের জন্য স্মৃতি বিভ্রমে পড়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন, "আপনাদেরকে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করতে হবে।" সাথে সাথে ব্রিটিশ দূত বললেন, আমি কি এর অর্থ এটা বুঝব যে, আপনারা ১৯৩৬ সালে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে যৌথ প্রতিরক্ষার ধারাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান ? এবার প্রধানমন্ত্রী চেতনা ফিরে পেলেন, তিনি এমন এক নিষিদ্ধ কূপে পা ফসকে পড়তে যাচ্ছিলেন যাতে বিগত তিনটি বছর ধরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সকল অর্জন ভেস্তে যেতে বসেছিল।

যদিও প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ দূতের এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি তবুও ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত একটি সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি তাঁর সরকারকে তাঁর ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচিত বিষয় জানিয়ে লিখলেন এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের সকল মৌলিক বিবেচ্য বিষয়গুলোকে বাদ দিলেও এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, মিসর একটি শিক্ষা পেয়েছে যে, সে একা তার প্রতিরক্ষায় সক্ষম নয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটর্নী প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট ব্যক্তিগত পত্র লিখে পাঠান। এর মধ্যে কায়রোস্থ রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টটিও ছিল। এ পত্রে তিনি ইঙ্গিত করেন যে, মিসরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বাগে আনার একটি মোক্ষম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ইসরাইলে নিযুক্ত তার রাষ্ট্রদূতের নিকট একটি তারবার্তা প্রেরণ করে।

"জরুরী ও অতীব গোপনীয়"

ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ইসরাইলে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত ম্যাকডোনাল্ড -এর প্রতি।

ওয়াশিংটন, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অনুরোধ করছেন যে, আপনি মিস্টার বেন গোরিয়ন ও মিস্টার শার্তুকের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাৎ করে তাদের উভয়কে জানিয়ে দেবেন যে, আপনি আমার পক্ষে কথা বলছেন এবং আপনি ভাল মনে করলে এই বার্তা প্রেসিডেন্ট ওয়াইজম্যানের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।

১. আমেরিকার সরকার এই মর্মে কিছু সঠিক প্রতিবেদন পাওয়ার পর উদ্বিগ্ন হয়েছেন যে, ইসরাইলী সামরিক বাহিনী মিসর ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে। রিপোর্টে এও জানা যায় যে, ইসরাইলী সামরিক বাহিনী ভুল করে ঢুকে পড়েনি বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত সামরিক এ্যাকশন।

২. ব্রিটিশ সরকার আমাদের জানিয়েছে যে, তিনি অতিশয় উদ্বেগের সাথে পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখছেন। যদি ইসরাইল বাহিনী মিসরের ভূখণ্ড থেকে ফিরে না যায়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার মিসরের সাথে ১৯৩৬ সালে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। তবে ব্রিটিশ সরকার বলেছে যে, ইসরাইল যদি পরিস্থিতি ঘোলাটে করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে তবে তার বিরুদ্ধে কোন সংঘাতে যাওয়ার ইচ্ছা তার নেই।

৩. মনে রাখবেন যে, যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যে অস্থায়ী ইসরাইল সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এবং যুক্তরাষ্ট্রই তাকে 'শান্তিপ্রিয় দেশ' পরিচয়ে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

৪. মিসর ভূমি থেকে ইসরাইল বাহিনীর তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার এ মুহূর্তে প্রত্যাশিত এবং এটা অস্থায়ী ইসরাইল সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ হবে।....

বেন গোরিয়ন সর্বশেষ যে জিনিসটি চাইলেন তা হচ্ছে— তার ও আমেরিকানদের মধ্যে একটা মতবিরোধ পয়দা হোক। এভাবেই তিনি লড়াইয়ের ময়দান পরিদর্শন থেকে ফিরে এসে সরকারের একটি জরুরী মিটিং ডাকলেন। এরপর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ডেভিড বেন গোরিয়ান তাঁর দিনপঞ্জিকায় লিখছেন ঃ

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

মোশে শার্তুক আমার সাথে যোগাযোগ করল। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ম্যাকডোনাল্ড কিছু নির্দেশনা নিয়ে যে কোন স্থানে আমার সাথে দেখা করতে চান। তাঁকে এখানে ডাকলাম। আমি পত্রের ভাষা ও ভঙ্গির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমি বললাম, এটা আমাকে পীড়া দিচ্ছে। এই ভাষায় কেবল বেফেন নিজেই লেখা সম্ভব। তারপর আমি তাঁকে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলো তুলে ধরলাম।

১. আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার জন্য অকৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমরা হচ্ছি মধ্যপ্রাচ্য বা অন্য যে কোন স্থানে শান্তি নষ্ট করার প্রতি আগ্রহী বিশ্বের সর্বশেষ জাতি (অর্থাৎ, যদি কখনও শান্তি নষ্ট করি তাহলে পৃথিবীর সকল জাতির শেষেই করব) আমরা ছোট্ট একটি জাতি, শান্তি ছাড়া আমাদের টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হব না। আমরা যা করছি তা একান্তই নিজেকে রক্ষা ছাড়া কিছুই নয়। আমি মিসর ভূমি থেকে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি।

রাষ্ট্রদূত আমাকে ব্যাখা করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত এগিয়ে এসেছে, যাতে নিরাপত্তা পরিষদে কোন সিরিয়াস এ্যাকশনের সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়াতে পারে। এছাড়াও ব্রিটিশরা কোন কিছু করার চিন্তা করার আগেই কিছু করা দরকার, বিশেষ করে তারা কমপক্ষে মিসরীদের অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিতে বাধ্য হতে পারে, যদি তারা পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালের চুক্তির স্থলে নতুন কিছু বিন্যাস ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে রাজি হয়।

দক্ষিণের অপারেশন কমান্ডার আ-লোন জানালেন যে, আরীশ ছেড়ে আসার আগে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে হবে এবং গাজা ও ফালূজার ঐ পকেটটির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। রেফহাতে প্রায় ১০০ মিসরী নিহত হয়েছে, আহতের সংখ্যা প্রায় দু'শ। এছাড়াও রয়েছে ৬০০ বন্দী, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রায় পঁচিশজন অফিসার।

আ-লোন সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য দু'দিন সময় চাচ্ছেন। যাতে রাস্তার দুধারের সকল ক্ষেত খামার এবং আরীশের সম্ভব সব কিছু ধ্বংস করে আসা যায়।

ফালূজার অবরুদ্ধ শক্তি পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে তাদের ওপর বিমান আক্রমণ করা হয়েছে।

মিসরী বাহিনীর সাথে সর্বোচ্চ দৃঢ়তা ও নৃশংসতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। যাতে এমন শিক্ষা পায় যা কোনদিনও না ভুলে। এরপর আর কোনদিন শত্রুকে ঘায়েল করতে ইসরাইলী শক্তি ও সামর্থ্যকে হালকা করে দেখবে না।

৬ জানুয়ারি, ১৯৪৯

গত পরশু কায়রো থেকে নিউইয়র্কে প্রেরিত একটি বিবৃতি হস্তগত হলো। এটি ৪ জানুয়ারি অপরাহ্নে প্রেরিত হয়েছিল। এটি হাইফার জাতিসংঘ অফিসে পাঠানো হয়। এতে বলা হয় ঃ

৫ জানুয়ারি, গ্রীনিচ মান ১৪০০ টার সময় সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ বন্ধ কার্যকর হওয়ার পর মিসর সরকার তার রাষ্ট্রদূতগণের কাছে এ নির্দেশনা জারি করতে প্রস্তুত যে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে ইসরাইলী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা শুরু করবে। এই আলোচনা হবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে।

৮ জানুয়ারি, ১৯৪৯

গত বছর আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব সাধন করেছি। এ ছিল আমাদের এক লালিত স্বপ্নসাধ। আমরা হিব্রু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। প্রতিষ্ঠিত করেছি ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনী, মুক্ত করেছি নাকাব ও আল-জালাল। এ দুটি অঞ্চলের বিস্তৃত ভূখণ্ড উদ্ধার করেছি আরও সুপরিসর বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে। কেবল এক বছরেই নির্বাসিত জীবন থেকে ১,২০,০০০ ইহুদী অভিবাসীর সমাবেশ ঘটিয়েছি।

আমরা অর্জন করেছি বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুটি দেশের মৈত্রী— যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের। আমরা এখন মধ্যপ্রাচ্য তথা গোটা পৃথিবীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক পক্ষে পরিণত হয়েছি।

১০ জানুয়ারি, ১৯৪৯

আমরা ঈলাতে পৌঁছে গেছি। আমাদের বাহিনী এখন লোহিত সাগর জুড়ে!

১৬ জানুয়ারি, ১৯৪৯

রাত দশটায় ইয়েগাল ইয়াদীন আমাকে গোপন সংবাদ দিল। বাদশাহ আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ শেষে দাইয়্যান ফিরে এসেছে। সে আগামীকাল এখানে হাজির হবে। বৃদ্ধ আবদুল্লাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে এবং অনুরোধ করছে যেন আল্লাহ না করেন গাজাতে মিসরীদের না ছাড়া হয়। সবচেয়ে উত্তম হবে আমরা এটাকে নেয়ার চেয়ে শয়তানের হাতে সোপর্দ করে দেই।

২৯ জানুয়ারি, ১৯৪৯

আরবদের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আমি একটি ব্যাপারে সব সময় খুবই ভীতসন্ত্রস্ত যে, পাছে যুব আন্দোলন সংগঠন ও তাদের প্রশিক্ষণের আহ্বান জানিয়ে আরব বিশ্বে কোন ডাক সোচ্চার হয় কি-না। এতে আরব বাহিনীর নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তারা অস্ত্রের কারখানা প্রতিষ্ঠা করে বসতে পারে। এর মাধ্যমে তারা আমাদের ওপর অর্থনৈতিক শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে। তারা সে সব সুবিধাও বাতিল করে দিতে পারে, যে সবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা আরবের ওপর আধিপত্য কয়েম করেছে এবং শ্রমিক সংগঠন সৃষ্টি করেছে, শিল্প ও আধুনিক মূল্যবোধকে বেগবান করেছে। তারা খুলেছে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে টেক্সের সীমা উঠিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী কার্যকর প্রচার প্রপাগাণ্ডার ব্যবস্থা করেছে। এ হলো আরবদের স্বপ্নের পথ। আমি সব সময় কেবল এ আশঙ্কায় থাকি, পাছে কোন আরব নেতা তাঁদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে। তারা ভিতর-বাইরের সমস্যাগুলো এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয় সময়কে ভুলে যায়। আমাদের তো ধ্বংস অনিবার্য, যদি আমরা সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত হওয়ার জন্য এ ধরনের মোক্ষম সময়ের সদ্ব্যবহার না করি। বিশ্বে আমাদের আসন লাভ করার এটাই সময়। এ ধরনের একটি জাতির জন্য আমরা প্রমাণ করে ছাড়ব যে, ঐক্য, মুক্তি ও প্রগতির দিকে আরবদের পথ আমাদের সাথে যুদ্ধ করার পথে নয়।

১৪ জুলাই, ১৯৪৯

আবা ইবান এসেছিলেন। তিনি মনে করেন, শান্তির পেছনে দৌড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। যুদ্ধবিরতিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা যদি শান্তির পেছনে হন্যে হয়ে দৌড়াই তাহলে আরবরা আমাদের কাছে এর মূল্য দাবি করবে। দাবি করবে সীমান্ত, শরণার্থীদের ফিরিয়ে দেয়া অথবা উভয়টি। কাজেই কয়েক বছর অপেক্ষা

করেই দেখা যাক। জায়নিস্ট পরিকল্পনা তার বিজয়ের মুহূর্ত অতিক্রম করছে। এর বাস্তবায়নের নীলনক্সাও ছিল এক রকম সহজ। এ পরিকল্পনা ছিল এমন এক জমীনকে নিয়ে যারা এ সম্পর্কে ছিল অসচেতন। যখন চেতনা ফিরে পেল ততক্ষণে এটাকে রোখার তাদের কোন সামর্থ্য রইল না। তাছাড়া এ পরিকল্পনা ছিল অসীম লাভজনক। কারণ জায়নিস্ট আন্দোলন একটি দেশ লাভ করল তার জমা-জমি, তার কৃষি ও শিল্পজাত সম্পদ এবং রিয়েল এস্টেট ও আবাদীসহ এর সাথে রয়েছে সে দেশের সমুদ্র বন্দর, এয়ারপোর্ট আর এমন সব রাস্তা যেগুলোকে কেবল একটু সৌন্দর্য বৃদ্ধি আর উন্নয়ন করা প্রয়োজন। বোনাস স্বরূপ নিয়ে নিল তার সাথে প্রশ্াসনিক কাঠামো আর সরকারের পুরো ম্যাকানিজম যা উসমানী খেলাফতের সময় এ দেশের সেবায় নিয়োজিত ছিল। এগুলোকে পুনর্বাসন করা হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুগে। অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপের অভিবাসীরা মধ্যপ্রাচ্যে এসেই দেখল, আরে! সমৃদ্ধি আর উৎকর্ষের জন্য প্রস্তুত একটি রাষ্ট্র তাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাদের এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে এ দেশের নতুন ভূমিকা আর ভিন্ন যুগের জন্য তাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে প্রস্তুত করে নেয়া। কিংবদন্তি আর আকিদা বিশ্বাসের কথা বাদ দিলে অস্ত্রশস্ত্রই হচ্ছে ফয়সালাকারী। পূর্ব ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসনের জোরওয়ার মৌজ থামাতে কেবল চিন্তাশক্তিই যথেষ্ট নয়, বরং বারুদের শক্তি ছিল অভিবাসনের আগেই প্রয়োজনীয়। সে শক্তিই তাদের আহবান করেছিল আর তাদের রক্ষা করেছিল।

তাছাড়া এই অস্ত্রশস্ত্রই অধিবাসীদের তাদের আবাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পড়শীদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। আর এ অস্ত্রই যে কোন কারণেই হোক, তাদের সহায়তাকারীদের মনে এ আস্থার সৃষ্টি করেছে যে, ইসরাইল রাষ্ট্রের ধারণাতে অর্থলগ্নি করা খুবই লাভজনক হবে নানা কারণে ঃ কৌশলগত. অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।

মিসর ও সিরিয়ার মাঝে সেই কাঙ্ক্ষিত আড়ালে দেয়াল ছিল তার জায়গা মতোই; তা ছিল খুবই বেদনাদায়কভাবে। সম্ভবত বাদশাহ আব্দুল্লাহ তা সাসুন ও দাইয়্যান-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুবই দুঃখ জাগানিয়া স্পষ্টতার সাথে প্রকাশ করেছিলেন, "উত্তরের বাসিন্দারা (সিরিয়াবাসী) বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে দক্ষিণের লোকদের (মিসরবাসীদের) কপাল হয়েছে মাটিতে ধুলোমলিন"।

নেপোলিয়নের পুরনো স্বপ্ন সাধ্য বাস্তবায়িত হলো। পূর্ণ হলো বিল মারস্টোন লয়েড জর্জ আর উইনস্টন চার্চিল-এর লালিত প্রত্যাশা। সেই বাঁধার বিন্ধাচল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আরব বিশ্ব হয়ে গেল দ্বিখণ্ডিত। দুটো ভাগের মাঝখানটায় প্রতিষ্ঠিত হলো এমনি এক দেয়াল যা ইতিহাসের সক্রিয়তাকে করছে বাধাগ্রস্ত আর তার নবতর আন্দোলনকে দিচ্ছে ঠেকিয়ে।

দ্বিতীয় খণ্ড

যুদ্ধের ঘূর্ণিঝড় আর শান্তির বেয়াড়া বাতাস

কেন জামাল আব্দুন নাসের আলোচনায় বসেননি ? আনোয়ার সাদাত কিভাবে আলোচনা করেছিলেন ? – সুন্নাহ্গ্রন্থ (আরব-ইসরাইল গোপন আলোচনা)-এর দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা ঘটনার ধারাবাহিকতায় সেখান থেকেই শুরু হয়েছে, যেখানে প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে প্রায় এক শতাব্দী কালেরও বেশি সময় ধরে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও রাজনৈতিক চড়াই-উতরাইয়ের বিবরণ ছিল। এই সুদীর্ঘ সময় ছিল ভিত্তিমূলক রচনার সন্ধিক্ষণ, এর ওপরই বিনির্মিত হয়েছে আরব-ইসরাইল সংঘাতের ফ্লোর আর প্রেক্ষাপট। এর আঙ্গিকেই শুরু হয়েছিল যোগাযোগ আর সংলাপ-আলোচনার প্রচেষ্টা।

প্রথম খণ্ডের বিষয়গুলোকে আবার মনে করিয়ে দেয়া হয়ত সমীচীন হবে ঃ আরব-ইসরাইল সংঘাতের প্রেক্ষাপটে কিভাবে নিষিদ্ধ তথা পবিত্র বিষয়াবলীর ধারণার উদ্ভব হলো– যার প্রেক্ষিতে আরব-ইসরাইল যে কোন যোগাযোগ ও আলোচনায় গোপনীয়তা রক্ষায় প্রশ্ন এলো। সাম্রাজ্যবাদ আর জায়নবাদ কিভাবে আরব জাহানকে পূর্ব-পশ্চিমে ব্যবচ্ছেদের কাজে হাত মেলাল ? ইসলামী খেলাফতের শক্তির ওপর যুক্তিহীন দীর্ঘ নির্ভরশীলতার পর কোন শক্তিশালী আরব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় তারা বিরোধিতা করেছিল ঠিক এ কারণেই। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ ও পূর্বের দু'টি জীবনময় কৌশলগত বাহু, অর্থাৎ মিসর ও সিরিয়ার মিলন মোহনায় একটি ব্যবচ্ছেদ রেখা টানা ছিল তাদের একান্ত কাম্য। কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনার সাথে (সেই ফ্রান্সের নেপোলিয়ন ও ইংল্যাণ্ডের বিল মার্স্টোনের সময় থেকে) জায়নিস্ট আন্দোলনের স্বপ্নের সাথে এ মিলন ঘটল। শেষ পর্যন্ত আরব জাহানের পূর্বাংশের সাথে পশ্চিমাংশের মিলনের কেন্দ্রবিন্দু সেই ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, কিভাবে এ অঞ্চলের ওপর সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্ব ব্রিটেন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হাত বদল হলো ? কিভাবে এই নেতৃত্ব হস্তান্তরের সময়টি ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়ের সাথে মিলে গেল ? ঠিক এ সময়ই কিভাবে মিসর তার রাজনীতিতে প্রাচ্যমুখিতার প্রভাবে তার আরব স্বকীয়তাকে পুনরায় আবিষ্কার করল ? কিভাবে ১৯৪৮ সালের পর আরব-ইসরাইলী সংঘাত প্রতিটি আরব দেশের রাজনীতিতে একটি প্রধান ও সক্রিয় উপাদানে পরিণত হলো, এতে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীও শামিল রয়েছে। যুদ্ধ ও শান্তির ডামাডোলে বিভিন্ন অমূল্যায়িত সরকার আর অপরিচিত জাতির মধ্যে আরব জাহানের সাধারণ পরিস্থিতি কি ছিল? ১৯৪৮ সালের ফিলিস্তিন যুদ্ধের সময় এবং তারপর চূড়ান্ত ও বিবৃতকর পর্যায়ে নাকাব অঞ্চলের গুরুত্ব কিভাবে ফুটে উঠল আরব জাহানের পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ন্যূনতম স্থল যোগাযোগের সূত্র হিসাবে এর গুরুত্ব ছিল এতই বেশি।

নাসের-এর নেতৃত্বে বিপ্লবের পটভূমি

মিসরে জামাল আব্দুন নাসের-এর নেতৃত্বে বিপ্লবের পটভূমি তৈরি হওয়ার আগের অবস্থা বোঝবার জন্যে ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গোরিয়নের ডায়েরি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

১৪ জুলাই ১৯৪৯। ১৯৪৮ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসরাইল একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করল। সে কখনও শান্তি চায়নি (না সংলাপের মাধ্যমে না অন্য কোনভাবে)। কারণ সে শান্তির বিনিময়ে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং এর চেয়ে বড় কথা হলো, সে ছিল সম্প্রসারণে উচ্চাভিলাষী।

জামাল আব্দুন নাসের শক্তি আর দুর্বলতার মানদণ্ড

"হে স্পেনের ভাইয়েরা! তোমাদের উচিত ছিল জামাতে নামাজ পড়া। যখন তোমরা জানতেই পেরেছিলে– শত্রুরা তোমাদের মোনাজাত করার আগে তোমাদের রক্ত দিয়ে অজু বানাচ্ছে (শেখ সা'দীর কবিতা থেকে)। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর চেয়ে বিপজ্জনক বিষয় এই যে, কোন যুদ্ধাবস্থা কোন শেষ পরিণতি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা ছাড়াই থেমে যায়। এ ধরনের অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এমনকি কোন যৌক্তিক প্রয়োজন ছাড়াই। কেননা, কারণ তো ঐ অস্বাভাবিক অবস্থার মেজাজেই সুপ্ত থাকে।

প্রথম অধ্যায়

সীমাহীন এক রাষ্ট্র !

॥ ১ ॥

লোযান

"অচিরেই মিসরে একটি বিপ্লব আসছে।"

—৭ জানুয়ারি ১৯৪৯ ইং তারিখে প্রকাশিত মার্কিন রিপোর্ট

যখন আরব বাহিনীগুলো নিজ নিজ দেশে ফিরে তাদের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করছে, অনুশোচনা করছে নিজেদের ব্যর্থতার, ভগ্ন হৃদয় আর তিক্ত অভিজ্ঞতার অনুভূতি তাড়িয়ে ফিরছে তাদের তখন তাদের দেশগুলোর অবস্থা ছিল সেনাবাহিনীর অবস্থার চেয়েও করুণ। যুদ্ধের ময়দানের সৈন্যরা এক তিক্ত ও বেদনাময় অভিজ্ঞতা পেয়েছিল ঃ নিজের কোন লক্ষ্য নেই, তার কোন নেতা নেই, এও ভাবতে পারছিল না সে পরিকল্পনা মতো এগুচ্ছে কিনা। এর ফলে হয়েছে পরাজয়, অবরোধ আর অপমানের অসহায় শিকার। কিন্তু স্বদেশের বির্পযয় দেখা গেল এর চেয়ে ব্যাপক ও গভীরতর।

এই প্রশ্ন অথবা স্বগতোক্তি, যা পরবর্তীতে কৌশল বলে প্রচারিত হয়েছিল, তা কোন পশ্চাদপদতা ছিল না। প্রশ্ন উঠেছে– আরবরা কেন সূচনা লগ্ন থেকেই কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান গ্রহণ করেনি– যা পরবর্তীতে করল ? (যদি ধরেও নেই যে, শান্তির সুযোগ আদৌ ছিল)। কেন তারা প্রস্তাবিত সুরাহাতে আগেভাগেই রাজি হয়ে গেল না? যদি তারা তা গ্রহণ করত তাহলে তারা একটি বা দুটি দীর্ঘকাল নষ্ট করা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারত।

এ সময় তারা প্রচুর সম্পদ, শক্তি আর রক্ত ক্ষয় করেছে। (যেন সমাধানের অনেক প্রস্তাব ছিল, যার মধ্য থেকে ন্যূনতম, খারাপটিও গ্রহণ করতে আরবরা ব্যর্থ হয়েছে!)

১৯৪৮ সালের অভিজ্ঞতার পর আরব বাহিনী ও জনগণ আবার নিজেদের প্রশ্ন করতে লাগল। তবে এ প্রশ্নগুলো পরবর্তীতে উত্থাপিত পশ্চাদমুখী প্রশ্নগুলোর সময় থেকে ভিন্নতর। সে সময়কার হতভম্বকরা প্রশ্নগুলো ছিল ঃ আসলে ঘটেছিল কি ? কিভাবে ঘটল? কেন ঘটল ? অতঃপর, এখন থেকে কি ঘটতে যাচ্ছে ? যা ঘটেছে তা শুধরে নেয়ার মতো কি কিছু করার আছে ? অন্ততপক্ষে তুলনামূলক কম বিপর্যয়ের দিকে রুট পরিবর্তন করা কি সম্ভব হবে ?

আত্মপর্যালোচনার জরুরী প্রয়োজনে বৈষয়িক সত্যগুলো সম্পর্কে ভাবলেশহীন থাকা মোটেই সম্ভব নয়। এসব সত্যকে ভুলে থাকা সমীচীনও নয়। যখন বিল মার্স্টোন

ও ডেজরেলির রাজনৈতিক শক্তি আর রুচিল্ড ও মন্টিফেরির অঢেল সম্পদের বদৌলতে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসন ও বস্তি স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তখনও ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র আট হাজার, যারা পাঁচ হাজার ফান্দানের বেশি জমির মালিক ছিল না। যখন ১৮৯৬ সালে হের্তুজাল তার ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র সম্পর্কিত বইটি প্রকাশ করেছিল, তখনও ইহুদীদের সংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি ছিল না। তারা ফিলিস্তিনের মোট কৃষি উপযোগী জমির মাত্র ২% ভাগের মালিক ছিল। আরবদের সংখ্যা ছিল ৮ লাখ, আর তাদের হাতেই ছিল ৯৮% ভাগ জমি। ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেলফোর অঙ্গীকার ইস্যু হওয়ার সময়ও ইহুদীদের সংখ্যা ৪৮ হাজারের বেশি ছিল না। তারা তখন ফিলিস্তিনের কেবল ৩.৫% কৃষি জমির মালিক ছিল। আরবদের সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ২০ হাজার, যারা ৯৬.৫% জমির মালিক ছিল।

তাহলে সে সময় ফিলিস্তিনীদের পক্ষে কি সম্ভব ছিল যে, হের্তুজালের স্বপ্ন অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের ওপর ভিত্তি করে কোন কিছু গ্রহণ করবে বা এ নিয়ে সংলাপে বসবে? যেদিন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিভক্তি সিদ্ধান্ত ইস্যু হলো সেদিন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ। তাদের জমির মালিকানা ৬%-এর বেশি ছিল না। পক্ষান্তরে ১১ লাখ আরব তখন ৯৪% জমির মালিক ছিল। যেদিন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষিত হলো সেদিনও সেখানে ইহুদীদের সংখ্যা সর্বমোট ৪ লাখের বেশি ছিল না। জমির মালিকানাও ৭% ভাগের বেশি তাদের হাতে ছিল না। পক্ষান্তরে সাড়ে এগারো লাখ আরবের হাতে ছিল ৯৩% জমির মালিকানা।

–বলুন, এ অবস্থায় কি কোন আরবের পক্ষে ভাগাভাগি বা ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল?

কেউ দু'টি সাক্ষীর দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। প্রথমত, কার্যত আরবরা আগেভাগেই বিভক্তিকে কবুল করে নিয়েছিল। এমনকি বাহিনীগুলো লাইনের কাছাকাছি পৌঁছার আগেই। দ্বিতীয়ত, ইহুদী এজেন্সি সবদিক থেকেই তা জেনেছিল। কিন্তু তা স্বীকার করতে নারাজ ছিল। কারণ তার এই স্বীকৃতি হতো তার গোপন মতলবের খেলাপ। যদিও এই ফন্দি-ফিকির অনেকটা জানাই ছিল।

ফিলিস্তিনে ইহুদী নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে হের্তুজাল প্রথমেই বুঝেছিল ঃ যে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে তাদের সব সময় গা বাঁচিয়ে চলতে হবে, তা হচ্ছে– ফিলিস্তিনীদের সাথে সংলাপ আলোচনা। কারণ তাদের সাথে আলোচনায় বসার অর্থ হচ্ছে ফিলিস্তিন জাতির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়া। অন্য কথায় এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়া যে, "জাতিবিহীন ভূখণ্ড ভূমিহীন জাতিকে দেয়ার" স্লোগানটি একটি অসত্য স্লোগান। এতে জায়নিস্ট ধারণার ভিত্তিমূলকেই ধ্বংস করে দেবে।

এভাবেই জায়নবাদী ইহুদী আন্দোলনই প্রথম এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাতে অটল থাকে যে, ফিলিস্তিনীদের স্বীকৃতি দেয়া যাবে না, তাদের সাথে কোন আলোচনা ও শান্তি হতে পারে না। ফিলিস্তিনীদের সাথে ব্যবহার হবে বিতাড়ন, হত্যা ও উচ্ছেদের। কারণ ওটাই হচ্ছে সহজ পথ। কারণ কোন তন্বী-তরুণী সুন্দরী বধূ একই সময় দু'জন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না। কাজেই এ অবস্থায় একজনকে চলে যেতেই হবে। আর এটাই হচ্ছে অপেক্ষাকৃত দুর্বলের অমোঘ ভাগ্যলিপি।

পরবর্তীতে ইহুদী এজেন্সি ও ইহুদী রাষ্ট্র যুদ্ধোত্তর বাস্তবতার ভিত্তিতে আলোচনা করতে চেয়েছিল বিভক্তি সীমা অনেক দূর অতিক্রম করার পর। এমনকি এ উভয় সংস্থা যখন আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তখনও তারা চেয়েছিল যে, ফিলিস্তিনীদের বাদ দিয়ে অন্য কোন পক্ষের সাথে আলোচনায় বসবে। এ জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আলোচনা চলেছিল জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহর সাথে, তাও কোন প্রচলিত অর্থে আলোচনার চেষ্টা ছিল না। আসলে তাঁবু আর ট্যাঙ্কের মধ্যে কোন আলোচনা হওয়াটা মুশকিলই বটে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাদশাহ আব্দুল্লাহর সাথে যোগাযোগগুলো কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ছিল না, বরং এগুলো ছিল সম্পদকে তার মালিকের জীবদ্দশায় ও প্রয়াত সময়ে বণ্টনের প্রক্রিয়া।

এরপর ইহুদী এজেন্সি ও ইহুদী রাষ্ট্র মিসরের সাথে আলোচনা করতে চেয়েছিল। কারণ সে সময় এটিই একমাত্র আরব রাষ্ট্র ছিল যাকে তারা হিসাবে ধরত। কিন্তু মিসর বাস্তবতার কিছু দিক আঁচ করে উপযুক্ত মূল্যায়নই করেছিল ঃ প্রথমত, সে ফিলিস্তিনীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে আলোচনা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, জায়নিস্ট পরিকল্পনায় আরেকটি ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে সে (মিসর) নিজেই। যদিও এর এখানে লক্ষ্যবস্তু ফিলিস্তিনীদের কাছে লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। কারণ ফিলিস্তিনীদের ক্ষেত্রে এদের লক্ষ্য হচ্ছে তাদের অস্তিত্বকে বানচাল করা। পক্ষান্তরে মিসরে তাদের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মিসরের ভূমিকাকে বানচাল করা। আরব-ভবিষ্যতের ব্যাপারে তার ভূমিকা প্রাচ্যে তার ভাগ্য নির্ধারণ করবে বিধায় এই ভূমিকা রাখার যোগাযোগও সে বানচাল করতে চায়। অবশেষে মিসর বাফার অঞ্চলের ভূমিকে আঁকড়ে রাখে যাতে সে তার ভূমিকা আর ভবিষ্যৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। কিন্তু ইসরাইল তাকে সেখান থেকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে ছিল কৃতসঙ্কল্প। তার চেয়েও বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল ঈলাত-এ পৌঁছতে। যাতে সিরিয়া থেকে মিসরকে পুরোপুরি আড়াল করা যায় এবং লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। যেমনটি ইতোপূর্বে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

এর চেয়ে ভয়ানক ব্যাপার ছিল, ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর মাসব্যাপী নাকাব অঞ্চলে চলমান যুদ্ধের গতিবিধির মূল টার্গেট ছিল সচেতনভাবে মিসর বাহিনীকে মিসমার

করে দেয়া; যদিও এর কোন সামরিক প্রয়োজন ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মিসরের অক্ষমতা প্রমাণ করে ছাড়া, তাকে অপদস্থ করা। এতে মিসরের মনে অনাগত সুদীর্ঘ সময় ধরে ত্রাস আর অবনত মনোভাব সঞ্চারিত থাকে। যাতে ফের কখনও যুদ্ধে বের হওয়া বা তার নিকটবর্তী হওয়ারও দুঃসাহস না দেখাতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে যখন সকল ধর্মীয় কৃষ্টি, সভ্যতাগত, জাতীয় কৌশলগত ও মানবিক পবিত্রতার ওপর বিপদ চেপে বসেছিল, ঠিক তখন মুদ্রার ও-পিঠে পবিত্র বিষয়গুলোর ওপর ধ্বংস নেমে এসেছিল 'নিষিদ্ধ' ও সংরক্ষিত বিষয়ের আকারে। এভাবেই, একটি মানসিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে প্রথমেই এসেছে প্রত্যাখ্যান।

এই প্রত্যাখ্যান সবচেয়ে বেশি মাত্রায় দেখা দেয় সিরিয়া ও মিসরে। কারণ, এ দু'টি জাতি গভীর পর্যালোচনার আগে মনের টানেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, ফিলিস্তিন হারিয়ে গেলে এর খেসারত কেবল সেদেশের অধিবাসীদের ওপরই বর্তাবে না, বরং এটা দামেস্ক ও তার আশপাশের ভূখণ্ড, এমনকি ফুরাত ও উপসাগর পর্যন্ত তার বিরূপ প্রভাব ফেলবে। প্রভাব ফেলবে কায়রো তথা তার ওধারে উত্তর আফ্রিকার আরব দেশগুলোর ওপর। এই প্রভাব আল্-কুদস ও ফিলিস্তিনের ওপর যতটুকু পড়বে, ঠিক ততটুকুই পড়বে এসব অঞ্চলেও। অন্যকে প্রত্যাখ্যান থেকে এক রকম আত্মপ্রত্যাখ্যানও উৎসারিত হয়েছে। এর সূচনা হয়েছে সিরিয়াতে– যখন হুসনী যাঈম -এর নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেখানকার অক্ষম ও পরাজিত সরকারকে উচ্ছেদ করা হলো। অনেকটা এমনই ধারণা ছিল তখন। আর মিসরে এ প্রত্যাখ্যানের রূপ ছিল ভিন্ন। এ দেশের সাইজ আর তার সভ্যতার উত্তরাধিকারের স্বাভাবিক আবেদনে এখানে গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এ প্রক্রিয়াতে শামিল হলো বিভিন্ন পক্ষ ও শক্তি। সহিংসতা চরম আকার ধারণ করল। যদিও বাহ্যত মনে হচ্ছিল যে এটা ফিলিস্তিনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। কেননা বিভিন্ন কার্যকারণ পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে নতুন কারণসমূহের সাথে পুরনোগুলো মিশে গিয়েছিল। মিসরের চলমান ঘটনাবলীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারীদের নিকট এই অস্থিরতা ও সহিংসতার কারণগুলো গোপন থাকেনি। বরং আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি ফাইল (যার মধ্যে ছিল ডকুমেন্ট নং ৮৪৯-১/ ৮৮৩০০)-এর শিরোনাম ছিল ঃ 'মিসরের বিপ্লব'। ডকুমেন্টটির ভাষ্য ছিল এ রকম ঃ

লণ্ডন ঃ ৭ জানুয়ারি ১৯৪৯ (গোপনীয়)

বিষয় ঃ "মিসরে বিপ্লব"

নিম্নোক্ত রিপোর্ট বিতরণের প্রয়োজন নেই। কেবল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের অবগতির জন্যই সংরক্ষিত থাকবে।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিসর বিষয়ক ডেস্কের প্রধান কর্মকর্তার সাথে সর্বশেষ আলোচনায় এ দূতাবাসের কাউন্সিলরের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, মিসরের সাধারণ মেজাজ এখন গভীর হতাশায় সময় পার করে যাচ্ছে। এখানকার পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের যুদ্ধ এ পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। মিসরী নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করার বদলে তারা অতীতে যা ঘটেছে তা ভোলার চেষ্টা করছে। তারা বরং মিসরে গনিমত ভাগাভাগিতে প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে।

মিসর ডেস্ক প্রধান এ আলোচনায় তাঁর যে মতামত রেখেছেন-এর মূল সুর হচ্ছে, এ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মতো একটিই শক্তি আছে তা হচ্ছে বাদশাহ ফারুকের পক্ষ থেকে উজ্জ্বলভাবে হস্তক্ষেপ। কিন্তু মনে হচ্ছে "এ যুবকটি" বড় বড় জমিদারের স্বার্থ সংরক্ষণে বড়ই ধুরন্ধর। এখন আমরা মিসরে যা দেখতে পারি তা হচ্ছে– আছে আর নাই-এর দলের মধ্যে তিক্ত সংঘাত। মিসরে যারা নিঃস্ব তাদের সবর করা কেবল গাধার ধৈর্যের সাথেই তুলনা করা যায়। এই গাধা তো দীর্ঘ সময় ধরে সবর করেই আছে। সম্ভবত সে এখন লাথি মারতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। পদাঘাত করবে কেবল নাতিদীর্ঘ সমরখণ্ডে। মিসর ডেস্ক প্রধান আরও বলেন, সৌভাগ্যক্রমে এখন আল ওয়াফদ পার্টি ক্ষমতার বাইরে। যদি কিছু ঘটে তাহলে পরিস্থিতি সামাল দিতে সে-ই এগিয়ে আসতে সক্ষম। এ অবস্থায়, নাহ্হাস প্রবেশ করার আগে বাদশাহ ফারুকের বের হয়ে পড়া দরকার। যখন এ দূতাবাসের কাউন্সিলর তার মুখপাত্রকে মিসরের সম্ভাব্য বিপ্লবের স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল তখন তিনি বলেন, খুব সম্ভব এটা মিসরীয় স্টাইলেই হবে আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এরপরই বিশৃঙ্খল বিক্ষোভ সমাবেশ আর লুটতরাজ, ভাংচুর শুরু হয়ে যাবে, তাঁদের সামনে কোন স্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী থাকবে না। এ অবস্থায় বিপ্লবের পর কি ধরনের লোক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তার ওপর নির্ভর করছে মিসরের রাজনীতির নতুন মেরুকরণ। মিসরের ভবিষ্যতের ব্যাপারে এ মন্তব্য ছুড়ে মিসর বিষয়ক কর্মকর্তা তাঁর রিপোর্ট শেষ করেন ঃ তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করছেন যে মিসরের ভবিষ্যৎ হবে খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

স্বা/

হোল্‌মজ

(লণ্ডনস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত)

বস্তুত সূচনা লগ্নে যেমনটি মনে হচ্ছিল, ফিলিস্তিন আসলে মিসরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির এই চিত্র থেকে সে রকম দূরে ছিল না। এ সময় আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রামাণ্য নথিপত্রে একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। এটি কায়রোস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত স্টান্টন গ্রেফেথ ও বাদশাহ ফারুকের মধ্যকার ২ জানুয়ারি ১৯৪৯

তারিখের সাক্ষাৎকার রিপোর্ট। এতে দেখা যায়, বাদশাহ্ আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে বলছেন যে, 'আমার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন আমার অবশ্য কর্তব্য। আমার জনগণ ফিলিস্তিনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছে, যদি এ যুদ্ধ দশ বছর ধরেও লেগে থাকে। রাষ্ট্রদূতের ভাষ্যমতে, বাদশাহ্ আরও বলেন, "আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, যুক্তরাষ্ট্র চিত্রটিকে সেভাবে দেখতে চায় না, যেভাবে আমি দেখি। কারণ ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে রুশ হস্তক্ষেপ সুস্পষ্ট। এটা অনেকটা গ্রীসে রুশ হস্তক্ষেপের মতো, যা শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছিল। আমি তো আপনাদের সে কবে থেকেই সতর্ক করে আসছি যে এরা রুশ...রুশ ... রুশ। কিন্তু আপনারা তো কর্ণপাতই করেননি। অথচ আপনারা গ্রীসে যে রকম আচরণ করেছেন, ফিলিস্তিনের বেলায় তা করছেন না। সেখানে আপনারা রুশদের বিরুদ্ধে গেলেন কিন্তু এখানে তাদের সাথে একই কাতারে অবস্থান নিলেন।" দেশের বাদশাহ রাশিয়ানদের ওপর দায়িত্ব চাপাতে চেয়েছিলেন– অথচ যুক্তরাষ্ট্র তার থেকেও অতি সূক্ষ্ম চাল ও গুপ্ত তথ্য সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফহাল। লণ্ডনস্থ মিসর বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা যেমনটি ভেবেছিলেন তিনি কিন্তু সে ধরনের উজ্জ্বল ভূমিকা পালনের মতো যোগ্যতা রাখতেন না বরং তিনি তাঁর দেশে সহিংসতা বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা করেছিলেন। কারণ হঠাৎ করে তিনিই একটি সন্ত্রাসী বাহিনী গঠন করে তার নাম দিয়েছিলেন– আল্-হারাস আল্-হাদীদী অর্থাৎ "লৌহ রক্ষীবাহিনী" যারা তার বিপক্ষদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত এবং তার শত্রুদের চিরতরে খতম করে দিত। এ ভূমিকায় তিনি ভয়ে থাকতেন পাছে কেউ তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বা এমন ইঙ্গিত করে যাতে তার ওপর সামান্যতম দায়িত্বও বর্তায়।

এরপর এ সহিংসতা একটি বৈধ ভিত্তি লাভ করল। কারণ এ বাহিনী সুয়েজ খাল এলাকায় ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর দিকে অগ্রসর হলো।

ইহুদীরা গভীরভাবে বিশ্বাস করত যে, আসল সমস্যা ওখানেই। কারণ এই ব্রিটিশ দখলদারই এই জাতির স্বাধীনতার অধিকারকে খর্ব করা ছাড়াও তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকেও পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। এভাবেই তার মুছিবত থেকে অন্যদিকে মনযোগী রাখার ভূমিকা রাখে। যখন সুয়েজ খাল এলাকায় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অপারেশন বেশ জোরদার হলো তখন পুরো প্রশাসন সমস্যার আবর্তে পড়ে গেল। এতে প্রাসাদ আর মন্ত্রণালয় উভয়ই শামিল ছিল। এই বিপর্যয় থেকে বের হয়ে আসার প্রয়াস হিসাবে নাহ্হাস পাশা ১৯৩৯ সালের চুক্তি বাতিল ঘোষণা করলেন। কিন্তু যখন বোঝা গেল, এ চুক্তি বাতিলের বিষয়টি ঐ বাতিল ঘোষণার কাগজটির বাইরে কোন প্রভাবই ফেলল না, তখন জনসাধারণ কিন্তু হতাশাব্যঞ্জক বেশ কিছু ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের অসন্তুষ্টি জানিয়ে দিল। এর সর্বশেষ নাশকতামূলক কাজ ছিল– কায়রোর বক্ষস্থলে অগ্নি সংযোগ করা।

এটা ছিল প্রশাসন, শৃঙ্খলা ও আইনের প্রতি এক সংক্ষুব্ধ প্রতিবাদ এবং বিরাজমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মন্তব্য করা যায় যে, তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিচ্ছাকৃত। যদিও মধ্যে কায়রোর অগ্নিসংযোগ ঘটনায় অন্যদের চেয়ে ইহুদীদেরই ক্ষতি করেছে বেশি। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে– ইহুদীদের স্বার্থাদি রাজধানীর বক্ষস্থলেই ছিল বেশি। এসব কিছুর সময় ইসরাইল অনুসরণ করে যাচ্ছিল যে, তার প্রতিষ্ঠার ফলে আগুনের লেলিহান কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। এই লেলিহান আগুনের দাবদাহ ছিল বেন গোরিয়ন-এর প্রতি ইবানের নসিহতের বাড়তি যুক্তি ঃ

. কয়েক বছর আরবদের সাথে কোন আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। যদি এখন আমরা তাদের সাথে সংলাপে যাই তাহলে তারা ভূমি ও মানবাধিকারের অনেক দাবি উত্থাপন করে বসবে। এর মধ্যে রয়েছে– শরণার্থীদের ফেরত পাঠানো যা ইসরাইলের পক্ষে কবুল করা কখনও সম্ভব নয়। অবশ্য এখানে আরেকটি কারণও আছে যা 'আবা ইবান' বলেননি বা বলা যায়– বেন গোরিয়ন তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেননি। সেটা ছিল এই যে, এখন আরবদের সাথে যে কোন আলোচনা-সংলাপ বা তাদের স্বীকৃতি দেয়ার যে কোন দাবি– এ দুটো বিষয়ই ইসরাইল রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণে বাধ্য করবে। অথচ এখন বিষয়টি অবারিত ও সম্প্রসারণযোগ্য।

এটা সুস্পষ্ট যে, সে সময়কার ইসরাইলী নেতৃত্ব এমন একটি রাজনীতিতে উপনীত হয়েছিল যা তারা নিজেদের জন্য তৈরি করে নিয়েছিল এবং তার ধারা-উপধারাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যা থেকে তারা এতটুকু সরে দাঁড়ায়নি।

১. তারা অচিরেই শান্তির লক্ষ্যে স্বীকৃতি ও আলোচনার দাবি জানাতে থাকবে।

২. তবে যদি তাদের এ দাবি মানা হয়, তাহলে তারা এমন কিছু শর্তারোপ করবে যার কারণে শান্তি অসম্ভব হয়ে পড়বে।

৩. তার এখন কোন মানচিত্রের দরকার নেই, কারণ সে এখন সীমানায় পৌছেনি– ১৯৪৮ সালে এক বছরেই তার সেই লালিত স্বপ্নের মানচিত্রে পৌছা সম্ভবও নয়। (এ জন্যই ইসরাইলের এখন পর্যন্ত কোন লিখিত সংবিধান নেই, জাতীয় আইন নেই। সীমানাকে এড়িয়ে যাওয়াই এর কারণ।)

৪. কাজেই তাকে অপেক্ষা করতে হবে, শক্তি আরও অর্জন করতে হবে, নিশ্চিত হতে হবে, আবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। এভাবে একদিন আসবে সে যেভাবে চাইবে সেভাবেই তার সীমান্ত নির্ধারিত হবে।

৫. এ সময়ে তাদের কাজ হবে রোষ আর রোষানলের বিস্ফোরণে আরবদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করে যাওয়া।

৬. এ সময় তার আরেকটি কাজ হচ্ছে– নিজেকে সুদৃঢ় করার দাবি তোলা এবং এমন সব আন্তর্জাতিক মৈত্রী বিনির্মাণ করা যার মাধ্যমে প্রয়োজনে সে তার সুরক্ষায় সহায়তা পেতে পারে।

তাদের এই নীতি প্রায় চূড়ান্ত পষ্ট হয়েছে জাতিসংঘ গঠিত সমন্বয় কমিটির ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে। এটা ছিল জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ সালে রোডস-এ সম্পাদিত শান্তি চুক্তির পর। তার কাজ ছিল ইসরাইলের সাথে এ শান্তিচুক্তি মেনে চলতে সম্মত আরব রাষ্ট্রগুলোকে একত্র করা । তাদেরকে ঐ চুক্তির ভূমিকার প্রথম লাইনে বিধৃত শান্তির দিকে নিয়ে যাওয়া।

১৯৪৯ সালের মে মাসে সুইজারল্যাণ্ডের 'লোযান'-এর দিকে এই সমন্বয় কমিটি রওনা হয়। সেখানে চলে বিভিন্ন যোগাযোগ। আরবরাও হাযির হলো। ইসরাইলীরাও। সেখানে আলোচনার প্রটোকল ঠিক করা হলো– যার ভিত্তিতে আলোচনা সম্পন্ন হবে। প্রটোকলের ভাষ্য ছিল ঃ '১১ ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত ফিলিস্তিন সমন্বয় কমিটি– যার দায়িত্ব হলো দ্রুততার সাথে শরণার্থী ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের সহায়-সম্পদের হেফাযতের পাশাপাশি সীমান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে সুরাহা করা– এ কমিটি আরব ও ইসরাইলী প্রতিনিধিদের প্রতি প্রস্তাব রাখছে যে, সংযুক্ত দলিলটিকে এই কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হোক।' সংযুক্ত দলিলটি ছিল সেই ১৯৪৭ সালে ইস্যুকৃত বিভক্তি সিদ্ধান্ত ও এতদসংক্রান্ত মানচিত্র। এর অর্থ হচ্ছে "লোযান" সম্মেলনে আরবদের অংশগ্রহণ মানে বিভক্তি সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া, ইসরাইলের অংশগ্রহণও সে অর্থই প্রকাশ করে।

'লোযান'-এর বৈঠকগুলো ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ ততক্ষণে ইসরাইল তার জন্য বিভক্তি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত ভূখণ্ডের চেয়ে দেড়গুণেরও বেশি জায়গা দখল করে বসে আছে। এই বাড়তি ভূমি ছিল নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত শান্তিচুক্তির সিদ্ধান্তগুলোর বরখেলাপ জবরদখলের মাধ্যমেই অর্জিত। ইসরাইল কখনও অধিকৃত ভূমি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি ছিল না। কারণ এটা ছিল তার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। এতে কারও নাক গলানো উচিত নয়। সে তা-ই মনে করত।

ইসরাইল শরণার্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনাকেও গুরুত্ব দেয়নি। কারণ এ বিষয়টি অন্যদের ব্যাপার; তারাই তা নিয়ে মাতামাতি করুক।

যখন দেখা গেল যে, অধিকৃত ভূমির বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করেছে, তখন মনে হলো যে, শরণার্থীর বিষয়টি সমাধানযোগ্য। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জাতিসংঘ প্রতিনিধিগণের কাছে এটা বড়ই মুশকিল ছিল যে, তাদের সামনে ৭ লাখ উদ্বাস্তু বিপর্যস্ত হয়ে থাকবে অথচ তারা নির্বিকার থাকবে।

পক্ষান্তরে আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, আরব রাষ্ট্রগুলো উদ্বাস্তু সমস্যার মাঝামাঝি সমাধান গ্রহণে প্রস্তুত ছিল ঃ

* বাদশাহ আব্দুল্লাহ জর্ডানে দু'লাখ ফিলিস্তিন উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসনে প্রস্তুত ছিলেন।

* সিরিয়ার নয়া প্রেসিডেন্ট 'হুসনী যাঈম' সিরিয়ায় তিন লাখ ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসনে প্রস্তুত থাকার কথা প্রকাশ করেন।

শর্ত হলো ইসরাইল যদি সিরিয়ার সাথে তার সীমান্তকে পুনর্বিন্যাস করতে রাজি হয় তথা "হাওয়াল্লা" অঞ্চলকে সিরিয়ার তাবরিয়া হ্রদের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়।

এমনকি মিসরও কম যায়নি। কায়রোস্থ আমেরিকান চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স মিস্টার প্যাটের্সনের সাথে প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহীম আব্দুল হাদি পাশা বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুসারে দেখা যায় যে, মিসরে প্রচণ্ড ঘনবসতি সত্ত্বেও সেখানে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে তাদের আপত্তি ছিল না। চাই তা কেবল অন্যান্য আরব দেশের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়ার জন্যই হোক না কেন।

অবশ্য আরব রাষ্ট্রগুলোর উদ্বাস্তু সমস্যার এই মাঝামাঝি সমাধানের বিপরীতে অধিকৃত ভূমির সমস্যাটিরও মাঝামাঝি সমাধান দাবি করা ছাড়া এ ধরনের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে তাদের প্রস্তুতি প্রকাশে সক্ষম ছিল না। জাতিসংঘ নির্ধারিত বিভক্তি রেখার বাইরেই এই ভূমি সমস্যা সৃষ্টি করে রাখা হয়। কিন্তু ইসরাইল উভয় ব্যাপারেই মাঝামাঝি সমাধানে প্রস্তুত ছিল না। জবরদখলকৃত ভূমি থেকে প্রত্যাহারে যেমন রাজি ছিল না তেমনি কিছু উদ্বাস্তুকে ফিলিস্তিনে ফিরতে দিতেও রাজি ছিল না।

"লোযান" সম্মেলন প্রথম দিনেই ভেঙে পড়তে পারত...। কিন্তু ইসরাইল তা চায়নি। তবে জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে ইসরাইলকে গ্রহণ করার এখতিয়ার ছিল সাধারণ পরিষদের। সেজন্যই সে সমন্বয় কমিটির কর্মতৎপরতার প্রথম রাউণ্ডে উপস্থিত থাকল। এর পরই সাধারণ পরিষদ তার সদস্য পদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সে যা চাইল তা পেয়ে গেল। ব্যস, দ্বিতীয় সভাতেই তারা অনুপস্থিত থাকল। ইসরাইলী প্রতিনিধি দল তেলআবিব ফিরে এলো; লোযানে আর যায়নি।

অর্থাৎ ইসরাইলের জন্য লোযান ছিল নিছক একটি মহড়া বা প্রহসন মাত্র, যাতে সে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করতে পারে। এভাবেই তার অস্তিত্বের বৈধতার ওপর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পূর্ণতা লাভ করবে। আর যখন তার সদস্য পদ লাভ হলো তখন লোযানের সভাগুলো আগ্রহীদের জন্য ফেলে রেখে চলে এলো।

পূর্বের সব ধোঁকাবাজির সাথে আরেকটি ধোঁকাবাজি যোগ হলো। ভূমিতে, বুদ্ধি-বিবেচনাতে আর হৃদয়ে যতটুকু পবিত্রতা নষ্ট হলো ততটুকু নিষিদ্ধ বস্তু তার স্থান করে নিল।

অঞ্চলটি কার্যত বিপ্লবোন্মুখ অবস্থায় ছিল। এ বিপ্লব ঘটার জন্য সব আয়োজনই যেন প্রস্তুত ছিল। বেন গোরিয়ন নিজেও তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন– এ সম্ভাবনায় অস্থিরচিত্ত ছিলেন। যদি লক্ষণগুলো সত্য হয়। তাঁর দ্বিতীয় মনোযোগের বিষয় ছিল– জমিতে সবেমাত্র রোপিত রাষ্ট্রের চারাটিকে এমন এক শক্ত মহীরুহে পরিণত করা, যাতে যে কোন ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিঝড়কে মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারে।

॥ ২ ॥

এডেনাওয়ার

"আপনি কি রাষ্ট্রের জন্য শীঘ্রই এক লাখ ডলারের ব্যবস্থা করতে পারবেন।"

—ইসরাইলী অর্থমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নাহুম গোল্ডম্যানের নিকট তারবার্তা

ইসরাইলী মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী– যা অধ্যাপক মাইকেল ব্রেশার পড়েছেন এবং সেখান থেকে তাঁর "ইসরাইলী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে নিবিড় অধ্যয়ন" – গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (এ গ্রন্থটি ৩ হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত ও ৩খণ্ডে সমাপ্ত)। এ মন্ত্রিপরিষদ মধ্য ১৯৫০ থেকে ১৯৫১-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশ কিছু সংখ্যক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভারাক্রান্ত ছিল। এর মধ্যে এমন বিষয়ও ছিল যা নবজাত শিশু রাষ্ট্রটির অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল ঃ "হাজানাহ্" বাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করা এবং তাকে একটি রাষ্ট্রের নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিবর্তিত করা এবং এর ভিত্তিতে তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও সশস্ত্র করতেই ইহুদী এজেন্সি ও পরবর্তীতে ইসরাইল রাষ্ট্রের অর্জিত সকল সম্পদের বড় অংশ নিঃশেষ হয়ে যায়। অস্ত্র কিনতেই তখনকার বাজারে এক শ' মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ হয়ে যায়। একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় প্রথম বছরে নতুন প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে। ঐ মন্ত্রিসভায় বেন গোরিয়নের মুখে প্রায় একটি কথা উচ্চারিত হতো, "যুদ্ধ আমাদেরকে কাবু করতে পারেনি কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে এ দায়িত্ব পালনে আমরা দেউলিয়া হয়ে পড়ব।"

ইসরাইলী মন্ত্রিসভার পরবর্তী মনোযোগের বিষয় ছিল সাধারণ পরিষদের বিভক্তি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবিলা করা। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে নিরাপত্তা পরিষদ আরও কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তা হচ্ছে– উদ্বাস্তুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও বিভক্তি সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহুদী রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ এবং ঐ সীমানার বাইরে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে অস্ত্রের জোরে দখলকৃত ভূমি ছেড়ে দেয়া।

ইসরাইলী মন্ত্রিসভার তখন সবচেয়ে বড় যে চিন্তাটি ছিল– যদিও কোন সদস্যই তা প্রকাশ্যে ঘোষণার দুঃসাহস দেখায়নি– তা হচ্ছে ঃ ভাটিকানের বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্-কুদসের ওপর পূর্ণ ইসরাইলী সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। সে সময় ভাটিকানের এই বিরোধিতা সকল আরব দেশের সম্মিলিত প্রতিবাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেজন্যই ইসরাইল চাইত না যে, আল্-কুদ্সের ব্যাপারে তার অভিপ্রায় সম্পর্কে খ্রীস্ট-জগতে কোন সন্দেহের দোলাচল হোক।

ইসরাইলী মন্ত্রিসভা চাচ্ছিল যে, ইহুদী রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি যেন দুর্বল ও চারদিক থেকে শত্রু আরব দেশসমূহ দ্বারা বেষ্টিত, এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়। এ জন্য যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি ও এর মাধ্যমে ইসরাইল যা অর্জন করেছে– তা বিশ্বের অনেকেরই নজর কেড়েছে। তারা ভাবতে শুরু করেছে যে বিশ্বে শক্তিশালী ও সশস্ত্র এক ইহুদী শক্তি রয়েছে। এ শক্তিটি মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে আগ্রহী বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করতে সক্ষম। পাশাপাশি এ চিন্তাও ছিল যে, সাধারণ বিশ্বজনমত পিঠটান দিতে পারে এই ভেবে যে, ইসরাইল এখন একাই নিজের স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম এবং যেসব ইহুদী তাদের 'ঐতিহাসিক স্বদেশে' ফিরেছে তাদেরকে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে কারও কাছে সহযোগিতা চাইতে হবে না।

এই সকল বিষয় অর্থনৈতিক গুরুত্বের সথে একাকার হয়ে গেছে। কারণ, অর্থনৈতিক উত্তরণই ছিল সবচেয়ে জরুরী ও প্রচণ্ড তাগিদতাড়িত বিষয়। মন্ত্রিসভার আলোময়তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাস্বরূপ ব্যাপকভাবে মঞ্জুরীর আবেদন জানাতে তারা দ্বিধান্বিত ছিল। তাদের ভয় ছিল এই সহযোগিতার বিপরীতে পাছে কোন বিনিময় করতে হয়। হতে পারে এ কারণে বিভক্তি সিদ্ধান্ত বা নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিতে হবে।

মন্ত্রিসভার সেপ্টেম্বর মাসের সভায় প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গোরিয়ন পরিস্থিতি এভাবে ব্যাখ্যা করেন ঃ "ইসরাইল রাষ্ট্র ১৯৪৯ সালের শেষের দিক থেকে খুবই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে, যা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। আমাদের সামনে সকল ইঙ্গিতই নেতিবাচক। আমরা কৃচ্ছ্রতা কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। কিন্তু ইসরাইলী জনগণের আত্মত্যাগেরও তো একটি সীমা আছে। যে সমস্যাটি আমাদের বিপর্যয়কে বাড়িয়ে দিচ্ছে তা হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইহুদী অভিবাসনের মাত্রা বেড়ে গেছে।

১৯৪৮-এর মে থেকে এ অভিবাসী জোয়ার জোরদার হয়েছে। এ পর্যন্ত ছয় লাখ ইহুদী অভিবাসী এখানে জমায়েত হয়েছে। এতে এখানকার জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে পড়েছে। সমস্যা হচ্ছে এসব নতুন অভিবাসী প্রায় নিঃস্ব। রাষ্ট্রকে দেবার মতো কিছুই তাদের নেই, অথচ রাষ্ট্রের কাছে তারা সব কিছুই দাবি করছে।"

এরপর 'ডেভিড বেন গোরিয়ন' বক্তব্য প্রদানের জন্য অর্থমন্ত্রী ইলইয়াজের ক্যাবলানকে অনুরোধ করলে তিনি অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত ফিরিস্তি দেন। এতে তিনি বলেন যে, ১৯৪৯-১৯৫০ সালের মধ্যে ইসরাইল বিশ্ব ইহুদীদের থেকে ৯০ মিলিয়ন ডলার চাঁদা পেয়েছে। অথচ এ সময় খরচ হয়েছে ২৬৩ মিলিয়ন ডলার। এতে বিরাট অক্ষমতা দেখা দেয়। যার ফলে ৪ লাখ ২০ হাজার লোক ইসরাইলে দারিদ্রসীমার নিচে জীবনযাপন করে। বেন গোরিয়ন-এর এই চিন্তা ও দুর্ভাবনা কেবল তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এ বিষয়ে রাষ্ট্র ও বিশ্ব জায়নিস্ট আন্দোলনের মধ্যে

ছিল অংশীদারত্ব। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল তখন নাহুম গোল্ডম্যানের হাতে। সে ছিল লিথুনিয়ার ইহুদী; অভিবাসী হয়ে জার্মানিতে চলে যায়। সেখানে সে শিক্ষিত ও সংস্কৃতবান ইহুদীদের জড়ো করতে সক্ষম হয়। এরপর হিটলারের উত্থানের সময় জার্মানি থেকে ভেগে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়। সেখানে তিনি আমেরিকার কিছু সংখ্যক ধনাঢ্য ইহুদীর চারপাশে ঘুরতে থাকে। এটাই হচ্ছে ইউরোপীয় ইহুদী ও আমেরিকান ইহুদীদের মধ্যে বড় ফারাক। কাজেই ইউরোপীয় ইহুদীদের মধ্যে যখন সংস্কৃতির দিকটি বেশি সুস্পষ্ট তখন আমেরিকান ইহুদীদের মধ্যে সমৃদ্ধির দিকটি বেশি প্রবল।

স্বভাবতই নাহুম গোল্ডম্যান ইসরাইলের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর কাছে ইহুদী রাষ্ট্রের অভাবগুলো ভীষণভাবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু তিনি এ বিপর্যয়কে হালকা করার মতো কোন তাৎক্ষণিক সমাধান খুঁজে পেলেন না। একটি সমাধান মনে আসে, তা হচ্ছে— আমেরিকার কাছে সাহায্যের আবেদন করা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হয়ত সীমান্ত নিয়ে কিছু মতামত থাকতে পারে। থাকতে পারে আল্-কুদ্স ও উদ্বাস্তুদের নিয়ে কিছু মতামত। সে এ অঞ্চলের আরব বন্ধুদের খুশি করতে চায়; কারণ তাদের ভূমিতে তার অনেক স্বার্থ রয়েছে। এজন্যই অন্তত এ যাত্রা গোল্ডম্যানকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরে থেকে অন্য কোন পন্থায় ইসরাইলকে উদ্ধার করতে হবে।

নাহুম গোল্ডম্যান তাঁর ডায়েরিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে নাজী বাহিনীর কমাণ্ডারদের বিচারকার্য প্রত্যক্ষ করার জন্য নূরেমবার্গ যান। এদের প্রথমেই ছিলেন বিজয়ী বাহিনীতে হিটলারের ডেপুটি ও জার্মানির বিমান বাহিনীর দায়িত্বশীল মার্শাল গোরেঞ্জ। সেদিন গোল্ডম্যান ছিলেন খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও এলোমেলো চিন্তায় মশগুল। এটা এজন্য ছিল না যে, তিনি নাজী বাহিনীর নেতাদের বিচারের সময় আদালতে হাযির হচ্ছেন।

নাহুম এর চিন্তিত ও বিক্ষিপ্ত ভাবনার কারণ আরেকটি জরুরী উদ্ভূত সমস্যা। ঐদিন সকালেই তিনি ইসরাইলের অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন, সেখানে তিনি অনুরোধ করছেন– "রাষ্ট্রের জন্য জরুরী ভিত্তিতে এক লাখ ডলারের ব্যবস্থা করতে পারবেন?" গোল্ডম্যান তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত' হয়ে পড়েন যে, একটি 'রাষ্ট্র' জরুরী ভিত্তিতে মাত্র এক লাখ ডলারের অভাবে পড়ে হাহুতাশ করছে !

গোল্ডম্যান বিচারকার্যের ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করছিলেন আর তাঁর মনে জাগছিল— যেমনটি তিনি ডায়েরিতে লিখেছিলেন— "ঐ সকল নাজী নেতার অপরাধের বিচার হওয়া ন্যায্য কাজ, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে তাও যথার্থই হবে। কিন্তু তাদের মৃত্যুদণ্ডে ইহুদী জাতির কি লাভ হবে ? এরপর তাঁর মনে হঠাৎ করেই একটি চিন্তা খেলে গেল। 'জার্মান জাতির জন্য কি কর্তব্য নয় যে হিটলারের শাসনের সুদীর্ঘ সময় ধরে ইহুদীরা নাজী বাহিনীর যে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ দেয়া

তারপর এই সব ক্ষতিপূরণ কি তাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীকে দেয়া বাহিনীর নয়? (উত্তরাধিকারী বলতে তার ধারণায়– নতুন ইসরাইল রাষ্ট্র)। তার এ মূল্যায়ন ছিল– তার লেখা অনুসারে– উত্তম পন্থায় ন্যায্য বিচার বাস্তবায়ন। তাছাড়া এ হবে ইসরাইলকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় উদ্ধার করা। গোল্ডম্যান তাঁর ড্রায়েরিতে লিখছেন– আমার বিবেক আমাকে বলছিল– "অবশ্যই জার্মানিদের এটা শোধ করতেই হবে।" আমার মন তখন বলছিল– "তাহলে কিভাবে আমি তাদের দিকে হাত বাড়াতে রাজি হতে পারি।"

গোল্ডম্যান জার্মান পার্লামেন্টে নবনির্বাচিত ইহুদী সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং তাঁদেরকে তাঁর নতুন চিন্তাটির কথা জানালেন। তাঁদের একজন বিষয়টিকে উৎসাহিত করলেন ইনি ডক্টর 'নাওযাহ প্যারু' যিনি ইতোমধ্যেই বিষয়টি রাজধানী বন-এ বাজিয়ে দেখেছেন। এরপর তিনি বিষয়টি জানিয়ে দেয়ার জন্য গোল্ডম্যানকে খুঁজলেন। দেখা গেল, তিনি সুইজারল্যাণ্ডের একটি হ্রদের উপকূলে ছুটি কাটাচ্ছেন। সৌভাগ্যের সিঁড়ি ঝুলে থাকল সামনেই। কারণ ডক্টর প্যারু গেলেন 'ফিফিয়া' গ্রামে গোল্ডম্যানের কাছে একথা বলতে যে, জার্মানির চ্যান্সেলর এডেনাওয়ারও ছুটি কাটাতে এখন সুইজারল্যাণ্ডেই রয়েছেন। যে হোটেলে তিনি থাকছেন তা এখান থেকে মাত্র এক ঘণ্টার গাড়িপথ। ডক্টর প্যারু আরও জানান যে, 'আমি এডেনাওয়ার-এর কাছে নাজী নির্যাতনের ক্ষতিপূরণের ধারণাটি তুলে ধরেছি। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ এখন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের হাতে যাবে তাও বলেছি। এডেনাওয়ার এ প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। এখন সময়ের আবেদন হচ্ছে গোল্ডম্যান কাছে গিয়ে এ বিষয়ে বৈঠক করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা।

গোল্ডম্যান বলেন তিনি ডক্টর প্যারুকে অনুরোধ করেন যেন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আগেভাগেই এডেনাওয়ারকে এই ধারণা গ্রহণে আমার প্রস্তুতির সবুজ সঙ্কেত দিয়ে দেন। প্যারু তাঁর দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন। এডেনাওয়ার পার্লামেন্টের বৈঠকে প্রকাশ্য ইঙ্গিত দিয়ে বলেন নতুন জার্মানি চায় না যেমত বন্দী শিবিরগুলোতে যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি হোক। তিনি ইহুদীদের ওপর নির্যাতনের দায় জার্মান জাতির বলে স্বীকার করেন। এই বিন্দুতে এসে গোল্ডম্যান ইসরাইলী সরকারের সাথে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন জার্মানি থেকে ক্ষতিপূরণের দাবি প্রস্তাব ইসরাইলী মন্ত্রিসভায় উপস্থাপিত হলো, তখন এ নিয়ে সদস্যগণ দু'ভাগ হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গোরিয়ন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে শারেট ও অর্থমন্ত্রী ইলইয়াজের ক্যাবলান এই ধারণাকে ইসরাইলের জন্য ত্রাণ হিসাবে জোরালোভাবে সমর্থন করেন, কিন্তু মন্ত্রিসভার ধর্মীয় দলনেতারা এর বিরোধিতা করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, নাজী বাহিনীর হাতে নিগৃহীত ইহুদীদের আত্মারা জার্মানদের যে কোন অর্থকে অপবিত্র বলে গণ্য করে। পক্ষান্তরে বেন গোরিয়ন এ ক্ষতিপূরণের ধারণার

পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, এটা হবে ন্যায়ের বাস্তবায়ন। ক্যাবলান যুক্তি দেখান যে, এটা হবে ধ্বংসোন্মুখ ইসরাইলী অর্থনীতির জন্য ত্রাণস্বরূপ। শারেট যুক্তি দেখান যে, উপরোক্ত দু'জনের যুক্তি ছাড়াও এটাকে আমরা বিশ্ব ইহুদীর প্রতিনিধিত্বকারী ইসরাইল রাষ্ট্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ইউরোপীয় স্বীকৃতি হিসাবে ধরে নিতে পারি। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পাশাপাশি এটা হবে নিঃসন্দেহে ইসরাইলের আঞ্চলিক অবস্থান সুদৃঢ় করার একটি মোক্ষম সুযোগ। নাহুম গোল্ডম্যান ইসরাইল থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে এডেনাওয়ারের সাথে আলোচনা শুরু করে দিলেন। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর দাবির পরিসর বাড়িয়ে দিলেন। এখন ক্ষতিপূরণ কেবল প্রাণের বিনিময়েই রইল না, বরং তাদের সহায়-সম্পদের বিনিময়েও নির্ধারিত হলো।

গোল্ডম্যান যখন আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, এ সময় ডেভিড হোরভেটজ সরকার থেকে একটি বার্তা নিয়ে এলেন। এতে তার কাছে তাড়াতাড়ি করার অনুরোধ জানিয়ে বলা হয় যে, ইসরাইল রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। গোল্ডম্যান তখন এডেনাওয়ারের নিকট যৌক্তিকভাবে ভাঁজ দিয়ে বলেন, ইসরাইল নাজী বাহিনীর হাতে নিগৃহীত হয়ে প্রাণ দেয়ার বিনিময় কখনও নিতে পারে না। সে শুধু নতুন অভিবাসীদের ইসরাইলে পুনর্বাসনের ব্যয় দাবি করছে। ইসরাইল অর্ধ মিলিয়ন ইহুদী অভিবাসীকে জায়গা দিয়েছে। যাদের প্রত্যেকের পুনর্বাসনের জন্য ৩ হাজার ডলার প্রয়োজন। এ হিসাবে জার্মানিকে অবিলম্বে ১.৫ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে। এডেনাওয়ার তা মেনে নেন। কিন্তু ইসরাইলের দাবি বাড়তেই থাকে। কারণ ইসরাইলী মন্ত্রিসভা অনুসন্ধান করে দেখল যে, প্রত্যেক অভিবাসীর জন্য তিন হাজার ডলার যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এডেনাওয়ার জার্মান জাতির দোষ স্বীকার করে নেয়ায় তার দুয়ার ইহুদীদের প্রবেশের জন্য পুরোই খোলা ছিল। গোল্ডম্যান তাঁর ডায়েরিতে বর্ণনা করেছেন, ক্ষতিপূরণ বিষয়ে ইসরাইলী আলোচকবৃন্দ এমনভাবে আচরণ করছিলেন যার কারণে ইসরাইলী প্রতিনিধি দলের প্রধানকে উদ্দেশ্য করে বলতে হয়েছে– সাবধান! পাছে জার্মানরা অনুভব করতে শুরু করে যে, তারা এমন লোকের কাছে ঋণী যারা তাদের জীবিত গোশত থেকে তাদের ধর্মকে কেটে বাদ দিতে চায়। গোল্ডম্যান তাঁর ডায়েরিতে বলেন– আমরা ১.৫ বিলিয়ন ডলারের আবেদন দিয়ে শুরু করেছিলাম, যখন শেষ করলাম ততক্ষণে জার্মানি আমাদেরকে ৬০ বিলিয়ন পরিশোধ করেছে। সে সময়কার মূল্যমানকে বর্তমানের সাথে তুলনা করলে প্রায় ট্রিলিয়নের সমান দাঁড়ায়।

এভাবেই ইসরাইল অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসের হাত থেকে সফলভাবে উদ্ধার হয় কিন্তু ইসরাইলের চারপাশের পরিমণ্ডল কিন্তু কখনও স্থির ও শান্ত ছিল না বরং বিপ্লবের বাতাস– যার আঁচ সে সবার আগেই করেছিল তা কেবল রাজনীতির আগাম বাণীই ছিল না বরং এখন দিকচক্রবালে তার খণ্ড খণ্ড মেঘ আনাগোনা করছে।

॥ ৩ ॥

জামাল আব্দুন নাসের

মিসরে ফেরাউনরা আমাদের বাপ-দাদাদের সাথে যা কিছু করেছে সে কারণে মিসরের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই।

—জুলাই ১৯৫২-এর বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর বেন গোরিয়নের প্রথম বিবৃতি

ইতিহাস কোন শূন্যতা বা গ্যাপ রাখে না। তবে তার অর্থ এই নয় যে, ইতিহাস অনিবার্য কিছু বিষয় যা আইনের আদেশ বাস্তবায়নের মতো একটি অপরটিকে অবধারিত করে দেয়। সে রকমটা আদৌ মানবিক নয়, কাজেই তা ঐতিহাসিকও নয়। কারণ মানব জীবন ও তার গতিধারার কিছু যুক্তি থাকে। যে যুক্তিরও থাকে কিছু কার্যকারণ। এই সকল কারণ সব সময় মৌলিকভাবে একই রকম তবে প্রতিটি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সেগুলো বিভিন্ন রূপ ধরে আসে। সে যুগের ভাষায় কথা বলে। কার্যকারণের সাথে কিছু সচেতন শিক্ষা ও অভিনব সৃষ্টিশীলতা যোগ করে যায়। সম্ভবত এটাই দৃঢ়মূল আমোঘ বিধানের ক্রিয়াশীলতার সাথে ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে তালগোল পাকিয়ে একাকার করে দেয়।

১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই সকালে মিসরে এক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সেনাবাহিনীতে একটি আন্দোলনের সূচনা হয় এবং সহসাই তা গণজাগরণে পরিণত হয় যা অবরুদ্ধ জাতির বিপর্যয়ের মাঝেও তার বাস্তবতাকে অতিক্রম করে নিয়েছে এবং হিম্মতের সাথে দাঁড়াতে সক্ষম করেছে। ২৩ জুলাই সকালের এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিল যে যুবক তার চিন্তা-চেতনায় ছিল এমন কিছু অনুপ্রেরণা যা তাকে দূর থেকে ইশারা দিচ্ছিল যে, মিসরের রাজনীতিতে প্রাচ্যধারার দিন সমাগত।

যে যুবকটি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিল সে ছিল সেনাবাহিনীর এমন কিছু সংখ্যক অফিসারের একজন যারা 'আযীয মিসরী'-কে তাদের আধ্যাত্মিক গুরু মনে করে। (আযীয মিসরী হচ্ছেন তুর্কী বাহিনীতে সূচিত আরব বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক। তারাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেই টগবগে পর্যায়ে বহু চিন্তাবিদ, রাজনীতিক ও আমির ওমরাহ-এর সাথে এ প্রেক্ষিতে যোগাযোগের গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন)।

আর সে বিপ্লবের আমলে যে রাজনীতিককে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করা হয় তিনি ছিলেন আলী মাহের। তিনি হচ্ছেন ত্রিশ দশকের শেষের দিকে বাদশাহ ফারুকের শাসনের শুরুতে প্রাচ্যমুখী নীতির অন্যতম ধারক।

বিপ্লবের প্রথম বছর সবচেয়ে বড় উপদেষ্টা ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক সানহুরি। এই সে ব্যক্তিত্ব যিনি বেশ কিছু সংখ্যক আরব দেশের আধুনিক সংবিধান রচনা করে দিয়েছেন। পরবর্তী মাসগুলোতে বিপ্লব তার প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব সাহায্যকারী নির্বাচন করেছিল তারা ছিল 'যুবতী মিসর'-এর যুবশ্রেণী। যেমন ফাতহী রেদওয়ান ও নূরুদ্দিন তারাফ। এদের মধ্যে আরও কিছু সহায়ক ছিল ইখওয়ানুল মুসলিম-এর তরুণ সমাজ। যেমন আহমদ হাসান আল বাকূরী। কিছু ছিল বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল যেমন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ফুয়াদ জালাল। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, জামাল আব্দুন নাসের নিজেই প্রথমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন 'যুবতী মিসর' দলের একটি বিক্ষোভে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এই বিক্ষোভ মিছিলে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার অন্যান্য যুবকের সাথে রাস্তায় নামেন এবং সেখানে আহতও হন। তাকে বন্দী করা হয়। আল-মুনশিয়ার পুলিশ বিভাগে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটে তাঁর।

এরপর জীবনের একটি পর্যায়ে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সাথে যোগাযোগ ঘটে। হাসান আল বান্নার সাথে পরিচিত হন। তাঁর সহকর্মীদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এঁরা ছিলেন ইখওয়ানুল সংগঠনের সদস্য।

মন্ত্রিপরিষদ মিসরের নতুন নেতৃত্বের প্রতি একটি বিবৃতি দেয়। মন্ত্রিপরিষদ মিসরের সর্বশেষ পরিস্থিতি গভীর আগ্রহের সাথে পর্যালোচনা করছে। ইসরাইলী সরকার আশা করে, কায়রোতে ক্ষমতা গ্রহণকারী সামরিক অফিসারগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, বাদশাহ ফারুক ও তাঁর "পাশা"গণ নিজেদের দেশকে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। তাঁরা দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন যার কোন আবশ্যকতা ছিল না। আর তাও এমন সব বিষয়কে ঘিরে যা মিসরের জন্য আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। মিসরের দরকার ছিল শান্তিপূর্ণ উন্নয়নে তার সকল প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা। ইসরাইলী সরকার এ আশা পোষণ করে যে, মিসর ও ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যে উত্তম প্রতিবেশী ও স্থিতিশীল শান্তিতে নিরাপদ সহঅবস্থানের পন্থা খুঁজে পেতে সক্ষম হবে।

মন্ত্রিপরিষদের এই বিবৃতির সাথে যোগ করে বেন গোরিয়ন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। যার মর্ম হচ্ছে, ফেরাউনরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে যে আচরণ করেছিল সে কারণে মিসরের সাথে ইসরাইলের কোন শত্রুতা নেই। এমনকি গত চার বছর ধরে আবার আমাদের ওপর জুলুম করার জন্যও নয়। যা হবার হয়ে গেছে। আমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে এবং অতীতকে ভুলে যেতে প্রস্তুত রয়েছি। জামাল আব্দুন নাসের সেই শেষ প্রশ্নটির কাছাকাছিই অবস্থান করছিলেন যা ইসরাইলী মন্ত্রিসভার আলোচনায় উত্থাপিত হয়েছিল। এখানে বলা হয়েছিল যে, তাঁর প্রথম ও প্রধান ব্যস্ততা হবে মিসর থেকে ব্রিটিশদের তাড়ানো এবং স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন।

বেন গোরিয়ন যথাসময়ে তা অবগত ছিলেন না। কারণ তথ্যগুলো দেবার উৎস থাকা সত্ত্বেও জানান দিচ্ছিল যে, বিপ্লবের নেতৃত্ব অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। এর পরই দৃশ্যপট ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। প্রকাশ পেল যে, বিপ্লবের আসল নেতা হচ্ছেন ত্রিশের ঘরে বয়সী এক তরুণ সেনা অফিসার। তাঁর কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয় জানা নেই।

বেন গোরিয়ন বর্ণনা করছেন, জেনারেল ঈগল আলোন, যিনি তাঁর মন্ত্রিসভায় একজন সদস্য হয়েছেন, তাঁকে বলেছেন যে, জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে– যখন যুদ্ধকালীন "নাজাবা" কলোনীতে ষষ্ঠ ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডারের সাথে তাঁর কাছে এসেছিলেন আলোন যখন জামাল আব্দুন নাসের– এ নামটি শোনলেন তখনই এই আবিষ্কারে উপনীত হলেন। একটু চিন্তা করেই তাঁকে মনে করতে পারলেন। তিনি এও বললেন যে, তাঁর যে ভাবের বহিপ্রকাশ ঘটেছিল তাতে মনে হয়েছে তিনি জাতীয়তাবাদী সেনা অফিসার, যাঁর ভাবনা কেবল মিসরকে ঘিরে, এর চেয়ে বেশি কিছুতে তার আগ্রহ নেই, (তবে এটা ছিল তার নিজের দাবি, যা বিভিন্ন ঘটনা সমর্থন করে না। আলোনের কাছে এ ধরনের মন্তব্য করার কোন উপায় বা মাধ্যম ছিল না। কারণ ঐ বৈঠকে জামাল আব্দুন নাসের তাঁর মুখ খুলে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। তিনি একবার মাত্র ঐ বৈঠকে ঢুকেছিলেন একটি ছোট চিরকুট লিখে এ্যাডমিরাল সাইয়্যেদ ত্বহার নজরে রাখার জন্য)। কিন্তু আলোন থেকেও গ্রহণযোগ্য সূত্র ছিল বেন গোরিয়নের কাছে। তিনি হচ্ছেন একজন ইসরাইলী সামরিক অফিসার, যাকে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের প্রেক্ষাপটে ফালুজায় অবস্থিত মিসর বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

তাঁর নাম ইরিভান কোহেন। এই অফিসার দুবার চাক্ষুষভাবে মেজর আব্দুন নাসেরকে দেখেন। একবার দেখা হয় হারাম এলাকায়, যখন তিনি সেখানে সাদা পতাকা ওড়াবার উদ্দেশ্যে "ইরাক আল্ মুনশিয়ায়' যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয়বার দেখা হয় যুদ্ধের পর; যখন প্রকাশ পেল যে, জামাল আব্দুন নাসেরের নেতৃত্বাধীন মিসর বাহিনী এক শ' আঠারো ইহুদী সিপাইকে অজ্ঞাত স্থানে পুঁতে রেখেছে। এরা যুদ্ধের সময় ধরাশায়ী হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর এদের কবরের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী নিহত বার্নাডটের উত্তরাধিকারী ডঃ র‍্যালফ পাঞ্চ চেষ্টা করছিলেন যেন সেই মিসরীয় অফিসারটিকে' ইরাক আল্ মুনশিয়ায়' তাঁর পুরনো যুদ্ধ ময়দানে ফিরিয়ে এনে তাঁকে বলবেন যেন তাঁর নিহত শত্রুদের গণকবরের সন্ধান দেয়।

শান্তি বাহিনীর এক দল অফিসারের সাথে জামাল আব্দুন নাসের সেখানে গেলেন। তখন কন্টাক্টিং অফিসার হিসাবে ছিলেন ইসরাইলী সেনা কর্মকর্তা ইরিভান কোহেন। ইরিভান কোহেন বর্ণনা করেন– ইরাক আল্ মুনশিয়ার পথ জুড়ে জামাল আব্দুন নাসেরের আলাপ হয়েছিল ইংরেজদের নিয়ে এবং কিভাবে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ

ম্যান্ডেটরি জীবনের শেষ পর্যায়ে হাজানাহ্ বাহিনী তাঁদের ওপর নির্মম আঘাত হানতে সক্ষম হয়। (ঈগল-এর বর্ণনার মধ্যে এটা ছিল সহির কাছাকাছি।)

আসলেও জামাল আব্দুন নাসের "বিদেশী হটানো ও স্বাধীনতা অর্জনের" প্রতি তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন। এটি ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান অগ্রাধিকার। এরপর রয়েছে কৃষি খাত সংস্কারের মতো সামাজিক অগ্রগতির কর্মসূচী। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও বিবেচনায় ছিল। স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন পরিষদের দায়িত্বে বিভিন্ন প্রকল্পও এর অধীন ছিল। এর পাশাপাশি সেবা পরিষদ গঠিত হয়। বাদশাহ্ ফারুক ও তাঁর পরিবারের সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ এ পরিষদের হাতে চলে যায়। এটি ছিল মিসরে সমূলে রাজতন্ত্র বাতিল করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর। সে সময়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা বা তার নাগরিকদের অবস্থা জামাল আব্দুন নাসেরের চিন্তার বিষয় ছিল না। সম্ভবত তিনি ফিলিস্তিনের চেয়ে মিসরের প্রতিই বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন।

ষষ্ঠ ব্যাটালিয়নের সাথে ফিলিস্তিনে যাবার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তিনি যে রেলগাড়িতে সুয়েজ খাল অতিক্রম করতে যাচ্ছেন সুয়েজ খালের সেই ঘাঁটিতে অবস্থানরত ইংরেজ সৈন্যরা গাড়িতে উঠে তাঁকে চেক করে এবং তারপর তাঁকে যেতে অনুমতি দেয়।

তিনি অবাক হলেন যে, একটি সেনাবাহিনী অন্য একটি দেশকে উদ্ধার করতে যুদ্ধে যাচ্ছে অথচ তার নিজের দেশই বিদেশী বাহিনীর দখলে, যারা স্বদেশী বাহিনীকে চেক করছে আর অন্যত্র যেতে দিচ্ছে অথবা দিচ্ছে না। একই সঙ্গে নাসের দেখেছেন কিভাবে কায়রোতে যুদ্ধের চাকা ঘুরছে। এতে তাঁর এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো যে, মিসরের সমস্যা হচ্ছে কায়রোতে– ফিলিস্তিনে নয়।

জামাল আব্দুন নাসের এ দুটো অভিজ্ঞতাকে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে 'বিপ্লবের দর্শন' শিরোনামে প্রকাশিত একটি ছোট্ট পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন।

নাহুম গোল্ডম্যান তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন, তিনি একদিন বেন গোরিয়নের নিকট গিয়ে দেখেন যে, তাঁর হাতে একটি ছোট্ট বই যার কভারে রয়েছে এক মিসরী তরুণ সেনা অফিসারের ছবি। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'কি পড়ছো ডেভিড ?'

পুস্তিকাটি হাতে ধরা অবস্থায়ই সে বেন গোরিয়নকে উত্তর দিল ঃ "মিসরের এই তরুণরা ইসরাইলের সাথে চুক্তি করেনি। এ পুস্তিকাটির লেখক হচ্ছে একজন যুবক যাকে আমরা এখন চিনি 'মিসর বিপ্লবের নেতা' হিসাবে। আপনার এ বইটি পড়া দরকার। এটি হিটলারের "কেফাহি" বইটি থেকেও জঘন্যতর ... এখানে যা কিছু লেখা আছে, খুবই বিরক্তিকর। এই যুবকরা ইসরাইলের জন্য ফারুকের শাসন থেকেও বেশি বিপজ্জনক। এরা আমাদের প্রত্যাখ্যান করছে। এরা ইসরাইলকে প্রত্যাখ্যান করছে, আমাদের সাথে কখনও শান্তি স্থাপন করবে না। অচিরেই এদের সাথে আমাদের সংঘাত অবধারিত, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

॥ ৪ ॥

জেফারসন কাফরি

"২৩ জুলাই থেকে কোন মানুষের কাছে চিঠিপত্র লেখার কোন সময় পাইনি।"

—কায়রোস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জেফারসনের প্রতি জামাল আব্দুন নাসের

আরবের সাধারণ জনগণই কেবল "পবিত্র ঃ নিষিদ্ধ" -এর বিধানাবলী গ্রহণ অথবা বর্জন করে থাকেন। জনগণের এই মোর্চাগুলো নিজেদের যুক্তি এভাবে দেখান যে, একটি সময় আসবে যখন জীবনের সহজাত আবেদনেই তারা তাদের ইচ্ছার আভরণে প্রত্যাখ্যানকে জোরদার করতে সক্ষম হবেন, নেতিবাচক মোকাবিলাকে সক্রিয় মোকাবিলায় পরিণত করতে পারবেন। কিন্তু শাসন ব্যবস্থা আর সরকারগুলো ছিল অন্য প্রান্তে, যদিও তাদের এই প্রান্তিকতাকে গোপনীয়তার চাদরে ঢেকে রাখতে প্রয়াস পেয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সালের বিপ্লবের আগে এমনটি কখনও ঘটেনি যে, ইসরাইলের সাথে কোন না কোন উপায়ে বেশ কিছু আরব পক্ষের সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়েছে।

১৯৫১ সালে বাদশাহ আব্দুল্লাহ আততায়ীর হাতে নিহত হওয়া সত্ত্বেও ইসরাইলের সাথে যোগাযোগ চলেছিল। যদিও এর মাত্রা কিছুটা কমেছিল এবং এ সবের বিবরণের গোপনীয়তা কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। আম্মান বাদশাহ আব্দুল্লাহর গোপন হত্যা থেকে শিক্ষা নিয়ে কিছুটা সচেতন হয়ে যায় এবং বাদশাহ মৃত্যুর পূর্বে যে সন্ধিচুক্তি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, সে চুক্তির প্রকল্প থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বস্তুত পশ্চিম তীরকে বাদশাহ আব্দুল্লাহ রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করার পর এ বিষয়ে তার ব্যস্ত থাকার আর কোন প্রয়োজনই থাকেনি। তাছাড়া এ সব শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও সমস্যাপীড়িত ভূমির বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। চুক্তি করার ঝুঁকিও ছিল অনেক। তাছাড়া ইসরাইলও সে সময় জর্ডানের সাথে চুক্তি চাচ্ছিল না। কারণ এটা ছিল তখনকার মতো অপ্রয়োজনীয় একটি বন্ধন।

এদিকে সিরিয়া ইতোমধ্যেই শান্তি কমিটির বৈঠকগুলোর মধ্য দিয়ে ইসরাইলের সাথে তার যোগাযোগের চ্যানেল খুলেছিল। এটা ছিল হুসনী যাঈমের বিপ্লবের পর প্রতিনিধিত্বের পর্যায় উন্নীত করার পর। এই চ্যানেলটি "আদীব শিশকলীর" অভ্যুত্থানের আগ পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছিল। দ্বিতীয়বার যোগাযোগ হয়েছিল শান্তি কমিটির ছত্রছায়ায়। এখানে প্রতিনিধিত্বের পর্যায় আরেকটু বেশিতে উন্নীত করা হয়।

এ সব যোগাযোগ পরবর্তীতে ইসরাইলী বাহিনীর চীফ অব ওয়ার স্টাফ জেনারেল মোশে দায়ান ও কর্নেল সালাহ্ জাদীফ মধ্যকার নিয়মিত বৈঠকের রূপ লাভ করে। এ সময়ে যে সীমিত আকারের চুক্তিগুলোর বিস্তারিত বর্ণনায় ইসরাইলী ও আমেরিকান নথিপত্র ভরপুর, এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে একটি চুক্তি ছিল 'হাওলা' অঞ্চলের অস্ত্রমুক্ত এলাকা বণ্টন। এদিকে লেবাননের সাথেও বিভিন্ন পর্যায়ে এমনকি কখনও কখনও প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্র ছিল উন্মুক্ত। বরং সৌদি আরব পরোক্ষ ও এক রকম সরাসরি যোগাযোগও রেখে যাচ্ছিল।

কারণ 'ট্যাবলেন' চুক্তি প্রস্তুতকালীন আলোচনার সময় আমেরিকান কোম্পানিগুলো বিভিন্ন চিঠিপত্র চালাচালি ও বৈঠকের ব্যবস্থাদি করত। এর কয়েকটি হয়েছিল নিউইয়র্কের "প্লাজা" হোটেলে।

এর চেয়েও এক কদম এগিয়ে ইসরাইলী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা পরিচালক শিলওয়াহ্ সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমীর ফয়সলের সাথে জেদ্দায় এসে বৈঠক করেন। শিলওয়াহ-এর বৈঠকে যোগদান ছিল আমেরিকান পেট্রোল ডেলিগেশনের মোড়কে। কেউ তার পরিচয় পরখ করে দেখার ছিল না। মিসরের সাথেও অবস্থার কোন ব্যত্যয় ছিল না।

১৯৪৮-এর আগে ইহুদী এজেন্সির সাথে প্রাসাদ, প্রধানমন্ত্রীবৃন্দ ও বিভিন্ন দলনেতাদের যোগাযোগ ছিল। এজেন্সির প্রতিনিধিত্ব করতেন প্রধানত "ইলইয়াহু সাসূন"। তাঁর পাশাপাশি ছিলেন রাব্বি হায়েম নাহুম আফেন্দী ও মিসরের ইহুদী সম্প্রদায়ের দিকপালগণ।

যুদ্ধের পর যোগাযোগের বেশ কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয় প্যারিসে নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের সময়। এরপর সমন্বয় কমিটির বৈঠকগুলো সংগঠিত হওয়ার সময় লোযানে। এরপর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বিভিন্ন বৈঠকের খোলসে।

বিপ্লব ঘটার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ইলইয়াহু সাসূন তুর্কি পাসপোর্টে কায়রো পৌঁছলেন। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে "মিনা হাউজে" উঠলেন এবং মিসরের বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এদের মধ্যে ছিলেন হুসেন সেরি পাশা, আহমদ আবূদ পাশা– ইনি ছিলেন বেশ প্রভাবশালী এক ধনকুবের। রাজনীতিতে ছিল তার হাত। এ ছাড়া এদের মধ্যে ছিলেন– কায়েমকাম ইসমাইল সিরিন– ইনি শান্তি কমিটিসমূহে মিসরের প্রতিনিধি (পাশাপাশি তিনি ছিলেন বাদশাহর সামরিক উপদেষ্টা ও ভগ্নিপতি)।

এমনকি বিপ্লব ঘটার মাত্র কয়েকদিন আগে সাসূন এবং সম্ভবত অন্যান্য ইসরাইলী প্রতিনিধি ইউরোপে একাধিক ওয়াফদ নেতার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটা নিশ্চিত যে, জুলাইয়ের মাঝামাঝি সাসূন ও তৎকালীন আল মিসরী পত্রিকার মালিক অধ্যাপক

মাহমুদ আবুল ফাত্‌হ-এর মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছিল। ইনি ওয়াফদ পার্টির নেতাদেরও বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশেষ করে আমেরিকান ও ইসরাইলী নথিপত্রে এই সকল বৈঠকের ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৫২ সালের ৩১ জুলাই অর্থাৎ বিপ্লবের এক সপ্তাহ পর ওয়াশিংটনস্থ ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত আবা ইবান আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমুখে রওনা হলেন। মন্ত্রণালয়ে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সহকারী সচিব বার্কার হার্ট ও আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিসর বিষয় ডেস্ক প্রধান-এর সাথে তার এ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে।

আবা ইবানের সাথে ছিল বেন হুরেন। ইনি হচ্ছেন আমেরিকান দূতাবাসের গোয়েন্দা শাখার দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আবা ইবান আলাপ এভাবে শুরু করেন (যেমনটি স্টাপলার সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে– ডকুমেন্ট নং ৩১৫২/ ৭৭৪০০/৭) ঃ "মিসরে সংঘটিত সর্বশেষ পরিস্থিতির পর থেকে তিনি ও তাঁর সরকার সেখানকার চলমান ঘটনাবলীর মর্ম ও ফলাফল সম্পর্কে কেবল চিন্তাই করে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সম্প্রতি তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে শারেটের সাথে তেলআবিবে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ভেডেজের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা উত্থাপন করেন। ঐ বৈঠকের সারসংক্ষেপ তিনি পেয়েছেন। আবা ইবান বলেন, মিসরের ঘটনাপ্রবাহ কোনদিকে মোড় নেবে তা আগাম বলার সময় এখন আসেনি। কিন্তু তিনি ও তাঁর সরকার মনে করে যে, কায়রোতে পরিস্থিতির নবতর উত্তরণ বা আলামতগুলো নিয়ে আমেরিকা ও ইসরাইলী সরকারদ্বয়ের মধ্যে সংলাপ ও যোগাযোগ অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়। হয়ত এসব সংলাপ এমন কিছু দিকনির্দেশনা দিতে পারে যা হবে খুবই উপকারী।" আবা ইবান তাঁর মতামত দিয়ে বলেন, বাদশাহ ফারুকের পতন ইসরাইলের জন্য কোন মাথা ব্যথার কারণ নয়। কারণ বাদশাহ তাঁর আচার-ব্যবহারে ছিলেন নিত্যপরিবর্তনশীল। তাছাড়া ইসরাইলের সাথে তাঁর শত্রুতা ছিল প্রকাশ্য। যদিও শেষের দিকে তাঁর কিছু সহকারীকে ইসরাইলের সাথে শান্তি স্থাপনের শর্তাদির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন। অপরদিকে জেনারেল নজীবের রাজনৈতিক আদর্শ বা ঝোঁক বোঝার মতো কোন আলামত স্পষ্ট হচ্ছিল না, যাতে সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেয়া যেতে পারত বা তার ওপর ভিত্তি করে কোন পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। তবে আলামতদৃষ্টে মনে হয়, সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। জেনারেল নজীব সম্পর্কে মিসরীয় সংবাদপত্রগুলোতে একটি কথা ঘুরেফিরে আসছে যে, "ফিলিস্তিন যুদ্ধের মহান বীর" এমন কি খোদ ফিলিস্তিন যুদ্ধ সম্পর্কেও অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে এ কথাও উঠেছে যে, ফিলিস্তিন যুদ্ধে অনেক নষ্ট হাতিয়ার সরবরাহ করা হয়েছিল এবং সেটি ছিল তাদের পরাজয়ের কারণ। আবা ইবান বলেন, ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ফিলিস্তিন যুদ্ধে জেনারেল মুহাম্মদ

নজীবের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু এ যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট আলামত খুঁজে পায়নি। কিন্তু ইসরাইল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিলিস্তিন যুদ্ধ সম্পর্কে কেবল আলোচনাই চাই, তা কেবল মনে করিয়ে দেয়ার মতো হলেও তা-ই মিসরীয় বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে শত্রুতামূলক চিন্তা-ভাবনা জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। এরপর 'আবা ইবান' ইসরাইলের চারপাশের দেশগুলোতে সামরিক ডিক্টেটরদের আত্মপ্রকাশে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এতে সিভিল ধারণাটি সঙ্কুচিত হয়ে সামরিক ধ্যান-ধারণা বড় করে দেখানো হচ্ছে, যেমনটি ঘটেছে সিরিয়াতে। আবা ইবান একটি বাস্তবতার দিকে ইশারা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সিরিয়ার 'শিশকলী'-এর সাথে আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে যোগাযোগের জন্য বহুবার আহ্বান জানিয়েছিল। এইসব যোগাযোগ খুব সীমিত ফলদায়ক ছিল যা সাধারণ দৃশ্যপটে তেমন কোন প্রভাবই রাখতে পারেনি। এরপর আবা ইবান ইসরাইলের সাম্প্রতিক যোগাযোগের উল্লেখ করেন। বিশেষ করে ইউরোপে মিস্টার সামূন ও মিস্টার ডেবোনের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন। উভয়েই সেখানে আল্-ওয়াফদ পার্টির কিছু বড় ব্যক্তিত্বের সাথে যোগাযোগ করেন। এসব যোগাযোগ চলেছিল কায়রোতে বিপ্লবের আগে এবং অব্যাহত থাকে বিপ্লবের পরেও। কিন্তু ইসরাইল এখন জানে না সে সকল যোগাযোগ আসলে কতদূর সিরিয়াস ছিল। কারণ মিসরের সেই সকল বড় ব্যক্তিত্ব এখন ইউরোপ ত্যাগ করে মিসর ফিরে গেছেন। আবা ইবান এও বলেন যে, ইউরোপে যে সকল ইসরাইলী প্রতিনিধি ছিলেন, তাদের এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, ওয়াফদ পার্টির যে সকল সদস্যের সাথে তাঁরা দেখা করেন তাঁরা মিসর-ইসরাইল মীমাংসার বিরোধী ছিলেন না। কারণ তাঁরা মনে করতেন, দু'দেশের মধ্যে আসলে তেমন কোন বিরোধ নেই। কাজেই মিসরের নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাই উত্তম, ফিলিস্তিনে তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবনে হার্ট ও স্টাবলারের সাথে আলোচনায় আবা ইবান এই মৌলিক বিন্দুতে পৌঁছেন, যার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। 'তিনি বলেন, "কায়রোতে নিয়োজিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জেফারসন কাফরি কায়রোতে পূর্ণ আস্থা ও সমীহভাজন। এছাড়া সেখানকার রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর ব্যাপক প্রভাবও রয়েছে।" আবা ইবানের বিশ্বাস– কাফরি এমন এক কেন্দ্রীয় অবস্থানে আছেন যেখান থেকে তিনি মিসরের নতুন সরকারকে ইসরাইলের সাথে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে নসিহত করতে পারেন। আবা ইবান আরও বলেন, এ ক্ষেত্রে অনেক সমস্যাও আছে, সেটা তিনি জানেন। এর মধ্যে রয়েছে তরুণ অফিসারবৃন্দ যারা কায়রোর ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, তারা ব্রিটেনের সাথে তাদের সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেবে। কিন্তু তিনি আশা করেন যে, কাফরি যদি তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সফল হন তাহলে তাদেরকে বোঝাতে

সক্ষম হবেন যে, ব্রিটেনের সাথে তাদের সমস্যা সমাধানের আগে ইসরাইলের সাথে এক রকম সমঝোতা করে নেয়া আবশ্যক।

ইবানের উত্তরে হার্ট বলেন, তিনি এ বিষয়ে একমত যে, মিসরের নতুন ক্ষমতাসীনদের অভিপ্রায় বোঝার এখনও সময় আসেনি। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই বাস্তবতাকে সমর্থন করছেন যে, বিপ্লবের নেতা নজীবও নয়, আলী মাহেরও নয়, যাকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়েছে। এরা তাদের কোন প্রকাশ্য বিবৃতিতে ইসরাইলের দিকে ইশারা করেনি। আর নজীবকে যে 'ফিলিস্তিনের বীর' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তা দিয়ে মিসরের নতুন সরকারের প্রতি ইসরাইলের চোখ রঙিন করা উচিত হবে না। আর ইসরাইলের চারধারে সামরিক একনায়কদের যে ভয় ইসরাইলের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে সে সম্পর্কে বলা যায়, 'যুক্তরাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করে কোন সরকার পরিবর্তনের নীতিতে বিশ্বাসী নয়। এতদসত্ত্বেও এটা স্বীকার করতে হয় যে, সেনা কর্মকর্তারা এক প্রকার স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হবে। বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় আর ঘুষ বন্ধ হবে। যাহোক, আমেরিকা সরকার মিসরে ঘটমান পরিস্থিতিকে গভীর মনোযোগের সাথে অনুসরণ করে যাবে। সে মনে করে ব্রিটেনের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার অর্থ এ নয় যে, ইসরাইল ও তার চারপাশের আরব দেশগুলোর সাথে শান্তির প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করবে। আগস্ট মাস জুড়ে ইসরাইল প্রায় কায়রোর ওপর থেকে তার নজর ফেরায়নি। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত মিসর যে পদ্ধতিতে নিয়েছিল তা সমালোচনা করে জেনারেল নজীব বিপ্লবোত্তর এক সংবাদ সাক্ষাৎকার দিলেন তখন। পরদিনই (১৮ আগস্ট) ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গোরিয়ন 'নেসেট'-এ দাঁড়িয়ে আবার বললেন– 'মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শত্রুতার কোন সত্যিকার ভিত্তি নেই।'

ইসরাইল ইতোমধ্যেই মিসরের প্রতি তার শুভ কামনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। কারণ, যখন গত ২৫ জানুয়ারি ইসমাইলিয়ার ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ইংরেজ ও মিসরীয়দের মধ্যে সমস্যা জট পাকিয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে সশস্ত্র-সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন ইসরাইল এ সুযোগকে ব্যবহার করতে চায়নি। এরপর বেন গোরিয়ন বলেন, "আমরা জেনারেল নজীবের সাথে একমত যে, ১৯৪৮-এর মে মাসে ইসরাইলের যুদ্ধে মিসরের অংশগ্রহণ ছিল তৎকালীন মিসরীয় শাসকদের একটি বোকামি। আমরা আশা পোষণ করি যে, মিসর একটি যুগ থেকে আরেকটি যুগে সাফল্যের সঙ্গে পদার্পণ করবে। তবে ইসরাইল অবশ্যই মিসরের ভূমিকাকে পূর্ণ সহায়তার সাথে লক্ষ্য রেখে যাবে।"

একই দিন, তেলআবিবে নিয়োজিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ওয়াশিংটনে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত তারবার্তা অনুসারে (ডকুমেন্ট নং ২২৫৩/৮/ ক

৭৬৪০৮৪) – পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে শারেট আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন, নেসেটে বেন গোরিয়নের ভাষণ ছিল মিসরের নতুন নেতৃবৃন্দের প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান। এটি খুবই যত্নবান একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এটা শারেটই বেন গোরিয়নকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে মিসরের নতুন প্রশাসনের প্রতি প্রকাশ্যে শুভ ইচ্ছা ব্যক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এটা কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে বা কোন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে না পাঠিয়ে নেসেটের মঞ্চ থেকেই আহ্বান করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। শারেট আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে এও বলেন, বেন গোরিয়ন তাকে বলেছেন যে, তিনি মিসরের নতুন প্রধানমন্ত্রী আলী মাহেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ১৯৩৯ সালে লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে তাঁর সাথে বেশ কয়েকবার আলোচনাও করেন। আলী মাহেরই তখন মিসরীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এরপর শারেট আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে বলেন, তাঁরা অনুভব করছেন যে, মিসরের পক্ষ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলবে। প্যারিস থেকে তাঁদের কাছে কিছু দূরবর্তী ইঙ্গিত এসেছে যাতে এ সম্ভাবনা টের পাওয়া যাচ্ছে। মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, এ কাজে শ্যামুয়েল ডেভোনকে পাঠানো হবে। ইনি ইতোপূর্বে মিসরীয়দের সাথে বিশেষ করে সর্বশেষ প্যারিসে ওয়াফদ পার্টির নেতাদের সাথে যোগাযোগে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইনি অচিরেই ফ্রান্সে তাদের দূতাবাসে কাউন্সিলর হিসাবে যুক্ত হবেন। তাঁদের কেউ কেউ সেখানে বা 'বারেন'-এ তাঁর সাথে যোগাযোগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা যোগাযোগের চ্যানেল স্থাপনে আগ্রহী এবং এর মাধ্যমে যে কোন বার্তা লাভের এন্টেনা হিসাবে এটাকে কাজে লাগাতেও প্রস্তুত।"

১৯৫২ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে প্যারিসে মিসরী দূতাবাসের একজন কাউন্সিলর বারুনের বাসভবন 'মিন্‌শা'তে নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বারুন ও তাঁর পরিবারের বিরাট স্বার্থ ছিল মিসরে। সেখানেই প্যারিসে ইসরাইলী দূতাবাসে নিযুক্ত নতুন কাউন্সিলর শ্যামুয়েল ডেভোনের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। তখন ইসরাইলী কাউন্সিলর মিসরীয় কাউন্সিলরের দিকে অগ্রসর হন। সেখানেই তিনি মিসরের নতুন প্রশাসনের প্রতি ইসরাইলের অনুভূতিগুলো চালান করতে থাকেন। ডেভিড বেন গোরিয়ন ইসরাইলী সংসদে দাঁড়িয়ে যা বলেছিলেন তার গণ্ডিতেই ছিল তাঁর আলাপ, সহসাই এ কথাটি যোগ করলেন যে, তিনি যে কোন জবাব পৌছাতে বা যে কোন প্রশ্ন গ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

প্যারিসের মিসরী দূতাবাস এ ঘটনা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট লিখে পাঠায়। রিপোর্টটি 'আলী মাহের পাশা'র হস্তগত হলো। তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। প্রতিবেদনটির ওপর আলী মাহের মার্কিং করে

লিখেছিলেন, জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ইসরাইলীদের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু না জেনে আমরা কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি না। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর গুণেও ইসরাইলী কাউন্সিলর তাঁর মিসরী প্রতিপক্ষ থেকে কোন জবাব পাননি। হঠাৎ তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের তিন সপ্তাহ পর তিনি একটি পত্র প্রেরণ করেন। এতে লেখা ছিল ঃ "তিনি তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব পেশ করেন তার উত্তর আশা করছি। এর জবাব না মিললে প্রচার মাধ্যমে এটা জানানো হবে যে, ইসরাইল মিসরের নতুন প্রশাসনের সাথে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কিন্তু এই পদক্ষেপের উত্তরে নীরবতা ছাড়া কিছুই মেলেনি। এতে ইউরোপ ও আমেরিকার সাধারণ জনমত মিসরের বিপক্ষে যেতে পারে।" আলী মাহের পাশা আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জেফারসন কাফরিকে ডেকে বললেন, ইসরাইলের এ ধরনের আচরণ তাদের সন্ত্রাসী-স্বভাবেরই বহিপ্রকাশ।

তবে কাহিনী এখানেই শেষ নয়। ১৯৫২-এর ১৭ সেপ্টেম্বর ইসরাইলে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ডেফেস পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট এক তারবার্তা পাঠান। (ডকুমেন্ট নং ১৭৫২-৯/৩২০)। এতে তিনি বলেন ঃ আজ অপরাহ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শারেট আমাকে জানালেন যে, তাদের প্যারিসস্থ দূতাবাসের কাউন্সিলর তাঁকে টেলিগ্রাম করেছেন যে, তিনি একটি বার্তা পেয়েছেন যাকে মিসরের নতুন প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সাক্ষাতের দাওয়াত বলে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ তাঁকে এক ব্যক্তি, জেনারেল নজীব-এর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি পরিচয়ে জানাল যে, তাঁর পক্ষ থেকে সে একটি পত্র বহন করে এনেছে। এর মূল প্রতিপাদ্য হলো ঃ তাঁর প্রশাসন ইসরাইলের প্রতি কোন শত্রুতামূলক গোপন দুরভিসন্ধি পোষণ করছে না। যদি তারা পত্র-পত্রিকায় তাঁর বা অন্য কোন মিসরী নেতার বলে কথিত কোন বিবৃতি পড়েও থাকেন, এটাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার দরকার নেই। এই ব্যক্তি ইসরাইলী কাউন্সিলরকে বলে, নজীব এখন ব্রিটিশদের সাথে আলোচনার জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। এতদসত্ত্বেও তিনি কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে ইসরাইলীদের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগকে কাজে লাগাতে চান। এই ব্যক্তি সেই সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো কি তা বিস্তারিত বলেনি। শারেট আমাকে এ কাহিনী শোনাবার সময় বলেন যে, এই বার্তার উৎস 'আলী মাহের' বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি এও বলেন যে, এ কথার সত্যতা যাচাই করার মতো কোন উপায় ইসরাইলী সরকারের নেই। বর্তমানে তারা ইসরাইলী সরকারের সাথে যোগাযোগ করবে প্যারিসে নিযুক্ত মিসরী প্রতিপক্ষের প্রতি ইসরাইলী কাউন্সিলরের পাঠানো পত্রের উত্তর হিসাবে। শারেট আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি শ্যামুয়েল ডেভোনকে কিছু নির্দেশনা পাঠিয়েছেন। এতে তাঁর সাথে যোগাযোগকারী ঐ ব্যক্তিকে নিম্নরূপ জবাব দেয়ার জন্য তাঁকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ঃ

১. তারা এই বার্তাকে মূল্যায়ন করছেন, অন্তত এটি শত্রুতামূলক নয়।

২. ইসরাইল গভীর গুরুত্ব ও আগ্রহের সাথে আপন পরিস্থিতি উন্নয়নে মিসরের প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে।

৩. তারা প্রস্তাব করছেন যে, মিসরই এ ধারার সূচনা করে নতুন ভূমিকে চাষাবাদ উপযোগী করার ইসরাইলী অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কারণ মিসরের নতুন প্রশাসন এ বিষয়কে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। ইসরাইল তার কৃষি অভিজ্ঞতাকে মিসরের সামনে মেলে ধরতে প্রস্তুত রয়েছে।

মনে হয় এ সময় কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জেফারসন কাফরি প্যারিসের সাথে এই সব যোগাযোগের মধ্যে কোন না কোনভাবে সিমেন্ট প্রলেপ লাগাচ্ছিলেন। এ প্রেক্ষিতেই তিনি প্রধানমন্ত্রী আলী মাহের-এর কাছে সাক্ষাতের সময় চান। কিন্তু সেদিনটিতেই আলী মাহের তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। আলী মাহেরের কার্যালয়ের সচিব আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে জানান যে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর এ্যাপয়েন্টমেন্ট পিছিয়ে দেয়া হলো। কারণ তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগপত্র পেশ করেছে। এ সময় কাফরি তাঁকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেগুলো পেশ না করেই তাঁর সচিবকে তিনি প্রশ্ন করলেন যে, প্যারিস হয়ে ইসরাইলের সাথে কোন যোগাযোগ হয়েছে কিনা। প্যারিসের মিসরীয় দূতাবাসের রিপোর্টের ওপর আলী মাহের যে মার্কিং নোট লিখেছিলেন তা এই সচিব জানতেন। এ প্রেক্ষিতেই তিনি কাফরিকে জবাব দিয়েছিলেন যে, যোগাযোগ চালিয়ে যেতে মিসরের কোন আপত্তি নেই। তবে শর্ত হলো ইসরাইলকে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সেমতে কাজ করে যেতে হবে।" কাফরি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "কোন্ সিদ্ধান্তের কথা বলছেন?" আলী মাহের-এর সচিব বললেন, বিভক্তি, শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও আল্-কুদসের পরিস্থিতি সম্পর্কিত জাতিসংঘের সকল সিদ্ধান্ত। প্যারিসে কি হচ্ছে এ ব্যাপারে কাফরি কোন সদুত্তর পেলেন না।

বস্তুত প্যারিসে কিছু একটা ঘটছিল। কিন্তু তা ছিল শারেটের লালিত স্বপ্নের চেয়ে কম। যার ব্যাপারে আলী মাহের ছিলেন শঙ্কিত অথচ কাফরি সেটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আসল ব্যাপারটা ছিল এ রকম– মিসরের নতুন প্রশাসন তার প্রথম পদক্ষেপেই তথ্য মাধ্যমকে ঢেলে সাজানোর দিকে মনোনিবেশ করেছিল। উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, উত্তরাধিকারসূত্রে তারা যে প্রশাসনযন্ত্র পেয়েছে তার সার্ভিসে আস্থা তথা পারঙ্গমতা নিশ্চিত করতে পারছে না। অথচ সময়ের আবেদন ছিল যেন সবচেয়ে বেশি পরিমাণ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা, যাতে সুয়েজ ক্যানেলের ঘাঁটির ভাগ্য নিয়ে আসন্ন আলোচনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে সম্পর্কের অবস্থান বুঝে-শুনে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে নেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী ছিল ঃ

১. লণ্ডন– কারণ সুয়েজ ক্যানেলের উভয় তীরেই ছিল ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি।

২. প্যারিস– কারণ হচ্ছে খোদ সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানি। এটা সবার জানা ছিল যে, পর্দার অন্তরাল থেকে হলেও এই কোম্পানিই ছিল যে কোন আলোচনার গতিধারায় এক প্রভাবশালী ও চাপ সৃষ্টিকারী শক্তি। এ প্রেক্ষাপটে তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাকানিজম দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করে ঃ একজনকে লণ্ডনে, দ্বিতীয় জনকে প্যারিসে।

লণ্ডনের প্রতিনিধির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু প্যারিসে প্রেরিত প্রতিনিধির ছিল একটি সমস্যা । তার আগে থেকেই কিছু রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং যোগসাজশ ছিল। তার মনে জাগল যে, কায়রোতে বিপজ্জনক মনে হচ্ছে এমন সব তথ্য লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা হবে সহজভাবে অগ্রসর হওয়া। প্যারিসে পৌঁছার পর যখন তিনি শুনতে পেলেন মিসরী কাউন্সিলরের সাথে ইসরাইলী কাউন্সিলর কি করেছেন তখন তাঁর মনে জাগল যে কাহিনী তার ঘাড়ে, তার কাঁধে ভর করেই চূড়ান্ত রূপ দেয়া যাক। অথবা সে সময় তথ্য সংগ্রহের নামেও চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। এই ভাবনা থেকেই তিনি নিজেই শ্যামুয়েল ডেভোনের নিকট গিয়ে নিজেকে জেনারেল নজীবের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিলেন, অথচ তা সঠিক ছিল না। তাঁর আন্দাজ ছিল যে, এতে হয়ত এমন দরজা খুলে যাবে যাতে স্বয়ং সিংহের গুহা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু ঐ ইসরাইলী এত সাদাসিধা ছিল না যে, মিসরী প্রতিনিধিকে এতটুকুন আসল তথ্য দিয়ে দেবে। একই সময় প্যারিসে এই প্রতিনিধিকে যে অফিস পাঠিয়েছিল তারা সহসাই আবিষ্কার করল যে, প্যারিসে তার খরচ অব্যাহতভাবে বেড়েই চলছে অথচ যে জন্য তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল সে খবর কেবল ফরাসী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ও আন্দাজ-অনুমানের বেশি কিছু নয়। ভয়াবহ গোপন তথ্য যেন একটি ছোট্ট খেলনাতে পরিণত হলো।

মিসরের সাথে গোপন যোগাযোগ চ্যানেল খোলার প্রতি শারেটের আগ্রহ থেকে ফায়দা হাসিল করতে কেবল প্যারিসে প্রেরিত মিসরী প্রতিনিধি একাই চেষ্টা করেননি বরং এই খেলায় আরও একজন ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন ইসরাইলী কন্টাক্টিং অফিসার, যিনি যুদ্ধবিরতির প্রস্তুতিকালে এবং ফালুজাতে নিহত ইহুদীদের শ্মশান খুঁজে বের করার সময় জামাল আব্দুন নাসেরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এর নাম ইউরিভান কোহেন। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক শাখা প্রধান হার্ট কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত কাফরিকে লিখছেন (ডকুমেন্ট নং– ১৫৫৩-৬/ক ৬৭৪০৮৪) ঃ

"মনে হচ্ছে মিসর-ইসরাইল যোগাযোগ সম্পর্কে ভাল খবরাদি আছে। আমি এখানকার ইসরাইলী দূতাবাসের একজন কূটনীতিকের সূত্রে বুঝতে পেরেছি যে,

কর্নেল নাসের ইসরাইলে এক ব্যক্তির নিকট একটি পত্র পাঠিয়েছেন। এতে তিনি মিসরের সাথে আসন্ন আলোচনা সহজ করার লক্ষ্যে ব্রিটেনের ওপর তাঁর সরকারের প্রভাব খাটাবার অনুরোধ করেন। আমি সেই প্রাপক ব্যক্তিকে চিনতে পারিনি। আমার মনে হয় না পত্রটিতে বিস্তারিত তেমন কিছু আছে। তবে এই ঘটনাটি বেশ কিছু উৎসাহব্যঞ্জক অবকাশের বার্তাবাহক।"

কাফরি আবারও বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানিয়ে বার্কার হার্টকে জবাবে লিখলেন (ডকুমেন্ট নং ২৩৫৩-৬/ক ৬৭৪০৮৪) ঃ

"ইসরাইলে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে নাসেরের কথিত পত্রের ব্যাপারে আপনার চিঠিখানা আমি গুরুত্বের সাথে পাঠ করেছি। আমরা মিসরীয় পত্র-পত্রিকার বরাতে পড়েছিলাম যে, যুদ্ধের সময় তিনি একজন ইসরাইলী সেনা অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমার মনে হলো, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার উত্তম পন্থা হবে স্বয়ং নাসেরকেই এ প্রশ্ন রাখা। তিনি জবাবে বলেছেন– আমি ২৩ জুলাই থেকে কোন মানুষের কাছে কোন পত্র লিখিনি। আমি যদি চিঠিপত্র লেখার ফুরসত পেতাম তাহলে কতই না ভাল হতো। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আপনার কাছে যে কাহিনী পৌঁছেছে তা সঠিক নয়।"

পরবর্তীতে পরিষ্কার হলো যে, ২৩ জুলাইয়ের বিপ্লবের আসল নেতা হিসাবে মিসরে ঘটনার নায়ক-পুরুষের সাথে তার সাক্ষাৎকারের দীর্ঘ সিরিজ কিছু ইসরাইলী পত্রিকার কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন এই ইউরিভান কোহেন।

॥ ৫ ॥

ফস্টার ডালাস

"মন্ত্রী মহোদয়! মিসরের যে সব উত্তম বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা ইসরাইলেরও আছে, বরং আরেকটু বেশি।"

—ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী "ডেভিড বেন গোরিয়ন" যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী "ফস্টার ডালাস"-এর প্রতি।

১৯৫২ সালের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে মিসরে বিপ্লবের অবস্থান ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছিল। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কিছু সুদৃঢ় পদক্ষেপ সম্পন্ন করার পর, যেমন কৃষি সংস্কার, প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, উপাধি বাতিল করা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎপাদন ও সেবা, এ দু'টি পরিষদ গঠন–এরপর সবচেয়ে বড় কর্তব্য স্থির করা হয় মিসর থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বহিষ্কার তথা স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। অগ্রাধিকার বিবেচনায় ইসরাইলের সাথে শান্তি অথবা যুদ্ধ কোন অবস্থাতেই কোন মোকাবিলার বিষয় স্থান পায়নি। একই সময় বেশ কিছু পট পরিবর্তন হয় এবং বিপ্লবীদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– এ অঞ্চলে ব্রিটেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের বিবেচনায় কিন্তু বাস্তবতার আলোকে মধ্যপ্রাচ্যে তার অবস্থান গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্র বেশ গুরুত্বের সাথে মনোনিবেশ করেছে। এই সব বাস্তবতা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার দায়-দায়িত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। কারণ ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং অস্ত্রের মাধ্যমে সে প্রমাণ করেছে যে, সে এ এলাকায় এমন এক শক্তি যাকে ছোট করে দেখা যায় না। বরং সে হচ্ছে সুদীর্ঘ বছরের জন্য এ অঞ্চলের অধিক সক্ষম ও যোগ্যতর শক্তি তার কাছে ভূমি অথবা শরণার্থী সম্পর্কে কোন ছাড় দেয়ার অনুরোধ করে এমন সাধ্য কারও নেই। কারণ সে এমন আরব হুমকির স্বেচ্ছামূলক মূল্য দেবে না যার কোন অস্তিত্বই নেই।

২. যুক্তরাষ্ট্র যখন দেখছিল যে মিসরের বিবর্তনের ধারা বিপ্লবের আবেদনেই প্রবাহিত তখন সে ঐ সময়টিতে সতর্ক দূরত্ব রেখে লক্ষ্য করছিল যে ব্রিটেন কি করতে যাচ্ছে। ইত্যবসরে সে আরব জাহানে তার ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে সৌদি আরবে তাঁর ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করছিল। সে দেশটি হচ্ছে পেট্রোল সম্পদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। আমেরিকার জয়েন্ট ওয়ার স্টাফের একটি প্রতিবেদন সৌদি আরবের কাছে

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দিক থেকে রাজকীয় সৌদি আরবই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ।

৩. যেহেতু সৌদি আরবের পরিস্থিতি ছিল কিছুটা স্থির এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও ছিল নানান অবকাশের সম্মুখীন। এ প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রকে এ অঞ্চলের তিনটি স্থানে জেঁকে বসতে হবে ঃ ইরান কেন্দ্র, লিবিয়া কেন্দ্র আর ইসরাইল কেন্দ্র তো আছেই।

৪. যেহেতু এই পরিমণ্ডলে আরব ও ইসরাইলের মধ্যে সরাসরি বা শীঘ্রই কোন শান্তির সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না । এ মূল্যায়নে যুক্তরাষ্ট্রের এখন যা করার তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে কোন এক প্রকার সামষ্টিক নিগড়ে শামিল করা, যা হবে আটলান্টিক জোটের সম্পূরক এবং পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন ও স্বার্থাদির সুরক্ষক। এভাবেই আরব-ইসরাইলের মধ্যে বিরাজমান অতিমাত্রিক স্পর্শকাতরতা চুপসে যাবে ধরে নেয়া যায়।

উভয় পক্ষ যদি একই সাথে সামরিক ও রাজনৈতিক কোন সামষ্টিক ব্যবস্থার নিগড়ে সহযোগিতা করে যায় তাহলে তা এক সুদূরপ্রসারী দরজা খুলে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্র যে বাস্তবতা উপলব্ধি করেছে তার ভিত্তিতে সে ইতোমধ্যেই এ অঞ্চলে অগ্রসর হলো। তবে একটি প্রকল্পের মোড়কে। তা হচ্ছে– মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষা চুক্তি প্রকল্প। তবে যুক্তরাষ্ট্র একাই অগ্রসর হয়নি; তার সাথে এলো ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুর্কিস্তান। তবে দু'টি কারণে এ প্রকল্পটিকে এ অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ গ্রহণ করতে পারেনি ঃ

প্রথমত, এ অঞ্চলের প্রভাবশালী দেশগুলো– যেমন, মিসর ও ইরাক– চাচ্ছিল তাদের স্বাধীনতা আগে অর্জন করুক, তারপর মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষার বিষয়ে নজর দেয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ আরব দেশ তাদের জনমতের চাপে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিল যে, যখন ইসরাইল দোরগোড়ায় বসে এ অঞ্চলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্প্রসারণের খায়েশ প্রকাশ করছে সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তাদের যোগ দেয়া কঠিন।

আরব জনগণ এখন উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। মিসরে যা কিছু হচ্ছে তা ছাড়াও এদিকে সিরিয়াতে চলছে সহিংস কোটারী স্বার্থের দ্বন্দ্ব। সেখানে সংঘটিত হচ্ছে একটির পিছনে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের সিরিজ।

বাদশাহ আব্দুল্লাহ ভেবেছিলেন যে, ইসরাইলের প্রতিবেশী আরব দেশ মিসর ও সিরিয়ার ব্যস্ততার ফাঁকে তিনি ইসরাইলের সাথে একটি সন্ধি স্থাপনে সমর্থ হবেন। তাঁর সামনে দাঁড়াবার কেউ নেই। তবে বাদশাহ আব্দুল্লাহ একা একা তা করতে চাননি। তিনি লেবাননকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে একই পথে নিতে চেয়েছিলেন। সেও তার মতো ছোট্ট একটি দেশ, যুদ্ধে সক্ষম নয়। তাই শান্তির প্রয়োজন। কাজেই সেও তার

সাথে মিলিত হতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এর ফল ছিল হতাশাব্যঞ্জক। আব্দুল্লাহ মসজিদে আকসার চত্বরে দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হলেন। যেমনি লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রিয়াদ-আস-সুল্হ নিহত হলেন। তাঁকে বাদশাহ আব্দুল্লাহ সহযাত্রী করার ব্যাপারে বোঝাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রিয়াদ আল-সুল্হ সেই একই আম্মানেই আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল বাদশাহ আব্দুল্লাহর সাথে তাঁর দীর্ঘ বৈঠকের পরই।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৫১ ও ১৯৫২ সাল জুড়ে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে আরব দেশগুলোর সাথে পথ বের করার চেষ্টারত ছিলেন। এজন্যই সিআইএ, যার প্রধান দায়িত্ব ছিল মধ্যপ্রাচ্য বিষয়, এ অঞ্চলে তার স্বাভাবিকের চেয়ে ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। তিনি হচ্ছেন– কেরমেট রুজভেল্ট– যিনি সাংবাদিকের ছদ্মাবরণে যুদ্ধের বছরগুলোতে এ অঞ্চলে কাজ করেন এবং একটি বই লেখেন, যা সে সময় বেশ প্রচার পায়। বইটির শিরোনাম ছিল– "আরব ঃ তাদের ইতিহাস ও পেট্রোল"। ১৯৫২ সালের প্রথমভাগে কেরমেট রুজভেল্ট বেশ কয়েকবার মিসরে আসেন। এখানে তিনি অনেকবার বাদশাহ ফারুকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তৎকালীন তিনজন প্রধানমন্ত্রীর সাথেও বেশ কয়েকবার তার বৈঠক হয়। এঁরা হলেন– আলী মাহের পাশা, নাজীর আল-হেলালী পাশা ও হুসেইন সেরি পাশা। এছাড়াও তাঁর এক বন্ধু– ডক্টর আহমদ হুসেইন বেশ কিছু ওয়াফদ পার্টি নেতার সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। ইখওয়ানুল মুসলেমীন আন্দোলনের কিছু প্রতিনিধির সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সব সাক্ষাৎকারের পর কেরমেট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, এ সকল নেতা একটি অক্ষমতায় বন্দী। তাঁদেরকে আন্দোলনের জন্য সুপরিসর ক্ষেত্র দেয়া হয়নি। কেরমেট ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রধান ডানোভানের নিকট এই মর্মে এক প্রতিবেদন পেশ করেন যে, "মিসর কার্যত বিপ্লব অবস্থায় রয়েছে, সে এ সময় যে কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত। এই পরিমণ্ডলে এখন বাদশাহ ফারুক থেকে শুরু করে ইখওয়ানুল মুসলেমীন পর্যন্ত– কেউই ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলতে সক্ষম নয়।"

১৯৫২-এর বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর কেরমেট রুজভেল্ট মিসরে এসে নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে নতুন প্রশাসন পুরনো প্রশাসন থেকে ভিন্নতর কোন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি। কেরমেট এবং তাঁর পিছনে সিআইএ তখন এ পর্যায়ে খোদ আমেরিকার রাজনীতির কারণে কোন তৎপর ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত ছিল না। কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে পৌঁছে যাওয়ায় নতুন কোন আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণের মতো ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তাছাড়া তাঁর দল তখন উত্তপ্ত নির্বাচনী লড়াইয়ের মোকাবিলা

করছিল। একদিকে তাঁর ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী এডলে স্টেফেনসন, অপরদিকে ছিল রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী জেনারেল ডুয়েট আইজেনহাওয়ার। কারণ শেষোক্ত ব্যক্তির ইউরোপকে মুক্তকারী বাহিনীগুলোর কমান্ডার হিসাবে জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। ঠিক যে সময়টিতে ট্রুম্যান বের হয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং আইজেন-হাওয়ার হোয়াইট হাউসে প্রবেশের অপেক্ষায় তখন ইসরাইল কিন্তু অপেক্ষা করতে চাইল না। বেন গোরিয়ন চাইলেন– যাকে বলে "নীল নদের পানির উষ্ণতা পরীক্ষা করতে।" সে সময়– ১৯৫২-এর শেষ তিন মাসে যখন মিসরের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল ব্রিটেনের সাথে আলোচনায় কেন্দ্রীভূত এবং মিসর ব্রিটেনের বিশেষ ব্যক্তিত্বদের, বিশেষ করে কমন্স সভার সদস্যদের মিসরে আসার ব্যাপারে উৎসাহিত করছিল। ভেবেছিল তাঁদের কাছে নিজেদের ন্যায্য অধিকারের যুক্তি তুলে ধরতে পারবে। এভাবে তারা সরকারের ওপর এ বিষয়ে প্রভাব ফেলতে পারবে। বিশেষ করে বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্থোনি এডেনকে মিসরীয় দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য আরেকটু বেশি প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। তখনকার বাস্তবতার আলোকে ব্রিটিশ কমন্স সভার বেশ কিছু সংখ্যক সদস্যই ছিলেন এই নীলনদের পানির উষ্ণতা পরীক্ষার কাজে অগ্রনায়ক। সে সময় যে সকল পার্লামেন্ট সদস্য এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন লেবার পার্টির প্রখ্যাত এমপি রিচার্ড ক্রসম্যান। কায়রোতে এসে তিনি সর্বপ্রথম যা চাইলেন তা হচ্ছে জামাল আব্দুন নাসেরে সাথে একটি এ্যাপয়েন্টমেন্ট। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ক্রসম্যানের জন্য এই এ্যাপয়েন্টমেন্টের অনুরোধ মিসরে ব্রিটিশ দূতাবাস করেনি। অনুরোধটি করেছেন আমেরিকান দূতাবাসের কাউন্সিলর উইলিয়াম লিকল্যান্ড। তিনি তাঁর বাসভবনে একটি নৈশভোজের আয়োজন করে সেখানে দাওয়াত জানিয়েছিলেন জামাল আব্দুন নাসেরকে এবং তাঁর দু'সহকর্মী ও এক বন্ধুকে। এতে রিচার্ড ক্রসম্যানকেও দাওয়াত দিলেন।

ক্রসম্যান জামাল আব্দুন নাসেরের অপেক্ষায় উইলিয়াম লিকল্যান্ডের ফ্ল্যাটে আন্-নুযহা রোডের একটি ভবনে বসে ছিলেন। এটি যামালেক দ্বীপের উত্তর প্রান্তে নীলনদ পর্যন্ত চলে গেছে।

লিকল্যান্ড উভয়কে পরিচয় করিয়ে দিতে না দিতেই ক্রসম্যান বলে উঠলেন "আমি আপনার একটি চিঠি বয়ে এনেছি।" এরপর ক্রসম্যান আলাদা হয়ে গিয়ে জামাল আব্দুন নাসের এর পাশে একটি আসন গ্রহণ করে তাঁকে বলতে লাগলেন ঃ "আমি এমন একজনের নিকট থেকে একটি পত্র বয়ে নিয়ে এসেছি যিনি অতি আগ্রহ ও গুরুত্বের সাথে মিসরে আপনার বিপ্লবোত্তর কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। জামাল আব্দুন নাসের ভাবলেন এই পত্রের প্রেরক হবেন–'হিউ জেসফল'–রিচার্ড ক্রসম্যানের লেবার পার্টির সভাপতি। কিন্তু তিনি হতবাক হয়ে গেলেন যে, ক্রসম্যান

তাঁকে বলছে, এ পত্র পাঠিয়েছে ডেভিড বেন গোরিয়ন, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী। যদিও জামাল আব্দুন নাসের-এর অবয়বে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠেছিল কিন্তু ক্রসম্যান বলেই চলেছেন– "ডেভিড বেন গোরিয়ন আমার মাধ্যমে আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং একটি বার্তা পাঠিয়েছেন যে, একমাত্র ইসরাইলের সাথে শান্তি স্থাপনই আপনার দেশকে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।" ক্রসম্যান এমনভাবে দ্রুত বলে চলেছেন, যেন সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি তাঁর বার্তা শেষ করতে পারেন। তিনি আরও বলেন– "বেন গোরিয়ন মিসর-ইসরাইল সম্পর্ক নিরসনে, আপনার সাথে আলাপ-আলোচনায় প্রবেশ করতে চায়। তিনি এখনই কোন আনুষ্ঠানিক আলোচনা চান না, তবে তিনি আপনাদের উভয়ের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল যোগাযোগের মাধ্যম পেতে তিনি আকুল আগ্রহী। এতে করে অন্তত এ পর্যায়ে উভয় পক্ষ এতটুকুন অবহিত থাকতে পারবে যে, অন্য পক্ষ কি চিন্তা-ভাবনা করছে। পরবর্তী উত্তরণের এটি হতে পারে ভূমিকা। এ প্রেক্ষাপটে আমি এখানে বেন গোরিয়নের পক্ষে আলোচক হিসাবে আসিনি বরং আমি তো কেবল তাঁর একজন বিশেষ দূত হিসাবে তাঁর আগ্রহের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম মাত্র।"

জামাল আব্দুন নাসের তাঁর আবেগ অনুভূতিকে সংযত রেখে 'ক্রসম্যানকে' বললেন ঃ "তাঁর অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়গুলোর চাপে তিনি এখন ইসরাইল বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। বেন গোরিয়ন-এর সাথে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোন যোগাযোগের চিন্তা-ভাবনা তার এখন নেই। কারণ বৈদেশিক ইস্যুতে এখন তাঁর ব্যস্ততার বিষয় হচ্ছে বিদেশী শক্তি বহিষ্কার ও স্বদেশের স্বাধীনতা বাস্তবায়ন। ক্রসম্যান জবাব দিলেন ঃ "আপনি আমাদেরকে (ব্রিটিশদের) বের করতে পারবেন না এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও কোন সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন না, যদি না ইসরাইলের সাথে একটা সমাধা না করেন।" জামাল আব্দুন নাসের উত্তরে বললেন যে, কার্যত ব্রিটেনের সাথে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। তখন ক্রসম্যান আবারও বলেন যে, এটা কোন কিছুতে উপনীত হতে পারবে না। আমি আমার দেশকে ভাল করেই জানি। এরা আপনার এখান থেকে আলোচনার মাধ্যমে বের হবে না। কেবল শক্তির সামনেই তারা পিছু হটবে। ইসরাইলীরা এটাই করেছিল। তারা আমাদের ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেছে, যার ফলে আমরা ফিলিস্তিনে তাদের অধিকার হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন 'আপনি কি তাদের মত সকল শক্তি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন? পারবেন আপনি আর আপনার জনগণ এটা প্রমাণ করতে যে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের পরাজিত করতে? একই সময় ইসরাইলের সাথেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন?

ক্রসম্যান তাঁর যুক্তি দেখিয়ে যেতে লাগলেন– আপনি আর আপনার জনগণ কি ইসরাইলের সাথে যুদ্ধাবস্থা বজায় রেখে ইংল্যাণ্ডের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছেন?

এর জন্য যে আত্মত্যাগের প্রয়োজন, আপনার জনগণ কি তা করতে প্রস্তুত আছে?" জামাল আব্দুন নাসের তার অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়াবলীর ওপর জোর দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রসম্যান আরও যুক্তি জুড়ে যান– "মিসরের বিষয়টি কোন স্থানীয় বিষয় নয়। বরং এটি আরও বড় সংঘাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিদিনই যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এ নিয়ে চলছে টানাপোড়েন।" ক্রসম্যান আরও বলেন– "আমরা এখান থেকে কখনও চলে যাব না, যতক্ষণ না আমরা ও আমেরিকানরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হই যে সুয়েজ খালের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন শূন্যতা সৃষ্টি হবে না। আমরা কখনও সুয়েজ খালকে এমনভাবে রেখে যাব না যে, এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে উন্মুক্ত পড়ে থাকে বা আপনাদের ও ইসরাইলের মধ্যে অস্থিরতার পরিস্থিতি জিইয়ে রাখে।" এ বিষয়ে আলোচনার প্রবেশ থেকে জামাল আব্দুন নাসের দূরে থাকেন। এর বদলে তিনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনাকে প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন মিসরের প্রতিটি মহল বিপ্লবের কাছে এটাই কামনা করে যেন এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। এর একমাত্র পথ হচ্ছে উৎপাদন ও সেবার মান উচু করা।" এভাবেই তিনি এ দিকটি ব্যাখ্যা ও বিস্তার করে তুলে ধরেন।

কিন্তু ক্রসম্যান কোন সন্তোষজনক ফল লাভ করতে ব্যর্থ হলেন।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কায়রো থেকে সাইপ্রাস সফর করবেন, সেখান থেকে ইসরাইল গিয়ে আব্দুন নাসের-এর সাথে আলাপের সারবত্তা বেন গোরিয়নকে জানাবেন। এরপর দু'সপ্তাহান্তে আবার তিনি কায়রোতে এসে জামাল আব্দুন নাসের-এর সাক্ষাৎ চাইলেন। জামাল আব্দুন নাসের সিদ্ধান্ত দিলেন যে, ডঃ মুহাম্মদ ফৌজি তাঁর পক্ষে সাক্ষাৎ দিবেন। কারণ তাঁর এমন একটি উপলব্ধি জন্মালো যে, যদি ক্রসম্যানকে সাক্ষাৎ দেন তাহলে তাঁর অর্থ দাঁড়ায় যে কোন এক মাধ্যমে তাঁর ও বেন গোরিয়নের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে। একই সঙ্গে ক্রসম্যান কি কথা নিয়ে এসেছে তা জানার প্রতিও রয়েছে তাঁর আগ্রহ। ডঃ ফৌজিকে ক্রসম্যান গুরুত্বপূর্ণ যা বলেছিলেন তা হচ্ছে– তিনি যখন বেন গোরিয়নের সাথে দেখা করলেন তখন জামাল আব্দুন নাসের-এর সাথে তাঁর আলোচনার বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। এতে মিসরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁর মনোযোগের বিষয়টি ছিল। এর পর ক্রসম্যান নিজেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলেন, কায়রো থেকে আমার প্রতিবেদনটি পূর্ণ অভিনিবেশের সাথে শুনে আলোচনায় প্রবেশ করতে চায়। (তিনি এখনই কোন আনুষ্ঠানিক সংক্ষিপ্ত নাম) "এটা হচ্ছে আমার শোনা সবচেয়ে খারাপ খবর।" তারপর বললেন– "আমি এমন কোন ব্যক্তিকে কায়রোতে কামনা করি না, যে ইসরাইলের সাথে সন্ধি না করেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দেয়।"

কায়রোতে ক্রসম্যানের মিশন কোন ফললাভ করতে পারেনি। একই কায়দায় বিভিন্ন দূত প্রেরিত হতে থাকে। এদের অধিকাংশ ছিলেন কমন্স সভায় ব্রিটিশ লেবার

পার্টির সদস্য। এদের মধ্যে ছিলেন 'এ্যানিউরেন বেকেন', জর্জ ব্রাউন, উড ওয়াট ও মিসেস বারবারা ক্যাসেল-এর মত ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে বড় বড় সাংবাদিকও ছিলেন- যেমন ক্যাসলে মার্টিন- প্রধান সম্পাদক দি স্টেটসম্যান পত্রিকা ও ডানিশ হেমিলটন- প্রধান সম্পাদক, টাইমস পত্রিকা।

পরবর্তীতে যখন মিসরে আমেরিকান সাংবাদিকদের অব্যাহত আগমন ঘটল তখন এদের মধ্যে নামকরা কোন সাংবাদিক পেলেই বেন গোরিয়ন তাঁর মাধ্যমে কায়রোতে একটা চিঠি বা সংবাদ পাঠিয়ে দিতেন। এ ঘটনা অনেকের বেলায় বারবার ঘটেছে। যেমন- ওয়াল্টার ল্যাবম্যান, গোজেব আলসূব, জেমস রেস্টন, এডমরো প্রমুখ।

জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে দ্বিতীয় মধ্যস্থতাকারী কিন্তু বেন গোরিয়নের পক্ষ থেকে কোন দায়িত্ব পাননি। যেমন ইতোপূর্বে ব্রিটিশ লেবার পার্টির এমপি অথবা কিছু সংখ্যক সাংবাদিক দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল পত্র পরিবহন তাঁদের মূল দায়িত্ব- সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তথ্যাদি লাভের সহায়ক হবে। কিন্তু এই মধ্যস্থতাকারী ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী। তিনি তাঁর নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকেই মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেন। ইনি হচ্ছেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে নামকরা ইহুদী সেই মহাবিজ্ঞানী 'আলবার্ট আইনস্টাইন।'

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল ওয়াশিংটনে এক সফরে গিয়েছিলেন (১৯৫২-এর শেষ ও ১৯৫৩-এর প্রথম দিকে), সেখান থেকে নিউইয়র্ক গেলেন। এখানেই প্রফেসর ও পুরনো বন্ধু ডক্টর মাহমুদ আযমীর সাথে সাক্ষাৎ হলো। ইনি ছিলেন জাতিসংঘে নিয়োজিত মিসর প্রতিনিধি দলের উপপ্রধান। জাতিসংঘে বেশ কিছু সাক্ষাৎকারের বাইরে হাইকাল, ডক্টর জর্জ গ্যালবের ইনস্টিটিউট দেখার জন্য আগ্রহী ছিলেন। উদ্দেশ্য ব্রিনস্টন ইউনিভার্সিটির সাধারণ জনমত যাচাই করা। ডক্টর মাহমুদ আযমী যখন এটা জানতে পারলেন তখন স্বগতোক্তি করলেন- এটা কি করে হয় যে, একজন 'ব্রিনস্টন' পরিদর্শন করবেন এবং সেখানে গ্যালবের সাথে সাক্ষাৎ করবেন অথচ ব্রিনস্টনের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা করবেন না। তিনি হচ্ছেন "আইনস্টাইন"।

কোনভাবে এটা বোঝা গেল যে, ডক্টর আযমী এমন অবস্থানে আছেন যে, এ ধরনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত এই সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারিত হয়ে গেল, একই দিন অপরাহ্নে যেদিন সকালে গ্যালব ইনস্টিটিউট পরিদর্শনের সময় নির্ধারিত হয়েছিল।

হাইকালের ভাবনা ছিল যে, আইনস্টাইনের সাথে তাঁর এ সাক্ষাতে তাঁকে প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক সফলতা, মানবিক অভিজ্ঞতা, পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে জানার একটি সুবর্ণ সুযোগ

হবে। কিন্তু হায়! সাক্ষাতের সময় দেখা গেল বিজ্ঞান, আপেক্ষিক তত্ত্ব, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের কথাবার্তা '১৫ মিনিটের বেশি সময় নিল না। এরপরই দেখা গেল আইনস্টাইন রাজনীতির আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী কোনভাবে জেনেছিলেন যে, তাঁর আগন্তুকের সাথে জামাল আব্দুন নাসেরের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। তিনি "জামাল আব্দুন নাসের" এই নামটি কেবল এই সাক্ষাতের সপ্তাহকাল আগেই "নিউইয়র্ক পোস্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত দীর্ঘ সংবাদ ভাষ্যের মারফত জানতে পারেন। আইনস্টাইন তাঁর কথা শুরু করলেন এভাবে যে, তিনি সংবাদ ভাষ্যের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর অতিথি জেনারেল নজীবকে চেনেন এবং তিনি ওই যুবক কর্নেলের বন্ধু– যিনি হচ্ছেন বিপ্লবের আসল শক্তি। নিউইয়র্ক পোস্টে তিনি তাঁর নামটি পড়েছেন; কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে মনে করতে পারছেন না। তাঁর কেবল নজীব নামটিই মনে আছে। এরপর আইনস্টাইন আবার জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, আপনার বন্ধু আমার জাতি সম্পর্কে কি চায়? তাঁর অতিথি যখন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তাকাল তখন আইনস্টাইন তাঁর কথা অব্যাহত রেখে বললেন, আমি বোঝাতে চাচ্ছি ইহুদীদের.... আমেরিকা আমার দেশ আর ইহুদী আমার জাতি। এরপর আইনস্টাইন জামাল আব্দুন নাসেরের নিকট যে বার্তা পাঠাতে চান তার মূলকথা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন ঃ

তিনি (আলবার্ট আইনস্টাইন) একজন ইহুদী হিসাবে ইহুদীদের দুর্দশার কথা ভালভাবে জানেন। কারণ তিনি নাজী বাহিনীর জার্মানিতে বসবাস করেছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবে কখনও ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থক ছিলেন না। না ফিলিস্তিনে, না অন্য কোথাও। কারণ ইহুদী হচ্ছে বিশ্বজনীন জাতি। সেভাবে থাকাই তাদের জন্য উত্তম ছিল।

তিনি, সত্য বলতে কি ইহুদীদের জাতীয়তাবাদী আবেগ দেখে শঙ্কিত। তাদের ইতিহাসে এটা কখনও ছিল না। তাঁর মতে ইহুদীবাদ হচ্ছে একটি মানবিক মূল্যবোধ যা যে কোন রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেয়তর। তিনি নিজেও ১৯৪৩ সালে একবার ফিলিস্তিনে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে ইহুদী এজেন্সির যে নেতৃবৃন্দ তাঁর সাক্ষাতে এসেছিল তাদের নসিহত করেছিলেন যেন ফিলিস্তিনী আরবদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের সাথে সমঝোতা করে নেয়। এখন তিনি তাই মনে করেন।

কিন্তু তিনি– ইসরাইলে ইহুদীদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবার পর– এই রাষ্ট্রের প্রতি তিনি এক ধরনের সহানুভূতি অনুভব করছেন এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ আগ্রহের সাথে ভাবছেন। তিনি চান না যে, তাঁর দোষে হলেও সে যেন অবরোধের শিকার হয়ে একটি উত্তপ্ত সামরিক সমাজে পরিণত হোক। কারণ সেটাই হচ্ছে ইহুদী চেতনার মূলকথা।

এরচেয়েও বড় কথা হলো— কয়েকদিন পূর্বে ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট হায়েম ওয়াইজম্যানের মৃত্যুর পর ইসরাইল প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য বেন গোরিয়নের মাধ্যমে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই অফার তিনি ফিরিয়ে দেন, কারণ এটা তাঁর আগ্রহ ও যোগ্যতার বাইরের বিষয়। কিন্তু ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট হওয়া থেকে ওজরবাহী করার সময় তিনি এটাও অনুভব করেন যে, তাঁর জন্য কিছু করা তাঁর কর্তব্য বটে। যখন পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন যে, এখন যুক্তরাষ্ট্রে একজন পর্যটক আছেন যিনি মিসরের বিপ্লবের নেতাদের চেনেন এবং তাদের এক নম্বর ব্যক্তির সাথে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব রয়েছে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মনে জাগল যে, এই লোকটির নিকট একটি বার্তা পাঠাই। যার মূল কথা হলো মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা একটি সভ্যতাগত, নৈতিক ও রাজনৈতিক অনিবার্য প্রয়োজন।

তিনি কার্যত বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করতে চান না। সেটা অন্য কেউ করাই শ্রেয় তবে তিনি প্রথমত নিশ্চিত হতে চান যে তাঁরা কায়রোতে এর জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

তিনি কায়রোর প্রস্তুতির ব্যাপারে তাঁর জিজ্ঞাসার জবারের অপেক্ষায় রয়েছেন। তার আগন্তুক কি এর উত্তর নিয়ে আবার আসতে পারবেন ? অথবা কায়রো কি কোন ব্যক্তিকে এ সূচিত কার্যক্রমের পূর্ণতা বিধানের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবেন ? "মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল" নিউইয়র্কে ফিরে এলেন এবং ডক্টর মাহমুদ আযমীকে ঘটনাটি জানালেন। তার কাছে আশা করলেন যেন এই বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য কোড করে কায়রোর বিপ্লবী পরিষদের কমাণ্ডের কাছে প্রেরণ করেন। যা শুনলেন এতে ডঃ মাহমুদ আযমী চমৎকৃত হলেন বলে মনে হলো না। বরং এর চেয়ে বড় কথা হলো তিনি বললেন যে তাঁর বন্ধুর কাছে এটা অজানা নয় যে ১৯৪৮-এর ঘটনাবলীর পর ইহুদীদের সাথে কখনই সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। যদিও তাদের সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। কিন্তু বেশ কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটেছে যে, ইসরাইলী প্রতিনিধি দলের কিছু সংখ্যক সদস্য তাদের মধ্যে আবা ইবান অন্যতম প্রায়শ কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই ঐ হোটেলটিতে আসত যখন তারা জানত যে ঐ হোটেলে তিনিও উঠেছেন। এটা হচ্ছে হোটেল 'বারবাজোন প্লাজা'। ডঃ আযমী আরও বলেন— তিনি মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে যোগাযোগ চ্যানেল খোলার সম্ভাবনা নিয়ে আইনস্টাইনের আগ্রহ দেখে মোটেই অপ্রস্তুত হননি।

মোট কথা আইনস্টাইনের পক্ষ থেকে এ পদক্ষেপটি কোন ফলে উপনীত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত শোনার পর জামাল আব্দুন নাসেরও চিঠি চালাচালির জন্য প্রস্তুত হননি। যদিও আইনস্টাইন বরাবরই উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন এবং তড়িঘড়িও

করছিলেন। যখন বিশ্বময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর-লাল নেহেরু অচিরেই মিসরে যাবেন তখন আইনস্টাইন তার ও জওহরলাল নেহেরুর কমন বন্ধু–ব্রিটেনের মহাদার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলকে অনুরোধ করলেন যেন জামাল আব্দুন নাসেরের কাছ থেকে নেহরু তার পূর্বে প্রেরিত একটি প্রশ্নের জবাব লাভ করে।

১৯৫৩ সালের সূচনাতে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির একটি সুরাহার পথ খোঁজার ওপর সুশৃঙ্খল ও কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার আবশ্যকতা ছিল অনস্বীকার্য। এর কারণ ছিল প্রধানত দু'টি ঃ

প্রথমত যুক্তরাষ্ট্রে এখন নতুন প্রেসিডেন্ট। তিনি হচ্ছেন একজন অসাধারণ প্রেসিডেন্ট যাঁর জন্য অপেক্ষা করছে অসাধারণ দায়-দায়িত্ব। কারণ, নাজী বাহিনীর ওপর বিরাট বিজয়ের সেই মিত্র শক্তির তিনি ছিলেন সাবেক কমাণ্ডার। তাছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এক নতুন ধরনের লড়াই– ঠাণ্ডা যুদ্ধের মোকাবিলায় অগ্রসরমান অবস্থায় তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত করেছে। আইজেনহাওয়ার-এর যোগ্যতাই তাঁকে এই নতুন ঠাণ্ডা লড়াই পরিচালনার জন্য নির্বাচন করেছে। যেমনটি তিনি ইতোপূর্বে আরেকটি উত্তপ্ত লড়াই পরিচালনা করেছিলেন। আইজেনহাওয়ার কিন্তু রোমেল অথবা রোনেস্টেড বা এমনকি মন্টোগোমারীর মতো অসাধারণ প্রতিভাধর সামরিক কমান্ডার ছিলেন না। এঁরা সবাই বিভিন্ন যুদ্ধ ময়দানে তাঁদের পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। তবে তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যৌথ বাহিনীর মিত্র শক্তিকে নেতৃত্ব দিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ এসব বাহিনীর ছিল ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ। এদেরকে তিনি একত্রিত করে একটি মাত্র লক্ষ্য হাসিলে কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছিলেন। এ ছাড়া লোক প্রশাসনে তাঁর অসাধারণ শক্তিমত্তা প্রকাশ পেয়েছিল।

তাঁর নেতৃত্বে যে বাহিনী বিজয় লাভ করেছিল তাতে ছিল ব্রিটিশ বাহিনী, ফরাসী, অস্ট্রেলীয় ও আমেরিকান বাহিনী এবং আরও অনেক দেশের বাহিনী। তাঁর নেতৃত্বাধীন ছিল একদল তারকা অধিনায়ক। যেমন– ব্রাডলে, মন্টোগোমারী প্যাটন, ডো ক্লার্ক– এভাবে এ তালিকায় ছিল অনেকের সমাবেশ। আমেরিকান যে নির্বাচক আইজেন-হাওয়ারকে নির্বাচিত করেছেন সে এখন প্রতীক্ষায় আছে যে, তিনি যুদ্ধে যে সফলতা লাভ করেছেন এখন শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও সে রকম কিছুই অর্জন করবেন। আইজেন-হাওয়ারও একই বস্তু কামনা করছেন। তিনি প্রত্যাশা করেন যেন ঠাণ্ডা লড়াইয়েও আমেরিকা তার বিজয় ছিনিয়ে আনুক। তাঁর পূর্বসূরি ট্রুম্যান এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ময়দান উন্মুক্ত করেন এবং তা ঝুলিয়ে রেখে যান– চাই তা হোক ইরানে বা বলকান অঞ্চলে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে। দূরপ্রাচ্যে যা ঘটেছে তাতে দেখা যায় কোরিয়াতে ঠাণ্ডা থেকে এখন এমন উত্তপ্ত পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, এর পরিণতি হবে অতি ভয়াবহ।

ট্রুম্যান আটলান্তিক জোট ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জোট গঠনে সফল হন। কিন্তু তিনি তার উত্তরসূরির জন্য মধ্যপ্রাচ্যে একটি অপূরণীয় শূন্যতা রেখে যান। তবে তিনি এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের জীবনময় স্বার্থগুলো সংরক্ষণের গ্যারান্টিস্বরূপ একটি প্রতিরক্ষা জোট সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। এ প্রেক্ষিতে যে অঞ্চলটি আইজেনহাওয়ার– এর শাসনামলের সূচনা লগ্নে তার ওপর এসে পড়েছিল তা ছিল এই মধ্যপ্রাচ্য। সেখানে তার জন্য দু'টি দায়িত্ব অপেক্ষা করছিল– দু'টি বিষয় এমনভাবে পারস্পরিক সম্পৃক্ত ছিল যে একটা কাজেই পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষার বিষয়টি আরব ইসরাইল সংঘাতের ইস্যুর সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাধা যার জন্য ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উপযুক্ত করে এ অঞ্চলকে পুনর্বিন্যাস করতে বাধা দিচ্ছিল। আইজেনহাওয়ার তাঁর এ দায়িত্ব পালনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁর মনে জেগেছিল যে, পবিত্র ভূমিতে শান্তি স্থাপনের ভূমিকা রেখেই তিনি তাঁর পুরনো যোদ্ধা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন।

দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের বিরাজমান পরিস্থিতিই যেন একটি সমাধানের জন্য আর্ত চীৎকার করছে। কারণ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ কোন নিরঙ্কুশ বিজয় ছাড়াই শেষ হয়েছিল।

ইসরাইল সাময়িকভাবে নিজেই যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সে অক্ষম হয়ে পড়ল। আরবরা এ যুদ্ধের মাশুল গুনছে। কিন্তু ভৌগোলিক আকার, নাগরিকের সংখ্যা আর কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণের দিক থেকে তারা কেন পরাজয় বরণ করেনি।

ইতিহাসের অবসান করে যুদ্ধের ময়দানে তারা যা মোকাবিলা করেছে সে তুলনায় অন্যান্য ক্ষতি তেমন কিছুই হয়নি। বরং তাদেরকে আরও ভালভাবে তাদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মরিয়া করে তোলে। লড়াইয়ের ময়দানে তাদেরকে আবার ফিরিয়ে এনে প্রথমবার যেখানে ধরাশায়ী হয়েছিল সেখানে আবার বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য করে তোলে উম্মাতাল। এভাবে এ অঞ্চলটি এমনিতেই বিভিন্ন কারণে অস্থিরতা আর গোলযোগপূর্ণ ছিল, অধিকন্তু এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাসমূহ ইসরাইলী ভয়াবহতার সাথে মিশে যায়। যার ফলে এখানে বিপদ আর বিস্ফোরণের সম্ভাবনার পরিপূর্ণ একটি চাপ সৃষ্টি হয়। এটা যে কেবল আরবদের দিক থেকেই হয়েছিল তা নয় বরং অপর পক্ষের জন্যও বিষয়গুলো ছিল প্রায় কাছাকাছি। সে অপর পক্ষ হচ্ছে ইসরাইলী পক্ষ। তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যয় ছিল খুবই ক্লান্তিকর। জার্মানের কাছ থেকে উদার ক্ষতিপূরণ পাওয়া সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা আর নিরাপত্তা তো এমন কিছু দ্রব্য নয় যে টাকা দিলেই তা রেডি স্টক থেকে পাওয়া যায়।

এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ভব হলো সবচেয় বড় আরব দেশ– মিসরে সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিছু সংখ্যক তরুণ সেনা কর্মকর্তা এর নেতৃত্বের পাদপ্রদীপে এসে গেল। বরং বলা যায়, গোটা আরব জাহানকে নেতৃত্ব দেবার কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের অধিষ্ঠান ঘটে। ফলে এ ছিল এক নতুন পরিস্থিতি, নতুন চ্যালেঞ্জ আর সম্ভাবনার দোলাচল– যার কোন সীমা পরিসীমা নেই– যদি কেউ দুঃসাহস নিয়ে কল্পনাতাড়িত ও ইচ্ছাশক্তিতে বলীয়ান হয়ে এ ময়দানে এগিয়ে আসে। আইজেনহাওয়ার ছিলেন প্রস্তুত। আর জামাল আব্দুন নাসের ছিলেন সতর্কাবস্থায় ।

মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আসল লড়াই শুরু হয়ে গেল। শুরু হলো আইজেনহাওয়ারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালাস-এর এ অঞ্চলে সেই বিখ্যাত সফরের মাধ্যমে যেখানে তিনি পরিস্থিতি বিন্যাসের রূপরেখার পথ অনুসন্ধান করছিলেন।

এ যাত্রায় ডালাসের প্রথম স্টেশন ছিল কায়রো। এখানে তিনি পৌঁছে ছিলেন ১১ মে ১৯৫৩ তারিখে। এ সময় প্রথম যিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি হচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মাহমুদ ফৌজি। সাক্ষাৎকারের বিবরণী থেকে জানা যায় (সভা ফাইল নং ১৫৬) যে, ডঃ ফৌজি, তাঁর আলোচনা শুরু করেন বহিষ্কারের বিষয় নিয়ে 'মিসর-ব্রিটেন আলোচনার অবস্থা ব্যাখ্যা করে। এরপর তিনি এক পর্যায়ে বললেন "মিসর তার শক্তিকে পুনর্গঠন ও জনগণের কল্যাণের বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে। সে বিশ্বাস করে যে, তার আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা প্রয়োজন। সেজন্যই সে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সংস্কারে তার শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করতে চায়। যদি এ ক্ষেত্রে তার বন্ধুরা তাকে সহযোগিতা করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই স্বাগত জানানো হবে, যদি না তা তার সার্বভৌমত্ব ও অধিকারে কোন আঁচড় না লাগে।"

এরপর মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় যান। তিনি বলেন ঃ "আবর লীগের সাম্প্রতিক বৈঠক আবর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা অঙ্গীকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।" এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিস্তিন বিষয়ে বলেন ঃ "তিনি মিস্টার ডালাসকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, 'ফিলিস্তিনে' উদ্ভূত পরিস্থিতি একে দু'টি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে (ডালাস লক্ষ্য করেন এবং নিজ কার্যবিবরণীতে লেখেন যে, ডঃ ফৌজি 'ইসরাইল' শব্দটি উল্লেখ করেননি)। একভাগ ফিলিস্তিনের জন্য, একই সময়ে আরব জাহানের জন্য আরেকটি ভাগ দু'অংশে বিভক্ত ঃ অর্ধেক আফ্রিকায় আর অর্ধেক এশিয়ায়।"

ডালাস দেখলেন যে, তাঁর মিসরে অবস্থানের কারণে সূচনা লগ্নেই তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় ইস্যুটির সামনে পড়ে যান। মিসরকে অবশিষ্ট আরব জাহান থেকে বিচ্ছিন্নকারী প্রতিবন্ধক হিসাবে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাই হলো সবচেয়ে বড় ইস্যু।

এরপর আসছে শরণার্থী সঙ্কট, আল্-কুদ্স ও ফিলিস্তিনে আরব ও ইসরাইলের মধ্যকার সীমান্ত বিষয়।

১৩ মে ডালাস ছিলেন ইসরাইলে। তাঁর প্রথম বৈঠক হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে শারেটের সাথে। ডালাস দেখলেন যে, তিনি একই সমস্যায় দ্বিতীয় যাদুর সামনে। তাঁকে শারেট বলেন, (সভার কার্যবিবরণী অনুসারে– ডকুমেন্ট নং ২-ড,ট,স) "আমি আরবদের চিন্তা-ভাবনা দেখে হতভম্ব হলাম। কারণ তারা আক্রোশের মাধ্যমে তাদের নিজেদের কাতারবন্দী করছে, যেমনটি যৌথ আরব নিরাপত্তা অঙ্গীকারে তা দেখলাম– অথচ তারা বলছে যে, তারা ইসরাইলের হুমকিতে শঙ্কিত। তারা দাবি করছে যে, আমরা অচিরেই সম্প্রসারণে বাধ্য হব, কারণ ইসরাইল খুবই ছোট। একই সময়ে তারা দাবি করছে যেন আমরা তাদেরকে এমন কিছু ভূমি ছেড়ে দেই যাতে তারা একে অন্যের সাথে স্থল যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।"

শারেট আরও বলেন ঃ "কোন অবস্থাতেই ইসরাইলের বন্ধুদের উচিত হবে না যে, তার কাছে এই অনুরোধ করে, ভূমি থেকে যে কোন প্রত্যাহার, কারণ তা হবে আত্মহননের শামিল।

তারা যেন ইসরাইলকে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের কোন অনুরোধ না করে। কারণ সেটাই আত্মহননের কাছাকাছি। তার কাছে যেন কোন ক্ষতিপূরণ দেয়ার অনুরোধও না করে। কারণ তার কাছে যা আছে তাতে কোনমতে কেবল তার চাহিদা মিটাতে পারে। যদি কেউ শরণার্থী বা তাদের সহায়-সম্পদের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য চাপাচাপি করে তাহলে সে যেন প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।"

পরবর্তীতে বেন গোরিয়নের সাথে সাক্ষাতে এবং লেভি আশকুল ও টেডে কোলেক প্রমুখ ইসরাইলী নেতার সাথে সাক্ষাতে আরও কিছু বাড়তি কথা শোনেন যেগুলোর গুরুত্বও কম নয়। ১৪ মে, ১৯৫৩-এর সকালে বৈঠকে ডালাসের সামনে বেন গোরিয়নই ছিলেন মূল মুখপাত্র। বেন গোরিয়ন বলেন (কার্যবিবরণী অনুসারে ডকুমেন্ট নং ১৫৬ সাক্ষাৎকার নথি দ্রঃ) ঃ

"মন্ত্রী মহোদয়, আপনি তো এ অঞ্চলে আরবদের বন্ধুত্ব লাভের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমারও কামনা, আপনার প্রচেষ্টা সফল হোক। যদিও এ ব্যাপারে আমার ঘোর সন্দেহ রয়েছে।"

এরপর বেন গোরিয়ন ইসরাইল প্রসঙ্গে আলোচনা তুলে বলেন ঃ "ইসরাইল হচ্ছে একটি ভিন্ন ব্যাপার। কারণ এটি হচ্ছে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মুক্ত বিশ্বের একটি অংশ। এ হচ্ছে তুর্কিস্থানের পাশে একমাত্র রাষ্ট্র যে মুক্তি ও গণতন্ত্রের রক্ষায় যুদ্ধ করতে সক্ষম। আপনারাও স্মরণ করে দেখুন, আমাদের সৈন্যরা দু'টি মহাযুদ্ধে কিভাবে আপনাদের পাশে থেকে লড়ে গেছে। এরপর ঐ দুই যুদ্ধে আরবরা

কি করেছে তা তুলনা করে দেখুন। তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল এবং আপনাদের সাথে দরকষাকষির খেলা খেলেছে। তারা আপনাদের যুদ্ধের সঙ্কট সন্ধিক্ষণে আপনাদের উপর নানা শর্ত চাপিয়ে দিয়েছিল। অথচ তারা তাদের বিরাট সাইজ সত্ত্বেও এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবেও ছিল মূল্যহীন। আমরা তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে সামান্য সম্পদ নিয়েও যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। অথচ তারা তাদের যা কিছু আছে সব নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি।"

বেন গোরিয়ন এই সাধারণ অবতরণিকা পেশ করে মিসরের ব্যাপারে আলোচনা কেন্দ্রীভূত করার দিকে মনোনিবেশ করলেন। তিনি বলেন ঃ

"আপনারা মিসরের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, মিসরের যে সব বৈশিষ্ট্য আছে, ইসরাইলেরও তার সব কিছু রয়েছে। কারণ উভয় দেশেই ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ঈলাত সমুদ্রবন্দর ও হাইফা সমুদ্রবন্দরের মাঝ দিয়ে প্রবাহ জীবনময় ধমনী সেই একই স্রোতস্বিনী যা পোর্ট সাঈদ ও সুয়েজের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। সেও দু'টি সমুদ্রের মাঝে যোগাযোগ রক্ষাকারী নতুন খাল খনন করার জন্য প্রস্তুত। আর এই কেন্দ্রটি নিঃশর্তভাবে মুক্ত বিশ্বের প্রতিরক্ষায়ও প্রস্তুত রয়েছে। অথচ মিসরীয় কেন্দ্রটি এর সঠিক বিপরীত। বরং ইসরাইলী কেন্দ্রটিতে রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। পক্ষান্তরে মিসরের পয়েন্টে সব সময়ই প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সম্ভাবনা আছে এবং আর্থ-সামাজিক কারণে অস্থিরতা সব সময়ই থাকবে। আপনারা সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলার বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন। আরবরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে কখনই আমাদের সাথে অবস্থান নেবে না। তারা দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার কারণে তাতে কখনই সক্ষম হবে না। তারা এমনকি চিন্তা-ভাবনার দিক থেকেও আপনাদের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সংঘাতের বাস্তবতা উপলব্ধি করে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না। আমি জ্যানি না, কেন মিসরীয়রা চাচ্ছে যে, আমরা নাকাব থেকে বের হয়ে যাই। তাদের তো রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বড় সাহারা মরুভূমি। তাদের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি ভূখণ্ড রয়েছে। তাদের দেশের সাইজ ইসরাইলের ৩৬ গুণের সমান।" এরপর বেন গোরিয়ন তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টিকে আরও সুনির্দিষ্ট করতে গিয়ে বলেন, 'আমরা চাই আপনাদের সাথে দূরতম সীমা পর্যন্ত সহযোগিতা করতে। আমাদের সাথে আরবদের লড়াইয়ে আপনাদের জড়াতে চাই না। আমরা উপলব্ধি করছি যে, তাদের সাথে কোন সন্ধি হওয়া সুদূরপরাহত। আমরা যা চাই তা হচ্ছে– এমন কিছু সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে যুদ্ধবিরতি চুক্তিগুলো আরও মজবুত, নিশ্চিত ও সম্প্রসারিত হয়।'

বেন গোরিয়নের আলোচনার মধ্যে এই শেষোক্ত পয়েন্টটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসরাইল কখনও সন্ধি-চুক্তির মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল না। সে কেবল

চাইত অস্থায়ী কিছু পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে যাতে সে অব্যাহতভাবে তার সম্প্রসারণ চালিয়ে যেতে পারে। নতুন নতুন সীমানা সৃষ্টি করবে। অস্ত্রের জোরে এমন এক পরিস্থিতিতে সীমানা ছাড়িয়ে যাবে যখন কেউ তার পথ আগলে দাঁড়াতে পারবে না। এটা নবতর ঘটনার বিবর্তনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব।

অবশিষ্ট আরব রাজধানীগুলোতে জন ফস্টার ডালাস বহু কথাবার্তা শোনেন। কোনটি মূল সমস্যার কাছাকাছি আবার কোন কোন আলোচনা ছিল সমস্যা থেকে অনেক দূরে। বৈরুতে প্রেসিডেন্ট কামিল শামউন অনেক লম্বা আলোচনায় বোঝাতে চাইলেন যে, এ অঞ্চলে ব্রিটিশ কেন্দ্র হারানোর পর তার জায়গায় যুক্তরাষ্ট্রের আসা খুবই জরুরী। এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলায় তার নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। আর খোদ এ অঞ্চলের সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়। এ প্রেক্ষিতে শামউন বেশ স্পষ্ট করেই বলেন যে, আরব ইস্যুই হচ্ছে ফিলিস্তিন সঙ্কট। মিসর (বৃহত্তম আরব দেশ হলেও) হয়ত ব্রিটিশদের সাথে ঝগড়া নিয়েই ব্যস্ত বলে মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের এ বিষয়টিই তার আপন আবেদনে মুখ্য হয়ে উঠবে। কারণ মিসর অন্যান্য আরব দেশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বেঁচে থাকতে পারবে না।

বাগদাদে তাঁর সাথে কথা বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নূরী-আস-সাঈদ ও প্রধানমন্ত্রী আহমদ জামির আল মেদফাঈ-এর উপস্থিতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফাদেল জামালী। তিনি বলেন, "আরবরা যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব চায়, কিন্তু এটা সুদূরপ্রসারীভাবে নির্ভর করছে ফিলিস্তিনে কি ঘটতে যাচ্ছে তার ওপর। ইরাকের সরকার ও জনগণ এ অঞ্চলে পশ্চিমাদের কর্তৃক গৃহীত যে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যোগ দেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে, কিন্তু সে এটাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, ফিলিস্তিন সঙ্কটের সমাধান ছাড়া তা কখনও কার্যকর হবে না।"

দামেস্কে তাঁর সাথে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল আদীব শিশকলী আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "তিনি হচ্ছেন একজন বাস্তববাদী লোক। তিনি বাস্তবতাকে তেমনি দেখছেন যেমনটা তা এ ভূমিতে আছে। তিনি তাঁদের একজন নন যাঁরা কল্পনা করেন যে, ইসরাইলের অস্তিত্ব নেই। বরং তার বিপরীত তিনি স্বীকার করেন যে, ইসরাইল বিদ্যমান এবং জীবন্ত। কিন্তু তিনি প্রত্যাশা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের আচরণে আরবদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য থাকবে এবং তাদের সাথে সেই ব্যবহারটুকু করবে যা ইসরাইলের সাথে করছে। রিয়াদে গিয়ে ডালাস দেখেন যে, বাদশাহ আব্দুল আজিজ ফিলিস্তিনের বিষয় নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাচ্ছেন না। কারণ তার কাছে মনে হলো ব্রিটিশ নীতি এখন নতুন করে মোড় নিয়ে ছোট ছোট দেশ সৃষ্টি করার পথ পরিষ্কার করছে, যাতে এগুলো উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আরব উপদ্বীপের পাড়ে শাসন করতে পারে। তা ছাড়া সে এখন এসব ভূখণ্ডের শেখ বা

গোত্রপতিদেরকে কিছু ভূমি দিচ্ছে যাকে বাদশাহ তাঁদের অধিকার বলে গণ্য করছেন। যেমন 'আল-বোরিমি' মরূদ্যান। এ সাক্ষাৎকারের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, বাদশাহ আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঠিক এ ভাষায় বলেন– "কোন একদিন ইংরেজরা বলত আমি তাদের কালো রাতের বন্ধু, আর এখন তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে আমি আগ্রাসী।"

আমির ফয়সলের সাথে ডালাসের পরদিনের বৈঠকে হেজাজে বাদশাহর প্রতিনিধি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী (ফয়সল) কেবল বোরমীর আমীর শেখ তুর্কি বিন উতাইশানের অভিযোগ, নিয়েই মেতে থাকলেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছেন যে, একটি ব্রিটিশ পেট্রোল তাঁর উটগুলোকে সিজ করে নিয়ে গেছে। এসব উটের গোশত আর দুধের ওপর নির্ভর করে তিনি ও গোত্র জীবনযাপন করেন।

দিল্লীতে এসে ডালাস প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর কথা শোনেন। তিনি (নেহেরু) তার আলোচনা মিসর-ব্রিটেন সংলাপের ওপর কেন্দ্রীভূত রাখেন। তিনি বলেন ব্রিটেনকে অবশ্যই সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে চলে যেতে হবে; নাইলে সম্ভব হলে সে গোটা মিসর দখল করে নেবে। কিন্তু তারপর কি করবে? তারপর নেহেরু ব্যঙ্গ করে বলেন, "বর্শার দাঁত সম্রাটদের উপবেশনের উত্তম স্থান নয়।"

করাচিতে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ডালাসকে গুরুত্বের সাথে একথা বলেন যে "সুয়েজ খালের ভবিষ্যৎ কেবল মিসরেরই বিষয় নয়।"

আঙ্কারায় আদনান মান্দারেস তাঁর বক্তব্যকে কেন্দ্রীভূত করেন ডালাসকে এ কর্তা বোঝালেন যে, তেল সম্পদ সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে ভিড়তে হলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবশ্যই প্রথমে তুর্কিস্তান হয়ে যেতে হবে। এ প্রেক্ষিতে প্রতীক্ষিত সব আমেরিকান সাহায্য তুর্কিস্তানের প্রতি নিবন্ধ হওয়া উচিত। কারণ এটাই হচ্ছে একমাত্র দরজা যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে বন্ধ করা যবে এবং এর পিছনে গোটা মধ্যপ্রাচ্য থাকবে সম্পর্ণ নিরাপদ। (চলবে)

ডালাস ওয়াশিংটনে ফিরে এলেন। এ অঞ্চলের সাম্প্রতিক সফরের ফলাফল তিনি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পেশ করেন। এ বৈঠকে সভাপতি ছিলেন আইজেনহাওয়ার এবং এতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুযায়ী (আইজেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত কাগজপত্র, ইয়ূথম্যানের ৪ নথিপত্র –জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সভা নং ১৪৭ দ্র.) জন ফস্টার ডালাস তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল এভাবে পেশ করেন ঃ

মিসর ঃ আমি যখন মিসরে পৌঁছলাম তখন আমার ধারণা ছিল যে, মিসর মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষা বিষয়ক আমাদের প্রকল্পের ঘাঁটি হতে পারে। কিন্তু সেখানে যা দেখলাম তাতে বর্তমানে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হচ্ছে। আমি দেখলাম, যেমনটি

ভেবেছিলাম নাজীব তেমন শক্তিশালী পুরুষ নয়। বরং তিনি হচ্ছেন চার সদস্য বিশিষ্ট বিপ্লবী কমাণ্ড কাউন্সিলের বহির্দৃশ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার কলকাঠি তারাই নাড়াচ্ছে। বর্তমান সময়ে তাদের মূল কাজ হচ্ছে সুয়েজ খালের ঘাঁটি থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন। তারা এই ঘাঁটির বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ চলিয়ে যাচ্ছে; যার ফলে ব্রিটিশরা তাদের প্রজা-পোষ্যদের সুরক্ষার জন্য কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া দখলের চিন্তা করতে পারে। আর এমন কিছু হলে তা হবে পাশ্চাত্যের জন্য এক বিপর্যয়। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিও সন্দেহের অনুভূতি দেখতে পেলাম। সাম্প্রতিক কয়েকটি মাসে এর আলামত প্রকাশ পেয়েছে। আমি তার প্রভাব হালকা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। এছাড়াও পশ্চিমা বিশ্বের কাছে সুয়েজ খালের ঘাঁটির গুরুত্ব সম্পর্কে জেনারেল মুহাম্মদ নজীবকে কিছু পাঠ দিতে হলো আমাকে। আমি নজীবের সহকর্মীদের মধ্যে ফিলিস্তিন সম্পর্কের ব্যাপারে সুস্পষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মিসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিস্থিতি বিচারে বেশ কিছু বছর পর ছাড়া কোন প্রভাবশালী ভূমিকা চর্চা করতে পারবে না।

ইসরাইল ঃ আমি ইসরাইলে লক্ষ্য করেছি যে, সে একটি বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করছে। তাকে জার্মানির দেয়া ক্ষতিপূরণ কিছু সাহায্য করবে। তারা আরবদের সাথে একেবারেই সন্ধি করার চিন্তা করছে না। বরং তারা আরব পক্ষগুলোর সাথে আলোচনার পথ ধরে ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় যেতে চায়। সেটাও কিন্তু সমষ্টিগতভাবে নয়। আমি ইসরাইলীদের মধ্যে এও লক্ষ্য করেছি যে, আরবদের প্রতি আমেরিকার আগ্রহ ও আমেরিকান নীতির ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন। আমাদের অবশ্যই জানা দরকার যে, ইসরাইলী বাহিনী একাই সকল আরব দেশের সমষ্টিগত বাহিনীর চেয়েও বড়। এই বাস্তবতাকেও আমাদের হিসাবে আনতে হবে।

সিরিয়া ঃ আমার মনে হলো সিরিয়া হচ্ছে এমন একটি দেশ যার সত্যিকার সামর্থ্য রয়েছে। দেখতে পেলাম যে, মিসরের নজীবের ব্যক্তিত্ব থেকে শিশকলীর ব্যক্তিত্ব অনেক বড়। তাঁর দৃষ্টি হচ্ছে অধিকতর প্রসারিত এবং সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর বুদ্ধি গভীরতর। আমার বিশ্বাস সিরিয়া বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনী শরণার্থীকে জায়গা দিতে সক্ষম।

ইরাক ঃ আমি দেখলাম যে, সোভিয়েত হুমকির ব্যাপারে ইরাক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সচেতন আরব দেশ। হয়ত দেশটি ভৌগোলিক দিক থেকে নিকটতর হওয়ার কারণে। তাছাড়া সে ইরানের পড়শী হওয়াও একটি কারণ হতে পারে।

সৌদি আরব ঃ এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমাদের জন্য এ অঞ্চলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ হচ্ছে সৌদি আরব। কারণ সেখানে আমাদের পেট্রোল সুবিধা হচ্ছে

বিকল্পহীন। অনুরূপভাবে সৌদি আরবে আমাদের বিমান ঘাঁটি হচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। কিন্তু বাদশাহ ব্রিটিশদের নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন। এ অবস্থায় আমরা উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করতে পারি।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ডালাসের উপস্থাপনায় ছেদ টেনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তাই যদি হয়, তাহলে ব্রিটিশরা কেন সৌদি সীমান্তে এসব শেখ রাজ্য আর সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠা করছে? ডালাস উত্তর করলেন, "কারণ সে মনে করে যে, এটা তাদের পুরনো প্রতিশ্রুতি পালন। "আইজেনহাওয়ার মন্তব্য করেন, তিনি এখন বিস্ময় অনুভব করছেন যে, সৌদি আরব এখন যেভাবে আছে সেভাবে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে কেন; যখন ইংরেজরা এর উপকূলে বিভিন্ন আমিরাত ও শেখ রাজ্য ঝুলিয়ে তাদেরকে সঙ্কুচিত করে নিচ্ছে?" ডালাসের সফরের পরপরই মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োজিত কূটনৈতিক মিশন প্রধানদের নিয়ে একটি মহাসম্মেলন হলো। সম্মেলনের সামনে ডালাসের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরা হলো। তাঁরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যা তাঁদের রিপোর্টে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। (ডকুমেন্ট নং ১৪৫৪-১২০০৪৩৮২/৫)। এর মূল কথা ৯ নং ধারায় বিধৃত হয়েছে। তা হলো– পাশ্চাত্যের পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ হতে হবে আরব জাহানের উত্তর বেল্ট ও দক্ষিণ বেল্টের মধ্যে ব্যবধানকারী। অর্থাৎ ডালাস যেমনটি তাঁর বাগদাদ সফরে লক্ষ্য করেছেন। ইরাক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপদ সম্পর্কে সচেতন। তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী পাশ্চাত্য প্রতিরক্ষা জোটে অংশগ্রহণে রাজি করানো সম্ভব। পরবর্তী পর্যায়ে ইরাকের সাথে সিরিয়াকেও টেনে আনা যাবে। জর্ডান ও লেবাননকেও একই কায়দায় রাজি করানো যাবে।

সম্মেলনের রিপোর্ট এরপর বলছে–"উত্তর বেল্টের প্রতি আগ্রহের কারণে পশ্চিমে মিসরের প্রতি গুরুত্ব আরোপে অবশ্যই শিথিলতা আসবে না। কারণ যদি কোন দিন আরব-ইসরাইল সঙ্কট সমাধানের ইচ্ছা থাকে তাহলে মিসর সব সময় গুরুত্বপূর্ণ থেকে যাবে। কারণ মিসরকেই এই সঙ্কট সমাধানের নেতৃত্ব দিতে হবে। কারণ আরব বিশ্বে এটিই হচ্ছে একমাত্র দেশ যার এমন ভারিক্কি ও প্রভাব রয়েছে যে, সে যদি ইসরাইলের সাথে সন্ধি করে তাহলে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যরাও এগিয়ে আসবে।

এ কারণেই সত্যি সত্যি আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রের কার্গোগুলো ইরাকের পথে অগ্রসর হলো। এ ছিল তার উত্তর বেল্টে যোগ দেয়ার ভূমিকা। এরপর হঠাৎ করে দেখা গেল আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালাস ইরাকী প্রধানমন্ত্রীকে সিরিয়া ও মিসরের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের ঘোষণা দিচ্ছেন। ডালাস তাঁর মন্ত্রণালয়ের সচিব হেনরি বায়রড'কে এক নির্দেশনায় লিখছেন (ডকুমেন্ট নং ৭৮০/

৮২৩৫৪), "ইরাক উত্তর বেল্টে যোগ দেবে, এর ভিত্তিতে এ দেশকে অস্ত্র সরবরাহ করার দৃষ্টিভঙ্গি আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু এ জন্য নয় যে, সে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরব লীগের কোন দেশের সাথে সহযোগিতা করবে। আমি শেষবার যখন ইরাকী প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করলাম তখন সিরিয়ার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। আমি তাঁকে বললাম যে, এটা আমাদের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যাত। কারণ এতে উভয় দেশ সম্মিলিতভাবে ইসরাইলের সীমান্তে শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ পাবে। তাদের এটা বোঝা উচিত যে, এখন যা করতে পারে তা হচ্ছে তুর্কিস্তান বা পাকিস্তানের সাথে অগ্রসর হওয়া। সত্য কথা বলতে কি, আমি তা পছন্দ করি না। বাগদাদে নিয়োজিত আমাদের দূতাবাসকে বিষয়টি অনুসরণ করে যেতে হবে।"

এই যে ইরাককে দিকনির্দেশনা দেয়া এবং পরে তার সাথে সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডানকে টেনে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধী জোটে তুর্কিস্তান ও পাকিস্তানের পাশে কাতারবন্দী করা, এর অর্থ হচ্ছে যেন দক্ষিণে ইসরাইলের সামনে মিসর নিঃসঙ্গভাবে পড়ে থাকে। অপরাপর আরব দেশ থেকে ভৌগোলিকভাবে যেন ইসরাইলের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং উত্তর বেল্টের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবেও নিঃসঙ্গ থাকে। কারণ এতে শাম ও উর্বরচন্দ্রে অবস্থিত আরব দেশগুলোকে উত্তরে টেনে নেয়া হবে। ইসরাইল এ সময় ঘটমান পরিবর্তনগুলোকে গভীরভাবে অনুসরণ ও উপলব্ধি করে যাচ্ছিল এবং এগুলোর বাঁকে বাঁকে নিজেদের সুযোগের সন্ধানে ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুয়েজের ভূমিকম্প

বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা কোন নৈতিক বা মানবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি হচ্ছে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। এ জন্যই স্বার্থের সাথে আরেক স্বার্থের এবং এক চাহিদার সাথে আরেক চাহিদার গ্রহণযোগ্য ভারসাম্য বাস্তবায়ন আবশ্যক। প্রয়োজন শক্তির উপাদানসমূহের সাথে অপর শক্তির উপাদানের সন্তোষজনক ভারসাম্যের। এ ভারসাম্য ছাড়া যে শান্তির চেষ্টা করা হয় তা হয়ে যায় অনৈতিক ও অমানবিক। কারণ সেটা প্রকৃত শান্তি নয়। বরং তা হয় দুর্বলতার ওপর পরাক্রমের আক্রোশে নেমে আসার স্তব্ধতা মাত্র।

হাইকাল-এর দর্শন

॥ ১ ॥

এডেন

"নাসেরকে এ কথা ভাবতেও দেয়া যায় না যে, আমাদের মুখের ওপর সে না বলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।"

—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জন ফস্টার ডালাস তাঁর মধ্যপ্রাচ্যে সফর থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পূর্ণ বুঝ নিয়ে ফিরে আসেন, যে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর আগে অন্যরাও পোষণ করেছিল। কিন্তু নিজের চোখে দেখে আসায় তাতে এখন বাড়তি শক্তির যোগ হলো। এর পিছনে এখন এমন জোরালো পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন ইতোপূর্বে যা মেলেনি। এই পৃষ্ঠপোষকতা আসছে ডুয়েট আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বে নতুন আমেরিকান প্রশাসন থেকে।

ডালাস দৃষ্টিভঙ্গির মূল যুক্তি ছিল- যা তিনি মধ্যপ্রাচ্যের যেখানেই গেছেন, আলোচনা করেছেন- সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা প্রকল্প প্রয়োজন। তবে তার আগেই তিনি সামনে আরেকটি বিবেচ্য বিষয় দেখতে পান। তা হচ্ছে- 'আরব-ইসরাইলী সংঘাত'। এ কারণেই মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য এই সংঘাতের সমাধান হচ্ছে অলঙ্ঘনীয় বিষয়। সকল আরব রাষ্ট্রের কাছে এই সঙ্কটের সমাধানই হচ্ছে সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয়। এমনকি যদি এসব দেশ তাদের অগ্রগণ্য বিষয়গুলোর মধ্যে পরিবর্তনও আনে তাহলেও এই পরিবর্তন কোন কাজে আসবে না। কারণ যদি তাদের সাথে ইসরাইলও মধ্যপ্রাচ্যের এই নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। কারণ কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ঠিক বক্ষদেশে যদি ফুটো থাকে তাহলে তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে "জন ফস্টার ডালাস ওয়াশিংটনে ফেরার সাথে সাথে আমেরিকার নীতির পরবর্তী পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা আর আরব-ইসরাইল শান্তির মধ্যেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে যায়। ডালাস দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর তার মনে যে দৃষ্টিভঙ্গি বা থিওরি জেগেছে তা উপস্থাপন করেন। এর মূল কথা হলো- সম্ভবত আরব ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া ছোট ছোট আরব দেশ যেমন লেবানন ও জর্ডান থেকে শুরু করাই শ্রেয়। এদেরকে রাজি করানো সহজ হবে। বড় বড় আরব দেশ ঠিক এর উল্টো। বিশেষ করে ইরাক উত্তর বেল্টে অংশগ্রহণ থেকে বেশি কিছুর ভার বহন করতে সক্ষম হবে

না। আর সেটাও সম্ভব হচ্ছে নূরী-আস্ সাঈদ-এর জন্য। কারণ ইসরাইলের সাথে ইরাকের কোন যৌথ সীমান্ত নেই। এদিকে সিরিয়া আদীব শিশকলীর কেন্দ্র টলমলে হয়ে যাওয়ার পর অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঠিক ডালাস যা ভেবেছিলেন তার উল্টো। পাশাপাশি সিরিয়ার জনমত তাদের আরব জাতীয়তাবোধে খুবই একরোখা, তাদেরকে ইসরাইলের সাথে শান্তির ব্যাপারে বাগে আনা খুবই কঠিন হবে। তার ও তার বিশেষজ্ঞদের মধ্য দীর্ঘ আলোচনা চলে; তারা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, জর্ডান ও লেবাননের মতো ছোট দেশগুলো দিয়ে শুরু করা অসম্ভব। বাস্তব অভিজ্ঞতা নেয়ার শুরুতেই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জর্ডানের বাদশাহ 'আব্দুল্লাহ' আর লেবাননের সবচেয়ে বড় মুসলিম রাজনীতিক বিয়াদ আস সুলহ্ আততায়ীর হাতে নিহত হন।

অবশেষে ডালাস তার উপদেষ্টাগণসহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি আরব ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি স্থাপনের কোন সুযোগ থাকে তাহলে একটিই পথ আছে–তা হচ্ছে কায়রো থেকে শুরু করা। কারণ মিসরের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও আরব বিশ্বে তার প্রভাব এবং পাশাপাশি এর বর্তমান পরিস্থিতির কারণ হয়ত এ ভূমিকা পালনে সে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, বিশেষ করে যদি যুক্তরাষ্ট্র তাকে সাহায্য করে। আর যদি তাই হয়, তাহলে অবশিষ্ট আরব দেশগুলোর সামনে তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। ফিলিস্তিন যুদ্ধের পরে যুদ্ধবিরতি চুক্তির অভিজ্ঞতা ঠিক এটাই ঘটেছিল।

১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে ডালাসের কিছু কর্মনীতি ছিল, যা তার কাঙ্ক্ষিত দ্বৈত লক্ষ্যের সাথে মিলে গিয়েছিল। তা হচ্ছে প্রথমত আরব ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি বাস্তবায়ন, যাতে পরবর্তী পর্যায়ে এ অঞ্চলের সব দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মোকাবিলার পদক্ষেপে সুপরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে শামিল হতে পারে। আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিন্তা-ভাবনায় যে কর্মনীতি ঘুরপাক খাচ্ছিল তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. মিসর ও ব্রিটেনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে সুয়েজ খাল ঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহারের ব্যাপারে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া।

২. আর যেহেতু এ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কিছু সময় লাগবেই, মিসর ঐ সময়টিতে এই প্রত্যাহার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার আগ্রহের ইসরাইলের সাথে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে আমেরিকান প্রচেষ্টার প্রতি মনখোলা থাকবে।

৩. এই স্পর্শকাতর সময়খণ্ডে মিসরের মনকে চাঙ্গা করে রাখার জন্য তাকে সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতা দেয়া যেতে পারে। এছাড়া বর্তমান মিসরীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণের কাছে প্রধান ইস্যু হিসাবে পরিণত উঁচু বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের সহযোগিতার ইঙ্গিত দেয়া যেতে পারে।

৪. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এই সংবেদনশীল সময়কে কাজে লাগিয়ে শান্তি স্থাপনের পূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অথবা কমপক্ষে এতদূর

পথ অতিক্রম করে যেতে হবে যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব হবে। আর এ কাজটি সারতে হবে সুয়েজ খাল বেস থেকে ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই। ক্ষণিকের জন্য মনে হচ্ছিল যেন ডালাস ও তার উপদেষ্টাদের নির্ধারিত পথেই এ অঞ্চলের জমিনে আমেরিকান কর্মনীতি পথ চলেছে।

যা হোক, মিসর ও ব্রিটেনের মধ্যে আলোচনায় অনেক সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও এক পর্যায়ে উভয় দেশ ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহারে এক চুক্তিতে উপনীত হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বাক্ষর করেন জামাল আব্দুন নাসের এবং ব্রিটিনের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 'এন্থোনি এডেন'। ১৯৫৪-এর জুলাইয়ে এ চুক্তির ঘোষণা দেয়া হয়। কার্যত যুক্তরাষ্ট্র এ চুক্তিতে পৌঁছার সহায়ক মৌলিক উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল। এ চুক্তি ৮ মাসের মধ্যে প্রত্যাহার কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়। এ সময়টি ছিল ডালাসের সামনে উন্মুক্ত এক মোক্ষম সুযোগ। তারা সময় নষ্ট করেনি। একদল বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে মশগুল ছিলেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ফ্রান্সিস রাসেল। একে তিনি আরব–ইসরাইল শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়নের জন্য বিশেষ সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। এই সেই পরিকল্পনা, যা "আলফা" প্রতীকী নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। শীঘ্রই এই আল্‌ফা প্রকল্প এমন এক পর্যায়ে সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছিল যে, তাকে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় রাখা হয়েছিল। এর রুট ঠিক করতে লেগেছিল তিন তিনটি মাস। এরপর সিআইএ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা চলে। তারপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের ভিত্তিতে এর চূড়ান্ত রূপরেখা ঠিক করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে একমাত্র ব্রিটেনই এ প্রক্রিয়ায় যোগ দেয়। কারণ তাকে মধ্যপ্রাচ্যের মৌলিক শরিক গণ্য করা হয়। তাছাড়া এ সময়ের সুবর্ণ সুযোগটি সৃষ্টি হওয়ার সাথে জড়িত ছিল সুয়েজ খাল ঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ প্রত্যাহার। পরিশেষে পরিকল্পনা গৃহীত হলো ঃ ব্যাপক পরিকল্পনা, এর বিস্তারিত কর্মসূচীর সময় নির্ধারণ, দায়িত্বশীল ব্যক্তি নির্ধারণ এবং তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা পালনের জন্য সময়ের পরিসর। তাছাড়া রয়েছে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নির্ণয়। এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে ২৩৮ পৃষ্ঠার এক ভলিয়্যুম প্রস্তুত হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরিকল্পনাটি পরিশিষ্ট 'খ' তে ছিল "উদ্বুদ্ধকরণের উপকরণ ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদান"–যার মাধ্যমে মিসরকে প্রকল্পটি গ্রহণে সম্মত করানো যাবে।

পরিকল্পনার বিবরণ নিয়ে যে ভলিয়্যুম প্রস্তুত হয়েছে তাতে রয়েছে ঃ

১. মিসর আমাদের সাথে অস্ত্র বেচা-কেনার চুক্তিতে উপনীত হতে বারবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমরা পরিকল্পনা সময়কালে তাদের সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়ে যৌথ নিরাপত্তা আইনের খ ১০৬ ধারা অনুসারে অস্ত্র কেনার জামানত

গ্যারান্টিসহ একটি ছাড়পত্র দিতে পারি। এ চুক্তিটি তিন বছরের জন্য হতে পারে। আমরা ২০ মিলিয়ন ডলার পরিমাণে চুক্তি করতে পারি। শর্ত থাকবে যে, আমরা মিসর সরকারকে এ মর্মে স্পষ্ট জানিয়ে দেব যে, আলোচনার সময়খণ্ডে আমরা তাদের আচরণ অনুসরণ করে যাব। যদি আমাদের নীতির সাথে তারা সঙ্গতিশীল আচরণ করে বলে লক্ষ্য করি তাহলে এ বিক্রির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারি।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্রিটেনের সাথে চুক্তির পর জামাল আব্দুন নাসেরের ভূমিকা সমালোচনার সম্মুখীন হবে। কারণ সেখানে কিছু জাতীয়তাবাদী আছে, যাদের প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি কিছুর। কাজেই যদি ব্রিটেনের সাথে চুক্তির পরপরই আমরা সামরিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিই, তাহলে নাসের এটা গ্রহণে আকৃষ্ট হবে। নাসেরকে অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে ইসরাইলের আপত্তিকে আমাদের ভয় করার কিছু নেই। কারণ সে যদি ইসরাইলের সাথে সন্ধি করার প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের অস্ত্রলাভ করতে রাজি হয়, তাহলে ইসরাইলের ভয় হবে অমূলক।

২. নাসেরের হাতে কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রয়েছে; এতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। যদি আমরা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরও বেশি মিসরী যুবকের বৃত্তির ব্যবস্থা করি তাহলে তা হবে তার মুখে বাড়তি মিছরির টুকরো ঢালার মতো। তাছাড়া অচিরেই আমেরিকান অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কিছু সংখ্যক সামরিক কর্মকর্তাকে আমাদের স্টাফ কলেজগুলোতে স্থান দিতে পারব।

৩. যেহেতু মিসরে উঁচু বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে অর্থনৈতিক ও মানসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, কাজেই আমরা প্রয়োজনীয় প্রকৌশলগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরপরই উঁচু বাঁধ নির্মাণে অর্থায়নের সহযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের ঋণের আবেদন করতে পারি। প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা কংগ্রেসের কাছে ২০ মিলিয়ন ডলারের ক্রেডিটের জন্য আবেদন করতে পারি। এতে করে আমরা নাসেরের যে কোন দ্বিধাকে কাটিয়ে উঠতে পারব।

৪. যখন মনে হবে যে, তিনি এটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তখন আমরা তাঁকে সামনে চলার জন্য এভাবে রাজি করাতে পারব যে, তিনি প্রতিবছর ২০ মিলিয়ন ডলার করে পাঁচ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে উঁচু বাঁধ নির্মাণের অর্থ পাওয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

৫. বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিকায়নের মিসরের উচ্চাভিলাষ রয়েছে। আমরা তাদেরকে বর্তমানে নির্মাণাধীন রেডিয়েটর ওয়ার্কশপ সম্প্রসারণে সাহায্য করতে পারি। এ ছাড়া আণবিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কর্মসূচী প্রস্তাব করতে পারি। এর কিছু দিন গেলে আমরা আণবিক শক্তি কেন্দ্রের প্রস্তাব যোগ করতে পারি।

৬. উপযুক্ত সময় বোঝে আমরা নাসেরকে তার দেশের জন্য আমেরিকান উদ্বৃত্ত গম দেয়ার সম্ভাবনার কথাও বলতে পারি।

৭. আমরা মিসরকে তার উৎপাদিত তুলার বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে পারি এবং আমেরিকার বাজারে আরও বড় কোটা অনুমোদন করতে পারি।

৮. আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিসরের আকাঙ্ক্ষাগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে পারি। এর মধ্যে যেমন ধরা যাক, আমরা মিসরকে আঞ্চলিক যাতায়াত ও যোগাযোগের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে পারি। তবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে আমরা এসবের মাধ্যমে ইরাককে যেন ক্ষেপিয়ে না তুলি। কারণ কায়রো ও বাগদাদের মধ্যে সনাতন প্রতিযোগিতা চলে আসছে।

২৭ জানুয়ারি ১৯৫৫ ইং তারিখে আমেরিকা ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের মধ্যে আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল এই পরিকল্পনায় চূড়ান্ত ছোঁয়া লাগানো। (নথি নং ৫৯ -ডি ৫১৮; ২৭ জানুয়ারি ১৯৫৫ তারিখে আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংরক্ষিত কাগজপত্র দ্রঃ) আমেরিকার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন ডালাসের প্রথম সহকারী 'হারবার্ট হোফার', তার সাথে রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আল্‌ফা পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বশীল ফ্রান্সিস রাসেল এবং রাষ্ট্রদূত রিমোন্ড হ্যার। ব্রিটিশ পক্ষে ছিলেন ওয়াশিংটনস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স 'রবার্ট সুট' ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিব 'ইভলেন শ্যাকবূরাহ'। বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুসারে– রাসেল প্রথমে আল্‌ফা পরিকল্পনাটি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা উপস্থাপন করেন। তারপর বলেন– যেহেতু প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাস এই পরিকল্পনাটিকে যে কোনভাবে সফল করতে চান সে জন্য ঠিক হয়েছে যে, আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব হেনরি বায়রডকে মিসরে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হবে যাতে কর্নেল নাসের-এর সাথে সরাসরি যোগাযোগে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে। এ ব্যাপারে সবার বড় আস্থা রয়েছে যে, বায়রড তার প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং জেনারেল 'মার্শাল'-এর সহকারী থাকাকালীন তার সামরিক ব্যাকগ্রাউন্ড-এর মাধ্যমে নাসেরকে বুঝতে পারবেন এবং তিনি যেকোন সাধারণ ও গতানুগতিক রাষ্ট্রদূতের চেয়ে বেশি দূরদর্শী হবেন। রাসেল আরও বলেন যে, এ পরিকল্পনার সাফল্যের বড় অংশ নির্ভর করে এর সাধারণ ধারণা নাসের গ্রহণ করবেন কি তার ওপর। তারপর 'রাসেল' বলেন– তিনি উপলব্ধি করছেন যে, এই পরিকল্পনা সবচেয়ে বড় যে বাধার সম্মুখীন হবে তা হচ্ছে নাসের তার কৌশলগত পারদর্শিতায় ফিলিস্তিনে লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মিসর ও বাকি আরব জাহানের মধ্যে স্থল যোগাযোগের পথ খোলার ওপর অনমনীয়ভাবে জোর দিবেন। এ কারণে তাঁর নিকট 'নাকাব' বিষয়টিই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।

এর জবাবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্যাকবূরাহ্ বলেন – 'প্রশ্ন উঠবে ইসরাইল কি নাকাব অঞ্চলের কোন ভূখণ্ড ছেড়ে আসতে আদৌ প্রস্তুত আছে ? তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন এই বলে যে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট কিছু সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো ইসরাইলের প্রতি আরবদের মানসিকতায় যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা কিভাবে অতিক্রম করা সম্ভব। দীর্ঘ আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই পরিকল্পনাটি প্রথমতঃ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে কায়রোতে অনুষ্ঠিতব্য সভায় ব্রিটিশ পররাষ্টমন্ত্রী এন্থোনী এডেন-এর মাধ্যমে জামাল আব্দুন নাসের-এর নিকট উত্থাপন করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে বায়রড কায়রোতে পৌঁছে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

ব্রিটেনের আল্ফা পরিকল্পনা

'এডেন' এর শুভ উদ্বোধনের পর বায়রড তাঁর ভূমিকা পালন করে যাবেন। কিন্তু আমেরিকান পক্ষ চেয়েছিলেন যে, বায়রডই সর্বপ্রথম বিষয়টি উত্থাপন করবেন। কারণ ইংরেজের প্রতি জামাল আব্দুর নাসের–এর কিছুটা এলার্জি রয়েছে। তার মনে এ ধারণা উদিত হতে পারে যে, আল্ফা পরিকল্পনা ব্রিটেনের নতুন কোন পাঁয়তারা, যাতে দরজা দিয়ে বের হয়ে আবার জানালা দিয়ে ঢুকতে পারে। শ্যাকবূরাহ্, মন্ত্রী এডেন–এর জন্য কেবল জামাল আব্দুর নাসের-এর নজরে আনার অধিকারেই সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সাক্ষাতে জামাল আব্দুন নাসেরকে বলবেন–এ অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে অংশগ্রহণ করে পরিস্থিতি বিন্যাসের একটি ব্রিটিশ-আমেরিকান যৌথ উদ্যোগ রয়েছে। বায়রড এ ব্যাপারে দুই বৃহৎ শক্তির চিন্তা-ভাবনা পেশ করবেন।

একই দিন অপরাহ্নে উভয় পক্ষ আবার বৈঠকে বসেন এবং বৈঠকের সভাপতি হিসাবে অংশ নেন খোদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাস। ডালাস একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উত্থাপনের ইচ্ছা করে স্বগতোক্তি করেন– আপনারা আল্ফা পরিকল্পনাটি বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নের চিন্তা-ভাবনা করছেন। এ পর্যন্ত আপনারা কি ভেবে দেখেছেন যে, এ পরিকল্পনায় এখানকার (যুক্তরাষ্ট্রের) ইহুদীদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে।

আমি বুঝলাম যে, আপনাদের মত হচ্ছে পরিকল্পনাটি প্রথমে নাসেরের নিকট উত্থাপন করে দেখবেন কি হয়। যদি এর কিছু যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীদের কানে যায় তাহলে সে জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করব যে, আমরা কেন এ বিষয়ে প্রথমে ইসরাইলের সাথে যোগাযোগ করছি না? হোফার জবাব দিলেন যে, সূচনাটি জামাল আব্দুন নাসের-এর সাথে হওয়া শ্রেয়। কারণ ইসরাইল ঘোষণা দেবে যে সে আরবদের সাথে আলোচনা করতে চায়। আরবরা এ ধরনের বিষয়ে তাদের প্রস্তুতির কথা কেবল কিছু শর্ত সাপেক্ষেই দেবে। এ প্রেক্ষিতে আমরা নীতিগতভাবে তাদেরকে মেনে নিয়েই শুরু করব। এরপর ইসরাইলকে বোঝাব। হোফার আরও

বলেন– আব্দুন নাসের-এর সাথে বিষয়টি আলোচনার সূচনা করলে এটা তার অহংবোধকে সন্তুষ্ট করবে এবং তিনি অনুভব করবেন যে, তাকে মিসরকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, এতে অনেক কাজই সহজ হয়ে যাবে। মনে হলো এ পয়েন্টে এসে ডালাস পক্ষপাত তাড়িত হয়ে বলেন ঃ 'মিসরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নই ওঠে না। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তাকে যা বলতে চাইছে তা হচ্ছে– প্রত্যাখ্যানের কোন সুযোগই নেই। আরবদেরকে অবশ্যই বুঝতে দিতে হবে যে, আমেরিকান ইহুদীদের রয়েছে বিপুল শক্তি এবং তা অব্যাহত থাকবে। যদি আরবরা কোন দায়িত্বহীন আচরণ করে তাহলে আমাদের অনুভূতি তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। শ্যাকবূরাহ উঠে বললেন যে, ইসরাইল হচ্ছে আরব অবরোধের চাপের সম্মুখীন কাজেই তাকে আরও চাপাচাপি করা আমাদের জন্য ঠিক হবে না। আরবরা শ্রেয়তর অবস্থানে রয়েছে। তারা অপেক্ষা করতে অথবা ছাড় দেয়াকে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম। এভাবে আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে দিতে পারে। কাজেই তাদের দিয়ে শুরু করাই উত্তম। তাছাড়া তাদের উপর চাপ প্রয়োগও সম্ভব। ডালাস আবারও আলোচনায় প্রবেশ করে বলেন ঃ 'নাসেরকে এটা ভাবতে দেয়া ঠিক হবে না যে, তার 'না' বলার সুযোগ আছে। যদি তা-ই বলে তাহলে আমরা তার সাথে এমন আচরণ করব যাতে সে 'হ্যাঁ' বলতে বাধ্য হয়।'

মনে হলো প্রথমে জামাল আব্দুন নাসের দিয়ে সূচনা করার চিন্তাটি ডালাস এখনও মেনে নিতে পারেননি। এ প্রেক্ষিতেই তিনি ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী শারেট-এর নিকট ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করেন। এতে লেখেন ঃ

"রাষ্ট্রদূত আবা ইবান আমাকে ইসরাইলের বিচ্ছিন্নতা ও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি অব্যাহত থাকায় আপনার অস্থিরতার বিষয়টি অবহিত করার পর বেশ কিছু সময় কেটে গেল। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম যেন আপনার সমস্যাটির সাথে আমার সহানুভূতি এবং এ বিষয়ে সম্ভব সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে আমার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা আপনাকে জানাই। আমি আপনাকে এ পত্রটি পাঠাচ্ছি যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে, সমস্যাটি আমার পূর্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। আমি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব প্রক্রিয়া এবং উপযুক্ত সুযোগগুলো পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করছি ....।

ডালাস জানতেন যে, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্থোনি এডেন কায়রোর পথে রয়েছেন। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জামাল আব্দুন নাসের-এর সাথে প্রতীক্ষিত আলোচনায় প্রস্তাবিত পয়েন্টগুলো সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল পাঁচটি ধারা সংবলিত ঃ

* প্রথম ধারায় এডেনকে অনুরোধ করা হয় যেন তিনি জামাল আব্দুন নাসেরকে বলেন ঃ "আমি জানি আপনি আরব দেশসমূহ ও ইসরাইলের মধ্যে বিদ্যমান

টেনশনের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন। আমিও জানি আরব শরণার্থীরা কি কষ্টে আছে। তাছাড়া আমি এ বিষয়েও শঙ্কিত যে, পাছে ইসরাইলের প্রতি আপনাদের ভয় এবং ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের দুঃখকষ্টকে পুঁজি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন ফন্দি আঁটে কিনা। তারা এই ফাঁকফোকরে ঢুকে পড়ে আপনাদের সমাজকে কুক্ষিগত করে ফেলে কি না।

* দ্বিতীয় ধারায়, এডেনকে অনুরোধ করা হয় যেন তিনি জামাল আব্দুন নাসেরকে এ কথা বলেন ঃ "মহামান্য রানীর সরকার মিসরকে শক্তিশালী ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বপাড়ে প্রভাবশালী দেখতে চায়। তিনি তাঁর দেশের উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে আগ্রহের সাথে অনুসরণ করে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রও তা অনুসরণ করে যাচ্ছে। উভয়ই সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ইসরাইলের সাথে অব্যাহত সংঘাতের কারণে এ দু'টি সরকার মিসরের প্রতি কি পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা দেবে তার ওপর প্রভাব পড়ছে। আপনি নিজেও ডালাসের কাছে শুনেছেন যে, যদি মিসর ইসরাইলের সাথে তার সংঘাতের সমাধানে সহযোগিতা করে তাহলে তিনি মিসরের ভবিষ্যতে পৃষ্ঠপোষকতা করতে প্রস্তুত।
* তৃতীয় ধারাতে রয়েছে– এডেন একথা বলে জামাল আব্দুন নাসের-এর অহংবোধকে সুড়সুড়ি দেবে যে, সে তাঁর সম্পর্কে ইতোপূর্বে সাক্ষাৎকারী সকলের কাছে অনেক প্রশংসা শুনেছেন। এদের মধ্যে রয়েছে মন্ত্রণালয়ে তাঁর সহকর্মী "এ্যান্থোনী নাতেং" এবং এরিক জনস্টন (জর্ডান নদী ব্যবহার প্রকল্প সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি)। আরব-ইসরাইল সংঘাত নিরসনে তাঁর কর্মতৎপরতা অচিরেই তাঁকে বৈশ্বিক রাষ্ট্রনায়কের আসনে সমাসীন করবে।
* চতুর্থ ধারায়, এডেনকে বেশ কিছু যুক্তিতর্ক দিচ্ছে যেগুলো তিনি জামাল আব্দুন নাসেরকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে করলে তাঁর ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করবেন।
* পঞ্চম ধারায়, এডেনকে কিছু চাবি দেয়া হয়েছে, যেগুলো তিনি জামাল আব্দুন নাসের-এর প্রস্তুতি দেখে দ্বার উন্মোচনের জন্য ব্যবহার করবেন।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ সত্ত্বেও এডেন-এর সফর সফল হয়নি যখন ব্যাংককে এন্থোনি এডেন জন ফস্টার ডালাসের সাথে মিলিত হন– এখানে তাঁরা উভয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জোটের এক সভায় যোগ দিয়েছিলেন তখন ডালাস তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীর কাছে বিস্তারিত শোনেন, তাঁর ও জামাল আব্দুন

নাসের-এর মধ্যে কি কথা হয়েছিল। এডেনের মন্তব্য ছিল যে, তিনি মিসরী প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে অনুভব করেছেন, তিনি আরব বিশ্বের নেতৃত্বের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আর ডালাস-এর মন্তব্য ছিল– যেমনটি তিনি নিজে লিখেছিলেন ঃ "আমি এডেনকে বলেছি– আমরা আরব বিশ্বের নেতৃত্ব অন্বেষায় 'নাসের'কে সমর্থন দিতে প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু তা ইসরাইলের সাথে শান্তি স্থাপনের পূর্বে কখনোই ঘটবে না।" এদিকে আমেরিকার নয়া রাষ্ট্রদূত 'হেনরি বায়রড' আল্‌ফা পরিকল্পনা পেশ করার তাঁর সেই গুরুদায়িত্ব শুরু করার জন্য কায়রো পৌঁছে গেলেন। কিন্তু তিনি যখন পৌঁছেন তখন গাজ্জায় সেই বিখ্যাত আক্রমণের কারণে কায়রো ভীষণ টেনশনের মধ্যে ছিল।

এ সময় ইসরাইলী বাহিনী মিসরী লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালিয়ে ২২ মিসরী সৈন্যকে হত্যা করে। এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, এর পিছনে দু'টি কারণ কাজ করেছিল ঃ

১. বেন গোরিয়ন, যিনি প্রায় বছর খানেক আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে গিয়ে শারেটকে সুযোগ দিয়েছিলেন যাতে আরবদের সাথে ইসরাইলের শান্তি স্থাপনের তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা যেন বাস্তবায়ন করতে পারেন। সেই বেন গোরিয়ন আবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় ফিরে আসেন। এটা ছিল মোশে দায়ান-এর নেতৃত্বে শারেট-এর বিরুদ্ধে ইসরাইলী বাহিনীর প্রায় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

২. এটাও হতে পারে যে, শারেট হয়ত গাজ্জায় আক্রমণের বিষয়টি অনুমোদন করেছিলেন, যাতে মিসর বিপদ অনুভব করতে পারে এবং এ প্রেক্ষাপটে সে ব্রিটিশ আমেরিকান উদ্যোগকে গ্রহণের জন্য আরেকটু বেশি প্রস্তুত হবে– যার ইশারা ডালাস তাঁর পত্রে দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ওয়াশিংটনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে 'আল্‌ফা' পরিকল্পনা সম্পর্কে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে জেনেছিলেন।

॥ ২ ॥

বায়রড

"আমাকে ইসরাইলের চূড়ান্ত মানচিত্র দিন... ।"

—বার্মার প্রধনমন্ত্রী 'উনো'-এর প্রতি জামাল আব্দুন নাসের

হেনরি বায়রড কায়রো থেকে ৪ মার্চ ১৯৫৫ তারিখে তাঁর প্রথম রিপোর্টটি লেখেন (ডকুমেন্ট নং ৪৫৫-৩/৬৮৪ ক ৮৬)। হেনরি বায়রড যিনি স্বাভাবিকের চেয়ে উচ্চমানের কায়রোস্থ রাষ্ট্রদূত ও আল্‌ফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তিনি তাঁর রিপোর্টে ব্যাখ্যা করেন যে, গাজ্জায় আক্রমণের পর তিনি মিসরে পৌঁছে কি ধরনের পরিস্থিতি পান।

তিনি তার জন্য প্রতীক্ষিত প্রতিক্রিয়াও বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর রিপোর্ট শুরু করেন– মিসরের বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম পেশের মাধ্যমে যাতে ডালাসের নিকট মিসরের তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। এরপর তিনি মূল পয়েন্টে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন সে কথা বলেন ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জানা প্রয়োজন যে, আল্‌ফা পরিকল্পনা কি ধরনের ঘোলাটে পরিস্থিতিতে এগুচ্ছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সময়ভিত্তিক কর্মসূচী পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ আমি শীঘ্রই আল্‌ফা উপস্থাপন করার মতো সুযোগ করে উঠতে পারছি না। এরপর বায়রড তাঁর রিপোর্টে যে বিবরণ দেন তা চিন্তার দাবি রাখে। তিনি বলেন, "আমি ওয়াশিংটন থেকে আমার সফর শুরু করার আগে আবা ইবানকে বলেছিলাম যে আমি মিসর পৌঁছেই মিসর ও ইসরাইলের মধ্যকার সাধারণ সম্পর্কের দ্রুত উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব, বিশেষ করে সুয়েজ খাল দিয়ে ইসরাইলী জাহাজ ও পণ্য যাতায়াতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে। কারণ এ বিষয়টি ইসরাইলের মতো আমার দেশের স্বার্থেও কাজ করবে বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু এখন আমি সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি যাতে কাজ করার মতো পরিমণ্ডল প্রস্তুত করে নিতে পারি। আমি এসে এখানকার যে পরিস্থিতি পেয়েছি এতে আমার (বায়রড ও ইবান)যে আলাপ করেছিলাম তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে গেলে একেবারে পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমি এবং এখনে আমার দূতাবাস সম্ভাব্য সকল সুযোগ কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করে যাব যাতে আল্‌ফা কার্যক্রমের জন্য পথ খুলতে পারি। তবে আমাদের অবশ্যই বিদ্যমান অবস্থার সকল কার্যকারণ সঠিকভাবে পরিমাপ করতে হবে।

ওয়াশিংটন ও লণ্ডনে বায়রডের নসিহতগুলো খুব সতর্কতার সাথে পর্যালোচিত হয়। ১৯ মার্চ, ১৯৫৫ তারিখে হোফার আমেরিকান সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বায়রডের কাছে কিছু নির্দেশনা পাঠান। (ডকুমেন্ট নং ৩/৮৬ ক ৬৮৪) এতে ছিল ঃ

"আমরা আপনার সতর্কতার কারণ উপলব্ধি করেছি। কিন্তু আমাদের কাছে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা আমাদের সাথে লণ্ডনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডেন যোগাযোগের সময় ব্যক্ত করেন। এডেন মনে করেন, আরব বিশ্বে আরও ভাল সময়ের অপেক্ষা করা কোন গ্যারান্টেড বা নিশ্চিত বিষয় নয়। তার মূল্যায়ন হচ্ছে বিষয়গুলো আরও খারাপের দিকে যাবে। কারণ নাসের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরা বুঝতে পারি, এ মুহূর্তে তাঁর কাছে আল্ফা পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া সমস্যাই বটে। তারপরও আমাদের ধারণা যে, দেরির চেয়ে এখনই তা শুরু করা শ্রেয়। এ কারণে আমরা চাই আপনি বিষয়টি নিয়ে স্টেফেনসন-এর সাথে আলোচনা করুন (স্যার র‍্যালফ স্টেফেনসন হচ্ছেন মিসরে নিয়োজিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত) তাঁর সাথে বুদ্ধি করে বিষয়টি নিয়ে নাসেরের সাথে আলোচনা শুরু করার উত্তম উপায় বের করুন। আপনি তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, আমরা বিষয়টির গোপনীয়তা সংরক্ষণ করব। আমরা তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়া ও উপলক্ষ গ্রহণ করার পদ্ধতি আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তাঁর সাথে আপনার আলোচনার সময় এমন কিছু তথ্য তাঁকে দিবেন না যা তিনি ব্রিটিশ, ইরাক ও তুর্কীদের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে চলমান আলোচনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন। যদি বুঝতে পারেন যে নাসের পরিকল্পনাটি সম্পর্কে সজাগ, তাহলে আপনি জরুরীভিত্তিতে রাসেল (আল্ফা পরিকল্পনার রূপকার)-এর সাথে এবং শ্যাকবূরাহ (ব্রিটিশ স্থায়ী পররাষ্ট্র সচিব)-এর সাথে উপযুক্ত স্থানে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কাছে যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জেনে নিবেন। তাঁদের সাথে আপনার বৈঠক গোপনীয় হওয়া উত্তম। তবে এ অবস্থায় নাসেরের সাথে আর কোন বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করবেন না। যতক্ষণ না আপনি ও স্টেফেনসন অভিন্ন নতুন নির্দেশনা পান। আশা করি স্মরণ রাখবেন যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নাসেরের সাথে বিষয়টি শুরু করা এবং তিনি বান্দুং বৈঠকের দিকে রওনা হওয়ার আগেই কোন ইতিবাচক উত্তর লাভ করা।"

বায়রড এখন এ বিশ্বাসে অনড় যে, কায়রোর পরিস্থিতি এখনও আল্ফা ফাইল খোলার জন্য অনুকূল নয়। ২১ মার্চ ১৯৫৫ তারিখে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাসের কাছে এক তারবার্তায় লিখলেন (ফাইল নং ২১৫৫-৩/ক ৮৬-৮৬৪) ঃ আমি স্টেফেনসনের সাথে আপনার নির্দেশনাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। দুঃখজনক হলেও আমাদের উভয়েরই মত হচ্ছে ঃ

(ক) নাসের এ পরিস্থিতিতে আল্ফা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার মতো মনের জোর পাবেন না। এমনকি যদি প্রস্তুতও থাকেন তবুও তাঁর অভ্যন্তরীণ ভূমিকাসহ

সাধারণ পরিমণ্ডল এবং অন্যান্য আরব দেশের প্রতি তাঁর ভূমিকার কারণে তিনি এটা প্রত্যাখ্যান করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

(খ) ইরাক ও তুর্কিস্তানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উত্তর বেল্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁকের কারণে এখানে নতুন কিছু দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে সাম্প্রতিক খরবগুলোর প্রেক্ষিতে আমি এর সাধারণ দৃশ্যপট দেখে হতাশ হয়েছি। আমাদের মত হলো, উত্তর বেল্ট ব্যবস্থার সাথে 'আল্‌ফা' মিলে যেতে দিতে পারি না। এ প্রেক্ষিতে আমাদের উভয়েরই মত হচ্ছে– বর্তমান অবস্থায় আল্‌ফা বিষয়টির সূচনাকে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। আশা করছি আগামী কয়েক সপ্তাহ পর বিষয়টি পাড়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

বায়রড এ তারবার্তা বিকাল তিনটার সময় ওয়াশিংটনে প্রেরণ করলেন। এক ঘণ্টা পরে চারটার সময় আরেকটি তারবার্তা পাঠিয়ে এটাকে জোরদার করতে চাইলেন। (নথি নং ২১৫৫-ত/৮৬ ক ৬৮৪)। এতে বলা হয়েছে ঃ আমি স্টেফেনসনের সাথে আলোচনা করে নিম্নবর্ণিত পয়েন্টগুলোতে উপনীত হলাম।

১. নাসের গাজ্জার ঘটনাবলীতে খুবই তিক্ততা অনুভব করছেন। আমাদের নীতি সম্পর্কেও তাঁর সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস বর্তমান পরিস্থিতিতে গোপনে তাঁর সাথে 'আল্‌ফা' নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য সময় এখন উপযুক্ত নয়।

২. তিনি 'আল্‌ফা পরিকল্পনা এবং তাঁর উত্তর বেল্টে আমাদের উদ্যোগের সাথে একটা যোগসূত্র খুঁজতে পারেন। তাঁর সংশয় ও সন্দেহ এ মাত্রায় পৌঁছতে পারে যে, আমরা আরব বিশ্বকে বিভক্ত করে মিসরকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেষ্টা করছি।

৩. এ মুহূর্তে জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর অনুভূতি খুবই তীব্র। এ অবস্থায় আমাদের কোন উদ্যোগের প্রতি তাঁর সাড়া দেয়ার সম্ভবনাকে কমিয়ে দিচ্ছে।

৪. গাজ্জার হামলা তাঁকে ভীত করতে পারেনি। বরং ইসরাইলের প্রতি তাঁর শত্রুতার ডিগ্রী বাড়িয়ে দিয়েছে মাত্র।

৫. আমরা যদি এ পরিস্থিতিতে তাঁর সাথে বিষয়টি পাড়ি তাহলে এ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি আমাদের কাছে আশাতীত দাবি-দাওয়া করে বসতে পারেন।

৬. ইরাকী-তুর্কী জোটের কারণে যে আরব সমস্যা আরও জটিল হয়েছে এবং তাঁর প্যান্ডিং সম্মেলনে অংশগ্রহণ অবস্থানকে কিছুটা নমনীয় করতে পারে এবং সম্মেলন উত্তর সময়টিই এ বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আরও বেশি উপযোগী হতে পারে।

৭. এ সময় আমরা আশা করি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সরকার এমন কিছু কাজ করে যাতে আমাদের প্রতি নাসেরের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। আমাদের মতে এখনও তিনিই হচ্ছেন সঙ্কট সমাধানের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য উত্তম ব্যক্তি। এত কিছু সত্ত্বেও ডালাস অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আবার ২৬ মার্চ ১৯৫৫ তারিখে বায়রডের কাছে লিখলেন ঃ "আমরা আল্‌ফার কাজকে বিরাট গুরুত্ব দিচ্ছি। আপনি নাসেরের কাছে এভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারেন যে আমরা তাঁকে আরব বিশ্বের নেতৃত্বে

প্রতিষ্ঠা করার জন্য সহযোগিতা দিয়ে যাব। আমরা তাঁর কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাব। তিনি 'আল্ফা' পরিকল্পনায় সহযোগিতা দেয়াই হবে একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আমরা তাঁর কাজ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।"

চাপের মুখে বায়রড একটি মধ্যপন্থা বের করলেন। তিনি ডঃ মাহমুদ ফৌজিকে প্লাস্টার হিসাবে কাজে লাগিয়ে শুরু করতে চাইলেন। তিনি বিস্তারিত না বলে বিষয়টির অবতারণা করেন। এই উদ্বেগাকুল সময়ে এ ব্যাপারে জামাল আব্দুন নাসেরকে কিছুই বললেন না। যাহোক, বায়রড ডঃ ফৌজির সাথে এ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, এটা একটি কৌশলগত চিন্তা-ভাবনা, যাতে নতুন মেরুকরণ হতে পারে। বায়রড তখন মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক আমেরিকান পররাষ্ট্র সচিব জর্জ এলেনকে অর্জিত অগ্রগতি সম্পর্কে এক ব্যক্তিগত পত্র লেখেন। এতে ছিল ঃ "বিষয়টির স্পর্শকাতরতার প্রতি লক্ষ্য করে আমি আল্ফা বিষয়ের যোগাযোগ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে কোন তারবার্তা পাঠাব না। কারণটি হলো আমি এ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে দীর্ঘ তিন বছর দায়িত্ব পালনকালে আমার এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে যে, ইসরাইলীদের কাছ থেকে কোন গোপন বিষয়কে গোপন রাখা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য খুবই কঠিন ব্যাপার।

আমার অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি যে, সব কিছুই অবলীলাক্রমে তাদের কাছে পৌঁছে যায়। নীতিগতভাবে আমি এর বিরোধী নই, যখন আমাদের নীতি সম্পর্কে তাদের জানা প্রয়োজন। কিন্তু আমি শঙ্কিত যে, বিশেষ করে এ বিষয়ে তারা জানতে পারলে প্রচার মাধ্যমে তথ্যগুলো ফাঁস করে দেবে, এতে পুরো প্রচেষ্টাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আমি স্বীকার করব যে, তারা যে গাজ্জায় সর্বশেষ আক্রমণটি করে এর কারণ যে আল্ফা পরিকল্পনার ক্ষতি করা এটা অসম্ভব নয় এবং এটা আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে যে, আসলেই আমাদের ইসরাইলী বন্ধুরা আদৌ কোন সমাধান চায় কিনা।"

এই ব্যক্তিগত কথাবার্তার পর বায়রড এবার ডঃ ফৌজির সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে বলেন ঃ "আমি মধ্যপ্রাচ্য বিষয়টি ডক্টর ফৌজির কাছে পেড়েছি। তিনি আমার সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, আসলে অবস্থাটি খুবই বিপজ্জনক। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, সংশ্লিষ্টরা কি বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্য এ বিষয়ে কিছু করতে সক্ষম হবে ? এর নিরসনে প্রাথমিক ইস্যু কি কি ? ফৌজি আমাকে বললেন যে, এ মুহূর্তে আরব বিশ্বে তিনটি জ্বলন্ত সমস্যা রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ আরব-আরব বিরোধিতা

দ্বিতীয়ত ঃ আরব-ইসরাইল সংঘাত

তৃতীয়ত ঃ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর (অর্থাৎ গাজ্জায় ইসরাইলী হামলার) কারণে উদ্ভূত উদ্বেগ। ফৌজি বলেন যে তার মূল্যায়নে প্রথম ও তৃতীয়–এ দু'টি সমস্যা হচ্ছে

সামরিক। কিন্তু দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ আরব-ইসরাইল সংঘাত) হচ্ছে সবচেয়ে বড় সঙ্কট। আর এই সঙ্কটটি দু'টি মৌলিক পয়েন্টে রয়েছে। প্রথমত শরণার্থী সমস্যা, দ্বিতীয়ত ভূমি সমস্যা।

ভূমি সমস্যা সম্পর্কে আমি ফৌজিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন যে, তাঁর দেশের পক্ষে অবশিষ্ট আরব দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টি গ্রহণ করা অসম্ভব। বিষয়টি ঠিক তেমন নয়, যেমনটি তিনি ওয়াশিংটনে কারও কারও কাছ থেকে শুনেছেন যে, মিসর ও জর্ডানের মধ্যবর্তী স্থানে ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত ভূমির মাঝামাঝি লাইন টেনে একটা সমাধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এটি Corridor নয় বরং এ হবে প্রকৃতই এমন ভূমি যা একটিকে আরেকটির সাথে জড়িত ও যুক্ত রাখবে।

তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে, ইসরাইলে কি এমন কোন নেতা আছে যে ভূমি থেকে প্রত্যাহারে রাজি হবে ? তিনি উত্তর করলেন যে তাঁদের জন্য এটা কঠিন হবে। তবে যদি তারা প্রকৃতই শান্তি চায় তাহলে এটা হবে যৌক্তিক দাম। ফৌজির সাথে আমি এ ব্যাপারে একমত হলাম যে, তিনি প্যান্ডং থেকে ফিরে এলে এ ব্যাপারে আলোচনা চলিয়ে যাব। কারণ তিনি আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে আগামী সপ্তাহে প্যান্ডং সফর করবেন।"

পর্দার অন্তরালে বান্দুং ইসরাইলের সাথে এক রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরিণত হয়। কারণ কলম্বো গ্রুপের দেশগুলো যারা আসরে এশীয় ও আফ্রিকান জাতিগুলোর সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তারা একটি এশীয় দেশ হিসাবে সেখানে ইসরাইলের অংশগ্রহণকে উড়িয়ে দেয়নি। বার্মা ছিল কলম্বো গ্রুপের অন্যতম দেশ। এ দেশের প্রধানমন্ত্রী 'উনো' ছিলেন শারেট ও বেন গোরিয়ন-এর বন্ধু। তিনি ইসরাইলের উপনিবেশী আন্দোলনকে সফল যৌথ অভিজ্ঞতা হিসাবে তাদের গুণমুগ্ধ ছিলেন।

এ জন্যই 'উনো' বান্দুং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী হিসাবে নির্বাচিত দেশগুলোর তালিকায় ইসরাইলকেও রেখেছিলেন। এ বিষয়টি জামাল আব্দুন নাসেরকে অবহিত করার দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু। জামাল আব্দুন নাসের এতে আপত্তি জানান। নেহেরুর মত হলো, ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করে যে ইসরাইল একটি এশীয় দেশ, এটাকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। হ্যাঁ, যদি এমন কোন কারণ দেখানো যায়, যা আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রিতদের কাছে গৃহীত হয়, সেটা ভিন্ন কথা। জামাল আব্দুন নাসের এই ইহুদী রাষ্ট্রের উদ্ভবের দিন থেকে নিয়ে এর ধরন-প্রকৃতি ও নীতিগুলো বিশ্লেষণ করে বোঝাতে লাগলেন। মনে হলো বিষয়টি নেহেরু বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তার কাছে উনো যখন জামাল আব্দুন নাসের-এর আপত্তিগুলো শুনলেন তখন তিনি এ যুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না যে, সম্মেলনে অংশগ্রহণ কোন দেশ বা সংস্থার জন্য কোন চরিত্র সনদ নয়। বরং তার বৈধ ও

আইনানুগ অস্তিত্বই আসল কথা। জামাল আব্দুন নাসের সরাসরি "উনো"র সাথে যোগাযোগ করে বলেন– কোন দেশের বৈধ ও আইনানুগ অস্তিত্বে জন্য তার গ্রহণীয় ও স্বীকৃত সীমা থাকা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসরাইলের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে তা হলো বিভক্তি সীমা। কিন্তু ইসরাইল জবরদখলের মাধ্যমে এ সীমা অতিক্রম করেছে। আর বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তসমূহের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত, উনো প্রশ্ন করে পাঠালেন –"আমি কি এতে এটাই বোঝব যে, যদি বিভক্তি রেখাকে ইসরাইল স্বীকার করে নেয় তাহলে তার বান্দুং-এ অংশগ্রহণে আপনাদের আপত্তি নেই ? জামাল আব্দুন নাসের উত্তরে জানান, ইসরাইল যদি বিভক্তি রেখা মেনে নিয়ে কার্যত তা অনুসরণ করে এবং এর ভিত্তিতে তার চূড়ান্ত সীমা নিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে সে অবশ্যই প্যান্ডং সম্মেলনে অংশগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হবে। উপরন্তু এটাও প্রমাণিত হবে যে সে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

'উনো' তার ইসরাইলের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে অনুরোধ করেন যাতে তারা বিভক্তি রেখাকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের দেশের চূড়ান্ত মানচিত্র পেশ করে। কিন্তু ইসরাইল এতে আদৌ সাড়া দেয়নি। 'উনো' তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে জোরাজুরি করা থেকে পিছিয়ে যায়।

বান্দুং সম্মেলন থেকে ইসরাইল দূরে থাকাটাকে বিরাট রাজনৈতিক পরাজয় হিসাবে গণ্য হয়। বেন গোরিয়ন এ ব্যর্থতা প্রধানমন্ত্রী শারেট-এর ঘাড়ে চাপাতে থাকেন। যদিও বেন গোরিয়ন নিজেও উনোর সাথে যোগাযোগে অংশগ্রহণ করেন।

৫ এপ্রিল ১৯৫৫ তারিখে যখন প্যান্ডং সম্মেলন ইন্দোনেশিয়ার সেই সবুজ সুন্দর শহরে তার কাজকর্ম প্রায় শুরু করতে যাচ্ছিল তখন ইসরাইলে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত 'লোসন'কে মোশে শারেট ডেকে পাঠিয়ে বলেন– "তার ওপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। বেন গোরিয়ন ও তার বন্ধুরা তার চারপাশে কঠিন অবরোধ গড়ে তুলছে। এ থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে– আমেরিকা সরকার আমাদের ও মিসরের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করবে এবং তিনি গোপনে কোন দেশে বা এয়ারপোর্টে জামাল আব্দুন নাসের-এর সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এটা ইন্দোনেশিয়া থেকে ফেরার পথে এশিয়ার কোন দেশে বা বিমানবন্দরে হতে পারে।

পরদিন ৬ এপ্রিল ১৯৫৫, ওয়াশিংটনে নিয়োজিত ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত আবা ইবান, জর্জ এলেন–এর সাথে দেখা করে প্রস্তাব দেন যে, ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে। এটা হতে পারে গাজ্জার পথে ৭৫ কি.মি এর সন্নিকটে অথবা ইউরোপের কোন স্থানে।

আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমত ছিল যে, তার সময় এখনও হয়নি। এতে 'আল্‌ফা' পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বায়রড এশিয়া থেকে ফেরার পথে জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করছেন। তিনি ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত 'র‍্যালফ স্টেফেনসন' বৈঠকে বসে 'আল্ফা' পরিকল্পনার ব্যাপারে শলাপরামর্শ করেন।

১৪ এপ্রিল জর্জ এলেন, বায়রডের কাছে লেখেন (ডকুমেন্ট নং ১৪৫৫-৪/৬৮৪০-৮৬) ঃ এখানে কায়রোতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আল্ফা পরিকল্পনার বিষয়টি উত্তর বেল্ট বিষয়ের সাথে একাকার হয়ে গেছে। দু'টি বিষয়ই প্রায় একই সূত্রে গ্রথিত। একদিকে 'নাসের' এখন স্থির বিশ্বাস অনুভব করছেন যে ইরাকসহ বেশ কিছু আরব দেশকে অবশিষ্ট আরব বিশ্ব থেকে খসিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এর ফলশ্রুতিতে সে দেখছে যে, মিসরকে দক্ষিণে একাই ইসরাইলী শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে হবে।

অপরদিকে মিসর কার্যত ভৌগোলিকভাবে অবশিষ্ট আরব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নই বটে। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের ইস্যুগুলোতে তার ভূমিকা হ্রাস পাবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নাসের তার দেশের সাথে বাকি আরব দেশগুলোর ভৌগোলিক সংযুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত না হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে আল্ফা আলোচনায় প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আমি তাঁর ও ফৌজির সাথে আমার সকল আলোচনায় উপলব্ধি করেছি যে, তাঁর চিন্তা-ভাবনায় মিসরের সাথে অবশিষ্ট আরব দেশগুলোর ভৌগোলিক সংযোগের এ বিষয়টি হচ্ছে এক প্রাণময় উপাদান। ফৌজির সাথেও একই জিনিস অনুভব করলাম। র‍্যালফ স্টেফেনসনও আমার মতোই মূল্যায়ন করছেন। আমরা উভয়ে এ ব্যাপারেও একমত যে, এ ব্যাপারে মিসর কেবল আরব বিশ্বের সাথে যোগাযোগের জন্য নিছক করিডোরে রাজি হবে না। আমাদের কাছে মনে হলো তারা গোটা নাকাব অঞ্চলেরই চিন্তা করছে। বি'রে সাব্আ থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত পুরো এলাকা। স্টেফেনসন ও আমি আশা করছি আপনারা এই পয়েন্টে চিন্তা-ভাবনা করবেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এই বিন্দুতে চিন্তা করবে। মিসর থেকে আরব বিশ্বে যাবার করিডোরের প্রস্তাব কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, নাহুম গোল্ডম্যান আমার সাথে এক আলোচনায় স্পষ্টভাবে বলেন যে, "করিডোরের ধারণাটি ভবিষ্যতের জন্য সঠিক হবে না।" তার মূল্যায়নে যা আমাকে বলেন– এটা হবে একটি ঘেরাটোপ বা ফাঁদ যা ভবিষ্যতে অগণিত সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আমি এ বৈঠকে গোল্ডম্যান থেকে অন্য একটি প্রস্তাব শুনেছি। তা হচ্ছে নাকাবকে মিসর-ইসরাইল যৌথ প্রশাসনের অধীন রাখা। তিনি আমাকে বলেন যে, " বেন গোরিয়ন এই প্রস্তাবে আপত্তি নাও করতে পারেন।"

৫ মে ১৯৫৫ বায়রড পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালাসকে লেখেন ঃ তিনি আল্ফা পরিকল্পনাটি সরাসরি নাসেরের কাছে পাড়বেন বলে স্থির করেছেন। তিনি তাঁর কাছে

বিষয়টি এমিনিটি স্টাইলে উপস্থাপন করতে চান। সেজন্যই তিনি তাঁর কাছে কোন এপয়েন্টমেন্ট চাইবেন না। বরং তিনি অপেক্ষা করবেন। যতক্ষণ না নাসের তাঁকে তলব করেন। তিনি জানেন যে, বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে মিসরে অনুপস্থিত থাকার ফলে অনেক বিষয় জমা হয়ে থাকবে। (প্যান্ডিং সফরের কারণে আব্দুন নাসের মিসরে অনুপস্থিত থাকবেন)।

মনে হলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাস অনুভব করতে লাগলেন যে, আল্ফা কার্যক্রম কার্যত প্রায় দ্বারপ্রান্তে। তিনি তার ডেপুটি হারবার্ট হোফার-কে ডেকে আলাপ করলেন যে, এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে কেমন খরচ পড়বে। দু'জনে মিলে হিসাব করে দেখলেন যে, এতে প্রায় বিলিয়ন ডলার লেগে যেতে পারে। যখন ব্যাপারটি এ পর্যায়ে তখন তিনি বিষয়টি প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে বিস্তারিত জানানো সমীচীন মনে করলেন। ডালাস হোয়াইট হাউসের দিকে রওনা হলেন। তিনি আইজেনহাওয়ার-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে এসে একটি নোটের ডিকটেশন দিলেন যাতে নথির ঘটনাবলীকে পূর্ণতা দিতে পারেন। তারিখটি ছিল ৬ মে ১৯৫৫। এতে বলেন নিকট প্রাচ্য সম্পর্কিত আল্ফা প্রকল্প সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে তা প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করা হলো। তাঁকে আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা সম্পর্কে বলেছি এবং জানিয়েছি যে, বিষয়াবলী এখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, বায়রড বিষয়টি এখন সরাসরি নাসেরের সাথে আলোচনা করতে পারেন। আমি প্রেসিডেন্টকে বলেছি যে, এ বিষয়ে আমি এক কদম আগে বাড়তে পারি না, যতক্ষণ না তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন চূড়ান্ত নির্দেশনা পাই। প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছি যে, আসন্ন কয়েকটি মাসে আমাদের সাথে নিকট প্রাচ্যের সম্পর্কের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন ঘটবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থেকে আমাদের ভূমিকা পালন করতে হলে আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকবে। আমাদের প্রাথমিক প্রাক্কালনে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পাঁচ বছরের জন্য আমাদের ৫০০ মিলিয়ন থেকে ১০০০ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে।

জন ফস্টার ডালাস আরও বলেন, "প্রেসিডেন্টকে এও জানিয়েছি যে, এই আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল হওয়া যাবে, যখন বায়রড পরিকল্পনাটি নাসেরের নিকট পেশ করবেন। প্রেসিডেন্ট বললেন যে, তিনি বিষয়টি বুঝতে পারছেন। কিন্তু এটা নির্ভর করছে বায়রডের যোগ্যতা ও প্রতিভার ওপর। পাছে তিনি নাসেরের সাথে আলোচনায় কোন নির্ধারিত বা চূড়ান্ত দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে না বসেন।" জন ফস্টার ডালাস নোটটি ডিকটেশন দেন। যখন শুদ্ধ টাইপ করে তাঁর কাছে পেশ করা হলো তখন তিনি এটাকে আরও অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন করার লক্ষ্যে নিজ হাতে লেখেন ঃ "প্রেসিডেন্ট বলেন, সামনে এগিয়ে যান, তবে সুনির্দিষ্ট ওয়াদা ছাড়া (president says go ahead but no firm commitments.)।"

পরদিন ডালাসের মনে হলো বায়রডের অবস্থানকে দৃঢ় করি। তিনি যখন আল্ফা বিষয়টি জামাল আব্দুন নাসেরের নিকট সরাসরি উপস্থাপন করবেন তখন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের একটি ব্যক্তিগত পত্র তাঁর সাথে নিয়ে যেতে পারেন। সাথে সাথেই এই পত্রের খসড়া প্রণয়ন করে হোয়াইট হাউসে পাঠালেন। এতে বলা হলো ঃ

প্রিয় বন্ধু,

আমি রাষ্ট্রদূত বায়রডকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেছি। তা হচ্ছে আরব দেশগুলো ও ইসরাইলের মধ্যকার সমস্যার সমাধান করা। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি যে সশস্ত্র সংঘাত থেকে দূরে একটি শান্তির যুগ হন্যে হয়ে খোঁজছে, আমি তার প্রতি গভীরভাবে প্রভাবিত। সম্প্রতি আফ্রো-এশীয়া প্যান্ডং সম্মেলন এবং ইউরোপের বিভিন্ন ঘটনায় এই অনুভূতি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, বান্দুং-এ প্রকাশিত সমাপনী বিবৃতিতেও সত্যিকারভাবে মুক্তি ও শান্তির বন্ধন, শান্তি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। আমি যদি বিশেষ করে নিকট-প্রাচ্যের প্রতি তাকাই তাহলে লক্ষ্য করি যে, এ অঞ্চলের পক্ষগুলো খুবই সঙ্কুল অবস্থায় রয়েছে।

আরব-ইসরাইল সঙ্কট সমাধানের পথে অন্তরায়গুলো আমি উপলব্ধি করছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এমন একটি সমঝোতা হওয়া সম্ভব যা তাদেরকে বর্তমান অবস্থা থেকে শ্রেয়তর অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। এতে টেনশন ও বিপদের ঝুঁকি দূরীভূত হতে পারে। বিরাট প্রত্যাশার দুয়ার খোলার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। এর বাস্তবায়নে আপনার প্রচেষ্টাকে আমি অনুসরণ করে যাচ্ছি।

আমি জানি স্যার এন্থোনি এডেন,গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এ বছর জানুয়ারিতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় অনুরূপ অনুভূতি সরাসরি আপনার নিকট ব্যক্ত করেন। আমি এখন এ বিষয়ে নেতৃত্বের বাগডোর হাতে নেয়ার জন্য আপনাকে প্রস্তাব জানাচ্ছি। আপনার প্রচেষ্টার জন্য আমার উত্তম সম্মান গ্রহণ করুন। আমি অনুভব করছি যে, একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে আমরা আপনার প্রতি আস্থা রাখতে পারি।

আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনার নেতৃত্বে মিসরের অব্যাহত অগ্রগতি কামনা করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

ডুয়েট আইজেনহাওয়ার

॥ ৩ ॥

ফয়সল আল্ সউদ

"জানি না, কখন আমেরিকানরা বুঝতে পারবে যে, তারা কখনও আমাদের অবস্থানকে পাল্টাতে পারবে না!"

—আমেরিকান চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্সের প্রতি প্রিন্স ফয়সল আল্ সউদ

বায়রডের আশঙ্কাই সত্য হলো ঠিকই জামাল আব্দুন নাসের প্যান্ডং সম্মেলন শেষে এশিয়া সফরের শেষ দেশ আফগানিস্তান থেকে মিসরে ফিরে আসার দু'সপ্তাহ পর তাঁর সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠালেন।

কিন্তু বায়রডকে বলার জন্য জামাল আব্দুন নাসেরের কিছু বিষয় ছিল। এ বৈঠকের বিবরণ দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পাঠানো রিপোর্টে বায়রড লেখেন (ডকুমেন্ট নং ১৭৫৫-৬/ক ৬৭৪০৮৪) ঃ

"কয়েক ঘণ্টা আগে নাসের তাঁর সাক্ষাতে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন যে, দীর্ঘ সময় ধরে আমেরিকান অস্ত্র কেনার ব্যাপারে তাঁরা যে "অগ্রসর" হয়েছিলেন সে ব্যাপারে আপনাদের কাছ থেকে আমি কোন উত্তর পেয়েছি কি না। তাঁরা নতুন করে অনুরোধ জানিয়েছেন এবং গাজ্জা আক্রমণের পর এ ব্যাপারে বার বার সিদ্ধান্ত চেয়েছেন। আমাকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেন। মিসর কি আমেরিকান অস্ত্র কিনতে পারবে, না পারবে না! প্রশ্নের ধরন আমাকে বিচলিত করে তোলে। আমি তার উত্তরে বলেছি যে, তিনি যেন এ অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করেন। কারণ এখন যে কোন অস্ত্রের চাহিদাকে সময়-উপযোগী মনে করা হবে না।"

এরপর দীর্ঘ আলোচনাকালে জামাল আব্দুন নাসের বলেন যে, তাঁর সামনে সোভিয়েত অস্ত্র লাভের সুযোগ রয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, এতে কিছু সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু তিনি যদি আমেরিকান অস্ত্রলাভে সমর্থ না হন তাহলে সোভিয়েত অস্ত্র কিনতে বাধ্য হবেন। তাঁর মতে গাজ্জায় আক্রমণ প্রমাণ করেছে যে, ইসরাইলী অস্ত্রের মুখে মিসর একেবারে চাঙ্গা। এই হামলায় যে সব সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছিল তাদের একজনকে চিনতেন। তিনি তাঁর জানাজায় হেঁটে গেছেন। পুরো সময় ধরে তাঁর চিন্তা ছিল যে, তাঁর বাহিনীকে নিজেদের প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। এরপর নাসের আমাকে অনুরোধ করেন যেন আমার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে

ওয়াশিংটনে তাঁর এ অনুরোধ পৌঁছিয়ে সুস্পষ্ট স্মরণ করিয়ে দিতে যে, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অস্ত্র কিনার ইচ্ছা পোষণ করছেন। আমি বিশেষ সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তিনি আমার সাথে কথা বলার অপেক্ষায় মস্কোয় একটা মিসরীয় সামরিক মিশনের সফরকে বিলম্বিত করেছেন। এই মিশন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অস্ত্র ক্রয়ের চুক্তি করতে যাবে।

আমার মনে হলো, আমরা তাঁর চাহিদার প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেব বলে নাসেরের বড় বেশি আশা নেই। তিনি তাঁর অনেক সহকর্মীর মতো ধারণা করেন যে, আমরা মিসরকে ইসরাইলের সামনে দুর্বল করে রাখতে চাই। আমার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে– আমি আপনাদেরকে প্রস্তাব করছি যে, আপনারা আমাকে এই মর্মে জানান যে, আমি তাঁকে এটা বলতে পারি "নীতিগত বা রাজনৈতিকভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এমন কোন বিবেচ্য বিষয় নেই যার কারণে মিসরে আমেরিকান অস্ত্র বিক্রি নিষেধ হতে পারে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আমরা তাঁকে বাস্তব প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট চাহিদা দেয়ার কথা বলতে পারি। পরিশেষে আমি জানি, মিসর যে অস্ত্র চাইতে পারে তার পরিমাণ কমই হবে। কারণ তার সম্পদ সীমিত। সাক্ষাতের শেষ লগ্নে নাসের আমাকে অনুরোধ করেন যেন তিনি যা বলেছেন তা আপনাদের জানাই এবং এর উত্তর শীঘ্রই তাঁকে জানাই। ডালাস কিন্তু এখনও এ ভাবনায় বিভোর যে, আল্‌ফা পরিকল্পনার সামনে দরজা বুঝি উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই তিনি আগস্টের মাঝামাঝি এক দীর্ঘ ভাষণে ঘোষণা করেন, যুক্তরাষ্ট্র অচিরেই আরব-ইসরাইল সংঘাতের সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এতে তিনি আল্‌ফা পরিকল্পনার কয়েকটি দিকের প্রতিও ইঙ্গিত করেন। এদিকে বায়রড তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট থেকে নির্দেশনা পান, যেন ডালাসের বিবৃতি সম্পর্কে জামাল আব্দুন নাসেরের মতমত জেনে নেন।

বাহ্যত দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্র আরব ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ অঞ্চলের রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে জানতে চেয়েছে যে, ডালাসের বিবৃতির প্রতি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে। বায়রড জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে সাক্ষাতে গেলেন। বৈঠকের পর তিনি আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর একটি রিপোর্ট পাঠালেন। (ডকুমেন্ট নং ২৭৫৫-৮/ক০৬৮৪) এতে ছিল ঃ "পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতির প্রতি নাসেরের প্রতিক্রিয়া কি জানতে চাইলাম। তাঁকে এ বিবৃতির পুরো ভাষ্যটি দিলাম। লক্ষ্য করলাম তাঁর প্রতিক্রিয়া যেমনটি আশা করেছিলাম তার চেয়ে কম বন্ধুত্বপূর্ণ। আমার অনুভূতি নাড়া দিয়েছে যে, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে হতভম্ব অনুভব করছেন। তাঁর প্রথম মন্তব্য ছিল ঃ এভাবে ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের তাড়িয়ে

দেয়ার ধারণা গ্রহণ করা আরব বিশ্বের জন্য কঠিন হবে। তাছাড়া নাকাব ইস্যুতো রয়েছেই। তিনি আরও বলেন যে, তিনি বেন গোরিয়নের বিবৃতি পড়েছেন। এতে তিনি বলেন যে, নাকাব-এ দু'মিলিয়ন ইহুদী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে ইসরাইলের। আমি তাঁকে বললাম, আমিও অনুরূপ বিবৃতি পড়েছি। আমার বিশ্বাস , এটা সামান্য অজুহাতে এক রকম প্রচার-প্রপাগাণ্ডা। তা হচ্ছে, নাকাব অঞ্চলে সেচ দেয়ার মতো পযাপ্ত পানি ইসরাইলের নেই; যদি ধরেও নেই যে তারা এত লোক পাবে। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলি যে, জর্ডান নদীর সমুদয় পানি নাকাবে সরবরাহের জন্য যথেষ্ট হবে না। যদি পুরো পানি বরাদ্দও দেয়া হয়।"

এ অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রদূত বায়রডের অনুরূপ নির্দেশনা পেয়েছিলেন। গ্যালম্যান, বাগদাদে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, ঐ একই তারিখে (২৭আগস্ট, যে তারিখে বায়রড লিখেছিলেন) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাসের নিকট লেখেন (ডকুমেন্ট নং ২৭৫৫-৮/ ক০৮৬/৬৮৪) ঃ

"আজ সকালে আমি প্রধানমন্ত্রী নূরী আস-সাঈদের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করি। তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগে দিতে যাচ্ছিলেন। আমি নিউইয়র্কে মন্ত্রী মহোদয়ের দেয়া ভাষণের একটি কপি দিলাম। তিনি বলেন যে, রেডিওতে তিনি কিছু পয়েন্ট শুনেছেন। এ বলে তিনি ভাষণের কপিটি তাঁর পকেটে রাখেন এবং আমাকে বলেন যে, তিনি তাঁর অফিসে বসে সুযোগ মতো এটা পড়ে নেবেন।

আমি তাঁকে বললাম যে, আমি আশা করছি, আপনি এটা পড়ার পর আরব-ইসরাইল সংঘাতের একটি সমাধানে পৌঁছার গুরুত্ব সম্পর্কে আপনি মন্ত্রী মহোদয়ের মতামতের সাথে একমত হবেন। কোন এক বিবৃতি উপলক্ষ্যে তিনি এর সমর্থনে তাঁর মতের ঘোষণা দিতে পারেন। নূরী মন্তব্য করলেন মন্ত্রীর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার; কিন্তু নিউইয়র্কের ভাষণের বিষয়ে কিছুই ইঙ্গিত করলেন না।"

জেদ্দাস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তাঁর রিপোর্টে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সলের যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সেটাই ছিল আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টসমূহের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট। ডালাসের ভাষণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ডালাসের কাছে লেখেন ঃ

"আমীর ফয়সল মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতির একটি কপি গ্রহণ করার পর বলেন, আপনি কেন চান যে, এটা আমি পড়ি ? আমি এ বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য তাদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি যাদের সাথে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। আমি তো আপনাকে বহুবার বলেছি, যে, আমরা ইসরাইলের সাথে বাস করতে পারব না। জানি না, আমেরিকানরা যখন বুঝতে পারবে যে, তারা যত চেষ্টাই করুক আমাদের অবস্থানে কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না। তারা হয়তো ওয়াশিংটনে বলাবলি করবে যে, আমি আমেরিকান

নীতিবিরোধী, যেমনটি মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক দফতরের আপনাদের এক বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি এ উক্তি করেছেন। জানি না তাঁরা কেন আপনাদের সাথে শত্রুতার জন্য আমাকে অভিযুক্ত করে। আমি তো হক কথা বলি, হক (হক শব্দটি দু'বার বলেন) এটাই সকল আরবের অনুভূতি। মন্ত্রীর ঘোষণা বিবৃতিতে কোন কিছুই পরিবর্তন হবে না। আমাদের বোঝে আসে না, কেন আমেরিকানরা আমাদের ও ইসরাইলের ব্যাপারে এত মাত্রায় মনোযোগ দিচ্ছে। আমাদেরকে আমাদের মতো করে থাকতে দিন। এই ধরনের অব্যাহত অনাহুত হস্তক্ষেপ সৌদি আমেরিকান সম্পর্ককে আহত করতে পারে।"

তারা যা করতে চাচ্ছে এ হচ্ছে প্রকৃতিবিরোধী, যদিও সাময়িকভাবে কিছু ফলাফল বয়ে নিয়ে আসুক না কেন। এসব ফলাফল স্থায়ী হতে পারে না। শেষ পরিণতিতে ফিলিস্তিনে দু'পক্ষের কেবল যে কোন একটি পক্ষই টিকে থাকবে। ইসরাইল থেকে রাষ্ট্রদূত লোসনের রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী শারেট-এর সাথে সাক্ষাতের বিবরণ ছিল (ডকুমেন্ট নং ১০৫৫-৯/৬৮৪ক০৮৬)। শারেট আলোচনার সূত্রপাত করেন ডালাসের প্রশংসার মাধ্যমে। তিনি ডালাসের ব্যক্তিত্বের ঋজুতা এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির বিষয়ে তাঁর আগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আলোচনা এগিয়ে যাওয়ার এক পর্যায়ে শারেট কিছু স্পষ্ট মন্তব্য করেন ঃ

"শরণার্থী বিষয়ে ডালাস যা বলেছেন, সে সম্পর্কে আমার মনে হয় 'শরণার্থী প্রত্যাবাসন (repatriation) শব্দটির পরিবর্তে পুর্নবাসন (resettlement) শব্দটি প্রয়োগ করাই শ্রেয় ছিল। কারণ তারা যেখানে আছে সেখানেই পুর্নবাসন সম্ভব। কিন্তু তাদের প্রত্যাবাসন, সে তো অসম্ভব ব্যাপার। কারণ ইসরাইলে তাদের জন্য কোন স্থান নেই।"

আর শরণার্থীদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ডালাস যা বলেছেন এতে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যয়ভার ইসরাইলের বহন করতে হবে বলে বুঝানো হয়নি। ইসরাইল এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে পারে। তারা যেখানে আছে সেখানে পুনর্বাসনের দায়িত্ব বর্তায় সেই মেঝবান দেশেরই ওপর, আর যেসব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এদের সমস্যার সমাধান চায়। আর ডালাস সীমান্ত ও নিরাপত্তা সম্পর্কে যা বলেছেন, এ সম্পর্কে ইসরাইল মনে করে যে, এ দু'টি বিষয়ে যদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাস আরও খোলাসা করে বলতেন সেটাই উত্তম হতো। শারেট আরও বলেন যে, ইসরাইলের নিকট নিরাপত্তার বিষয়টি যে কোন সীমারেখা থেকে অনেক বেশি ব্যাপক অর্থবহন করে।

সীমান্ত বিষয়ে শারেট ডালাসের বিবৃতির কিছুই বুঝতে পারেননি। কারণ ডালাস ভূমি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ পয়েন্টে এসে শারেট আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে বলেন, "আমার মনে হয় না যে, বর্তমানে ইসরাইলের কজায় যে ভূমি আছে তা থেকে কোন ভূমি ছেড়ে দেয়ার কথা বলা কারও পক্ষে সম্ভব। এমনকি এসব ভূমি যাকে

অনেকে বলে থাকেন যে আর্থিকভাবে মূল্যহীন উষর ভূমি যেগুলো ১৯৪৮-এর পর নৈতিক মূল্য অর্জন করেছে, এর প্রভাবকে খাটো করে দেখা যায় না। এ কারণে এখন এগুলোও ছেড়ে দেয়া অসম্ভব।"

এরপর শারেট সরাসরি তাঁর কাঙ্খিত বিষয়ে চলে গেলেন। স্বভাবতই তিনি জানেন যে, বিষয়টি নিয়ে কায়রোতে অব্যাহতভাবে মাতামাতি চলছে। সেটা হচ্ছে নাকাব ইস্যু। কারণ এ অঞ্চলটির মাধ্যমে এশিয়া ও আফ্রিকার আরব দেশগুলোর মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত। শারেট আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে বলেন,"আমি বুঝি না, মিসরীরা একথা কোথা থেকে পেল যে, তাদের এবং আরব বিশ্বের সাথে স্থল যোগাযোগ থাকবে। এটা ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। কারণ ব্রিটিশ শাসন ফিলিস্তিনে বিদ্যমান থাকার সময় তাদেরকে বাকি আরব জাহান থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। তাদের আগে উসমানী শাসনও একই কাজ করেছিল। যদি ইসরাইল এখন এ যুক্তি মেনে নেয় তাহলে মিসরীরা একদিন এসে বলবে যে ইসরাইল, মিসর ও বৈরুতের মধ্যে রেল যোগাযোগের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ কারণে রেলগাড়ি চলাচলের জন্য ইসরাইলকে দূরীভূত করতে হবে।"

অবশেষে শারেট আল্-কুদস্ বিষয়ে উপনীত হলেন। তিনি এ বিষয়টি উত্থাপন না করার অনুরোধ করেন। যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ জানান যে, কোন দিন যদি এ উদ্যোগে অগ্রগতি হয় এবং সমাধান প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ অন্তর্ভুক্ত হয় তখন যেন জাতিসংঘের সাথে কোন বিষয়ে আল্-কুদস্ বিষয়কে জোর করে ঢুকিয়ে না দেয়া হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরব-ইসরাইল সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছেন তার প্রতিধ্বনি কি হল সে সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতদের পাঠানো রিপোর্ট পড়ে শেষ করা পর্যন্ত বাতাস শান্ত থাকেনি। বরং বাস্তবতা হলো বায়ু এবার প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলো; যখন জামাল আব্দুন নাসের ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ তারিখে অপরাহ্নে ঘোষণা দিলেন যে, মিসর সোভিয়েত নির্মিত অস্ত্র আমদানির চুক্তি করেছে। কায়রোর রাষ্ট্রদূত হেনরি বায়রড এই চুক্তির ঘোষণায় কোন চমক অনুভব করলেন না। কারণ একদিকে জামাল আব্দুন নাসের তাঁর কাছে নিজের অভিপ্রায় গোপন করেননি। অন্যদিকে তিনি যখন উভয়ের মধ্যকার সর্বশেষ বৈঠকের আলোচনা ওয়াশিংটনে জানালেন, তখন এমন একটি উত্তর পেলেন যাতে কায়রোর বাস্তব অবস্থা গভীরভাবে বুঝতে পেরেছে বলে প্রতীয়মান হয়নি।

উত্তরটি পাঠিয়েছিলেন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হারবার্ট হোফার। এতে তিনি লেখেন (ডকুমেন্ট নং ২০৫৫/৬৮৪ ক ০৮৬ /৯) ঃ "অস্ত্রের চাহিদা সম্পর্কে নাসের আপনাকে যা বলেছেন, সে সম্পর্কে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, মন্ত্রী মহোদয়ের সাম্প্রতিক ভাষণে ব্যাখ্যাকৃত পন্থায় আরব ও ইসরাইলের মধ্যকার রাজনৈতিক সমাধানের

কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত না হলে আমরা মিসরকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে পারি না।"

যদিও বায়রড অস্ত্র চুক্তির ঘোষণায় চমকালেন না কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওয়াশিংটন এমন ভাব দেখাল যেন সে চমকে উঠেছে। অথচ বিভিন্ন সূত্রে তার কাছে এ তথ্য পূর্বেই ছিল তাছাড়া বায়রড তো জামাল আব্দুন নাসের থেকে জেনে সরাসরি তা টেলিগ্রাম করে দেন।

প্রথমদিকে ডালাস ভেবেছিলেন যে, তিনি বুঝি বা জামাল আব্দুন নাসেরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে অস্ত্র চুক্তি থেকে ফেরাতে পারবেন। কিন্তু পরদিন তিনি ভাবলেন যে, তাঁর চেষ্টা-তদ্বির মস্কোর দিকে নিবদ্ধ করা দরকার। এতে হয়ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এ চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াতে পারে।

ডালাস কায়রো অথবা মস্কো কোথাও সফল হলেন না। এরপর তিনি এ চুক্তির সাইজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলেন । তার কাছে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ একটি রিপোর্ট দাখিল করলেন (ডকুমেন্ট নং ২৩৫৫-৯/৭৭৪/৫৬) প্রমাণ্য সূত্র অনুসারে এ চুক্তির সাইজ হচ্ছে ঃ

২০০ যুদ্ধ বিমান, ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের পূর্বেই ১০০টি হস্তান্তর করা হবে। এই প্রথম এক'শ বিমানের মধ্যে ৩৭টি হবে মাঝারি ধরনের বোমারু বিমান। অবশিষ্ট এক শ' হবে মিগ-১৫ মডেলের বিমান। ৬ প্রশিক্ষণ বিমান, ১০০ ভারি ট্যাঙ্ক, ৬ টর্পেডো নৌকা, ২ সাবমেরিন। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই চুক্তির অর্থের পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড স্টার্লিং, যা মিসরী পণ্যের বিপরীতে পরিশোধ করা হবে।

আমাদের তথ্যসূত্রে আরও জানা গেছে যে, ইতোমধ্যে প্রথম কার্গো ওডেসা সমুদ্রবন্দর ত্যাগ করেছে। কার্গো বোঝাইয়ের কাজ দেখাশোনার জন্য একটি মিসরী সামরিক মিশন সেখানে ছিল। এমন কিছু ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এক দল সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ অচিরেই মিসর পৌঁছবেন, সেখানে তাঁরা কিছু যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম স্থাপন ও প্রশিক্ষণের কাজে তিন মাস থাকবেন। বার্নেস্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষিত 'ডালাস'-এর কিছু ব্যক্তিগত পত্র ইঙ্গিত করে যে, অস্ত্র বিপর্যয়ের সেই দিনগুলোতে ডালাসের চিন্তা-ভাবনা ছিল বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত ঃ

"কোন এক মুহূর্তে তার মনে হলো যে, তিনি ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিলে জামাল আব্দুন নাসেরকে সতর্ক করে দেবেন অথবা এই সতর্কবাণী হতে পারে আইজেনহাওয়ার ও এডেন-এর যৌথ ভাষণে। তাঁরা এতে বলবেন যে, "এই অস্ত্র চুক্তি মেনে নেয়া যায় না। তাছাড়া এ অঞ্চলে একটি সমাধান প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক চুক্তির ভারসাম্যে কোন ধরনের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াও মেনে নেয়া অসম্ভব। যখন সঙ্কটের সমাধান হয়ে যাবে তখন অস্ত্র প্রতিযোগিতার না কোন যুক্তি থাকবে , আর না থাকবে কোন প্রয়োজন।"

পরবর্তী মুহূর্তে তার ভাবনা চলে যায়– এই অস্ত্র চুক্তির অর্থ হচ্ছে– মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ অত্যাসন্ন। এখন হয়ত এ সোভিয়েত অস্ত্রের কিনিবিকি শেষ হওয়ার আগেই ইসরাইল মিসর আক্রমণ করবে। অথবা সোভিয়েত অস্ত্রের সব চালান পৌঁছে যাওয়া মাত্র মিসর ইসরাইল আক্রমণ করে বসবে। আবার এক সময় ডালাস 'এডেন'-এর কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠাচ্ছেন যে, এখন সুয়েজ এলাকায় বিদ্যমান ব্রিটিশ বাহিনীর সাইজ কেমন ? জানতে চাচ্ছেন– এখন বাকি ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহার বন্ধ করা যায় কিনা। বরং উল্টো তাদেরকে জোরদার করা যায় কিনা। এর উত্তরে এডেন জানালেন যে, সুয়েজ খাল ঘাঁটির ব্রিটিশ বাহিনীর বড় অংশ ইতোমধ্যে সেখানে থেকে চলে এসেছে। অবশিষ্ট সৈন্যদের মিসরের সাথে সম্পাদিত প্রত্যাহার চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে প্রত্যাহার করা, বাতিল করাটা খুবই কঠিন হবে। কারণ প্রত্যাহার না করা হলে হঠাৎ করে মিসরের বাড়তি অস্ত্রের সামনে তারা প্রতিকূল পরিস্থিতির সামনে অসহায় বোধ করবে ।

শেষ মুহূর্তে ডালাস তাঁর তীব্র আবেগকে নিয়ন্ত্রণে এনে নিজেকে বোঝাতে থাকলেন যে, এখনও আলাদা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। সম্ভবত আরব -ইসরাইল যুদ্ধ এড়াবার একমাত্র সমাধান হলো, মিসর যদি এ অঙ্গীকার করে যে, এটা একমাত্র, বার বার এর পুনরাবৃত্তি হবে না; আর এদিকে ইসরাইল যদি ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমে আটলান্টিক জোট থেকে কিছু ক্ষতিপূরণ পেয়ে যায় এবং ব্যারেজ নির্মাণে অর্থায়নের প্রতি নাসেরকে প্রলুব্ধ করা যায়। কিন্তু ডালাস সব সময় তার মতের সবচেয়ে দুর্গম উপত্যকায় ফিরে যায়। সেটা হচ্ছে মিসরের সাথে আরব জাহানের সংযোগ এমন পথে হওয়া, যাতে নাকাব অঞ্চলটি 'আরব অঞ্চল' থাকে।

ডালাস ২৮ অক্টোবর ১৯৫৫ তারিখে এতদূর পৌঁছে গেলেন যে, তার সহোদর সিআইএ পরিচালক এলেন ডালাস-এর কাছে একটি রিপোর্ট চাইলেন যে, জামাল আব্দুন নাসেরের পিছনে লেগে কি করা যায়। তাকে শেষ করে দেয়া যায় কিনা। এর জবাবে (তাঁর সহোদর) সিআইএ পরিচালক ২৯ অক্টোবর ১৯৫৫ তারিখে এক রিপোর্ট লেখেন (আইজেনহাওয়ার-এর দফতরে রক্ষিত ডকুমেন্ট, বার্নেস্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'ডালাস–নথিপত্র সমগ্র' ও হোয়াইট হাউস-এ সংরক্ষিত দলিলাদি দ্রঃ)। এতে লেখা ছিল আপনার প্রশ্নের জবাবে সিআইএ নিম্নোক্ত মূল্যায়ন পেশ করছে ঃ

১. সোভিয়েত অস্ত্রের কারবারের ফলে আরব বিশ্বে নাসের নিজের জন্য এক সমীহ ও নেতৃত্বের আসন অর্জন করেছে। তিনি এই আসন সংরক্ষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

২. তিনি বর্তমান অবস্থান হতে সোভিয়েত প্রভাব বলয়ে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে সংযত রাখবেন যেমনটি তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব বলয়ে যোগ না দিতে সচেতন

ছিলেন। তিনি তাঁর এ মধ্যবর্তী অবস্থান ধরে রাখার ব্যাপারে নিজের ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল।

৩. যদি তিনি পাশ্চাত্যের সাথে কোন প্রকার ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজ স্বাধীনতাকে জোরদার করতে পারেন তাহলে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক রাখার চেয়ে সেটাকেই বেশি শ্রেয়তর মনে করবেন।

৪. তিনি যদি অনুভব করেন যে, পশ্চিমা বিশ্ব তাঁকে সম্পূর্ণ পিঠ ফিরে দিয়েছে তাহলে আরও বেশি সোভিয়েত সাহায্য গ্রহণ করবেন এবং এ চেষ্টা করবেন এবং সম্ভবত এতে বিরাট বিজয়ও লাভ করবেন, যে সিরিয়া ও সৌদি আরবকেও নিজের পাশে টেনে আনবেন।

৫. নাসেরের সাথে যে কোন পশ্চিমা আলোচনা হবে দীর্ঘ, সমস্যাসঙ্কুল ও অনিশ্চিত। যদি তার প্রতি আমাদের সিদ্ধান্ত হয় যে মিসরকে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধ্বংস করে দেয়া, সেক্ষেত্রে এটা একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। কারণ এটা ইসরাইলকে মিসরের ওপর আক্রমণ হানায় অনুপ্রাণিত করবে।

৬. আমরা যদি নাসেরকে আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ইত্যাদি সুবিধাদি দেই, তাহলে তাঁকে সাহায্য দেয়ার সাথে সাথে উত্তর বেল্টের দেশগুলোকে বাড়তি সাহায্য দিতে বাধ্য হব, যাতে আমাদের বন্ধুদের হেফাজত করতে পারি।

৭. যদি কোন কারণে নাসের মৃত্যুর মাধ্যমে দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মিসরের বিপ্লবী কমাণ্ড কাউন্সিল তার নীতিই চালিয়ে যাবে। তখন নেতৃত্বে আসবেন 'আমের'– যিনি এ অবস্থায় পুরোপুরি সেনাবাহিনীর আধিপত্যে থাকবেন।

৮. এই ধারাটি ডকুমেন্ট থেকে এর স্পর্শকাতরতার জন্য পুরোপুরি মুছে ফেলা হয়। সম্ভবত এ ধারায় জামাল আব্দুন নাসের বা মিসরের জন্য কাউকে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে সরিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ডালাসের কাছে মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রেরিত রিপোর্টে বলা হয়, জর্ডানের উত্তর বেল্টের দেশগুলোর সাথে যোগ দেয়ার সম্ভাবনা হয়ত মিসরের সাথে আলোচনার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দিতে পারে।

আমাদের কাছে এর কোন দ্রুত সমাধানের সুযোগ নেই। কিন্তু যদি আমরা মিসর-ইসরাইলী বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থাকে ঠেকাতে সক্ষম হই তাহলে আমরা নিজেদেরকে আরও কিছু সময় দিতে পারি, যাতে মিসর কিংবা তুর্কিস্তান অথবা ইরাকের সাথে বা অন্য কারও সাথে এর বিকল্প খুঁজে পাই কিনা।

এই মূল্যায়নে এটাই অবধারিত করছে যে, যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটিশ সরকার কেউই এখন এ অঞ্চলে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নীতি আরোপ করতে প্রস্তুত নয়।

॥ ৪ ॥

এন্ডারসন

'পুলের কাছে আগে পৌঁছি, তখন পার হওয়ার বিষয়টি দেখা যাবে।'

—ইসরাইলী বাহিনীর ওয়ার স্টাফের প্রতি বেন গোরিয়ন

অস্ত্রের কারবারটি ছিল 'পবিত্র ও নিষিদ্ধ' ধারণার ক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক টার্নিং পয়েন্ট। যে ধারণাটি প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে আরব-ইসরাইল সংঘাতের পেছনে পলে পলে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

আরবদের অনুভূতি ছিল ইসরাইল তাদের অঞ্চলের মানচিত্র আর ইতিহাসকে ভেঙ্গে দেবে এবং তাদের সাথে সন্ত্রাস, ধোঁকাবাজি আর মূলোৎপাটনের উপায়গুলোই চর্চা করবে। তাদের ভূমি জবরদখল করে এখানকার অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেবে। তাদের যোগাযোগকে করে দেবে জটিল ও বাধাগ্রস্ত। তাদের ন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধে বিশ্বকে ১৯৪৮ সালের পূর্ব অবস্থাকে রাখবে আড়াল করে। এ বছরেই তারা যতদূর সম্ভব উদ্ধার করে নিয়েছে সশস্ত্র মোকাবেলার মাধ্যমে। কিন্তু তারা ফিলিস্তিন যুদ্ধের পর আবিষ্কার করল যে, পবিত্র ও নিষিদ্ধ ধারণাটি তার প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও বাস্তবতার সামনে একই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয়। কারণ সেটা এক প্রকার অরক্ষিত। এতে আইনের সুরক্ষা, শান্তির সুরক্ষা অথবা চরিত্রের সুরক্ষা নেই। এখন এল সোভিয়েতের সাথে সম্পাদিত মিসরের অস্ত্র চুক্তির বিষয়। এতে সমগ্র আরব বিশ্বে এই গভীর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে যে, অবশেষে পবিত্র ও নিষিদ্ধ ধারণাটি এমন এক লৌহবর্ম অর্জন করতে সক্ষম হলো, যা বাস্তবে তাদের ওপর আরোপিত চাপ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে। এদিকে প্রতিটি আরব রাজধানীতে এক প্রচণ্ড আবেগ-অনুভূতির ঝড় বয়ে যাচ্ছিল যে, আগামী মাসগুলো যার মধ্যে মিসর অস্ত্রের সরবরাহগুলো গ্রহণ করে তা ধাতস্থ করতে সক্ষম হবে– এ মাসগুলো হবে দারুণ মাস, যাতে প্রতিটি আরব মানুষের একান্ত কর্তব্য হবে মিসরের সুরক্ষায় ছুটে আসা; যাতে সে তার অর্জিত লৌহবর্মের যোগ্য ব্যবহার করতে পারে।

তখনকার দৃশ্যপট অনেকটা উইনস্টন চার্চিলের বর্ণনার মতোই ছিল– যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানদের সামনে ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ না করা এবং ব্রিটিশ বাহিনী ইউরোপ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল যাতে, ব্রিটিশ দ্বীপটিকে রক্ষা করতে পারে এবং যাতে তার গায়ে এমন নতুন আঁশ গজায় যা তার নাঙ্গা জীবকোষকে সুরক্ষা

করতে সক্ষম হয়। সে সময় চার্চিল বলতেন, 'সে সময় ব্রিটিশ ছিল অনেকটা আঁশঅলা মাছ হোমারড (Homard)-এর মতো, তার শত্রুরা তাকে আঘাতে আঘাতে তার রক্ষাকবচ আঁশগুলোকে খসিয়ে ফেললে সে তার শত্রুর সামনে অরক্ষিত হয়ে পড়ে, তখন আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রগর্ভে পড়ে থাকা পাথরের ফাঁকফোকরে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে কিছু দিন অপেক্ষা করে। নতুন আঁশ গজালে আবার ফিরে এসে উত্তাল সমুদ্রে অন্যান্য মাছের সাথে পাল্লা দিয়ে সাঁতরে বেড়ায়।

সে সময়টি ছিল স্বর্ণের মাপে মূল্যবান এবং বিরল। এই বাস্তবতা কেবল আরব জাতিগুলোই দেখেনি, বরং উইনস্টন চার্চিলের সেই উপমা জানুক বা মানুক আর নাই মানুক, দৃশ্যটি তখন একই ছিল। হয়ত তারা তাদের এই বেদনাময় ঐতিহাসিক মুহূর্তকে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিরিখে অন্য বর্ণনা ভঙ্গিতে, প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা একই ছিল।

ইসরাইল তখন বাস্তবতাকে উপলব্ধি করছিল। অনুরূপভাবে ডালাসও। কারণ তিনি শেষ অবধি এই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে,"মিসরকে কেনা'র শেষ চেষ্টাটুকু করে যেতে হবে; কিন্তু ব্রিটেন এ মত পোষণ করত না। এডেন ১৯৫৫-এর নভেম্বরে আগেভাগেই বুঝেছিলেন যে, সর্বশেষ পরিস্থিতির নিরিখে ব্রিটেন সরকার মনে করে না যে, তার আর্থিক অবস্থা তাকে মিসর কেনার কারবারে অংশগ্রহণের অনুমতি দেবে। কারণ ইতোমধ্যেই তার প্রতিশ্রুত ব্যয় বাজেট বরাদ্দকে ছড়িয়ে গেছে।

ফ্রান্সও তার সাথে ছিল না। কারণ আলজিরিয়ার বিপ্লবে মিসরের সহযোগিতা এখন উত্তর আফ্রিকার ফরাসী কেন্দ্রকে হুমকির সম্মুখীন করেছে।

এছাড়া ইসরাইল তার পদ্ধতি গ্রহণ করে ফেলেছে। কারণ মোশে শারেট প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁকে এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। বেন গোরিয়ন আবার প্রধানমন্ত্রীর পদে ফিরে এসেছেন। তবে সাথে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদটিও রয়েছে। এটা ছিল ৩ নভেম্বর ১৯৫৫-এর ঘটনা। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫। আমেরিকান চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাসের কাছে একটি রিপোর্ট লিখে পাঠান (ডকুমেন্ট নং ২৩৫৫-৪৮/ ৬৮/ ৩০৮৪)। এর ৬ষ্ঠ ধারায় রয়েছে ঃ

"বেন গোরিয়ন ইসরাইলী বাহিনীর ওয়ার স্টাফদের সাথে একটি বৈঠক করেন। তিনি উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের বলেন যে, তাদের সামনে আর মাত্র তিন মাস সময় আছে। অন্য বর্ণনাসূত্র মতে, 'তিন কি চার মাস' ধৈর্য ধরতে হবে। এরপর ইসরাইল তার নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করবে।

একজন অফিসার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ এই সময়ের পর কি ঘটতে যাচ্ছে?

বেন গোরিয়ন উত্তরে বলেন, আগে তো সেতুর নিকট পৌঁছি, তারপর পার হওয়া যাবে। ডালাস সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি আল্‌ফা পরিকল্পনা উদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা করে যাবেন। তাঁর মনে হতে লাগল যে, তিনি দিন, সপ্তাহ ও অল্প কয়েক মাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছেন, এর বেশি নয়। বিশেষ করে যখন তিনি একট তারবার্তা পেলেন (ডকুমেন্ট নং ৫৫৫৬-৭৮০ ক০ ৫৬তম-১)। এটি পাঠিয়েছেন প্যারিসে নিযুক্ত আমেরিকার চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স। এতে বলা হয়েছে ঃ "আটলান্টিক জোটের যৌথ সামরিক কর্মসূচীর অর্থে ইসরাইলকে মিস্টের মডেলের কয়েকটি বিমান হস্তান্তরের ছাড়পত্র অনুমোদন দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে ফরাসী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করে।"

একই সময় তিনি ইসরাইলে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত প্রেরিত একটি তারবার্তা পেলেন (ডকুমেন্ট নং ৫৫৬-১/৬৮৪ক০৮৬)। এতে বলা হয় ঃ "ইসরাইলে বিরাজমান মনোভাব যা দেখছি এতে মনে হয়, দু'দেশের মধ্যে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম জরুরী পদক্ষেপ হিসাবে নাসের ও বেন গোরিয়নের মধ্যে একটি প্রকাশ্য বা গোপন বৈঠকে মিসরের স্বীকৃতি ছাড়া এটাকে থামানো যাবে না।

প্রেসিডেন্ট ডুয়েট আইজেনহাওয়ার শেষ প্রচেষ্টার দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পরবর্তীতে ভাণ্ডারমন্ত্রী রবার্ট এন্ডারসনকে নির্বাচন করলেন আলাদা পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। আইজেনহাওয়ার ৯ জানুয়ারি ১৯৫৬ তারিখে তাঁর ডায়েরিতে লেখেন ঃ "আজ আমি আমার পক্ষ থেকে মিসরী প্রেসিডেন্ট নাসের ও ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়নকে লেখা দু'টি পত্রে স্বাক্ষর করি। উভয়কে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি এন্ডারসনকে অনুরোধ করেছি।

যেন তিনি তাঁদের উভয়ের সাথে যোগাযোগ করে সাধারণভাবে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশেষ করে মিসর-ইসরাইল সম্পর্কের বিপজ্জনক সমস্যাগুলো অনুসন্ধান করেন। আমি তাঁদেরকে জানিয়েছি যে, এন্ডারসন আমার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। তিনি এ অঞ্চল সম্পর্কে আমার অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাকে বুঝতে পারেন। আমি তাঁদেরকে অনুরোধ করেছি যেন তাঁরা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করে তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করতে সাহায্য করেন।"

১৯ জানুয়ারি ১৯৫৬। এন্ডারসন কায়রো থেকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে প্রথম রিপোর্ট লেখেন (ডকুমেন্ট নং ৫১৮,দ ৫৯-আল্‌ফা) ঃ আমি কর্নেল জাকারিয়া মহিউদ্দীনের বাসায় নাসেরের সাথে প্রথম বৈঠক করেছি। আমরা এক সাথে নৈশভোজ গ্রহণ করি। ডিনারে সাধারণ আলোচনা হয়। ডিনার শেষে তিনি বলেন, তিনি তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য প্রস্তুত। আমি শুরু করলাম।

ব্যাখ্যা করে বললাম যে, প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার আমাকে এ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, কারণ তিনি বিশ্বশান্তির সৌষ্ঠবে গভীর বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন যে, প্রতিটি জাতির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাপ্ত সুযোগকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। আমি এও বলি যে, তিনি ও প্রেসিডেন্ট উভয়ই এর অনেক কিছু বোঝতে সক্ষম। কারণ উভয়েরই রয়েছে সামরিক প্রেক্ষাপট। এরপর আমি এক পর্যায়ে বলি যে, মিসরের সাথে প্রতিবেশী দেশের জটিল সম্পর্ক বিদ্যমান। এর পিছনে রয়েছে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট নানান কারণ। এ সকল বিবেচ্য বিষয়গুলো একটি আরেকটির সাথে তালগোল পাকিয়ে আমাদের সামনে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে। এরপর আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি যে,আমি এ সমস্যার সকল প্রশ্নের রেডিমেট জবাব নিয়ে তাঁর সাক্ষাতে আসিনি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আশা করেন এবং আমিও এ প্রত্যাশা পোষণ করি যে, আমরা সংলাপের পথ ধরে অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব। আমার আশা, আমি তাঁর সাথে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়ে সম্ভাব্য সংলাপের মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমি তাঁকে বলেছি যে, তাঁর সাথে বৈঠক শেষে আমি ইসরাইলে যাব। আশা করি সেখানে আমার কাছে পুরো দৃশ্যটি ভেসে উঠবে।

এখান থেকে আমি অন্য আলোচনায় গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি আমাদের বিদ্যমান সমস্যাটি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও মতামতের একটি রূপরেখা দেন। নাসের এবার শুরু করে বলেন– তিনি সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপট টেনে এনে আমাকে ভারাক্রান্ত করতে চান না, যদিও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি এটাকে বাদ দিয়ে এখন বর্তমান পরিস্থিতি ও এর ভয়াবহতার দিকটিই আলোচনা করতে চান। এরপর তিনি বলেন–"আমরা পরস্পর গাঁটছাড়া বাঁধা বেশ কিছু সঙ্কটের সামনে রয়েছি। এরপর তিনি অভিমত রাখেন যে, তাঁর মূল্যায়নে তিনটি সমস্যা হচ্ছে সবচেয়ে অগ্রগণ্য।

প্রথমত ঃ ফিলিস্তিনের আরব ভূমি সমস্যা।

দ্বিতীয়ত ঃ একটি রাজনৈতিক ও মানবিক ইস্যু হিসাবে শরণার্থী সঙ্কট।

তৃতীয়ত ঃ আরব বিশ্বের একটি ভাগ দু'টি অংশে বাহ্যত বিভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে এক অংশ উত্তর বেল্টে যোগ দিচ্ছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপদের দিকে পা বাড়াচ্ছে। অপর অংশটি দক্ষিণে অবশিষ্ট আরব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে এবং ইহুদী হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এরপর নাসের আরও বলেন, সঙ্কট এখন বিগত বছর থেকেও বেশি তীব্রতর। এর কারণ হচ্ছে ১৯৫৫ সাল ধরে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলী– সেই গাজ্জায় হামলা থেকে শুরু করে বাগদাদ জোট পর্যন্ত, সেখান থেকে নিয়ে অস্ত্র কেনার কারণে উদ্ভূত হৈ চৈ এরপর প্রকাশ্য ইসরাইলী হুমকীগুলো তো রয়েছেই। যার উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলকে দেয়া পশ্চিমাদের রাজনৈতিক সামরিক ও প্রচারণা সমর্থন।

মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের তারপর বললেন, তাঁর মতে আরব-ইসরাইল সংঘাতের যে কোন সমাধানের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে কথা বলার আগে আরব বিশ্বের পরিস্থিতি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে তারা স্বেচ্ছায় সম্মিলিতভাবে এমন সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যাতে তাদের ন্যূনতম হলেও প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। এ প্রেক্ষিতে তিনি মনে করেন যে, আরব পরিস্থিতি ঠিক করার পূর্বে আরব-ইসরাইল সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি আরব জাহানে এই ভুল বোঝাবুঝির কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেন।

১. বেশ কিছু সংখ্যক আরব দেশে নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রগণ্যতা নিয়ে মতের ভিন্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ইরাকী প্রশাসনের মতে আগে বিপদ আসবে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, পরে ইসরাইলের। "আমরা মিসরে এ বিন্যাসের ঠিক উল্টোটা লক্ষ্য করছি।"

২. সৌদী অর্থে অনর্থক কিছু সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের অস্থিরতা।

৩. তিনি স্পষ্টতই বলেন, বেশ কিছু আরব দেশে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে তার প্রভাব বিস্তারের অনুশীলন করছে, এতে তিনি শঙ্কিত। যেমনটি 'আমরা দেখেছি' বাগদাদ জোটের ক্ষেত্রে।

৪. আরব বিশ্বে কিছু পশ্চিমা দেশের ঢালাও আচরণ ও ক্রিয়াকলাপও এর জন্য দায়ী। (আমার ধারণা, তিনি আম্মানে ব্রিটিশ সরকারের অব্যাহত চাপ প্রয়োগের ইঙ্গিত করেছেন। উদ্দেশ্য, যেন বাদশাহ হোসাইন বাগদাদ জোটে যোগ দেন।)

এরপর নাসের একথা বলে শেষ করেন যে, "আমি যেভাবে উপস্থাপন করলাম এতে আমি এ মতামত রাখতে পারি যে, মূলতঃ অধিকাংশ আরব– আরব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমা দেশগুলোর অনুসৃত নীতি ও চাপ প্রয়োগের ফলে।"

তার কথা শোনার পর আমি তার কাছে গোপন না রেখে বললাম যে, আমি দেখছি তিনি আরব-ইসরাইল ইস্যু থেকে আরব–আরব সমস্যা নিয়েই বেশি ব্যস্ত। তিনি আমার এ মন্তব্য সমর্থন করলেন। আমি এ পর্যায়ে মিসর-ইসরাইল সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টিকারী কিছু বিষয়ের অবতারণা করি। নাকাব ইস্যুটি উত্থাপন করলাম। তখন যাকারিয়া মহিউদ্দীন– যিনি পুরো সময়টি চুপ থেকে কেবল শুনে যাচ্ছিলেন– মন্তব্য করলেন, তিনি অবাক হচ্ছেন যে আমরা মিসরের পক্ষে নাকাবে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারছি না। প্রধানমন্ত্রী তখন নাকাব বিষয়টি অনুসরণ করে যেতে লাগলেন।

২১ জানুয়ারি, ১৯৫৬ তারিখে এন্ডারসন কায়রো থেকে তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্ট লিখলেন ঃ "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় কর্নেল যাকারিয়া মহিউদ্দীনের ফ্ল্যাটে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বসি। আমি শুরুতেই বললাম– প্রেসিডেন্ট ভাবছেন যে, শীঘ্রই একটি সমাধানে পৌঁছা সম্ভব।" সে কারণে আমি আমার দায়িত্বের মূল বিষয়ে প্রবেশ করতে চাই। আমার কথা শেষ না হতেই নাসের বললেন– "শীঘ্রই কোন সমাধানে পৌঁছা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।" তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, যে কোন

সমাধানের আগে তা সাধারণ আরব স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়েছে। আর অত সহজে সমাধান চিন্তা সাধারণ আরব স্বীকৃতি এখন পাবে না। সহসাই গতকাল যেখানে বৈঠকের আলোচনা শেষ হয়েছে, সেখানে ফিরে এসে আবার নাকাব বিষয়টি উঠে এলো। তিনি আবার দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আরব বিশ্বের উভয় অংশকে সংযুক্ত না রেখে এক অংশ আফ্রিকায়, অপর অংশ এশিয়ায় বিভক্ত রেখে এর ভিত্তিতে কখনই সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম– "এটা কি কোন মানসিক বিষয় না কি তার চেয়েও বড় কিছু ?" এ পয়েন্টে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করি। আমরা মানচিত্র চেয়ে আনলাম।

আমি কর্নেল নাসেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এশিয়া ও আফ্রিকার কতটুকু জুড়ে আরব বিশ্বের এই সংযোগের প্রস্তাব করা হচ্ছে ? কর্নেল নাসের মানচিত্রের দিকে তাকালেন। মনে হলো তিনি উত্তরের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি বললেন ন্যূনতম পরিমাপে অঞ্চলটি হতে হবে যাহিরিয়া থেকে আল্ খলিল, সেখান থেকে গাজ্জা– আরব অঞ্চল। আমি উত্তরে তাঁকে বললাম, এটা মেনে নেয়া ইসরাইলের পক্ষে অসম্ভব হবে। এটার ওপর বার বার জোর দিলে ইসরাইলের সন্দেহ বেড়ে যেতে পারে যে, এটাই হচ্ছে যুদ্ধের পথ। তবে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তিনি কি এ ভূমির কোন পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা করছেন কিনা। এখানে তিনি বলেন যে, তার বিশ্বাস– 'সাম্খ' ট্রায়াঙ্গাল ও তিবরিয়া হ্রদ পরিবেষ্টিত অঞ্চল অবশ্যই সিরিয়ার হাতে থাকতে হবে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় এ দু'টি অঞ্চল আরবী অঞ্চল থাকতে হবে। আমি তাঁকে একটি প্রশ্ন করে চমকে দিলাম, "এটা কি উত্তম হবে না যে, এটা ও অন্যান্য বিষয়ে আপনার এ বক্তব্য সরাসরি কোন গোপন বৈঠকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়নের সাথে হোক ?" আমি আরও বললাম– "আমার বিশ্বাস ইসরাইল কিছু ভূমি ছাড় দিতে রাজি হতে পারে। কিন্তু বেন গোরিয়ন কখনও এছাড়া কোন মধ্যস্থতাকারীকে দিবেন না বরং সংশ্লিষ্ট পক্ষকে তা সরাসরি প্রদানেই বেশি আশ্বস্ত হতে পারে। নাসের এ প্রস্তাব গ্রহণেও তাঁর অসম্মতি জানান। আমি প্রতিরক্ষা লাইনে আবার ফিরে এসে বললাম– যদি মনে করেন আপনাদের উভয়ের মধ্যে বৈঠক অসম্ভব, তাহলে আপনি কি আপনার মর্জিমতো তাঁকে একটি পত্র লিখে দেবেন, যা আমি বহন করে নিয়ে যাব এবং এর উত্তর নিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব ? এবারও নাসের বেন গোরিয়নের নিকট লিখতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

এবার আমি তাঁকে তৃতীয় আরেকটি প্রস্তাব দিলাম যে, তিনি সঙ্কট সমাধানে তাঁর দাবি ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার-এর নিকট একটি পত্র লিখবেন। আমরা এদিকে বেন গোরিয়ন থেকেও অনুরূপ একটি পত্র নেব। এভাবে আমরা ঐক্য ও বিভেদের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে চেষ্টা করব। এরপর আমরা দেখব যে, আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোথায় কিভাবে অগ্রসর হতে পারি। এর উত্তরে নাসের বলেন যে, "তিনি এ প্রস্তাবটি ভেবে দেখবেন।"

॥ ৫ ॥

এন্ডারসন-২

"নাসেরকে এমন অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে, যা ইসরাইল গ্রহণ করতে পারে।"
—প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত রবার্ট এন্ডারসনের প্রতি আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনা

এন্ডারসন কায়রোর পর সাইপ্রাস সফর করলেন। সেখান থেকে ইসরাইলে গেলেন। সেখানে তিনি ইসরাইলে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালাস-এর কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন (এর ভাষ্য সংরক্ষিত আছে আল্‌ফা ডকুমেন্ট সংগ্রহ ৫১৮/দ৫৯-তে) এতে ছিল ঃ

* "আপনি নাসের-এর সাথে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে আলোচনা চালিয়েছেন। আমরা সকল সময় এ আশাই করে যাচ্ছিলাম যেন নাসেরকে এমন অবস্থানে টেনে আনতে সক্ষম হন যা ইসরাইলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যাতে তাদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারি।

* নাসের শর্ত দিলেন যে, ইসরাইল নাকাব ছেড়ে গাজার যাহিরিয়া লাইনে চলে আসবে তা আদৌ আলোচনা করা সম্ভব নয়।

* আপনি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, নাসের প্রথমে বেন গোরিয়নকে লিখবেন ও বেন গোরিয়ন তার উত্তর দেবেন এবং দু'জনের মধ্যে পত্র যোগাযোগ চলবে, এটা একটি উত্তম প্রস্তাব। এটার ওপর জোর দিয়ে যান। ইসরাইলীরাও এখন উভয় পক্ষের মধ্যে সরাসরি ও সত্বর বৈঠকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যাবে। কিন্তু তাদের মেজাজ কিছুটা শান্ত হবে যখন তারা অনুভব করবে যে, নাসের-এর পক্ষ থেকে বেন গোরিয়নের নিকট একটি পত্র আসছে।

* আপনাকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে যে, আপনি বেন গোরিয়নের সাথে সাধারণভাবে আলোচনা করবেন। আপনাকে যদি ইসরাইলে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, নাসের-এর সাথে আলোচনার ফল কি ? তাহলে আমরা মনে করি আপনার এটা বলাই ভাল হবে যে, 'সেটা তেমন কোন উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না, তবে একই সময় তা নিরুৎসাহব্যঞ্জকও নয়।' তবে আপনি নাসের-এর সাথে আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে তাদের প্রস্তুতির সীমানা সম্পর্কেও নিশ্চিত হয়ে নিতে পারেন।

* ইসরাইলীরা ভয়ে আছে যে, পাছে আপনার বর্তমান দায়িত্ব বেশ কয়েক মাস ধরে চলতে থাকে, ইত্যবসরে মিসরী বাহিনী সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে যায়।

সম্ভবত এভাবে বর্তমান উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে যে, উভয় পক্ষ এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দিবে যে, তারা তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে কখনও ব্যবহারের আশ্রয় নেবে না এবং আমরা ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এর গ্যারান্টি দেব।"

২৩ জানুয়ারি, রবার্ট এন্ডারসন ইসরাইল থেকে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গোরিয়ন-এর বৈঠক সম্পর্কে প্রথম রিপোর্ট লিখলেন। এর মূল ভাষ্য আল্ফা-৪১৮/দ৫৯, ডকুমেন্ট সমগ্রে রয়েছে। এতে ছিল ঃ আমি রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচটায় ইসরাইলে এসে পৌঁছেছি। আমি আল্-কুদ্সে গাড়িতে এসেছি এবং টেডি কোলিক ও তাঁর স্ত্রীসহ ডিনার করেছি। আমাদের সাথে মি. শারেট ছিলেন, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে কোন কথা হয়নি।

আজ সকালে বেন গোরিয়নের সাথে আড়াই ঘণ্টা আলাপ হয়। আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শারেট, কোলিক ও হের্তুযওজ, ইনি বৈঠকের কার্যবিবরণী লিখেন। আমি আলোচনা শুরু করে সাম্প্রতিক এই শান্তি প্রচেষ্টার কারণগুলো ব্যাখ্যা করি, এটা প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার-এর সিদ্ধান্তেই শুরু হয়েছে। এন্ডারসন বলেন, আমি প্রস্তাব করি যে, বেন গোরিয়ন যেন তাঁর চিন্তা-ভাবনার একটি চিত্র তুলে ধরেন।

বেন গোরিয়ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এরপর বর্তমান অস্থিরতার কারণগুলো বর্ণনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বহুবার নাসের-এর অশুভ ইচ্ছায় কথা বলেন।

বেন গোরিয়ন তাঁর আলোচনায় শান্তির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এ জন্য অন্য পক্ষেরও প্রস্তুত থাকার প্রয়োজন। নাসের যে শান্তি চায় না এর প্রমাণস্বরূপ তিনি বাগদাদ মৈত্রী জোটের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড আক্রমণের কথা তুলে ধরেন। এ মৈত্রী তো পশ্চিমাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই হচ্ছে। আমি তাঁকে নাসের-এর আশঙ্কার বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দিতে চেষ্টা করি। এরপর ইঙ্গিত করি যে, ইসরাইলেরও ভয়ের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বিশেষ করে উভয় পক্ষের শক্তির ভারসাম্য অস্ত্র চুক্তির পর পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ জন্যই আমি উভয় পক্ষের কাছে এ অঙ্গীকার গ্রহণের প্রস্তাব করছি যে, তারা কেউ শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় নিবে না। উভয়ই এ অঙ্গীকার প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার-এর নিকট পেশ করবে। এতে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স গ্যারান্টি দিবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ধরনের প্রস্তাব কি এমন আস্থার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে, যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। তিনি উত্তরে বললেন যে, এটা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের অঙ্গীকার কেবল মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমেই হতে পারে। বেন গোরিয়ন বার বার নাসের-এর ইচ্ছা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, "আমাদের এটা বলা ঠিক নয়

যে, আমরা তার কথা শুনি, কিন্তু সঠিক হচ্ছে যে, আমরা তার কর্মকাণ্ডকে পর্যবেক্ষণ করি।" তিনি আবার জোর দিয়ে বলেন যে, তার কথার সাথে কাজের মিল নিরূপিত হবে দু'দেশের মধ্যকার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তার সম্মতি দিয়ে। এটা জরুরী নয় যে, প্রথম বৈঠকই শীর্ষ পর্যায়ে হতে পারে।

বেন গোরিয়ন বেশ কয়েকবার ইঙ্গিত করেন যে, তিনি আকাশে মিসরের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত। কারণ মিসরী এয়ার বেস থেকে ইসরাইলের শহরগুলো মাত্র ১০ মিনিটের পথ দূরে।

পরদিন এন্ডারসন শারেট-এর সাথে একলা ডিনারে মিলিত হন। এন্ডারসন আমেরিকাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট লেখেন (নথি ৫১৮ আল্‌ফা ডি৫৯) ঃ

শারেট-এর সাথে একান্ত ডিনারে মিলিত হই। তিনি আমাকে নাসের ও যাকারিয়া মহিউদ্দীন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার সাথে কি খোলাখুলি আলাপ করেছেন ? আসলে কি তার মধ্যে মিসরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন ? তাঁরা কি ভাল ইংরেজী বলতে পারেন ? আপনি যে বিষয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা কি তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে ? আমি তাঁকে বললাম যে, উভয়ই ভাল ইংরেজী বলতে পারেন। তবে কখনও কখনও কিছু পরিভাষা বোঝার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁরা উভয়ে আসলেই উন্নয়ন কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আমার কথার মাঝেই শারেট এই কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আমি তাঁকে বললাম, বিভিন্ন সেচ প্রকল্প, সমাজসেবা কেন্দ্র, গ্রামাঞ্চলে পরিষ্কার পানি সরবরাহের প্রকল্প, স্কুল.... ইত্যকার বিষয়।

শারেট আমাকে প্রশ্ন করেন যে, আমি নাসেরকে কোন নিরপেক্ষ দেশে গোপনে মিসর-ইসরাইল বৈঠকের ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছি কিনা, হোক তা শীর্ষ পর্যায় থেকে নিচে ?

আমি বললাম যে, আমি তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিনি। শারেট আমাকে বললেন যে, তিনি এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত যে, ভূমি ও সীমান্ত সমস্যাটাই প্রধান সমস্যা, যা হয়ত পুরো প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে। শারেট আরও বলেন যে, তিনি ভয় করছেন যে, নাসের যে বার বার নাকাবের মাধ্যমে আরব বিশ্বের সাথে স্থল সংযোগের ওপর জোর দিচ্ছেন এর লক্ষ্য হচ্ছে আসলে ইসরাইলকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তারে বাধা দেয়া এবং ঈলাতকে গলাটিপে মেরে ফেলা। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন যে, "আমি যেন নাসের-এর সাথে আগামী সাক্ষাতে এ পয়েন্ট সম্পর্কে নিশ্চিত হই এবং আমি যেন এ বিষয়ে তাঁকে খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করি।

কায়রো ও আল্‌-কুদ্‌সে এন্ডারসনের বৈঠকগুলোর কার্যবিবরণী নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করলে যে বিষয়টি প্রধানত স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে, এন্ডারসনের কাছে

প্রেরিত ডালাসের পত্রের ভাষায় "যুক্তরাষ্ট্র আসলে সে চেষ্টাই করছে যে, নাসেরকে এমন এক অবস্থানে এনে দাঁড় করাবে যা ইসরাইলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়।" তাদের পদ্ধতিটি ছিল সুস্পষ্ট ঃ

* জামাল আব্দুন নাসেরের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে সরাসরি সাক্ষাৎ অথবা পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে বেন গোরিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা করা যায়।

* এই প্রচেষ্টা কেবল মিসরের মধ্যেই সীমিত রাখা। এটা সফল হলে মিসর নিজের গরজেই আরব বিশ্বের যাকে ইচ্ছা বা যারা বিষয়টি গ্রহণ করবে তাদেরকে নিজের দলে টেনে আনতে পারবে।

* এই সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কেবল আলোচনা করা নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার সংলাপই নয়। কারণ ইসরাইল কিছুই ছাড় দিতে রাজি নয়। না ভূমি বিষয়ে, আর না শরণার্থীর ব্যাপারে।

* এসব কিছু বাদ দিলেও মিসরের কাছে আসলে চাইবার বিষয় হলো ইসরাইলের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়া এবং ১৯৪৮ সালে ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত সকল ভূখণ্ড ও সীমারেখাকে মেনে নেয়া।

এন্ডারসন ইসরাইল ত্যাগ করার আগে আগে ডালাস তাঁর কাছে প্রেসিডেন্টের কিছু নির্দেশনা প্রেরণ করেন। এতে ছিল– এখন আপনার প্রথম রাউণ্ড শেষ হলো। আপনি আবার কায়রো ফিরে আপনার দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু করার সময় আপনি প্রথমে নাসেরকে ও পরে বেন গোরিয়নকে বলতে পারেন– প্রথম রাউণ্ড ছিল বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা নেয়া এবং প্রত্যেকের মতামত শোনা।

আমাদের এখন কিছু 'মূলনীতি ঘোষণা' করা দরকার, যার ভিত্তিতে উভয় পক্ষের একটি সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হবে। আপনি বিশেষ করে নাসেরের সঙ্গে মূলনীতি ঘোষণার ব্যাপারে চাপাচাপি করবেন। তাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরা সর্বোচ্চ এক কি দু'মাসের বেশি অপেক্ষা করতে পারব না।

এরপর জন ফস্টার ডালাস এমন একটি প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা করলেন যা মিসরীয় পক্ষের জন্য ছিল একেবারেই অভিনব। তার মত হলো, সহজ হবে যদি যুক্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষের নীতিমালা ঘোষণার প্রস্তাব পেশ করা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে। নইলে প্রতিটি পক্ষ তার চাহিদাকে দূরতম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করারই চেষ্টা চালাবে। কাজেই এর পরিবর্তে সময় বাঁচানোর তাগিদে যুক্তরাষ্ট্র সকল পক্ষের মতামত শোনার পর সে নিজেই আলোচনার নীতিমালা ঘোষণার প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মতামতের জন্য পেশ করবে। এরপর স্বাক্ষর ও ঘোষণার জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুতি নেবে।

যুক্তরাষ্ট্র মিসরের জন্য এবং জামাল আব্দুন নাসেরের স্বাক্ষরের জন্য যে সব কাগজপত্র প্রস্তুত করেছিল তা ছিল তিনটি, যা সরাসরি মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে মীমাংসা সংক্রান্ত ছিল ঃ

* প্রথমত ঃ জামাল আব্দুন নাসেরের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে একটি পত্র লেখা।

* দ্বিতীয়ত ঃ আরব-ইসরাইল সংঘাত নিরসনের ভিত্তি সম্পর্কে প্রস্তাবিত সাধারণ নীতিমালার বিবরণ।

* তৃতীয়ত ঃ জামাল আব্দুন নাসের আন্তর্জাতিক ব্যাংকের (বিশ্বব্যাংক) প্রেসিডেন্টের কাছে প্রস্তাবিত একটি পত্র প্রেরণ করবেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিটি ছিল অদ্ভুত রকমের। আর প্রস্তাবিত শান্তির বিষয়বস্তু ছিল আরেকটু বেশি অদ্ভুত। আল্‌ফা পরিকল্পনা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। এরপর প্রতীয়মান হলো যে এটা তার পরিণতির দিকে সঠিকভাবেই এগুচ্ছে। একটির পর আরেকটি ঘটনা আর প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। যার শেষ ফলশ্রুতি হলো আমেরিকান (পশ্চিমা) এই সিদ্ধান্ত যে, ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সহযোগিতা প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হবে। এর লক্ষ্যবস্তু কেবল বিরাট পানি প্রকল্পই ছিল না বরং এর উদ্দেশ্য ছিল একটি দেশ ও জাতির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে গুড়িয়ে দেয়া। এর প্রতিবাদস্বরূপ এলো সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণের মিসরীয় সিদ্ধান্ত। এর লক্ষ্যবস্তু কেবল একটি বৃহৎ বৈশ্বিক কোম্পানিই ছিল না বরং এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল ইচ্ছা অথবা আকাঙ্ক্ষাকে গুড়িয়ে দেওয়াকে প্রতিহত ও প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা।

॥ ৬ ॥

আইজেনহাওয়ার

"ঐতিহাসিক দিক থেকে আপনাদের অবস্থানকে বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু বাস্তবতার নির্দেশ কিছু আলাদা।"

—প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের প্রতি প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার

১৯৫৬ সালের ৩১ জুলাই তারিখে স্বয়ং আইজেনহাওয়ারের সভাপতিত্বে হোয়াইট হাউসে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী অনুসারে (এটি আইজেনহাওয়ারের অফিসে রক্ষিত ওয়েটম্যান ফাইলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সহকারী জেনারেল গুডবাস্টারের স্বহস্তে লেখা ও তাঁর স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণীতে লেখা আছে) এই বৈঠক সকাল পৌনে দশটার সময় অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সাথে অংশগ্রহণ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'ডালাস', সহকারী মন্ত্রী 'হোফার', ডেপুটি মিনিস্টার রবার্টসন ও আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনীর চীপ অব ওয়ার স্টাফ কমোডর 'ব্যার্ক' এবং সিআইএ পরিচালক 'আলেন ডালাস'। এছাড়াও ছিলেন হোয়াইট হাউসের আইন উপদেষ্টা 'ফেলজার'।

বৈঠকের কার্যবিবরণী ও এর আনুষঙ্গিক নথিপত্র বিশেষ করে চীফ অব জয়েন্ট ওয়ার স্টাফের প্রতিবেদন এবং সিআইএ রিপোর্ট সূত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ চিত্র প্রতীয়মান হয়–

১. মিসর যে ব্যবস্থা নিয়েছে– (সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণ করেছে) তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সম্ভাব্য সকল উপায়ে একে প্রতিহত করতেই হবে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। তবে যদি রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকে, যাতে শক্তি প্রয়োগ কার্যকর ও লক্ষ্যভেদী হয়। যদি এই মিসরী ব্যবস্থাকে সফল হতে দেয়া হয় তাহলে তা গোটা আরব অঞ্চলের স্ট্র্যাটেজিতে প্রভাব ফেলবে। অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী ধারায় বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যেও এমন প্রভাব ফেলবে– যাতে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদসহ নানামুখী গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের জন্য হুমকির সৃষ্টি করবে। তাছাড়া এটা হবে ইসরাইলের ওপর এক ঝুলন্ত বিপদ।

২. এর প্রতিকারের পদ্ধতি চয়নে আমেরিকান সামরিক সংস্থাগুলো হচ্ছে সবচেয়ে চরমপন্থী। র‍্যাডমিরাল 'ব্যার্ক' তাঁর কথা বলার পালা এলে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, নাসেরকে অবশ্যই হতাশ করে তুলতে হবে।

৩. অপরদিকে সিআইএ পরিচালক এলেন ডালাস উপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট তাঁর মতামত সংবলিত সিআইএ রিপোর্ট বিতরণ করেন (জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা রিপোর্ট নথি– এএনআর, এনএএ দ্রঃ)। এতে ছিল–

"নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করার কারণে তার অবস্থান যারপরনাই দৃঢ় হয়েছে। এটা কেবল একজন মিসরী নেতা হিসাবেই নয় বরং মধ্যপ্রাচ্য আরব জাতীয়তাবাদের প্রতীকস্বরূপ। তার শক্তি এখন কেবল মিসরে প্রাপ্ত সমর্থনের সাইজের ওপরই নির্ভরশীল নয় বরং আরবের অভ্যন্তরে এবং বাইরের দুনিয়াতেও তাঁর সমর্থন শনৈ শনৈ শক্তি ও উত্তাপ লাভ করছে।"

৪. আইজেনহাওয়ারের মূল্যায়ন ছিল এ রকম যে, এ অবস্থায় জামাল আব্দুন নাসেরের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করলে আরব ও বহির্বিশ্বে খারাপ পরিণতি বয়ে আনতে পারে। মিসরের প্রতি এখন যে ব্যবস্থা নেয়া দরকার তা সামরিক অপারেশন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এটা করা সহজ ব্যাপার এবং তা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব এবং তা এমন দ্রুততার সাথে, যাতে এই বিপর্যয় ঠেকাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাক গলাবার সময়ও পাবে না। আইজেনহাওয়ারের অভিমত হলো– শক্তি প্রয়োগের পালা আসবে, যখন মঞ্চ প্রস্তুত হবে। শেষ মুহূর্তে শক্তি প্রয়োগ করে তার চারপাশের ইনফেকশনের সব লক্ষণ ফুটে ওঠার পর তা নির্মূল করার জন্য অস্ত্রোপচার করা হবে। ডালাসের মত ছিল, এই ইনফেকশনের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান হচ্ছে সিরিয়া– যে কিনা মিসরে ঘটমান প্রতিটি ঘটনার সাথে প্রাণময়তা ও উচ্ছ্বাসের সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে এবং এর জীবাণু আরব বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়।

৫. জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের প্রতিটি ইঙ্গিত ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি সুস্পষ্টভাবে জানান দেয় যে, উপস্থিত সকলেই সম্যক বুঝেছিল যে, তারা কি নিয়ে আলোচনা করছে। কাজেই কোন কোম্পানিকে জাতীয়করণ করা তাদের মাথাব্যথা ছিল না বরং গোটা এ অঞ্চলকে বিশ্বের মধ্যে পুনর্বিন্যাস করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। আসলে তারা আলোচনা করছিল ঠিক কিভাবে এই 'পবিত্র ও নিষিদ্ধ" বিষয়াদিকে মোকাবিলা করা যায়। কারণ এ ধারণাটি জড়িয়ে আছে উসমানী সাম্রাজ্যের পতনকে ঘিরে এবং তার উত্তরাধিকার ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রবেশ নিয়ে। আরও জড়িয়ে আছে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব দক্ষিণের দু'টি পাঁজর তথা মিসর ও সিরিয়ার অব্যাহত গুরুত্বকে কেন্দ্র করে। তদুপরি রয়েছে ইসরাইল রাষ্ট্রের ধারণা, প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠাকে ঘিরে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সভাপতিত্বে হোয়াইট হাউসে যে বৈঠক হয়; সেই বৈঠকের কার্যবিবরণীতে মধ্যপ্রাচ্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। সেই কার্যবিবরণীতে আরও বলা হয় ঃ আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ও সমৃদ্ধি– যার পুরোভাগে রয়েছে মিসর এবং যে কিনা এই 'পবিত্র ও নিষিদ্ধ' ধারণাকে

সুরক্ষা করছে তাকে ঘিরে। সুরক্ষা করেছে প্রথমত প্রত্যাখ্যান করে, তারপর এই প্রত্যাখ্যানকে সুরক্ষার জন্য লৌহবর্ম ধারণ করে এবং তৃতীয়ত ও শেষতক এই চ্যালেকে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে– আরব ইচ্ছাশক্তি দিয়ে।

এসব ছিল মূল্যায়ন। এর পর এলো এ অবস্থানের জন্য সাধারণ রূপরেখা নির্ধারণের পালা–

১. মিসরের কর্মকাণ্ডের প্রতিহননের জন্য সূচনাটা হবে রাজনৈতিক ও স্নায়ুবিক। ব্যাপক আন্তর্জাতিক শত্রুভাবাপন্ন হামলা আর অর্থনীতিক অবরোধ– যার শুরু হবে বিদেশে মিসরীয় রসদ ফ্রিজ করে এবং এটা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে দুর্ভিক্ষের চেষ্টায়। উদ্দেশ্য, নতজানু করে ফেলা। এতেও যদি প্রশাসনের পতন অথবা তার এ্যাকশনকে স্থবির করে দেয়া না যায় তাহলে সামরিক এ্যাকশন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে অংশগ্রহণ করতে হবে, তবে এর নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা থাকতে হবে যুক্তরাষ্ট্রেরই কব্জায়।

২. যখন মিসরী প্রশাসনের পতন ঘটানো অনিবার্য, ঠিক তখনই ইউরোপীয় ভূমিকাকেও সাইজ করা প্রয়োজন। না হয়, কেবল ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিসরে কাজ করলে, হতে পারে এ দু'টি দেশ আবার তাদের সাবেক সাম্রাজ্যে ফিরে আসতে পারে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে মিসর থেকে তাড়াতেই চেয়েছে। এভাবে এখানকার নীতি ছিল বহুমুখী লক্ষ্যবস্তুর ওপর ঃ "মিসরকে শীঘ্রই হাবিয়া দোজখে পাঠানো এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের চোয়ালের লাগাম টেনে ধরা।"

৩. ইসরাইলকে পুরো প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা ভাল হবে। কারণ এ লড়াইয়ে তার প্রবেশ লড়াইকে সুয়েজ খাল থেকে পেট্রোলের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ সেক্ষেত্রে অনিচ্ছায় হলেও আরব দেশগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে মিসরকে সমর্থনের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

৪. যেহেতু সিরিয়া হচ্ছে প্রাণময়তা ও উচ্ছাসের এক জ্বলন্ত উনুন। কাজেই মিসরের বিরুদ্ধে এ্যাকশন শুরুর সময় সিরিয়াতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দামেস্কের মসনদে এমন শাসককে বসাতে হবে যে হবে আরেকটু বেশি সংরক্ষণবাদী এবং কায়রোর চেয়ে বাগদাদের ঘনিষ্ঠতর। আর এটা সম্ভব।

বস্তুত সুয়েজ সমস্যার প্রতি আমেরিকান নীতি আগাগোড়া বোঝা মুশকিল হবে, যদি না তার প্রধান প্রধান মূল্যায়ন পরিমাপ ও সাধারণ রূপরেখাগুলো বোঝা যায়। এগুলোই তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। এই নিরিখেই বলা যায়, আমেরিকান নীতি ঃ

১. সুয়েজ খাল জাতীয়করণে মিসরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল, এমন কি, 'মঞ্চ বিন্যাসের' পর সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

২. সুয়েজ সমস্যায় প্রতীয়মান হলো যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে তার বিরোধটা আসলে কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে নয়– বরং এটা ছিল নিছক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। কারণ ইউরোপীয় এ মিত্রদ্বয় ঃ

(ক) এ্যাকশনে কেবল চিন্তা করেছে তাদের নিজস্ব হিসাবে, তাদের হারানো বা হারিয়ে যেতে বসা সম্রাজ্য ফিরে পেতে– যার দিকে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসছে।

(খ) তারা উভয়ই তা করেছে পিছন থেকে। তারা নির্ভর করেছিল তাদের চালবাজি আর সময়সূচীকে গোপন রাখার ওপর।

(গ) ইসরাইলও তাদের দু'জনের সাথে জড়িত হলো। অথবা তারাই ইসরাইলের পিছনে জড়িত হলো। কথা একটাই। ফল হচ্ছে, একটি অস্থির অঞ্চলে আরও বেশি অস্থির পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিব্রত করে তোলা– যা তার কাম্য নয়।

সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার একটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যাতে ছিল সুয়েজ ইস্যুতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে একটি উচিত শিক্ষা দেয়া। যার সারবত্তা হলো ঃ

* একলা চলার নীতির জন্য শাস্তি দেয়া।

* সোভিয়েত বিপদের সামনে নাঙ্গা হওয়া ঠিক যতটুকু উন্মোচন করা সমীচীন। যাতে অন্যরা তাদের শক্তি সম্পর্কে বুঝতে পারে। তারপর কোন হুমকি দিতে না দেয়া যাতে সকলের সম্মিলিত শত্রু তার শক্তির সীমা লঙ্ঘন না করে।

৩. মিসরের ব্যাপারে উদ্দেশ্য ছিল– সুয়েজ যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের তার একই পশ্চিমা কৌশল পূর্ণ করা– মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে ব্যবধান রচনা করে দু'দেশের মধ্যে বাধার দেয়াল তুলে রাখা এবং ওই কোণের দু'পাঁজরে তা অব্যাহত রাখা।

দক্ষিণ পাঁজরে অর্থাৎ মিসরকে অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপের মধ্যে রেখে এবং উত্তর পাঁজর অর্থাৎ সিরিয়া অগ্নিঝরা অবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করে তা নিয়ন্ত্রণ করা – হোক না তা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এ পরিস্থিতিতে ইসরাইলের সাথে গোপন চ্যানেল বা কোন রকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ রাখার অবকাশ ছিল না। কারণ "পবিত্র ও নিষিদ্ধ" -এর শক্তি ছিল তখন একবারে তুঙ্গে।

সুয়েজ ছিল এ অঞ্চলে এক ব্যাপক ভূমিকম্পের মতো, যার ছিল ভূমিকম্পের মতো নানা অনুষঙ্গ (ভূমিকম্পের বিস্তারিত তথ্যনির্ভর ঘটনা পাওয়া যাবে মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের 'সুয়েজ নথিপত্র' গ্রন্থে)। সম্ভবত সুয়েজ ভূমিকম্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ছিল সিরিয়াতে বিরাজমান। উত্তুঙ্গ উত্তেজনার আরও প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি। যার কারণে সে মিসরের সাথে পূর্ণমাত্রায় ঐক্যসূত্রে মিশে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

কিন্তু হঠাৎ করেই ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে উভয় পাঁজর আবার মিলিত হলো। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্বস্থিত সিরীয় পাঁজর আর উত্তর-পশ্চিম উপকূলের মিসরী পাঁজর। তবে এ মিলন স্থলভাগের কোন উন্মুক্ত সংযোগ সেতুর মাধ্যমে ছিল না। বরং অভিন্ন রাজনৈতিক ইচ্ছাকে ধারণ করেই এই ঝুলন্ত সেতু স্থাপিত হয়। এর মূল অনুপ্রেরণাটি এসেছে এমন একটি চেতনা অথবা অবচেতন অনুভূতি থেকে যা সেই দুর্দান্ত 'পবিত্র ও নিষিদ্ধ'-এর কার্যকারণ থেকে উৎসারিত। এই "পবিত্র ও নিষিদ্ধ"-এর প্রভাবাধীন কেবল আরব বিশ্বই ছিল না। বস্তুত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সেই পরিমণ্ডলে বিশ্বাস ও সংস্কারের এ ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সাধারণ পরিচিত বিষয়। বরং এটি ছিল স্নায়ুযুদ্ধ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কারণ গোটা যুগটিই ছিল প্রত্যাখ্যান আর বিরাট নেতিবাচক পরিস্থিতির যুগ। তবে হ্যাঁ, এসব সংস্কার ও বিশ্বাসে সুপ্ত বৈষয়িক বস্তুনিষ্ঠার পরিমাণের তারতম্যে এর মধ্যেও তারতম্য ঘটেছে বৈকি।

যুক্তরাষ্ট্র চীন প্রজাতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করত এবং তাকে স্বীকৃতি দিত না। সে মনে করত যে, আসল চীন সে মহাদেশটি নয় সেখানে ১০০০ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে, বরং সেটা হচ্ছে চীন সাগরের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ– যার নাম ফরমুজা থেকে পরিবর্তন করে তাইওয়ান রাখা হয়েছে, সেখানে ২০ মিলিয়ন চীনা বাস করে। অর্থাৎ চীনের সাথে যার লোকসংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ১ ঃ ৫০। আর জমির অনুপাত হচ্ছে ১ ঃ ২৬৬।

* এদিকে গোটা আফ্রিকা মহাদেশ তার দক্ষিণাঞ্চল দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রত্যাখ্যান করত। অথচ সেটিই ছিল সমগ্র মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী।

* এ সময় জার্মানির এক অর্ধেক অপর অর্ধেককে প্রত্যাখ্যান করত। পশ্চিম জার্মানি হ্যালেস্টাইন' (জার্মানির পররাষ্ট্র সচিব)-এর নীতি গ্রহণ করে। আর এর ভিত্তিতেই সে বিশ্বের যে কোন দেশ পূর্ব জার্মানিকে স্বীকৃতি দিলে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করত।

* উত্তর কোরিয়া প্রত্যাখ্যান করে দক্ষিণ কোরিয়াকে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম অস্বীকার করে উত্তর ভিয়েতনামকে।

* যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে প্রায় অস্বীকারই করত। এ দেশটিকেই ইতোপূর্বে আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন স্থল টুকরো বিবেচনা করা হতো। এটি তা থেকে অদূরেই সম্মুখ সাগরের মাঝখানে অবস্থিত।

যখন আইজেনহাওয়ার ও জামাল আব্দুন নাসের এই প্রথম ও শেষবারের মতো– ১৯৬০-এর সেপ্টেম্বরে– সামনাসামনি বৈঠকে বসলেন তখন আলোচনাকালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেন– "তিনি ও তাঁর প্রেসিডেন্সি প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে। এ

সময় তিনি আরব-ইসরাইল সংঘাতের মধ্যে প্রবেশ করতে চান না। তিনি বিষয়টি আগামী প্রেসিডেন্ট হিসাবে কেনেডি বা নিক্সনের জন্য ছেড়ে যাচ্ছেন।"

কিন্তু আব্দুন নাসের ও অন্য আরব নেতৃবৃন্দের প্রতি তাঁর প্রশ্ন ছিল ঃ "ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মতো একটি বাস্তবতাকে তাঁরা কিভাবে অস্বীকার করেন ?"

"জামাল আব্দুন নাসের" সহজেই এর উত্তর দেন– যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিভাবে গণচীনকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়, অথচ এ দেশটি পৃথিবীর মধ্যে লোকসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। জামাল আব্দুন নাসের আরও বলেন যে, এতদসত্ত্বেও চীন যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে ও থাকবে। এর জনগণ তাদের জায়গাতেই আছে, তার সীমান্তও নির্ধারিত রয়েছে। অথচ ফিলিস্তিনের বেলায় তার অধিবাসীদের স্বদেশ থেকে মূলোৎপাটন করে সে ভূমিকে জবরদখল করেছে এমন কিছু ভিনদেশী উজবুক লোকজন যারা কেবল শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ইউরোপ থেকে এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তারা সব কিছুই গ্রাস করে নিয়ে এ ভূখণ্ডের মূল অধিবাসীদের এমনকি তাদের অস্তিত্বের অধিকারকেও অস্বীকার করেছে।" আইজেনহাওয়ার বলেন, "ইতিহাসের দিক থেকে তো আমি আপনাদের অবস্থান বুঝতে পারছি, কিন্তু বিদ্যমান বাস্তবতার নির্দেশ কিছু আলাদা।" উত্তরে জামাল আব্দুন নাসের আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "চীন হচ্ছে এক বিদ্যমান বাস্তবতা। বরং সেটি তো প্রকৃত ও আদি বাস্তবতা।"

আলোচনা কোন সন্তোষজনক পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। কিন্তু এ আলোচনা ছিল সে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিরাজমান পরিস্থিতি এবং এর কার্যকারণ ও নির্দেশের এক উল্লেখযোগ্য ভাষ্য!

তৃতীয় অধ্যায়

প্রচলিত-অপ্রচলিত অস্ত্র

॥ ১ ॥

কেনেডি

"নাসের কমিউনিস্ট নয় .... কিন্তু তিনি ইসরাইলের জন্য তার চেয়েও ভয়ঙ্কর।"
—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির প্রতি বেন গোরিয়ন

১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে জন কেনেডি ডেমোক্রেটিক দলের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন। রিপাবলিকান দলের রিচার্ড নিক্সন এ ভোটযুদ্ধে তাঁর কাছে পরাজিত হলেন। কেনেডি যখন ২০ জানুয়ারি ১৯৬১-তে হোয়াইট হাউসে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন, তখন যে কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের মতোই তার দু'টি দায়িত্ব ছিল ঃ

প্রথমত ঃ সরকারে তার মন্ত্রীদের আর হোয়াইট হাউসে তার উপদেষ্টাদের নির্বাচন করা।

দ্বিতীয়ত ঃ তার পূর্বসূরি– আইজেনহাওয়ারের স্টাফদের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান নীতির ছবিগুলো গ্রহণ করা– বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতি ও আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা বিষয় দু'টি সম্পর্কে।

১৯৬০ সালের ১৭ নভেম্বর সিআইএ পরিচালক আলেন ডালাস নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের সাথে এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেন। তিনি তাঁর এজেন্সির দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পর্শকাতর সমস্যাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করছিলেন। মধ্যপ্রাচ্য এবং এর ঘটনাবলীই ছিল নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট-এর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এবং এ বিষয়ে দীর্ঘ সময় নেন। মনে হলো তিনি পবিত্র ভূমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। আলেন ডালাস তাঁর জানা সব ফিরিস্তি দিলেন। তিনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এজেন্সির যাবতীয় গোপন কাজগপত্রসহ একটি সম্পূর্ণ ফাইল তিনি তাঁকে দেবেন। কিন্তু আলেন ডালাস একটি বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর মনে হলো বিষয়টি নতুন প্রেসিডেন্টের অবগতিতে আনা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটিই হবে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও জটিল। আলেন ডালাস যে বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা হচ্ছে 'ডেমোনা'। ডালাস তা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন ম্যাক জর্জ ব্যান্ডে, কেনেডির নির্বাচিত জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা-এর লেখা অনুযায়ী, তিনি সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন– কিভাবে ইসরাইল এই উপাদানটি লাভ করে। এর শক্তি ছিল ২৪ মেগাওয়াট। কিভাবে সুয়েজ লড়াইয়ের পরিণতির পর ফরাসী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ইসরাইলকে চূড়ান্ত নিরাপত্তার

উপায়-উপকরণ দেবে। তা ছিল পরমাণু স্থাপনা, যা এ উপাদানটি উৎপাদন করবে। এটা হবে তার নিরাপত্তার প্রতি হুমকির চিন্তা থেকে শক্রদের সাবধান করে দেয়ার এক মোক্ষম অস্ত্র। কেনেডি তাকে এ অঞ্চলে শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন সিআইএ পরিচালকের উত্তর ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র আইজেনহাওয়ারের আমলে যথেষ্ট সিরিয়াসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল কিন্তু শান্তি প্রমাণ করল যে, সে আসলে 'লুকোচোর'। কারণ আরব কেবল এমন মূল্যেই এতে প্রস্তুত যাকে ইসরাইল মনে করে অকল্পনীয়। এদিকে ইসরাইলও তার কাঙ্ক্ষিত মানচিত্র আজও পূর্ণ করেনি। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির চেয়ে যুদ্ধের আশঙ্কাই বেশি। এর পর ডালাস বলেন যে, ভয়ের বিষয় হলো– এ অঞ্চলটি এমন পরমাণু প্রতিযোগিতায় নামার বেশি বাকি নেই, যা সে অঞ্চলসহ গোটা পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ। ডালাস তাঁর কথা শেষ করেন এ বলে যে, তাদের কাছে এ তথ্য রয়েছে যে মিসর হচ্ছে আরেকটি দেশ যার পরমাণু কর্মসূচী রয়েছে। সে যদিও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এজেন্সির মূল্যায়নে এদিক থেকে ইসরাইল ২৪ মেগাওয়াট ডেমোনা নিয়ে এগিয়ে আছে।

মিসরের হাতে কেবল দুই মেগাওয়াটের একটি মাত্র স্থাপনা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে, সে এর চেয়েও বড় অস্ত্র লাভের চেষ্টায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দেন-দরবার চালিয়ে যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে পরমাণু অস্ত্র ও এর সম্ভাব্য পরিণতি সে সব কারণগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ফলশ্রুতিতে জন কেনেডি আরব-ইসরাইল সঙ্কট নিরসনে তাঁর সেই প্রখ্যাত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি অন্য সকল আমেরিকান প্রেসিডেন্টের মতো তার মনেও জেগেছিল যে, সনাতন ধীশক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের জন্য পবিত্র ভূমিতে শান্তি স্থাপনের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে অথবা নিদেনপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে– এমনকি এ লড়াইয়ের পর, যদি আদৌ কোন দিন তা শেষ হয়– ন্যূনপক্ষে আমেরিকান শান্তির জন্য এ অঞ্চলকে প্রস্তুত করতে হবে; ১৯৬১-এর মে মাসে– অর্থাৎ হোয়াইট হাউসে ঢুকার ৪ মাসেরও কম সময় পরেই জন কেনেডি তৎকালীন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গোরিয়ন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের-এর নিকট আরব-ইসরাইলের সন্ধি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী যোগাযোগের সূচনা করে পত্র লেখেন। এরপর কেনেডি জামাল আব্দুন নাসের অনুরূপ আরও কিছু আরব রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে পত্র লেখেন।

কেনেডির পত্রটি কায়রোতে গুরুত্বের সাথে পাঠ করা হয়। এর জবাবে জামাল আব্দুন নাসের ফিলিস্তিন সঙ্কটের বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে চিঠি দেন। কিন্তু কায়রোতে কেউই এ ব্যাপারে সচেতন ছিল না যে, আসলে কোন্ কারণে কেনেডি

তাঁর দায়িত্বলাভের এত কম সময়ে মধ্যে আরব-ইসরাইল সঙ্কট নিরসনের উদ্যোগ নিচ্ছেন। কায়রো ভাবছিল ফিলিস্তিন সঙ্কটের কথা আর কেনেডি ভাবছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সমস্যা ও পরিণতির কথা।

ডেভিড বেন গোরিয়ন একটি উত্তর লিখে কেনেডির নিকট পাঠান। এর পরপরই তিনি কেনেডির সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী লবির সূত্রে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, কেনেডির উদ্যোগের আসল কারণ কি ছিল। আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ও ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার বৈঠকের কার্যবিবরণী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রাচ্য বিষয়ক সহকারী মিস্টার ফিলিপস ট্যালবট যেভাবে লিপিবদ্ধ করেন তা ছিল নিম্নরূপ।

আলোচনা স্মারক

বিষয় ঃ প্রেসিডেন্ট কেনেডির সাথে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গোরিয়নের বৈঠক। তাং ৩০ মে. ১৯৬১।

স্থান ঃ নিউইয়র্ক-এর ওয়ালডর্ফ অষ্ট্রোরিয়া হোটেলের প্রধান উইং। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন ঃ প্রেসিডেন্ট (জন কেনেডি), ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গোরিয়ন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত মিস্টার আব্রাহাম হারম্যান, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রাচ্য বিষয়ক সহকারী মিস্টার ফিলিপস ট্যালবট ও প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত উপ-উপদেষ্টা মিস্টার মায়ের ফিল্ডম্যান। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়ন পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সাক্ষাতে খুশি হয়েছেন জানানোর পর মিস্টার বেন গোরিয়ন এক লাফে সরাসরি ডেমোনা ও একে ঘিরে ইসরাইলী পারমাণবিক স্থাপনা বিষয়ে চলে গেলেন। প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তিনি এ কথা জেনে খুশি হয়েছেন যে ঐ স্থাপনা সম্প্রতি দু'জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ পরিদর্শন করেছেন। তিনি তাঁদের রিপোর্ট পড়ে দেখেছেন। রিপোর্টগুলো ছিল বেশ ভাল। কিন্তু এ স্থাপনা এখনও নির্মাণাধীন এবং এর ক্ষমতা এখনও সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। যেহেতু আপনাদের পড়শী কিছু দেশে এ নিয়ে উত্তেজনা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে যে, ইসরাইল বেশ বড়সড় স্থাপনা নির্মাণ করছে যা প্লুটোনিয়াম উৎপাদনে সক্ষম। এ জন্যই প্রেসিডেন্টের মত হচ্ছে, এ দর্শনের ভিত্তিতে এসব স্থাপনার বিষয়টি উন্মুক্ত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে, "কোন মহিলার জন্য এটাই যথেষ্ট নয় যে তিনি অন্তর্গতভাবে বিদুষী বরং তাঁর বাহ্যিক অবয়বেও সে রকমভাব প্রকাশমান থাকতে হবে।" কাজেই তাঁর অভিমত হচ্ছে– ডেমোনা স্থাপনার মহত্ত্ব বাস্তবে প্রমাণের উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে– ইসরাইলের শান্তিপুর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ নিরসনের লক্ষ্যে এসব স্থাপনার ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য হাতে থাকা চাই।

প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়ন বলেন– তিনি ইসরাইলের সাধারণ সমস্যাগুলোর প্রেক্ষাপটে এসব স্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করতে চান। বেন গোরিয়ন বিস্তারিতভাবে বলেন যে, "এসব দুর্লঙ্ঘ সমস্যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে– ইসরাইলে পরিষ্কার পানির ঘাটতি। এমন কি জর্ডানের সকল প্রকল্পের সমুদয় পানি লাভ করার পরও ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ নাকাব পর্যাপ্ত পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে। এ কারণে ইসরাইল সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জটির সম্মুখীন তা হচ্ছে সাগরের পানিকে মিঠা পানিতে পরিণত করার কাজ। এ কাজটি প্রযুক্তির দিক থেকে যেমন কঠিন প্রক্রিয়া আর্থিকভাবেও ব্যয়বহুল। ইসরাইল আশা করছে, পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারবে।

যদিও পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প এখন ব্যয়বহুল, তবে অচিরেই এই প্রকল্প ব্যয় সাশ্রয়ী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক-এর সাথে আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইংল্যাণ্ডের কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞের সাথেও আলাপ করেন। ইসরাইল তাদের সকলের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো, পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করা। বস্তুত ডেমোনা স্থাপনার এটাই আসল উদ্দেশ্য। এটা ফ্রান্স ইসরাইলকে সাহায্যস্বরূপ দিয়েছে। যদিও ফ্রান্সসহ সবাই তাঁকে সুয়েজের পর ছেড়ে গিয়েছিল।

বেন গোরিয়ন বলেন যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে সাগরের পানি মিঠা করার জন্য শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, "আমরা এখনই এমন কোন আন্দাজ করতে পারি না যে ভবিষ্যতে তিন কি চার বছর পর কি ঘটবে। হয়ত প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের জন্য আমাদেরকে কিছু কারখানা বাড়াতেও হতে পারে।" প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়ন এরপর মধ্যপ্রাচ্যে পরমাণু শক্তি প্রবেশের কৌশলগত সম্ভাবনার বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন এখনই মিসরকে পারমাণবিক সক্ষমতা দিতে চায়, এটা তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে তাঁর বিশ্বাস, বছর দশকের মধ্যে মিসর এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যাবে যখন তারা নিজেরাই এ লক্ষ্য অর্জনের সক্ষম হতে পারে।"

প্রেসিডেন্ট এসব শোনার পর মন্তব্য করেন যে, "তিনি প্রধানমন্ত্রীর মূল্যায়নের সাথে একমত। কিন্তু তিনি নিজে যা বললেন তার অর্থ দাঁড়ায় যে, আমরা নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারাই মধ্যপ্রাচ্যে পারমাণবিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করছি।" তিনি আরও বলেন, এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সম্পূর্ণ ইসরাইল ও উভয়ের যৌথ স্বার্থের সাথে জড়িত। যদি ইসরাইল তার আচরণের মাধ্যমে এ অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসারে সাহায্য করে তাহলে এটা নিশ্চিত যে, "সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র কখনও এ ক্ষেত্রে

ইসরাইলকে এ সুযোগ দেবে না যে তাকে ছাড়িয়ে যাবে।" প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন রাখলেন যে, আরব রাষ্ট্রগুলো ডেমোনা স্থাপনা পরিদর্শনকারী আমেরিকান বিশেষজ্ঞদ্বয়ের রিপোর্ট সম্পর্কে আদৌ জানতে পেরেছে ? এরপর তিনি বলেন– "আমাদের যৌথ স্বার্থের– আরবদের কাছে কিছু হলেও বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যাতে তারা অন্ধকারে থেকে পারমাণবিক প্রতিযোগিতায় পড়িমরি করে না দৌড়ায়।"

প্রধানমন্ত্রী এর উত্তরে বলেন– "এ রিপোর্ট সম্পর্কে আপনাদের যা ইচ্ছা করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। যদি মনে করেন এটা প্রকাশ করার প্রয়োজন রয়েছে তাহলে আমরা কখনও আপত্তি করব না।" প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়নের বক্তব্য শোনার পর প্রেসিডেন্ট তাঁর মূল্যায়ন ব্যক্ত করে আবার বলেন– "আপনি জানেন যে, ইসরাইলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে আরব বিশ্বের কাছে যুক্তরাষ্ট্র এমনিতেই সন্দেহভাজন।" এর পর প্রেসিডেন্ট একটি প্রস্তাব রাখেন যে, আরবদের কাছে কিছুটা বেশি আস্থার কারণ হবে যদি এসব স্থাপনা কিছু নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ দ্বারা করা যায়। মিস্টার বেন গোরিয়ন প্রশ্ন তোলেন যে, "আজকাল আর কেউ নিরপেক্ষ নেই।" প্রেসিডেন্ট তাঁকে বলেন– "আপনি তো ক্রুশ্চেভের মতোই কথা বললেন; তিনি বলে থাকেন একজনও নিরপেক্ষ লোক নেই। এ সত্ত্বেও আমি এর বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করি। কিছু লোক আছেন যাঁরা নিরপেক্ষ হতে পারেন, যেমন– স্ক্যান্ডেনেভিয়া (সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক) ও সুইজারল্যাণ্ডের মতো দেশের বিশেষজ্ঞ। তিনি আশা করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদের মতো লোকেরা ডেমোনা স্থাপনাগুলো পরিদর্শন করতে পারবেন।"

প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়ন এবার ইসরাইলের নিরাপত্তার বিষয়ে চলে গেলেন। কত ও কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন তা উল্লেখ করলেন। তিনি ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অস্ত্রসজ্জার মধ্যে একটি তুলনামূলক বিবরণ দিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, একটি গ্যাপ বিদ্যামান রয়েছে। এ গ্যাপটি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে একথা স্বীকার করেও তিনি এটা ভুলতে পারেন না যে, নাসেরের ঘোষিত লক্ষ্য হলো ইসরাইলকে ধ্বংস করে দেয়া কেবল পরাজিত করা নয়। যদি আরবরা এই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে তারা ইহুদীদের সাথে হিটলারের চেয়েও জঘন্য আচরণ করবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়ন প্রেসিডেন্টকে বলেন– "আপনি কয়েকদিন পরই ক্রুশ্চেভের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন। এ সময় আমাদের জন্য একটা সান্ত্বনা হবে যদি আপনারা উভয়ই বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সীমান্তের গ্যারান্টি দিয়ে অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।" প্রেসিডেন্ট তাকে বলেন– এ বিষয়ে তিনি ক্রুশ্চেভকে আঠা লাগাবার চেষ্টা করবেন। যদিও সন্দেহ হয় যে, তিনি তা করতে রাজি হবেন কিনা। কারণ এটা নাসেরকে ক্ষেপিয়ে দেবে। এ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট সরাসরি বেন গোরিয়নকে প্রশ্ন করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের

সাথে নাসেরের সম্পর্ক কেমন ? বেন গোরিয়ন উত্তর দিলেন– উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে নাসের কমিউনিস্ট নয়। এতদসত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন আফ্রিকাতে প্রবেশের জন্য তার সাথে এ সম্পর্ককে ব্যবহার করবে।

আফ্রিকায় নাসেরের বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। সে ওখানকার নতুন নেতাদের সাথে প্রাণপণে কাজ করে যাচ্ছে। ওই সব নেতা যাঁদের মধ্যে সেকেতুরেও রয়েছেন, তাঁরা কমিউনিস্ট নন। তবে কথা থেকে যায় যে, নাসের সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে আফ্রিকার দুয়ার খুলে দিচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট মধ্যপ্রাচ্যে আরব ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন রাখলেন– উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য গঠিত জাতিসংঘের কমিটির কাজ কতদূর পৌঁছল; তিনি এটাও মন্তব্য করলেন যে, এই কমিটি তাদের কাজের রিপোর্ট ১৯৬১ সালের শরতেই দেয়ার কথা। প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বেন গেরিয়নের নীতিগত অনুভূতি জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বেন গোরিয়ন জবাব দিলেন যে– প্রেসিডেন্টের জানা প্রয়োজন যে, এ বিষয়টিকে তাঁর পূর্বসূরি জেনারেল আইজেনহাওয়ার– সেই ১৯৫৩ সাল থেকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছিলেন। এ ছাড়া ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে মিস্টার এন্ডারসন প্রচলিত পর্যায় থেকে উচ্চতর প্রতিনিধি হিসাবে আরব ও ইসরাইলের মধ্যে যোগাযোগের দায়িত্বে ছিলেন। প্রথম দিকে নাসের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেও যখন দেখলেন যে, এ বিষয়ে ইসরাইল বেশ সিরিয়াস, তখনই তাঁর মত পরিবর্তন করে ফেললেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন– মধ্যপ্রাচ্যের সব বিষয়ই নাসেরের ওপর নির্ভরশীল। প্রেসিডেন্ট এ পর্যায়ে মন্তব্য করলেন যে, মনে হয় নাসের আমাদের সকলের জীবনকে কঠিন করে তুলবে। প্রধানমন্ত্রী এটাকে সমর্থন করে বলেন– তবে যদি আমরা শান্তির জন্য সম্ভব সবচেয়ে বড় চাপ প্রয়োগ করি, তাহলেই রক্ষা। প্রেসিডেন্ট তাঁকে প্রশ্ন করলেন– তাঁর ওপর প্রভাব ফেলার মতো কেউ কি আছে ? যেমন নেহেরু ? বেন গোরিয়ন উত্তরে বললেন– "আমার মতে এ বিষয়ে নেহরুর ভূমিকা রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। শান্তির জন্য চেষ্টা করে যাবার ক্ষমতা তাঁর আছে কিন্তু তিনি তা করবেন না।" আরও বলেন– "নেহেরুর মতো লোকের ওপর আমি নির্দেশ করতে পারি না। তিনি এক মহান ব্যক্তি, আমি তাঁর ভক্ত। ভারতে গণতন্ত্র রয়েছে, জানি না নেহেরু চলে গেলে সেখানে কি ঘটে। কিন্তু নেহেরু মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে কিছু করতে চান না।"

প্রেসিডেন্ট এবার প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়নকে জিজ্ঞাসা করেন যে, শরণার্থী সমস্যাটিকে সমাধানের ব্যাপারে তাঁর ভাবনা-চিন্তা কি ? বেন গোরিয়ন জবাব দিলেন যে, আসলে শরণার্থী সমস্যা বলে কিছু নেই। এটাকে ইস্যু করে আরবরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায়। সাক্ষাতের শেষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী ল্যাটিন ভাষায় লেখা একটি

ভলিউম বের করেন, যা ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে গ্রন্থকার "রাডযিফাইলী" পবিত্র ভূমিতে সফরের কিস্‌সা বর্ণনা করেন। তিনি হচ্ছেন প্রিন্স রাডজ ওয়েল' -এর প্রপিতামহ। তিনি প্রেসিডেন্টের স্ত্রী জ্যাকলিন কেনেডির বোনকে বিয়ে করেন। প্রেসিডেন্ট ধন্যবাদের সাথে এ উপঢৌকন গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, তিনি আগামী সপ্তাহে লণ্ডনে রাডজ ওয়েল-এর নতুন পুত্রকে বরণের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুমতি নেন যে, এই খণ্ডটি তিনি নবজাত শিশুকে উপহার দিতে চাচ্ছেন। তিনি অচিরেই যার আধ্যাত্মিক পিতা হতে যাচ্ছেন।

ডেভিড বেন গোরিয়ন ইচ্ছাকৃতভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। কারণ তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে ১৯৫৬ সালে সুয়েজ বিষয়ে মিসরের ওপর ত্রিমুখী হামলা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর তিনি কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইসরাইল আর সনাতন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তার চূড়ান্ত নিরাপত্তা বিধানের ওপর নির্ভর করতে পারছে না, এমনকি আন্তর্জাতিক মৈত্রী জোটের ওপরও নয়। তার স্বতন্ত্র পারমাণবিক শক্তি থাকা অনিবার্য, যার ইঙ্গিত করে সে ভয় দেখাতে পারবে এবং যদি তার চারপাশে তার অস্তিত্বের ওপর হুমকি সৃষ্টিকারী বিপদ ঘিরে আসে, তখন কার্যত ব্যবহারও করতে পারবে।

ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির এক সভার কার্যবিবরণী– যাতে ১৯৫৭-এর জানুয়ারিতে আণবিক শক্তি কমিটির চেয়ারম্যান ড. আর্নেস্ট বার্গম্যান উপস্থিত ছিলেন। এতে বেন গোরিয়নের কথা নথিভুক্ত করা হয় ঃ "আমি জানি না আমাদের পারমাণবিক কর্মসূচী নিয়ে আমরা কতদূর পৌঁছতে পারি। তবে আমি আজই বলে দিতে পারি যে, দিন আসছে যখন এখনকার পরিস্থিতিতে বিদ্যমান ভূমি অবস্থানের ভিত্তিতেই ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি করতে তার শত্রুরা বাধ্য হবে। তখন সে সব শত্রুর এ ক্ষমতা থাকবে না যে ইসরাইলের ওপর কোন শর্ত আরোপের আলোচনাটুকু করে। কারণ তখন তারা জানবে যে, তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে।"

হয়ত কেনেডি বেন গোরিয়নের সাথে আলোচনার সময় ইসরাইলী পারমাণবিক কর্মসূচীর শান্তিপূর্ণ ধরনের ওপর তাঁর জোর দেয়াকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কেনেডিও জানতেন না যে, সিআইএ'র অপারেশন কার্যালয় এবং তার তৎকালীন প্রধান 'মিঃ জেমস্ এ্যাঙ্গেলটন' সে সময় ডেমোনা স্থাপনার শক্তির সাথে নতুন পারমাণবিক শক্তি স্থাপনা ইসরাইলকে সরবরাহ করার লক্ষ্যে ইসরাইলী গোয়েন্দাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট যে তা জানতেন না তা তাঁর আচরণ ও তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভাগুলোর কার্যবিবরণীর ভাষ্য থেকে বোঝা যায়।

এ অঞ্চলে শান্তি স্থাপনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেও প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির প্রচেষ্টা কোন ফল লাভ করেনি। অথচ তিনি চেষ্টা করেছেন এবং প্রায় সময় খুব আন্তরিকভাবেই। কারণ ১৯৬০-৬৩–এ দু'বছরের মাঝখানের ঐতিহাসিক সময়খণ্ডটি ছিল বিভিন্ন অবকাশের সম্ভাবনাময় সময়কাল। এতে বৈশ্বিক ঐকমত্যের অবকাশও ছিল, অথবা ন্যূনতম পক্ষে আন্তর্জাতিক সংঘাত পরিবর্তিত হয়ে এক ধরনের শান্তিকামী প্রতিযোগিতায় রূপ নিতে পারত; যেমন– সুখ-সমৃদ্ধি, মহাকাশ অভিযান, তৃতীয় বিশ্বকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং সে সময় যাকে বলা হতো– সম্ভবত আশা প্রকাশ করে– "নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা।"

সে এক সময় ছিল যখন বিশ্বের শীর্ষ পদগুলো অধিকার করে রেখেছিল জন কেনেডির মাপের পুরুষরা এবং তাঁর প্রশাসনের একদল উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাছাড়া ছিলেন 'নিকিতা ক্রুশ্চেভ'– সেই মানব অবয়ব যা প্রথমবারের মতো সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন পেয়েছিল, শার্ল দ্য গল, কনরাফ আদিনাওয়ার ও উভয়ের ইউরোপীয় ধীশক্তি, বাবা ২৩তম ইউহেন্না– সকল মানুষের প্রতি সমতার ডাক দিয়ে যার তারকা ভাটিকানে উদিত হয়েছিল। উন্নয়নশীল বিশ্বে এমন মাত্রার কিছু ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা স্বদেশ মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ জাতির বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন– ভারতে জওহরলাল নেহেরু, চীনে চৌ এন লাই, আরব বিশ্বে জামাল আব্দুন নাসের, যুগোশ্লাভিয়ায় যোশেফ ব্রুজ টিটো। এরপর আফ্রিকার নতুন প্রজন্ম নেতৃত্বে আসছিল– ঘানায় এ্যাংক্রোমা,গিনিতে সেকেতুরে, মালিতে মোদিবুকিতা, আলজিরিয়ায় বেন বেল্লা, তানজানিয়ায় জুলিয়াস নেরেরি, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন নেলসন ম্যাণ্ডেলার নামও শোনা যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গোটা যুগটাই বিপর্যয়ে ভেঙ্গে পড়ে। আততায়ীর হাতে কেনেডি নিহত হওয়া ছিল এই বিপর্যয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলামত।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির অবনতি কোন এক ব্যক্তির জীবনাবসানের কারণে ছিল না– কারণ কোন লোক যতই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোক না কেন, তাঁর সম্পর্কে মতের ভিন্নতা থাকেই বরং ভেঙ্গে পড়েছিল এ জন্য যে, গুপ্ত হত্যা প্রক্রিয়াটি আমেরিকান সমাজের বক্ষে বিভিন্ন দোষ-ক্রটি ও বুম্রজালের নানান কারণ উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। কেনেডি নিহত হওয়ার কয়েক মাস পরই ক্রুশ্চেভ ক্রেমলিনের সেই সনাতন ধারায় এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন। একই সময় আফ্রিকাতেও পশ্চাদ্ধাবনের আলামত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর এই পিঠটান দেয়া বিশ্বময় এক সাধারণ চিত্রে পরিণত হয়। এর প্রভাবের সবচেয়ে বীভৎস চিত্র প্রকাশ পায়। ভিয়েতনামে এবং সেই যুদ্ধে যা দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে। ভিয়েতনামে আমেরিকার জড়িত হওয়া শুরু হয় সেই কেনেডির যুগেই। কেনেডির পর এই জড়িত হওয়া ভয়াবহ পর্যায়ে উঠে যায়।

॥ ২ ॥

জনসন

"মিসর ১৫০ মেগাওয়াট শক্তির পারমাণবিক স্থাপনা নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সাইজের স্থাপনা দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব।"
—ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের তারবার্তা

২২ নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখে জন কেনেডি নিহত হওয়ার পর তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। যখন জনসন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর ইচ্ছা বা পরিকল্পনায় মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনকারীর ভূমিকা পালনের কোন কিছুই ছিল না। এটা মূলত তাঁর ধাতেই ছিল না।

তাঁর ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ছিল না এ কারণে যে, তিনি কেনেডির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর চেষ্টা-তদ্বির খুব কাছে থেকে অনুসরণ করেছিলেন। তাই তিনি দেখেছেন যে, এটি আসলে অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, মিসর কখনও এটা মেনে নেবে না যে, তার ও প্রাচ্যে অবস্থিত আরব বিশ্বের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হোক। আর ইসরাইল ১৯৪৮ সালে অধিকৃত ভূমির এক বিঘত জমিও ছাড় দিতে কখনও রাজি হবে না। বরং সে উল্টো সম্প্রসারণের গোপন ইচ্ছা পোষণ করছে, বিশেষ করে পশ্চিম তীর ও আল্-কুদ্সে।

তাঁর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তও ছিল না। কারণ. তিনি যেহেতু স্বতন্ত্রভাবে তাঁর নামে প্রেসিডেন্সি লাভ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কেনেডির প্রেসিডেন্সির মেয়াদ পূর্তি হয়নি বলে জনসনের ইহুদী ও জায়নিস্ট দলগুলোর সমর্থন লাভের দরকার ছিল। তিনি তাদের সমর্থন লাভের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন দুর্দিনের পরীক্ষিত বন্ধু। সুয়েজ বিপর্যয়ের সময় তৎকালীন কংগ্রেসে ডেমোক্রেটিক দলের নেতা হিসাবে তিনি আইজেনহাওয়ারের নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এখন তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে আরও জোরালো সমর্থন আশা করেন। কারণ তিনি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি প্রার্থনা করার পাশাপাশি, ভিয়েতনাম যুদ্ধে উত্তরণের কথা ভাবছেন যার মাধ্যমে তিনি সামরিক বিজয় লাভ করে স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথ প্রশস্ত করবেন। যেহেতু ভিয়েতনাম যুদ্ধে নামার নীতির বিরোধিতাকারীদের বড় অংশই হচ্ছে লিবারাল

চিন্তাবিদ ও সাংস্কৃতিক লোকজন। এদের অনেকেই ইসরাইলের সমর্থক ইহুদী। এ প্রেক্ষিতে 'জনসন' অতীতের যে কোন সময় থেকে ইহুদী ও জায়নবাদীদের প্রভাব ও সমর্থন বেশি আশা করেন– চাই তা তাঁর নির্বাচনী প্রচারণার অর্থায়ন হোক অথবা তাদের প্রভাবাধীন টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের আনুকূল্যে ভোটারদের কাছ থেকে বেশি ভোট আদায় করা হোক।

আর তাঁর ধাতে ছিল না, এ জন্য যে জনসন মেজাজের দিক থেকে আমেরিকান নীতি– "রক্তপাতের চেয়ে লাঠি বেশি ব্যবহার"-এর সমর্থক ছিলেন।

এ ছাড়াও আরবদের শক্তি– যা সুয়েজে এবং তারপর চূড়ান্তরূপ লাভ করে– তা এখন আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য সামাজিক মোড় নেয়ার পর এক ধরনের বিহ্বলতা প্রত্যক্ষ করছে। মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার পর এবং ইয়েমেনে মিসরীয় প্রবেশের পর আর আমেরিকান সামরিক সংস্থা ও বৃহৎ পেট্রোল কোম্পানিগুলোর ভিতর ভয় ঢুকে পড়ার পর সবকিছু মিলিয়ে তাঁকে অস্থির করে তোলে যে, আরব উপদ্বীপে মিসরী সামরিক অস্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। এমনকি যদি তা ব্যবসা ক্ষেত্র ও তেলকূপ থেকে দূরে হয় এবং ইয়েমেনের এক দূরবর্তী কোণেও সীমিত থাকে।

তদুপরি যুক্তরাষ্ট্র তখন এ অঞ্চলে প্রবেশরত অপ্রচলিত অস্ত্র প্রতিযোগিতায় খুব বেশি প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিল।

মিসর যখন ধারণা করছিল যে, ইসরাইল অপেক্ষা করতে পারবে না, সে সময় ইসরাইলও চেষ্টা চালাচ্ছিল কিভাবে এ প্রতিযোগিতায় মিসরের অংশগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা যায়। তখন এ অঞ্চলের সাধারণ দৃশ্য দেখে মনে হতো যে, এ বুঝি এমন খরস্রোত ধারায় প্রবহমান যেখানে বিপদের পাড় থেকে, পা ফসকে পড়ে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অপ্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের মিসরী কর্মসূচী ইসরাইলকে গোড়া থেকেই ব্যস্ত রেখেছিল। বাস্তবেও এ বিষয়ে তার গরজ প্রকাশ পেয়েছিল ঐ সব মিসরী বিজ্ঞানী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে পরিচালিত স্নায়ুযুদ্ধ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে যাঁরা ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী ও মিসরী বিমান নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজ করছে। বিশেষ করে জার্মান বিশেষজ্ঞগণের ওপর তাদের শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রও কিছু কম যায়নি। যদিও তার এই গুরুত্ব প্রদানের স্বরূপ ছিল পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ। এমন কি কেনেডির সময় থেকে আমেরিকান দলিল দস্তাবেজ মিসরীয় এই অসনাতন অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হওয়ার দিকটির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট করেই তুলে ধরছে। ৯ জুলাই, ১৯৬৩ তারিখের আমেরিকান দলিল অনুসারে (৪৪৪৫-১৩৮ নং এর অধীন) আমেরিকান বিদেশমন্ত্রী 'বেন রাসেক' কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত-এর কাছে একটি তারবার্তা লিখে পাঠান।

১৯৬৩ সালের ৯ জুলাই মিসরে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের কাছে যে চিঠি পাঠানো হয় তার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

রাষ্ট্রদূতের প্রতি।

যদিও আমরা আশা করি না যে, ২২ জুলাইয়ের বার্ষিক সামরিক প্রদর্শনীতে মিসরীয় ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ে নতুন কিছু প্রকাশ পাবে, তবুও আপনি ও আপনার দূতাবাসের সদস্যগণ যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদেরকে প্রদর্শনীর সময় যা কিছু লক্ষ্য করবেন তা জানাবেন। এতে যেন ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের ব্যাপারে যে কোন অগ্রগতি বা পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। বিষয়টি অতীব জরুরী। এটা ইসরাইলীদের সাথে আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

–রাসেক।

মিসরের অস্ত্র সজ্জিত হওয়ার প্রচেষ্টাকে বিশেষ করে মিসাইলের ক্ষেত্রে জনসনের নেতৃত্বে বেশ কয়েকবার অনুসরণ করা হয়। জনসন কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে জামাল আব্দুন নাসের-এর নিকট একটি পত্র পাঠান। এতে ১৪টি অনুচ্ছেদ ছিল। সব ক'টিকে একটি প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন হুমকির মোড়কে বিন্যাস করা হয়েছিল। এ পত্রের উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদগুলো ছিল এ রকম ঃ

* একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর সম্পর্ক, অপরদিকে তার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর সম্পর্কের মধ্যে যে টানাপোড়েন ও টেনশন দেখা দিয়েছে এর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অস্থিরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

* জর্ডান নদীর পানির গতিপথ পরিবর্তনের আরবী প্রকল্পগুলোর অন্তর্নিহিত হিংসা-দ্বেষের প্রেক্ষিতে ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই তীব্র।

* একটি বিপদ সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে যখন একটি পক্ষ বিরাট সামরিক বিশিষ্টতা অর্জন করে বসে, যার কারণে প্রতিপক্ষ কিছু আগেভাগেই হামলা চালিয়ে বসতে পারে। বিশেষ করে যখন সে অনুভব করে যে তার হাতে যা আছে তা ছোট্ট ও হালকা।

* যখন উভয় পক্ষই কোন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বা অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাসের কোন রকম ব্যবস্থা নেয়ার পথ খুঁজে না পায় তখন আন্তর্জাতিক সমাজের সামনে শান্তি সংরক্ষণের নিমিত্ত এই ভারসাম্যের যে কোন ত্রুটিকে সংশোধন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই নীতিগত ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইসরাইলের নিকট 'হুক' মডেলের মিসাইল বিক্রি করেছে– যাতে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বোমা উৎক্ষেপকগুলোর ভয় ইসরাইলীদের মন থেকে মুছে যায়। এখন, ঠিক এ কারণেই, যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতিরক্ষার জন্য তার কাছে বিভিন্ন রকম ও পরিমাণে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বিক্রির জন্য প্রস্তুত।

* আরবরা যা করছে তার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। যদি আরবরা চায় তাহলে ইসরাইলের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের এ সীমিত অস্ত্র বিক্রিকে বড় ইস্যু বানাতে পারে। এটা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক ব্যাপক জন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ পর্যন্ত যে আত্মসংযমের পরিচয় দিয়ে আসছে তাতে ধস সৃষ্টি করবে।

* যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে তার চেষ্টা চালিয়ে যাবে, যাতে সে তার পারমাণবিক কর্মসূচীকে সমরমুখী না করে। আপনারা জেনে থাকবেন যে, ইতোমধ্যেই আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা ডেমোনা স্থাপনাগুলো পরিদর্শন করে এসেছেন।

* পরিশেষে, প্রেসিডেন্ট জনসন আরব-ইসরাইল সঙ্কটের কারণে আসন্ন বিস্ফোরণের সলতে ছাড়িয়ে নেয়ার সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নাসের ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের যে কোন অভিমতকে স্বাগত জানাবেন।

নাসেরের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবের আলোচনা

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল ইতোমধ্যে জনগণ তার চাহিদা বাড়িয়ে দিল। তিনি আমেরিকান পররাষ্ট্র সচিব ফিলিপ্স ট্যালবটকে মিসরীয় পারমাণবিক কর্মসূচী বিষয়ে জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে আলোচনা করার জন্য কায়রোতে পাঠালেন।

১৮ এপ্রিল, ১৯৬৫ তারিখে ফিলিপ্স ট্যালবট যখন জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি সরকারী রিপোর্ট অনুসারে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির ওপর পরিবীক্ষণ গ্যারান্টির ব্যাপারে জাতিসংঘে উত্থাপিত আয়ারল্যাণ্ডের সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করে শুরু করেন। এরপর তিনি মিসরী পরমাণু প্রকল্পের সীমা ও এর কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রসমূহের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে আশ্বস্ত করার জন্য মিসর কি ধরনের গ্যারান্টি দেবে এ প্রশ্ন তোলেন। ট্যালবট তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের সময় ইঙ্গিত করলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র চায় যেন মিসরী স্থাপনাগুলো পরিদর্শনে তার সুযোগ থাকে। জামাল আব্দুন নাসের উত্তর দিলেন যে, তিনি পরমাণু বিষয়টির ভয়াবহতা দেখতে পাচ্ছেন এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র তার এ ভয়াবহতার মূল্যায়ন থেকেই তার আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি ভিয়েনার শক্তি এজেন্সিতে ঘোষণা করে। যাতে ছিল ঃ

১. যুক্তরাষ্ট্রের পরিদর্শনের অধিকারের বিরোধিতা করবে, যদিও এটাকে পরিদর্শনের সুযোগ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২. সে কেবল আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক এজেন্সিকে জামানত বা গ্যারান্টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অধিকার দেবে, অন্য কাউকে নয়। তবে শর্ত থাকবে যে, এজেন্সি এ কাজটি মিসর ও ইসরাইল উভয় দেশই করবে।

এরপর জামাল আব্দুন নাসের বলেন, মিসরের পারমাণবিক স্থাপনা এতই ছোট যে, এতে কারও অস্থির হওয়ার কারণ নেই। যে বিষয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক

তা হচ্ছে ডেমোনার পারমাণবিক স্থাপনাসমূহ। কারণ এর শক্তি অনশাচে অবস্থিত মিসরের স্থাপনাগুলোর শক্তির দশগুণ। ট্যালবট এবার বললেন যে, প্রেসিডেন্ট জনসন এখন পর্যন্ত তাঁর পাঠানো প্রথম পত্রে উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব প্রেসিডেন্ট নাসেরের কাছ থেকে পাননি। সেখানে তিনি সলতে ছুটিয়ে নেয়া সম্পর্কে তাঁর ভাবনা কি জানতে চেয়েছিলেন। এখনও তিনি সেই প্রশ্নই পুনরায় উত্থাপন করছেন এবং আরব-ইসরাইল সঙ্কট সমাধানে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের চিন্তাধারা শোনার আশা করছেন। জামাল আব্দুন নাসেরও পূর্বের অনুরূপ কিছু প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন যে, এখন তাঁর দুটো মন্তব্য রয়েছে ঃ

প্রথমত, স্পষ্টতই আরব-ইসরাইল সঙ্কটটি মিসরের একার কোন বিষয় নয়। এটা সকল আরবের ইস্যু। এর পুরোভাগে রয়েছে ফিলিস্তিনী জনগণ। কাজেই এ ব্যাপারে এককভাবে মিসরের মতামতের প্রশ্নই ওঠে না। যদি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন ধারণা থাকে তা উত্থাপনের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে। কারণ অতীতে দেখা গেছে, আরবরা তাদের মতামত প্রকাশ করেছিল কিন্তু তারা সব সময় ইসরাইলীদের পীড়াপীড়িরই সম্মুখীন হয়েছিল কোন সমাধানের জন্য নয়, বরং বর্তমান বাস্তবতাকে চাপিয়ে দিতে।

দ্বিতীয়ত, মিসরের সাথে যে বিষয়টি সরাসরি জড়িত তা হচ্ছে অবশিষ্ট আরব অংশের সাথে তার চিরদিনের মতো অব্যাহত বিচ্ছিন্নতাকে কল্পনা করার সমস্যা। ট্যালবট তাঁর রিপোর্টে লেখেন 'আমি আমাদের বৈঠকের শেষ লগ্নে তাঁকে বলেছিলাম যে, তিনি যদি উন্নত অস্ত্র তৈরির চেষ্টা ছেড়ে দেন তা হলে তাঁকে আরেকটি সুবিধা প্রদান করতে প্রস্তুত রয়েছি। আমরা তাঁকে পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে এমন সহযোগিতা করতে প্রস্তুত যা অস্ত্রের ক্ষেত্র থেকে দূরে।

আমি তাঁকে আরও বললাম, আমরা তাঁকে মহাকাশের কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতেও প্রস্তুত। কিন্তু তিনি এসব ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। মনে হলো তিনি আমাদের বিশ্বাস করেন না। যখন আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি আমাদের প্রতি আস্থা কমই রাখেন।' তিনি চটজলদি উত্তর দিলেন– 'এই কম থেকে কিছুটা বাড়াব।' এ বলে তিনি স্মিত হাসি মেলে ধরেন।

এ সকল বিষয় এবং আনুষঙ্গিক অনেক আলোচনা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল, কিন্তু স্বাভাবতই কোন ফলাফলে উপনীত হতে পারেনি। বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র মিসরী পরমাণু কর্মসূচীর ব্যাপারে জামাল আব্দুন নাসেরের কোন উত্তরের অপেক্ষায় ছিল না, বরং তার সকল উপায়-উপকরণ লাগিয়ে দিয়েছিল, যাতে তিনি স্বেচ্ছায় যা বলবেন তার চেয়েও বেশি জানা যায়। ২৯ জুলাই, ১৯৬৪ তারিখে কায়রোর আমেরিকান দূতাবাস

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট একটি তারবার্তা পাঠায় (নং- ২৩০১৬/৩৬৩)। এতে ছিল ঃ কায়রোস্থ দূতাবাসের বিশ্বাস যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র পরমাণু স্থাপনা লাভের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। দূতাবাস সন্দেহ পোষণ করছে যে, এ সময় আণবিক শক্তি এজেন্সি আরোপিত গ্যারান্টির শর্তাদি মেনে নিতে সে (মিসর) আদৌ প্রস্তুত কিনা বা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর সাথে একমত হবে কিনা, অথচ এর ওপরই যুক্তরাষ্ট্র চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। অপরদিকে আমরা বিশ্বাস করি যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এসব স্থাপনা চাচ্ছে কেবল রাজনৈতিক শৌর্য বীর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। মুখ্য উদ্দেশ্য এ নয় যে, পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদন করবে যার মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রয়োজন মেটাবে বা সাগরের পানিকে মিঠা করার কাজে এই শক্তি ব্যবহার করবে।

একই সাথে আমরা এও বিশ্বাস করছি যে, মিসরী প্রকল্পের সামনে অর্থায়নই হবে সবচেয়ে বড় বাধা।

বিরক্তিকর বিষয় হচ্ছে যে, একই সময় যুক্তরাষ্ট্রের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসরাইল আসলে পারমাণবিক অস্ত্র বানাবার খেয়ালেই এসব করছে।

৯ এপ্রিল, ১৯৬৫। ইসরাইলী পরমাণু প্রকল্প সম্পর্কে আমেরিকান দূতাবাস একটি বিস্তারিত রিপোর্ট লেখে (রিপোর্ট নং-৪৭২-ক)। ইসরাইলে নিযুক্ত সিনিয়র আমেরিকান সামরিক উপদেষ্টা ও দূতাবাসের বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই রিপোর্টের গুরুত্বের কারণে এর নির্দেশনা ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। এর শেষের দিকটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

যখন বিভিন্ন পর্যায়ে ইসরাইলী দায়িত্বশীলদেরকে ইসরাইলী পারমাণবিক কর্মসূচী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাদের সকলের জবাব প্রায় একই ছিল। এ বিষয়ে নাসেরকে উদ্বিগ্ন রাখতে পেরে তারা আনন্দিত। তারা এমনভাবে বিষয়টি জাগিয়ে রাখতে চাইত যাতে তাদের অভিপ্রায়ের রহস্যময়তা নাসেরের বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধের একটি অংশ হিসাবে কাজ করে। তারা একই কায়দায় ডেমোনা স্থাপনাকে ঘিরে গোপন ব্যবস্থাদিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করত, কিন্তু যে কোন পর্যবেক্ষকের জন্য এটা ভাবা কঠিন হবে যে, এ পর্যন্ত ডেমোনা স্থাপনার জন্য ইসরাইল যে অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছে তা স্নায়ুযুদ্ধের কোন একটি ধারায় খরচ করতে পারে।

আমাদের কাছে প্রাপ্ত সকল তথ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, ডেমোনা স্থাপনাসমূহ এর ইতিহাস, সামর্থ্য ও দুঃসাধ্য বৈজ্ঞানিক যোগ্যতার সমন্বয়ে কেবল সামরিক উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হওয়া সম্ভব। কারণ এছাড়া তো পুরো প্রকল্পটাই হয়ে যাবে এক ধরনের বাহুল্যমাত্র। ডেমোনা স্থাপনাগুলোতে এখন পর্যন্ত সর্বসাকল্যে যত

অর্থ ব্যয় হয়েছে তা ৬০ মিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি হবে। আমাদের মূল্যায়ন হচ্ছে ইসরাইলী পরমাণু স্থাপনা প্রকল্পে সহকারী ও গবেষকগণ ছাড়াই প্রায় দুই শ' বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী নিয়োজিত রয়েছে। এ প্রকল্পের কাজ কেবল ডেমোনাতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটা ওয়াইজম্যান ও তাখ্‌নিয়ন ইনস্টিটিউট এবং হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামর্থ্যেও যোগান দিচ্ছে।

ডেমোনাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ পরিদর্শক আমাদের কাছে সেখানকার প্রস্তুতিতে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের বিভাগগুলোর বিবরণ দিয়েছেন ঃ

১. একটি বিভাগ রয়েছে কাঁচা ইউরেনিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করার জন্য। এগুলো ইসরাইল অজ্ঞাত উৎস থেকে লাভ করেছে।

২. আরেকটি বিভাগে কাঁচা ইউরেনিয়ামকে পরিষ্কার ইউরেনিয়ামের খানিতে রূপান্তরিত করছে।

৩. আরেকটি বিভাগ রয়েছে ইউরেনিয়ামকে বিভিন্ন পক্রিয়ায় দলিত মথিত করে জ্বালানিতে রূপান্তরিত করার জন্য।

৪. অপর বিভাগে এই জ্বালানিকে রেডিয়েটেড জ্বালানিতে রূপান্তরিত করা হয়।

৫. আরেকটি বিভাগে এই জ্বালানি রশ্মিকে ঠাণ্ডা করা হয়।

৬. অন্য একটি বিভাগে এই জ্বালানি রশ্মি থেকে কিছু অংশ ভেঙ্গে চূর্ণ করা হয়।

৭. এই রঞ্জনরশ্মি-জ্বালানি থেকে প্লুটোনিয়ামকে আলাদা করার জন্য একটি কেমিক্যাল কারখানা রয়েছে।

৮. একটি বিভাগে প্লুটোনিয়ামকে প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

৯. একটি ক্ষেত্র সম্ভবত অস্ত্র পরীক্ষায় জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে; তবে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাটির নিচে অবস্থিত। আমাদের প্রাপ্ত তথ্যাদি ইসরাইলের পরমাণু কর্মসূচীর নিম্নবর্ণিত সময়সূচীকে নিশ্চিত করে ঃ

১৯৬৫– রিএ্যাক্টরগুলোর সাথে যে ফরাসী জ্বালানি এসেছিল তার স্থলে ইসরাইলী জ্বালানিকে স্থলাভিষিক্ত করা এবং কেমিক্যাল বিভাজন কারখানা নির্মাণ শুরু।

১৯৬৬– (মাটির নিচে) পরীক্ষা ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ শুরু।

১৯৬৭– কেমিক্যাল বিভাজন কারখানা চালু।

১৯৬৮– পারমাণবিক অস্ত্র সংযোজন, পরীক্ষা ও বিস্ফোরণ।

দূতাবাস ডেমোনার যে কোন উন্নয়নে তার পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখে যাবে। কোন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হলে তা আপনাদেরকে একের পর এক জানিয়ে যাবে। –উইলিয়াম ডেল।

ইসরাইলে চলমান দৃশ্য মিসরের কাছে গোপন ছিল না। সে অপেক্ষায় চুপ থাকতেও পারেনি। আবারও সেই যুক্তরাষ্ট্র অনুসরণ করে যাচ্ছে।

কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত লোচিস প্যাটেল এক তারবার্তা (নং-২৮১০১) লেখেন ঃ

আমরা আজ জানতে পেরেছি যে, সাত শ' মিলিয়ন জার্মান মার্ক ব্যয়ে পরমাণু রিএ্যাক্টর নির্মাণের লক্ষ্যে মিসর সরকার ও সংযুক্ত জার্মানির সেমেঞ্জ কোম্পানির মধ্যে আলোচনা চলছে। আমরা এসব তথ্যাদি একজন মিসরী অফিসার থেকে পেয়েছি। ইনি শিল্প মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতেন এবং তিনি আমেরিকান রিএ্যাক্টর কেনার জন্য মিসরকে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু মিসর সরকার জার্মান রিএ্যাক্টর কেনাকে শ্রেয় মনে করে। এটা তাকে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনে আরও বেশি সুযোগ দেবে। বাহ্যত মিসর সরকারের প্রভাবশালী মহল সেমেঞ্জ কোম্পানি থেকে জার্মান রিএ্যাক্টর (স্থাপনা) ক্রয় করাকে সমর্থন করছে। —প্যাটেল।

১৯৫৭ সাল থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে মিসরীয় নীতি কেন্দ্রীভূত ছিল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের নেতার তৈরিতে। তারাই হচ্ছে যে কোন পারমাণবিক প্রকল্প প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি। এছাড়া মিসরের কিছু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঐসব প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি গ্রহণও ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছিল। (যেমন– আসোয়ানের ইউরেনিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ভারি পানি উৎপাদনের 'কিমা' কোম্পানি, খনিজ পদার্থ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য হালওয়ানের আলমাতরুকাত কোম্পানি)। অনশাচের সেই ছোট্ট স্থাপনাটি তার ভূমিকা বরং কিছু বেশিই পালন করেছিল। ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৫। কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান দূতাবাস। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সিআইএ ও জয়েন্ট ওয়ার স্টাফ ডিপার্টমেন্ট এবং ভূমধ্যসাগরে নিয়োজিত আমেরিকান নৌ-বহরের কমাণ্ডারের নিকট এক জরুরী তারবার্তা পাঠান ঃ

"মিসর পশ্চিম আলেকজান্দ্রিয়াস্থ 'বুরজ আল-আরব' এলাকায় ১৫০ মেগাওয়াট শক্তির পরমাণু স্থাপনা নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সাইজের স্থাপনা থেকে পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম করে তুলবে।

বর্তমানে রাষ্ট্রদূত প্যাটেল কায়রোতে নেই। তাঁকে ওয়াশিংটনে এক পরামর্শে ডাকা হয়েছে। তবে তাঁর কাছে কিছু তথ্যা রয়েছে এগুলো উপস্থাপন করে তিনি সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আলাপ-আলোচনা করবেন।"

॥ ৩ ॥

জুলিয়ান এমরে

"আপনারা কেন জামাল আব্দুন নাসেরের ব্যাপারে দেরি করছেন ?"

— সৌদি আরবে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের প্রতি বাদশাহ ফয়সল

সে সময়কার পরিস্থিতিতে মিসরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পক্ষগুলো যার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নও ছিল, সকলেই নিজ নিজ ধান্ধায় মশগুল ছিল।

যেমন ধরা যাক, সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক এই সময়টিকেই বেছে নিয়েছিল শান্তির শ্বেত কবুতরের ভূমিকা পালনের জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ঘটনাবলী অনুসরণ করে যাচ্ছিল। তিনি উপলব্ধি করলেন যে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন তার সকল শক্তি নিয়ে সুস্পষ্ট সহিংসতার মাত্রায় আরব-ইসরাইল সঙ্কটে প্রবেশ করছেন। মুহূর্তের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বের মনে জাগল যে, সে সম্ভবত জনসনের চেয়েও বেশি পারঙ্গমতার সাথে এসব ঘটনাবলীকে সামাল দিতে পারবে এবং আরব ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তির একটা পথ খুঁজে পাবে। এ ব্যাপারে সোভিয়েত নেতৃত্বের প্রতি আরবদের আস্থাও বেশ খানিকটা সাহায্য করবে। হোয়াইট হাউসের কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে যেটা গ্রহণ করা তাদের জন্য কঠিন হবে সেটা হয়ত তার (রাশিয়া) থেকে আরবরা গ্রহণ করবে। কারণ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তো ইসরাইলীদের সহযাত্রী। আর জনসনের ক্ষেত্রে তো সহযাত্রীর চেয়েও বেশি। সে তো সহায়ক বরং বলা যায় অনুপ্রেরণকারী। ভারত উপমহাদেশে দু'টি দেশের মধ্যে স্বল্পস্থায়ী একটি যুদ্ধের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মিলন ঘটাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফল হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীকে (নেহেরুর উত্তরসূরি) তাশখন্দে তাঁর সাথে বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেখানে জানুয়ারি ১৯৬৬-তে তখনকার মতো এই দুই বৃহৎ এশীয় দেশের বিভেদকে সীমিত করতে শামিল হন। তাদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে কোসিগিন সাক্ষ্য দেন এবং এই সাক্ষ্যের ওপর ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বাক্ষর করা হয়। এ দিনকে আখ্যা দেয়া হয়– 'তাশখন্দের চেতনা' অর্থাৎ যুদ্ধারত পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তির আগ্রহ ও সম্ভাব্যতা।

কোচিগিন তখন জামাল আব্দুন নাসেরের নিকট একটি পত্র লিখে জানান যে, তাঁর ধারণা 'তাশখন্দ চেতনা' আরব-ইসরাইল সঙ্কট নিরসনে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে

পারে। জামাল আব্দুন নাসের এতে অস্থিরতা অনুভব করবেন। কারণ বিষয়টির আবেদনের তুলনায় সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ছোট মাপের। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পাক-ভারত বিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যে তাঁকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করেছে।

এই সঙ্কটের বিবেচ্য বিষয়গুলোর কথা বাদ দিলেও জামাল আব্দুন নাসেরের ভয় ছিল– মধ্যপ্রাচ্যের মাপঝোপে আন্তর্জাতিক হিসাব-নিকাশের তুলাদণ্ড ক্রটিযুক্ত হয়ে পড়া। কারণ হিসাবের একটি মানদণ্ড ছিল এই যে, দুই মহাশক্তির একটি– যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রথম থেকেই ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শক্তিটি সোভিয়েত ইউনিয়ন আরবদের পক্ষ নিচ্ছে। এখন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, এখন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা সচেষ্ট এক মধ্যস্থতাকারীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে অথচ যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রমাণে ইসরাইলের সাহায্যে সহায়তাকারীর ভূমিকাতেই তার অবস্থান বজায় রাখবে। এর ফলে আরব-ইসরাইল সংঘাতে আন্তর্জাতিক হিসাবের মধ্যেই গড়মিল থেকে গেল।

জামাল আব্দুন নাসের কোসিগিনের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে উত্তর পাঠালেন যে, পাক-ভারতের সমস্যাটি আরব-ইসরাইল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ এশীয় ঐ দু'টি দেশের বিরোধী সীমান্ত বিরোধের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু এই সীমার অভ্যন্তরেই ভারতীয়রা ছিল ভারতে আর পাকিস্তানীরা ছিল পাকিস্তানে। পক্ষান্তরে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের বিষয়টি হচ্ছে একেবারেই আলাদা। কারণ ফিলিস্তিন জনগণ তাদের স্বদেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। অনুরূপভাবে একটি আরব রাষ্ট্র মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসে আরব জাহানের মাঝখানটায় এক হাশর-কেয়ামত শুরু করে দিল যাতে আরব জাহানের অখণ্ডতা আর বিস্তৃতিকে ব্যবচ্ছেদ করতে।

জামাল আব্দুন নাসের তার পত্রে আরও লেখেন যে, তিনি তাঁর আসন্ন মস্কো সফরে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সাথে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন এবং তাঁর সব বক্তব্য খোলা মনে শুনবেন। এতে "কোসিগিনের" নিকট 'তাশখন্দ চেতনার তাপ ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনকারীর ভূমিকায় কিছুটা বিলম্বেই নেমে ছিল কিন্তু তার প্রচেষ্টা সব সময়ই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ষাট দশকের মাঝামাঝি সেই ক্রান্তিকালে সৌদি আরবের ভাবসাব এমনই ছিল যেন ইয়েমেন ছাড়া তার আর কোন মাথাব্যথা ছিল না। কোন কোন সময় তো ইয়েমেনের বিষয়ে বাদশাহ ফয়সলের অবস্থাটা যেন অসুখের সীমায় পৌছে যেত। জেদ্দায় নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত 'বার্কার হার্ট' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে

লিখিত এক তারবার্তায় তাঁর ও বাদশাহ ফয়সলের মধ্যকার বৈঠকের কার্যবিবরণী পাঠান (ডকুমেন্ট নং ৩৬৬৫১/৪৩ তাং ১৯ আগস্ট ১৯৬৪) ঃ "গতকাল সকালে আমার সাথে প্রটোকল যোগাযোগ করে আমাকে জানায় যে আমাকে ৪.১৫ টায় তায়েফ যেতে হবে। প্রটোকল আমাকে কেবল এইটুকু জানিয়েছে যে, অপরাহ্নে আমাকে নিয়ে একটি বিমান তায়েফ যাবে। বাদশাহ্ ফয়সল রাত ন'টায় শিবরা প্রাসাদে আমাকে অভ্যর্থনা জানান। বাদশাহ্ আমাকে জানান যে, একটি ঘটনা ঘটেছে, তিনি চান যে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের নিকট একটি বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বিষয়টি তাঁকে নিজেই অবহিত করতে চান। এরপর বাদশাহ্ বলেন গত দু'দিন ধরে ১৩ ও ১৪ তারিখে হারেস ও আবু অবরীন গোত্রের এলাকার ওপর জিযানের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে তিনটি মিসরী বিমান সৌদি আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে। এ বিমান তিনটি এ এলাকার খুব নিচু দিয়ে কয়েকবার পাক খায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে দৃশ্যত ভয় দেখানো।

ইয়েমেনের অভ্যন্তর থেকে কিছু তথ্য তাঁর কাছে এসেছে যে, কিছু মিসরী বাহিনী সৌদি সীমার দিকে অগ্রসরমান। আমি বাদশাহের কাছে এ বিষয়ে আরও বেশি তথ্য জানতে চাই। কিন্তু বাদশাহ এ বাহিনীর সাইজ অথবা অস্ত্রশস্ত্র বা এর অবস্থান সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি। বাদশাহ বললেন এসব সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ আমার স্মৃতিতে বেশ প্রভাব ফেলছে। আমি শুনেছিলাম যে মিসর, ইরাক ও জর্ডান (?) মিলে একটি ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে যে, তার দেশকে আক্রমণ করে নিম্নরূপে তা ভাগ করে নেবে ঃ হুসেইন হেজায নিয়ে যাবে, কারণ এটা তাঁর সাবেক হাশেমী রাজ্য ছিল, ইরাক পূর্বের প্রদেশ আর ইয়েমেন নিয়ে যাবে দক্ষিণাঞ্চল আর অবশিষ্ট রাজ্য নাসেরের কব্জায় চলে যাবে। বাদশাহ আমাকে এও বলেন, নাসের তাঁর বন্ধু হাইকালকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যেন একটি আরব পেট্রোল সংস্থার পরিকল্পনা প্রকাশ করে।

পাদটীকা ঃ সে সময় আসলেও আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এতে আমি প্রেট্রোল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরি। এ সংস্থার মাধ্যমে দেশগুলো তেল উৎপাদন বাজারজাতকরণ ও দর নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের নীতি নির্ধারণ করবে। এ প্রবন্ধটি প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের ইশারায় লেখা হয়নি। বরং এ চিন্তাটি ছিল আমারই মন থেকে একটি প্রস্তাব। এর মাধ্যমে আমি এই বাস্তবতার দিকে আহ্বান করেছিলাম যে, আরব তেল এখন একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছে যা সংরক্ষণের জন্য একটি সিস্টেম বা প্রশাসন ব্যবস্থা দরকার। বাস্তবে যা ঘটল এই প্রস্তাব ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। আজ যে ওপেক-এর বাগডোর সৌদি আরবের হাতে তার প্রতিষ্ঠার পিছনে এই উদ্যোগও একটি ছিল। এতে আজ প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়কালে বাদশাহ ফয়সলের সংশয় ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন।

জামাল আব্দুন নাসের কোসিগিনের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে উত্তর পাঠালেন যে পাক-ভারতের সমস্যাটি আরব-ইসরাইল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ এশীয় ঐ দু'টি দেশের বিরোধী সীমান্ত বিরোধের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু এই সীমার অভ্যন্তরেই ভারতীয়রা ছিল ভারতে আর পাকিস্তানীরা ছিল পাকিস্তানে। পক্ষান্তরে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের বিষয়টি হচ্ছে একেবারেই আলাদা। কারণ ফিলিস্তিন জনগণ তাদের স্বদেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। এরপর বাদশাহ বলেন, সৌদি আরব আজ অবরুদ্ধ, হয়ত এ দেশ বড় বা শক্তিশালী নাও হতে পারে, কিন্তু এটি তার ভূমি আর মর্যাদা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। যদি নাসের যেমনটি দৃশ্যত মনে হয় এই ভেবে সৌদি আরবের ওপর হাত রাখতে চায় যে, "ফয়সল শ্বাসরুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকবে, তাহলে সে ভুল করছে।" বাদশাহ ইঙ্গিত দেন যে, তিনি অচিরেই সামরিকভাবে মোকাবিলা করবেন। তিনি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলোই এখন বলবেন ঃ

১. ইয়েমেনের সীমান্তে নিরস্ত্রিকৃত এলাকাতে অস্ত্রশস্ত্র প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি নির্দেশ ইস্যু করা হয়েছে।

২. তিনি ইতোমধ্যেই তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন ইয়েমেন সীমান্তে সমাবেশ ঘটায় যাতে তারা সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা করার অবস্থানে প্রস্তুত থাকতে পারে।

৩. এখন থেকে তিনি নিজেকে ইয়েমেনে সেনা বিরতি চুক্তির সাথে জড়িত মনে করেন না। রাজকীয় বাহিনী এখন থেকে বিবেচনা মতো তাদের সমর্থন জুগিয়ে যাবে। আমি বাদশাহকে আমার হতভম্বতা দেখালাম। মিসর-ইরাক ও জর্ডানের ত্রয়ী চুক্তি সম্পর্কেও আমার বিস্ময়ের কথা ব্যক্ত করলাম।

এরপর বাদশাহ আমাকে সৌদি গোয়েন্দা রিপোর্ট অবহিত করলেন যে, মিসরী বাহিনীর কিছু অফিসার ২৬ জুলাই নাসেরকে হত্যার অপারেশন সাজিয়ে রেখেছে।

বাদশাহ আরও বললেন, 'নাসের খুবই অসুস্থ'। এরপর বাদশাহ আমি ও তিনি ছাড়া সবাইকে হলঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আমি সুযোগটি গ্রহণ করে আমার এ আশাবাদ ব্যক্ত করি যে, বাদশাহ ইয়েমেন সীমান্তে ফোর্স পাঠাবেন না। তবে সতর্ক অবস্থার প্রেক্ষিতে সীমান্ত থেকে দূরে যেখানেই প্রয়োজন ইচ্ছামতো বাহিনী নিয়োগ করতে পারেন। আমি তাকে বললাম যে, আমরা ইয়েমেনে যুদ্ধের পরিধি বিস্তৃতিকে উৎসাহিত করি না। তিনি এ পর্যায়ে তীব্রভাবে বলে উঠলেন, "ইয়েমেন থেকে মিসরী বাহিনীকে বের করে দিন। সে প্রশাসন থেকে সাহায্য তলব করছে, এবার তো বেশি হলে এক কি দু'মাসের মধ্যেই পতন ঘটবে।

এরপর বাদশাহ তাঁর সকল প্রাণময়তাকে জড়ো করে আমাকে বললেন, "এই লোকটি থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য আপনারাও চূড়ান্ত চেষ্টা করেন। এ তো

কমিউনিজম ছড়ানোর পথ খুলে দিচ্ছে।" তিনি নাসেরকেই বুঝাতে চেয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, আপনারা তার ব্যাপারে দেরি কেন করছেন ? আপনারা কি দেখেন না যে সে প্রতিদিনই আপনাদের ওপর আক্রমণ করে কথা বলা থেকে বিরত থাকছে না। কখনও ভিয়েতনামের কারণে, কখনও বা কিউবার কারণে, আবার কখনও বা কঙ্গোর কারণে ? কঙ্গোর সাথে তার কি ? জেনেভাতে সে যে নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছে এটাতো তো মস্কোর নির্দেশনার মোড়কেই উপস্থাপিত হয়েছে।

আমি আমার সীমাবদ্ধতার কথা বলেছি। কিন্তু বাদশাহ তারপরও কেবল বলে যাচ্ছিলেন যে, নাসের আমাদের সাথে শত্রুতা করছে এবং আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে অথচ আমরা এখনও তাকে সন্তুষ্ট রাখতেই চেষ্টা করছি। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, আমরা ৪৮০ ধারায় মিসরের কাছে গম রফতানির বিষয়টি বাতিল করে দিয়েছি। বাদশাহ তখন মন্তব্য করেন "তার থেকে সম্পূর্ণভাবে খাবার বন্ধ রাখুন, দেখেন না অবস্থাটা কি হয়।"

তায়েফে এ দৃশ্য ছিল অভূতপূর্ব। সবচেয়ে বড় কথা, অনেক কিছুরই সত্যতা বহন করছিল না। এর সাধারণ একটি সাক্ষী হলো বাদশাহ হুসেইন তখন সৌদিদের বিরুদ্ধে কিছুই করতেন না। বরং সে তো ছিল তাদের মিত্র, বিশেষ করে ইয়েমেনের ব্যাপারে।

তখন ঘটনাপ্রবাহ বিপজ্জনক খাতে গড়াচ্ছিল। আরব-আরব শত্রুতার দিকে যাচ্ছিল। এর প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছিল সেই- "পবিত্র ও নিষিদ্ধ" ধারণায় যার ব্যাপারে গোটা উম্মাহ ঐকমত্য। আর এই ক্রান্তিকালেই আরব প্রত্যাখ্যান প্রাচীরে বিপজ্জনক ফাটল দেখা দিল। যদিও কিছু সময়ের জন্য এটাকে বিভিন্ন রং আর প্রলেপ ঢেকে রেখেছিল।

ইয়েমেনের যুদ্ধ থেকে থেকে জ্বলে আর নেভে। এ সময় ইয়েমেনের তাপমাত্রা ছিল উচ্চ, এর তীব্রতা আরেকটু বেড়ে গেল যখন ফরাসী সহযোগিতা পেল এমন সব সনাতন প্রশাসন- যারা ইয়েমেনের মালিকানা নিয়ে যুদ্ধ করছিল। এরই মধ্যে ঘটে গেল আরেক ঘটনা। জিবুতির ফরাসী প্রশাসন 'এডেনে' ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে প্রবেশ করল। উদ্দেশ্য, বিদেশী ভাড়াটে বাহিনীকে (সৌদি অর্থায়নে) আরও জোরদার করা। এরা তখন ইয়েমেনের আনাচেকানাচে ছেয়ে গিয়েছিল। তারা ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের বাহিনী এবং তাদের সমর্থক সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রবেশ করেছিল।

ইসরাইল তার দিক থেকে ইয়েমেনের যুদ্ধের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিল। সে চাচ্ছিল এটা যতদূর সম্ভব প্রলম্বিত হোক। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মিসরী বাহিনীর একটি বড় অংশ তার ফ্রন্টিয়ার থেকে অনেক দূরে গেছে ইয়েমেনের পাহাড়ে পাহাড়ে

লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকুক। তাছাড়া তার ধারণায় ইয়েমেনের পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে এভাবে ব্যস্ত থাকলে মিসরের সামরিক শক্তি অনবরত ক্ষয় হতে থাকবে। এ সময় পর্যন্ত ইসরাইল ইয়েমেনে রাজতন্ত্রীদের সমর্থক জোটকে প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছিল। এই জোটটি এডেনের ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী প্রশাসনের সাথে আরবদের সনাতন সংস্থাগুলোকে যুক্ত করে দিয়েছিল। পাশাপাশি ছিল জিবুতির ফরাসী উপনিবেশী প্রশাসন। এরা অপরদিক থেকে বাবুল মান্দেব-এর জলসীমা থেকে ইয়েমেনের মোকাবিলা করছিল।

তবে এ কথা জানা যায়নি যে, এসব পক্ষগুলোর মধ্য থেকে ঠিক কার মনে জেগেছিল যে, ইসরাইল এ লড়াইয়ে এমন সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে– যা অন্যদের চেয়েও বেশি কার্যকর হবে। দেখা গেল, যখন ইয়েমেনের ভাড়াটে বাহিনীর রসদ ও গোলা বারুদের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তাদের অবস্থানকে লক্ষ্য করে বিমান থেকে প্যারাস্যুটে এগুলো নিচে ফেলা হলো। অথচ এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী কোন আরব পক্ষেরই সামর্থন ছিল না। একই সময়ে এডেনের ব্রিটিশ উপনিবেশী প্রশাসনও এ কাজ করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। জিবুতির ফরাসী উপনিবেশী প্রশাসনের অবস্থাও ছিল তথৈবচ।

যখন লড়াইয়ের পক্ষগুলোর মধ্যে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় প্রথমবারের মতো ইসরাইলী সহযোগিতার বিষয়টি উত্থাপিত হলো তখন এই ভূমিকা পালনে ইসরাইলীদের আমন্ত্রণ জানানোকে সৌদি পক্ষ ঘোরতর বিপদ মনে করলেন। সৌদি গোয়েন্দা বিভাগ এর বদলে ইরানের শাহ্ মুহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহলভীর কাছে খতিয়ে দেখলেন তিনি এ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত কি-না। তাছাড়া এ সময় ইরান বেশ ভাল এয়ার ফোর্সের মালিক ছিল। তাছাড়া এ বাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল খাতমী হলেন শাহের সহদোরা প্রিন্সেস ফাতেমার স্বামী; কাজেই বিষয়টি গোপন রাখাও সম্ভব ছিল। বাস্তবিকই সৌদি ও জর্ডানি গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণ শাহের কাছে বিষয়টি পাড়তে প্রয়াস পান।

কিন্তু শাহ্ এতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ইয়েমেনের রাজতন্ত্রীদের লক্ষ্য অর্জনের সাহায্যে তাঁর নৈতিক ও বস্তুগত সকল সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, ইয়েমেনের ভাড়াটে বিদেশী বাহিনীর সাথে সামরিক অপারেশনে ইরান সরাসরি ভূমিকা রাখলে একদিন হয়ত এটা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে এবং এতে মুসলিম বিশ্বে ইরানের সুনামের ক্ষতি হতে পারে। শাহের ইতস্ততার মধ্যেই বিষয়টি আবার নতুন করে উত্থাপিত হলো। কারণ কোন ইতস্তত অথবা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচলে কালক্ষেপনের জন্য যথেষ্ট সময় ছিল না।

এদিকে ইসরাইল ভিতর থেকে নিবিড়ভাবে গোটা বিষয়টি অনুসরণ করে যাচ্ছিল। সে সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

সে সরাসরি সাহায্যের প্রস্তাব দিতে চাইল না বরং একদল ব্রিটিশ সাংসদের মাধ্যমে পথ খুঁজে নেয়াটাকেই উত্তম মনে করল। এসব সাংসদ নিজেদের 'সুয়েজ গ্রুপ' নামে পরিচয় দিতে। কমন্স সভার প্রায় ২০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এই গ্রুপটির নেতৃত্বে ছিলেন স্যার জুলিয়ান এমরে। ইনি এক সময় ব্রিটিশ সমরমন্ত্রী ছিলেন। মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের সাথে এক সাক্ষাতে জুলিয়ান এমরে নিজেই এই সব বৈঠকের কথা স্বীকার করেছেন। সাক্ষাৎকারটি হয়েছিল ভূমধ্যসাগরে নিয়োজিত ব্রিটিশ নৌ-বহরের মশহুর ব্রিটিশ কমাণ্ডারের বিধবা স্ত্রী লেডি জিলিকোর বাড়িতে, ১৯৯৪ সালে। ঘটনা স্বীকার করে এমরে আরও বলেন যে, "সে সময় নাসেরের বিরুদ্ধে সকল পক্ষ শয়তানকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল।" আবার হেঁসে বললেন, "যা হোক আপনি যা-ই মনে করুন– ইসরাইল কিন্তু শয়তান নয়।"

এমরে নিজেও ছিলেন একজন ইহুদী। জায়নিস্টদের প্রতি তাঁর স্বজনপ্রীতি ছিল, সবার জানা। কমন্স সভায় সে ও তার সহকর্মীরা শুরু থেকেই মিসরী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিল প্রচণ্ডভাবে। তারা মিসর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার চুক্তির বিরুদ্ধে একযোগে অবস্থান নিয়েছিল। তাছাড়া সুয়েজ ষড়যন্ত্রের অংশগ্রহণে এডেনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা দাতা ছিল তারা। এরপর মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচারাভিযান চালায় এরাই। যখন ইয়েমেনে যুদ্ধ বেধে গেল তখন এই জুলিয়ান এমরের নেতৃত্বে সুয়েজ গ্রুপই পুরোভাগে থেকে লণ্ডনে ও প্যারিসে বসে ইয়েমেনের রাজতন্ত্রীদের কাতারে শামিল হয় যুদ্ধ করার জন্য বিদেশী ভাড়াটে বাহিনী রিক্রুট করার প্রক্রিয়াটি সমাধা করে। এরাই ইয়েমেনের যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহারের জন্য মিসরী বাহিনীকে অভিযুক্ত করার অভিযানটি পরিচালনা করে। তারা এই হামলাটি নিয়ে জাতিসংঘ পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে তারা দারুণ তোলপাড় সৃষ্টি করে, যার প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হয় বিশ্বের পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে।

এ সময় ইয়েমেনের লড়াইয়ের কি ভূমিকা পালন করা যায়– এ বিষয়টি নিয়ে জুলিয়ান এমরের সাথে ইসরাইল যোগাযোগ করে। জুলিয়ান এমরে তার দিক থেকে ইয়েমেনের রাজতন্ত্রীদের সমর্থক আরব পক্ষগুলোর সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব নেন। তিনি ইসরাইলকে কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। বিষয়টি যেন সর্বোচ্চ গোপনীয়তার মোড়কে থাকে তাও বলে দেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু প্রামাণ্য দলিল রয়েছে যে, এটন স্কোয়ারে জুলিয়ান এমরের বাড়িতে যেখানে সুয়েজ গ্রুপ নেতা বসবাস করতেন– সেখানে অনেক বৈঠক হয়েছিল। প্রথম বৈঠকটি ছিল কেবল আরব প্রতিনিধিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর দ্বিতীয় বৈঠকে ইসরাইলী প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। এভাবে অনেক বৈঠক হয়। এ ছিল ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসের ঘটনা।

এটন স্কোয়ারে জুলিয়ান এমরের বাসায় এসব বৈঠকে যুদ্ধে ইসরাইলের ভূমিকা নির্ধারিত হয়। এ ভূমিকার প্রতীকী নাম দেয়া হয় "ম্যাঙ্গো"। আশ্চর্যের কথা হলো, মিসরী গোয়েন্দারা 'জাওফ'-এ রাজতন্ত্রীদের কমাণ্ড থেকে ইস্যুকৃত বেশ কিছু চিঠিপত্র সংগ্রহ করে যাতে 'ম্যাঙ্গো' শব্দটি বার বার এসেছিল। কিন্তু কেউই সে সময় খেয়াল করেনি যে, এই শব্দটি আসলে ইয়েমেনের যুদ্ধে ইসরাইলী ভূমিকার প্রতিই ইঙ্গিত করত।

যা হোক, সান্‌আর গণতন্ত্রী শাসনের বিরোধী রক্ষণশীল আরব ফ্রন্ট লাইনের সাথে সহযোগিতা করে ইয়েমেনে ইসরাইল যে ভূমিকাটি পালন করে তা কেবল এমন কিছু সামরিক এ্যাকশন ছিল না যাতে দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির ভিন্নতা থাকলেও পক্ষগুলো এক জোটে কাজ করেছিল। বরং এ ছিল ঐক্যবদ্ধ আরব ভূমিকার কলিজায় ও পৃষ্ঠদেশে এক বিরাট ইসরাইলী ফুটো। এর শেষ পরিণতি হলো, এটা আরব ইসরাইল সংঘাতে 'পবিত্র ও নিষিদ্ধ' বিশ্বাসের দেয়ালে এক বিরাট গবাক্ষ হয়ে দেখা দেয়। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে ইসরাইল ঠাণ্ডা মাথায় যে আক্রমণ চালিয়েছিল এর পিছনে অন্যতম প্রেরণা ছিল এই ফুটো করাই তার সাফল্য। সে আগেই জানত যে, মিসরের বিরুদ্ধে তার হঠাৎ আক্রমণকে আরব বিশ্ব মোকাবিলা করবে এমন অবস্থায় যখন তারা সম্পূর্ণ দু'টি ভাগে বিভক্ত।

॥ ৪ ॥

১৯৬৭

"আমি এখন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নতুন বন্ধুত্ব পাতাতে পারি না, কারণ তার ব্যাপারে আমার বেশ কিছু হতাশাব্যঞ্জক সন্দেহ রয়েছে।"

—আমেরিকান চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স ডোনাল্ড বেরগেস-এর প্রতি জামাল আব্দুন নাসের

জুন, ১৯৬৭-এর যুদ্ধে ইসরাইলের তিনটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ঃ

১. ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যাখ্যানের যে আরব 'নিষিদ্ধ ও পবিত্র' ধারণার সংরক্ষণের ইস্পাত বর্মটি ছিল তা ভেঙ্গে ফেলা।

২. আরব ভূমির সবচেয়ে বড় আয়তন ধরে রাখা এবং তার সাথে সন্ধি করার জন্য আলোচনায় আরবদের বাধ্য করতে এটাকে পণ হিসাবে ব্যবহার করা। এ ছিল শাস্তি চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে বেন গোরিয়নের সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ।

৩. আল্-কুদ্সকে দখল করা, যাতে এটাকে ইসরাইলের অখণ্ড রাজধানী বানানো যায়। ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'আবা ইবান' ও গোয়েন্দা প্রধান আভরায়েম এভরুন, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট "লেন্ডন জনসন" হোয়াইট হাউসে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক তাঁর উপদেষ্টা ওয়ালট রোস্টোর অফিসে ৩১ মে সর্বশেষ যে বৈঠক করেন এতে ইসরাইলের শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. প্রেসিডেন্ট জনসন, যিনি মিসরকে সামরিকভাবে আঘাত করার, অপারেশন বাস্তবায়নের গ্যারান্টিস্বরূপ ইসরাইলকে তার প্রার্থিত সবকিছুই দেন– এখন তাঁর প্রভাব খাটিয়ে শেষ মুহূর্তে ইকুইপমেন্টস আমদানিতে তালিকার পূর্ণতা বিধান করবেন। তিনি এ অঙ্গীকারও দেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেলে তার দায়িত্ব তিনি নেবেন। প্রেসিডেন্ট ইসরাইলকে গোয়েন্দা তথ্য প্রবাহ সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন যাতে অপারেশনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ময়দান তার সামনে উন্মুক্ত থাকে।

প্রেসিডেন্ট জনসন এ মর্মেও অঙ্গীকার দেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ও মিডিয়া কভারেজ দিয়ে ইসরাইলী এ্যাকশনকে চালিয়ে নেবেন। কারণ এ কাজটি ইসরাইলী বাহিনী একাই করবে। তিনি এর সামর্থ্য সম্পর্কে আস্থাবান।

২. যুদ্ধ বন্ধের পর এটা নিশ্চিত যে, নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা বন্ধ হবে– যুক্তরাষ্ট্র ইতোপূর্বে ১৯৬৫ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবে না। তখন এতে

মিসরের ওপর সন্ধির শর্ত চাপানো ছাড়াই সিনাই থেকে ইসরাইলকে সরে আসতে হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে যা ঘটেছিল এতে পুরো আরব বিশ্বে এই ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, সোভিয়েতের সতর্কবাণীতেই ইসরাইল সৈন্য প্রত্যাহার করেছিল অথবা এ ছিল তখনকার জাতিসংঘের ভূমিকার ফল, যা এর সেক্রেটারি জেনারেল 'দাগ হেমারশীল্ড' সমন্বয় করেছিলেন। এ ধরনের ধারণা আর কখনও শ্বাসও নিতে পারে সে সুযোগ দেয়া উচিত হবে না।

৩. এই প্রেক্ষাপটেই নিরাপত্তা পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই বাধা সৃষ্টি করতে হবে। কারণ অপারেশন শুরু হওয়া মাত্রই সে বৈঠকে বসবে এতে সন্দেহ নেই। তখন সিদ্ধান্ত দেবে যেন যুদ্ধ শুরুর আগের জায়গায় সকল সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়।

৪. তখন যুক্তরাষ্ট্র বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে সরাসরি আলোচনার প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়ে যাবে। এটাই হবে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত আরব ভূমি উদ্ধারের জন্য তাদের সামনে একমাত্র উপায়।

৫. তাছাড়া অপেক্ষমাণ সেই দীর্ঘ আলোচনা পর্বে কোথাও জাতিসংঘের কোন ভূমিকা থাকবে না, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ বৃহৎ কোন শক্তিরও না। অবশ্যই সরাসরি আলোচনার কার্যক্রম কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে দূর থেকে যুক্তরাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাবে, যাতে আরব ও ইসরাইলীরা সরাসরি তাদের মধ্যে সহযোগিতায় ফিরে আসে। এভাবেই আরব প্রত্যাখ্যানের দেয়াল ধসে পড়বে। এসব কিছু জামাল আব্দুন নাসেরের চিন্তা-ভাবনার বাইরে ছিল না। এমনকি, জুন, ১৯৬৭-এর লড়াইয়ের আগে পরের রাজনৈতিক চুক্তি-আদির বিস্তারিত তখনও পৌঁছেনি। এ সকল চুক্তির মূল রূপরেখা তার কাছে ছিল।

কিন্তু পুঙ্খানুপঙ্খ তথ্যের ফিরিস্তি তখনও গোপন গুহা গলিয়ে বেরিয়ে আসতে সময় নিচ্ছিল। এ সত্ত্বেও যা কিছু হস্তগত হয়েছিল তা তার মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট ছিল ।

প্রথম মূল্যায়ন ঃ ১৯৬৭ সালের জুনে সংঘটিত লড়াইয়ে আরব জাতি একটি ভীষণ বিপজ্জনক নাকানি-চুবানি খেয়েছিল। এটা অস্বীকারের জো নেই। এই বিপর্যয়ের দায়িত্ব তাদেরকে বহন করতেই হবে। এখন একে মোকাবিলা করার জন্য অবশ্যই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

তাঁর দ্বিতীয় মূল্যায়ন ঃ বৃহৎ আরব অভিলাষগুলোকে অপেক্ষার আভরণে পুরে রাখতে হবে। এখন আরব জাতির ভূখণ্ড (নাকাব) এর মধ্যে ভৌগোলিক নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ে কথা তোলার সময় হয়নি। ফিলিস্তিন জাতির স্বদেশে প্রত্যাবাসনের অধিকার নিয়ে কথা বলার সময়ও আসেনি। না হয় তাদেরও তো একটি দেশ ছিল, যার রয়েছে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর সীমান্ত।

* বর্তমান পরিস্থিতির আবেদন অনুযায়ী এখন দুই পর্যায়ে কাজ করতে হবে ঃ প্রথম পর্যায় হবে মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের ভূমিতে ৫ জুনের আগ্রাসনের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য কাজ করা।

যখন এটা বাস্তবায়িত হবে তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য দুয়ার খুলে যেতে পারে। তবে প্রথম পর্যায়ের দায়িত্ব শেষ না করে এর জন্য পরিকল্পনা আঁটা কঠিন হবে। মূল কথা হলো– প্রথম পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকার সময় তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যে কোন অধিকার সম্পর্কে যেন আরবরা কোন বাড়াবাড়ি করে না বসে।

তৃতীয় মূল্যায়ন ঃ আরবদের এ্যাকশন এমন পরিস্থিতিতে নিতে হবে যার কোন নজির ছিল না। কারণ এই পরিস্থিতির ছায়ায় যুদ্ধ করা কঠিন, আবার শান্তিও অসম্ভব। তাছাড়া ১৯৫৬ সালের ঘটনার মতো কোন সমাধান এখন অসম্ভব। তখন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে বৃহৎ শক্তিবর্গ, জাতিসংঘ ও বিশ্ব শক্তিসমূহের মানদণ্ড– এসবই দায়িত্বের সাথে এগিয়ে এসেছিল।

চতুর্থ মূল্যায়ন ঃ বিভিন্ন শক্তিসমূহের বর্তমান মানদণ্ডের ছাতার নিচে আদৌ কোন সমাধান সম্ভব নয়। সামরিক এ্যাকশনের মাধ্যমেই এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তারপরই কেবল রাজনৈতিক এ্যাকশন সম্ভব হবে।

পঞ্চম মূল্যায়ন ঃ রাজনৈতিক কার্যক্রমের ভূমিকা প্রস্তুত করায় সামরিক এ্যাকশন যেন সক্ষম হতে পারে। এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা হবে একটি বুনিয়াদী বিষয়। কারণ সে-ই একমাত্র শক্তি যে যুদ্ধে আরবদের প্রয়োজনে আয়োজন করতে পারে। এতে তাদেরকে রাজনৈতিক এ্যাকশনেও অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে। কারণ এটা অযৌক্তিক চিন্তা হবে যদি মনে করা হয় যে, বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের ভূমিকাকে কেবল যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। যখন রাজনৈতিক এ্যাকশনে তাদের ভূমিকা রাখার প্রশ্ন আসবে তখন তাদেরকে বলা যাবে যে, এক্ষেত্রে আপনাদের কোন ভূমিকা রাখার প্রয়োজন নেই।

ষষ্ঠ মুল্যায়ন ঃ যুক্তরাষ্ট্র –যদিও তার শত্রুভাবাপন্ন আচারণই ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বা তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল- তবুও সে সম্ভাব্য সামরিক এ্যাকশন অথবা রাজনৈতিক এ্যাকশনে সমভাবে একটি প্রধান পক্ষ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেছিলেন, তা থেকে তাঁরা বেশ কিছু নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেয়া। তবে এটাও স্বীকার করা হয় যে, এটা মূলত সামরিক এ্যাকশনের ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করেই এর শর্তাবলীর ভালমন্দ সাব্যস্ত হচ্ছে– এ ধরনের একটি সমাধানের প্রস্তুতি প্রকাশ ছাড়া এ সিদ্ধান্ত বেশি কিছু নয়।

এটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জুনার ইয়ারেঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং প্রস্তাবের ভিত্তিতে সমাধানের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি এ অঞ্চলের বিবাদমান পক্ষগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি শোনার জন্য এ অঞ্চল বেশ কয়েকবার সফর করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস এবং আরবদের অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ মোকাবিলার কথা ভেবে তার প্রতি ভীতিমূলক মনোভাব কেটে ওঠা এ উদ্দেশ্যে সে চাইলে তাকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়া যায়। এতে সে (সোভিয়েত) নিশ্চিত হতে পারবে যে, তারা যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে এবং এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে এটা আসলে শান্তির ভিত্তি হওয়ার মতো নয়। কাজেই এরপর মিসর ও অবশিষ্ট আরবদের সামনে সামরিক এ্যাকশনের মাধ্যমে তাদের ভূমিকে মুক্ত করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এ হচ্ছে এমন একটি পরিকল্পিত লক্ষ্য– যার মাধ্যমে বিভিন্ন নীতি ও বন্ধুত্বকে পরখ করা যাবে।

এ প্রেক্ষিতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পর্যায়ের প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক শক্তি- এমনকি ইসরাইলের সাথে এই মূলনীতির ভিত্তিতে যোগাযোগ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যে, মিসর কেবলমাত্র দু'টি শর্তের ভিত্তিতে এটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত–তৃতীয়টি নয়।

প্রথমত কোন সমাধান পরিকল্পনায় তাকে অধিকৃত আরব ভূমির ওপর থেকে দাবি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হবে না। দ্বিতীয়ত ১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত আরব ভূমিতে দখলদারী না ছাড়া পর্যন্ত ইসরাইলের সাথে তাকে সরাসরি আলোচনার অনুরোধ করা যাবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন নিউইয়র্কে চার তরফা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এরপর ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও হয়। সরাসরি মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনায় সীমিত চ্যানেল খোলা। এরপর হয়ত হতে পারে! তখন সবচেয়ে দুরূহ কাজটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগের চ্যানেল খোলা।

১৯৬৭ সালের ২২ নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং সিদ্ধান্তের পূর্বেকার পুরো সময়ে আমেরিকান ও মিসরীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে যোগাযোগ কখনই বিচ্ছিন্ন ছিল না। জাতিসংঘের প্রেক্ষাপটে মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ রিয়াদ একাধিকবার আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেন রাসেকের সাথে বৈঠক করেন। অনুরূপভাবে জাতিসংঘে মিসর ও আমেরিকার প্রতিনিধিগণ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের নিকট উপস্থাপিত সিদ্ধান্ত বিলগুলো প্রস্তুতের সময় বেশ কয়েকবার বৈঠকে মিলিত হন।

কিন্তু সরকারী যোগাযোগের ক্ষেত্রে সব সময়ই একটি সীমা মেনে চলা হয়েছে। তবে গোপন চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তা সব সময়ই ছিল। এর মাধ্যমেই অনুভব আর পরখ করে নেয়ার কাজ চলত। সে সময়ে অনেকেই স্বেচ্ছায় কায়রো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করার কাজটি করত। কিন্তু এই সব স্বেচ্ছাসেবীর চেষ্টা-তদ্বির মেঘকে হালকা করার চেয়ে বরং পুঞ্জীভূত করেছে বেশি। এমনি ধারায় দেখা গেল এক স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যম ছিল পাকিস্তানের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী, যিনি কায়রোয় তাঁর এক বন্ধুর বরাতে এ তথ্য পাচার করেন যে, জামাল আব্দুন নাসের ওয়াশিংটনে গিয়ে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জনসনের সাথে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। ঘটনাক্রমে ঠিক সে সময় 'লুক' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক উইলিয়াম আটউড মিসরে এলেন। সে সময় এ পত্রিকাটি ছিল আমেরিকার সবচেয়ে বড় ও ব্যাপক প্রভাবশালী পত্রিকা। তিনি জামাল আব্দুন নাসেরের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন (ইনি ১৯৫১ সালে কোরিয়া যুদ্ধে সংবাদ প্রতিনিধি হিসাবে মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের সাথে পরিচিত হন এবং সেই থেকে তাঁরা দুজন ছিলেন বন্ধু)। যা হোক, সাক্ষাৎকালে আটউড বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট নাসেরের নিকট প্রেসিডেন্ট জনসনের শুভেচ্ছা বহন করে এনেছেন। তিনি মিসর সফরের পূর্বে তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর তিনি জনসনের ভর্ৎসনা পৌঁছানোর অনুমতি চান। কারণ প্রেসিডেন্ট নাসের প্রকাশ্যে আমেরিকান প্রশাসনকে অভিযুক্ত করে বলেন যে, সে ১৯৬৭-এর ৫ জুনের সেই আগ্রাসী হামলার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করছিল।

জামাল আব্দুন নাসের জবাব দিলেন যে, তিনি শুভেচ্ছা গ্রহণ করেছেন, তবে ভর্ৎসনা প্রত্যাখ্যান করছেন। যা হোক তিনি ইসরাইলের সাথে আমেরিকার যোগসাজশের ব্যাপারে কথা বলাকে এমন একটি বিষয় মনে করেছেন, যার সময় চলে গেছে। এটা এখন ইতিহাসের কাছেই ন্যস্ত। সেই ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর আলোকে তার বিচার করবে। এখন সবার ওপরই যে, বিষয়টি বর্তাচ্ছে তা হচ্ছে– কোন এক সময় যে একটি সংশয় ঘিরে ছিল তাকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ব্যস্ত না থেকে, যেটা এখন আমাদের সামনে তাকে মোকাবিলা করা। আটউড উত্তর দিলেন, আমি প্রেসিডেন্ট জনসনের কাছ থেকে বুঝতে পেরেছি যে; আপনি যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে সেখানে তার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত সে সময় যদি সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয় তখন আপনারা উভয়ই ঘটিত বিষয়াদি সম্পর্কে পরিস্থিতি স্বচ্ছ করে নিতে পারবেন এবং ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি দিতে সক্ষম হবেন।

জামাল আব্দুন নাসের তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, যুদ্ধের আগে কোন এক সময় তিনি ওয়াশিংটন সফরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন বটে। কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস সময়টি অনুকূলে নয়।

আটউড মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্টের কাছে কিছু তথ্য রয়েছে যে, আপনি ওয়াশিংটন সফরের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। জামাল আব্দুন নাসের উত্তর দিলেন যে, তিনি কখনও এমন অনুরোধ করেননি। তিনি ভাবতেও পারেন না কিভাবে তা তিনি চাইতে পারেন। যেখানে ১৯৬৭-এর ৭ জুন থেকে সম্পর্কই ছিন্ন রয়েছে।

আটউড যোগাযোগ চ্যানেলে এই স্পষ্ট গোঁজামিল দেখে তার হতভম্বতা প্রকাশ করেন। আটউড প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি ওয়াশিংটন ফিরেই প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তিনি তাকে অনুরোধ করবেন যেন বিষয়গুলো খাতিয়ে দেখা হয়, যাতে উভয় পক্ষ কিছুটা অবহিত থাকে। এতে এহেন পরিস্থিতিতে যেন যে কোন ভুল বোঝাবুঝিকে অপনোদন করা যায়। উইলিয়াম আটউড ওয়াশিংটনে ফিরেই প্রেসিডেন্ট জনসনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে যে আলাপ হয় তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এর ভিত্তিতে জনসন ও তাঁর উপদেষ্টাবন্দৃ সিদ্ধান্ত নেন যে, জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে যোগাযোগ চ্যানেল খোলার এ তো সুবর্ণ সুযোগ। মাধ্যমে ধরে স্বেচ্ছাসেবী আর ভেজাল বার্তা পাচারকারীদের প্রয়োজন নেই। এ প্রেক্ষিতেই স্পেনিশ দূতাবাসের এ্যাটাশে ও আমেরিকান স্বার্থদির ইনচার্জ আমেরিকান কূটনীতিক ডোলান্ড প্যারগ্যাস ওয়াশিংটন থেকে এই মর্মে নির্দেশনা লাভ করেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে সাক্ষাতের এ্যাপায়েন্টমেন্ট নিয়ে তার কাছে ওয়াশিংটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেবে। প্যারগ্যাস ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে এক তারবার্তা লিখে পাঠালেন । এতে ছিল ঃ আজ ৬ জানুয়ারি আপরাহ্ণ আড়াইটায় প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর বাস ভবনে আমাকে সাক্ষাৎ দেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকাল ৪০ মিনিট স্থায়ী হয়। মনে হলো নাসের উত্তম স্বাস্থ্য আর উচ্চ মনোবলেই আছেন। তিনি প্যান্ট পরা ছিলেন। এর ওপর পশমী ব্লুভার পরেন। তার মধ্যে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে আলাপকালে নার্ভাসনেসের যে আলামত দেখা যেত যেমন হাঁটু দোলানো– এমন কিছুই দেখলাম না। পুরো সাক্ষাৎকালে তিনি ছিলেন বেশ পরিতোষক ও আন্তরিক। তিনি আমার পরিবার এবং নতুন পরিবেশে কাজ করার অবস্থাদিরও খোঁজ খরব নেন।

১. আমি আলাপ শুরু করলাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করলাম যে, মিস্টার বার্ডসোয়েল কায়রো সফর করেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাবেক পাকিস্তানী মন্ত্রী সিদ্দিকী। বললাম, বার্ডসোয়েল কায়রো থেকে ফিরে প্রেসিডেন্ট জনসনের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। তাঁর সাথে এর পূর্ব পরিচয় রয়েছে। তিনি কায়রোতে তাঁর সাক্ষাতের বিষয়টি তাঁকে বলেন। প্রেসিডেন্ট নাসেরের বলে কথিত একটি পত্র তিনি তাঁকে দেন এবং এতে তিনি (নাসের) ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জনসনের সাথে একটি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি তাঁকে বললাম যে, তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনার

পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে এ কথা জানা যে, বার্ডসোয়েল যে তথ্যাদি সেখানে বলেছেন, এতে তাঁর (নাসেরের) দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে কিনা। আমি তাঁকে এও বললাম যে– "বার্ডসোয়েল প্রেসিডেন্ট জনসনের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন তার একটি কপিও তিনি সাথে করে এনেছেন।" আমি আমার ব্যাগ থেকে তা বের করে দেখালাম। পাতাটি হাতে নিয়ে নাসের পড়তে লাগলেন। যতই পাতাটি পড়ছিলেন ততই তাঁর চোখ দু'টি আরও বিস্ফোরিত হয়ে যাচ্ছিল। পড়া শেষ হলে কাগজটি আমার হাতে দিয়ে তিনি হাসতে লাগলেন।

২. নাসের আমাকে বললেন যে, আমি এমনকি এও জানি না যে, "বার্ডসোয়েল" লোকটি কে বা 'সিদ্দিকী' কে। তবে আমি তাঁদের কায়রোতে আসার কথা শুনেছিলাম। তাঁরা একজন মুক্ত অফিসারের মাধ্যমে এসেছিলেন এবং কিছু কর্মকর্তার সাথে দেখা করেন। কিন্তু আমি বিষয়টিকে আদৌ গুরুত্ব দেইনি। কারণ অনেকেই তো আসছে– যাচ্ছে। প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই থাকে আলাদা। তখন আমি তাদের সম্পর্কে যা জানি তাঁকে বললাম।

বেল আটউডের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে, তিনি আসলেই হাইকালের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৩. আমি প্রেসিডেন্ট নাসেরকে বললাম যে, জনসন প্রশাসন ও তার মধ্যে মধ্যস্থতার গণ্ডিকে আরও সীমিত করার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উভয় দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকেই যোগাযোগ থাকা শ্রেয়। এতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কমে যাবে। এতে উভয়ে যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে পরস্পর পরামর্শ করার সুযোগ থাকবে। নাসের মত দেন যে, তিনি তাঁর ও প্রেসিডেন্ট জনসনের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান। তবে তিনি বর্তমান সময়টি উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন না। তিনি এটাকে পরিষ্কার করে বলতে চান যে, এ বৈঠক সরাসরি বা কোন মাধ্যমেও চান না। তিনি মনে করেন যে, দু'দেশের সম্পর্ক অনেক জঞ্জালে ভরপুর। প্রথমে এগুলো সাফ করতে হবে। এরপর বৈঠকের ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে।

৪.আমি নাসেরকে বললাম– প্রেসিডেন্ট জনসন নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করতে চান যার মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। নাসের আমাকে বলেন– তিনি আমার সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে চান। তাঁর মতে উভয় দেশের মধ্যে 'দুঃখজনক সংশয়' বিরাজমান। এরপর নাসের বলেন– "আমি যদি আপনাকে বলি যে, আমি এখন বন্ধুত্বের নতুন পর্যায়ে যেতে সক্ষম তাহলে আমি আর আমি থাকব না। আমার পক্ষে একথা বলা সত্যিই খুব কঠিন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। এতে সময়ের প্রয়োজন।"

আমি পরোক্ষভাবে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করলাম। বার্ডসোয়েল-এর বিবরণের মধ্যে বিষয়টি এসেছিল বলেও ইঙ্গিত করলাম। নাসের জবাবে বললেন যে, যদি কেউ উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় শুরু করার কথা বোঝাতে চান তাহলে এ জন্য সময় বোধ হয় এখনও আসেনি। তবে যদি এটা বোঝাতে চান যে, দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের কাজ করা দরকার তাহলে সেটা অবশ্যই জরুরী বিষয়। এরমধ্যে দিয়েই আমরা অনিবার্য কিছু আস্থা ফিরে পেতে পারি।

এরপর নাসের আলোচনায় মোড় ঘুরিয়ে অভিযোগ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আক্রমণ শাণিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন– আমেরিকান পত্র-পত্রিকার আক্রমণে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তিনি জানান সেখানে কিছু প্রভাবশালী মহলই এসব হৈ চৈ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। যা আমরা দেখতে ও শোনতে পাচ্ছি। অনুরূপভাবে কংগ্রেসের সংসদ ও সিনেটরদের বিবৃতিগুলোও বেশ বুঝতে পারি। এসব কর্মকাণ্ডের সীমা আমার জানা। তবে তিনি যা বোঝাতে পারছেন না, তা হচ্ছে– তার মতে ম্যাকেনমার কর্তৃক দেয়া বিবৃতির স্টাইলে কিছু সরকারী বিবৃতি। এতে বলা হয় যে, মিসরই নাকি ১৯৬৭-এর জুনে প্রথম আক্রমণ চালিয়েছিল। অথচ ম্যাকেনমার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে প্রকৃত ঘটনা জানেন যে সেটা তাঁর বক্তব্যের বিপরীত ছিল।

যখন আমি নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোচনায় যাই তখন তিনি বলেন যে, আমাদের যে কোন চেষ্টাকেই তিনি স্বাগত জানাবেন। তবে তিনি মনে করেন যে, এতে অনেক সময় লেগে যাবে। কারণ তার কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসরাইল প্রকৃত শান্তিতে আদৌ আগ্রহী নয়। এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করবে। এখানে নাসের আরেকটি কথা বলেন যে, তিনি জানেন তার সামনে কিছু কঠিন বছর অপেক্ষা করছে। খুবই কঠিন। যুদ্ধের পর তার জন্য সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে দু'টি দায়িত্ব পালন ঃ

প্রথমত ঃ জাতিকে স্পষ্ট করে বলা যে, আমাদের পরাজয় ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ এটা স্পষ্ট করে বলা যে, শক্তি দিয়ে যা কিছু নিয়ে গেছে তা শক্তি প্রয়োগ ছাড়া পুনরুদ্ধার করা যাবে না।

তিনি এ দু'টি দায়িত্ব পালন করেছেন। এ জন্যই সে মানসিক দিক থেকে বেশ চাঙ্গা , যদিও সামনে অনেক কঠিন সময় দেখতে পাচ্ছেন। তিনি এখন মূল্যায়ন করছেন যে, তাঁর জাতি এখন গ্রহণীয় শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য দিতে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, শান্তিই তাঁর লক্ষ্য। তিনি যখন বিপ্লব ঘটান তখনও

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা। যখন তিনি বাধ্য হয়ে যুদ্ধের মোকাবিলা করেন তখনও তিনি জানেন যে এর পিছনে মূল কারণ তাঁর দেশের উন্নয়মের পথে বাধার সৃষ্টি করা– এজন্যই সমগ্র দেশের সামর্থ্যকে ভারাক্রান্ত করে রাখা হয়েছে।

প্যারগ্যাস তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে বলেন– "তিনি সাক্ষাৎকারটির মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে, জামাল আব্দুন নাসের তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক সচেতন রয়েছেন। তিনি আসলেও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক কামনা করেন। কিন্তু তার মনে জটিল সংশয় খুবই গভীরভাবে জায়গা করে আছে। তিনি এটাও অনুভব করেন যে, নাসের সোভিয়েতের উপর তেমন আস্থা রাখেন না। তিনি তাদের দিকে গ্লাভ্স পরেই হাত বাড়ান।" প্যারগ্যাস-এর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেন রাসেক প্রেসিডেন্ট জনসনের নিকট একটি স্মারক পেশ করলেন (এর সংযুক্তিগুলোর নম্বর ছিল ১৪৬৯)। এতে তিনি বলেন ঃ মিস্টার প্রেসিডেন্ট মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট নিরসনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমার অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ইয়ারেঙ নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যেমনটি ভাবা হচ্ছিল তেমন অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হচ্ছিল না। দেখা যায়, একদিকে ইসরাইল বলছে যে, সে কখনই মূল সমস্যা নিয়ে ইয়ারেঙের সাথে আলাপ-আলোচনা করবে না। বরং সে তার আরব প্রতিবেশীদের সাথে সামনাসামনি আলোচনায় প্রস্তুত । অথচ অপরদিকে তার প্রতিবেশী আরবরা তাদের ভূমি থেকে তার প্রত্যাহার ছাড়া তার সাথে কোন আলোচনায় যেতে আদৌ প্রস্তুত নয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে– অস্ত্রের প্রতি আরবদের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে সোভিয়েত প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে।

আমি ভাবছি কোন বিকল্প পথের কথা। যাতে এই বিপদ বিছানো মুখবন্ধ পথ থেকে বের হতে পারি। আমি এ প্রস্তাবটি জোরের সাথে পেশ করতে পারি তা হচ্ছে আমরাই আরব ও ইসরাইলের সাথে সংলাপে তৎপর হতে পারি। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আমরা এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাদ দিয়েই আরবদের সাথে বসতে পারি। এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে এমন এক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে যে, আপনার পক্ষে যে কোন পক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। যাতে এ ব্যক্তি আপনার পক্ষে তথা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব পেয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে।

ডেন রাসেক মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে তার মূল্যায়নে বলেন ঃ আমার বিশ্বাস আর্থার গোল্ডবার্গ (সে সময়কার জাতিসংঘে নিযুক্ত আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধি) ইসরাইলে আপনার প্রতিনিধি হতে পারে। সে এখন তার বর্তমান পদ প্রশাসনে ন্যস্ত করে এই কাজে নিয়োজিত হতে পারে। আমার বিশ্বাস, ইসরাইলীদের সাথে সিরিয়াস আলোচনা

করতে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর চমৎকার বুদ্ধিমত্তাও রয়েছে। তাছাড়া তিনি প্রথিতযশা আলোচকও বটে। পাশাপাশি তাঁর উপর ইসরাইলীদের আস্থাও রয়েছে। আরবদের প্রতি আপনার প্রতিনিধি কে হবে সে বিষয়ে বলছি। এর জন্য কয়েকজনের নাম ক্রমানুসারে সুপারিশ করছি। ডেভিড রকফেলার, ইউগিন ব্লাক, জন ম্যাকলে ও রবার্ট এন্ডারসন। আমি আপনার সামনে এ প্রস্তাব রাখছি। আপনার গুরুত্ব আরোপের অপেক্ষায় রইলাম। আমি রাষ্ট্রদূতকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি। তিনি আরব ও ইসরাইলীদের কাছে উত্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব প্রস্তুত করে রাখবেন।

তখন মনে হচ্ছিল সমাধানের আলোচনা হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরে এবং চারপাশে বেশ ঘুরপাক খাচ্ছিল। লিন্ডন জনসনের পত্রাবলী সঙ্কলনে এগুলো পাওয়া যায়। ডকুমেন্ট নং -৩৫৩১ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতে ছিল ঃ

প্রেসিডেন্টের প্রতি–

প্রেরক ঃ ওয়ালেট রোস্টো (জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা)।

আজ জেনারেল গুডবাস্টারের নিকট থেকে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের একটি প্রস্তাব পেলাম। এটাকে মনে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সমাধানের সবচেয়ে উপযোগী উপায়। তার মতে, আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো কোন আগ্রহ অনুভব করবে না। কারণ এ পর্যন্ত এর মাধ্যমে কোন কিছুতে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। পথটি হচ্ছে আইজেনহাওয়ারের মতে– যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে পানি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এক বিরাট প্রকল্পের প্রস্তাব দেবে, কারণ ভবিষ্যতের জন্য এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় 'পণ্য' হবে এই পানি। যদি যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠা করে যাতে পানি মিঠাকরণের কাজে তিনটি বড় পারমাণবিক স্থাপনার ব্যবস্থাপনায় তত্ত্বাবধান করে এবং জর্ডান, সিরিয়া, ইসরাইল ও মিসরের বিদ্যুৎ ও সেচের পানি সরবরাহ করে তাহলে এটা হবে– এমন একটি উপাদেয় মূল্য যার মধ্যে পক্ষগুলো শান্তির স্বাদ পেয়ে যাবে। এই প্রকল্পের সাইজ হবে আমার মনে হয় ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার। এ ধরনের একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হলে আরব ও ইসরাইলীরা এমন একটি ইনসেন্টিভের সন্ধান পাবে যার বাস্তবায়নে তারা সবাই সম্মিলিতভাবে কাজে লেগে যাবে। কারণ এতে তারা দেখতে পাবে যে, উষ্ণ মরুভূমিতে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বিবাদ-বিসংবাদে সময় নষ্ট করার চেয়ে সে কাজ করাই শ্রেয়, এতে সকলের বহুত বহুত ফায়দা হাসিল হয়।

॥ ৫ ॥

নিক্সন

"একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্য সুয়েজ ফ্রন্টের ওপর নির্ভরশীল।"

—১৯৬৯ সালের পরিস্থিতি মূল্যায়নে জামাল আব্দুন নাসের

এই সকল যোগাযোগ. চিঠিপত্র ও স্মারক চালাচালি এবং দূতদের দূতিয়ালি সত্ত্বেও কোন সমাধান অথবা সমাধানের আশা দেখা যায়নি, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত লিন্ডন জনসন হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যা-ই বলুক না কেন, অথবা স্বয়ং হোয়াইট হাউস থেকে ইস্যুকৃত কাগজপত্র যা-ই প্রকাশ করুক না কেন একদিকে ইসরাইল ও তার বন্ধুদের মধ্যকার সরাসরি সম্পর্ক, অন্যদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনসন– এরাই হচ্ছে আমেরিকান সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল আধিপত্যকারী পক্ষ। এদিকে ইসরাইলের জন্য আমেরিকান অস্ত্র কারবারে চলছিল প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। অপরদিকে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের জন্য সোভিয়েত অস্ত্র কারবার প্রতিযোগিতা চলছিল। এভাবেই শক্তি ক্ষয়ের যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যবেক্ষণকারী এটাকে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের একটি স্বতন্ত্র রাউণ্ড হিসাবে গণ্য করেন।

জনসনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরাইল এমন একটি সমাধানের ওপর দৃঢ়মূল ছিল যার সূচনা হবে তিনটি আরব দেশের দখলকৃত ভূমির বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে। অর্থাৎ জবরদখলকে বাস্তবতা ধরে নিয়ে। অন্যদিকে মিসর এই বাস্তবতাকে পরিবর্তনেই ছিল দৃঢ়প্রত্যয়ী। তার সংকল্পের ঘোষণা ছিল– সুয়েজ খালের লাইনে মোকাবিলা অব্যাহত রাখতে হবে।

লিন্ডন জনসন তাঁর প্রেসিডেন্সির শেষ মাসগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটে শেষ চেষ্টাটুকু করেন। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি। কারণ, এমন একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, যার সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে অথচ দ্বিতীয়বার তিনি ভোটে জেতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না, তাঁর এ ধরনের চেষ্টা এহেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চলমান ঘটনার সামনে থোড়াই টিকতে পারে।

রিচার্ড নিক্সন হোয়াইট হাউসে ঢুকলেন। অন্যদের মতো তাঁর চিন্তা-চেতনায়ও পবিত্র ভূমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার নয়া স্বপ্ন দোলা দিয়ে যেতে লাগল। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের

প্রচণ্ডতাই প্রধানত তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নামাল। এটা ছিল সবচেয়ে বড় চেষ্টা এবং কিছু একটা করার সম্ভাবনার সবচেয়ে কাছাকাছি।

যখন নিক্সন ওভাল অফিসে তাঁর আসনে বসলেন তার সামনে দু'টি সমস্যা দেখতে পেলেন ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্য। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তার পাশে দু'ব্যক্তিকে পেলেন– জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জার আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স। তার সিদ্ধান্ত ছিল প্রত্যেককে একটি করে বিষয়ের সুরাহার দায়িত্ব দেয়া যাক। কিসিঞ্জার দেখবেন ভিয়েতনাম সমস্যা আর মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের দেখাশোনা করবেন 'রজার্স'।

এদিকে ওয়াশিংটনে যা হচ্ছিল তা কায়রো কর্তৃপক্ষের কাছে সুস্পষ্ট ছিল। জামাল আব্দুন নাসের দেখলেন যে এ্যাকশনের একটি পর্যায়ের উত্তরণ ঘটেছে। এর মধ্যেই সকল পক্ষের কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মিসরীয় জাতি পরাজয়ের বাস্তবতা গ্রহণ করেছে বটে, তবে এটাকেই ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি মনে করছে না। একই সময়ে সে এ যুক্তিও গ্রহণ করেছে যে, 'যা শক্তি দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তা শক্তি প্রয়োগ ছাড়া পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়।' এর মূল্য দিতেও সে এখন রাজি। এ প্রেক্ষাপটেই মিসরের অবস্থান একেবারে নিচে নেমে যায়নি, যেমনটি ইসরাইল ও জনসন আশা করেছিল। তাঁরা উভয়ে অপেক্ষা করেছিলেন যে কোন রকমেই হোক তাঁদের আরোপিত শান্তি কবুল করাতে কিন্তু তারা মেনে নেয়নি। বরং ফল হলো উল্টো। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মিসর উঠে এল এবং রাজনৈতিক এ্যাকশনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিল।

এদিকে নিউইয়র্কে চার বৃহৎ শক্তির সাথে বৈঠক এবং দীর্ঘ যোগাযোগের পর (১৯৬৭-এর শেষভাগ আর পুরো ১৯৬৮ সাল জুড়ে) সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

এর সারবত্তা হলো– ইসরাইল আসলে কোন ন্যায়নুগ সামাধানের জন্য প্রস্তুত নয়, আর আরব– যার অগ্রভাগে রয়েছে মিসর– তাদের সামনে অস্ত্রের চাপ প্রয়োগের জন্য একরকম লড়াই করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। উইলিয়াম রজার্স পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট বিষয়ে দায়িত্ব লাভ করার কয়েক মাস পরে তিনি একটি পরিকল্পনা নেন, যা পরে তাঁর নামে 'রজার্স পরিকল্পনা' হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। রজার্সের এই পরিকল্পনাটি ছিল তাঁর উপদেষ্টা উইলিয়াম কোয়ান্ট–এর লেখা অনুসারে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সংবলিত। এতে প্লানটির উদ্দেশ্য বলা হয়েছে– মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন বাস্তবায়ন। এটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জুনার ইয়ারেঙ-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে ঠিক সেভাবে বিন্যস্ত করা হবে যেটা ১৯৪৯ সালে রোডস আলোচনায় অনুসৃত হয়েছিল (পক্ষগুলো সামনাসামনি বৈঠকে মিলিত হবে না বরং আন্তর্জাতিক

মধ্যস্থতাকারী তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং মতৈক্যের পয়েন্ট নির্ধারণের লক্ষ্যে পক্ষগুলোর মধ্যে যাওয়া-আসা করবেন)।

প্লানটির অন্যান্য পয়েন্ট ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ইসরাইল একটি চুক্তিতে উপনীত হবে। এতে ইসরাইল যুদ্ধের সময় সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের যে ভূমি জবরদখল করেছিল তা থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহারের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য সময়সূচী নির্ধারণ করবে।

২.ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধাবস্থার সমাপন হবে। উভয় পক্ষ এ মর্মে অঙ্গীকার করবে যে, শান্তি অবস্থার সাথে সঙ্গতিশীল নয় এমন যে কোন তৎপরতা থেকে বিরত থাকবে। এটি আগ্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকাকেও শামিল করবে। উভয় পক্ষ জাতিসংঘ অঙ্গীকারকে মেনে চলবে।

৩. উভয় পক্ষ এ মর্মে চুক্তিতে উপনীত হবে যে, কিছু নিরাপদ অঞ্চল সৃষ্টি করা হবে এবং অনস্বীকার্য মানচিত্র অনুসারে স্বীকৃত সীমান্ত মেনে চলবে। এই সাথে 'তিরান' প্রণালীসমূহে অবাধ জাহাজ চলাচলের গ্যারান্টিও থাকবে।

৪. উভয় পক্ষে 'রোডস' মডেলের ভিত্তিতে পরোক্ষ আলোচনার মাধ্যমে নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলসমূহের ব্যাপারে চুক্তিতে উপনীত হবে। এছাড়া তিরান প্রণালীতে অবাধ নেভিগেশন এবং গাজ্জা উপত্যকার ভাগ্য নির্ধারণে প্রক্রিয়া গ্রহণে ঐক্যমত্যে পৌঁছবে।

৫. উভয় পক্ষ সেভাবেই ঐকমত্যে পৌঁছাবে যেভাবে ইসরাইলসহ সকল দেশের সামনে "তিরান" প্রণালীতে জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৬. সুয়েজ খালে তার সার্বভৌম অধিকার খাটাতে হলে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রকে সকল দেশের অবাধ নৌ-চলাচলের স্বীকৃতি দিতে হবে। সকলের অবাধ যাতায়াতে কোন নাক গলাতে পারবে না। এর মধ্যে ইসরাইলও শামিল রয়েছে।

৭. উভয় পক্ষ একমত হবে যে জর্ডান ও ইসরাইলের মধ্যে চূড়ান্ত সমাধানের শর্তে উদ্বাস্তু সমস্যার ন্যায়নুগ সমাধান করা হবে।

৮. সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ইসরাইল প্রত্যেকে প্রত্যেকের সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং শান্তিপর্ণ সহাবস্থানের স্বীকৃতি দেবে।

৯. চূড়ান্ত চুক্তির জন্য উভয় পক্ষ একটি দলিলে স্বাক্ষর করে তা জাতিসংঘে জমা রাখবে এর কার্যকারিতা জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট পেশ করার সময় থেকে শুরু হয়ে যাবে।

১০. উভয় পক্ষ চুক্তিটিকে প্রত্যয়নের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সামনে রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স চুক্তির সহায়তা করার অঙ্গীকার দেবে।

ইসরাইল কিন্তু পরিকল্পনাটি গ্রহণ করল না বরং এর প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিল। মিসরও এ প্লানটি গ্রহণ করল না। সে অপেক্ষা করল যেন প্রত্যাখ্যানটি প্রথমে

ইসরাইল থেকে আসে। কিন্তু এ অঞ্চলের পরিস্থিতি স্থবিরতা কাটিয়ে একটি সূক্ষ্ম ও বিপজ্জনক স্রোতে প্রবাহিত হতে লাগল।

জামাল আব্দুন নাসের রজার্স প্লানটি বেশ কয়েকটি কারণে গ্রহণ করেননি। এর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হলো উদ্যোগটি নিছক মিসরভিত্তিক সমাধানের মধ্যে সীমিত ছিল।

এটাই ছিল মৌলিক শর্ত, যার পর আর কোন বিস্তারিত জানার দরকার পরে না। নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সমাধানের কিছু মৌলনীতির একটি সাধারণ প্রেক্ষিতে রচনা করেছিল যা সকল পক্ষের ওপরই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে রজার্সের উদ্যোগ কেবল মিসর ফ্রন্টের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও "রজার্সের উদ্যোগে" এমন কিছু পয়েন্ট ছিল যা নিতে জামাল আব্দুন নাসের আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। যেমন ধরা যাক, মিসরী জলপথে নৌ-চলাচলের বিষয়টি। স্পষ্টত তিনি জরুরী পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন। আর তাই সাধারণ আন্তর্জাতিক ঐকমত্যের মোকাবিলায় উপসাগরে ইসরাইলী নেভিগেশনকে বাধা দিতে পারবেন না– এই উপলব্ধির দিকেই মোড় নিলেন। কিন্তু সুয়েজ খালের ব্যাপারে তাঁর অভিমত ছিল যে, তা এ পর্যায়ে যায়নি। বরং এর ব্যাপারে কথা উঠবে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সমাধানের সময়। এর মধ্যে ভূমি সমস্যা ও শরণার্থী সমস্যাও শামিল আছে। তার বাহ্যিক অজুহাত ছিল এই যে, ইসরাইল সুয়েজ ক্যানেল ব্যবহার করলে তা মিসরের ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর সাথে সংঘাতের বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে। কারণ ঐ শহরগুলো সুয়েজের দু'পাশেই গড়ে উঠেছে, যেমন সুয়েজ ইসমাইলিয়া ও পোর্ট সাঈদ। এতে অচিরেই নৌ-চলাচলে যেমন সমস্যা সৃষ্টি হবে তেমনি খালটির নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। অপরদিকে জামাল আব্দুন নাসের প্লানটি প্রত্যাখ্যানের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেও চাননি। বেশ কিছু কারণে তিনি চেয়েছিলেন যে, ইসরাইলই প্রথমে তাদের প্রত্যাখ্যানের কথা ঘোষণা করুক।

কারণগুলো ছিল এ রকম ঃ

আরব অবস্থানটি সার্বিকভাবে ভালোর দিকে যাচ্ছিল, প্রাচ্য ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা চলছিল এবং এর নেতৃত্বে সিরিয়া ও ইরাক যোগ দিয়েছিল। তিনি চাচ্ছিলেন যেন এই নেতৃত্ব তার ভূমিকা পালনের জন্য আরেকটু শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পায়। না হয় এই ফ্রন্টের ওপর রাজনৈতিক ও মিডিয়া আক্রমণ এসে পড়বে এবং দক্ষিণের মিসর ফ্রন্টের সাথে পূর্বের ফ্রন্টের সম্পর্ক সুদূর হওয়ার আগেই পক্ষগুলোর মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হবে।

নতুন পরিকল্পনার মূল রূপরেখা ছিল এ রকম ঃ

১. মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেগমথিত ঘনিষ্ঠতা হতে পারে, যার মাধ্যমে একটি যৌক্তিক সমাধান সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

অধিকৃত এলাকার সামরিক শক্তির পাল্লা এখন ইসরাইলের দিকেই ভারী। কারণ আমেরিকান সামরিক সরবরাহ অব্যাহতভাবেই তার জন্য চলছে, বিশেষ করে "ফ্যান্টম" বিক্রয় করছে। ব্যাপক আমেরিকান সাহায্যও যে কোন সময় তার পিছনে এসে দাঁড়াতে পারে এবং তার শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। যখন বিষয়টি এমনই, তখন মোকাবিলার পর্যায়কে আঞ্চলিক থেকে আর্ন্তজাতিক স্থানান্তর করাই শ্রেয়। অর্থাৎ এখন আরও জোরালো ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবিলায় এ ভূমিকা পালন করার এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন। এতে স্থানীয় শক্তি তাদের সামরিক অবস্থান তৎপর হয়ে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে সুযোগ পাবে। কারণ তখন দু'টি বৃহৎ শক্তির মধ্যে সংঘাত এড়াবার জন্য স্থানীয় শক্তিকে ঠাণ্ডা করার দাবি উঠবে অনিবার্যভাবেই।

জামাল আব্দুন নাসের তাঁর মস্কো সফরে প্রস্তাব দিলেন নতুন এক পরিকল্পনার। তিনি বোঝালেন যে, মিসরে আরও সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতি মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের যে কোন ভূমিকার বিরুদ্ধে বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দেবে। অনুরূপভাবে মিসরের নীতির জন্যও একটি ধমকি হয়ে থাকবে। এতে করে মিসরী বাহিনী- চাই আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী বা আর্টিলারি ও বিমান বাহিনী যুদ্ধ ফ্রন্টে তার চেষ্টাকে সুদৃঢ় করতে আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

সাধারণ আরব অবস্থানটি ১৯৬৯-এর মে-তে সুদানের এবং সেপ্টেম্বরে লিবিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় আরেকটু ভালর দিকে যাচ্ছিল।

তিনি এ দু'টি প্রশাসনকেও তাদের কর্তৃত্ব দৃঢ় করার সুযোগ দিতে চাইলেন। না হয় পাছে খার্তুম ও ত্রিপোলী আমেরিকান চাপের মুখে পড়ে যাবে। বিশেষ করে লিবিয়াতে যেহেতু কিছু আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি ছিল যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো হারাবার আশঙ্কায় ছিল।

২. রজার্স উদ্যোগের বিভিন্ন ধারায় অনেক আপত্তিকর বিষয় থাকা সত্ত্বেও এমন কিছু মূলনীতিও ছিল, যার মাধ্যমে অবস্থার উন্নয়নের চেষ্টায় একটা ভিত্তি গ্রহণ করা যেতো। কারণ এ উদ্যোগের ধারাগুলো আন্তর্জাতিক সীমান্ত প্রত্যাহার নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। অথচ এটা ছিল ইসরাইলের স্বার্থের বিরোধী। অনুরূপভাবে এই ধারাগুলো 'রোডস মডেলে' পরোক্ষ আলোচনার ধরনকে অনুসরণের কথা বলেছিল, অথচ ইসরাইল চাচ্ছিল সামনাসমনি প্রত্যক্ষ আলোচনা। এছাড়া এর ধারাগুলো শান্তপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে একটি চুক্তির কথা বলেছিল, পক্ষান্তরে ইসরাইলের দাবি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শান্তির অঙ্গীকার। কাজেই প্রেসিডেন্ট নিক্সন অধৈর্য হয়ে তড়িঘড়ি করে তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স-এর উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করার কোন যুক্তি ছিল না।

৩. জামাল আব্দুন নাসের দেখলেন যে, লেফি আশকুল-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্থানে গোল্ডা মায়ার-এর প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের পর ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নানা

সমস্যার সম্মুখীন। ইসরাইলে রাজনীতির স্বভাব অনুসারে এ ধরনের অবস্থায় কর্তৃত্বের দৃঢ়তায় এক ধরনের আড়ষ্টতা দেখা দিতে পারে। যদি মিসর রজার্সের উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে প্রথমেই মুখ খোলে তাহলে এটা ইসরাইলকে নীতিগত সিদ্ধান্তের কর্তৃত্বকে দৃঢ় করার সুযোগ এনে দেবে। এর চেয়ে বরং নতুন প্রধানমন্ত্রীকে (মহিলা) তাঁর দলের বিভক্তি আর বিরোধী দলের চাপ এবং এ উদ্যোগের ব্যাপারে তাদের মতবিরোধের মধ্যে ছেড়ে রাখাই ভাল। মিসর আগেই তা প্রত্যাখ্যান করলে তো তাদের মধ্যে আর বিভেদ থাকবে না।

৪. তাঁর মনে একটি অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল যে, মধ্যপ্রাচ্যের মঞ্চে একটি আমূল পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়ে যাবে। দেখা গেল একদিকে ব্রিটিশ সরকার পূর্ব সুয়েজ থেকে প্রত্যাহারের নতুন নীতি ঘোষণা করল। এর অর্থ হচ্ছে–বৃটেনে সাইপ্রাস থেকে আরব উপসাগর এমনকি হংকং পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে তার সামরিক ঘাঁটি সাফ করে নিয়ে যাবে। একই সময় আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিবাদ বিসম্বাদে পুলিশের ভূমিকা পালন করতে চায় না। বরং ভাল হয় যদি এসবকে তার নিজস্ব গতিতে চূড়ান্ত পরিণতির জন্য ছেড়ে দেয়া।

৫. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আগুন তো আছেই, পাশাপাশি এ অঞ্চলে বিরাজমান অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতাই মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটকে জিইয়ে রেখেছিল এবং পূর্ব ফ্রন্টের ওপর সামরিক এ্যাকশনকে চাঙ্গা করতে সহায়তা করেছিল। সে সময়টিতে 'কারামতের লড়াই' সংঘটিত হয়েছিল; এতে ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ বাহিনী অংশ নিয়েছিল। এ যুদ্ধে জর্ডান বাহিনীর কিছু ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর অর্থ হচ্ছে, ইসরাইলী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের অপারেশনগুলোতে আরব ফ্রন্টগুলো গোলাবারুদের টিকা নিচ্ছিল।

এ সকল কারণে জামাল আব্দুন নাসের ভাবলেন যে, তাঁর আলোচনাগত অবস্থানে নানান গুজবের সুযোগ রয়েছে। এ সময় তাঁকে আরেকটি বিষয় সাহায্য করেছিল তা হচ্ছে– ইসরাইল সে সময় সুয়েজ উপসাগরে মিসরী অবস্থান থেকে একটি রাডার চুরি করার জন্য অপারেশন করে। এদিকে তিনি ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে তাঁর সেই বিখ্যাত গোপন মস্কো সফর করেন। তখন কাজের নতুন পর্যায় সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা তাঁর ছিল।

মিসরী ফ্রন্ট ছিল সুয়েজ খালের পাড়ে। এ স্থানেই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে যাচ্ছে। যদি মিসরী বাহিনী বড় কোন অপারেশনে সফল হয়– চাই সীমিত আকারেই এবং গ্রেনেট-১ পরিকল্পনা অনুসারে সুয়েজ খাল পার হতে পারে; বিশেষ করে তার বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ইসরাইলী স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে আমেরিকা ষষ্ঠ নৌ-বহরকে তার সনাতনী ভূমিকা

পালন থেকে বিরত রাখা যায় তাহলে এ অঞ্চলে এক নতুন শক্তির ভারসাম্যের আবির্ভাব ঘটবে।

ঠিক এটাই জামাল আব্দুন নাসের মস্কোতে প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি সামষ্টিকভাবে সোভিয়েত নেতৃত্বকে মোকাবিলা করেন এবং সতর্ক করে দেন যে, একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ সুয়েজ ফ্রন্টের সাথে সম্পৃক্ত– চাই সোভিয়েত তা সানন্দে স্বীকার করুক বা বাধ্য হয়ে।

কিন্তু উত্তপ্ত আলোচানার পর সোভিয়েত নেতৃত্ব তা মেনে নেয়। তার একমাত্র শর্ত ছিল যে, 'আল উবুর যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় মিসরে একেবারেই সোভিয়েত বাহিনী থাকবে না।' এটা জামাল আব্দুন নাসেরেরও শর্ত ছিল। তিনি কিছু বোধগম্য মনস্তাত্ত্বিক কারণেই চেয়েছিলেন যেন যুদ্ধটি হয় একেবারে নির্ভেজাল আরব লড়াই। এর কিছু বাস্তব কারণও ছিল– যা নিরূপণ করা অসম্ভব নয়। মূল কারণটি ছিল, যুদ্ধের সময় মিসরে সোভিয়েত বাহিনী থাকলে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ময়দানে উপস্থিত হওয়ার একটি ছুতা পেয়ে যাবে। যে কোন জটিলতাকে বাদ দিলেও এটা নিশ্চিত যে, বিষয়টি যা-ই হোক দুটি বৃহৎ শক্তির কেউই তাদের সরাসরি মোকাবিলায় যাবে না।

যখন মিসরের দিকে সোভিয়েত বাহিনীর আগ্রগামী দল আসতে শুরু করল এবং গভীরভাবে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিল, আর ভূমধ্যসাগরের পূর্ব প্রান্তদ্বয়ের জলসীমায় টহল দেয়া শুরু করল তখন সকল পক্ষের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে গেল– মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটে এখন ভিন্ন বাস্তবতা জানান দিতে আর বেশি বাকি নেই।

॥ ৬ ॥

চসেস্কু

"আমার মনে হয় না ইসরাইলের এখন কোন শান্তি পরিকল্পনা রয়েছে।"

—জামাল আব্দুন নাসের ১৯৭০ সালে রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকোলাই চসেস্কুর প্রতি

এই সমরখণ্ডে শান্তি দূতদের সংখ্যা বেজায় বেড়ে গিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে অর্থপূর্ণ পাঁচটি বিশেষ প্রচেষ্টা চলে।

প্রথম উদ্যোগ নেন নাহুম গোল্ডম্যান। ইনি একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রেসিডেন্ট টিটোর সাক্ষাতে যান। (টিটো এক পত্রে এ বিষয়টি জামাল আব্দুন নাসেরের কাছে পাঠান। এর আসল কপি আবেদীন প্রাসাদে সংরক্ষিত আছে)।

গোল্ডম্যানের দর্শন ছিল " ইসরাইল এখন প্রস্তুত" জুন, ১৯৬৭-এর পর এই প্রথমবারের মতো তার নীতিতে পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছে। তিনি টিটোকে বলেছিলেন, "ইসরাইলী নেতাদের মধ্যে এখন রাজনৈতিক মতবিরোধ চলছে। মতবিরোধ রয়েছে রাজনীতিক ও সামরিক জান্তাদের মধ্যে। জনমতের মধ্যেও বিভক্তি রয়েছে। কারণটি হচ্ছে যুদ্ধের দায়ভারে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপর্যয়। সবার উপরে সেখানে মতবিরোধ রয়েছে বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থা ও ইসরাইলের মধ্যে। কারণ সেই বেন গোরিয়নের যমানা থেকে ইসরাইলী সরকার চাইত বিশ্বের জায়নিস্ট সিদ্ধান্তগুলো তার হাতের মুঠোয় রাখতে। ওদিকে তার নেতৃত্বে বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থা ইহুদী নীতির বাস্তব নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরে নিজের কব্জায় রেখে এসেছে। কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধই পেলাম, যার কোন শেষ নেই। শান্তির বহু সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল কেবল এমন কিছু উচ্চাভিলাষী খেয়ালের কারণে– যা ইসরাইলী নেতাদের মগজে ভর করেছিল। টিটোর কাছ পেশকৃত গোল্ডম্যানের প্রস্তাবের মোদ্দা কথা ছিল, মিসর গোল্ডম্যানকে কিছু শিক্ষা দেয়ার এই তো সুযোগ, যাতে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, ইসরাইলের বর্তমান পরিস্থিতিতে সে তাকে কুচলিয়ে দিতে পারে এবং অন্যদেরকেও বুঝিয়ে নিতে পারে। টিটোকে গোল্ডম্যান প্রস্তাব দেন যেন তার ও জামাল আব্দুন নাসেরের মধ্যে একটি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। আর এ সাক্ষাতের ঘটনাটি ঘটবে খুবই সঙ্গোপনে। কায়রোতেও হতে পারে। গোল্ডম্যান তথায় আসতে প্রস্তুত। যুগোস্লোভিয়াতেও হতে পারে তখন তো টিটো হাতে-কলমেই পরিস্থিতি ঠাণ্ডা রেখে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি করতে পারবেন। জামাল আব্দুন নাসের দেখলেন গোল্ডম্যান সাধারণ দৃশ্যপট

তুলে ধরেছেন অনেকটা সঠিকভাবেই। কিন্তু তারপরও তিনি গোল্ডম্যানের সাথে সাক্ষাতে রাজি হতে পারেন না। এর কারণও তিনি টিটোকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এদিকে তিনি এও বিশ্বাস করেন না যে, বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থার সিদ্ধান্ত ইসরাইল সরকারের ওপর কখনও আবশ্যিক বিষয় হবে। হ্যাঁ, যদি প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে অন্য কথা। অপরদিকে যেমনটি তিনি টিটোকে জানিয়েছিলেন যে– তিনি আগেই জানতেন যে, বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থা এবং ইসরাইলী সরকারের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। এই বিরোধের এক উত্তেজনাময় মুহূর্তে গোল্ডম্যান অথবা ইসরাইলী সরকার অচিরেই এই সাক্ষাতের কথা প্রকাশ করে দেবে, যদি জামাল আব্দুন নাসের আদৌ রাজিও হতেন।

এছাড়াও জামাল আব্দুন নাসেরের মত ছিল যে, এ পরিস্থিতিতে কোন গোপন সাক্ষাৎ একটা অযৌক্তিক চিন্তাও বটে।

এর চেয়ে বরং ভাল, যদি সার্বিক বিবেচনায় কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন হয়, তাহলে তা প্রকাশ্যে হওয়াই ভাল– যাতে আরব জনমতের কাছে কোন কিছু গোপন না থাকে। কারণ তারা তো তাদের সমগ্র চেতনা দিয়ে এই অস্থির পরিস্থিতিকে অনুভব করে– যার শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সাল থেকে। মনে হয়, এ সময় টিটো এই সব গোল্ডম্যানকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। টিটো ফের জামাল আব্দুন নাসেরের নিকট জানতে চেয়ে লেখেন যে, ব্রিওনিতে গোপনে এ বৈঠক সম্ভব কিনা, নাকি এতে জামাল আব্দুন নাসের অংশগ্রহণ করবেন না বরং মিসরীয় পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কোন বন্ধু বেসরকারীভাবে অংশগ্রহণ করবে। গোল্ডম্যান প্রস্তাব করেন– টিটোর বর্ণনামতে এই বৈঠক মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল মিসরীয় পক্ষ হতে পারেন।

জামাল আব্দুন নাসের টিটোকে উত্তর দেন যে, হাইকালের অংশগ্রহণের অর্থ আমি ব্যক্তিগতভাবে সে বৈঠকে উপস্থিত থাকা। কারণ তাঁর সাথে আমার সম্পর্কের বিষয়টি সবাই সেভাবেই জানে। এরপর জামাল আব্দুন নাসের টিটোকে প্রস্তাব দেন যে, এই ঘোরাঘুরির বদলে গোল্ডম্যানের কাছে জানতে চাওয়া যায় যে, বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থা কি ধরনের সমাধানের চিন্তা-ভাবনা করছে। অথবা এই সংস্থাটি ইসরাইলী সরকার থেকেও অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা তলব করতে পারে।

টিটোর সাথে সংলাপে আশাব্যঞ্জক কিছু না পেয়ে দ্বিতীয় উদ্যোগটি গোল্ডম্যানই নেন। সেই মুহূর্তে দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে মিসরের এক রহস্যময় ও প্রাচীন কমিউনিস্ট ব্যক্তি। ইনি হচ্ছেন হেনরি কোরিয়েল। বিপ্লবের আগে দীর্ঘ ক'বছর এবং পরেও সামান্য সময়ের জন্য ইনি মিসরের সবচেয়ে বড় কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি ছিলেন। তাঁর পার্টির নাম ছিল 'হাদিতো'। যখন কোরিয়েল শেষবারের মতো মিসর ছাড়েন তখন অন্যদের মতো তিনি ইসরাইলে যাননি, বরং প্যারিসে গিয়ে সেখানে বসবাস

শুরু করেন। সেখানে তাঁর পার্টির নেতৃত্বের কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেখান থেকে তিনি মিসরের সেই সব কমিউনিস্ট বিপুল সংখ্যক লোকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। যাঁরা তাঁর পার্টির সাথে পুরনো সংশ্লেষের কারণে প্রভাবিত হয়ে তাঁদের সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, বস্তুত তাঁদের একটা বিরাট অংশ এখনও হেনরি কোরিয়েলকে শিক্ষাগুরু মানেন।

কোনভাবে এই হেনরি কোরিয়েল ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে গোল্ডম্যান ও মিসরের বামপন্থী এক দিকপালের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। (ইনি হচ্ছেন 'হাদিতো' পার্টির সাবেক দায়িত্বশীল, পরে এই পার্টিকে হেনরি কোরিয়েল লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন)। প্যারিসের ১৭ নং মহল্লায় অবস্থিত হেনরি কোরিয়েলের ফ্ল্যাটেই এ বৈঠক হয়। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে– গোল্ডম্যান এ বৈঠক থেকে বের হয়ে গোল্ডা মায়ারের কাছে বার্তা পাঠান যে, তিনি মিসরের আরব সাম্যবাদী ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন এবং তিনি কায়রো সফরের দাওয়াত পেয়েছেন।

প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের ভেদ কায়রো যখন জানল তখন ইসরাইলে তা দ্বিগুণ-বহুগুণ হয়ে বিস্ফোরিত হলো। এটা ফরাসী সংবাদ সংস্থার একটি খবরে প্রকাশ পেল। এতে বলা হয়, জায়নিস্ট নেতা নাহুম গোল্ডম্যান মিসর সফরের একটি আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এতে ইসরাইলে চরম মতবিরোধ দেখা দিল। নেসেটও এতে শামিল হলে শেষে পর্যন্ত এটা যুক্তফ্রন্ট সরকারেও বিরূপ প্রভাব ফেলল। গোল্ডম্যান যে বার্তাটা গোল্ডা মায়ারকে পাঠিয়েছিলেন, এটা ইসরাইলী মন্ত্রিসভায় ফাঁস হয়ে গেল। সেখানে থেকে কিছু পত্রিকায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ল। এতে ইসরাইল রাজনৈতিক মহলে গভীর প্রভাব পড়তে শুরু করল।

বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, বিক্ষোভ মিছিল বের হলো। এতে সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং ছাত্ররাও যোগ দিল। মন্ত্রিপরিষদের সামনে দিয়ে গোল্ডম্যানের সমর্থনে এবং গোল্ডা মায়ারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে মিছিল এগিয়ে গেল। কারণ তিনি (গোল্ডা মায়ার) প্রকাশ্যে বলেন যে, গোল্ডম্যান ইসরাইল সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন না, যদি মিসরী প্রতিনিধিদের কোন কিছু বলার থাকে তাহলে তা তার কাছেই পেশ করা উচিত– নাহুম গোল্ডম্যানের কাছে নয়। মোট কথা, এই কাহিনী শেষ পর্যন্ত ইসরাইলের শীর্ষ মহল ও বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থার মধ্যে বিরাট ফাটল সৃষ্টি করে।

প্যারিসের কিছু এজেন্সি স্বয়ং গোল্ডম্যানকে প্রশ্ন রাখতে চেষ্টা করেছিল যে, যদি তাঁর কাছে কায়রো সফরের আমন্ত্রণ পাওয়ার কোন প্রমাণ থেকে থাকে তাহলে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি তা বের করে দেখাতে পারেন। গোল্ডম্যানের নিকট দেখাবার মতো কোন প্রমাণই ছিল না। ইসরাইলী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে

দাঁড়িয়ে আবা ইবান বলেন (ফরাসী সংবাদ সংস্থার তারবার্তা অনুসারে), মিসরে গোল্ডম্যানকে আমন্ত্রণ জানানোর সামান্যতম কোন প্রমাণও নেই। দায়িত্বশীল অনুভূতির অভাবসঞ্জাত বাড়াবাড়ি ছাড়া পুরো বিষয়টিকে আর কিইবা বলা যেতে পারে। এটা ছিল একটা বড় সাবানের কেস। দুর্ভাগ্যবশত গোল্ডম্যানের মতো ব্যক্তি এমন একটি ভিত্তিহীন বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজে ড্রাম পেটালেন। এরপর "দ্য জেরুজালেম পোষ্ট" পত্রিকা খবর বের করল যে, "ইসরাইলের সরকারী উচ্চবৃত্তে একটি জনমত প্রচার পেয়েছে যে, গোল্ডম্যানই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। এরপর তিনি প্যারিসে যান এবং সেখানে কিছু বামপন্থী নেতার সাথে আলাপ-আলোচনা করেন।" গোল্ডম্যান এমন একটি ধারণা দিতে চেষ্টা করেন যে, প্যারিস বৈঠকটি যুগোস্লাভ সরকারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমেই হয়েছে। বেলগ্রেড সরকারই প্রথমে এই ঘোষণা দেয় যে, "তার সাথে এ বিষয়ে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।"

তৃতীয় উদ্যোগটি ছিল ইতালির। প্রখ্যাত শহর" ফ্লোরেন্সের" মেয়র "লাবেরা" এ উদ্যোগটি নেন। লাবেরা শুরুতেই জামাল আব্দুন নাসেরকে ফ্লোরেন্স নগরীর চাবি উপহার দিলেন। যখন দু'জনে বৈঠকে মিলিত হলেন তখন ইসরাইলের সাথে শান্তির বিষয়টি পাড়তে লাবেরা বেশি কালক্ষেপণ করলেন না। লাবেরা স্পষ্ট করেই বললেন– ইহুদী আন্দোলনের বড় দায়িত্বশীল (নাহুম গোল্ডম্যান) এবং শ্রমিক দল তারাই তাকে মিসরের সাথে চেষ্টা করে দেখতে বলেছেন। এই চেষ্টাটুকু হচ্ছে শান্তির দিকে সাধারণ অভিমুখিতার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার সহজাত সম্পূর্ণিমা। এটা ফ্লোরেন্সের সাংস্কৃতিক মর্যাদার সাথেও সঙ্গতিশীল। লাবেরার স্বপ্ন ছিল আরব-ইসরাইল সঙ্কট সমাধানের লক্ষ্যে বৈঠকগুলো বসবে মহান 'লরেঞ্জ' নির্মিত 'সিনোরিনা' প্রাসাদে।

জামাল আব্দুন নাসের অনুভব করলেন যে, লাবেরা তো সংস্কৃতির আদর্শ যুক্তি নিয়েই অগ্রসর হচ্ছেন– যা রাজনীতি থেকে বেশ দূরে। কাজেই তিনি তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। পরে বললেন যে, এ বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের সাথে আলোচনা করতে পারেন। পরের দিন 'লাবেরা' আল্ আহ্রাম পত্রিকা ভবনে প্রবেশ করলেন হাতে ছিল একটি দেবতার ব্রোঞ্জ মূর্তি– যে কিনা পৃথিবীর শান্তির অন্বেষায় নিরত। ফ্লোরেন্সে ফিরে এসে লাবেরা জামাল আব্দুন নাসেরের নিকট দু'টি পত্র পাঠান। প্রথমটি ছিল নাহুম গোল্ডম্যানের পত্র যা তিনি তাঁর (লাবেরা)কাছে পাঠিয়েছিলেন।

প্রফেসর জার্জিও লাবেরার কাছে নাহুম গোল্ডম্যান যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তার ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রিয় বন্ধু,

আমি দুঃখিত যে, বেশ কিছু সময় ধরে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। বিগত ২০ মার্চ আমাদের সর্বশেষ সাক্ষাতের পর আমি নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম, এরপর প্যারিসে ফিরে এলাম। এপ্রিলের শেষ দিকে আমি ইসরাইলে যাচ্ছি। আমি পত্র-পত্রিকায় পড়েছি, আপনি সর্বশেষ মিসর সফরে ছিলেন। এর পর ইসরাইলে গিয়েছেন। আপনি এখনও শান্তিপূর্ণ সমাধানে আশাবাদী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি এখন আমার আশা হারাচ্ছি এবং আমার আশাবাদ অন্তর্হিত হচ্ছে। কারণ আমার সামনে সংশয়ের অনেক কারণ বিদ্যামান। সম্প্রতি আমি ব্যাপক যোগাযোগ করেছি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। মার্শাল টিটোর সাথেও দীর্ঘ আলোচনা চালিয়েছি। প্রতিটি দিক থেকেই প্রত্যেকের কাছে শুনলাম যে, যে ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক তিনি হচ্ছেন 'হাইকাল'। আমি জানি, হাইকাল ও আবা ইবানকে একত্রিত করার আপনার একটা পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু মার্শাল টিটো আমাকে বলেছেন যে, এ চিন্তাটি অথবা হাইকাল ও আমার মধ্যে বৈঠকের চিন্তা বাস্তবায়ন কঠিন হবে। এ ধারায় আপনার কিছু করা কি সম্ভব হবে ? আপনি এপ্রিলের মাঝামাঝি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যাতে আমরা রোমে অথবা প্যারিসে মিলিত হতে পারি।

আপনার মাথায় কোন নতুন চিন্তা এলে আমাকে লিখবেন। কারণ একটা কিছু করার জন্য আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার। আশা করি অচিরেই আপনার কাছ থেকে একটি জবাব পাব। আমার জেনেভার ঠিকানায় পাঠালেই ভাল হবে। তা হচ্ছে ঃ ২৬ মালাগনু রোড । প্রিয় বন্ধুবর, আমাদের আসন্ন সাক্ষাতের প্রত্যাশা রইল।

—নাহুম গোল্ডম্যান।

দ্বিতীয় পত্রটি ছিল স্বয়ং লাবেরার নিকট থেকে জামাল আব্দুন নাসেরের প্রতি। এর ভাষা ছিল এ রকম ঃ

মাননীয়ে,

এ সময়ে যখন বিরাট বিষয়গুলোতে গতি সঞ্চারিত হচ্ছে তখন আলোচনা ও শান্তির চিন্তা-ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এটা এখন ভিয়েতনামসহ সারা বিশ্বেই ঘটছে। এ প্রেক্ষাপটে আপনি কি মনে করেন যে, মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটও মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে অনুরূপ কোন পথ খুজে পেতে পারেন ? আমি পূর্ণ আশা ও বিশ্বাসের সাথে আপনার বন্ধু হাইকাল ও আবা ইবানের মধ্যকার সাক্ষাতের পরিকল্পনাটি উত্থাপন করছি। আবা ইবান প্রস্তুত রয়েছেন। আমি জানি, ইসরাইল অনেক অপরাধ করেছে, তবুও আমাদের তো সব সময় আশা আর চেষ্টা করে যেতে হবে। মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন।

লাবেরা তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, আমি আশা করি, আপনি আমাকে লেখা গোল্ডম্যানের পত্রটি মনোযোগের সাথে পড়বেন। আমি পত্রটির একটি কপি সংযুক্ত করে পাঠালাম।

শান্তিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধ অসম্ভব। গেরিলা যুদ্ধে কোন ফল হবে না। একমাত্র অবশিষ্ট বিষয়টি হলো আলোচনা। বিশ্বের সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে আলোচনার কোন বিকল্প নেই।

মান্যবর,

আমি চাই আপনি আপনার চূড়ান্ত সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করবেন। ইসরাইলের প্রতি আমাদের ভূমিকা হচ্ছে 'জানালা খোলার' ভূমিকা। আবা ইবান ও হাইকালের মধ্যকার বৈঠক অথবা আরও উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সম্পর্কে আমার পরিকল্পনাটি দিন দিন আরও বেশি সঠিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সব কিছু ছাপিয়ে আমার আশা জেগে আছে। আমাকে দোয়া করবেন।

স্বা/
–লাবেরা

এরপরের চতুর্থ প্রচেষ্টাটিও ছিল ইতালীয়। এ উদ্যোগটি গ্রহণ করেন ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সহসভাপতি সিনেটর 'পায়েটা'। উদ্যোগটি ছিল পরোক্ষ। কারণ ইতালীয় সোস্যালিস্ট পার্টির সহসভাপতি কায়রোতে একটি প্রকল্প নিয়ে এলেন, বাহ্যত এর সাথে আরব-ইসরাইল সংঘাতের কোন সম্পর্ক নেই। এ প্রকল্পের মোদ্দা কথা ছিল, বিশ্ব দূরপ্রভাবী পরিবর্তনগুলোর মাধ্যমে অস্থির হয়ে উঠছে। ভূমধ্যসাগরকে বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্র এবং যুদ্ধের ময়দান হিসাবে বেছে নিয়েছে তাদেরকে এ আধিপত্য থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের স্বজন ও মলিকদের কাছে। তারা এটাকে বানাবে শান্তি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনাবিল হ্রদ। পায়েটার প্রস্তাব ছিল একটি সম্মেলন করে সেখানে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে অবস্থিত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা উন্মুক্ত বৈঠকে বসে এই সাগর পাড়ের দেশগুলোর নিরাপত্তাসহ শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করবে। স্পষ্টত পায়েটার উদ্দেশ্য ছিল আরব ও ইসরাইলীদের একত্রিত করা তথা মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ সমস্যার ওপর ঝাঁপ দেয়া। তবে পায়েটা তাঁর মতলবকে ঢেকে রাখতে পারলেন না, বিশেষ করে যখন জামাল আব্দুন নাসের তাঁকে বলেন– "স্বভাবতই মিসর ভূমধ্যসাগরের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এর ভবিষ্যতের সাথে জড়িত যে কোন বিষয়ে সে অংশগ্রহণ করতে পারে।" এর পর তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, "এই ভূমধ্যসাগরীয় উদ্যোগে কি ইসরাইলও অংশগ্রহণ করবে?" পায়েটা উত্তর দিলেন– "স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিক সত্য হলো, আধুনিক ইহুদী ভূমিকা হচ্ছে ভূমধ্যসাগরীয়

অভিজ্ঞতা– স্পেন থেকে নিয়ে তুর্কিস্তান পর্যন্ত এবং গিন্ওয়া থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত।" জামাল আব্দুন নাসের বললেন," তিনি ইহুদীদের সম্পর্কে কথা বলছেন না, তিনি তো বলছেন ইসরাইল রাষ্ট্রের কথা। পায়েটা বললেন , "ইসরাইল তো হচ্ছে ভূমধ্যসাগরে ইহুদী ভূমিকারই বাস্তব রূপায়ণ।" এরপর ভূমধ্যসাগরীয় পরিকল্পনাগুলো দীর্ঘ বছরের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল। পুনরুত্থান ঘটল দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের পর।

এরপর পঞ্চম প্রচেষ্টাটি ছিল রুমানীয়। এর দায়িত্ব কাঁধে নেন রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকোলাই চচেস্কু। ১৭ মে, ১৯৭০ তারিখে রুমানিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন । এ্যাপয়েন্টমেন্টে যাওয়ার সময় সৈয়দ হাসান আব্বাস যকী (তৎকালীন মিসরীয় অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী) ও কায়রোস্থ রুমানীয় রাষ্ট্রদূতকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। বৈঠকের শুরুতে রুমানীয় মন্ত্রী জামাল আব্দুন নাসেরকে প্রেসিডেন্ট চচেস্কুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এর পর দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি আলোচিত হয়। বাণিজ্য, শিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়াদিও এসে যায়। তারপর রুমানীয় মন্ত্রী সামান্য চুপ থেকে প্রেসিডেন্টকে বলেন যে, তাঁর কাছে একটি গোপনীয় পত্র রয়েছে, যা তিনি তাঁর কাছে পেশ করতে চান। জামাল আব্দুন নাসের বললেন, সৈয়দ হাসান আব্বাস যকী সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সরকারের একজন বড় দায়িত্বশীল। তিনি একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি। রুমানীয় মন্ত্রী তাঁর সামনে নিঃসঙ্কোচে তাঁর কথা বলতে পারেন। একটু ইতস্তত করার পর রুমানীয় মন্ত্রীর সামনে প্রেসিডেন্ট চচেস্কুর পত্র বের করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। রুমানীয় মন্ত্রী বলতে শুরু করলেন। বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুসারে (ক্যাসেটে বাণীবদ্ধ) মন্ত্রী যা বলেন ঃ

"ইসরাইলের পক্ষ থেকে তাদের কাছে একটি উদ্যোগ এসেছে। রুমানীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাকোভেস্কো সম্প্রতি জাদ্উন রাফায়েল-এর সাথে একটি বৈঠক করেন। রাফায়েল হচ্ছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরাইলের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বর্তমানে গোল্ডা মায়ার-এর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা। জাদ্উন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন এবং এমন কিছু বিষয় জানান, যা তিনি মিস্টার প্রেসিডেন্টকে (জামাল আব্দুন নাসেরকে) অবহিত করতে চান। জাদ্উন রাফায়েল ও ম্যাকোভেস্কো'র মধ্যে আলোচিত বিষয়গুলো রুমানিয়ার নেতৃত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। মিস্টার প্রেসিডেন্টের নিকট রাফায়েল উল্লিখিত বিষয়গুলো বলতে প্রেসিডেন্ট চচেস্কু আমাকে উৎসাহিত করেছেন। "

রুমানীয় মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁরা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী নন। মিস্টার প্রেসিডেন্টের ক্ষতি হয় এমন দিকে বিষয়গুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতেও তাঁরা আগ্রহী নন।

কেবল ইসরাইলী প্রতিনিধির অনুরোধে বন্ধুত্বের অনুভূতি থেকেই প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রীকে এ দায়িত্বভার দিয়েছেন। এখন মাননীয় প্রেসিডেন্টই সিদ্ধান্ত নেবেন কি বিষয় তিনি বিবেচনায় আনতে পারেন, আর কি বিবেচনার বাইরে রাখবেন। তিনি আরও জানান, যে বিষয়গুলো তিনি তাঁর কাছে বলবেন তা সীমিত গণ্ডিতে জানাজানি আছে। তিনি যেভাবে ম্যাকোভেস্কো থেকে পেয়েছেন সেভাবেই বিষয়গুলো পেশ করবেন। তিনি এতে কিছু কম-বেশি করবেন না। (গোল্ডা মায়ার-এর উপদেষ্টা জাদ্উন রাফায়েলের) পত্রের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

"মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কেটের পরিস্থিতির কারণে রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে ১৯৬৯ সাল এক বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করল। তাঁর দৃষ্টিতে কারণগুলো ছিল ঃ

১. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো আলোচনার ভারকেন্দ্র বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে স্থানন্তর। এ জন্যই ইয়ারেংয়ের ভূমিকা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

২. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং সিদ্ধান্ত ও ১৯৬৭ সালের জুনে গৃহীত অস্ত্রবিরতি সিদ্ধান্তের মধ্যে সম্পর্ক ও বন্ধন নষ্ট হয়ে যাওয়া।

৩. আরব দেশগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঠানো অস্ত্রের পরিমাণ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তার গুণ ও পরিমাণের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।

৪. যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ইসরাইলের সামরিক ও অর্থনীতিক নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়া। এ প্রেক্ষাপটেই যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। ক্রমেই আমরা এমন সুতায় জড়িয়ে যাচ্ছি যা থেকে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না।

এটাই হচ্ছে প্রাথমিক ভাবনা। দ্বিতীয় ভাবনা হচ্ছে (জাদউন রাফায়েলের মতে) ইসরাইল সরকার যে কোন নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে অনেক ছাড়ও দিয়েছে। সে আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে যে কোন ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছে। বিশেষ করে মাননীয় প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে (অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট নাসেরের কাছ থেকে)।

ইসরাইল নতুন অবস্থান গ্রহণ করেছে, এটা আলোচনা পর্যায়ে পৌঁছার পরই প্রকাশ পাবে। সে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোন পূর্বশর্ত ছাড়াই যুদ্ধসৃষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। এ ছাড়া আরব পক্ষ যে কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে এতেও সে প্রস্তুত আছে।

ইসরাইল এখন রোড্স আলোচনার ধাঁচে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোচনার মিশ্ররূপে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও গ্রহণ করেছে। তারা মনে করছে, এই সম্মতি তাদের পূর্ব অবস্থান থেকে সরে আসার শামিল। কারণ ইতোপূর্বে তারা সরাসরি আলোচনার জন্যই চাপ দিয়ে আসছিল। অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনী শরণার্থী সমস্যাটিও আরব দেশগুলোর সাথে দ্বিপক্ষিক পর্যায়ে সমাধানের বিষয়ে রাজি হয়েছে। ইসরাইল

মনে করে, তার ও আরব দেশগুলোর মধ্যকার মূল বিরোধ হচ্ছে আস্থাহীনতা। কারণ আরবরা মনে করে যে, ইসরাইল শক্তি প্রয়োগ করে আঞ্চলিক সম্প্রসারণে আগ্রহী। একই সময় ইসরাইল মনে করে, আরবরা তাকে একটি রাষ্ট্র হিসাবে ধ্বংস করে দিতে চায়। এই আস্থাহীনতা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে– ইসরাইলের পেশকৃত বিষয়গুলোকে পরীক্ষা করে দেখা। কারণ বাইরে থেকে সমাধান আসা সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ অঞ্চলের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু আমরাই (আরব-ইসরাইল) আমাদের রক্ত ঝরাই। জাদ্উন নিম্নবর্ণিত পয়েন্টগুলো পেশ করছেন ঃ

১. ইসরাইল আরব দেশগুলোর ওপর কোন শর্তই আরোপ করবে না। অনুরূপভাবে ইসরাইল তার ওপর চাপিয়ে দেয়া কোন সমাধানও গ্রহণ করবে না। আরব ইসরাইল বিষয়ক মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব সিস্কো অথবা ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ডোবরেনিন আমাদের মধ্যে কোন সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কোন সীমারেখা নেই। ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া সীমারেখার মধ্যে বাস করতে চায় না।

২. ইসরাইল এমন কিছু চাইবে না যাতে ইহুদীদের স্বদেশ হিসাবে তার জাতীয় পরিচিতি বা বৈশিষ্ট্যে কোন পরিবর্তন ঘটে।

৩. কাজেই ইসরাইলের আদৌ এমন কোন ইচ্ছা নেই যে বর্তমান অধিকৃত ভূমিকে সে সংযুক্ত করবে বা তার কব্জায় রেখে দেবে।

৪. শীঘ্রই কোন সমাধান করে মীমাংসায় পৌঁছাতে হবে, পাছে নতুন নতুন বিপদ এসে যুদ্ধকে উস্কে দিতে পারে। এ ছাড়া ইসরাইল তার বিরুদ্ধে নতুন নৌ-অবরোধ আরোপের বিরুদ্ধে গ্যারান্টিও চায়।

৫. এই গ্যারান্টি অবশ্যই সিনাই উপদ্বীপে থাকতে হবে যাতে ইসরাইলে হামলা করার জন্য তা ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হতে না পারে। পক্ষান্তরে ইসরাইল মিসরের জন্য তার ভূমিতে অনুরূপ গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

জামাল আব্দুন নাসের মন্তব্য ছাড়াই শুনে যাচ্ছিলেন। রুমানীয় মন্ত্রী বলছিলেন যে, "তাঁর কাছে মনে হয় যেন ইসরাইলের কাছে কোন গ্রহণীয় সমাধান রয়েছে। কিন্তু তাঁরা মনে করছেন যে, এইসব সমাধানের কথা ঘোষণা করা ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক হবে না, যতক্ষণ না সে আস্থাবান হয় যে সে মিসরের সাথে সিরিয়াস ও প্রকৃত আলোচনায় প্রবেশ করছে।

জামাল আব্দুন নাসেরের কথা বলার পালা এলো। কার্যবিবরণী অনুসারে তখন তিনি যে পয়েন্টগুলোর অবতারণা করেন সেগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

তিনি সংশয় প্রকাশ করেন যে, ইসরাইলের নিকট প্রকৃতই কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান আছে কিনা। তিনি উপলব্ধি করছেন যে, এখন যা প্রস্তাব করা হচ্ছে এ হলো এক রহস্যময় প্রচেষ্টা। আসলে এর লক্ষ্য হচ্ছে মিসরের অবস্থানকে হেয় করে দেখা।

তিনি ইসরাইলী মন্ত্রিসভার আলোচনাকে অনুসরণ করে যাচ্ছেন। তিনি জানেন যে, সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ইসরাইলের সাথে অধিকৃত অঞ্চলের কিছু অংশ যুক্ত করার পক্ষে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছেন।

মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের বললেন, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার অনুমোদনযোগ্য একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইসরাইলী পূর্ণ প্রত্যাহার। এমন সমাধান মেনে নেয়া যায় না যাতে আল-কুদ্‌সকে ইসরাইলের জন্য ছেড়ে দেয়া হবে।

সমাধানের ব্যাপারে তার অবস্থান সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্যে ঘোষিত। অথচ ইসরাইল তার পরিকল্পনা গোপন করে রেখেছে। কিছুদিন আগেও মিস্টার নাহুম গোল্ডম্যান এ ধরনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন, যা এখন গোল্ডা মায়ারের উপদেষ্টা মহাশয় চালিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যায়ে রুমানীয় অতিথি তাঁর কথার মাঝে বলে উঠলেন ঃ "মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইসরাইল সরকারের মন্ত্রীদের কাছে গোল্ডম্যান অপাংক্তেয়। সে ইসরাইল রাষ্ট্রের সরকারের মুখপাত্র হিসাবে কোন কিছু বলতে পারে না। জামাল আব্দুন নাসের এর উত্তরে রুমানীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন যে, মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের ব্যাপারে অব্যাহত গুরুত্ব আরোপের জন্য তিনি যেন প্রেসিডেন্ট চচেস্কুকে তাঁর শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। কিন্তু রুমানীয় মন্ত্রী এভাবে আলোচনার দরজা বন্ধ করতে চাননি। তাই, আবারও প্রশ্ন করেন যে, যদি ইসরাইলীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে মাননীয় প্রেসিডেন্ট সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন তাহলে আমি কি জানতে পারি যে, কিভাবে হলে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে ?" জামাল আব্দুন নাসের বলেন–(কার্যবিবরণীর ভাষ্য অনুসারে)ঃ "আমি শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। আরব জাতির স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষিত হলে এ ধরনের সমাধানের ব্যাপারে তাদের বোঝাতে পারার ক্ষমতা আমার আছে বলে মনে করি। কিন্তু তাদের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলতে আমি আদৌ প্রস্তুত নই। কারণ আরবদের অবস্থান ভাল। গোটা জাতি আমাদের সাথে রয়েছে। এমনকি যারা আমাদের সামাজিক দর্শন নিয়ে মতপার্থক্য রাখেন তাঁরাও আমাদের অর্থনীতিক অবস্থানকে সমর্থন করেন। সবার একটাই দাবি– তা হচ্ছে প্রত্যাহার। এই শর্তে আরব জাতি এক কাতারে। কাজেই আমরা যখন প্রত্যাহারের কথা বলি তখন এর অর্থ কেবল মিসর ভূমি থেকে তাদের চলে যাওয়াকে বুঝি না, বরং সকল আরব ভূখণ্ড থেকে প্রত্যাহারকেই বোঝে থাকি। চচেস্কুর চেষ্টা ফলবতী হলো। তার এ উদ্যোগের সেই দশাই হলো যা ইতোপূর্বে গোল্ডম্যান, লাবেরা ও পায়েটার বেলায় হয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স তাঁর ভাষায় ইতোপূর্বেকার ছোট ছোট শান্তির দোকানের মতো তাঁর পরিকল্পনার দশা হতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে রিচার্ড নিক্সনের দায়িত্ব দেয়াকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে তাঁর প্রতিপক্ষ ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার ভিয়েতনাম সঙ্কট নিরসন করার আগেই তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে একটি নতিজা বের করে ফেলবেন।

॥ ৭ ॥

রজার্স

"আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আর কতদিন আমরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি বরদাশত করতে পারব ?"

—ইসরাইলী মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী গ্যালিলীর খেদোক্তি

রজার্স পরিকল্পনা মিসরের কাছে বরাবরই অগ্রহণযোগ্যই রয়ে গেল। এমনকি, যখন মার্কিন সরকার জর্ডানের কাছে একটি পেপার পেশ করে এর আওতা বাড়াতে চেষ্টা করেন, তারপরও। এর নাম পড়েছিল 'ইউস্ট পেপার'। এটি বাদশাহ হোসেনের নিকট পেশ করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত আমেরিকান প্রতিনিধি চার্লস ইউস্ট। এতে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকার করে যে, জর্ডানের পরিস্থিতিকে ১৯৬৭-এর ৫ জুনের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। এতে উভয়দিকের রেখায় পারস্পরিক বিনিময়ভিত্তিক ঈষৎ সংশোধনী আনা হবে। এতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল যে, প্রথমত ইসরাইল ও জর্ডানের মধ্যকার বিভিন্ন স্থানে কাঁটাতারের বেড়ায় যেসব গ্রাম কাটা গিয়েছে সেগুলোকে এক সাথে করা হবে। এখানে সেখানে এইসব গ্রামকে একীভূত করে ভুল সংশোধন করা জরুরী হয়ে পড়েছিল।

সম্ভবত আমেরিকা সরকার একজন বিশেষ দূতকে কায়রো পাঠানোকে সমীচীন মনে করেছিল কিছুটা উৎসাহ অথবা সতর্কতা নিয়ে।

উৎসাহ এ কারণে যে, আসলে মিসর রজার্স পরিকল্পনাকে এখনও স্পষ্ট করে প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেয়নি। বরং মিলিয়ে রেখেছে। সতর্কতার কারণে এজন্য বলব যে, প্রকৃতপক্ষে জামাল আব্দুন নাসেরের গোপন মস্কো সফরের পর সোভিয়েত বাহিনী মিসরে পৌঁছতে শুরু করে দিয়েছিল।

কায়রোতে যে আমেরিকান প্রতিনিধি আসলেন তিনি হচ্ছেন– গোজেফ সিস্কো। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ঠিক ১২ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে জামাল আব্দুন নাসের তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। এই সাক্ষাতে সিস্কোর সাথে একেবারে খোলামেলা আলোচনা হয়।

১. জামাল আব্দুন নাসের বলেন যে, তাঁর কাছে পরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তিনি তার স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানকে প্রকাশ করতে চাননি। যাতে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে প্রথম সিরিয়াস উদ্যোগেই নিক্সন প্রশাসন ধাক্কা না খায়। উল্টো তিনি চেয়েছিলেন যেন, এই প্রশাসন সঙ্কটের সমাধানকল্পে তাঁর মনোযোগ বাড়িয়ে দেয়।

২. সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব আলগা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে এই পয়েন্টটি বোঝতে হবে যে, তিনি মনে করেন না যে, যুক্তরাষ্ট্র একাই সমস্যা সমাধানের অধিকার বা সামর্থ্য রাখে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি পক্ষ, তাকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। বরং মিসরও চায় না যে, এতকিছু করার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন দূরে থাকুক। সর্বশেষ যা সে করেছে তা হচ্ছে মিসরের গভীরতায় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নেয়া। কিন্তু এটা মিসরী সিদ্ধান্তের পায়ে কোন বেড়ি পরাতে পারবে না। এই বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝে নিতে হবে মিসরের সাথে তার দীর্ঘ ও তিক্ত অভিজ্ঞতার নিরিখেই ।

৩. যদি যুক্তরাষ্ট্র সঙ্কট সমাধানে আগ্রহী হয়– সে নিজেকে তো তা-ই মনে করে– তাহলে মার্কিন প্রচেষ্টা চলতে থাকাই শ্রেয়। তবে তার মূল অনুপ্রেরণা হতে হবে জাতিসংঘের প্রেক্ষাপটে এবং নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং সিদ্ধান্তের সূত্র ধরেই। যাহোক রজার্স পরিকল্পনাটি ছিল নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা তথা এর কার্যকরী রূপ দেয়ার জন্য একটি সিরিয়াস উদ্যোগ।

মিসরের মত ছিল তাড়িঘড়ি প্রত্যাখ্যান না করা। বরং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য কিছু সময় নেবে। ২১ জনু– এই উদ্যোগের দু'দিন পর ইসরাইলই প্রথমে এই রজার্স উদ্যোগটি প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেয়।

এবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের মধ্যে বিরাট মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৬৭ সালের আগ্রাসনের পটভূমি রচনায় দু'পক্ষের মধ্যে গোপন চুক্তি আর ব্যবস্থাদির পর এটাই ছিল প্রথম তীব্র মতবিরোধ।

এই মতবিরোধ থেকে খোদ ইসরাইলের অভ্যন্তরেই গভীর বিভক্তি সৃষ্টি হলো। আসলেও 'রজার্স উদ্যোগ'-এর ব্যাপারে ইসরাইলের প্রতিক্রিয়াটি তাড়াতাড়িই হয়েছিল। এ বিষয়টি যিনি প্রথম লক্ষ্য করেন তিনি হচ্ছেন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত 'আইজ্যাক রাবিন'। তিনি তাঁর সরকারের প্রতিক্রিয়াটি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার ব্যাপারে নিজ দায়িত্বেই দেরি করেন। যাতে তিনি নিজ সরকারের সাথে পরামর্শ করে প্রতিক্রিয়ার ভাষাটি পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব রাখতে পারেন। কারণ তাঁর মতে ওটা ছিল গোঁড়া পক্ষপাতদুষ্ট আর তড়িঘড়ি তো রয়েছেই। রাবিনের ইতস্ততায় স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রতি এই গোঁড়ামিপূর্ণ চটজলদি ইসরাইলী প্রত্যাখ্যানের জের কি হতে যাচ্ছে। পুরো মাস জুড়ে– জুনের শেষ দিক থেকে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত (১৯৭০) ইসরাইল এক প্রচণ্ড অস্থিরতায় কেটেছে। নিরুপায় হয়ে 'রজার্স উদ্যোগ' গ্রহণ করে তবে এই দশা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এই উদ্যোগ মেনে নেয়ার কারণে সেই ১৯৬৭-এর জুনে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যে জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের সূচনা হয়েছিল তা ভেঙ্গে যায়।

অভিজ্ঞতাটি ছিল বেদনাদায়ক। সম্ভবত প্রফেসর মাইকেল প্রেসারের 'ইসরাইলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত' বিষয়ক বিখ্যাত স্ট্যাডিজই হচ্ছে ইসরাইলের রাজনৈতিক জীবনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার সবচেয়ে উজ্জ্বল চিত্র। 'প্রেসার'-এর মূল্যয়নে 'রজার্স উদ্যোগে' মধ্যকার একটি কেন্দ্রীয় শব্দই ইসরাইলের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল, যার কারণে তড়িঘড়ি করে উদ্যোগটি প্রত্যাখ্যান করে বসে। সে শব্দটি হচ্ছে 'প্রত্যাহার'। ২০ জুন তারিখে ইসরাইলী মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী অনুসারে যখন 'রজার্স উদ্যোগ' প্রত্যাখ্যানের প্রক্রিয়া চলে তখন মেনাহেম বেগিন (যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিমন্ত্রী) 'প্রত্যাহার' শব্দটির ওপর জোর দিয়ে বলেন– আড়াই বছর ধরে অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৯৬৭ থেকে অদ্যাবধি ইসরাইলী সরকার এ শব্দটি ব্যবহার থেকে বিরত রয়েছে এবং অব্যাহতভাবে রাষ্ট্রদূত ইয়ারেঙ ও সংশ্লিষ্ট সরকারের মধ্যে যত কাগজপত্র বিনিময় হয়েছে তার মধ্যে অব্যাহতভাবে এ শব্দটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যতবারই ইয়ারেঙ আমাদের পত্রোত্তরে 'প্রত্যাহার' শব্দটি ব্যবহারের চাপ দেন ততবারই আমার তা প্রত্যাখ্যান করি। এটা বলতে ততবারই আমাদেরকে আমেরিকানরা বলেছিল, অধিকাংশ সময়ই আমরা আমাদের কান বন্ধ করে রাখি এবং তা শুনতে চাইনি। আমাদের বিশেষজ্ঞগণ যেসব পরিভাষা বা ভাষ্য বেছে নিয়েছেন আমরা কেবল সেগুলোই ব্যবহার করেছি এবং এই প্রত্যাহার শব্দটি বাদ দিয়েই যোগ্যতার সাথে কেবল বাহিনী কেন্দ্রীভূত করা ও বাহিনী কেন্দ্রীভূত করাকে ফিরিয়ে নেয়া ইত্যাকার শব্দগুলো দিয়েই কাজ চালিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ সেটা তো ন্যূনপক্ষে এক শ'টি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। বেগিন-এর দৃষ্টিভঙ্গিটাই মন্ত্রিপরিষদের সভায় প্রাধান্য পায় এবং সকলেই তা গ্রহণ করে। কারণ প্রত্যাহার শব্দটি তাদের কাছ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য মনে হয়।

জুনের শেষ লগ্ন থেকে জুলাইয়ের শেষ দিকেই ইসরাইলী সরকার তাদের মত বদলে ফেলে। কারণটা কেবল কেন্দ্রীয় একটি শব্দই ছিল না বরং এবার ছিল অনেক জটিল ও পরস্পর জড়িয়ে যাওয়া সমস্যা। সে সময়কার ইসরাইলী মন্ত্রিসভার কর্মকাণ্ডের নিরিখে কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. ইসরাইলের এমন কোন শক্তিই ছিল না যে, আমেরিকার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে ইসরাইলের জন্য কতটুকু কি তা বাদ দিলেও এ মুহূর্তে সেই হচ্ছে ইসরাইলের জন্য একমাত্র অস্ত্র যোগানদাতা। বর্তমানেও একটি বিক্রয় চুক্তি রয়েছে। এতে আছে ৫০টি ফ্যান্টম বিমান, ৮০টি স্কাইহুক বিমান। অবশিষ্ট যুদ্ধ বিমানগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইসরাইলে সরবরাহের অপেক্ষায় রয়েছে। যখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে তখন আমেরিকান নীতির সাথে অভিযাত্রীর মতো অমসৃণ ব্যবহার ইসরাইলের পক্ষে আদৌ সমীচীন নয়। কারণ এতে মোকাবিলার পর্যায়ে এসে পড়ে।

২. মিসরে সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতি– জানুয়ারিতে জামাল আব্দুন নাসেরের গোপন সফরের পর এ অঞ্চলের পরিস্থিতি যারপরনাই স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় – ১ জানুয়ারি ১৯৭০ অর্থাৎ মস্কোর গোপন সফরের ঠিক আগে ইসরাইলী গোয়েন্দাদের আন্দাজে মিসরে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ছিল ২৫০০ থেকে ৪০০০-এর মধ্যে। ৩১ মার্চ ১৯৭০-এ এসে এ সংখ্যা দাঁড়াল একই মূল্যায়নে ৬৫৬০ থেকে ৮০৮০। এ ছাড়া আকাশ প্রতিরক্ষায় সাম-৩ মডেলের ২২ ব্যাটারি দেখা গেল, যা এর আগে ছিল না। ৩০ জুন ১৯৭০ ইসরাইলে এমনভাবে দৃশ্যপট পাল্টে গেল যা রীতিমতো অস্থিরতার উদ্রেক ঘটায়। ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার অনুমান মতে– পুঙ্খানুপুঙ্খ না হলে মিসরে দেখা গেল ইসরাইল নীতিগত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য অনুসন্ধানী ঘাঁটি।

একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে, ১০০ থেকে ১৫০টি সোভিয়েত বিমান এবং ১০৬০০ থেকে ১২১৫০ সোভিয়েত কলাকৌশলী এবং সাম-৩ মডেলের এন্টি এয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের ৪৫-৫৫টি ব্যাটারি। আর রয়েছে ১২০টি মিগ-২১ জ, স বিমান।

এই সব জনবল আর সাজসরঞ্জামের সাইজ দেখে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, মিসরের অভ্যন্তরভাগে সুরক্ষার জন্য জঙ্গী কাঠামো প্রস্তুত হয়ে আছে। যদিও তা যুদ্ধফ্রন্ট থেকে দূরেই রয়েছে। ইসরাইলী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল মোশে দায়ান। তিনি ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের নতুন ভারসাম্যে সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ভীতসন্ত্রস্ত। ১৯ জুলাই ইসরাইলী মন্ত্রিপরিষদের কার্যবিবরণীতে এসেছে যে, মোশে দায়ান এ পর্যায়ে এক কথায় বলে– আমি তাদের দলের নই যারা বলে থাকে যে, রুশ আছে কি নাই সে তা বোঝে না। আমার কাছে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই লড়াইয়ে কোন দিকেই কোন ওয়ান লাইনে একজন রুশও দেখতে চাই না। আমি চাই না যে, মিসরে আক্রমণকারী আমাদের জঙ্গী বিমানগুলোকে রুশ বিমান ভূপাতিত করে দিক। আমাদের বিমানগুলো রুশ বৈমানিকদের মোকাবিলা করুক, এটাও চাই না। কার্যবিবরণী অনুসারে 'দায়ান' এর পর ভারসাম্যে আমেরিকান পক্ষের কথা আলোচনাকালে তিনি বলেন– "আমাদের যে কোন অবকাশকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি আছে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে মিত্রপক্ষকে ক্ষেপিয়ে দেয়ার শক্তি তো নেই (অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র)।"

৩. সুয়েজ খাল ফ্রন্টে মিসর বাহিনীর চাপ বৃদ্ধি এখন অস্থিরতার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসরাইলী মন্ত্রিপরিষদের যে সভায় প্রত্যাখ্যান থেকে পিছু হটে আসা হয়েছিল সে সভায় যিনি এ বিষয়টিকে বেশি করে তুলে ধরেছিলেন তিনি হচ্ছেন– 'ইসরাইল গ্যালিলি' যিনি কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর একটি কথা ছিল– "আমি– একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মিসরী লাইনের ওপর ফ্যান্টম জঙ্গী বিমানের ক্ষয়ক্ষতিতে আমরা পর্যুদস্ত অবস্থায় পড়েছি। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, ক্ষয়ক্ষতির এই

উচ্চহার আমরা কতদিন পর্যন্ত বহন করতে সক্ষম হব ? আমাদের অবস্থান কি হবে, যদি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা 'শ্রায়েক' ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি না পাই ? এটাই কেবল সুয়েজ খালের পাড়ে মিসরী ক্ষেপণাস্ত্রের দেয়ালকে প্রতিহত করতে সক্ষম।" (প্রফেসর প্রেসার ইসরাইলী নাথিপত্রে একাধিকবার দেখেছেন যে, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে "হাজার দিনের যুদ্ধ" অভিহিত করা হয়েছে)।

৪.ইসরাইলী সরকারকে বোঝাবার ক্ষেত্রে জনরোষ বড় ভূমিকা পালন করেছিল যার দরুন বাধ্য হয়েও এই প্রত্যাখ্যান থেকে তারা সরে এসেছিল। মন্ত্রিপরিষদের সভার একই কার্যবিবরণী (১৯ জুলাই) মতে– গোল্ডা মায়ার বলেন, আমার সামনে কিছু রিপোর্ট রয়েছে, এতে সরকারের নীতির সমালোচনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে যারা আমাদের ভবিষ্যৎ। 'রজার্স উদ্যোগে' যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এতে সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতির আহবান রয়েছে। এতে আমাদের যুব সমাজ তাদের মানসিক স্থিরতা ফিরে পাবার সুযোগ পাবে। কারণ মিসরের সাথে লড়াইয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে আমাদের নিহতদের তালিকা দেখে তাদেরকে অস্থিরতা কুরে কুরে খাচ্ছে। তাদেরকে এটা উপলব্ধি করতে দিতে হবে যে, আমাদের ভূমিকায় আমরা তাদের অস্থিরতার কারণগুলো অনুভব করি।

মিসর ও ইসরাইল প্রত্যেকেই রজার্স উদ্যোগ গ্রহণের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার তা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তারা অস্ত্রবিরতির ব্যবস্থা নিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, এতে সময় নেবে। কারণ এ উদ্যোগ গ্রহণ করায় রাজনৈতিক উপদলগুলোর মধ্যে যে প্রচণ্ড কাপন লেগেছিল তা ছিল গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। সে সময়টিতে মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল জাতীয় নির্দেশনা মন্ত্রীর পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। কারণ সৈয়দ মাহমুদ রিয়াদ (পররাষ্টমন্ত্রী) দু'সপ্তাহব্যাপী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বেশ কিছু পূর্ব ইউরোপীয় দেশ সফরে দেশের বাইরে ছিলেন। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল 'রজার্স উদ্যোগ' গ্রহণ করার পর সঙ্কটের গতিবিধি নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা ও শলাপরামর্শ করা।

আগস্টে আমেরিকান ঐ চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স "ডোনাল্ড বেরগেস' ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তাঁর সাথে এক জরুরী বৈঠক করতে চান। আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্সের ব্যক্তিগত একটা বার্তা পৌছানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। যেহেতু জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে হাইকালের সংশ্লিষ্টতা ছিল তাই আমেরিকান চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্সকে জানিয়ে দেয়া হলো, তার যা কিছু বলার তা যেন পররাষ্ট্র সচিব এ্যাম্বেসেডর 'মুহাম্মদ রিয়াদ'কেই বলেন। এ্যাম্বেসেডর মুহাম্মদ রিয়াদ এই বৈঠকের যে নোট লেখেন, তাতে ছিল ঃ

"আজ ৪/৮/১৯৭০ আপরাহ্নে মিস্টার ডোনাল্ড বেরগেসের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন যে, সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটাতে তিনি সাইপ্রাস ছিলেন। তার কাছে নির্দেশ যায়

যেন ছুটি বাতিল করে তাৎক্ষণিকভাবে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং অপেক্ষমাণ একটি বার্তা পৌঁছে দেন। সেটা যেন তিনি মন্ত্রী হাইকাল-এর কাছেই পেশ করেন।

তিনি বলেন, পত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে অস্ত্রবিরতি। তিনি জানান যে, তারা নিজ নিজ স্থানে অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব করছে যাতে এ অস্ত্রবিরতি দ্বিপাক্ষিক ভারসাম্যের মাধ্যমে বাস্তবে কার্যকর হয়। তিনি আরও জানান যে, যুক্তরাষ্ট্র তাঁর গোয়েন্দা সংস্থার গোপন রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এ বিশ্বাস করছে যে, স্থল ময়দানগুলোতে সুয়েজ খালের পশ্চিমে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বাহিনী সুয়েজের পূর্ব দিকে মোতায়েনকৃত ইসরাইলী বাহিনীর সমান। এমনি করে মিসরের বিমান বাহিনী ইসরাইলী বিমান বাহিনীর খুবই কাছাকাছি সামর্থ্যে রয়েছে। এ কারণেই বাস্তবতার নিরিখেই অস্ত্রবিরতি উভয় পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। তিনি আরও বলেন যে, অস্ত্রবিরতি বজায় রাখার স্বার্থে উভয় পক্ষের যোদ্ধা বাহিনীগুলো অবশ্যই এটা অনুভব করতে হবে যে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ এই কারণেই অস্ত্রবিরতির ছত্রছায়াতেই এটার যোগ্য বাস্তবায়ন সম্ভব।

এই গ্যারান্টির জন্য উভয় পক্ষ তাদের ছবি তোলার বিমান ব্যবহার করতে পারে এবং এজন্য একটি নির্দিষ্ট রুট ঠিক করে নিতে পারে, যাতে নিরাপদে ছবি তোলার কাজ করতে পারে। যদি কোন পক্ষ সন্দেহ করে যে, অপর পক্ষ এমনভাবে তার বাহিনীকে বিন্যাস করছে যাতে তার বাড়তি সুবিধা হতে পারে, তাহলে সে ছবিগুলো সে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পেশ করতে পারে যাতে এ বিষয়টি নিয়ে অপর পক্ষের সাথে বোঝাপড়া করতে পারে।

যখন এ্যাম্বেসেডর মুহাম্মদ রিয়াদ তার স্মারকটি মুহাম্মদ হাসনইন হাইকালের কাছে পেশ করলেন তখন হাইকাল মিস্টার ডোনাল্ড বেরগেসকে ডেকে পাঠিয়ে জানিয়ে দেন ঃ

১. আমাদের পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা খুবই কঠিন হবে যে, মিসরী এয়ার লাইনের ছবি তোলা যায় এমন রুটগুলোতে ইসরাইলী বিমান উড্ডয়নের অনুমতি দেয়া হবে। তাছাড়া এটা তো জানা কথাই যে, যদি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহলে ইসরাইল অনুমোদিত রুট অতিক্রম করে বসবে। এমনি করে ইসরাইলী অনুসন্ধানী বিমানগুলো ছবি তোলার সক্ষমতা ঠিক কত দূর এগিয়ে গেছে তা জানাও আমাদের পক্ষে কঠিন। এছাড়া কোন অবস্থাতেই মিসরের অভ্যন্তরভাগ পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়। কারণ ইসরাইলী প্রতিরক্ষা লাইনগুলো যে একেবারেই সুয়েজ খালের পাড়ে রয়েছে তা তো সকলেরই জানা।

২. বাহিনী বিন্যাসের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত যে কোন বিবাদের ক্ষেত্রে কেবল যুক্তরাষ্ট্রই হবে রেফারেন্স, যার কাছে এর সমাধান চাওয়া হবে এই প্রস্তাবও মেনে নেয়া কঠিন। বরং এ ক্ষেত্রে রেফারেন্স বা সালিশ জাতিসংঘে হওয়াই শ্রেয়। যদি ফোর্স

মুভমেন্ট-এর বেলায় রাষ্ট্রদূত ইয়ারেঙের নিকট কোন অভিযোগ দেয়া হয় তা তিনি তাঁর প্রচলিত উপায়েই নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এ জন্য রুটের কাছে এসে উড্ডনের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন নেই।

৩. মিস্টার বেরগেসকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, তারা কি অস্ত্রবিরতি সম্পর্কে কোন মতপার্থক্যের ব্যাপারে জাতিসংঘ বা এর স্থায়ী সদস্যদের সাথে পরামর্শ করেছেন কিনা।

পরদিনই বেরগেস রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ রিয়াদের নিকট একটি প্রস্তাব নিয়ে ফিরে এলেন, এর মোদ্দা কথা হলো– যুক্তরাষ্ট্র এ প্রস্তাব করছে যে, সে নিজেই রুট লাইনের ওপর উড্ডয়নের কাজ করবে, যাতে Stand still ceasefire (স্থাণিক অস্ত্রবিরতি) এর চুক্তির ব্যাপারে কোন পক্ষের যে কোন লঙ্ঘন না ঘটায় নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, এতে সমস্যাটির সকল দিক আলোচিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর বেশ কিছু কারণে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। কারণগুলো ছিল ঃ

১. এখন প্রত্যাখ্যানের অর্থ হলো গোটা রজার্স উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করা। এতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল বিরোধিতার স্থালে যুক্তরাষ্ট্র-মিসর বিরোধ সঙ্কটে মোড় নেবে।

২. যুক্তরাষ্ট্র অচিরেই ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান ব্যবহার করে এ কাজ সেরে নেবে। এ বিমানগুলো এত উচ্চতায় চলাফেরা করবে, যে পর্যন্ত পৌঁছার মতো কোন ক্ষেপণাস্ত্র বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের কারও কাছে নেই। মিসর এটা মানুক বা না-ই মানুক অচিরেই এই বিমানগুলো তার কাজে লেগে যাবে। তখন মিসরী কর্তৃপক্ষের নিকট কেবল অক্ষম প্রতিবাদ প্রকাশ ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের বাসভবনে সমাপ্ত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিস কক্ষে গিয়ে মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালকে ডেকে পাঠান। তিনি তাঁকে বলেন, “আমেরিকানরা যে কোন সময় হঠাৎ করে আমাদেরকে অস্ত্রবিরতি কার্যকর করার জন্য সময় বেঁধে দিতে পারে। তিনি যেন কোন অবস্থাতেই ৬-১২ ঘণ্টার অবসর না দেয়া পর্যন্ত তা কার্যকর করার প্রস্তাব গ্রহণ না করেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে আমেরিকানরা অচিরেই সময় বেঁধে দেবে। তিনি ইতোমধ্যেই সমরমন্ত্রী লেঃ জেনারেল মুহাম্মদ ফৌজিকে নির্দেশ দিয়েছেন। যেন অস্ত্রবিরতির সময় বেঁধে দেয়ার আগে প্রাপ্ত প্রতিটি মিনিটকে কাজে লাগিয়ে মিসরী ফ্রন্টে এবং এর অভ্যন্তর ভূভাগে মিসরী ক্ষেপণাস্ত্র দেয়ালের পয়েন্টগুলো আরও শক্তিশালীভাবে বিন্যস্ত করেন।

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক থেকে ফিরে এসে দেখেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার রিচার্ড বোমাট তাঁর কাছে একটি জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট চাচ্ছেন। স্যার রিচার্ড একথা জানাতে চাচ্ছেন যে তিনি লণ্ডন থেকে এ মর্মে কিছু নির্দেশনা পেয়েছেন যে, আমেরিকান সরকার তাদের সাথে যোগাযোগ করে এই অনুরোধ করেন যেন তাদেরকে রজার্স উদ্যোগ অনুসারে অস্ত্রবিরতির লাইনগুলো পর্যবেক্ষণ কাজে সাইপ্রাসের 'এ্যাক্রোটেরি' ঘাঁটিটি ব্যবহার করতে অনুমতি দেয়া হয়। রিচার্ড বোমাট বলেন, লণ্ডন আবেদনটি মঞ্জুর করেছে। তবে এ শর্তে যে, সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট মাকারিউস ও মিসর যদি বিষয়টি অনুমোদন করে। এখন যে পর্যায়টি শুরু হলো তা বেশ সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর এবং এর ওপর এ অঞ্চলের জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এর মোকাবিলা করতে হলে চাই সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল তৎকালীন তাঁর সরকারী অবস্থান নির্দেশনামন্ত্রী ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ পুনর্গঠনের প্রস্তাব রাখেন। কারণ এ পরিষদ এখন পর্যন্ত কেবল এর সদস্যদের মধ্যেই এর ভূমিকা সীমিত রাখে। এরা হচ্ছেন রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তি যাঁরা পদাধিকার বলে এর সদস্য হন। এদের সংখ্যা ৭ কি ৮ থেকে বেশি নয়। অথচ যেসব দেশে এই ধরনের পরিষদ রয়েছে তারা জানে যে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ধারণার আসল উদ্দেশ্য এই সীমিত পদস্থ ব্যক্তির দ্বারা হাসিল হতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের পরিসর বিস্তৃত করা হবে এবং এর স্থায়ী কমিটিও বড় হবে। আর এটাই হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ম্যাকানিজম বা যন্ত্র। এই স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হবেন প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মাহমুদ ফৌজি।

তবে এটা যে কেবল একেবারেই একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই হয়ে যাবে তা সম্ভব ছিল না। তাই বাস্তব পদক্ষেপের প্রক্রিয়ার জন্য ভূমিকার সূচনা হলো। প্রথম পদক্ষেপ ছিল সামরিক কর্মকর্তাদেরকে শীর্ষ পর্যায়ের আরব শলাপরামর্শে অংশগ্রহণ করানো, যাতে তারা বুঝতে পারে যে কি ধরনের পরিস্থিতিতে আরব নীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এতে করে পরিকল্পনার ক্ষেত্রসমূহ ও যুদ্ধের ময়দানগুলো আরব নীতির চিন্তা-ভাবনা ও কৌশল নিয়ন্ত্রণকারী সীমারেখাগুলো কাছাকাছি আসতে পারে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাকে ১৯৭০ সালের জুলাইয়ে ত্রিপলীতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের কাজে অংশগ্রহণের বিষয়টি অনুমোদন করেন। এরা হচ্ছেন মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আব্দুল গনি আল জেম্‌সী, মেজর

জেনারেল মুস্তফা আল-জামাল ও মেজর জেনারেল হাসান আল বদরি। এই শীর্ষ সম্মেলনে তাঁদের অংশগ্রহণ শীর্ষ পর্যায়ে আরব নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিস্থিতির সাথে সামরিক ব্যক্তিদের পরিচয়ের মূল্যবান সুযোগ করে দেয়।

এরপর আসে দ্বিতীয় পদক্ষেপ। এতে প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে বেশ কিছু সংখ্যক কূটনীতিক তারকাদের মুক্ত আলোচনা হয়। এর মাধ্যমে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরত কর্তাব্যক্তি এবং বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যক্রমের মধ্যে সহযোগিতার যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই অভিজ্ঞতার সুযোগটি আসে রজার্স উদ্যোগ উত্তর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। অনুরূপভাবে ৯ আগস্ট প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালকে তাঁর সাথে আর জনাদশেক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বাছাই করে এনে প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করার জন্য ডাকেন। হাইকাল ১০ জনকে নির্বাচন করে ফেলেন। এদের মধ্যে ছিলেন এ্যাম্বেসেডর মুহাম্মদ রিয়াদ, এ্যাম্বেসেডর ডক্টর মুহামুদ হাসান যাইয়্যাত, এ্যাম্বেসেডর আশরাফ গেরবাল, এ্যাম্বেসেডর আহমাদ উসমান, উপদেষ্টা উসামা আল বায। এর সবাই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে কোন বাধ্যবাধকতা অথবা প্রটোকল ছাড়াই মুক্ত আলোচনায় অংশ নেবেন। এ ছিল এক নবতর ও ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা।

প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসের এ বৈঠকটি করেন আল মামূরার অবকাশ কেন্দ্রে। বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের তিনি বলেন যে, তিনি এই বৈঠকে তাদের কথা শুনতে চান। কোন ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বা ধরাবাধা নিয়ম ছাড়াই তিনি তাঁদের আলোচনা শুনতে, তাঁরাও তাঁকে প্রশ্ন রাখতে পারেন।

তিনি চান তারা তাদের চিন্তা-চেতনাকে মেলে ধরেন। এমনকি যদি তারা তাঁর নীতি বলে জানেন বা ধারণা করেন এমন বিষয় থেকে বাইরে গিয়েও মত রাখতে পারেন। আলোচনা শুরু হলো। মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল উপদেষ্টা উসামা আল বাযকে বৈঠকের তাৎক্ষণিক কার্যবিবরণী লেখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি পূর্ণ ঊনিশ পৃষ্ঠাব্যাপী তা লিপিবদ্ধ করেন।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে হতে প্রেসিডেন্টের সাথে মত বিনিময়ে প্রথম যিনি কথা বলেন তিনি হচ্ছেন এ্যাম্বেসেডর মুহাম্মদ রিয়াদ। কারণ তিনি মন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক হিসাবে তখনকার চলমান রাজনৈতিক যোগাযোগের এলোপাতাড়ি চিত্রের দূরাভিসারী প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। মুহাম্মদ রিয়াদ শুরু করেন। উসামা আল বায-এর স্বহস্তে লিখিত কার্যবিবরণী অনুযায়ী তিনি তখন বলেন ঃ

"আসন্ন পর্যায়টি বিগত পর্যায় থেকে আলাদা। কারণ আমরা এমন একটি কাজে এগুচ্ছি যা যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে খুবই সিরিয়াস। সত্য বটে সে নিরাপত্তা পরিষদের

সিদ্ধান্ত স্বীকার করে কিন্তু সে তা বাস্তবায়নে অগ্রগামী হতে আদৌ রাজি নয়। যুক্তরাষ্ট্র দেখেছে যে আমরা অবিচল রয়েছি, তাই সে এখন সমস্যার সমাধান চাইছে। কিন্তু কী সে সমাধান ? সেটা কি আমানতদারী ও ইনসাফের সাথে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না কি সমাধানটি ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে না ? আলোচনার জন্য এ হচ্ছে আমার প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কি প্রায় চুক্তি হয়ে গেছে কথাটা কি সত্যি ? এখন ইন্দোচীনের অবস্থান আগের চেয়ে ভাল। এ বিষয়টি কি আমেরিকাকে মধ্যেপ্রাচ্যে প্রবেশে উদ্বুদ্ধ করেছে ? জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি, তারপর সল্ট আলোচনা— এতে যদি তারা কোন চুক্তিতে পৌঁছে থাকে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে— আমাদেরকে সম্ভাব্য উত্তম সমাধানে পৌঁছে যেতে হবে। আর যদি এটা সঠিক না হয় তাহলে এর অর্থ হচ্ছে..... (মুহাম্মদ রিয়াদ বাক্যের বাকি অংশ সম্পূর্ণ করেননি)। এখন পর্যালোচনার বিষয় হচ্ছে– যুক্তরাষ্ট্র কি নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সত্যিই আগ্রহী; না কি সে কেবল একটা সুরাহা চায়– যাতে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নাও করতে পারে।"

কার্যবিবরণী অনুসারে প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসের অসমাপ্ত বাক্যটি লক্ষ্য করলেন। তাই আলোচনা শুরু থেকে টেনে এনে বললেন : "এ্যাম্বেসেডর মুহাম্মদ রিয়াদ গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বললেন তা হচ্ছে এই যে, আমরা নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি। কাজেই আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে। কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই একই ধারার পুরনো স্কোর বোর্ড থেকে দূরে থাকতে হবে– চাই তা ওয়াশিংটনে বা নিউইয়র্কে অথবা কায়রোতে হোক বা গণমাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে হোক। আমরা আমাদের মূল বিষয় বা সারবত্তায় আমাদের নীতি পাল্টাইনি। কিন্তু আমরা এখন যে কৌশলে কার্যাদি নিষ্পন্ন করব এতে আমাদের পুরনো পেপার পুড়ে ফেলে নতুন স্টাইলে শুরু করতে হবে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে তা হচ্ছে– আমেরিকানরা কেন এখন ভূমিকা রাখতে এত আগ্রহী ? এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্থিতিও রয়েছে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন এটাকে সামরিকের চেয়ে রাজনৈতিকভাবেই বেশি গ্রহণ করছে। আর আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার চুক্তির ব্যাপারে বলছি। তাদের মধ্যে বিদ্যমান কিছু সমস্যার সুরাহা তারা চাচ্ছে। তারা পরস্পরকে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছে। রাশিয়ানরা আমাদের বেশ সাহায্য করেছে। আমরা তাদেরকে বাদ দিয়ে চলতে পারব না। তাহলে তো আমরা ইসরাইলের লক্ষ্যই বাস্তবায়ন করলাম। তারা এখান থেকে বেরিয়ে গেলে আমেরিকানরা সমস্যা সমাধানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে না। আমরা তো প্রকৃতই শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। রুশরা তা জানে। তারাও শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। তারা

চেষ্টাও করেছে। কিন্তু একটি সময় আসবে যখন তারা বলবে— এই সকল লোককে (ইসরাইলীদের) পিটাতে হবে যাতে তারা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাইতে বাধ্য হয়। তারা সে সময়টিরই কাছাকাছি রয়েছে। তারাও মনে করে যে আমাদের ভূমি মুক্ত করার জন্য আমাদেরকেই এগিয়ে যেতে হবে। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, রুশ ও আমেরিকানদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমি ভাবছি, এদের মধ্যে আসলে কোন বিস্তারিত চুক্তি হয়নি। আমার কাছে আরেকটি পয়েন্ট রয়েছে। তা হচ্ছে— দূরপ্রাচ্য সম্পর্কিত (অর্থাৎ ভিয়েতনাম ও চীন বিষয়ক)। সেটা হচ্ছে যদি রাশিয়ানদের এখানে থেকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বের হতে হয় তাহলে তারা যেন গোটা বিশ্বেই হেরে গেল। সেজন্যই আমাদের নীতি হবে রাশিয়ানদের সব কিছু আমাদের জানতে হবে।

তাদের সংবেদনশীলতার প্রতিও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এ দিক থেকে তারা বেশ জটিল। বেরগেস-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের চিন্তা-ভাবনা তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাদেরকে একেবারে স্পর্শকাতর করে তুলতে পারে। তারা ধারণা করে বসতে পারে যে এটা আমাদের সাথে আমেরিকার যোগাযোগের সাক্ষী। এজন্যই এ দিক থেকে তাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে। তাদের রয়েছে চীন ও অন্যান্য স্থানের অভিজ্ঞতা। তারা ধারণা করে যে তাদের বন্ধুরা তাদের সাথে গাদ্দারি করেছে।

এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান হবে– আমরা তাদেরকে আমাদের দেশ দিয়ে দেব না এমনকি আমাদের নীতিতে প্রভাব ফেলতেও দেব না। এখানে মিসরে আমাদের জানা কিছু কমিউনিস্ট মহল রয়েছে যারা আমাদের ও রুশদের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করতে চায়। কাজেই ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কেও আমাদের এটা লক্ষ্য রাখতে হবে। আমেরিকানরা চায় যেন আমাদের কাছে প্রকাশ পাবে যাতে আমাদের প্রতি সোভিয়েত সাহায্য কমাতে পারে। তারপর যখন এমন কিছু বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ পাবে যাতে আমাদের মনে হবে যে, রুশরা নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কাজেই আমেরিকা ও ইসরাইলী উদ্দেশ্য সাধিত হয় এমন কোন আচরণে আমরা পা ফসকে পড়ার আগে নিজেদেরকে পুরোপুরি সামলে নিতে হবে। কিছু পক্ষ আছে সাম্যবাদী আবার কেউ আছে অসাম্যবাদী। আমেরিকাও চায় আমাদের ও রাশিয়ানদের মধ্যে কিছু সংশয় ধরিয়ে দিতে। তারা চায় তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ককে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে নিয়ে আসতে। এর চিকিৎসা হচ্ছে আমাদের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখা। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সাথে আমার আলোচনা অনুসারে আমি আত্মবিশ্বাসী যে, আমাদের গ্রহণীয় না হলে তারা কোন ব্যাপারে আমাদের স্বীকৃতি আদায় করতে পারবে না। এবার ডঃ মুহাম্মদ হাসান যাইয়্যাতকে কিছু বলার জন্য আহ্বান করা হলে

তিনি বলেন– "আমার ও বেরগেসের মধ্যে আলোচনাকালে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি কি এ ব্যাপারে আশাবাদী ? আশাবাদের ডিগ্রী কত ? তিনি উত্তর করেছিলেন –অর্ধেক অর্ধেক। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তর দেন, সংশ্লিষ্ট চারটি দেশ মনে করে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে লক্ষ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। খোদ ইসরাইলই মনে করে যে, তার বর্তমান রূপরেখা তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এ পয়েন্টটি তিনি দু'বার জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। এবার এ্যাম্বেসেডর আশরাফ গেরবালকে আলোচনার জন্য আহবান জানানো হলো। (ইনি হচ্ছেন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত মিসরী নাগরিক বিষয়ক চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স। তাঁকে রজার্স উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনার সময় কায়রোতে ডেকে পাঠানো হয়)। তিনি বলেন ঃ আমার আমেরিকা অবস্থানের সময়টিতে আমি যা উপলব্ধি করেছি তাতে আমি এটুকু বলতে পারি যে, ইসরাইল ও আমেরিকার অবস্থান সমান্তরালভাবেই চলছিল। এ অবস্থানে রজার্স উদ্যোগই হচ্ছে প্রথম পরিবর্তন। এ ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক তৎপরতার পরই আমেরিকান নীতির সাথে ইসরাইলী নীতি-বিচ্ছিন্নতা বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমেরিকানরা আমাদের ও রুশদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্য নানাভাবে বার বার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। তারা আন্তর্জাতিক কৌশলগত পন্থায়ও চেষ্টা-তদবির করে যাচ্ছে কোন প্রকারে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পৌঁছার কোন রাস্তা পায় কি না যাতে তাদের ওপর আছর ফেলতে পারে। এ জন্যই দেখা যায় যখনই রাশিয়া তৎপর হয়েছে, তা দেখে আমেরিকাও তৎপর হয়েছে কাজেই এ উপাদানটি সব সময় মনে রাখা আমার জন্য আবশ্যক। যেদিন আমেরিকা অনুভব করবে যে পরিবর্তনের উপাদানটি হারিয়ে যাচ্ছে সেদিন আসন্ন পর্যায়ের জন্য আমেরিকার পরিবর্তন মূল্যহীন হয়ে পড়বে। যে সময় আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমাদের সম্পর্ককে শক্ত ও মজবুত রেখে যাব সে সময় যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের সাথে আরও কিছু বৃহৎ দেশের সঙ্গে আমি সম্পর্ক পাতিয়ে তাদেরকে এটা বলার চেষ্টা করব যে, "আপনাদেরকে আগের পদক্ষেপ থেকে এখন আরও বড় পদক্ষেপ রাখতে হবে।" এ ব্যাপারে আমার ভাবনা এ রকম যে, নিঃসন্দেহে সম্পর্ক ফিরে পাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি তা হাতে পেয়েও দূরে নিক্ষেপ করতে পারি না। যতক্ষণ না এর বদলে আরও বড় কিছু পাই। ইয়ারেঙ-এর সাথে আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে যখন আমেরিকার অবস্থান স্পষ্ট হবে এবং আমেরিকান চাপে ইসরাইলের অবস্থানও স্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন আমরা ব্যাপকভাবে আমাদের সম্পর্কে পুনর্বিন্যাস করতে দেরি করা ঠিক হবে না।

এ ছাড়াও আমেরিকার সাথে পুনরায় ঋণ সমন্বয়ের মতো অনেক বিষয় রয়েছে। এ ধরনের ইস্যুগুলোতে আমার রাজনৈতিক বা কৌশলগত কোন দাম দিতে হবে না।

বিশেষ করে ম্যাকনামারার মতো ব্যক্তিদের সাথে আমি যে মানবিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার আলোকে এটা বলা যায়। আমরা আমেরিকার সাথে যে কিছুটা খোলা মনের কথা বলছিলাম তা এভাবে হতে পারে যে, মাননীয় প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ থেকে নিক্সন বা রজার্সের কাছে পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে আরও একটু বেশি প্রসারতা নিয়ে বৈষয়িক দিকগুলো মোকাবিলার আহ্বান জানাতে পারেন। আবারও জামাল আব্দুন নাসের সোভিয়েত আমেরিকা ইস্যুতে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

"আমি এখন সে কাজগুলো করতে থাকি যাতে বেশি মূল্য দিতে হবে না। এগুলো হচ্ছে Niceties (খোশমোদী)। কিন্তু এগুলো কৌশলগত কার্যক্রম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। কিছুটা ভাব করা সম্ভব। কিন্তু সম্পর্কের পুনর্স্থাপন একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। আমরাই তো আরব দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছিলাম যেন আমেরিকার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে। তা তারা করেছে। এখানেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলায় ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। কারণ এখন সম্পর্ক পুনর্স্থাপনের অর্থ হবে, আমরা পর্দার অন্তরালে আমেরিকানদের সাথে সমঝোতা করে নিয়েছি। অথচ আমরাই তো সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে চেয়েছিলাম যেন ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তো আমাদের কাছে কিছু চায় না, আমরাই তো তার কাছে চাচ্ছি। স্বভাবতই রুশদের প্রকৃতি আমেরিকানদের চেয়ে ভিন্ন। তাদের রয়েছে Discipline যা খামশ থাকার সীমায় পৌঁছে যায়। যখন তাদেরকে অস্ত্রবিরতির কথা জানালাম তখন তাদের বলেছিলাম যে আমরা আগামীকাল ১২ টার সময় আমাদের জবাব দেব। আমরা অনুমোদনের দিকেই এগুচ্ছি, যদি তোমাদের কিছু বলার থাকে তা আমাদেরকে জানাও। কিন্তু তারা আমাদের কাছে কিছুই পাঠায়নি। অথচ সে সময় বেরগেস ঘণ্টায় লণ্টায় বার্তা পেয়ে যাচ্ছিল। আমাদেরকে এ বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নেই কিছু এমন কণ্ঠ রয়েছে যারা বলছে যে, আমরা তাদেরকে জড়ায়ে ফেলছি, অথচ শেষমেষ দেখা যাবে যে, তারা চীনের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছিল সেটাই পেয়েছে।

মুহাম্মদ রিয়াদের সাথে বেরগেস-এর সাক্ষাৎ, এমনকি বাসভবনেও ভাল চোখে দেখছে না। তবে আমরা কেবল আমাদের ইস্যুর খাতিরেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে এত হিসাবে রাখছি। কারণ আমি প্রতি সপ্তাহেই তাদের কাছে বৈমানিক চাচ্ছি। আমি এক'শ বার লিখেও যদি বৈমানিক পাই তাতেও অপমানিত বোধ করব না। এটা স্পষ্ট যে, যদি এই অপারেশন থেকে রুশরা চলে যায় তাহলে আমেরিকানরা আমাদের একা

পেয়ে বসবে। যা হোক, কিছু খোশামোদের যে কথা আশরাফ (গেরবাল) উত্থাপন করেছেন এটা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আপনি এখন আপনার কাজকে সম্পূর্ণ পুনর্স্থাপনের ভিত্তিতে নির্মাণ করতে পারেন না। এ ছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট রয়েছে যা আমাদের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন বা আমাদের চিন্তা-ভাবনায় থাকা দরকার। এর মধ্যে প্রথমত আমাদের জানতে হবে যে মিসর বাহিনীই ইসরাইলকে অস্ত্রবিরতি মেনে নিতে বাধ্য করেছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আমরা সব সময় আমেরিকাকে এটা ভাবা উচিত নয় যে, সে কেবল ইসরাইলীদের সহায়তাকারী। তৃতীয়ত, আমাদের একটি আরব অবস্থান রয়েছে, তা আমাদের সযত্নে লালন করে যেতে হবে। চতুর্থত, আমাদেরকে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করতে হবে। গণমাধ্যমগুলো এ উদ্দেশ্যে বড় ধরনের প্রচারাভিযান চালাবে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে আপনাদের মুক্ত হাতে কাজ করে যেতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রইল। এটার কোন সীমা নেই, কেবল ১৯৬৭-এর ৪ জুনের পর অধিকৃত সকল আরব ভূমি থেকে পূর্ণ প্রত্যাহারের উপর জোর দিয়ে যেতে হবে। আর তারা যে ছোটখাটো সংশোধনের কথা বলে থাকে সে ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নেই যদি জর্ডান তা মেনে নেয় এবং প্রশাসনিক কিছু সংস্কার বা ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বিরল পরিস্থিতিতে কোন কিছু সংশোধন করে নেওয়া হয়। অনুরূপভাবে আমরা গোলান থেকে কখনও দাবি প্রত্যাহার করব না। এ কাজ খুবই কঠিন হবে। তারা এক সময় প্রত্যাহার সম্পর্কিত কথাবার্তা প্রত্যাখ্যান করত। সম্প্রতি এ শব্দটি গ্রহণ করে নিচ্ছে। আমি আশা করি অচিরেই তারা এটা থেকেও পিছু হটে যাবে। কিন্তু আমরা এ কাজে একটি বিষয় অর্জন করেছি তা হচ্ছে বাস্তবতা এখনও কেবল নিছক কথামালা মাত্র। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আপনাদের কাছে এটা স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, আমরা এক ইঞ্চি ভূমিও ছাড় দেব না। আপনাদের কাছে আমি যা শুনলাম এর অনেক ব্যাপারেই আমি একমত। যাইয়্যাত ও আশরাফ যদি এ মর্মে কিছু মৌখিক বার্তা পাঠান যে, আমরা সমাধানের বিষয়ে সিরিয়াস এবং আন্তরিক এতে আমার আপত্তি নেই। যদি ইয়ারেঙ সাইপ্রাসে উপস্থিতির চেষ্টা করে তাহলে আমরা সেখানে আমাদের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্সকে তার সাথে সর্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে বলব। তবে আমি আপনাদেরকে একটি বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাই যে, কেউ যেন আমাদের কথাবার্তায় এটা অনুভব না করে যে, আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য একেবারে ত্রাহি ত্রাহি করছি। এ ধরনের সমাধান এত কাছে নয়।"

এরপর প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসের হঠাৎ খেয়াল করলেন যে, তিনিই কেবল কথা বলে যাচ্ছেন। তাই তিনি বললেন– "আমি চেয়েছিলাম আপনাদের কাছে শুনতে কিন্তু

আপনারা আমাকেই কেবল ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে যেতে বাধ্য করলেন।" এই বৈঠক পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে। বেশির ভাগ সময়ই জামাল আব্দুন নাসের শুনেছিলেন এবং খুব কমই কথা বলেন। এই সমন্বয় আলোচনা সভাটির কয়েক সপ্তাহ পরেই জামাল আব্দুন নাসের ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন)। শান্তির সিদ্ধান্ত ঝুলে থাকে. যদিও চেষ্টা ও উদ্যোগ ছিল। যুদ্ধের সিদ্ধান্তও থাকে তেমনি ... যদিও পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

আনোয়ার সাদাত

শান্তি নির্মাণ ও তার ব্যবসায় শান্তি প্রস্তুত ও বাণিজ্য করা।

"সুসংবাদদাতার কথা শুনে ভরে গিয়েছিল মন। আহা! যদি সে বলিত তখন সঠিক সত্য ভাষণ!"

—কবি আল্-বুহ্তারী

যে কোন নীতি কূটনীতি অথবা শান্তির মাধ্যমে চর্চা করা হোক তার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পস্ট হওয়া। অর্থাৎ কূটনীতি ও শক্তির জানা থাকা দরকার সে কোথায় পৌঁছতে চায়। কূটনীতি হয়ত ঢাকা থাকতে পারে, অস্ত্র হয়ত মহড়া দিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য থাকতে হবে পরিষ্কার। এর চারপাশেই ঘুরতে হবে। কখনও হয়ত পরোক্ষ পথে তার কাছে ঘেঁষা সুদূর পরাহত মনে হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য থাকতে হবে সব সময় দৃষ্টির সীমানায়। কূটনীতি ও শক্তির সাফল্যের মাপকাঠি হবে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারা– কোন্ পথে পৌঁছা হলো সে বড় কথা নয়।

যুদ্ধ ও শান্তি

যুদ্ধ লাগানো অথবা শান্তি আনা কোন একজন ব্যক্তির দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া বেশি বিপজ্জনক, চাই সে হোক কোন রাষ্ট্রপতি অথবা নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তার অধিকারী কোন নেতা।

এ ধরনের প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অংশগ্রহণ কখনও কখনও সুযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ হয় বটে, কিন্তু কোন একক ব্যক্তির ওপর সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলে তা ডেকে নিয়ে আসতে পারে দুঃসহ দুর্যোগ!

—হাইকাল

॥ ১ ॥

গোল্ডা মায়ার

"আমরা মিসরীদের ওপর আত্মসমর্পণ অথবা গ্লানি চাপিয়ে দিতে চাই না। আমাদের কাছে কেবল এমন কিছু কথা আছে যা শোনার দাবি রাখে।"
—গোল্ডা মায়ার-এর তরফ থেকে হেনরি কিসিঞ্জারের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে পাঠানো পত্র।

আনোয়ার সাদাত ইসরাইল থেকে প্রথম পত্রটি পেলেন ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০-এ। অর্থাৎ তাঁর পূর্বসূরি প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের মৃত্যুর দু'দিন পরেই। তখনও আনোয়ার সাদাত প্রেসিডেন্ট হননি। কেবলমাত্র ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট। মিসরের নতুন প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্য সাংবিধানিক ও আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে তখন। আসলে কেবল আনোয়ার সাদাতই এই পত্র পাননি। বরং তিনি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের একদল দায়িত্বশীলের একজন হিসাবেই তা পান। ভাবার বিষয় হলো, যিনি স্বয়ং এ পত্রটি পান তিনি হচ্ছেন জনাব আলী সবরি– যিনি হচ্ছেন আনোয়ার সাদাতের জাতশত্রু এবং যাঁকে মনে করা হতো তাঁর অবস্থানে সবচেয়ে কঠোর, তিনিই এটাকে স্বাগত জানালেন। পত্রটি নিয়ে আসেন রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী। তিনি কায়রোতে এসেছিলেন জামাল আব্দুন নাসেরের জানাজায় শরিক হতে। পত্রটিতে ছিল— প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্সি বিষয়ক মন্ত্রী সে সময় মুখ্য সচিবের অফিসের একটি পাতায় যা লিখে রেখেছিলেন "রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে জনাব আলী সবরির সাক্ষাৎকার।" রুমানিয়ায় নিযুক্ত ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে নিম্নবর্ণিত পত্রটি দিয়ে তা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের দায়িত্বশীলদের নিকট পৌঁছানোর অনুরোধ করেন ঃ

১. ইসরাইল প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের মৃত্যুতে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কখনও সুযোগ হিসাবে কাজে লাগাবে না। প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর পর ইসরাইলী দায়িত্বশীলগণ যে বিবৃতিগুলো দেন তা হচ্ছে আন্তরিক এবং এতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে (বিবৃতিগুলোর মোদ্দা কথা ছিল– ইসরাইল মিসরের সাথে নতুন পৃষ্ঠা খুলতে প্রস্তুত)।

২. ইসরাইল আশা করে যে, মিসরের নতুন দায়িত্বশীলগণ সে ধারাই বজায় রাখবেন, যা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট তাঁর সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের খোঁজে অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন।

৩. এ লক্ষ্যে ইসরাইল অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এটাকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাড়াতে প্রস্তুত রয়েছে।

৪. ইসরাইল দু'জন প্রতিনিধি– সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (মিসর) যে পর্যায়ের ভাল মনে করেন– পাঠাতে প্রস্তুত রয়েছেন। তাঁরা আলোচনা চালিয়ে যাবেন। তবে রাষ্ট্রদূত ইয়ারেঙ কর্তৃক পরিচালিত আলোচনায় কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।

প্রেসিডেন্ট সাদাত ইসরাইলের পক্ষ থেকে যে পত্রটি পেলেন তাতে আরও বলা হয়েছিল যে, যদি তা রুমানীয় পক্ষকে জানিয়ে দেব। তিনি ইসরাইলী কর্তৃপক্ষকে তা জানাবার ভূমিকা পালন করবেন। আলী সবরি কোন উত্তর দিলেন না। কেবল রুমানীয় সরকার ও প্রেসিডেন্ট চচেস্কু এবং অন্য দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের অনুসৃত নীতি ও পথেই অগ্রসর হচ্ছে। এতে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

এটা ছিল আলী সবরির পক্ষ থেকে কিছুটা বাড়তি আশাবাদ। কারণ এ পত্র পাওয়ার কয়েকদিন পর যখন সাদাতের নাম আস্থা ভোটের জন্য মনোনীত হলো এবং তিনি দু'সপ্তাহ পর মিসরের প্রেসিডেন্ট হলেন— তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেল একেবারে ভিন্ন এবং তাঁর প্রশাসনের পদ্ধতির সাথে 'একই পথ, একই নীতি'-এর কোন সম্পর্কই নেই।

প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রশাসনকে তাঁর প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে অক্টোবর যুদ্ধ ও তার ফলাফল পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট বিষয়ে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, এ প্রশাসন বেশ কিছু পর্যায় অতিক্রম করে গেছে যার একটা থেকে অপরটিকে সহজেই আলাদা করা যায় এগুলোর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণের কারণে।

প্রথম পর্যায় ঃ অক্টোবর ১৯৭০ থেকে অক্টোবর ১৯৭১। এই সময়টিতে প্রেসিডেন্ট সাদাত কেবল 'রজার্স উদ্যোগের' সাথে সহযোগিতা করে গেছেন। তিনি যখন ক্ষমতায় এলেন তখন এ অঙ্গনে কেবল এই একটি পেপারই উত্থাপিত ছিল। কাজেই এর প্রেক্ষাপটেই যা ভাল মনে করেছেন, করে গেছেন। কিন্তু এ উদ্যোগের রূপকার খোদ উইলিয়াম রজার্সের সাথে সামনাসামনি সাক্ষাৎ হওয়ার পর এ ব্যাপারে তিনি একেবারে হতাশ হয়ে যান এবং এটা একেবারে ঝেরে ফেলেন। আনোয়ার সাদাত বোঝে যান যে, রজার্সের নিয়ত যতই ভাল থাকুক না কেন তিনি তা করতে পারবেন না। কারণ ওয়াশিংটনে আসল ক্ষমতা হচ্ছে হোয়াইট হাউসে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নয়।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ অক্টোবর ১৯৭১ থেকে অক্টেবর ১৯৭২। এ সময় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত হোয়াইট হাউস পর্যন্ত পৌঁছতে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ওয়াশিংটনে পৌঁছার তাঁর মাধ্যম ছিল সৌদি আরব– যাকে মনে করা হয় ওভাল অফিসের

রাজ–তোরণ। আর এ অফিসই হচ্ছে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলকেন্দ্র।

মজার ব্যাপার হলো, ওয়াশিংটনের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাত যে যুক্তিটি রাজকীয় সৌদি আরবের নিকট পেশ করেছিলেন তা ছিল— "মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার জন্য ইসরাইলী প্রহরার প্রয়োজন নেই।" যেহেতু খোদ সৌদি আরবই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ও অর্থনীতিক চাহিদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ– কাজেই এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে বার্তাবাহক নিজেই বার্তার বিষয়বস্তু!

তৃতীয় পর্যায় ঃ এটি ছিল অক্টোবর ১৯৭২ থেকে অক্টোবর ১৯৭৩ পর্যন্ত সময় খণ্ড। এ সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্ট সাদাত হোয়াইট হাউসের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। কিন্তু তার সামনে তখনও দরজা উন্মোচিত হয়নি । কারণ ঘরের বাসিন্দা রিচার্ড নিক্সন। সে সময় এক বড় স্ক্যান্ডেল– ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নিয়ে মশগুল ছিলেন। হোয়াইট হাউসের দরজার পাশে তখন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারও অপেক্ষমাণ ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত হোয়াইট হাউসের দরজায় অপেক্ষমাণ ব্যক্তিটিকে ভিতরে কেলেঙ্কারির হাতে বন্দী ব্যক্তিটির চেয়ে বেশি কামনা করছেন। কিন্তু কিসিঞ্জার তাঁর ইচ্ছানুয়ায়ী অগ্রাধিকারের তালিকা প্রস্তুত করছিলেন। সে মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়নি। তিনি কিছুটা অবসর বা সময় দেয়ার মতো ফুরসত পাওয়ার অপেক্ষায় এ ইস্যুটিকে তাঁর ভাষায়– ফ্রিজে রাখতে চেয়েছিলেন।

১৯৭২ সাল পর্যন্ত তখন কিসিঞ্জারের সাথে দূরতম যেখানে পৌঁছা সম্ভব হয়েছিল তা হচ্ছে, গোপন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সাদাতের যোগাযোগ রক্ষা। তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হাফেজ ইসমাইল ও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট 'রিচার্ড নিক্সন'-এর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসাবে হেনরি কিসিঞ্জারের মাধ্যমে এই চ্যানেল স্থাপিত হয়েছিল। সিআইএ'র মাধ্যমে এই গোপন চ্যানেল তাদের কাজ চালিয়ে যেত। মিসরে নিযুক্ত সিআইএ সেন্টার প্রধান ইউগিন ট্রোনই এ পত্রাদি নিয়মিতভাবে পৌঁছাতেন।

চতুর্থ পর্যায় ঃ এ পর্যায়টি প্রসারিত ছিল ১৯৭৩-এর অক্টোবর মাসের কয়েক সপ্তাহ জুড়ে। এর সূচনা হচ্ছে যুদ্ধ শুরু সম্পর্কিত আনোয়ার সাদাতের সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমাপ্তি হচ্ছে অক্টোবরের সেই দু'সপ্তাহের শেষ লগ্ন। সে সময় এ সঙ্কটের ভাগ্য ছিল কেবল হেনরি কিসিঞ্জারের হাতে, অন্য কারও হাতে নয়। এভাবে এই সঙ্কট অনেক কৌশলগত হাতবদল হয়েছে বিভিন্ন উত্তরণে ঃ

১. প্রথম স্থানবদল ঃ রজার্স থেকে সৌদিতে।

২. দ্বিতীয় স্থানবদল ঃ সৌদি থেকে হোয়াইট হাউসে।

৩. তৃতীয় স্থানবদল ঃ হোয়াইট হাউস থেকে এর অভ্যন্তরে হেনরি কিসিঞ্জারের অফিসে।

৪. চতুর্থ বারে ঃ হেনরি কিসিঞ্জার আনোয়ার সাদাতকে ইসরাইলী আস্তানায় পাঠান। সেখানে তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন গোল্ডা মায়ার।

অক্টোবর যুদ্ধের আগে-পরে পুরোটা সময় হেনরি কিসিঞ্জারের লক্ষ্য ছিল কেবল মিসরকে ইসরাইলের সাথে সামনাসামনি বসিয়ে সরাসরি আলোচনায় প্রবৃত্ত করা। ইসরাইল এতে বেশ আগ্রহী ছিল— সেই হেনরি কিসিঞ্জারেরও অনেক আগে থেকে। উভয়ের মতলব ছিল মিসরকে আরব দেয়াল থেকে খসিয়ে বের করে নেয়া। এভাবে এই দেয়াল ফুটো করে 'পবিত্র ও নিষিদ্ধ' ধারণা তাতে ঝুলিয়ে দেয়া। এরপর যে কোন রাজনৈতিক ও সামরিক ইত্যাদি ফায়দা লোটা যাবে এবং এতে করে ইসরাইল মিসরের সাথে একলা কোন শান্তির ব্যবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

আরব-ইসরাইল আলোচনার প্রস্তাব সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয় নিরাপত্তা পরিষদের ৩৩৮ নং সিদ্ধান্তে– যার মাধ্যমে ১৯৭৩-এর ২২ অক্টোবর যুদ্ধবিরতির ফয়সালা হয়। এটা তো জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত বহু সিদ্ধান্তের মতো ঝুলেও থাকতে পারত। কিন্তু ইসরাইল– তেমনি কিসিঞ্জার-এ সিদ্ধান্তকে ভূমিতে কার্যকর করার জন্য অতি আগ্রহী ছিলেন। তারা চায়নি এটা দীর্ঘ সময় হাওয়ায় ঝুলে থাক।

আনোয়ার সাদাতের কাছে কিসিঞ্জারের পত্র

যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ২২ অক্টোবর থেকে ইসরাইল মিসরী ফ্রন্টের ওপর তার সামরিক চাপ অব্যাহত রাখে, যাতে তৃতীয় যে মিসরী বাহিনীকে ঘিরে রাখতে পারে এবং এমন অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে যাতে মিসরী নেতৃত্ব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। ২৭ অক্টোবর বিব্রতকর মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের কাছে ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার একটি পত্র পাঠালেন। ১৯৭৩-এর জানুয়ারি থেকে প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হাফেজ ইসমাইল ও তার মধ্যে যে গোপন চ্যানেল প্রতিষ্ঠিত ছিল সে চ্যানেলেই এ পত্রটি এসেছিল। এতে লেখা ছিল ঃ

ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের পক্ষ থেকে জনাব হাফেজ ইসমাইলের নিকট। আপনারা আমার পূর্বে প্রেরিত পত্রগুলোর আলোকে অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমি তৃতীয় মিসর বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে ইসরাইলী সরকারের সাথে জরুরী যোগাযোগ রেখে আসছি। আমি সম্প্রতি ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে নিচের চিঠিখানা পেয়েছি ঃ

"আমার বর্তমান পরিস্থিতির সমাধানের উপায় সম্পর্কে মিসরীদের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে আলোচনায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত আছি। (বর্তমান পরিস্থিতি অর্থ— যুদ্ধবিরতির পর তৃতীয় মিসর বাহিনীকে ইসরাইল অবরোধ করে রাখতে চেয়েছিল)। মিসরীদের এখন প্রস্তাব দিতে হবে স্থান, তারিখ এবং তাদের প্রতিনিধিদের পদ কি

হবে। আমরা চীফ অব স্টাফ অথবা প্রতিরক্ষামন্ত্রী বা অন্য কোন জেনারেল অথবা এদের বাইরে যে কোন প্রতিনিধিকে আলোচনার জন্য পাঠাতে প্রস্তুত রয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের কাছে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা তাদের কাছে উত্থাপন করতে পারি। এমন কিছু যা আত্মসমর্পণ বা অপমানজনক নয়... এ পরিস্থিতি থেকে বের হবার একটি সম্মানজনক রাস্তা। মিসরীদের কেবল একটি করবার আছে তা হচ্ছে– স্থান, সময় ও প্রতিনিধিদের পদমর্যাদার প্রস্তাব রাখা। ইসরাইলী পত্রের এখানেই শেষ। আমরা নির্দিষ্ট মাধ্যমের মারফত কেবল পত্রটি স্থানান্তর করলাম— এটা কোন সুপারিশ বা প্রশংসাপত্র নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্যা থেকে সম্মানজনকভাবে বের হবার লক্ষ্যে তার সকল প্রভাব খাটিয়ে যাবে।

স্বা/

– হেনরি কিসিঞ্জার

প্রেসিডেন্ট সাদাত এ রকম একটি পত্র লাভের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন— তাই এটা তাঁর সুচিন্তিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল হোক অথবা তাঁর সামনে বিরাজমান সামরিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের ফল হোক। কাজেই তিনি মিসরী ও ইসরাইলী সামরিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত নেন যে, উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হবে, যার নেতৃত্ব দিবেন তৎকালীন ডিরেক্টর অপারেশন মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আব্দুল গনি জেম্‌সী। এই আলোচনাই তখন এর অনুষ্ঠানের স্থান "কিলো ১০১" এ নামেই পরিচিতি লাভ করে। জেম্‌সীর সামনে ইসরাইলী আলোচক ছিলেন জেনারেল 'আহারুন ইরারিফ'– ইসরাইলী সামরিক গোয়েন্দা পরিচালক। এ ছিল প্রথম পদক্ষেপ, যাকে ইসরাইল স্বাগত জানায় এবং স্বাগত জানান কিসিঞ্জারও। কিন্তু উভয়েরই আসল মতলব সামরিক আলাপ-আলোচনা ছিল না। কারণ "রোড্‌স" যুদ্ধবিরতি চুক্তির স্টাইলে এ ধরনের আলোচনার তো নজির আছেই– যদিও একই পর্যায়ের না হোক। ইসরাইল ও কিসিঞ্জারের মতলব ছিল– সকলের সামনে প্রকাশ্যে সরাসরি মিসর–ইসরাইল রাজনৈতিক আলোচনা হোক, যাতে সবার কাছে প্রতিভাত হয় যে, নিষিদ্ধ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে পুরনো রেড লাইন মাড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্যাটি ছিল ঃ

কিভাবে ? অথচ লড়াইয়ের আওয়াজ তো এখন কানে বাজছে, মরু বালুতে এখনও ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, সেনাবাহিনী এখনও মোতায়েন আছে এমন ফ্রন্ট লাইনের সামনে যেখানে নিকষ ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে ক্রমাগত আগুনের লেলিহান জিহ্বা চমকে উঠছে, মিসরের গণমানুষ এখনও বিনিদ্র , আরব জাতির বাহিনীগুলো প্রস্তুতি নিয়ে আছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে, বিশ্বজনমত সহনুভূতিশীল, বিশ্ব অর্থনীতির ওপর প্রভাবশালী মোক্ষম পেট্রোলিয়াম অস্ত্র এখনও

উঁচিয়ে আছে ? কিভাবে এই বিদ্যুতায়িত পরিস্থিতিতে এত ত্বরিতগতিতে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে সরাসরি রাজনৈতিক বৈঠক সম্ভব হতে পারে ? কিন্তু ইসরাইলী ও আমেরিকান লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার জন্য এই দ্রুত গতিতেই তা যে হওয়া দরকার।

ইসরাইলের লক্ষ্য ছিল দু'ধরনের ঃ

* সাধারণ ধরনের মধ্যে ইসরাইলে এ স্বার্থ শামিল ছিল যে লোহা গরম থাকতেই তার পথগুলোকে সোজা করে নেয়া। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা ও শান্ত হয়ে যেতে না দেয়া। নইলে তো একই পথে ফিরে এসে আবার প্রস্তাব রাখা শুরু হয়ে যাবে– কালি আর কাগজে স্ববিরোধী সব প্রস্তাব এসে যাবে!

* আর বিশেষ লক্ষ্যগুলোর মধ্যে শামিল ছিল এই যে ইসরাইলের শাসক পার্টি হচ্ছে 'শ্রমিক দল'– যারা ১৯৭৩ সালের শেষ দিন অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। সে এখন যুদ্ধের এমন দৃশ্যের অবতারণা করতে পারে না যা ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষা করবে না, বিশেষ করে লড়াইয়ের প্রথম দিনগুলোতে। শ্রমিক দল চাচ্ছিল না যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী "লিকুদ" দল যুদ্ধের ত্যাগ-তিতিক্ষার পর তার হাতে শান্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে অগ্রসর হোক। এদিকে আমেরিকার সম্মিলিত লক্ষ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের নেতৃত্বের লাগাম টেনে ধরার জন্য তড়িঘড়ি করা এবং আমেরিকান নির্দেশনার আওতায় এটাকে সংরক্ষিত রাখা। শঙ্কা ছিল, পাছে আমেরিকার বিবেচনার বাইরের বিষয় টেনে এনে কোন প্রভাবশালী মহল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ফেলে বা নাক গলিয়ে পরিস্থিতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে বসে।

হেনরি কিসিঞ্জারের মাথায় যে চিন্তাটি খেলে গেল তা ছিল মূলত সমস্যার সব দিক নিয়ে আলোচনাকারী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চিন্তা। এতে ৩৩৮ সংখ্যক সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত নির্দেশনার আলোকে সকল পক্ষই অংশগ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ধারণা উত্থাপিত হলো। নীতিগতভাবে এর সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সবাই ভাবল যে এর মাধ্যমেই অনেক বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে একটি সমাধান বের হয়ে আসতে পারে। কারণ বিশ্বের সকল শক্তিরই এতে অংশ নেয়া উচিত। আঞ্চলিক শক্তিগুলো হলরুমে প্রবেশ করতে সক্ষম। সকল পক্ষই তাদের সিটে আমন্ত্রিত হতে পারে, বিগত কালের পুঞ্জীভূত কোন বিব্রতকর কারণ বা সংবেদনশীলতা ছাড়াই। কিন্তু হেনরি কিসিঞ্জার আন্তর্জাতিক সম্মেলন চাচ্ছিলেন তাঁর আরোপিত শর্তানুসারে।

দুর্ভাগ্য ছিল যে, তাঁর যাদু আনোয়ার সাদাতের ওপর ছিল লাগসই এবং ক্রিয়াশীল। দেখা গেল ৭ নভেম্বর তাঁদের মধ্যকার প্রথম সাক্ষাতে— তখনও সংঘর্ষ চলছিল— হেনরি কিসিঞ্জার আনোয়ার সাদাতকে বোঝাতে সক্ষম হন, যা ছিল বিশেষ করে সে সময়ে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। উভয়ের মধ্যকার সেই প্রথম বৈঠকে হেনরি কিসিঞ্জারকে আনোয়ার সাদাত অনেক ছাড় দিতে সম্মত হন। এর মধ্যে ছিল ঃ

—২২ অক্টোবর যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত ইস্যুর দিন ইসরাইল যে সীমারেখায় ছিল তাতে ফিরে আসার শর্ত বাদ দেয়া।

—উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধের লক্ষ্যে সরাসরি একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া, এর বিস্তারিত বিবরণের ওপর আলোচনা চলবে।

—১৯৭৩ সালের ২৮ অক্টোবর যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত অতিক্রম করে লড়াই যে সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায় সে সীমারেখায় বাহিনীগুলোকে স্থির রাখার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান। যদিও এ সিদ্ধান্তে মিসরী ফ্রন্ট বেকায়দায় পড়ে থাকবে, বিশেষ করে তৃতীয় বাহিনী।

—ইসরাইলী যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেয়ার ব্যাপারে সম্মতি। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলটি হলো ৩৬ ইসরাইলী বৈমানিক, যাদের বিমানগুলো মিসরী আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী ভূপাতিত করে তাদেরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে। গোল্ডা মায়ার কোন আলোচনা ছাড়াই এদের সমর্পণের ব্যাপারে অতিশয় আকুলভাবে অনুরোধ করে যাচ্ছিলেন।

—মিসর 'বাবুল মান্দেব'–এর যে সামুদ্রিক অবরোধ কায়েম করেছিল তা উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সম্মতি। এ অবরোধ করা হয়েছিল এ বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে যে, আল্ আকাবা উপসাগর থেকে এডেন উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত লোহিত সাগর মূলত আরব হ্রদ।

—মিসর এ ব্যাপারে তাদের সম্মতি দেয় যে, যদি সমাধানের অনিবার্যতা সম্পর্কে আরব মিত্রদের বোঝাতে সফল না হয় তাহলে সে ইসরাইলের সাথে একলা সমাধান কবুল করতে প্রস্তুত রয়েছে। ব্যাপকভিত্তিক আরব-ইসরাইল সন্ধি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পূর্ণ সমন্বয়ের অনুমোদন।

—এ অঞ্চলের শক্তির ভারসাম্য থেকে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে রাজি হন।

—অবিলম্বে সুয়েজ ক্যানেল নগরীগুলো নির্মাণ শুরু করে সেখান থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া নাগরিকদের সেখানে পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে যাতে মিসর এ মর্মে আশ্বস্ত হয় যে, মিসর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করতে চায় না বা নতুন করে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না; বরং সে সমাধানের পথে চলার ব্যাপারে আসলেই আন্তরিক।

—এটা হবে সুয়েজ খালকে আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের জন্য খুলে দেয়ার প্রস্তুতি। এতে ইসরাইল তার কাঙ্খিত পূর্ণ আশ্বাস ও বিশ্বাস লাভ করবে যাতে সে সমাধানের জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে। এ ছিল এমন সব ছাড় যা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। অথচ এ সবই সম্পন্ন হলো হেনরি কিসিঞ্জার ও আনোয়ার সাদাতের প্রথম বৈঠকেই; বরং এর চেয়েও অনেক বেশি স্বার্থসিদ্ধি হলো তাদের। দেখা যায়

প্রেসিডেন্ট সাদাত হেনরি কিসিঞ্জারের নিকট অনুরোধ করলেন, যুক্তরাষ্ট্র যেন মিসরের নিরাপত্তার ভার নেয়– ব্যক্তিগত ও সাধারণ পর্যায়ে।

একটি সমাধানের পথে এসব ছাড় দিয়ে তিনি ভাবলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র তার কাগজপত্রের ৯৯ ভাগেরই মালিক বনে গেল। বলা হয়ে থাকে— এভাবেই তিনি কঠিন বিপদের মুখে নিজেকে ঠেলে দেন এবং তাঁর নিজের সুরক্ষার শক্তি-সামর্থ্যটাও এখন এক অজানা পরিবেশে পা ফেলে অগ্রসর হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র এটা করতে গেলে দু'টি বৃহৎ শক্তির মধ্যে এমন বিবাদ দেখা দেবে যে, পুরো সম্মেলনই পণ্ড হয়ে যেতে পারে।

জেনেভার এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য পশ্চিম ইউরোপও জেদ ধরবে। কিন্তু এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো, বিশেষ করে মিসর, ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র এমন কোন ইউরোপীয় ফুটো রাখতে চায় না যার ফাঁক গলিয়ে তারা অযাচিত হস্তক্ষেপ করতে পারে, যার ফলে বিষয়গুলোকে সহজ করার চেয়ে জটিল করে তুলবে বেশি।

জেনেভার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে হবে ইসরাইলী নির্বাচনের নির্ধারিত সময়ের আগেই। যাতে মিসর ও ইসরাইল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মুখোমুখি বসতে পারে। এর ফলে ইসরাইলের ভোটযুদ্ধে শ্রমিক দলের পক্ষে এর ইতিবাচক দিক প্রতিফলিত হয়। (ইসরাইলের নির্বাচনী তারিখ ছিল ৩১ ডিসেম্বর, কিসিঞ্জারের প্রস্তাবিত সম্মেলনের তারিখ ছিল ১৮ ডিসেম্বর। এতে করে কাছাকাছি দুটো সপ্তাহের মধ্যে ইসরাইলী নির্বাচকরা জেনেভা থেকে প্রতিফলিত শান্তির রঞ্জনরশ্মি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে)।

পরিশেষে হেনরি কিসিঞ্জার এ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত সম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে তার প্রত্যাশার এটাও যোগ করতে পারেন যে, এতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আরোপিত তেল অবরোধ সমাপনেও সহযোগিতা হবে। কাজেই আরবদের শান্তির নেপথ্য থেকে শান্তির নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তর দিয়েছিলেন– "তিনি যথাসময়ে তাঁর প্রভাব খাটাতে প্রস্তুত রয়েছেন।"

হেনরি কিসিঞ্জার আনোয়ার সাদাতের সাথে 'কানাতের' অবকাশ কেন্দ্রে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর দু'টি বৈঠক করে যখন বের হন ততক্ষণে তিনি যা চেয়েছেন তা পেয়ে গেছেন। আবারও প্রমাণিত হলো যে, তাঁর যাদু অপ্রতিরোধ্য!

॥ ২ ॥

কিসিঞ্জার

"পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চেয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে সরাসরি কাজ করাকে আমি শ্রেয় মনে করি।"

— প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে প্রেরিত কিসিঞ্জারের পত্রের মর্ম

হেনরি কিসিঞ্জার তাঁর নিজস্ব স্টাইল ও শর্তাদির ভিত্তিতে জেনেভা সম্মেলন করার পটভূমি রচনাতে ব্যস্ত ছিলেন। এমনকি ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে সাক্ষাতের আগে থেকেই। কিসিঞ্জার তাঁর মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্মীর মধ্যে পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেন যে, জেনেভা সম্মেলনের পূর্বেই লড়াইয়ের ময়দানে সংঘর্ষ বন্ধের চুক্তি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কারণ জেনেভায় মিসরী আলোচক তখন আর চাপ সৃষ্টিকারী পয়েন্ট হিসাবে মিসরী বাহিনী অবস্থাটিকে তুলে ধরতে পারবে না। হেনরি কিসিঞ্জার অনুভব করেন যে, মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নজরে নির্বাচন দ্বারপ্রান্তে রেখে ইসরাইলী সরকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কি না এ ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ আছে। এ কারণে বোধহয় জেনেভা সম্মেলনটি ইসরাইলী নির্বাচনের পর করাই উত্তম হবে।

এ ছাড়া মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর ভূমিকায় অনুভব করেন যে, হেনরি কিসিঞ্জার তড়িঘড়ি করে প্রেসিডেন্ট সাদাত থেকে প্রাপ্ত অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন দেখতে চান এবং পরে এর বিনিময়ে কিছুই দেবেন না। অনুরূপভাবে হেনরি কিসিঞ্জারও এক প্রকার বোঝে নিলেন যে, নতুন মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ খেলায়ও নতুন-ই বটে। খেলার অভ্যন্তরীণ নিয়মেও তিনি কাঁচা। কাজেই আপাতত তাঁর সাথে যোগাযোগ সীমিত রাখারই সিদ্ধান্ত নিলেন।

সে সময় যে একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ পত্র কিসিঞ্জার মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পাঠিয়েছিলেন তাও ছিল নিছক একটি স্মারকপত্র, যাতে ছিল ঃ

"আমি সমস্যা এড়ানোর চেতনায় আপনাকে জানাতে চাই যে, আগামী রবিবার কিছু ইসরাইলী স্টিমার 'বাবুল মান্দেব'(MANDEB) প্রনালী অতিক্রম করতে যাচ্ছে বলে আমি জানতে পেরেছি। এ সঙ্গে আমার মনে পড়ছে যে আপনার সাথে কায়রোতে সাক্ষাতের সময় আপনি আমাকে অবহিত করেছিলেন যে, বাবুল মান্দেব অবরোধকে হাল্কা করার ব্যাপারে ইতোমধ্যেই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। আপনাকে এ বিষয়ে আবারও স্মরণ করে দিতে চাইলাম যাতে তা কার্যকর সময় আমরা যে কোন

ভুলকে এড়াতে পারি।” কিন্তু কিসিঞ্জার অন্য পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞ চ্যানেলে কাজ করাকেই শ্রেয় মনে করলেন। কাজেই তিনি গোপনে সরাসরি চ্যানেলে ফিরে এলেন। যার দায়িত্বে ছিলেন হাফেজ ইসমাইল— প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে পৌঁছার সোজা পথ। এভাবেই ২১ নভেম্বর ১৯৭৩-এ নতুন করে উজ্জীবিত সেই গোপনীয় চ্যানেলেই হাফেজ ইসমাইলের নিকট আবার একটি পত্র লিখলেন। এর ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের পক্ষ থেকে জনাব হাফেজ ইসমাইলের প্রতি বিগত ১৫ নভেম্বর আপনার সাথে মিস্টার ট্রোনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমার কাছে প্রেরিত বিস্তারিত রিপোর্টটি পেয়ে আমি খুশি হলাম। (মিঃ ইউগিন ট্রোন তৎকালীন সিআইএ প্রতিনিধি ছিলেন, এ হিসাবে তিনি কিসিঞ্জার ও হাফেজ ইসমাইলের মধ্যে যোগাযোগের কড়ি ছিলেন)। এ প্রধান রুটটি সযত্নে লালনের ব্যাপারে আপনার মতোই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এ পর্যায়ের যোগাযোগেই সেসব মতামত খুলে বলা যায় যা সরকারী মাধ্যমগুলোর মারফত সরকার থেকে সরকারে চালাচালি করা দুরূহ হয়ে থাকে। এ উপলক্ষ্যে আমি বিশেষভাবে এ চ্যানেলটি ব্যবহার করে আমি ব্যক্ত করতে চাই– প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে সাক্ষাৎ করে আমি কত যে মুগ্ধ হয়েছি। আমি তাঁকে দেখেছি, বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক দূরাগত বিষয়কেও তিনি তাঁর শ্যেনদৃষ্টিতে দেখতে পান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ অঞ্চলের প্রধান নেতাগণ দূরদর্শী না হলে মধ্যপ্রাচ্যে কখনও শান্তি আসবে না। তাঁদেরকে অবশ্যই ছোট ছোট ঘটনার পিছে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য- উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার প্রেসিডেন্ট বেশ উজ্জ্বলভাবেই তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করতে পেরেছেন। একজন স্টেটসম্যান হিসাবে অনেকেই তাঁর অব্যাহত ভূমিকা সম্পর্কে আজ অবহিত।

হয়ত আপনি সম্প্রতি আমার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্মীর মধ্যকার বিনিময় হওয়া পত্রাবলী দেখে থাকবেন। আমি ভাবছি এ প্রস্তাব আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রীই উত্থাপন করুক। এর মূল কথা হচ্ছে— লিয়াজোঁ ছিন্ন করার আলোচনা সফল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত শান্তি সম্মেলনটি পিছিয়ে দেয়াই উত্তম। আমার মতে এটা ভুল। বরং লিয়াজোঁ ছিন্ন করার বিষয়টিই হবে শান্তি সম্মেলনে আলোচ্য এজেণ্ডার প্রথমটি। আমার বিশ্বাস, আমাদের আলোচিত কিছু কিছু ভাবনা সিরিয়ার প্রেক্ষাপটেও বাস্তবায়ন করতে পারব (অর্থাৎ বাহিনীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করার বিষয়টি কার্যকর করা পিছিয়ে দিয়ে সরাসরি আলোচনায় অগ্রসর হওয়া)। আমি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, শান্তি সম্মেলনই হচ্ছে আমার মতে সবচেয়ে উত্তম স্থান– যেখানে আমাদের প্রভাব সবচেয়ে উত্তম ফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

আমি আরও বলতে চাই যে, সম্মেলনের আগে অন্য কোন সাংগঠনিক রূপ বিন্যাসে যাওয়া ভুল হবে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সময় আসার আগেই সাধারণ

আলোকে কোন চিন্তা-ভাবনা উত্থাপন করলে যুক্তরাষ্ট্রের গতিশীলতা ও নমনীয়তায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। কারণ এতে অন্যরা জটিলতা সৃষ্টির সুযোগ পেয়ে যাবে। বস্তুত যে কোন চলমান আলোচনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়েই কেবল প্রস্তাব রাখতে হয়।

আমার মনে হয়, শান্তি সম্মেলন করার উত্তম সময় হচ্ছে ১৭ ডিসেম্বরের কাছাকাছি কোন দিন। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, অতলান্তিক জোটের আসন্ন সম্মেলনে যোগ দেয়ার সুযোগ খুঁজব। আবারও বলছি, আমি খুব খুশি যে, আপনার ও আমার মধ্যে এই চ্যানেলটি এখনও অব্যাহত রয়েছে। অনুরোধ রইল, প্রেসিডেন্ট সাদাতকে আমার উত্তম শুভেচ্ছা ও সম্মান এবং আমাদের সম্পর্ককে যেভাবে তিনি পরিচালনা করছেন, এর প্রতি আমার পছন্দের কথা জানাবেন (বলে রাখা ভাল হেনরি কিসিঞ্জার আবিষ্কার করেছিলেন যে, অতি প্রশংসার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সাদাতের স্নায়ুকে উৎফুল্ল করা যায়, আর তাই এ নীতি তিনি ভালভাবেই চর্চা করেছিলেন)। আমার ব্যক্তিগত উষ্ণ শুভেচ্ছা রইল।

স্বা/ হেনরি কিসিঞ্জার

অক্টোবর ২২-২৯ -এর মধ্যে ইস্যুকৃত অস্ত্রবিরতির বিভিন্ন লাইনের পারস্পরিক যোগাযোগ থাকলেও ফ্রন্টিয়ারের পরিস্থিতি তৃতীয় বাহিনীর রসদ সরবরাহে বিশেষ করে সুয়েজ নগরে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্মী ঠিক এটাই আশঙ্কা করেছিলেন। এ জন্যই তিনি চাচ্ছিলেন, জেনেভা সম্মেলনের বৈঠকের আগেই বাহিনীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধের চুক্তি বাস্তবায়ন হয়ে যাক। যে সব মিসরীয় অভিযোগ কিসিঞ্জারের কাছে পৌঁছেছিল সে সম্পর্কে তিনি ইসরাইলী সরকারের সাথে যোগাযোগ করেন। ২৯ নভেম্বর তিনি গোপন চ্যানেলের মাধ্যমে হাফেজ ইসমাইলের কাছে লেখেন ঃ ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের পক্ষ থেকে জনাব হাফেজ ইসমাইলের নিকট– সাম্প্রতিক ঘণ্টাগুলোতে আমি ইসরাইলী সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। তারা আমাকে পরিষ্কার করে বললেন যে, তারা কিবরিত অঞ্চলে বেসামরিক সরবরাহ যাতায়াতের অনুমোদন দিতে প্রস্তুত। তারা সুয়েজ দিয়েও কিছু কিছু বেসামরিক সরবরাহ চলাচল করতে দিতে প্রস্তুত । কিন্তু তারা এ জন্য একটি শর্তের কথা জানালেন— তা হলো মিসর সরকার মিস্টার প্যারখ মেজরাহীকে মুক্তি দিতে হবে। মিস্টার মেজরাহী কয়েক বছর পূর্বে ইয়েমেনে মিসর বাহিনীর ওপর গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে অভিযুক্ত একজন ইহুদী। এরপর ইয়েমেন থেকে মিসরে আনা হয়। এখানেই তাঁর বিচার হয় এবং জেলের হুকুম হয়।

হেনরি কিসিঞ্জার মিসরে এলেন। তিনি ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর 'কানাতের' অবকাশ কেন্দ্রে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে বৈঠক করেন এবং যা চাইলেন তা-ই পেলেন (এর

মধ্যে ছিল মেজরাহী ও অন্য গুপ্তচরদের মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি)। এরপর তিনি ইসরাইলে গেলেন। সেখান থেকে গোপন চ্যানেল ব্যবহার করে সরাসরি প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৩-এ একখানা নতুন পত্র পাঠান ঃ

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

আমি এখন ইসরাইলে আলোচনা শেষ করেছি। আপনার সাথে সাক্ষাৎকালে আমি যা আলোচনা করেছি তার ভিত্তিতে বাহিনীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করার বিষয়টি কার্যকর করার ব্যাপারে নিবিড় আলোচনা চালিয়েছি। আমার আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, জেনেভায় ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো যখন তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করবে তখন সিরিয়াস ও সফল আলোচনা সম্ভব হবে। আশা করি এটা জানুয়ারি মাসেই সম্পন্ন হবে। আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে জেনেভায় সাক্ষাৎকালে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখন আমি আলোচনার কার্যক্রম সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মোকাবিলা করছি, তা হচ্ছে ইসরাইলীরা আমাকে জানাল যে, তারা সিরিয়ার কাছে ইসরাইলী যুদ্ধবন্দীদের তালিকা চায়। তারা রেডক্রসকে সে সব বন্দীর সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়ার জন্যও অনুরোধ করছে। আমার মনে হয়, সম্মেলন সফল করার জন্য এটা জরুরী। সত্য কথা বলতে কি, ইসরাইলী সরকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই সিরিয়ার কাছে বন্দী ইসরাইলীদের তালিকা না পেলে সম্মেলনের উদ্বোধনী সভায় ইসরাইলীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারছি না। আমি আশাবাদী যে, আপনি আপনার প্রভাব খাটিয়ে সিরিয়াকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে পারবেন। এটা শান্তি সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট. আমি যে সময় মধ্যপ্রাচ্য ছেড়ে যাচ্ছি, এ সময় আমার কাছে আরেকটি বিষয় রয়েছে তা হচ্ছে আমি কেবল আপনার অনাবিল আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতাই জানাব না বরং একজন স্টেটসম্যান হিসাবে পথ রচনা করে তা অতিক্রম করার মতো অব্যাহত ক্ষমতা আপনার মধ্যে দেখে আমি যে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি, তাও জানাতে চাই । আমার উষ্ণতম ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি—

হেনরি এ কিসিঞ্জার

জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে দ্রুত প্রস্তুতি চলছিল, যাতে ইসরাইলী নির্বাচনের ওপর পূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে। সিরিয়া ঘোষণা করে যে, সে কখনই সম্মেলনে যোগ দেবে না। কারণ সে এ ব্যাপারে অনড় যে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে লড়াইয়ের ফ্রন্টিয়ারগুলোতে যুদ্ধরত বাহিনীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সে সম্মেলনে যাবে না। এছাড়া জেনেভা সম্মেলনের আগে সংঘর্ষ বন্ধের স্পষ্ট কোন চুক্তি না হলে সিরীয় বাহিনীর নিকট বন্দী ইসরাইলীদের তালিকা হস্তান্তর করতে সে আদৌ রাজি নয়। একই সময় জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট

ওয়াল্ডহেম উপলব্ধি করলেন যে, প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর পক্ষগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা জেনেভার জাতিসংঘ ভবনে চলবে। তবে সম্মেলনে জাতিসংঘের বাস্তব ভূমিকা কেবল অন্যান্য সাক্ষীর মতো একজন সাক্ষীর ভূমিকার চেয়ে বেশি কিছু হবে না। এছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলোও একই ধরনের অনুভূতি পোষণ করছে। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করছে। তখন ফিলিস্তিনীরাও তাদেরকে সম্মেলন থেকে দূরে রাখার মর্মবেদনায় আর্তচিৎকার করে যাচ্ছিল, যদিও সম্মেলনের বৈঠকগুলোতে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি খতিয়ে দেখার ওয়াদা আদায় করে নিয়েছিল।

সম্মেলনের প্রটোকল ব্যবস্থাদি নিয়ে শেষ মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত কিছু সমস্যা দেখা দিল। কিছু ছিল আলোচনাকারীদের ক্রমিক নম্বর নিয়ে আর কিছু সমস্যা ছিল সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক ভাষা নিয়ে। আর কিছু তো ছিল উপস্থিত প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বসার স্থানবিন্যাস নিয়ে। এর মধ্যে এসব বসার স্থান দূরে ও কাছাকাছি হওয়া নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হয়।

এক সময় মনে হয় যেন "পবিত্র ও নিষিদ্ধ" এর ছায়ামূর্তি তার ছায়ায় পুরো সম্মেলন কক্ষটিকে ঢেকে ফেলেছিল। যদিও আরব ও ইসরাইলীরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাকক্ষের মতো এক স্থানে এর আগেও মিলিত হয়েছিল, কিন্তু এ যাত্রা সাক্ষাৎ ঘটবে একেবারে সরাসরি ও গাঘেঁষে— একে অপর থেকে দূরে থাকার জো নেই, অথবা ছবি নেয়া থেকেও গাঢাকা দিতে পারবে না। এমনকি স্বাগতিক সমাবেশ থেকেও ওজর দিয়ে পিছিয়ে থাকতে পারবে না।

এ সকল সমস্যার কারণে উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হতে বিলম্ব হলো। হলো তো সেই ২১ ডিসেম্বর, ইসরাইলে আসন্ন নির্বাচনের ওপর প্রভাব ফেলার জন্য সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে।

কিসিঞ্জার যেমনটি আশা করেছিলেন, সম্মেলনের উদ্বোধনী সভা তেমনটি উতরে যায়নি। তিনি ভেবেছিলেন যে, এই সভাটি হবে নিছক একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক যা যুক্তরাষ্ট্রই পরিচালনা করবে। এরপর সম্মেলনের কার্যক্রম ইসরাইলী নির্বাচন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হবে। যদিও সম্মেলন থেকে উৎসারিত দ্বি-পাক্ষিক কমিটিগুলো আলোচনা চালিয়ে যেতে ইসরাইলী নির্বাচনী ফল পর্যন্ত অপেক্ষার কোন দরকার নেই। এতে মনে হবে যে, সম্মেলনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যদিও কোন পক্ষকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাধ্য থাকতে হবে না। কারণ এ ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে অবশ্যই কিছু সময়ের প্রয়োজন। সম্ভবত যে বিষয়টি সবইকে চমকে দিয়েছিল, তা হচ্ছে জেনেভা সম্মেলনে ইসরাইলী প্রতিনিধিদের মধ্যে সামরিক ব্যক্তিদের অনুপস্থিতি। এর অর্থ হচ্ছে ইসরাইল এখনও রাজনৈতিক আলোচনার

ওপরই গুরুত্ব ও জোর দিয়ে যেতে চাচ্ছে, ফ্রন্টিয়ারে সংঘর্ষ বন্ধের বিষয়টি বিলম্বিত করে তাকে আরব আলোচকদের স্নায়ুতে একটি চাপ সৃষ্টিকারী বিষয় হিসাবে ঝুলিয়ে রাখতে চায়। মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্‌মী জেনেভায় পৌঁছলেন (মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে প্রথম সরাসরি রাজনৈতিক আলোচনার কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে)। ইনি এখনও খেলার নিয়ম-কানুনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। তাঁর প্রতীকী তারবার্তাগুলো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ভবনে বৃষ্টির মতো আসতে লাগল। এগুলোতে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে অবহিত করার জন্য বিস্তারিত বিবরণ ছিল ঃ

জেনেভা থেকে

প্রাপক মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জেনেভা পৌঁছেই আমি জানতে পারলাম যে, ইসরাইলীরা সিরিয়া ও যুদ্ধবন্দীদের সাথে তাদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিরাট সংবাদ প্রচারণা ও অনেক সাংবাদিক সম্মেলন করে যাচ্ছে।

– লক্ষ্য করলাম ইসরাইলী প্রতিনিধি দলের প্রাথমিক গঠন কাঠামোতে সামরিক ব্যক্তি নেই, অনুরূপভাবে জাতিসংঘ থেকেও জেনেভায় কোন সামরিক ব্যক্তিকে পেলাম না। এ কারণে নিউইয়র্কে ওয়াল্ডহেমকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছি যেন (জাতিসংঘের সিনিয়র পর্যবেক্ষক) জেনারেল সিলাসেভোকে অবিলম্বে নিজে অথবা তার কোন সহকারীকে উপস্থিত হতে নির্দেশনা জারি করেন।

কিসিঞ্জারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আমেরিকার চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্সকে ডেকে কিসিঞ্জারকে প্যারিসে পাঠাবার জন্য এই মর্মে একটি বার্তা দিলাম যে, যদি ইসরাইলী সামরিক কর্মকর্তাগণ জেনেভায় না আসে তাহলে তাদের হাজির হওয়া পর্যন্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিতে বাধ্য হব। কারণ আমাদের চুক্তির আবেদন অনুযায়ী সামরিক কমিটিকে তাৎক্ষণিকভাবে তার কাজ শুরু করতে হবে।

সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর সঙ্গে আলোচনা শেষে কিসিঞ্জার মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে একটি পত্র পাঠান।

জেনেভা থেকে ঃ

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজ ২০ ডিসেম্বর সকালে আমি সোভিয়েত মিশনের কার্যালয়ে গ্রোমিকোর সাথে বৈঠক করি। (গ্রোমিকো তৎকালীন সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী) তাঁর সাথে আমার নিম্নরূপ আলাপ হয় ঃ

প্রথমতঃ আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি।

গ্রোমিকো বললেন, তাঁরা প্রটোকল বা ব্যবস্থাপনার বিষয়াদি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না। ভাষার ব্যাপারে বলেন যে, তাঁরা আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসাবে কেবল ইংরেজী ও ফরাসীর প্রতিই মত দিচ্ছেন। তবে আরবী ও হিব্রু ভাষা ব্যবহারকেও গ্রহণ করবেন। এরপর উপ-কমিটিগুলোর জন্য সম্মেলনের বিষয় ঠিক করা ও কাজ শুরু করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন।

আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে, বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছু বিষয়কে গুরুত্ব না দিলেও আমাদের জন্য সেগুলোর গুরুত্ব অনেক। হয়তো ভবিষ্যতের কাজে এগুলোর প্রভাব পড়তে পারে। আমি তাঁকে বললাম যে, বিষয়টি আমাদের ক্ষেত্রে কেবল নিছক কিছু অনুষ্ঠান করা, ছবি তোলা, করমর্দন করা আর প্রচার প্রপাগাণ্ডাই নয়। এ ব্যাপারে সেক্রেটারি বা আমেরিকানদের পক্ষ থেকে যে কোন বিব্রতকর অবস্থায় আমি সম্মেলন ত্যাগ করতে বাধ্য হব।

সম্মেলন কক্ষ ও আসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি তাঁকে বলেছি, আমরা জাতিসংঘের মহাসচিবকে জানিয়েছি যে, সিরিয়ার জন্য আসন প্রস্তুত রাখতে হবে, চাই সে হাজির হোক বা না হোক। সে যখনই ইচ্ছা আসবে।

ভাষা সম্পর্কে আমি তাঁকে বললাম, এ ব্যাপারে আমাদেরকে জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক ভাষাগুলোকেই ভিত্তি হিসাবে ধরতে হবে। আমি চাই ফরাসী ভাষা ব্যবহৃত হোক। কারণ আমি ও আমার প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কেউ কেউ ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে। সাধারণ বৈঠকে যা নির্ধারিত হবে তা যে কোন শাখা বৈঠকে পরিত্যক্ত হবে। এছাড়া আমি হিব্রু ভাষা ব্যবহারকে সমর্থন জানাতে পারি না। আবার আরবী ভাষা ব্যবহারের শর্তও আরোপ করব না।

দ্বিতীয়তঃ বৈষয়িক ইস্যুসমূহ

আমি বললাম যে, সম্মেলনে অংশগ্রহণের দিক থেকে আমরা আন্তরিক। আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে সরাসরি আলোচনা শুরু করতে সকাল থেকেই প্রস্তুত। আমাদের নিকট শান্তিপূর্ণ সমাধান মানে পূর্ণ প্রত্যাহার এবং ফিলিস্তিন জাতির অধিকার।

শাখা সভাগুলো সম্পর্কে আমার মত হচ্ছে— এখনকার মতো উপ-কমিটি গঠন করা ঠিক হবে না। কারণ, আমাদের বলা হয়েছে যে, নির্বাচনের পূর্বে বর্তমান ইসরাইলী প্রতিনিধি দল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। কাজেই একটিই মাত্র কমিটি রয়েছে যাকে তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠকে বসতে হবে তা হচ্ছে— মিসর-ইসরাইল সামরিক টেকনিক্যাল কমিটি, যার সভাপতিত্ব করছে জরুরী বাহিনীর কমাণ্ডার বা তার প্রতিনিধি। তাদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন রাজনৈতিক বা সামরিক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন, চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধিও

থাকতে পারেন। আমি আরও বললাম, যদি সম্মেলন উদ্বোধনের পূর্বে এই কমিটির বৈঠকের ব্যাপারে একমত না হয় তাহলে এই বিন্দুতে একমত না হওয়া পর্যন্ত সম্মেলন পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কাজ করে যাব। গ্রোমিকোর মধ্যে সুস্পষ্ট অস্থিরতা দেখা দিল। কারণ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের অবস্থানে কোন পরিবর্তন আসবে কিনা। তিনি বলেন, কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যথাসময়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ইতোপূর্বে আমাদের সাথে পরামর্শের পর্যায়ে তারা এই শর্ত সম্পর্কে জানতে পারেনি।

আমি আবারও বললাম, আমাদের অবস্থানে কখনও পরিবর্তন হবে না। আমরা সকল শক্তি দিয়ে বাস্তবানুগভাবে রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলব তা আমার আসন্ন বক্তৃতায় প্রতিফলিত হবে। যদি ইসরাইলী প্রতিনিধি দল বড় ধরনের রাজনৈতিক বা নীতিগত বিষয়ে কথা বলতে সক্ষম না হয়– যেমনটি আমরা শুনলাম তাহলে আমরা এখানে বসে কি করব ?

এটা কি কেবল প্রচার প্রপাগাণ্ডা বা নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র ? এতো হলো একদিক, অন্যদিকে– যেমনটি মিস্টার গ্রোমিকোও জানেন টেকনিক্যাল ও সামরিক কমিটির বৈঠকের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সময়ে বাহিনীগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদন করা। মধ্য জানুয়ারির দিকে যখন সম্মেলন তার বৈঠকে বসবে, ঠিক সে সময়ে এ চুক্তিটি হয়ে যাবে। জানুয়ারির বাকি সময়ের মধ্যেই এ চুক্তি বাস্তবায়িত হবে। এরই ভিত্তিতে বলছি, যদি এই পয়েন্টেও ইসরাইল কথা বলতে প্রস্তুত না থাকে, আবার তাদের প্রতিনিধি দল সামরিক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তও করা হয়নি, তাহলে ধরে নিতে হবে যে ইসরাইলের নিয়ত যে কিছু খারাপ আছে এবং তাদের আগ্রহ বা আন্তরিকতা নেই তা তারা যেন প্রকাশই করে দিল। কারণ যুদ্ধবিরতির অবস্থা যখন এই সেক্ষেত্রে বড় বড় রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার কথা যুক্তিতেই আসে না। তবে হ্যাঁ, যদি আবা ইবানই সামরিক বিষয়গুলোর দায়িত্ব নেয়। যদি ইসরাইলী সরকার রাজনীতির কোন বিষয়ে কথা বলতে অক্ষম হয়, সেটা তার জন্য হতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে সামরিক বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হতে পারে এবং এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা যেতে পারে। কারণ এর একটি বিশেষ অগ্রগণ্যতা রয়েছে এবং এটা যুদ্ধবিরতির সাথে সংশ্লিষ্ট। পরিশেষে আমি তাকে বললাম, যদি এই সামরিক কমিটিও বৈঠকে না বসে তাহলে কিভাবে জানুয়ারির ভিতর বাহিনীগুলোর ব্যাপারে সুরাহা হবে, যেমনটি কিসিঞ্জার আমাকে জানিয়েছেন এবং আপনিও নিশ্চিয়তা দিয়েছিলেন।

গ্রোমিকো বললেন, বাহিনীগুলোর ফয়সালা করার গুরুত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো রাজনীতিকদেরই হাতে। তিনি বলেন, সাধারণ নীতি ও কৌশলের জন্য সম্মেলনের উদ্বোধন গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সম্মেলন বিভিন্ন আলোচ্য

বিষয়ের প্রেক্ষাপটে এবং বাহিনীসমূহের ফয়সালার বিষয় এবং টেকনিক্যাল ও সামরিক কমিটির কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আমি তাঁকে বললাম, উল্লিখিত বিষয়ে আমি একমত নই। এরপর তাঁর ও আমার মধ্যে সংলাপ চলে এবং সামরিক কমিটি কাজ শুরুর ব্যাপারে পীড়াপীড়ির আবশ্যকতা আছে এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। গ্রোমিকো এই লাইনে কিসিঞ্জারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবেন বলে কথা দেন।

গ্রোমিকো এও বললেন যে, সম্মেলন শুরু করতে না পারলে এটা ইসরাইলীদেরই স্বার্থ অর্জন হবে। আমি তাঁকে বললাম, কেবল আনুষ্ঠানিকতা দিয়েই সম্মেলন কোন ফলাফল বয়ে আনতে পারবে না। সেটাও তো ইসরাইলের অর্জন হবে। তবে আমরা যদি শান্তি অর্জন করতে চাই এবং এজন্য আন্তরিকভাবে কাজ করতে প্রয়াসী হই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই টেকনিক্যাল সামরিক কমিটির কিছু বৈঠক শুরু করে দিতেই হবে। এ পর্যয়ে আমাদের মতৈক্য হয়।

তৃতীয়ত ঃ আমরা আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আবার বৈঠকে বসব বলে একমত হয়েছি।

–পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে জেনেভা থেকে একটি চিঠি পাঠান।

জেনেভা থেকে

প্রাপক-মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক-পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজ বিকাল চারটার সময় গ্রোমিকো ও সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের সদস্যদের স্বাগত জানাই। আমরা আমার এখানেই সবাই নৈশভোজ গ্রহণ করি। তিনি যা বললেন তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে ঃ তিনি আমাকে জানালেন যে, সিরিয়ার ব্যবহারে সোভিয়েত নেতৃত্ব উদ্বিগ্ন। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আবার 'আসাদ'-এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

তিনি সম্মেলনে অংশগ্রহণে সিরিয়ার প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসাবে তাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ইঙ্গিত করেন। যদিও তিনি এও বলেন যে, সিরীয়রা মিসরের উপর ভর্ৎসনা ঢালছে, কারণ তাদের মতে, মিসর তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। এ পর্যায়ে সিরিয়ার অবস্থান সম্পর্কে কায়রোতে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভিনোগ্রাদভ মন্তব্য করেন যে, যুদ্ধের শুরুতে যখন সিরিয়া যুদ্ধবিরতির জন্য অনুরোধ করেছিল তখন সে তার অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাকে বলে (তবে হাইকাল বলেন যে, এ কথা ভিনোগ্রাদভ বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে)।

–গ্রোমিকো সম্মেলনে উপস্থিতির ব্যাপারে মহামান্য প্রেসিডেন্টের ভূমিকার জন্য কয়েকবার প্রশংসা করেন। এতে মিসর প্রমাণ করল যে, সে যা ওয়াদা করে তা সে বাস্তবায়ন করে।

– তিনি আমাকে বলেন, তিনি আমার সাথে একমত যে সরাসরি রাজনৈতিক বিষয়াদির সুরাহার জন্য শক্তির সাথেই সম্মেলনে প্রবেশ করা জরুরী– শাখা বিষয়াদিতে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। তিনি বলেন যে, আগামীকাল কিসিঞ্জারের সাথে নৈশভোজের সময় তিনি এ বিষয়টির উপর কেন্দ্রীয় গুরুত্ব আরোপ করবেন।

– সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক কার্যালয়ের পরিচালক 'সেতেনকো' আমাকে জানিয়েছেন যে, সিরিয়া সম্মেলনে উপস্থিতির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবে। সিরিয়ার অনুপস্থিতির দিকে না তাকিয়ে সম্মেলন কক্ষে তার জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার জন্য আমি বার বার জোর দিয়েছি। গ্রোমিকো আমার মস্কো সফরের কথা পাড়লেন। আমি তাকে বলেছি যে, আমি যথাশীঘ্র সম্ভব সফর করব। এর রেশ ধরে তিনি বলেন যে, আমার মস্কো সফরের পর তিনি মিসর সফর করতে আগ্রহী। আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম।

জেনেভা থেকে

প্রাপকঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আমার প্রেরিত তারবার্তা নং ৯৯৬৮-এর অনুবর্তে কিসিঞ্জারের নিকট থেকে আমার নিকট নিজের পত্রটি এসেছে। এতে সামরিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতির গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

"পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের অভিপ্রায় হচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্‌মী এ বিষয়ে অবহিত হন যে, সামরিক কমিটির কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইসরাইলের সামরিক প্রতিনিধিগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। অধিকন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার এ নিশ্চিয়তা দিচ্ছেন যে, বাহিনীগুলোর লিয়াজোঁ ছিন্ন করার ব্যাপারে আলোচনা হবে– প্রেসিডেন্ট সাদাত-এর সাথে হেনরি কিসিঞ্জারের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত কর্মসূচীর ভিত্তিতেই।"

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার জাতিসংঘ মহাসচিব 'কুট ওয়ান্ডহেমের' সঙ্গে আলোচনা শেষে প্রেসিডেন্টকে একটি চিঠি পাঠান।

জেনেভা

প্রাপক ঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজ ওয়াল্ডহেম আমার সাথে ডিনার করেন। এ সময় যা আলোচনা হয় তার উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলো হচ্ছে ঃ

১. নীতিগতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন চাচ্ছে যে, আগামীকাল সকালে কেবল মহাসচিব এবং রাশিয়া ও আমেরিকার প্রতিনিধিরাই কথা বলবেন। এরপর শনিবারের

জন্য সম্মেলন স্থগিত হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। এ কারণে অনুষ্ঠানসূচীতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে যাতে একই দিন সকালে অন্যান্য পক্ষও আলোচনায় অংশ নিতে পারে।

২. ওয়াল্ডহেম যখন ইবানের সাথে বৈঠক করেন তখন শেষোক্ত জন অপরাহ্নে ওয়াল্ডহেমের বক্তব্য অনুসারে কথা বলাকেই শ্রেয় মনে করেন, যাতে প্রাচার প্রপাগাণ্ডা ও প্রচার মাধ্যমগুলোকে একলা সময় দিতে পারেন এবং যাতে আমার বক্তব্যের জন্য নির্ধারিত সময় সকালে তিনি আমার বক্তৃতা ভালভাবে শোনার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন। এ সুযোগে তিনি তাঁর বক্তৃতার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে পারেন।

৩. ইবান যেন প্রচার ও কৌশলগত দিকের সুযোগ গ্রহণ করতে না পারেন সে জন্য আমি ওয়াল্ডহেম-এর সাথে সাব্যস্ত করি যে, সকালের বৈঠক কেবল তাঁর বক্তৃতা আর রাশিয়া ও আমেরিকার বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি তিনটার সময় অপরাহ্নিক পর্বে প্রথম বক্তা হবে। আমার পরই ইবান বক্তৃতা দেবে, এরপর রেফাঈ (জর্ডান প্রতিনিধি দল প্রধান) বক্তব্য রাখবেন। এ বিষয়ে ঐকমত্য হয় যে, এটা তার ও আমার মধ্যেই গোপনীয় ও সীমাবদ্ধ থাকছে। যাতে সম্মেলনে আবা ইবান হঠাৎ চমকে যায়।

৪. ওয়াল্ডহেম ইবান থেকে জেনেছেন যে, তারা ৭ জানুয়ারির পূর্বে সামরিক আলোচনা শুরু করতে আগ্রহী নয়। মধ্যে জানুয়ারিতে যখন সম্মেলন পূর্ণশক্তিতে আবার বৈঠকে বসার জন্য ফিরে আসবে তখন "লিয়াজোঁ ছিন্নের" বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।

৫. ওয়াল্ডহেমকে জানালাম যে, আমি গ্রোমিকোর সাথে আলাপ করেছি। সকালে কিসিঞ্জারের সাথেও কথা বলে জানাব যে, সামরিক কমিটি তার কাজ শুরু করা জরুরী বলে আমি মনে করি। যদিও আমি জানি যে, হয়ত জানুয়ারির আগে তারা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে নাও পৌঁছতে পারে। আমি মনে করি আনুষ্ঠানিক বিবৃতির পর সম্মেলনকে পিছিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। তিনি আমার সাথে একমত হন এবং স্বীকার করেন যে, সম্মেলনকে অনুষ্ঠানরত অবস্থায় রাখা দরকার।

৬. ওয়াল্ডহেম আমাকে জানান যে, তিনি রেফাঈর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং রেফাঈ তাঁকে জানান যে, মিসরের সাথে "লিয়াজোঁ ছিন্ন" চুক্তির অনুরূপ একটি "লিয়াজোঁ ছিন্ন" চুক্তি জর্ডান ও ইসরাইলের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। এটা হবে পশ্চিম জর্ডানে ইসরাইলী ফোর্সের সাথে, বিশেষ করে যারা টিলাসমূহের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। ওয়াল্ডহেম আরও বলেন যে— এটা স্পষ্ট যে, জর্ডান মিসরের অনুরূপ কাজ করতে চায় এবং তার সাথে জড়িয়ে থাকতে চায়।

জাতিসংঘ মহাসচিব ওয়াল্ডহেমের বিশ্বাস, জর্ডানও এ আশঙ্কা করছে যে, "লিয়াজোঁ ছিন্ন" করার ব্যাপারে কেবল মিসরের সাথে চুক্তি করার বিষয়ে আমাদের ও আমেরিকানদের মধ্যে চুক্তি হয়ে থাকতে পারে। ওয়াল্ডহেম আলোচনায় আমাকে জোর দিয়ে বলেন যে, কিলো ১০১-এর কাছে "লিয়াজোঁ ছিন্ন"-এর আলোচনা স্থগিত রাখার কারণ হচ্ছে স্বয়ং কিসিঞ্জার ব্যক্তিগতভাবে। কারণ তিনি চান যে, ডিসেম্বরের সম্মেলনেই তা সম্পন্ন হোক, যাতে বিশ্ববাসী জানবে যে, এই অগ্রগতি তিনিই সাধন করেছেন। ওয়াল্ডহেম এটা উপলব্ধি করেছেন নিউইয়র্কে তার ও কিসিঞ্জারের মধ্যে কিলো ১০১ নিয়ে আলোচনার সময়। তখন কিলো ১০১-এর ব্যাপারে আলোচনার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। কারণ তখন কিসিঞ্জার ওয়াল্ডহেমকে কিলো ১০১-এ ঘটিতব্য বিষয় নিয়ে তাঁর উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বিষয়টি সামরিক নয়, এটা রাজনীতিকদের বিষয়। এটাকে নিউজউইক পত্রিকাও বেশ কিছু দিন আগে প্রতিষ্ঠা করেন, যা তীব্র বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওয়াল্ডহেম আমাকে এও জানান যে, সকালে সম্মেলন উদ্বোধনের সময় তিনি তার বক্তব্যে "লিয়োজোঁ ছিন্ন" করার বিষয়টির উপর জোর দেবেন এবং আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি তার সামরিক উপদেষ্টাকে নিউইয়র্ক থেকে ডেকে পাঠাচ্ছেন এবং তাঁর সাথে জেনারেল সিলাসিভোর একজন সহকারীকেও আসতে বলেছেন, যাতে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারেন।

আমি আগামীকাল কিসিঞ্জারের সাথে সামরিক ব্যক্তিদের কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলব এবং খুবই দৃঢ়চেতা ভঙ্গিতে।

আমার কথার রেশ ধরে নৈশভোজের টেবিলে ওয়াল্ডহেম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, মহামান্য প্রেসিডেন্ট যখন কোন সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি তা বাস্তবায়নে লেগে যান। তাঁর কাছে যে তথ্যাদি রয়েছে তাতে দেখা যায়, আমেরিকানদের সাথে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সিদ্ধান্তে ইসরাইলীরা খুশি হয়নি।

কিসিঞ্জার জেনেভায় পৌঁছেই তাঁর নিজস্ব স্টাইলে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে খেলায় মেতে উঠল। উদ্দেশ্য, নিজের কাছের ও দূরের লক্ষ্য হাসিল করা।

জেনেভা ঃ

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজ ২১ ডিসেম্বর সকালে সম্মেলন শুরুর আগেই কথা বলার জন্য কিসিঞ্জার আমাকে ডেকে পাঠালেন ঃ

১. তিনি আরব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলার সময় যে ধরনটি অনুসরণ করেছেন তাতে আমাদের অসন্তুষ্টির কথা জানালাম। তিনি তাঁর সে সব আলোচনায় উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি সকল বিষয়ে মিসরের সাথে একমত হয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে

সিরিয়া অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সম্মেলন পূর্ব সফরে কোন বিস্তারিত বিবরণে না যাওয়াই ছিল তাঁর জন্য শ্রেয়। যদি এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য থাকে যে, সিরিয়া যেন না আসে, তাহলে সে সফলই হয়েছে বলতে হবে। অথচ তিনি ইসরাইলকে নির্দিষ্ট তৎপরতা চালাবার ব্যাপারে রাজি করাবার কাজে সফল হননি।

২. এই পয়েন্টে বিতর্ক চলে। অবশেষে তিনি হার মানলেন এবং তিনি বিশ্বাস করছেন যে, তিনি ভাল কাজ করেন। হয়ত বিস্তারিত তুলে ধরা তাঁর ঠিক হয়নি। যদিও তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তিনি তা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট আসাদকে সম্মেলনে আসার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই। তিনি আরও বলেন যে, তিনি আসাদকে বলেছেন যে, সিরীয় ফ্রন্টিয়ারেও অস্ত্রবিরতির বিষয়টি সুরাহা করা যাবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আসাদ একটি মানচিত্র মেলে ধরে গোটা গোলান থেকে ইসরাইলী প্রত্যাহার দাবি করেন। কিসিঞ্জার মন্তব্য করলেন যে, যখন প্রেসিডেন্ট আসাদ মানচিত্র আনালেন তখন কিসিঞ্জার হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তিনি আগে থেকে সিরিয়ার অবস্থানের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। সেই জন্য তাঁর সাথে সায় দিলেন না।

৩. আমি আরও বললাম যে, এ ধরনের আচরণে হতে পারে তাঁর (কিসিঞ্জারের) ওপর থেকে আরব বিশ্বের আস্থা উঠে যেতে পারে। এদিকে ইসরাইল অব্যাহতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও সামরিক সাহায্যপুষ্ট হয়ে এখন শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আমেরিকা তাদের এ পুরনো ধাচ অনুসরণ করে গেলে আরব বিশ্বের কাছে এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হবে না।

৪. এ কথার জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি আমাকে জানাতে চান যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন অচিরেই একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন, এতে তিনি ইসরাইলকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দেবেন বা কমিয়ে দেবেন যাতে ইসরাইল তার অবস্থানকে দুরস্ত করে নেয়।

৫. আমি সামরিক টেকনিক্যাল কমিটির কাজ তাৎক্ষণিকভাবে শুরু করার আবশ্যকতা সম্পর্কে কথা বললাম। আমি কায়রো থেকে এসেছি। মহামান্য প্রেসিডেন্টের নির্দেশ মোতাবেক আমি তাঁর অনুমোদিত বিষয়কে বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই কাজ করে যাব।

৬. আমি আরও বললাম যে, আমি প্যারিস থেকে প্রেরিত তাঁর (কিসিঞ্জারের) পত্রখানা মহামান্য প্রেসিডেন্টের নিকট হস্তান্তর করেছি।

তিনি নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, ইসরাইলী সামরিক কর্তাব্যক্তিরা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। আমি মন্তব্য করলাম যে, মহামান্য প্রেসিডেন্টেকে এ রকম খবর পাঠানোর পর তারা যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে মহামান্য প্রেসিডেন্ট পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে

সন্দিগ্ধ হয়ে পড়বেন। আমি আরও বললাম যে, কেবল ৭ তারিখে সামরিক কমিটির বৈঠক যা ইসরাইল চাচ্ছে তা আদৌ গ্রহণ করা যায় না।

৭. তিনি উল্লেখ করলেন যে, আমি যা বললাম তা তিনি বুঝতে পারছেন। কিন্তু তিনি ইসরাইলের সাথে এ বিষয়ে একমত হন যে, সে ওয়াশিংটনে একটি হালকা মাপের প্রতিনিধি দল পাঠাবেন। তাঁরা ইয়ারিফ প্রকল্পের ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির রুটগুলো সম্পর্কে আমেরিকান সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে চুক্তি করবে। এরপর তারা ৭ তারিখে জেনেভায় মিসরী সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের জন্য চলে আসবে। তারা জানুয়ারির শেষ নাগাদ তাদের কাজ চূড়ান্ত করে নেবে। তিনি আমাকে জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি ইসরাইলী নেতৃবৃন্দ থেকে দ্ব্যর্থহীন ওয়াদা লাভ করেছেন যে, তারা এ তারিখেই যুদ্ধবিরতির সমস্যাটি শেষ করে দেবেন এবং সরকার গঠনের বিষয়ের সাথে এটাকে জড়াবেন না।

৮. আমি বললাম, বর্তমান বৈঠকগুলো শেষ হয়ে ৭ জানুয়ারি আসতে অনেক লম্বা সময়। এ সময়টি নষ্ট করা চলে না। তখন তিনি বলেন, সে নতুন করে ইবান-এর সাথে যোগাযোগ করবে এবং ফলাফল আমাকে জানাবেন।

৯. আমি অস্ত্রবিরতির লাইনের অবস্থা সম্পর্কে কথা বললাম। কিবরিত ও সুয়েজ বিষয়ে কথা উঠালাম। বললাম অবস্থা কিন্তু খুবই বেগতিক। তিনি এ ব্যাপারেও ইবানের সাথে কথা বলার ওয়াদা করেন।

১০. তিনি আরও বলেন যে, বড় দিনের উৎসবের পর বাংকারকে কায়রোতে পাঠান হতে পারে। (ইনি কিসিঞ্জারের ঘনিষ্ট সহযোগী)। তারপর আজ রাতে আমার নৈশভোজ গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এ সুযোগে তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দিবেন। ইসরাইলীদের সাথে তাঁর সাম্প্রতিক বৈঠকগুলোতে কি কি হলো, তাঁর ভাষায় যা দীর্ঘ দশ ঘণ্টা ধরে ভাল করে চলে তিনি বুঝিয়ে বলবেন।

১১. যখন তাঁকে জানালাম যে, আমি এও জানি যে, তার আলোচনার ফল হলো বাদশাহ হোসেনও অনুরূপ "লিয়াজো ছিন্নের" অনুরোধ করেছেন, দেখলাম আমি এ খবর অবহিত আছি জেনে তিনি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে "যায়েদ আর রেফাঈ তার বিবৃতিতে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন যে, জর্ডান কোন একটি আরব দেশের সাথে একলা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার যে কোন চেষ্টার বিরোধিতা করবে।

-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে বিদ্যমান পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে একটি চিঠি লেখেন।

জেনেভা ঃ

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গতকাল কিসিঞ্জার আমার সাথে নৈশভোজ গ্রহণ করেন। ৪ ঘণ্টা ধরে তা চলে। এ ডিনারে মিসরী প্রতিনিধি দলের সাথে কিছু আমেরিকান প্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করেন। আমার ও মহামান্য প্রেসিডেন্টের সাথে কায়রোতে বিভিন্ন বৈঠকে যে কথা ঠিক হয় সে সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা চলে। কিসিঞ্জার যেসব দেশ সফর করে এসেছেন সে সবের নেতৃবৃন্দের অবস্থান নিয়ে কথা উঠে। বিশেষ করে মিসর ও মহামান্য প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে। ইউরোপে আন্তর্জাতিক নীতি, রুশ-মার্কিন সম্পর্ক এবং আমেরিকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও এর নানামুখী সম্ভাবনার দিক নিয়ে আলোচনা হয়। আমি পৌঁছেই আলোচনার সারসংক্ষেপ আলাদা তারবার্তায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। এরপর চার ঘণ্টার ডিনারে মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যে সব আলোচনা হয় তার বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত বহু তারবার্তা আসে।

স্বা/ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ওয়াল্ডহেমকে জানালাম যে, আমি গ্রোমিকোর সাথে আলাপ করেছি। সকালে কিসিঞ্জারের সাথেও কথা বলে জানাব যে, সামরিক কমিটি তার কাজ শুরু করা জরুরী বলে আমি মনে করি।

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরকঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কিসিঞ্জারের সাথে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয় আলোচনায় তিনি ফ্রান্স প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, তিনি কিছুতেই পারছেন না যে সে কেন অর্থনীতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিযোগিতা করতে চেষ্টা করছে? এ প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণস্বরূপ সুয়েজ থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত তেলের পাইপ লাইন প্রকল্পটির কথা বলেন। তিনি আরো বলেন— যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ফ্রান্সের প্রতিযোগিতার কোন ভিত্তি নেই। তারা ওয়াশিংটনে যথেষ্ট ধৈর্যের সাথে নিজেদের সংবরণ করে রাখছেন। অথচ যখন ফ্রান্স তার দেমাক বাড়িয়ে যাচ্ছে ঠিক সে সময় তাঁকে একেবারে মেরে ফেলা সম্ভব— প্রথমত, ব্রান্টকে (পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর) পতনের নোটিশ দিয়ে, দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সে অবস্থা এখন ভীষণ খারাপ যাচ্ছে। কারণ তারা (আমেরিকানরা) বোম্বিদোকে কেবল এক বছরের সময় দিচ্ছে। কারণ তার হাঁড়ে ক্যান্সার হয়েছে। তার অবস্থা এখন আশঙ্কাজনক। তাদের কাছে পূর্ণ স্বাস্থ্য রিপোর্টটি রয়েছে। তার মুখ ফুলা। আর ক্রমেই তা আরও বেশি ফুলে যাচ্ছে। তিনি কথা বলতে বলতেই সামনের লোকদের সম্মুখেই ঘুমিয়ে পড়েন। — পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কিসিঞ্জার আমাকে জানিয়েছেন যে, গ্রোমিকো তাকে অনুরোধ করেছেন যাতে ইসরাইলের ওপর তিনি চাপ সৃষ্টি করে বা তার চাপকে বৃদ্ধি করতে থাকেন যাতে সে আরও বেশি নমনীয় হয়। তখন কিসিঞ্জার তাকে অনুরোধ করেন যেন তার ভূমিকায় ইবানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎ শেষে তাকে (কিসিঞ্জারকে) দৃশ্যপট সম্পর্কে অবহিত করেন। কিসিঞ্জার আরও বলেন যে, গ্রোমিকো সেই এসে অবধি যতবারই তার সাথে বৈঠক হয়েছে একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে করছেন যে, "লিয়াজো ছিন্ন" করা অথবা অন্য যে কোন বিষয়ে মহামান্য প্রেসিডেন্টের সাথে কিসিঞ্জারের কি কি গোপন চুক্তি হয়েছে। তবে তিনি গ্রোমিকোকে কিছুই বলেননি বরং তাঁর সাথে সাধারণভাবে অস্পষ্ট করে কথা বলেছেন। কিসিঞ্জার জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি সোভিয়েতকে কোন তথ্যই দেবেন না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তারা সোভিয়েতের সাথে তথ্যাদি বিনিময় করছেন কিনা। এর উত্তর কিসিঞ্জার তা জোরালোভাবে নাকচ করে দেন।

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কিসিঞ্জার এ মর্মে একমত হন যে, মিসর ইসরাইলের মধ্যে "লিয়াজোঁ ছিন্নের" ব্যাপারে ফেব্রুয়ারির আগেই চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন হবে, এমনকি নতুন সরকার গঠন সম্পন্ন না হলেও। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে এর কি গ্যারান্টি আছে ? তখন নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করেন ঃ

১. তিনি ওয়াশিংটনে পৌঁছেই নিক্সনকে অনুরোধ করবেন যেন তাৎক্ষণিকভাবে ইসরাইলী রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠান এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রচণ্ড ভঙ্গিতে টেবিল চাপড়ে তাঁকে এ ব্যাপারে বলে দেন।

২. কিসিঞ্জার অচিরেই নিবিড় প্রচারণার কাজে কংগ্রেসের সকল নেতাদের নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠক করবেন (যাতে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়)।

৩. ইসরাইল তার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দেখতে পাবে যে, ১ জানুয়ারি থেকে "লিয়াজোঁ ছিন্নের" উদ্দেশ্যে তার ওপর এক অভিনব প্রচার হামলা চলছে।

৪. আমেরিকা সরকার ইসরাইলের বিরুদ্ধে এক বিরাট চাপ প্রয়োগ করতে যাচ্ছে এবং একটি একটি পদক্ষেপ করে ওয়াশিংটনের চাহিদা মতো ইসরাইল না চলা পর্যন্ত তাকে যে কোন সামরিক ও আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হবে।

৫. কিসিঞ্জার বলেন— তিনি আশা করেন যে আমি যেন মহামান্য প্রেসিডেন্টকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তার কথা জানিয়ে দেই। মহামান্য প্রেসিডেন্টের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা বাস্তবায়নে তিনি ও নিক্সন বদ্ধপরিকর। —পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইসরাইলী নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে তার মূল্যায়ন কি, আমার এ প্রশ্নের উত্তরে কিসিঞ্জার জবাব দেন ঃ

১. তিনি ব্যক্তিগতভাবে গোল্ডা মায়ারকে সমর্থন করেন না, তাকে সহ্যও করতে পারেন না। তবুও তার দল জেতারই সম্ভাবনা বেশি এবং সে-ই নতুন সরকার গঠন করবে।

২. তার চেয়ে আলোন ভাল।

৩. তবে যদি মায়ার-এর দল পরাজিত হয় এবং বেগিন-এর দল এসে যায় তাহলে তার ওপর বেদমভাবে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হবে।

সেই সকল অপ্রকাশিত পত্র

জেনেভা

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কিসিঞ্জারের সাথে আমার বৈঠককে তিনি উল্লেখ করেন ঃ

১. যখন ইসরাইলে তারা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে একথা বলে বেড়াতে লাগল যে,"লিয়াজোঁ ছিন্ন" করার ব্যাপারে আমার তড়িঘড়ি করা উচিত নয় এবং তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা আমার ঠিক নয়। তাদের জানা তথ্য মতে প্রেসিডেন্ট সাদাত সুয়েজ খাল পরিষ্কার করা শুরু করবেন না। এমন কি পরিষ্কার করলেও তা আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের জন্য খুলে দেবেন না। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরব অর্থ সাহায্য লাভকে জোরদার করা, মূলত যে কারণে এ সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

২. আমি এসব নাকচ করে ইসরাইলের এসব দাবি করার মূল মতলব কিসিঞ্জারকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেই। আমি আরও বলি যে, এ ব্যাপারে তাকে সুস্পষ্ট ধরণা দিতে চাই যে, যদিও আমি এসব নাকচ করে দিয়েছি তবুও এটা ঠিক যে ইসরাইল যদি তার কাছে কাম্য সবকিছু বাস্তবায়ন না করে তবে সুয়েজ খাল দিয়ে ইসরাইলী জাহাজ কখনও যেতে দেয়া হবে না। এর মধ্যে ফিলিস্তিন সমস্যাও রয়েছে। কিসিঞ্জার মন্তব্য করলেন যে, তার জন্য এ ব্যাখ্যাই যথেষ্ট।

৩. আমি তাকে জানালাম যে, প্রচার মাধ্যম, সরকার ও অভিজ্ঞমহলে এটা সবার জানা যে যাদের সুয়েজ খাল পরিষ্কার করার সামর্থ রয়েছে তাদের সাথে ইতোমধ্যেই খাল কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছে। এই পরিষ্কারের কাজ সম্পন্ন হতে ছয় মাস সময় লাগবে। বছরও লেগে যেতে পারে যদি আমরা চাই যে বড় বিশাল বিশাল তেলবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য এটাকে আরও গভীর করব।

৪. কিসিঞ্জার বলেন যে, পরিষ্কারের কাজে অর্থায়ন কোন সমস্যা নয়। তিনি মন্তব্য করেন যে, জাপানের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মিসর সফরে এ কাজে তাদের প্রাথমিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে গেছেন। বৃহৎ দেশগুলোও একই ভূমিকা পালনে কেবল ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রয়েছে। বিশেষ দ্র ঃ

এ বিষয়টি মহোদয় যে ভাবে ভাল মনে করেন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিশেষ করে ইউরোপ জগৎ অন্যরা সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে জাহাজ চলাচলের অনুমতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসরাইলের ওপর বৈশ্বিক চাপ বৃদ্ধি করেছে। এ প্রেক্ষাপটেই প্রচার মাধ্যমগুলোকে নির্দেশনা দিতে পারেন।

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আমেরিকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করার অনুরোধ জানালে কিসিঞ্জার আমাকে বললেন ঃ

১. নিক্সন কখনই পদত্যাগ করবেন না, এমন কি ইম্পিচমেন্টের সিদ্ধান্ত হলেও।

২. তিনি মনে করেন জায়নবাদী চাপ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং জায়নবাদী সংবাদপত্র ও অন্যান্য চরমপন্থী গ্রুপগুলোও তার বিরুদ্ধে তাদের হামলাকে আরও জোরদার করবে। কিন্তু নিক্সন বেশ শক্তিধর ব্যক্তি, তিনি বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন। কারণ তিনি দুর্দমণীয়।

৩. ডেমোক্রেটিক দল হচ্ছে দুর্বল।

৪. কিসিঞ্জার অচিরেই তার ব্যক্তিগত বন্ধু নেলসন রকফেলারকে নিয়োজিত করবেন যেন সে নিক্সনকে সমর্থন জানায় এবং তার হাতকে শক্তিশালী করে।

৫. "লিয়াজোঁ ছিন্ন"-এর ব্যাপারে যদি মধ্যপ্রাচ্যে কিছু অগ্রগতি লাভ করা যায় তাহলে তেলের ব্যাপারে পরিস্থিতি শান্ত করা যেতে পারে। আর এ সবই তখন নিক্সনের কৃতিত্ব হিসাবে প্রচার পাবে। এতে তার হৈ-চৈকারী বিরোধীদের জন্য লাগসই একটি জবাব হয়ে যাবে। তারা আর হালে পানি পাবে না। তখন তার গদি ভয়ানক রকম মজবুত হয়ে যাবে। এ জন্যই তিনি এ দু'টি বিষয়কে যত তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন করে ফেলতে চান।

৬. কিসিঞ্জার আরও বলেন— যদি নিক্সন-এর প্রত্যাশিতভাবে ঘটনার উত্তরণ নাও ঘটে, সে ক্ষেত্রেও কিসিঞ্জার পররাষ্ট্রমন্ত্রীই থেকে যাবেন, যা তিনি আগেই আমাকে জানিয়েছেন। তিনি বুঝেশুনেই কথাটা বলেছেন।

জেনেভা থেকে কায়রোতে তারবার্তা উড়তে থাকল। প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পত্রে বলা হয় ঃ জানতে পারলাম যে, গ্রোমিকো ইতোমধ্যে আবা ইবানের সাথে দেখা করেছেন। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আমি মুহাম্মদ রিয়াদকে অনুরোধ করি যেন ভিনোগ্রাদভের সাথে যোগাযোগ করে দেখে যে, ইবানের সাথে সাক্ষাতে কি কি আলাপ হয়েছে। ভিনোগ্রাদভ জানান ঃ

১. আবা ইবানের অনুরোধেই বৈঠকটি হয়। তিনি স্পষ্টত বেশ উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন।

২. গ্রোমিকো ইবানকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আসলে ইসরাইল কি চায়। গ্রোমিকো পরিষ্কার করে বলেন যে, যদি ইসরাইলের নীতি সম্প্রসারণবাদী নীতিই হয় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরোপুরিভাবে আরব দেশগুলোর পক্ষে অবস্থান নেবে এবং তাদেরকে পূর্ণ সমর্থন দেবে। আর যদি ইসরাইল শান্তিতে বসবাস করতে চায় তাহলে গ্রোমিকোর বিশ্বাস যে, তার প্রতিবেশীরা সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে যাবে।

৩. ইবান তার স্টাইলে এর উত্তর দেন এবং ঘুরে ফিরে যে কথাগুলোই বলেন যা গতকালের প্রকাশ্য বৈঠকে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন।

৪. গ্রোমিকো ইবানকে বলেন, সম্মেলনের মূলভিত্তি হচ্ছে—ভূমি জবরদখল অবৈধ। কাজেই ইসরাইলকে সকল অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে হটে যেতে হবে।

আর যদি সে আরব ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে তার সামরিক সম্প্রসারণবাদী নীতি অব্যাহত রেখে যায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরব দেশগুলোর পক্ষে যথার্থই অবস্থান নেবে।

৫. ইবান এর উত্তরে বলেন যে, ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও আসন্ন নির্বাচনের কারণে আমরা এখন খোলাখুলি কথা বলে ফেলতে পারছি না। গ্রোমিকো উত্তর দিলেন যে, এটা তো ইসরাইলের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, অন্যদের এতে কোন সংশ্লেষ নেই। অন্যদের কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে প্রকৃত শান্তি।

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরকঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গ্রোমিকোর সাথে দেখা করে তার ও ইবানের মাঝে কি কথা হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষায় ছিলাম। ইত্যবসরে আজ সকালে কিসিঞ্জারের সাথে সাক্ষাৎ হলে

জিজ্ঞাসা করলাম যে, কি কথা হয়েছে তা ইবান তাকে কিছু বলেছে কিনা। তখন কিসিঞ্জার বলেন যে, সোভিয়েত ও ইসরাইল আবার তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে (জেনে রাখা ভাল যে ইসরাইল ও সোভিয়েত কূটনৈতিক সম্পর্ক কেবল ১৯৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের শেষে মাদ্রিদ সম্মেলনের পরই পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়— হাইকাল)। তবে এটা হবে লিয়াজোঁ ছিন্ন তথা সৈন্য প্রত্যাহারের প্রথম অগ্রগতি সম্পন্ন হবার পর পরই। কিসিঞ্জারকে ভড়কে দেয়ার জন্য আমি তাকে বললাম যে, আমি তো আশা করি, ইসরাইল মুভমেন্ট ও লিয়াজোঁ ডিস্‌মিসালের ব্যাপারেও সোভিয়েতকে বেশ কিছু ছাড় দিতে চেষ্টা করবে যাতে সোভিয়েতের অবস্থানটা আরেকটু ভালোর দিকে যায় এবং সোভিয়েত আরও বেশি ইহুদী অভিবাসীকে ছেড়ে দিতে পারে। এ পয়েন্টে স্পষ্টতই কিসিঞ্জার, বাঙ্কার ও সিসকো চমকে উঠলেন। কিসিঞ্জারের স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া ছিল ঃ

"এই যদি হয় তাহলে ইসরাইলের শেষদিন খুবই নিকটবর্তী। আমি তাঁর কথার পিঠে জুড়ে দিয়ে বললাম— আমি তো কেবল তাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, যাতে সময় হাতছাড়া হয়ে না যায়।"

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সম্মেলনের বৈঠক চলাকালে আমি সাধারণভাবে ভিনোগ্রাদভকে জিজ্ঞাসা করি যে, সোভিয়েত-ইসরাইল কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্স্থাপন সম্পর্কে যে কিছু কানাঘুষা চলছে এটার হাকিকত কি ? তখন ভিনোগ্রাদভ আমার সাথে একটি জরুরী বৈঠক করতে চান। আজ অপরাহ্ণ ১টার সময় তিনি উপস্থিত হয়ে বলেন, গ্রোমিকোর সাথে বৈঠকে আবা ইবান বেশ ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে সম্পর্ক পুনর্স্থাপনের বিষয়টি পাড়েন। কিন্তু গ্রোমিকো সাফ জবাব দেন যে, এ বিষয়ে কথা বলার এখন উপযুক্ত সময় নয়। তবে শান্তি মেনে নিলে তার এ বিচ্ছিন্নতা কমে যাবে।

জেনেভা থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে চিঠি পাঠান, তাতে বলা হয় যে, কিসিঞ্জার আমার সাথে যোগাযোগ করে বলেন যে, তিনি আজ সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে আমার এখান হয়ে যেতে চান। তার সাথে বাঞ্ছার ও সিসকোও আসেন। মিসর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ রিয়াদ ও উমর সের্রি।

১. সোভিয়েত-ইসরাইল সম্পর্কের কথা ওঠে। আমি উল্লেখ করলাম যে, মনে হচ্ছে ইসরাইল সোভিয়েত ইউনিয়নের মন গলাবার চেষ্টা করছে, যাতে দু'দেশের

মধ্যে আবার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। আমি আরও বললাম যে, ভিনোগ্রাদভ আমাকে জানিয়েছে যে, আবা ইবানই বিষয়টি প্রথম পাড়েন। কিসিঞ্জার মন্তব্য করলেন যে, আবা ইবান তো তাকে সম্পূর্ণ উল্টো খবর দিয়েছে যে, আবা ইবান নয় বরং গ্রোমিকোই বিষয়টি প্রথম উত্থাপন করেন। তার বিশ্বাস আবা ইবানই ঠিক বলেছে, কারণ তিনি এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চেয়েছেন। কিসিঞ্জার এও বললেন যে, গ্রোমিকো ইবানকে বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইসরাইলের সাথে সাধারণ সম্পর্কের চেয়েও বেশি সম্পর্ক চান এবং গোল্ডা মায়ার যেন ব্রেজনেভের সাথে দেখা করেন। এ বিষয়ে কিসিঞ্জার বলেন, ইসরাইল যদি ভেবে থাকে যে, সে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সখ্য গড়ে তুলতে পারবে তাহলে সেক্ষেত্রে সে আমাদের আস্থা হারাবে। পরিণামে তার মৃত্যু অবধারিত।

২. কিসিঞ্জার জানান, সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ইসরাইলী সামরিক প্রতিনিধিগণ জেনেভায় পৌঁছে যাবে। তাঁরা কিলো ১০১-এর নিগড়ে সরাসরি আলোচনা শুরু করে দেবেন। আমি বললাম যে, ভিনোগ্রাদভ আজ অপরাহ্নে আমাকে বলেছেন যে, এ আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতদ্বয় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। এতে এ দু'দেশের সামরিক বিশেষজ্ঞগণও উপস্থিত থাকবেন। আমি তাঁকে এও বললাম যে, আমি এই প্রক্রিয়ায় আমার অসন্তোষ জানিয়ে দিয়েছি। কিসিঞ্জার দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, এসব আলোচনায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক প্রতিনিধি দল উপস্থিত থাকলে আলোচনার সাফল্যের যে কোন সুযোগ পুরোপুরিই হারিয়ে যাবে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপস্থিতিতে ইসরাইল কখনও এতটুকুন ছাড় দেবে না বা গঠনমূলক পথে আদৌ অগ্রসর হবে না। এ প্রেক্ষিতে তিনি মনে করেন, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত অথবা সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত অথবা এ দু'দেশের কোন বিশেষজ্ঞই যেন উপস্থিত না থাকে। তিনি এ সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত বাঙ্কারকে দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা দিলেন। তিনি এ সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩. তিনি বলেন যে, তিনি রাষ্ট্রদূত বাঙ্কারকে কয়েক দিনের জন্য জেনেভায় রেখে যাচ্ছেন। তার প্রতি নির্দেশনা থাকল যেন, আমি জেনেভা থেকে চলে যাবার পর তার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বা তার ও ইসরাইলের মধ্যে কি কথা হয় অথবা সোভিয়েত-ইসরাইলের মধ্যে কোন্ কথা সে জানলে তা আমাকে বা আমার ডেপুটিকে জানায়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসরাইল তার কাছে কিছু লুকাবে না।

৪. কিসিঞ্জার আমাকে বোঝালেন, পেট্রোল ও গ্যাসের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের এত তাড়া নেই। সে এক মাস বা আরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে পারবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি আরব অবস্থানকে কেন্দ্র করে ৫০০ মিলিয়ন পশ্চিমা বা আমেরিকানদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থিক অবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসে তখন আমেরিকা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

জেনেভা থেকে
প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট
প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গ্রোমিকো ও তাঁর প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ আমাকে সোভিয়েত মিশনে এক নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালেন। এর আগে আড়াই ঘণ্টার কর্মনির্ধারণী বৈঠক হয়ে গেছে।

১. গ্রোমিকো আমাকে জানালেন যে, গত তিনদিন ধরে আমি তাঁকে যা যা বলেছি এবং যা কিছু হয়েছে সব কিছু তিনি মস্কোতে সবিস্তারে পাঠিয়েছেন, যাতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সম্মেলনের খবরাখবর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে পারে। তিনি সম্মেলনের সূচনা পর্বটিকে মূল্যায়ন করতেও চেষ্টা করেছেন।

২. আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, তাঁর ও কিসিঞ্জারের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছে আমাকে যেন জানতে দেন। তিনি উত্তর করেন যে, কিসিঞ্জার মধ্যেপ্রাচ্যের বিষয়টি একেবারেই উথাপন করেননি। বরং তিনি কেবল কয়েকটি ইস্যুকে কেন্দ্র করেই আগ্রহ দেখান। এর মধ্যে রয়েছে সল্ট আলোচনা, সোভিয়েত-আমেরিকান বাণিজ্য চুক্তি, নিক্সন ও ব্রেজনেভের মধ্যকার আসন্ন শীর্ষ সম্মেলন।

৩. আমি তাঁর সাথে লিয়াজোঁ ডিস্‌মিসালের ব্যাপারে সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে আলাপের ব্যাপারে কথা বললাম। আমি তাঁকে বললাম, এ বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিকের আগে সামরিক। কিসিঞ্জার তাঁর চলে যাবার অব্যবহিত আগে আমাকে জানিয়েছেন যে, আবা ইবান ইসরাইলে ফিরে গিয়ে ইসরাইলী মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক করে সামরিক প্রতিনিধি পাঠানো এবং সামরিক কমিটির বৈঠকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৪. কিসিঞ্জার বলেন, আমি এও বললাম যে, গ্রোমিকো হয়ত আমার সাথে একমত হবেন যে, সম্মেলনে উপস্থিত হতে সিরিয়াকে রাজি করানোর জন্য আমাদের একযোগে কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন। কারণ তার উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর তার অনুপস্থিতি মিসরকে মৌলিক কিছু সমস্যার সম্মুখীন করে দেবে। আর এটা হবে এমন একটি ফুটো যা দিয়ে যে কেউ ইচ্ছা করলে দু'দেশের মধ্যে মনকষাকষি ছড়িয়ে দিতে ঢুকে পড়তে পারে।

৫. গ্রোমিকো বললেন, তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে প্রেসিডেন্ট আসাদের সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন। তিনি ইতোপূর্বে রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছিলেন যে, যদি সকল আরব ভূমি থেকে পূর্ণ ইসরাইলী প্রত্যাহারের ব্যাপারে ঐকমত্য হয় তাহলে সে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছে। আমি মন্তব্য করলাম যে, সম্মেলনের আগেই যদি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া ঘোষিত হয় তাহলে তো

কার্যত কোন সম্মেলন হবে না। গ্রোমিকো আমার সাথে একমত প্রকাশ করলেন এবং এ পয়েন্টে এসে তাঁর কথা শেষ করলেন যে, এ মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। মস্কো এখনও সিরিয়ার যুক্তি বুঝতে পারেনি। গ্রোমিকো আরও বলেন– হয় তিনি কোন সোভিয়েত ব্যক্তিত্বকে দামেস্ক পাঠাবেন, নয়ত কোন সিরীয় ব্যক্তিত্বকে মস্কো পাঠাবার অনুরোধ করবেন। কি হয় তিনি আমাকে জানাবেন।

৬. গ্রোমিকো কিছু গুজব রটনার দিকে ইঙ্গিত করেন। এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলাবলি হচ্ছে যে, সে ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্স্থাপন করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এটা সঠিক নয়। তিনি আরও বলেন যে, তিনি ইবানকে বলেছেন, যদি ইসরাইল সকল আরব ভূমি থেকে পুরোপুরি হটে যায় তাহলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু সে যদি কোন আরব ভূমি কব্জায় রাখার সঙ্কল্প সংরক্ষণ করে থাকে তাহলে সে কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা কোনদিন লাভ করতে পারবে না। তিনি আবারও জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান সময়ে ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্স্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না। আমি ইবানকে যা বলেছি তা হচ্ছে যদি আরবদের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়া যায় তাহলে এটা ইসরাইলকে বিচ্ছিন্নতা থেকে বের হতে সহায়ক হবে।

৭. গ্রোমিকো সামরিক কমিটিতে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণের বিষয়টি তোলেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, যদি মিসরের সহায়তা হয়, তার উপকার হয়, তাহলে এতে অংশগ্রহণে তাদের আগ্রহ এখনও বহাল রয়েছে। তিনি নিজেই প্রশ্ন তোলেন যে তাহলে বাঙ্কার কেন গতকাল অপরাহ্নে ভেনোগ্রাদভকে জানাল যে, মিসর সামরিক কমিটির বৈঠকগুলোতে দু'বৃহৎ শক্তির অংশগ্রহণ চায় না এবং এতে কোন ফায়দা হবে বলেও মনে করে না। অথচ কিসিঞ্জার তো এ বিষয়ে তাঁকে (গ্রোমিকোকে) কিছুই বলেননি। গ্রোমিকো আরও বলেন– তিনি বিশ্বাস করেন যে, সোভিয়েত সামরিক কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ মিসরের পক্ষেই যাবে। তবে তিনি মনে করেন যে, মিসর যদি তাদের অংশগ্রহণ না চায় বা এদিকে তেমন আগ্রহ না দেখায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনও অংশ নেবে না এবং এ অংশগ্রহণ না করা কখনই মিসরের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে না।

৮. এ কথায় আমি হতভম্বতা দেখালাম। আমি তো সেই প্রথম বৈঠক থেকেই তাঁকে বলেছি যে, এ সামরিক কমিটির কার্যক্রম অনিবার্য প্রয়োজন। এতে রাজনীতিকদের অংশগ্রহণের কোন অবকাশ নেই। তবে যদি সোভিয়েত ও আমেরিকান সামরিক কর্তাব্যক্তিরা এ বিষয়ে উপস্থিত থাকতে চান তাহলে এটা আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতার বাইরে। কারণ বিষয়টি দু'টি বৃহৎ দেশের একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার। কারণ তারা যৌথভাবে এ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে। যা হোক, যদি

সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকানদের সাথে সমঝোতায় সক্ষম না হয় তাহলে আমি, গ্রোমিকো চাইলে, আমেরিকান প্রতিনিধি দলের সাথে কথা বলতে প্রস্তুত আছি। স্বীকার করছি যে, আমি কোন ফলাফলের গ্যারান্টি দিতে পারব না। কারণ এটা হচ্ছে সম্মেলনের সভাপতির ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত।

সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বভাবতই মিসর ও তার কৌশলগত কারণগুলোকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে মিসরের অনেক যৌক্তিক কারণ থাকা সত্ত্বেও সে পরিষ্কার বুঝতে পারেনি। ইসমাইল ফাহ্মীও জেনেভায় তাঁর নীতি ও কৌশল কাজে লাগাননি; বরং তিনি কেবল তাঁর প্রতি প্রেরিত নির্দেশই পালন করে গেছেন। এর মধ্যে কিছু এমন বিষয়ও ছিল যা তাঁর অজ্ঞাতসারে মিসরে বসে স্থির হয়েছিল!

জেনেভার পত্র চালাচলি তখনও চলছিল

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরকঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সিরিয়াকে খোশামদ করার জন্য জেনেভায় নিযুক্ত তার স্থায়ী প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। মনে হলো, তিনি দৃশ্যপটে নেই। তিনি বেশ কিছুক্ষণ ধরে বোঝালেন যে, এ সম্মেলনটি তো জতিসংঘের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে না। তারপর স্বভাবসুলভ আরও বাড়িয়ে বলতে লাগলেন। তখন আমি পরিমাণ মতো দৃশ্যপট ব্যাখ্যা করলাম।

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জেনেভায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আমার সাক্ষাতে এসে বললেন ঃ

১. মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে দু'টি বৃহৎ দেশের দ্বন্দ্ব এখন ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের প্রতিযোগিতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যের লড়াই এখন ভিয়েতনামের লড়াইয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি। তবে পদ্ধতিটা একটু ভিন্ন এই যা!

২. বাংলাদেশের সঙ্কটকালে কিসিঞ্জারের সাথে ভারতীয় অভিজ্ঞতা বলে যে, তার ওয়াদা রক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কারণ ১৯৭১ সালে তার নয়াদিল্লী সফরের সময় কিছু বিষয়ের সমাধান নিয়ে ঐকমত্য হয়। কিন্তু তিনি যখন ওয়াশিংটনে তাঁদের রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক করেন তখন ভিন্ন ভূমিকার কথা জানান।

৩. শান্তি সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে এই প্রচেষ্টায় ভারত কিভাবে সহায়তা করতে পারে তা জানতে চান। আমি তাকে অব্যাহত সহযোগিতার প্রয়োজন বলে জানাই।

তার কাছে প্রাপ্ত তথ্যাদি জানাবার অনুরোধ করি এবং বলি তিনি যেন আমাদের জেনেভাস্থ প্রতিনিধি দলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন।

জেনেভা থেকে
প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট
প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

১. সিরীয় ফ্রন্টিয়ারের লিয়াজোঁ ছিন্নের বিষয়ে সামরিক কমিটিতে আমার দায়িত্ব পালনের জন্য সিরীয় অনুরোধ সম্পর্কে আপনার নির্দেশনা পেয়েই আমি টেলিফোনে কিসিঞ্জারের সাথে যোগাযোগ করি এবং তাকে বলি যেন এ ব্যাপারে ইসরাইলী পক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন। আমি তাকে জানাই যে, এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এটাকে কাজে লাগিয়ে একে অনুপ্রাণিত করা উচিত। তিনি তাঁদের সাথে যোগাযোগ করার ওয়াদা করেন এবং সকাল সকাল আমাকে জানাবেন বলেছেন।

২. আধঘন্টা পর তিনি আমার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস, তিনি যদি এখন এ ধরনের যোগাযোগ করেন, তাহলে তা হবে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ। এর ফল হবে এই যে, মিসর-ইসরাইল সামরিক আলোচনায় যে চেষ্টা চালানো হয়েছে এবং যতটুকু সফলতার আশা করা যাচ্ছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. তিনি আরও বলেন, ইসরাইলে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার আগে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একেবারেই পরামর্শ দেয়া যায় না।

৪. এখন সিরিয়া বন্দীদের তালিকা প্রকাশের আগে এ বিষয়ে আলোচনা করা অসম্ভব। এমনকি মিসরী ফ্রন্টিয়ারে কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টাও বাতিল হয়ে যেতে পারে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় আলাপে জানিয়ে দেন যে, এখন তিনি এ বিষয়ে ইসরাইলীদের সাথে যোগাযোগ করবেন না।

৫. আমি তাঁকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলাম এবং তাঁকে বললাম যে, আমি তাঁর সাথে একমত হতে পারছি না। কারণ আমাদের প্রতিনিধি দল সিরীয় ফ্রন্টিয়ার নিয়ে আলোচনা করবে। কারণ কমাণ্ড বা নেতৃত্ব একটিই। যা হতে যাচ্ছে, তা হলো কেবল একজন সিরীয় সেনা কর্মকর্তা এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে তার মন্তব্য ছিল, যদি এখন এই গঠন বিন্যাস ঘোষণা করা হয় তাহলে সব কিছু মুখ থুবড়ে পড়বে। এ কারণে তিনি আবারও জোড়ালোভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন যে, আলোচনাটি নির্বাচনের পরের জন্য তুলে রাখা হোক।

জেনেভা থেকে
প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট
প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আমার "আগেভাগে" চলে আসার পূর্বে জেনেভাস্থ আরব রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রদূতদের সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হওয়া উচিত বলে মনে হলো। যাতে তারা দৃশ্যপট সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং তাদের মধ্যকার আলোচনাও আমি জানতে পারি।

কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রদূত যে বিষয়গুলো উত্থাপন করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ

১. মিসরের প্রকৃত অবস্থানটি কি ?

২. গ্রোমিকো ইরানের সাথে বৈঠকের উদ্দেশ্য কি ?

৩. ইসরাইলের ওপর আমেরিকান ও রাশিয়ান চাপ কি যথেষ্ট ?

৪. কিলো ১০১-এর আলোচনা কি জেনেভায় স্থানান্তরিত হয়ে গেছে ?

৫. যদি আসল বৈঠকগুলো বিফল হয় তাহলে মিসরের অবস্থান কি হবে ?

আমি তাদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছি এবং জোর দিয়ে বলেছি যে, মিসরের কোন গোপন ভূমিকা, প্রকাশ্য ভূমিকা বলতে কিছু নেই। সম্মেলনে আমাদের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্যের বাইরে আর কিছুই ঘটেনি। আমার বক্তব্য হুবহু বিদেশী প্রচার মাধ্যম ও মিসরী সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে। এ ছিল আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে জেনেভায় কিসিঞ্জারের সাথে প্রথম বৈঠকের পর ইসমাইল ফাহ্মীর পাঠানো আনোয়ার সাদাতের কাছে লেখা পত্রাবলীর সিরিজ। এ সকল তারবার্তায় এমন কিছু যৌক্তিক দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা সন্দেহ করা কঠিন।

যেমন ঃ

১. মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানতেন না যে, তাঁর প্রেসিডেন্ট ও আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে কায়রোর বৈঠকগুলোতে কি কথা হয়েছিল। তিনি কিসিঞ্জারের সাথে আলোচনার জন্য বসে আছেন অথচ দৃশ্যপটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এ বিষয়ে তিনি কিসিঞ্জারকে জিজ্ঞাসা করছেন আর কিসিঞ্জার তাঁকে ভাঁড়াচ্ছেন যে, অচিরেই তিনি তাঁকে বলছেন। কিন্তু তারবার্তাগুলোর আলোকে মনে হয় না যে তাঁকে কিছু বলেছেন।

২. কিসিঞ্জার (স্বভাবতই ইসরাইলও) চাচ্ছে যেন সামরিক সমস্যাগুলো একপাশে পড়ে থাকে। জেনেভা সম্মেলনে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যাতে সম্মেলনটি রাজনৈতিক ভাবমূর্তিতে আবির্ভূত হয়।

৩. কিসিঞ্জার তাঁর কথাবার্তায় এমন একটি স্পষ্ট লাইন অনুসরণ করছেন যেন মিসরকে তার আন্তর্জাতিক মিত্রদের, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি সন্দেহ, ইতস্ততা ও শত্রুতার মনোভাবের দিকে টেনে আনা যায়।

৪. কিসিঞ্জার উপন্যাসের শাহেরজাদের ভূমিকা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। সে মূল বিষয়গুলো এড়িয়ে গিয়ে তার আলোচককে রসালো আলাপে মেতে রাখছে। যেমন বোম্বিদো ফুলে আছে। সে তার মেহমানদের সামনেই কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ ৩॥

জেনারেল গোর

"হেনরি কিসিঞ্জারের পরিকল্পনা নামে আমরা কোন কিছু জানি না।"
—জেনেভা সোভিয়েত সামরিক প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে মিসরীয় সামরিক প্রতিনিধি দলের উপদেষ্টা

২৭ ডিসেম্বর সামরিক এ্যাকশন কমিটি প্রায় কাজ শুরু করতে যাচ্ছিল। মিসর এ কমিটির কাজে তড়িঘড়ি করছিল যাতে ফ্রন্টিয়ারের পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতে পারে। বিশেষ করে তৃতীয় বাহিনীর ব্যাপারে। কিন্তু ইসরাইল সেই কিলো ১০১-এর সন্নিকটে প্রথম মিসর-ইসরাইল থেকে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল তাই চালিয়ে যেতে লাগল। এ প্ল্যানে প্রথম পয়েন্ট হলো রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া। কারণ সকল সামরিক ইস্যুই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম সামরিক বৈঠকটি যখন শেষ হলো তখনও মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েক ঘণ্টার ভিতর জেনেভা ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন। এজন্যই এই সামরিক এ্যাকশন কমিটির প্রথম বৈঠক সম্পর্কে তিনিই প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে প্রথম রিপোর্ট পাঠান। তার শুরুটা ছিল এ রকম ঃ

জেনেভা থেকে ঃ

প্রাপক ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজ অপরাহ্ণ ৫ টায় জাতিসংঘ দফতরে জেনারেল সিলাসিভোর সভাপতিত্বে সামরিক এ্যাকশন কমিটির বৈঠক বসে। মিসরের অনুরোধে উভয় পক্ষের সামরিক অফিসারগণ সামরিক ইউনিফর্ম পরে আসেন।

কিন্তু ইসরাইলের মূল দাবি থেকে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে তাকে রাজি করাবার জন্য সামরিক পোশাক পরার ওপর চাপ প্রয়োগই যথেষ্ট ছিল না। সে সকল আলোচনাতে একই আবেদন প্রকাশ করে থাকে, চাই কাগজের ওপর তার বৈশিষ্ট্য, যা-ই হোক না কেন বা অংশগ্রহণকারীদের পোশাকের রকমফের যা-ই হোক না কেন।

মিসরীয় সামরিক প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন ওয়ার স্টাফ ব্রিগেডিয়ার ত্বহা আল-মাজদুব। ইসরাইলী সামরিক ডেলিগেশনের প্রধান জেনারেল গোর-এর সামনে তিনিই ছিলেন মিসরীয় পক্ষের মুখ্য আলোচক। মাজদুবই প্রথম শুরু করেন। তিনি সরকারী রিপোর্ট অনুসারে কয়েকটি বিষয় দাবি করেন ঃ

১. জরুরীভিত্তিতে বিবাদমান বাহিনীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধের সিদ্ধান্ত উপনীত হতে হবে।

২. এটা নিষ্পন্ন হবে সুয়েজ ক্যানেলের পূর্ব পাড়ে সিনাইয়ের লাইনে ইসরাইলী প্রত্যাহারের মাধ্যমে।

৩. উভয় পক্ষের দূরত্ব থাকবে গোলার রেঞ্জের বাইরে।

৪. যুদ্ধবিরতি রেখা ক্যানেলের পূর্ব পাড়ে এমন দূরত্বে হতে হবে যাতে সামরিক বাহিনীগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং ক্যানেল এলাকার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো ব্যাহত না হয়।

মাজদুব পরিষ্কার করে বলেন, সামরিক পরিস্থিতি শান্ত করা এবং নির্ভরযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে সমাধান সফল করার ক্ষেত্রে একান্ত কাম্য একটি বিষয়। এটা ইসরাইলের স্বার্থেও বটে। কারণ এতে ইসরাইলী সরকারের ওপর জেনারেল রিক্রুটমেন্টের ভার হাল্কা হবে। গোর এবার জবাব দিতে শুরু করলেন। তাঁর জবাবের সুরটা তেমন স্বস্তিকর ছিল না। কিন্তু তাঁর বাক্যগুলোতে সে মুহূর্তে ইসরাইলের অনুভূতি ও উদ্দেশ্য কিছুটা প্রতিফলিত হচ্ছিল।

গোর বলেন--"কিলো ১০১ আলোচনা সফল হয়েছে। এর প্রমাণ হচ্ছে, অস্ত্রবিরতি এখনও বহাল আছে। যারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিল তারা পদোন্নতি পেয়েছে। মেজর জেনারেল জেমসী এর পরই লেঃ জেনারেল হয়ে গেলেন।"

এরপর গোর দ্বিতীয় পয়েন্টে গিয়ে বলেন– ব্রিগেডিয়ার মাজদুব-এর কাছে ইসরাইলী প্রত্যাহার বিষয়ে যা শুনেছেন তা চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। কারণ "প্রত্যাহার" শব্দটির একটি রাজনৈতিক অর্থ আছে। এটা সামরিক কমিটির কাজ থেকে বাইরে নিয়ে যায়। আর যদি কমিটির কাজ কেবল সামরিক বিষয়ের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে উভয় পক্ষের কাজ হবে কেবল সামরিক বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিপক্ষিক ব্যবস্থা গ্রহণ। তিনি বলেন, আলোচ্য বিষয় হবে, সামরিকভাবে অধিকৃত ভূমির পরিস্থিতি। কাজেই আলোচনায় এ ভূমিসমূহের সার্বভৌমত্বের বিষয় নিয়ে আসা উচিত হবে না।

এরপর জেনারেল গোর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সবিস্তারে বলেন। এ পর্যায়ে তিনি বলেন যে, মিসরের ভূমিতে তার সার্বভৌমত্ব ইসরাইল প্রত্যাখ্যান করে না। "does not deny." ভূমি বিষয়ে আলোচনা করবেন রাজনীতিবিদগণ। তিনি একজন সামরিক ব্যক্তি হিসাবে এ ব্যাপারে কথা বলার দায়িত্ব পাননি। সাধারণ নীতি হিসাবে ইসরাইলের মত হচ্ছে– লড়াইয়ের ময়দানে যখন হেরে যায়নি তখন আলোচনার টেবিলে যেন কোন পক্ষই হার না মানে। কাজেই যদি কেবল ইসরাইলের পক্ষ থেকেই প্রত্যাহারের কাজটি হয় তাহলে এটা এমন একটি অনুভূতির জন্ম দেবে যে, ইসরাইল সামরিক কমিটির আলোচনায় হার মেনে বের হয়েছে। কাজেই ব্যবস্থাদি উভয় পক্ষের

জন্যই প্রযোজ্য হতে হবে (অর্থাৎ যতটুক দূরে ইসরাইলী সৈন্য পিছিয়ে যাবে ততটুকু দূরত্ব মিসরীয় বাহিনীকেও পিছু হটতে হবে)।

এ পর্যায়ে সিনিয়র আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক জেনারেল সিলাসিভো আলোচনায় ঢুকে বলেন, মিসর আগেই যে কোন মিসরীয় প্রত্যাহারের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই এই সব প্রস্তাব আবারও ইসরাইলী পক্ষ থেকে উত্থাপনের বিষয়টি তিনি বোঝতে পারছেন না।

জেনারেল গোর উত্তর করলেন–মিসরের পক্ষে যদি "প্রত্যাহার" শব্দটি অগ্রহণীয় হয় তাহলে 'movement' (চলে যাওয়া) শব্দটি ব্যবহার করা যায়। তিনি আশা করেন, বাহিনীগুলোর যৌথভাবে চলে যাওয়া গ্রহণীয় হবে।

ইসরাইলী দলের আরেক সদস্য কর্নেল যিয়ুন বলেন ঃ "একটি পক্ষ যদি প্রত্যাহার করে অন্যটি তো নিজ জায়গায় বহালই থাকল। যে প্রত্যাহার করবে সে হারল, যে জায়গায় বহাল থাকল সে জিতল। এটা যুক্তির কথা নয় যে, কোন পক্ষ রাজনৈতিক আলোচনায় উপনীত হওয়ার আগেই তার কার্ডগুলো সমর্পন করতে রাজি হবে। এ কথা ইসরাইলের যে কোন প্রত্যাহার– তার ধরন যা-ই হোক না কেন– রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতার দিকে ঠেলে দেবে।"

প্রথম বৈঠকের শেষের দিকে ইসরাইলী সামরিক প্রতিনিধি দল অনুরোধ করে যেন আগামী বৈঠকে তাদেরকে সামরিক পোশাক পরা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কারণ এটা জেনেভার শান্তির দফতরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মিসরীয় দল এ ব্যাপারে কায়রো ফিরে যাবার সুযোগদানের অনুরোধ জানায়। এ ছাড়া অন্তত আগামী বৈঠকটি সামরিক পোশাকে হওয়ার অনুরোধ করে।

আবা ইবান, ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, হচ্ছেন প্রতিনিধি দল প্রধানদের প্রথম ব্যক্তি যিনি জেনেভা ত্যাগ করেন। তিনি তাড়াতাড়ি চলে এলেন যাতে নির্বাচনী যুদ্ধ ও নতুন সরকার গঠনের সময় হাজির থাকতে পারেন। জেনেভা ত্যাগের আগে আবা ইবান মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট একটি পত্র পাঠান। এর মূল কথা ছিল ঃ দয়া করে আমাদের একটু সাহায্য করুন যাতে বেগিন-এর জয়টা ঠেকাতে পারি। নইলে আবার সেই যুদ্ধ–ইসরাইলের প্রাপ্ত সকল অস্ত্র দিয়ে। এতে আরও যোগ হবে, যুদ্ধবিরতির পর সে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব অস্ত্র পেয়েছে সেগুলোও।

এরপর ইবান পারমাণবিক অস্ত্রের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, বেগিনের নেতৃত্বাধীন সরকারের ছত্রছায়ায় যুদ্ধ হয়ত কোন নিয়ম-কানুনই মানবে না।

মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনেভা ত্যাগ করলেন, তাঁর স্থলটি রেখে গেলেন রাষ্ট্রদূত হুসেইন খাল্লাফের জন্য তিনি মিসরী সামরিক প্রতিনিধি দলের প্রধানের সাথে সমন্বয় করে আলোচনা পরিচালনা করবেন। অনুরূপভাবে কিসিঞ্জারও তাঁর পিছনে রেখে

গেলেন রাষ্ট্রদূত এলবোর্থ বান্কারকে। কিন্তু বাঞ্চার অচিরেই পানামা খালের সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়াদির জন্য জেনেভা ছেড়ে চলে গেলেন। আমেরিকান প্রতিনিধি দলের প্রধানের দায়িত্ব ছেড়ে গেলেন তাঁর সহকারী রাষ্ট্রদূত স্টের্নারের ওপর। এদিকে গ্রোমিকোও সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের প্রধানের দায়িত্ব তাঁর কায়রোস্থ রাষ্ট্রদূত ভ্লাদিমির ভিনোগ্রাদভের ওপর ছেড়ে চলে গেলেন। জেনেভায় প্রতিনিধি দলের কার্যনির্বাহী হিসাবে রাষ্ট্রদূত হুসেইন খাল্লাফ তাঁর প্রথম তারবার্তায় লিখলেন ঃ

প্রাপক ঃ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রেরক ঃ রাষ্ট্রদূত হুসেইন খাল্লাফ।

১. মিস্টার স্টের্নার (আমেরিকা ডেলিগেটের ডেপুটি চীফ) মিসরী সামরিক পক্ষের সাথে সাক্ষাতের কামনা করেন এবং এর জন্য বার বার চাপ দেন। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে রাজনৈতিক পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করাকেই শ্রেয় মনে করি। এতে তাঁর সাথে রাষ্ট্রদূত আহমদ উসমান ও উপদেষ্টা নাবীল আল-আরাবী আজ ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করেন।

২. তিনি তাঁর কথা শুরু করে বলেন যে, বাঞ্চার তাঁকে ফোনে জানান যে, তাঁর জেনেভায় আসতে কয়েকদিন দেরি হবে। কারণ, পানামা খাল সম্পর্কিত তাঁর কিছু কাজ পড়ে আছে। স্টের্নার আরও বলেন যে, তিনি বাঞ্চার বলেছেন, এখানে তাড়াতাড়ি আসার কোন কারণ নেই।

৩. তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি নিজেকে কারও ওপর চাপাতে চান না। তবে তিনি সম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি হিসাবে সামরিক আলাপ-আলোচনায় আমাদের মতিগতি জানতে আগ্রহী। তখন আমরা তাঁকে জানালাম যে, নিঃসন্দেহে জেনারেল সিলাসিভো তাঁকে যা কিছু হয়েছে জানিয়েছেন। আমার কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই।

৪. তিনি দ্বিপাক্ষিক বিনিময়ের মূলনীতির বিষয়টি তুললেন (অর্থাৎ মিসর ও ইসরাইল উভয় পক্ষই হটে যাবে)। তিনি বলেন যে, ইসরাইলী প্রতিনিধি দল এই মূলনীতি দাবি করে পীড়াপীড়ি করবে। এই বলে তিনি এ বিষয়ে ইসরাইলী পক্ষের বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরতে লাগলেন। এতে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম যে, তিনি কি ইসরাইলের এ নীতিমালার জন্য আমাদেরকে নসিহত করতে এসেছেন কিনা। তিনি বলেন যে, এটা একটি মৌলিক নীতি, ইসরাইলী পক্ষ এখন এটা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে যাতে সমাধান ঘটার সময় আরব পক্ষ বোঝে নেয় যে, তারা মূল্য না দিয়ে কখনও তাদের ভূমি লাভ করতে পারবে না।

একই দিন রাষ্ট্রদূত হুসেইন খাল্লাফ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট তার দ্বিতীয় তারবার্তা পাঠান। এবার তার ও সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের উপ-প্রধান রাষ্ট্রদূত ভ্লাদিমির ভিনোগ্রাদভের মধ্যকার সাক্ষাৎ সম্পর্কে ঃ

প্রাপক ঃ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রেরক ঃ রাষ্ট্রদূত হুসেইন খাল্লাফ

১. আজ ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় ভিনোগ্রাদভের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমি ইসরাইলী সামরিক কর্তাব্যক্তিদের সাথে সোভিয়েত সামরিক কর্মকর্তাদের যোগাযোগের বিষয় সম্পর্কে তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম।

২. আমি এই যোগাযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি এটা দৃঢ়তার সাথে নাকচ করে দিয়ে বলেন, এতো কেবল একটি ইসরাইলী প্রস্তাব ছিল। তারা এরপর এ নিয়ে এমন কি চেষ্টাও করেনি। এরপর তিনি এ ভুল তথ্যের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, আমরা এটা শুনেছি। তখন তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন যে, যদি কোন যোগাযোগ হয় তাহলে তিনি তা আমাদেরকে সরাসরি জানিয়ে দেবেন।

৩. তিনি বলেন যে, সামরিক এ্যাকশন কমিটিতে যা হয়েছে তা জেনারেল সিলাসিভো তাকে জানিয়েছেন। তার মতে, সারবত্তা কিছুই হয়নি। তিনি আমার মনোভাব জানতে চাইলেন। আমি বললাম প্রথম দিককার বৈঠকগুলো স্বভাবতই সাধারণ ধরনের ছিল। বিস্তারিত এরপর আসছে।

৪. সম্মেলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা সম্পর্কে ভিনোগ্রাদভ কথা বললেন। তারা এ ব্যাপারে আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে চান। তিনি এ জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, আমেরিকা ও ইসরাইল উভয়ই এ কার্যক্রমে ঢিল দিতে চায় অথবা ডিমে তেতালা ধরনের চালিয়ে যেতে চায়। এর অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে জেনেভায় বাঞ্চারের অনুপস্থিতি।

৫. তিনি সম্মেলনের কর্ম-পরিকল্পনা ঠিক করার জন্য আমার সাথে বৈঠকে বসার উপর জোর দেন। আমি তাকে বললাম যে, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন বর্তমান পর্যায়ে সামরিক এ্যাকশন গ্রুপের কাজ কর্মে কেন্দ্রীভূত থাকি। তার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত এতটুকু রাজি হয়েছি যে, শেষ পর্যায়ে তার সাথে বসে কেবল তার মতামত শুনব এবং তা পর্যালোচনার জন্য আমার সরকারের নিকট পাঠাব।

সোভিয়েত অবস্থান নিয়েই তখনও মিসরী প্রতিনিধি ব্যস্ত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল কায়রো যেন সম্মেলনের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকে।

জেনেভা থেকে

প্রাপক ঃ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রেরক ঃ রাষ্ট্রদূত হুসেইন খাল্লাফ

সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের সাথে বিভিন্ন আলোচনার ফলে প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ সাধারণ যে মনোভাব লক্ষ্য করেন তার সারসংক্ষেপ ও কিছু পার্শ্ব কথা ঃ

১. সম্মেলনে আমেরিকার ভূমিকা মূখ্য হয়ে প্রকাশ পাওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যে উৎকণ্ঠিত তা বেশ বোঝতে পারছি। কারণ এতে তার কোন সক্রিয় ভূমিকা রাখা হয়নি। তার ভয় হচ্ছে, যেভাবে সামরিক কমিটির বৈঠক বসেছে তা আসলে সম্মেলনে তাদের "আইনগত" (রাজনৈতিক) ভূমিকাকে নিশ্চিন্ত করা মাত্র।

২. এ কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের সাথে তাদের যোগাযোগ নিবিড় করা আর পরামর্শ করার আগ্রহ দেখিয়ে আসলে সামরিক এ্যাকশন কমিটির কার্যাদি সম্পর্কে নিজেকে দৃশ্যপটে রাখতে চায়।

৩. সামরিক এ্যাকশন গ্রুপের কার্যক্রম বন্ধ হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধরে নেবে যে এটা তাদের অংশগ্রহণ না করা তথা ইসরাইলী পক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে না পারারই ফল।

৪. সোভিয়েত ইউনিয়ন আশঙ্কা করছে যে, পাছে মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোন গোপন চুক্তি হয়।

৫. আলোচনায় প্রতিনিধি দলের মনে হলো যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ইসরাইল আহূত শান্তির ধারণা মিসরী সীমান্ত, এ অঞ্চলের নিরাপত্তার ধারণা– এসব ব্যাপারে মিসরের দৃষ্টিভঙ্গি সুনির্দিষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে জানা প্রয়োজন মনে করে। এসব ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য সনদের বিবরণ চায় যাতে মৌলিক বিষয়াদিতে মিসরের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের বোঝ পাকাপোক্ত হয়।

৬. আমাদের সামরিক প্রতিনিধি দলের একজন সদস্যকে এক সোভিয়েত কর্তাব্যক্তি তার ভাষায়– "কিসিঞ্জার পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করে সে সম্পর্কে জানতে চায়। তখন মিসরী দলের উত্তর ছিল আমরা কমিটিতে মিসরী পরিকল্পনা অনুসারে এগুচ্ছি, কিসিঞ্জার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই।" তারবার্তার এই লাইনগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন শরমে শরমে মিসরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল যে, সোভিয়েতের সাথে তার একটা সমঝোতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জেনেভায় প্রতিনিধি দলের অবস্থান ক্রমেই বিব্রতকর হয়ে পড়েছিল।

জেনেভা থেকে রাষ্ট্রদূত হুসেইন খাল্লাফ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি বলেন, কিসিঞ্জার পরিকল্পনার বিষয়টি নিয়ে বেশি তোলপাড় হলো যখন মেজর জেনারেল মাজদুব সোভিয়েত সেনা কর্মকর্তাকে ইসরাইলী প্রস্তাবনা সম্পর্কে কিছু তথ্য বা তাঁর মতামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তরে বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস তাঁরা কিসিঞ্জার প্লান অনুসারে গোলযোগরেখা পর্যন্ত প্রত্যাহারে রাজি হবেন। যখন মেজর জেনারেল মাজদুব জানতে চাইলেন যে, কিসিঞ্জার প্লান বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন। তখন তিনি এ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তখন জেনারেল মাজদুব তাঁকে বললেন ঃ "কিসিঞ্জার পরিকল্পনা নামে

আমরা কোন কিছুর কথা জানি না, আমাদের সকল কার্যক্রম কেবল মিসরী পরিকল্পনার উপরই ভিত্তিশীল। বলিহারি এই কিসিঞ্জার প্লানটি কি ? সোভিয়েত অফিসারের উত্তর ছিল সৈন্য প্রত্যাহারের কাজ তিনটি রেখায় (রুটে) বিন্যাস করা হবে ঃ

প্রথমত ঃ গোলযোগরেখা, কোন সূক্ষ্ম সীমা নির্ধারণ ছাড়াই, দ্বিতীয়ত, আল্-আরীশ— রা'স মুহাম্মদ রুট এবং তৃতীয়ত সীমান্তরেখা।

যখন জেনারেল মাজদুব তাঁকে জানালেন যে তিনি এ কথা এই প্রথমবারের মতো শুনছেন তখন সে বলল, এটা তো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ভঙ্গিতে এই তারবার্তাটি প্রেরণ করা আসলে জেনেভায় মিসরী প্রতিনিধি দলের একটি প্রচ্ছন্ন অভিযোগই ছিল যে, তারা অন্ধকারে কাজ করছে।

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখায় পশ্চিম ইউরোপ খুশি ছিল না। কারণ সেও একটি ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিল। অথচ দেখা গেল পুরো মঞ্চটি কিসিঞ্জারই নিয়ন্ত্রণ করছেন আর তিনিই ভূমিকা বিতরণের দায়িত্ব নিয়েছেন। সে সময় ফ্রান্সই ছিল ইউরোপীয় ভর্ৎসনার কারণ বর্ণনা করার স্বাভাবিক ভাষ্যকার। এর অধিকাংশই নিবদ্ধ ছিল আরবদের প্রতি। কারণ তারাই তো সমস্যার মূল বিষয়। তাদেরই তো অধিকার রয়েছে অন্তত এ সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতে শেষ কথা বলার।

প্যারিসে নিযুক্ত মিসরী রাষ্ট্রদূত নাজিব কাদরি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট লিখলেন। এতে তিনি ফরাসী অনুভূতি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এর জবাব পেলেন যে, "জেনেভায় ফ্রান্স তার ভূমিকা পালনে মিসর সরকারের কোন আপত্তি নেই। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বেসরকারী বা অনানুষ্ঠানিক ভূমিকা রাখাই শ্রেয় হবে।" ফ্রান্স তাৎক্ষণিকভাবে এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। এদিকে রাষ্ট্রদূত নাজিব কাদরি তাঁর সাথে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিশেল জোবেরের সাক্ষাৎ সম্পর্কে এক তারবার্তা লিখে পাঠালেন।

প্যারিস থেকে রাষ্ট্রদূত নাজিব কাদরির পক্ষ থেকে মিসরীয় মন্ত্রীর নিকট। আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিশেল জোবেরের সাথে দেখা করে আপনার পত্র পৌঁছে দিয়েছি। এ বিষয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট বোম্বিদোর সাথে পরামর্শ করেন। তাঁরা বর্তমান সময়ে এ থেকে নিম্নবর্ণিত কারণে দৃষ্টি সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঃ

১. তাঁরা একটি স্থায়ী শান্তির সমাধানে পৌঁছার ব্যাপারে জেনেভা সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী নন। কাজেই পরোক্ষভাবে হলেও ফ্রান্সের অংশগ্রহণে তাঁরা আগ্রহী নন। যাতে বৃহৎ দু'টি শক্তি এই উপস্থিতি থেকে ফায়দা লুটতে না পারে। তাঁরা মনে করেন যে, আসল অংশগ্রহণ তো হবে এই আলোচনা ব্যর্থ হলে।

২. তাঁরা বর্তমান পর্যায়ে তাঁদের ভূমিকাকে জেনেভা থেকে দূরে রাখার পক্ষপাতী। পরিস্থিতি পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত এটাই তাঁদের অভিমত। চলমান আলোচনা হোঁচট খেলেই কেবল ফ্রান্স মিসরের পাশে এসে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩. ফ্রান্সের বেসরকারী উপস্থিতি ফ্রান্সের জন্য বিব্রতকরও বটে।

৪. আমাকে জানালেন যে, তাঁদের এই নৈরাশ্যবাদিতা এই বিশ্বাস থেকে উৎসারিত যে, ইসরাইল আসলে কোন শান্তিতে আগ্রহী নয়। বরং তারা দীর্ঘমেয়াদী অস্ত্রবিরতিতেই বেশি আগ্রহী। অন্তত এ পর্যায়ে এটাই তাদের স্বার্থের পক্ষে যাবে।

৫. মিশেল জোবের আরও জানান যে, তিনি এ মাসের শেষের দিক থেকে নিয়ে মার্চের শুরু পর্যন্ত এ অঞ্চলে এক পাক ঘুরে আসবেন। অপেক্ষা করছেন, সৌদি আরব ও সিরিয়া সফরের মধ্য দিয়েই তিনি এ ভ্রমণ শুরু করবেন। তবে মিসরের ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয় একটি বিশেষ সফরের দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। খুবই উত্তম হবে, যদি এটা জেনেভার বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়ার সময় ঘটে।

॥ ৪ ॥

লিবিয়া

"এ হলো আমেরিকান টিমের সদস্যদের নাম যারা প্রেসিডেন্ট সাদাতের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন।"

—হেনরি কিসিঞ্জারের পক্ষ থেকে মিসরীয় প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হাফেজ ইসমাইলের নিকট পাঠানো তারবার্তা।

১৯৭৪ সালের ৭ জানুয়ারি সোমবার ছিল সামরিক এ্যাকশন গ্রুপের পঞ্চম বৈঠকের জন্য নির্ধারিত দিন। স্পষ্টত বিষয়গুলো ছিল এলোমেলো। উভয় এ্যাকশন গ্রুপের সদস্যগণ আলোচনা টেবিলে জড়ো হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্মেলন কক্ষের বিভিন্ন পাশে সম্মেলনের কার্যসূচী নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চলে। চলমান আলোচনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার পথই সবাই খুঁজছে। এ কোণায় বসে ইসরাইলী প্রতিনিধি দলের সদস্য কর্নেল যিয়ুন দু'জন মিসরীয় সামরিক কর্মকর্তার সাথে আলাপ করছেন। হঠাৎ তিনি তাঁদের দু'জনকে বলছেন, সম্ভবত ভাষাটি হুবহু এরকম ছিল–" সত্যি কথা বলতে কি, তাঁরা বুঝতে পারছেন না, কেন মিসর প্রাচ্য অভিমুখী নীতির ওপর জেদ ধরে আছে এবং ফিলিস্তিন ইস্যুকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে। এই নীতির কারণে অনেক সম্পদ নষ্ট হয়েছে এবং কয়েকটি যুদ্ধে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অথচ তারা যদি অন্য কোন নীতি অবলম্বন করত তাহলে তারা বিপুল সম্পদ অর্জন করতে পারত, অনেক যুদ্ধে লাভবানও হতো।"

কর্নেল যিয়ুন তাঁর সামনের শ্রোতাদের চোখেমুখে এই মন্তব্যের কারণে হতভম্ব হয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট রেখা দেখেও আরও বললেন, " তোমরা কেন পূর্বে ফিলিস্তিনের জন্য তোমাদের সময় ব্যয় না করে এর বদলে পশ্চিমে লিবিয়াকে নিয়ে নিচ্ছ না ?" লিবিয়া নিয়ে নাও, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তোমাদের কোন কাজে আপত্তি করব না এবং তোমাদের ব্যস্ততার সুযোগ নেব না, এমনকি যদি লিবিয়াকে জবরদখলের জন্য তোমরা সামরিক যুদ্ধেও প্রবেশ কর।"

কর্নেল "ফুয়াদ হুওয়াদী" ছিলেন ঐ দু'জন অফিসারের একজন। তিনি কর্নেল যিয়ুন-এর প্রত্যুত্তর করে যাচ্ছিলেন। তিনি আরব মিসরের দায়িত্বের কথাই নির্দেশ করছিলেন। বলেন, আরবের সাথে মিসরের সম্পর্ক কোন দুরভিসন্ধি বা লোভের

সম্পর্ক নয়। এমনি করে ফিলিস্তিন ইস্যুটি হচ্ছে তার জন্য একটি বিবেক ও কর্তব্যের ব্যাপার। কিন্তু কর্নেল যিয়ুন তখন জানালেন যে, তাঁর এটা বোঝে আসেনি। এরপর উভয় প্রতিনিধি দলকে আলোচনা টেবিলে আহ্বান করা হয়।

টানা ৩ ঘন্টা ধরে চলার পর বৈঠক যখন শেষ হলো কর্নেল যিয়ুন মিসরীয় দলের কাছে এসে একটি স্মারক হস্তান্তর করে বৈঠকে মিসরীয় সভাপতির উদ্দেশ্যে বলেন ঃ "এই স্মারক নোটটি পড়ার জন্য অনুরোধ রইল, এতে কিছু উপকারী জিনিস পেতে পারেন।"

স্মারকটির শিরোনাম ছিল ঃ "মিসরের প্রকৃত প্রত্যাশা ঃ লিবিয়া"। এরপর স্মারকটি শুরু হয়ে পূর্ণ চার পৃষ্ঠাব্যাপী বলছে ঃ

১. মিসর সেই ১৯৬৭ সাল থেকেই তার আরব জাতীয়তাবাদের ডাকের জন্য বিরাট মূল্য দিয়ে আসছে। এখন সময় এসেছে এই নীতি থেকে মিসরের নিজের জন্য কিছু ফসল ঘরে তোলার।

২. যে কোন দেশ অগ্রগতি চাইলে তার দরকার ভূমি, কর্মশক্তি আর পুঁজি। প্রথম দু'টি তো মিসরের দেদার রয়েছে কিন্তু পুঁজির অভাবে ভুগছে। অথচ লিবিয়ার রয়েছে অনেক পুঁজি।

৩. বর্তমান সময়ে লিবিয়ার কাছে রয়েছে প্রভূত নগদ রিজার্ভ, প্রায় ৩.৪ বিলিয়নেরও বেশি। ১৯৭৪-১৯৮০ পর্যন্ত অনুমান করা যায় লিবিয়ার তেল রপ্তানির আয় ৩৬ বিলিয়ন ডলারের কম হবে না। অর্থাৎ গড় বার্ষিক আয় হবে ৫.১ বিলিয়ন ডলার।

৪. এ বিরাট সাইজের পুঁজি নিয়ে মিসর তার অনেক আর্থ-সামরিক প্রয়োজনের আয়োজন করতে সক্ষম হবে। বেশি দিন লাগবে না, সুদানও তার সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এভাবে এক নতুন জাতির উন্মেষ ঘটবে। এতে করে এমন এক প্রকৃত শক্তির অভ্যুদয় ঘটবে যাকে সবাই হিসাবে আনতে বাধ্য হবে।

৫. স্বভাবতই এ সকল দেশের মধ্যে সমতা না থাকার কারণে কিছু সমস্যার উদ্ভব হবে বলে ধারণা করা যায়। তবে এগুলোর সীমান্ত পরস্পর মিলিত থাকায় একে অপরকে এ সব সমস্যা উত্তরণে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু যদি মিসর এখনকার মতো পুঁজির জন্য তৃষ্ণার্ত থাকে তাহলে সে এমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে, যা তার জাতি তথা গোটা আরব বিশ্বের জন্য দুর্গতি ডেকে আনবে।

৬. এ প্রেক্ষিতে মিসর ও লিবিয়ার একীভূত হওয়াই এখন মিসরের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। সিনাই বা অন্য কিছু মিসরের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে না। বরং তার সমস্যার সমাধান হচ্ছে লিবিয়াকে নিয়ে নেয়া। এ পরিস্থিতিতে শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মিসরকে আর পাশ্চাত্যের কাছে সিনাই ফিরে

পাওয়ার জন্য ধরনা দিতে হবে না। কারণ সে সময় তার শর্ত আর চাহিদাগুলো এমনিতেই পূরণ হয়ে যাবে।

৭. স্বভাবতই মিসর এ ধারায় বেশ শক্তিশালী হবে এবং এতে করে সে গোটা আরব বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য বিরাট বিপদ হয়ে দেখা দেবে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রও মিসরকে এই ধারা থেকে বিরত রাখার জন্য যে কোন মূল্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

৮. অনুরূপভাবে এ ধরনের একীভূত হওয়া থেকে দূরে রাখার উপায় হিসাবে সৌদি আরব যে মিসরকে অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দেবে তা সন্দেহজনক। কারণ সৌদি আরব নিশ্চিতভাবে অমোঘ বিধান অনুসারেই এ পথ বন্ধ করার জন্য তার সাধ্যের সবই করবে।

সৌদি আরব বাৎসরিক ১০% ভাগ তেল উৎপাদন হ্রাস করার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও এটা কতটুকু আন্তরিক প্রতিশ্রুতি তাতে ঘোর সন্দেহ রয়েছে। কারণ আগামী অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ইরাক, আবুধাবী, লিবিয়া, আলাস্কা ও উত্তর সাগর থেকে তেলের উচ্ছ্বাস শুরু হয়ে যাবে। সংযুক্ত ছকে ১৯৮০ সাল নাগাদ বিশ্বের তেল উৎপাদনের পরিমাণ দেখা যেতে পারে।

এরপর এই স্মারকের বক্তব্য এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যেন লিবিয়া মিসরের সাথে মিলিত হয়ে গেছে। যেন এটাই হচ্ছে সকল সমস্যার যাদুকরী সমাধান।

মিসরী প্রতিনিধি দল বুঝে উঠতে পারল না যে, এই বিষয়টিকে কিভাবে নেবে। তবে তারা এর বিস্তারিত বিবরণ কায়রোতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রেসিডেন্ট সাদাত এই ইসরাইলী স্মারকের তৃতীয় ধারার একটি অনুচ্ছেদের নিচে তাঁর নিজ কলমে দু'টি দাগ দিলেন। সে অনুচ্ছেদটি হচ্ছে যেখানে আগামী পাঁচ বছরে লিবিয়ার আয় ধরা হয়েছে ৩৬ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু জেনেভা দৃশ্যপট ছিল তখনও উত্তপ্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র তখন পেরেশান ছিল যে, জেনেভায় কি হচ্ছে, এর মর্ম কি আর এর ফলাফলই বা কি হতে পারে। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭৪ রাষ্ট্রদূত হুসেইন খাল্লাফ কায়রোতে তারবার্তা নং ২৬৭ পাঠালেন। এর ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ও নিউইয়র্কে নিযুক্ত ডেপুটি মাইকেল "ওয়েস্টন" শান্তি সম্মেলন পর্যবেক্ষণের জন্য চলতি মাসের ৯ তারিখ মিশনে এলো। তিনি জানালেন ঃ

১. বর্তমানে সামরিক এ্যাকশন কমিটিতে যা হচ্ছে এ ব্যাপারে তাঁর সরকার বেশ আগ্রহী। শান্তি সম্মেলন এবং এর সিদ্ধান্তকে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে কর্মপত্র প্রস্তুত করেছে যা অচিরেই জানানো হবে। তিনি আশা করেন, এ ব্যাপারে মিসরের মন্তব্য পাবেন।

২. তাঁর সরকার জাতিসংঘের উৎস থেকে জেনেভায় চলমান নির্দেশনা লাভ করছে। চাই নিউইয়র্কের মহাসচিব অথবা জেনেভার সহকারী সচিব মারফত। তবে তাঁরা মনে করেন যে তথ্যের কিছু ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে জেনেভার ইসরাইলী মিশনের মাধ্যমে তা উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু কোন সদুত্তর পায়নি।

জেনেভাস্থ জাপানী রাষ্ট্রদূত তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীর অভিযোগের কাছাকাছিই ছিলেন।

জেনেভা থেকে

প্রেরক ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রেরক ঃ রাষ্ট্রদূত হুসেইন খাল্লাফ

আজ অপরাহ্নে জাপানী রাষ্ট্রদূত মারিতারার অনুরোধে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি সিনাই থেকে ইসরাইলের প্রত্যাহার কাজে গড়িমসির কারণে তাঁর শঙ্কা ব্যক্ত করলেন। বললেন যে, তিনি সম্মেলনের প্রথম দিনগুলোতে এ্যাম্বেসেডর বাঙ্কার সায়েজুনে তাঁর সহকর্মী, ভিনোগ্রাদভ, যিনি তাঁর দেশ জাপানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন যখন মারিতারা জাপানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন, দুজনের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। উভয়কেই তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়টি ভিয়েতনাম ইস্যু থেকে আলাদা। এ বিষয়ে কেবল বৃহৎ দু'টি দেশই মাথা ঘামাচ্ছে না বরং জাপানের মতো অনেক দেশকেই ভাবিয়ে তুলছে।

মারিতারা আরও বলেন, তিনি বাঙ্কার ও ভিনোগ্রাদভকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন এ সম্মেলনে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স অংশগ্রহণ করল না। বাঙ্কারের উত্তর ছিল এ ব্যাপারে ফ্রান্স ও ব্রিটেন কোন দৃঢ় আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এছাড়া এদের কারুরই মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে সুরাহা করার ব্যাপারে সক্রিয় অবদান রাখার শক্তি নেই। তবে ভিনোগ্রাদভ বলেন, কারণটা হলো সম্মেলনে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের অংশগ্রহণে ইসরাইল সম্মতি দেয়নি। এরপর মারিতারা জিজ্ঞাসা করলেন, "কখন সুয়েজ খাল খুলে দেয়া হবে, প্রশস্ত ও গভীর করা হবে।"

হঠাৎ করেই বিশ্ববাসী জানল যে, হেনরি কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট সাদাত-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসোয়ানের পথে রয়েছেন। তাঁর সাথে সরাসরি আলোচনা করবেন। জেনেভার নাট্য মঞ্চ দূরে ঠেলে দিয়েই এটা হচ্ছে। এ মঞ্চে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, বৃহৎ শক্তি আর দোস্ত-দুশমন সবাই রয়েছে। এদিকে ইসরাইলে লেবার পার্টি আবারও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো। এতে হেনরি কিসিঞ্জার কিছুটা সময় পেলেন। এ অবসরে তিনি তাঁর পরিকল্পনার বিস্তারিত প্রণয়ন করে নেন এবং এ অঙ্গনে একাই অগ্রসর হলেন।

ঠিক যে সময়টিতে হেনরি কিসিঞ্জার তাঁর পরিকল্পনায় শেষ পরশ বুলাচ্ছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর কাছ থেকে নিচের পত্রটি পান ঃ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট পত্র।

আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সমস্যা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে আলোচনাকালে যে পরামর্শ হয় সে প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নবর্ণিত একটি বিশেষজ্ঞ দল তাৎক্ষণিকভাবে কায়রো পাঠাতে প্রস্তুত রয়েছি ঃ

জর্জ কিথান (Keithahn)–ইনি ব্যক্তিগত সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। পল লুইস (Paul lewis) ইনি গুপ্ত শ্রবণ মোকাবিলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। হিউ ওয়াড (Hugh Ward) –ইনি ব্যক্তিগত সুরক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞ। এছাড়াও প্রত্যক্ষ নিরাপত্তা ও বিস্ফোরক সন্ধানে একজন বিশেষজ্ঞও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে টিমের সাথে যোগ দিবে।

অধিকন্তু আমরা মিস্টার এলান ডি উল্‌ফ (Alan D. Wolf)-এর নেতৃত্বে আরেকটি টিম পাঠানোর প্রস্তাব করছি। ইনি গোয়েন্দাগিরিতে বিশেষজ্ঞ। যদি প্রেসিডেন্ট সাদাতের অনুমোদন থাকে তাহলে আমরা তাঁকে কায়রোতে অবস্থিত আমেরিকান স্বার্থ দেখাশোনার মিশনের সাথে সংযুক্ত করতে পারি। এ যাত্রা তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার নিরাপত্তায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদেরকে তাঁকে দেখার সুযোগ করে দেয়া এবং তার প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাতে এগুলো আপনার গ্রহণ করার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারা যায়। আমরা এই দলটিকে অচিরেই কায়রোতে পাঠাবার ইচ্ছা পোষণ করছি। ২ ফেব্রুয়ারির আগেই। যদি এর চেয়ে বেশি উপযোগী সময় দেখেন তাহলে স্বভাবতই আমরা আপনার আগ্রহ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত রয়েছি।

—হেনরি কিসিঞ্জার

যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট সাদাতের অনুরোধে তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার দায়িত্ব বহনের জন্য এগিয়ে আসছিল। আর সাড়া দেয়ার সময়টিও ছিল দৃষ্টি আকর্ষক। সেটিই ছিল সমসাময়িক মিসরীয় রাজনীতিতে এক বিপজ্জনক মোড়।

॥ ৫ ॥

কিসিঞ্জার—২

"আমার বাহিনী আমার নির্দেশ ও কামাও মেনে চলে। আমি যে নির্দেশই জারি করি তারা তা অচিরেই বাস্তবায়ন করবে।"

— হেনরি কিসিঞ্জারের প্রতি আনোয়ার সাদাত

জেনেভা সম্মেলন কিছু সমস্যার তো সমাধান করতে সক্ষম হলো, কিন্তু আরও কিছু সমস্যা সমাধানে অক্ষম রয়ে গেল। যাহোক, কিসিঞ্জার অনুভব করতে লাগলেন যে, সম্মেলনের উদ্দেশ্য সব ফুরিয়ে গেছে। এ সম্মেলন প্রধানত যে সব আমেরিকান-ইসরাইলী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে তা হচ্ছে ঃ

—আরব ও ইসরাইলের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক পর্যায়ে প্রকাশ্য বৈঠক। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, আরব প্রত্যাখ্যানের দেয়ালে এক বড় ফুটো হয়ে গেল।

—ইসরাইলী সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে এই সম্মেলন সংঘটিত করায় এর উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিল হয়েছে। আর তা হচ্ছে লেবার পার্টিকে জিতানো। কারণ কিসিঞ্জারের বিশ্বাস, ইসরাইলের রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে এ পার্টির সাথে কারবার করাই বেশি জুতসই [আজও ঠিক একই নীতিরই চর্চা চলছে, যদিও জনসনের জায়গায় এখন ক্লিনটন আর কিসিঞ্জারের জায়গায় ক্রিস্টোফার বা মেডেলিন অলব্রাইট। আর স্বভাবতই গোল্ডা মায়ারের স্থলে শিমন পেরেজ বা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু]।

—সম্মেলনের কার্যধারায় সমাধান প্রক্রিয়া থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নির্বাসিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই কিসিঞ্জার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

—তাছাড়া সম্মেলন সংঘটিত হওয়ার পরিবেশ ছিল বিপরীতমুখী—কিছু আরব দেশ আমন্ত্রণ পেয়েও অনুপস্থিত ছিল আর কিছু আরব দেশ দাওয়াত পেয়ে তা কবুল করে নিল। এমন দাওয়াত কবুলকারীদের মধ্যেও দ্বিধাবিভক্তি ছিল। যেমন মিসর ও জর্ডানের মধ্যেও সন্দেহ বেড়েছে বৈ কমেনি। আর এখন সম্মেলনটি এমন কিছু সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করতে উপক্রম হয়েছে যাতে চলার পথে হোঁচট খেতে হবে, থমকে দাঁড়াতে হবে। কাজেই এখন যতদূর সম্ভব আমেরিকান-ইসরাইলী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের- ওপরই ছায়াপাত করা হলো। কিসিঞ্জার ব্যর্থ হতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এমনকি কাউকে কিছু চিন্তা করতে বা হিসাব-নিকাশ ও মূল্যায়ন পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ দিতেও রাজি ছিলেন না।

যে প্রধান বিন্দুতে এসে সম্মেলন বিকল হয়ে গেলে তা হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক প্রত্যাহারের ইস্যু। কারণ বাহিনীগুলোর ফয়সালা করার জন্য এ নীতির ওপর ইসরাইল জেদ ধরেছিল আর জেনেভার মিসরীয় প্রতিনিধি দল আবেদন করেছিল যে, ফয়সালা বাস্তবায়ন করতে হলে ইসরাইলী বাহিনীকে সুয়েজ খালের পূর্ব রেখায় প্রত্যাহার করে নিতে হবে। গোলযোগ রেখাকে সীমা সাব্যস্ত করে এর থেকে ছাড় দেয়া সম্ভব নয় বলেও জানিয়ে দিয়েছে।

এসবই ছিল কিসিঞ্জারের জেনেভা ত্যাগের মূল কারণ। আর তাই তিনি ওয়াশিংটন থেকে সরাসরি আসোয়ানে চলে গেলেন। যেখানে প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর অপেক্ষায় রয়েছেন। এক মুহূর্তে জেনেভা থেকে সকল আলো অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার সম্মেলন প্রাসাদটি নিমিষেই পরিণত হলো এক পরিত্যক্ত মঞ্চে। আসোয়ানেই সব আলো ঠিকরে পড়তে লাগল। সেখানেই বড় বড় শিল্পী তাঁদের ভূমিকা রাখার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

কিসিঞ্জার তাঁর সফরের পটভূমি রচনার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন থেকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের বরাবর একটি পত্র সংগ্রহ করে নিলেন। এতে তাঁকে অনুরোধ করা হয় যেন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর থেকে তেল অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করেন। কারণ স্বাভাবিকভাবেই "সে (যুক্তরাষ্ট্র) এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে না, যখন সেখানে তার বিরুদ্ধে কালাকানুন জারি করা আছে। যদি চাওয়া হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র সমাধান প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা রাখুক– যার জন্য সে প্রস্তুতও বটে– তাহলে সে তা স্বেচ্ছাসেবামূলক করতে চায়– কোন প্রকার চাপের তলে পড়ে নয়, চাই তা মানসিক চাপই হোক।"

কিসিঞ্জারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল রাষ্ট্রদূত আশরাফ গেরবালকে তার সাক্ষাতে ডেকে পাঠানো। তার উদ্দেশ্য ছিল তার আসন্ন সফরে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে সেখানে প্রস্তুত করে নেয়া। সাক্ষাতের পর আশরাফ গেরবাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্মীর কাছে একটি প্রতিবেদন লেখেন।

ওয়াশিংটন থেকে

প্রাপক ঃ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রেরক ঃ রাষ্ট্রদূত আশরাফ গেরবাল

আজ ১০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কিসিঞ্জারের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। এ সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন আহমাদ খলীল । আরও ছিলেন মিসর অফিসের গোজেফ, সিসকো ও এন্ডারসন।

১. কিসিঞ্জার উল্লেখ করলেন যে, ইসরাইলী সরকার নিজেই বিভক্ত। এর ভিতর বহু মতবিরোধ। তাছাড়া নতুন মন্ত্রিসভাও এখনও গঠিত হয়নি।

২. তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত অতীব ধৈর্যশীল ও জ্ঞানী। তিনি আরও বলেন যে, তিনি আসোয়ানে দু'টি লক্ষ্যে যাচ্ছেন ঃ

প্রথমত মহামান্য প্রেসিডেন্টের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং তাঁর মতামত নেয়া, যদিও তা কিসিঞ্জারের নিকট স্পষ্টই। দ্বিতীয়ত দায়ান থেকে যেমনটি শুনেছেন সেভাবে দৃশ্যপট প্রেসিডেন্টের সামনে তুলে ধরা।

৩. তিনি বলেন যে, তিনি আশাবাদী। এরপর তিনি ইসরাইল সফর করবেন। তিনি নিশ্চিত যে, তিনি লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানের বিষয়টি হচ্ছে ইসরাইল পশ্চিম তীর (সুয়েজ খালের) থেকে সিনাইতে স্থানান্তর হবে।

৪. তাঁর প্রতিটি সফরেই অগ্রগতি অর্জন করা। তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্টের সামনে অগ্রগতি হাসিলের ব্যাপারে তার দায়-দায়িত্ব রয়েছে। তিনি অনুভব করেন যে, এই অগ্রগতি কেবল তখনই অর্জিত হবে যখন ইসরাইলকে পশ্চিম তীর থেকে হটিয়ে সিনাইতে স্থানান্তর করা হবে।

৫. সাম্প্রতিক সময়ে ইসরাইলের কড়াকড়ি থেকে যা স্পষ্ট, সেদিকে আমি ইঙ্গিত করি। কিসিঞ্জার আমার মূল্যায়নে একমত পোষণ করে বলেন, সমস্যা হচ্ছে দায়ানের সাথে ঐকমত্যে পৌঁছার পর এখন মনে হচ্ছে ইসরাইল কিছুটা পিছে সরে যাচ্ছে।

৬. তিনি আরও বলেন, গত সোমবার জেনেভায় যা হয়েছে তা আমার অবশ্যই জানা দরকার (ইসরাইল কর্তৃক মিসরী দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা এবং দ্বিপাক্ষিক প্রত্যাহারের ওপর পীড়াপীড়ি করা)। এসব কারণে তিনি ইসরাইলের এই খেলা বন্ধ করতে চান এবং তাকে (ইসরাইলকে) সীমিত প্রকল্প নিতে বাধ্য করতে চান।

৭. তিনি আরও বলেন যে, তাঁর এ সফরে তিনি মহামান্য প্রেসিডেন্টের নিকট তুলে ধরতে চান যে, ঠিক কতখানি আমাদের পৌঁছা সম্ভব। তিনি বলেন, মহামান্য প্রেসিডেন্ট বিরাট ধরনের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন, যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরও গভীর যোগাযোগে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, যে কিনা যুদ্ধকালীন তার শত্রুর বিরুদ্ধে বিরাট প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এ অবস্থানকে কখনো ভুলতে পারবে না। এ কারণেই আমেরিকা চায় যেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট সফল হন।

৮. তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আসলে তিনি মহামান্য প্রেসিডেন্টের মতামত জানেন। কাজেই তিনি জানেন যে, তাঁর কায়রো সফর তেমন দীর্ঘ হবে না। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আর কায়রো সফরের কারণ কি ? তখন তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি আসলে প্রথমেই ইসরাইল যেতে চান না (যাতে তার উপর কিছুটা চাপ থাকে)। এরপর তিনি কায়রো ফিরবেন (কি ফলাফল হলো তা দেখে)। কাজেই ইসরাইল দিয়ে সফর শুরু করলে মনে হবে তিনি তার এ্যাডভোকেট।

৯. তাঁকে জানালাম যে, কিছু প্রচারণা চলছে, তিনি কায়রো যাবেন আমাদের ওপর কিছু চাপ সৃষ্টি করে, কিছু ছাড় আদায় করে তা নিয়ে ইসরাইল অভিমুখে রওনা দেয়ার জন্য। তিনি তা দ্ব্যর্থহীনভাবে নাকচ করে দেন। বলেন, তিনি মহামান্য প্রেসিডেন্টের সাথে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা পালনে সচেষ্ট রয়েছেন।

কিসিঞ্জার সুয়েজ খালের পশ্চিম তীর থেকে ইসরাইলকে বের করে দিয়ে সিনাইতে পাঠানোর ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। সুয়েজ খাল খোলা ও এ অঞ্চলের সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টাই করবেন। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর প্রত্যাশিত সবকিছু ইসরাইল থেকে এখনও অর্জন করতে পারেননি ঠিক– এ জন্যই তিনি নতুন করে আবার সেখানে যাচ্ছেন।

১০. এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করলাম যে, বিভিন্ন পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, ইসরাইল কেবল অন্য এক লাইনে প্রত্যাহার করতে চায়। এরপর পরিস্থিতি একেবারে স্থবির হয়ে যাবে। তখন অবস্থানটা কি দাঁড়াবে ? এর উত্তরে তিনি বলেন, সম্ভবত এটাই হচ্ছে ইসরাইলের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ, যেন এটাই শেষ পরিণতি না হয়। বরং ব্যাপক সমাধানের এটি হবে প্রথম পদক্ষেপ। তিনি বাহিনী ছিন্ন করা এবং সিনাইতে ইসরাইলী প্রত্যাহারের ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পরপরই পরবর্তী পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা শুরু করবেন।

১১. প্রশ্ন করলাম যে, দায়ানের সাথে যে প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয় তার মধ্যে কি এটাও শামিল ছিল ? উত্তরে জানান যে, তিনি এ সম্পর্কে এখনও কোন সুনিদিষ্ট সিদ্ধান্ত নেননি। তবে এখন নেবেন।

১২. তিনি উল্লেখ করেন, তিনি মহামান্য প্রেসিডেন্টের শত্রুদেরকে এ দাবি করার সুযোগ দেবেন না যে, তিনি কিছুই বাস্তবায়িত করতে পারেননি। কারণ সেটা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যাবে না।

১৩. আমি নতুন করে সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী ইসরাইলী কড়াকড়ির কথা তুললাম– অনেকেই আশা করছে যে, আংশিক সমাধান আর পর্যায়ক্রমিক চুক্তিকে ঘিরে ১৯৭১ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। তখনও ইসরাইলকে দেয়া আমেরিকার বিরাট সামরিক সাহায্য থেকে বলীয়ান হয়ে ইসরাইলী একগুঁয়েমির কারণে বিষয়টির কোন দফারফা হয়নি।

১৪. তিনি উল্লেখ করেন যে, দু'টি অবস্থার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে ঃ

প্রথমত, এখন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গভাবে একক সরকারী অবস্থানে রয়েছে। পক্ষান্তরে ১৯৭১ সালে সিস্কো নিছক তার নিজ বিবেচনায় রজার্সের সাথে কাজ করত। হোয়াইট হাউসের ভূমিকা তেমন পরিলক্ষিত হতো না। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বয়ং কিসিঞ্জারও সে সময় আমার সাথে সাক্ষাৎকালে সুনির্দিষ্ট কোন কিছুর প্রতিশ্রুতি

দেয়নি। তাঁর কথাবার্তা অধিকাংশ সময় কেবল সাধারণ বৃত্তেই ঘুরপাক খেত। কিন্তু এখনকার অবস্থা একেবারে ভিন্ন।

দ্বিতীয়ত, (অক্টোবরের যুদ্ধে) ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে আমাদের সামরিক অপারেশন প্রমাণ করেছে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা তাদের নেই।

১৫. কিসিঞ্জার (আবারও) উল্লেখ করেন যে, আসোয়ানে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রেসিডেন্টের সাথে পূর্বের একমত হওয়া বিষয়ের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা।

১৬. আমি উল্লেখ করলাম যে, আমরা সবাই অনুভব করছি, আমেরিকার প্রচার মাধ্যমের ম্যাকানিজম কাজে লাগিয়ে এবং ওয়াশিংটনস্থ ইসরাইলী দূতাবাসের সমন্বয়ে আমেরিকার প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি সংগঠিত অপারেশন চলছে। সাথে সাথেই কিসিঞ্জার কথাটিকে জোরালো সমর্থন দিয়ে বলেন, গোজেভ ক্রাফট ও মারলিন বার্গার ওয়াশিংটন পোস্টে যা লিখছেন এবং মারফেন কাল্ব CBS টেলিভিশনে যা প্রচার করছেন এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৭. আমি বললাম যে, ঠিক এ কারণেই সময়ের ইস্যুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উদ্দেশ্যের ত্বরিৎ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আমাকে সমর্থন করে তিনি বলেন, সে জন্যই তো আমার এ সফর।

১৮. কিসিঞ্জার বললেন, তিনি এ পর্যায়ে যা বাস্তবায়ন করতে চান তা হচ্ছে একটি সীমিত ও সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের ব্যাপার মূলনীতির চুক্তি বাস্তবায়ন- যা আনুষ্ঠানিকভাবে জেনেভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে।

১৯. তিনি ব্যক্ত করেন যে, তিনি প্রকাশ্য বিবৃতি বা প্রপাগাণ্ডাকে এড়িয়ে থাকতে আগ্রহী। এমন একটি শান্ত (Low Key)পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান যাতে পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছুতে পারেন এবং এভাবে চূড়ান্ত সমাধানে উপনীত হতে সক্ষম হন। তার অনুসৃত এই পদ্ধতি তার প্রতি জায়নিস্ট(!!) বৃত্তসমূহের ব্যাপক হামলা চালানোর মোকাবিলায় একটি দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ বলেন, তিনি সংসদ ও সিনেট কমিটিগুলোতে কংগ্রেস সদস্যদের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন এবং তাদেরকে দৃশ্যপট সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিবেন। তিনি জানেন তাদের কাছে যা-ই বলবেন তা অচিরেই ইসরাইল পক্ষের কাছে চলে যাবে। কাজেই তার করণীয় হচ্ছে, যদি ইসরাইল তার (কিসিঞ্জারের) উপর আক্রমণের চেষ্টা করে তাহলে সে সিনেট ও কংগ্রেস সদস্যদের বিরোধিতার সম্মুখীন হবে।

২০. আমি তাঁকে সিনেটরদের সাথে আমার যোগাযোগের কথা জানালাম। এদের মধ্যে তিনজনই এ এলাকা সফর করছেন। এদের মধ্যে দু'জনই ইসরাইলকে (বাড়তি) সাহায্য দেয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। আমরা তাঁদেরকে অব্যাহতভাবে সিনারিও

সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করব। তিনি তখন বলেন, ভোট দেয়ার বিষয়টি ধর্তব্য নয়। আসল কথা হলো, পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সদস্যদের সম্যকভাবে বোঝা। এ প্রসঙ্গে প্রমাণস্বরূপ মিসর সফরকারী সামরিক কমিটির প্রধান সাংসদ স্ট্রাটনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে। ইনি কংগ্রেসে এমন পরিবেশে সৃষ্টিতে প্রভাব রাখতে পারেন যাকে তাঁর বিরুদ্ধে (কিসিঞ্জারের বিরুদ্ধে) ব্যবহার করা ইসরাইলের পক্ষে কঠিন হবে। আমি তাঁকে বোঝালাম যে, ভোটভুটির গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। প্রমাণস্বরূপ ১৯৭১ সালে আমার সাথে সিনেটর স্কটের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলাম। যখন তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি ইসরাইলী চাপের মুখে ছয় মাস অটল ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ভেঙ্গে পড়লেন এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য অন্যদের সাথে তিনি তাঁর স্বাক্ষর দিলেন এবং ইসরাইলকে অর্ধ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা (বাড়তি ঋণ) দেয়ার বিলে তার অনুমোদন দিতে বাধ্য করি।

২১. তিনি উল্লেখ বলেন যে, তিনি আমেরিকার ইহুদী লবির নেতৃবৃন্দের সাথে প্রতি সপ্তাহে বৈঠকে বসেন। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন– তাদের মধ্যকার সুস্থ বিবেকবানরা ইসরাইলী নীতির যথার্থতা নিয়ে অভিযোগ তুলে থাকেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তারা এখন আমেরিকান নীতির পক্ষে তাদের অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করছে। আগের মতো কেবল ইসরাইলী দৃষ্টিভঙ্গি জানাই যথেষ্ট মনে করছে না।

২৩. আমি তাকে প্রশ্ন রাখলাম, তার চিন্তা-ভাবনার আলোকে সেই পর্যায়ে কখন আসবে যখন ফিলিস্তিনীরাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে? বললেন, বাহিনী আলাদা করার বিষয় সম্পর্কিত প্রথম পর্যায়ে তাদের অংশ নেয়ার সুযোগ নেই। তাদের পালা আসবে পরবর্তী পর্যায়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোন ফিলিস্তিনী নেতার সাথে বৈঠক করেছেন কিনা, উত্তর 'না' বললেন।

২৫. আমি ইসরাইলী টালবাহানার নীতির কথা উল্লেখ করলে কিসিঞ্জার এটা সমর্থন করে বলেন যে, এ নীতি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্যও বিপজ্জনক। তিনি আরও বলেন, দায়ান ওয়াশিংটনে থাকাকালে তিনি তাকে সতর্ক করেন যে, সুয়েজ খালের পশ্চিম তীরে ইসরাইলী বাহিনীর অবস্থান বিপদ ডেকে আনবে তখন দায়ান মন্তব্য করেন যে, পরিস্থিতি সামাল দেয়া ইসরাইলের পক্ষে সম্ভবপর। তারা পশ্চিম তীরে এক লাখের বেশি মাইন পুঁতে রেখেছে। কিসিঞ্জার তখন দায়ানের যুক্তিকে সমর্থন করেননি।

২৬. আমি তাঁকে ইসরাইলী হঠকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। তাঁকে বলে দিলাম যে, আমরা যখন বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হব, তখন ইসরাইলের ক্ষতি হবে অবর্ণনীয়।

২৭. বললাম, এ কথা প্রকাশ করছে যে, ইসরাইলী সৈন্যরা ৬ অক্টোবরের পূর্বের যুক্তিতে ফিরে যাচ্ছে।

২৮. তিনি পুনরায় নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে একমত হওয়া বিষয় থেকে পিছে সরে দাঁড়ানোর জন্য কায়রো যাচ্ছেন না। তিনি বলেন যে, আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে ভাল মনে করি তবেই তিনি ইসরাইল সফর করতে প্রস্তুত (কিন্তু সেটা হয়ত কোন সুনির্দিষ্ট মনোভাব প্রকাশ করবে)। আমি তাঁকে বললাম, এখন তাঁর সফরসূচীতে কোন পরিবর্তন আনার প্রয়োজন নেই। বিষয়টি কিসিঞ্জারের বিবৃতিতেই সুরাহা করা সম্ভব। তিনি আমাকে সমর্থন করলেন।

২৯. আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে, ওয়াটার গেট সঙ্কটের উত্তরণ কি ঘটল এবং প্রশাসনের ওপর এর প্রভাব কতটুকু পড়ল তখন উত্তরে বললেন যে, নিঃসন্দেহে এটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তবে তিনি বুঝতে পারছেন যে এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবেন। এ প্রসঙ্গে বলেন যে, আমরা অবশ্যই তাদের সাহায্য করব। আরবের অবশিষ্ট তেল অবরোধ ব্যবস্থাও তুলে নেয়ার সময় এসে গেছে। আরও বলেন যে, যদিও এ অবরোধ আমেরিকার ওপর বেশি প্রভাব ফেলছে না তবুও এ পদক্ষেপে এখনকার মতো (ওয়াটারগেট ইস্যুতে) তাঁর গদি শক্ত করতে কিছু ফল বয়ে নিয়ে আসবে।

তিনি বলেন যে, দর বাড়ানোর কারণে আরবদের অবস্থান দুর্বল হয়ে গেছে। যদিও তিনি স্বীকার করেন যে, ইরানের শাহ্-ই এদিকে ঠেলে দিয়েছে। তাঁকে সৌদি আরবের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে বললেন, সে তো নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিতে রাজি বলে জানিয়েছে। তবে তাঁর বিশ্বাস, সৌদি আরব আমেরিকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বুঝতে পারছে না।

৩০. তাঁকে তাঁর সিরিয়া সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জানান, তিনি এই মনোভাব নিয়ে বের হয়ে এসেছেন যে, প্রেসিডেন্ট আসাদ মেধাবী ও যুক্তিসঙ্গত পুরুষ কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

কিসিঞ্জার বলেন যে, তিনি এ অঞ্চলের বহু নেতার সাথে বৈঠক করেছেন, তবে প্রেসিডেন্ট সাদাতই হলেন একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী, রাজনৈতিক স্বচ্ছদৃষ্টি, হেকমতের সাথে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা, এসব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর (কিসিঞ্জারের) পৌঁছার কয়েক ঘণ্টা আগেই মহামান্য প্রেসিডেন্টের নিকট আমার রিপোর্ট পৌঁছে দেবেন। আমাকে অনুরোধ করেন যেন মহামান্য প্রেসিডেন্টকে এ নিশ্চয়তা জানাই যে, তাঁর সাথে ইতোপূর্বে তিনি যে সব বিষয়ে একমত হয়েছিলেন তা বাস্তবায়নে তাঁর আগ্রহ অব্যাহত রয়েছে।

– "আশরাফ গেরবাল।"

কিসিঞ্জার আসোয়ানে পৌঁছলেন এবং প্রেসিডেন্ট সাদাত-এর সাথে দেখা করেন। সহসাই দেখা গেল ওয়াশিংটনে আশরাফ গেরবালকে যা ব্যাখ্যা করেছিলেন তা থেকে তার আসল মতলব সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে পুরনো আসোয়ানের বাঁধের উপর অবস্থিত তার অবকাশ উদ্যানে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে দেখা গেল হেনরি কিসিঞ্জার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্থিতিকে তুলে ধরছেন। এর সারবত্তা হলো, ইসরাইলী সামরিক কর্তাব্যক্তিরা বিশেষ করে তাদের প্রধান পুরুষ মিস্টার দায়ান তাঁদের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার ও ইসরাইলী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে এবং তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। এটা বিশেষ করে জেনারেল দায়ানের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য তাকেই এ অবস্থার চাবি মনে করা হয়। কিন্তু তার চেষ্টা-তদরিব প্রত্যাশিত ফল বয়ে আনেনি। তবে তিনি একটি মধ্যস্থতায় উপনীত হয়ে তা-ই এখন পাড়তে চাচ্ছেন। এই মধ্যস্থতায় তার যুক্তি হচ্ছে ঃ

১. সুয়েজ খালের পশ্চিম তীর থেকে সকল ইসরাইলী বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি করার অধিকার প্রেসিডেন্ট সাদাতের রয়েছে।

২. অথচ ইসরাইল দ্বিপাক্ষিক প্রত্যাহারের উপর গোঁ ধরে বসে আছে।

৩. এদিকে মিসর ভূমির অভ্যন্তরীণ লাইন থেকে মিসর বাহিনীকে প্রত্যাহার করাও প্রেসিডেন্টের পক্ষে সম্ভব নয়।

৪. অবস্থা যখন এই তখন মধ্যস্থতার যে প্রস্তাবটি করা হচ্ছে তা হচ্ছে ইসরাইল পশ্চিম তীর থেকে সরে যাবে। বিনিময়ে মিসর পশ্চিম তীরে তার বাহিনীর সাইজ অনুসারে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে (নিজ স্থানে থাকবে না)।

৫. এরপর কিসিঞ্জার আরও বলেন যে,পূর্বে ইসরাইলী প্রত্যাহার কতদূর পর্যন্ত হবে তা নির্ভর করবে পশ্চিমে মিসরী লাইনে সামরিক ঘনত্ব কতটুকু পাতলা হবে তার উপর।

দেখে মনে হচ্ছিল যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত এসব শোনার সময় খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। কিসিঞ্জারের জবাব ছিল–তিনি একটি মধ্যস্থতায় পৌঁছার জন্য জানপরান চেষ্টা করেছেন। বদলে এখন যেখানে উপনীত হলেন তা হচ্ছে সমাধান প্রক্রিয়া বিব্রতকর ও বিপদ সীমায় এসে থেকে যাচ্ছে। মধ্যস্থতা এখন যা হলো, এতে মিসরী লাইনগুলো তার স্ব-স্থানেই থেকে যাচ্ছে। আর সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ অনুপাতে ঘনত্ব হালকা করার বিষয়ে বলা যায় যে, সেটা কেউ কখনও অনুভব করতে পারে না। কাজেই প্রেসিডেন্ট সাদাত তার দেশে বা আরব দেশগুলোর জনমতের সামনে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার কোন কারণ ঘটবে না। এরপর কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট সাদাতের সংবেদনশীল স্নায়ুতে একটি পরশ বুলিয়ে বললেন, কেউ

নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না, মিসরী লাইনের অভ্যন্তরভাগে অচিরেই কি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি অঙ্গীকার করছেন যে, যে চুক্তিতেই উপনীত হন না কেন তা গোপনীই থাকবে। কিন্তু এই গোপন বিষয়টি একটি পক্ষের কাছে অবশ্য গোপন থাকবে না। সে হচ্ছে খোদ মিসরী বাহিনী। তবে যদি প্রেসিডেন্ট কোন বিপদের আঁচ করেন যে, তাঁর ইস্যুকৃত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মিসরী সামরিক কমাণ্ড বেঁকে বসতে পারে, তাহলে তা ভিন্ন কথা। প্রেসিডেন্ট সাদাতের অহংবোধে কথাটি বেশ লাগল, অন্য যে কোন কারণের চেয়েও বেশি। তাই তৎক্ষণাত বলে উঠলেন, "আমার বাহিনী আমার নির্দেশ মেনে চলে এবং আমার নেতৃত্বের প্রতি অনুগত। আমি যে নির্দেশই জারি করি, তারা তা অচিরেই বাস্তবায়ন করবে।" কথাটি কিসিঞ্জার হাওয়া থেকেই লুফে নিয়ে প্রেসিডেন্টকে বললেন, "ও তাহলে তো আমি যে, মধ্যস্থতার কথা প্রস্তাব করতে চাচ্ছি তা বাস্তবায়নযোগ্য। এতে ইসরাইলও সান্ত্বনা পাবে এবং ওখানকার সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যকার জটিল গিটটিও খুলে যাবে।"

কিসিঞ্জার তার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে তার এই বিরাট ছাড়ের জন্য যথেষ্ট মূল্য ইসরাইল থেকে আদায় করে দিবেন। এবং আশা করেন যে প্রেসিডেন্ট এটাকে তার ব্যক্তিগত অভিমত ছাড়াই গণ্য করবেন, ইসরাইলের জন্য নয়।

তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে লাগলেন। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি নীতিগতভাবে প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছেন। মনে হলো, যা ঘটল কিসিঞ্জার ঠিক সেটাই আশা করেছিলেন। তখন তিনি তার ব্যাগ থেকে এক অভিনব দলিল বের করলেন। সেখানে শব্দগুলো লেখা ছিল কেবল সেগুলোর সামনে সংখ্যার স্থানগুলো খালি রয়েছে। এটা যেন সনাতন আমলের চুক্তিনামা বা বিভিন্ন পক্ষ কেবল সংখ্যা পূরণ করে যে কোন চুক্তি করার একটি রেডিমেড ফরম। এর ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

আমেরিকার গোপনীয় প্রস্তাব

মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে চুক্তি সহজীকরণের আগ্রহ ও চুক্তির অংশ হিসাবে এবং অস্ত্রবিরতির পূর্ণ পরিবীক্ষণ বাস্তবায়নের প্রত্যাশায় যুক্তরাষ্ট্র নিম্নলিখিত প্রস্তাব করছে ঃ

১. কিছু সীমিত অস্ত্রের অঞ্চল থাকবে, যা চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে। তা হচ্ছে ঃ

(ক) যা... (শূন্যস্থান) সশস্ত্র বাহিনীর ব্রিগেড থেকে এবং ... (আরেকটি শূন্যস্থান) ট্যাঙ্ক থেকে বেশি হবে না।

(খ) এমন কোন স্থল অস্ত্রশস্ত্র থাকবে না যা একটি পক্ষের অবস্থান থেকে অন্য পক্ষের নিকট পৌঁছাতে পারে। (এ ছিল ইসরাইলী বাহিনী যে স্থানে প্রত্যাহার করা

হবে তা থেকে গুলি ছোড়ার লক্ষ্যস্থলের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক নীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে)।

২. এটা হবে মিসরী লাইনের ৩০ কিলোমিটার পশ্চিম থেকে পূর্বে ইসরাইলী লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আকাশ প্রতিরক্ষার জন্য কোন ক্ষেপণাস্ত্র রাখা যাবে না।

৩. এ সকল শর্ত বাহিনীর সাইজ অনুসারে প্রযোজ্য হবে। উভয় পক্ষের মধ্যে 'লিয়াজোঁ ছিন্নের' চুক্তির মুহূর্ত থেকে এর কার্যকারিতা শুরু হবে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে কেবল রেডিমেড চুক্তিনামা বা ফরমে শূন্যস্তান পূরণ করা। এর আবেদন অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট সাদাত নিম্নরূপে তা গ্রহণ করেন ঃ

১. স্থলবাহিনী সম্পর্কে তিনি শূন্যস্থানে লেখেন– ('যেখানে মূল কিসিঞ্জার ফরমে' লেখা ছিল–... বেশি নয়, তার সামনে) "৮ ব্যাটালিয়ন ও ৩০ ট্যাঙ্কের বেশি নয়।"

২. ক্ষেপণাস্ত্র ও আর্টিলারি প্রসঙ্গে কিসিঞ্জার ফরমের শূন্যস্থান পূরণ করা হয় এভাবে "এন্টি ট্যাঙ্ক আর্টিলারি মর্টার গোলন্দাজ ও ১২২ মি.মি. মডেলের হারওর্টজার আর্টিলারির অনূর্ধ্ব ৬ ব্যাটারি– যার পাল্লা ১২ কি. মিটারের বেশি নয়– এতদ্ব্যতীত কোন আর্টিলারি অবশ্যই রাখা হবে না।

৩. এয়ারফোর্স সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ধারায় লেখা হলো– কোন পক্ষই এমন কোন অস্ত্র রাখবে না যা দিয়ে নিজ নিজ বাহিনী এলাকার উপর উড্ডয়নে কোন জটিলতা সৃষ্টি করা যায় এবং কোথাও কোন স্থায়ী ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। যুদ্ধবিরতি লাইনগুলোতে কোন অবস্থাতেই কোন পক্ষের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৭ হাজারের বেশি হতে পারবে না।

অবশেষে সেই বিখ্যাত মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয় যখন লেঃ জেনারেল জেম্‌সী চুক্তির বিস্তারিত জেনে কেঁদে ফেলেন।

মুহূর্তের জন্য কিসিঞ্জার অস্থির হয়ে উঠলেন, যখন তিনি আসোয়ানের পুরনো কাট্রাক্ট হোটেলের দিকে যাচ্ছিলেন। এখানেই উভয় ডেলিগেট একত্রিত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, মিসরী লাইন হালকা করা এবং কিসিঞ্জার ফরমের শূন্যস্থান পুরণ করার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাত কতটুকু পর্যন্ত চুক্তি করেছেন তা জানানো।

চোখে অশ্রু দেখা যাওয়ার পূর্বে জেনারেল জেমসীর প্রথম মন্তব্য ছিল, "আমরা এ পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে এসেছিলাম আমাদের বাহিনীর কুয়্যতে। তখন ছিল ১ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য ১২০০ ট্যাঙ্ক এবং দু'হাজার পিস আর্টিলারি (গোলা-উৎক্ষেপক)। আর এখন কি এটা কল্পনাও করা যায় যে, এই বাহিনীর বাকি থাকবে কেবল... এখানে এসে থেমে গেলেন এবং রাষ্ট্রদূত এলস ওয়ার্থ (কিসিঞ্জারের সহকারী) এর সামনে থাকা পেপারটির দিকে ইঙ্গিত করলেন। ইনিই আসোয়ান বাঁধের উদ্যানে রেডিমেড চুক্তি ফরমের শূন্যস্থান পূরণের জন্য কি চুক্তি হলো তা উপস্থিত সমাবেশকে অবহিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বিদায় জানাবার আগে এ অনুরোধ জানাতে ভুললেন না, যেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরব তল নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি ত্বরিৎ পদক্ষেপ নেন। কারণ এটা প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরও বেশি দৃঢ়চেতা হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে। প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিসিঞ্জার তার ভূমিকায় এবার দামেস্কে সফরের আশা পোষণ করেন, অন্তত প্রেসিডেন্ট আসাদের মনকে প্রশমিত করার জন্য হলেও। যাতে তিনি আসোয়ানের বৈঠকে যা কিছু হয়েছে এর ব্যাঘাত ঘটাবার মতো কোন হৈ চৈ শুরু করে না দেন। কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে অনুরোধ রাখেন যাতে তিনি সুয়েজ খালের শহরগুলোকে পুনর্নির্মাণের কাজে উঠে-পড়ে লাগেন। প্রেসিডেন্ট তার পক্ষ থেকে কিসিঞ্জারকে এ অনুরোধ করেন যাতে পুনর্বাসন কাজে সহযোগিতা দেন। কারণ তাহলে মিসরী লাইনগুলো থেকে বাহিনী হালকা করার বিষয়টি থেকে সকলের নজর এ দিকে ফেরানো যাবে।

এরপর প্রেসিডেন্ট সাদাত কিসিঞ্জারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সুয়েজ ক্যানেলের নগরগুলো পুনর্নির্মাণ ও নিজ পরিবারে অভিবাসীদের ফেরার কাজে জলদি করা মিসরের উদ্দেশ্য হওয়ার সাথে সাথে ইসরাইলেরও কাংখিত বিষয়। কারণ ইসরাইল চায় পুনর্নির্মাণ ও দেশত্যাগীদের প্রত্যাবর্তনের কাজ শুরুর মাধ্যমে নিশ্চিন্ত হতে। অন্তত এ সময় মিসর হঠাৎ করে তার ওপর হামলা চালিয়ে বসবে না। অনুরূপভাবে মিসরও শান্তির ছায়ায় পুনর্বাসনের নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করতে আগ্রহী।

কিছু সময় পরে প্রেসিডেন্ট সাদাত এ বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে, তিনিই হচ্ছেন সুয়েজ খালের নগরীগুলোকে পুনর্নির্মাণের প্রস্তাবক। যখন স্যার জেমস্ কালাহান-এর সাথে দেখা হলো (ইনি তৎকালীন লেবার পার্টির ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পরবর্তীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী) তখন তার কাছে অনুরোধ করলেন যেন এ সাক্ষাতের পর তিনি ইসরাইলে পৌঁছলে গোল্ডা মায়ারকে এ কথাটি পৌঁছে দেন যে, তার কাছে সুয়েজ খাল নগরীগুলো পুনর্নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করার একটি প্রস্তাব রয়েছে যাতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। কালাহান ঠিক সে কাজটিই করলেন। সে সময় সত্যিকার অর্থে গোল্ডা মায়ারের প্রতিক্রিয়াটি যে কি ছিল তা কেউ পরিমাপ করতে পারবে না। ইনি তো জানতেন যে ক্যানেল নগরী পুনর্নির্মাণের বিষয়ে চূড়ান্ত কথা তো কিসিঞ্জার ও প্রেসিডেন্ট সাদাতের মধ্যে পূর্বেই হয়ে গেছে।

ব্রিটেনের ভাবী প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত তার নেক নিয়ত থেকেই লণ্ডনে ফিরে এসে ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ প্রেসিডেন্ট সাদাতকে একটি পত্র লেখেন ঃ

প্রেরক ঃ রাইট অনারেবল জেমস্ কালাহান,

কমন্স সভা, লণ্ডন

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি। বাহিনীসমূহ সম্পর্কে আপনার বার্তাটি মিসেস মায়ারকে পৌঁছে দিয়েছি। (বাহিনী সম্পর্কে, মানে এক সময় মিসর-ইসরাইল সীমান্তে টহলরত সৈন্য থাকার প্রয়োজন হবে না বলে প্রেসিডেন্ট সাদাতের আশাবাদ)। তিনি এ জন্য আপনাকে তার ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তিনি আমাকে এ অনুরোধও করেন যেন আপনাকে জানাই যে, তিনি সুয়েজ খালের তীরবর্তী (মিসরী) নগরীগুলো পুনর্নির্মাণ আপনার প্রস্তাবনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং আমি যেন আপনাকে দু'টি কথা জানাই ঃ

প্রথমত তিনিও আরেকজন যিনি শান্তি চান। দ্বিতীয়ত, তিনি অচিরেই সম্পাদিত চুক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করবেন। তবে আপনার জেনে রাখা দরকার যে, ইসরাইলী সরকারের কাছে আপনার মনোভাব পেশ করলে তারা আমাকে যা বলেন তাতে মনে হচ্ছে যে কিসিঞ্জারের ফরমূলার সাথে তারা সংহত আছেন। আমি সযত্নে শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কিত আপনার অবস্থান ব্যাখ্যা করি এবং এতে আপনার আগ্রহের ওপর জোর দেই। একই সময়ে এর বাস্তবায়নের পথে যে সব কঠিন সমস্যা পথ আগলে দাঁড়াতে পারে তাও উল্লেখ করেছি। ইসরাইল কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। কাজেই অগ্রগতি অর্জনে কিছু সময় লাগবে।

(এরপর কালাহান নিজ হাতে আরেকটু লেখেন) ঃ মিস্টার উইলসন (লেবার পার্টি প্রধান) মিসর সফরের জন্য আপনার দাওয়াত পেয়ে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা করছেন, যথাসময়ে তিনি এ দাওয়াতে সাড়া দিবেন।

স্বা/

একান্ত আপনার

– 'জেমস্ কালাহান'

কিসিঞ্জার কেবল অক্টোবরের বিজয় ও তার অর্জন নিয়েই খেল তামাশা করেননি বরং তার বালখিল্যতা আরও বহুদূর বিস্তৃত ছিল।

"পবিত্র ও নিষিদ্ধ" বিশ্বাসকে নিয়ে এল ৩০টি ট্যাঙ্ক আর ৬ ব্যাটারী আর্টিলারির ওপর নির্ভরশীলতায়। এগুলোর আওতা ১২ কি. মি. এর বেশি ছিল না। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ঘেরা সেই দুর্লঙ্ঘ্য কৌশলগত কোণের সুবিস্তৃত অঞ্চল কভার দেওয়ার মতো শক্তি তাদের আদৌ ছিল না।

॥ ৬॥

কিসিঞ্জার – ৩

"আমি এ অঞ্চলে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নীতি ব্যাখ্যা করেছি। আমার বিশ্বাস আরব জনমত এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।"

—প্রেসিডেন্ট সাদাতের পক্ষ থেকে ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের প্রতি পত্র

হেনরি কিসিঞ্জারের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে লিয়াজোঁ ছিন্নের প্রথম চুক্তি সমাপন শেষে প্রেসিডেন্ট সাদাত বুঝলেন যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে সাহায্য করার জন্য তার চেষ্টা আরো সুনিবিড় করা প্রয়োজন। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির প্রেক্ষাপটে তার প্রশাসনকে আরেকটু শক্তিশালী করা দরকার। তাতে নিক্সন তার পক্ষ থেকে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি কয়েকটি আরব দেশ সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সফর শেষে এসে তিনি হেনরি কিসিঞ্জারের নিকট লিখলেন। প্রেসিডেন্ট সাদাতের পক্ষ থেকে ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের নিকট পত্র ঃ

ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম

আজ আমি সৌদি আরব, সিরিয়া, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, আবুধাবী, আলজিরিয়া ও মরক্কো সফর শেষ করে ফিরলাম। এখন আমি এ সফরের ফলাফল সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই–

১. লিয়াজোঁ ছিন্নের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার বিরাট প্রচেষ্টার কথা এবং এ সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গঠনমূলক ভূমিকার কথা বুঝিয়ে বলেছি। আমি জানিয়েছি যে, ৬টি পয়েন্টের ধারা–২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটি হচ্ছে নিছক একটি সামরিক চুক্তি।

২. বিভিন্ন আরব দেশের মতো সিরিয়া সফরের সময়ও সিরীয়, ফ্রন্টিয়ারে লিয়াজোঁ ছিন্নের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। আমি উপলব্ধি করেছি যে, এই বিষয়টি গোটা আরব বিশ্বেই বিরাট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হচ্ছে। এ কারণে সিরীয় ফ্রন্টিয়ারে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে অবদান রাখার দায়-দায়িত্ব আমাদেরও আছে বলে এই দেশগুলোতে উল্লেখ করেছি। এ বিষয়টি বাস্তবায়নে আপনার প্রস্তুতির কথা যে আপনার আসোয়ানের বিবৃতিতেও রয়েছে তা উল্লেখ করি। আর আপনি যে সফরের রুট দামেস্কে তারপর ইসরাইলে পরিবর্তিত করেছেন এটাও এ বিষয়ে আপনার

গুরুত্বারোপের প্রমাণ বহন করছে। একই সময়ে আমি দ্বিতীয়বারের মতো এ বিষয়ে দ্রুতগতিতে কাজ করার বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। এতে এ ইস্যুতে ফলোদয় হবে। আমার সিরিয়ার বৈঠকে এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ হয়। আমার মনে হয় এ বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

৩. (জ্বালানি) শক্তি সম্পর্কে আমি পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলোকে সবিস্তারে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছি। তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছি যে, এটা আরবদের পক্ষে অধিকতর ইতিবাচক নীতি গ্রহণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে সুযোগ করে দেবে। কাজেই বিনিময়ে আরবদের পক্ষ থেকেও ইতিবাচক পদক্ষেপ আসা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বাদশাহ ফয়সলের সঙ্গে সুস্পষ্ট সমঝোতায় উপনীত হতে পেরেছি। প্রেসিডেন্ট বুমেদীনও সমঝোতায় এসেছেন।

উপসাগরীয় দেশের কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু নীতিগতভাবে একমত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ের সঙ্গে সিরীয় ফ্রন্টিয়ারে 'লিয়াজোঁ ছিন্নের' বিষয়টি সংশ্লিষ্টতা রাখার অনুরোধ জানান।

৪. আমরা মনে হচ্ছে, জ্বালানি শক্তির বিষয়টি সমাধানের পথেই অগ্রসর হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, সিরীয় ফ্রন্টিয়ারে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে কার্যত দ্রুত আলোচনা শুরুর ব্যাপারে সিরিয়াতে আপনার আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ করলে এ বিষয়ে আমাদের চুক্তি মোতাবেক সফলতা আসতে পারে।

৫. আমি এ কথা বলতে পারি যে, আমার আরব দেশসমূহ সফর এবং সেখানে কয়েকটি সংবাদ সম্মেলন সংঘটিত করার মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সেখানে আমি আপনার ভূমিকাকে তুলে ধরেছি। অনুরূপভাবে, এ অঞ্চলে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নীতিও ব্যাখ্যা করেছি। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, এ সফরের ফলে আরব জনমত সম্পূর্ণভাবে একটি সমঝোতায় পৌঁছে গেছে।

৬. মস্কোয় ইসমাইল ফাহ্মীর আলোচনা সম্পর্কে বলছি– এ বিষয়ে আজ আমার কাছে যে তথ্য এসে পৌঁছেছে যে অনুসারে আমাদের সাধারণ নীতির আঙ্গিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই এগুচ্ছে।

আমি আবারও নিশ্চয়তা জানাতে চাই যে, আমি আমাদের মধ্যে যা যা চুক্তি হয়েছে সে সবের লিয়াজোঁর কাজ করে যাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও আপনার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

– আনোয়ার সাদাত

মনে হয় কিসিঞ্জার চেয়েছিলেন, সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে উৎসাহিত করতে। কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকার স্বার্থাদি সংরক্ষণের তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলটস ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্মীর মধ্যে সাক্ষাৎ হলো।

বৈঠকের পর ইসমাইল ফাহ্মী প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে একটি স্মারক পাঠালেন। এর ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মন্ত্রীর দফতর

বৈঠকের কার্যবিবরণী

কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান স্বার্থাদির তত্ত্বাবধায়ক এ্যাম্বেসেডর এলটস আমার আহ্বানে উপস্থিত হন। বৈঠক নিম্নরূপ আলোচনা হয় ঃ

প্রথমতঃ তিনি জানান যে, তিনি কিসিঞ্জার থেকে একটি পত্র পেয়েছেন। এতে বলা হয়েছে তিনি অচিরেই কায়রোতে আন্তর্জাতিক ব্যাংকের পরিচালক তার বন্ধু মিস্টার রবার্ট ম্যাকেনমারাকে মিসরের পুনর্গঠনের ব্যাপারে যোগাযোগ করার বিষয়টি অবহিত করবেন। এটা হচ্ছে তার ও মহামান্য প্রেসিডেন্টের মধ্যে ইতোপূর্বেকার আলোচনারই ফলোআপ। তিনি বলেন যে, আগামী ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি এ সময়টি তার সফরের পূর্ণতা দেয়ার সময় হিসাবে প্রস্তাব করছেন। এটা প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ তিনি সরকারী বা আনুষ্ঠানিকভাবে মিসরে আসবেন না। বরং ব্যক্তিগতভাবে বা বন্ধুর অনুরোধেই কেবল আসছেন।

আমি তাকে জানালাম যে, আমরা এ সফরকে স্বাগত জানাই। তবে আমার মনে হয়, ম্যাকেনমারা মধ্য ফেব্রুয়ারি বা প্রস্তাবিত তারিখের পরে আসাই শ্রেয়। কারণ প্রস্তাবিত তারিখে মহামান্য প্রেসিডেন্ট লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী মহাসম্মেলনে থাকবেন। কাজেই সে সময় ম্যাকেনমারার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে না।

দ্বিতীয়তঃ কিসিঞ্জার দায়িত্ব দেয়া তিনি ইসরাইলী দু'জন গুপ্তচর মেজরাহী ও লিফিয়ের ব্যাপারে কথা তোলেন। মহামান্য প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে ইতোপূর্বে অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি জানতে চান আমরা কি তাদের মুক্তি দেয়ার যে তারিখ নির্ধারণ করব তা এখন থেকেই ইসরাইলকে জানাবার জন্য আমেরিকান পক্ষকে অনুমতি দেব কি না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্মী ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলটস-এর মধ্যকার একই বৈঠকে কিসিঞ্জার এটাই চাচ্ছিলেন যে পুনর্গঠন কাজে সাহায্যের ছুতায় তাঁর বন্ধু ম্যাকেনমারা গোপনে ব্যক্তিগত সফরে মিসরে আসার আগেই যেন মিসরে অবস্থিত আমেরিকান কোম্পানিগুলো দ্রুত কিছু অর্জন করে নিতে পারে। দেখা গেল, একই সাক্ষাৎকার বিবরণীতে ইসমাইল ফাহ্মী এলটসের বরাতে লিখছেন ঃ

তিনি আরও বলেন যে, সুয়েজ ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে তেলের পাইপ লাইন প্রকল্প সম্পর্কে আমেরিকান কোম্পানির গ্রুপ ও সংশ্লিষ্ট মিসরী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা যেখানে গিয়ে ঠেকেছে, তিনি তা আমাকে অবহিত করতে চান। তিনি বলেন, আমেরিকান গ্রুপ ৩০ জানুয়ারি একটি পত্র পেয়েছে যাতে মিসরী পক্ষ ধরে

নিচ্ছে যে, তার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি এখন কার্যকর যোগ্য হয়ে গেছে। বিশেষ করে, ইতোমধ্যে 'সুমিদ' কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। কিন্তু পরদিনই গ্রুপ মিসরী পক্ষের অন্য একটি ভূমিকায় চমকে গেল, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতোমধ্যে কার্যত সুমিদ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার ফলে সে, কখনই নতুন করে আলোচনা শুরু করবে না। কাজেই এখন থেকে সরাসরি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রদূত বলেন যে, এতে আমেরিকান গ্রুপকে বড়ই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা হয়েছে। কারণ আমদানি চুক্তিটি বিভিন্ন কোম্পনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদের সঙ্গে চুক্তিটি ৩১ তারিখেই কার্যকর হয়ে গেছে। এ কারণে এ ব্যাপারে আলোচনার দুয়ার আবার খোলা একান্ত আবশ্যক হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ দর ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ কথার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, যেখানে মিসর আমেরিকান সাহায্য কামনা করেছে সেখানে এখন তাকেই আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে সাহায্য করতে হচ্ছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর থেকে আরব তেল অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার বিষয়টি সকলের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। মনে হয়, বাদশাহ ফয়সল তাঁর সমর্থনের জন্য এই শর্তারোপ করেন যে, জানুয়ারির শেষের দিকে কংগ্রেসের সামনে ঐক্যের অবস্থা সম্পর্কে যে ভাষণ দিবেন তাতে এ নির্দেশনা থাকতে হবে যে সিরীয় ফ্রন্টিয়ারে লিয়াজোঁ ছিন্নের (যুদ্ধবিরতির) চুক্তি উপনীত হওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়নে সহযোগিতায় তাঁর দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর ভাষণে বাদাশাহ ফয়সলের দাবিতে সাড়া দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইঙ্গিতটি বাদশাহ্র আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক ছিল না। ৪ ফেব্রুয়ারি কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট লিখলেন– যা ছিল বলতে গেলে একটি মাথা গরম করে দেয়ার মতো পত্র। তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ওয়াশিংটন

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

আপনি অবগত রয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও আমি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর থেকে আরব তেল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টাকে অনুসরণ ও মূল্যায়ন করে যাচ্ছি। আমরা উভয়ই বেশ বুঝতে পারছি, এ ব্যাপারে আপনাকে কী বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আপনার সাম্প্রতিক আরব দেশসমূহ সফরকালে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে আপনার ও আপনার কিছু উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছি। এতে করে আমাদের প্রতীতি জন্মেছে যে এই নিষেধাজ্ঞা অচিরেই উঠে যাচ্ছে।

তবে এখন বাদশাহ ফয়সালের একটি পত্র পেয়ে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। এতে তিনি বলেন যে, তিনি বেশ কিছু সংখ্যক আরব দেশের মতমত

নিয়েছেন, এর মধ্যে শেষে দামেস্কে প্রেসিডেন্ট আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর ফলে তিনি ভেবে দেখেছেন যে, সিরিয়া ও ইসরাইলের বাহিনীগুলোর মধ্যে লড়াই বন্ধে উপনীত না হলে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া আদৌ সম্ভব নয়। এর ভিত্তিতে তিনি আমাদের কাছে তাঁর আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, ১৪ ফেব্রুয়ারি তেল উৎপাদনকারী দেশসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পুর্বে সিরিয়া-ইসরাইলী ফ্রন্টিয়ারে যুদ্ধবিরতিতে উপনীত হতে পারলে এ লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টায় হয়ত সহায়ক হতে পারে। অন্যথায়– তিনি যা আমাদের জানান– ফলাফল নেতিবাচকই হবে। এই ফলাফল নিঃসন্দেহে আপনার কাছে শোনা খবরের উল্টো। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লেখা আপনার ২৭ জানুয়ারি পত্রের বরখেলাপ। ঐ পত্রে আপনি জানিয়েছিলেন যে, আপনার কূটনৈতিক চেষ্টা তদবিরে বাদশাহ ফয়সল নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিতে রাজি হয়েছেন। একইভাবে বাহরাইন, কাতার ও আবুধাবীর সরকারগুলোও এই পদক্ষেপে একমত হয়েছে।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট,

আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, বাদশাহ ফয়সলের পক্ষ থেকে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত আচরণের সাথে জড়িত অস্থিরতার কারণগুলোর গুরুত্ব আপনি সম্যকভাবে বোঝতে পারছেন। বিশেষ করে তাঁর সরকার বেশ কয়েকবার আমাদের জানিয়েছে যে, সে নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ সংখ্যক সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। এরপর বাদশাহ ফয়সল আমাদেরকে আমাদের নেক নিয়ত প্রকাশের অনুরোধ করেন। এভাবেই আমরা ৬ নভেম্বরে ৬ পয়েন্টের চুক্তিটি সম্পাদনেও সাহায্য করি। এরপর আমরা মিসরী ফ্রন্টিয়ারে যুদ্ধবিরতির (লিয়াজোঁ ছিন্নের) সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এতে সুয়েজ ক্যানেলের পূর্ব তীরে ইসরাইলী বাহিনী প্রত্যাহারের বিষয়টি ছিল। এখন আমাদের কাছে আরেকটি পূর্বশর্ত চাচ্ছেন তা হচ্ছে সিরীয় ফ্রন্টিয়ারে যুদ্ধবিরতি (লিয়াজোঁ ছিন্ন) । এ শর্তটিকে আমাদের কাছে কার্যত অসম্ভব মনে হচ্ছে। বিশেষ করে বাদশাহর চাহিদা অনুযায়ী ১৪ ফেব্রুয়ারির আগেই।

আমার আস্থা রয়েছে যে, আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন, যখন আমি বলছি যে, এহেন অবস্থায় আমি ও আপনি যে ভূমিকার কথা সবিস্তারে আলাপ করেছিলাম তা এখন পালন সম্ভব নয়। আপনার পত্রের মাধ্যমে আমি জানি যে, আপনি সম্যকভাবে বুঝতে পেরেছেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আসন্ন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তেল নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার খবর দিতে পারার কী গুরুত্ব রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন আপনাদের সাথে সহযোগিতা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আরবরা এভাবে তাঁর বর্তমান সমস্যার ওপর আরও ভার রাজনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দিবেন। এই ভার অচিরেই যুক্তরাষ্ট্র ও মিসর কর্তৃক অর্জিত সাম্প্রতিক মাসগুলোর সফলতাকে হ্রাস করে

দিতে বিরাট প্রভাব ফেলবে। আমার ভয় হচ্ছে, আপনাকে আমি একথা বলতে হয় কিনা যে, যদি তেল অবরোধ উঠে না যায় তাহলে এ বিষয়ে তাঁকে আরবরা যে অঙ্গীকার দিয়েছে তা প্রকাশ করে দেয়া ছাড়া প্রেসিডেন্টের গত্যন্তর থাকবে না। এটা আরবদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে এবং আরব রাজনৈতিক নেতাদের জ্ঞান-গরিমায় বিরাট ক্ষতি সাধন করবে। অনুরূপভাবে একটি সমাধানে পৌঁছার ব্যাপারে এদেশে একটি সমর্থন গড়ে তোলার জন্য আমার ও প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রচেষ্টাও ক্ষতি হবে। প্রিয় প্রেসিডেন্ট, সেটা যদি আমরা হতেও দেই তাহলে তা হবে এক হতাশাব্যঞ্জক বিষয়। এছাড়াও ব্যাপারটা তখন আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা গভীর সমঝোতারও বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। এই নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকলে কি ধরনের পরিণতি হতে পারে তার বাস্তবতা আমি স্পষ্ট করে না বললে আমি নিজেকে দোষী গণ্য করব।

আসলে সিরিয়ার সাথে যুদ্ধবিরতি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি আর অপেক্ষা করতে পারছে না। যাহোক, আপনি তো জানেন, আমেরিকা সরকার এ বিষয়ে অঙ্গীকার করেছে। আমিও আপনাকে আমার ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা দিয়েছি। আমি মনে করি, মার্চ মাসের শুরুতে এটা ঘটার সুযোগ রয়েছে। তবে যদি নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয় (এই শর্তে)।

এ প্রক্রিয়ার জন্য বিরাট চেষ্টা তদবিরের প্রয়োজন রয়েছে। আমার বিশ্বাস, এটা করা আমাদের জন্য অসম্ভব হবে, যদি কংগ্রেস দেখে যে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের ব্যাপারে তাদের জন্য এতকিছু করা সত্ত্বেও আরবরা এখনও আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখছে। আমি আশা করি, আপনি সাধ্যমতো সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবেন যাতে বাদশাহ ফয়সল ও প্রেসিডেন্ট আসাদকে বোঝাতে পারেন যে, ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য তেল উৎপাদনকারী দেশসমূহের সম্মেলনের আগে বা তা চলাকালীন তাৎক্ষণিকভাবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র যা অঙ্গীকার করেছে তা করেছে। এখন আরবদের পালা–তারা যা অঙ্গীকার করেছে তা করে দেখাবে। আমি আশা করি, আমাদের উভয় সরকার বহু কষ্ট ও জোর চেষ্টা চালিয়ে যে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে তা যেন কোন বিপদের সম্মুখীন না হয়।

আপনার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

– হেনরি কিসিঞ্জার

অব্যাহত থাকলে এর গুরুত্ব হারিয়ে যাবে। বরং এটা একটা ট্যাজেডিতে পরিণত হবে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখন প্রচণ্ড চাপের নিচে রয়েছেন বরং ব্যক্তিগতভাবে তাদের অভিযুক্ত করতে হচ্ছে যে, তারা উভয়ে আসলে ইসরাইলের বিরুদ্ধে এবং আরব স্বার্থের পক্ষে একটি ভারসাম্যহীন সমাধানের সূচনা করেছেন।

এরপর আমি উল্লেখ করলাম যে, যদি এই নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকে তাহলে যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে এর জন্যও সরকারের সমালোচকরা অভিযোগ আনবে এবং

তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, আরবরা প্রত্যুত্তর করতে অক্ষম। এভাবেই তাদের শক্রদের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তাদের জন্য যত কিছুই করুকই না কেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের শক্রতা করেই যাবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। আমি দুঃখিত যে বাদশাহকে স্পষ্ট করে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ১৪ ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপলীতে অনুষ্ঠিতব্য তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর বৈঠকের আগে বা তার পূর্বেই যদি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা না হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র শান্তির পথে তার সকল প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেবে।

তখন এ সঙ্কট থেকে যে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তাতে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যকার ঐতিহ্যগত সম্পর্কের ওপর যেন বেশি প্রভাব না পড়ে সে আশাই করছি। প্রেসিডেন্ট সাদাতকে সন্ত্রাসী পত্র দেয়ার পর এবার বাদশাহকে খোলাখুলি সতর্কবার্তা দেয়া হলো। ১৮ মার্চ আলজিরিয়াতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্রের ওপর থেকে তেল নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। বাদশাহ ফয়সল তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত থেকে এই মর্মে একটি পত্র তলব করেন যে, "তেল অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে লড়াইয়ের স্বার্থেই" এবং মোকাবিলাকারী দেশগুলোই তা চাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট আসাদ বাধ্য হয়েই এ পত্রের প্রেক্ষিতে এই পক্ষে অঙ্গীকারের বিনিময়ে তাতে সায় দেন যে, সিরীয় ফ্রন্টিয়ারে লিয়াজোঁ ছিন্নের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হবে। আর এটা কার্যত ৩১ মে ১৯৭৪-এ গিয়ে সম্পন্ন হলো। এতসব কিছুই শেষ পর্যন্ত রিচার্ড নিক্সন ও তার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগিরির শেষ পরিণতিতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। দেখা গেল ১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট এক আদেশ জারি করে কংগ্রেসের বিশেষ তদন্ত কমিটি তলবকৃত ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ৬৪টি ক্যাসেট হস্তান্তরে বাধ্য করেন।

৫ আগস্ট বিশেষ কমিটি (২৩ জুন, ১৯৭২-এর) একটি ক্যাসেট-এর ভাষ্য প্রকাশ করেন। এতে নিক্সনের নিজকণ্ঠে একটি নির্দেশ ছিল–তিনি সিআইএ ও ফেডারেল গোয়েন্দা অফিসকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির তদন্তে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়।" এতে নিক্সনের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে গেল যাতে কংগ্রেসে মিথ্যা বলা, ন্যায়বিচার বিঘ্নিত করা ও আইন অমান্য করার জন্য নিক্সনের বিচার করার সুযোগ করে দিল।

৮ আগস্ট রিচার্ড নিক্সন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে তার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন এবং তিনি ৯ আগস্ট চূড়ান্তভাবে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অসময়ের খেল

যখন কোন নীতি তার লক্ষ্যের স্পষ্টতা হারায় তখন দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ইতিহাস গড়ার কাজে অংশগ্রহণে ভূমিকা রাখা ছেড়ে দিয়ে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা প্রণয়নে ডুবে থাকে। এটা যে কেবল লক্ষ্য ও নীতির মূল্য হ্রাস করে দেয় তাই নয়, বরং সে সব দায়িত্বশীল লোকের মূল্য ও মর্যাদারও পতন ঘটায়।

॥ ১ ॥

ফোর্ড

"বাপু, প্রেসিডেন্ট সাদাতকে গিয়ে বলো, আমেরিকানরা তাঁকে কখনই তাঁর প্রত্যাশিত অস্ত্রশস্ত্র দেবে না।"

—প্রেসিডেন্ট সাদাতের বিশেষ দূতের প্রতি বাদশাহ ফয়সল

১৯৭৪ সালের ৯ আগস্ট জেরাল্ড ফোর্ড আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এর অর্থ হচ্ছে, হোয়াইট হাউসে নতুন আগন্তুক এসেছেন। সব কিছু এখন জিরো পয়েন্ট থেকে নতুন করে শুরু হবে। হয়ত শূন্য থেকেও কম থেকে। কারণ নতুন প্রেসিডেন্ট কোন রাজনৈতিক ঘাঁটি থেকে আসেননি। বরং এ ছিল প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মনোনয়ন যা কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব রাখলে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস তা অনুমোদন করেন। এমন অভিনব পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এর আগে কখনও ঘটেনি।

সংবিধান অনুসারে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, কোন কারণে যদি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তার মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারেন ভাইস প্রেসিডেন্ট 'স্পেরো এগনিও', প্রেসিডেন্টের বাকি মেয়াদ পূর্ণ করবেন। কিন্তু ঘুষের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কয়েক মাস আগেই স্পেরো এগনিও তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন। কারণ তিনি একটি বড় ঠিকাদারী কোম্পানির কাজ সহজ করে দেয়ার বিপরীতে বড় অঙ্কের অর্থ চেয়েছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হওয়ায় কংগ্রেসের ওপর দায়িত্ব বর্তায় যেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যিনি তাঁর মেয়াদ পূর্ণ করতে অক্ষম–তাঁর মনোনীত একজনকে নির্বাচন করবেন। কাজেই নিবিড় শলাপরামর্শের পর জেরাল্ড ফোর্ডকে নির্বাচন করা হয়। নিক্সন হোয়াইট হাউস ত্যাগ করার এক মিনিট পরই তিনি শপথ গ্রহণ করেন।

এ অবস্থায়, জেরাল্ড ফোর্ড ছিলেন যে কোন বিচারে একজন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট। অস্থায়ী এ হিসাবে যে, তাঁর কোন নির্বাচনী ভিত্তি নেই। কোন স্বতন্ত্র সাংবিধানিক ভিত্তিও নেই।

–অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এ বিবেচনায়ও যে, তাঁর কাছে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে কেবল তাঁর পূর্বসূরির মেয়াদপূর্ণ করা।

–অস্থায়ী এ অর্থেও যে, তিনি পূর্বোক্ত কারণে নতুন কোন নীতিও গ্রহণ করার অধিকার রাখেন না।

এরচেয়ে বড় সমস্যা ছিল তিনি ছিলেন একজন দুর্বল প্রেসিডেন্ট এবং নিক্সনের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার কারণে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু। নিক্সনের এ শর্ত মেনেই তিনি এসেছিলেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আরেকটি বাস্তবতা। তা হচ্ছে, ফোর্ড যদি তাঁর গদি শক্ত করতে সক্ষম হন তাহলে তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টি থেকে নভেম্বর '৭৬-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য মনোনীত হতে পারবেন।

কিন্তু সাধারণভাবে আরবদের অবস্থানের জন্য তারা হোয়াইট হাউসে বাসকারীর সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিল। কারণ পদত্যাগী সাবেক প্রেসিডেন্ট তাঁর গদি শক্ত করার অজুহাত দেখিয়ে সব ধরনের ছাড় অর্জন করে নিয়েছিলেন। যাতে তিনি ইসরাইলের মোকাবিলায় শক্ত ও জোরালো অবস্থানে থাকতে পারেন। কিন্তু বিধিবাম, তিনি তো সব সুবিধাই আরবদের কাছ থেকে আদায় করে নিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে বা হোয়াইট হাউসে তাঁর গদি রক্ষাও করতে পারলেন না। এ কারণেই আরব পক্ষগুলো একটি ভিত্তি বা বিনিময়ে অন্য কাউকে পাওয়ার আবশ্যকতা প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছিল। এ প্রেক্ষাপটেই সেই আগস্ট মাসেই মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। তাঁর পিছনেই গেলেন বাদশাহ হুসেইন! এ দু'জনের পিছনে গেলেন আব্দুল হালীম খাদ্দাম, সিরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁরা সবাই নয়া প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করেন। স্বভাবতই তার পূর্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কারণ, ফোর্ড তাঁকে একই পদে বহাল রাখেন। বেশ কিছু কারণে তাঁকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল না। প্রথমত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনিই নিক্সন থেকে ফোর্ডের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি সমাধান করেন। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য নীতিই ছিল সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সাফল্য। বরং বলা যায় এ ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার একটি বিকল্প।

রাবিন তাঁর পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হিসাবে তিন আরবের পর পরই ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাড়িঘড়ি করে আইজ্যাক রাবিনের ওয়াশিংটন সফরের উদ্দেশ্য একটি লক্ষ্যেই সীমিত ছিল। তা হচ্ছে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সূচনাতেই আমেরিকার নতুন প্রশাসনের কাছে এ অনুরোধ করা যেন তাঁর মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সমাধান প্রক্রিয়ায় মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে যোগসূত্র না রাখা হয়। কাজেই যখন মিসরের সাথে বিভিন্ন বিষয় "লিয়াজোঁ ছিন্ন" থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণ সম্ভব হতে যাচ্ছে।

তখন সিরীয় ফ্রন্টিয়ার চূড়ান্ত সমাধান ছাড়া অন্য কিছু হিসাবেই রাখেনি। কাজেই দু'টি ফ্রন্টিয়ারে কোন ভারসাম্যপূর্ণ নীতির চিন্তা-ভাবনা ইসরাইলের পক্ষে খুবই বিব্রতকর।

সকল সাক্ষাৎ প্রার্থীকেই তিন আরব আর ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীকে জেরাল্ড ফোর্ড অচিরেই এ অঞ্চলে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে পাঠাচ্ছেন। তিনিই খতিয়ে দেখবেন, পরিস্থিতি কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায়।

২০ অক্টোবর, ১৯৭৪। হেনরি কিসিঞ্জার এবার জেরাল্ড ফোর্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে এ অঞ্চলে পৌঁছলেন। দেখা করলেন প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে। প্রেসিডেন্ট সাদাত এবার দেখলেন হেনরি কিসিঞ্জার লিয়াজোঁ ছিন্নের দ্বিতীয় চুক্তি সম্পাদনে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর নিকট তাঁর দাবিগুলো আরেকটু হালকা করার অনুরোধ করছেন। কিন্তু তিনি এতে বেশি একটা চমকালেন না। এ চুক্তি করতে চান ফোর্ড। একই সময়ে তিনি এটাও জানেন যে, এতে ইসরাইল এমন কোন ছাড় দাবি করতে পারবে না, যার কোন মূল্য আছে। কিসিঞ্জার এসে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সামনে জেরাল্ড ফোর্ডের হাল হকিকতের লম্বা চওড়া ফিরিস্তি দিতে লাগলেন। অথচ প্রেসিডেন্ট সাদাত দারুণভাবে মনমরা হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে তিনি ২৮ অক্টোবরে নির্ধারিত আরব শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেয়ার উদ্দেশে রাবাত সফর করতে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত চমকে উঠলেন, কিসিঞ্জার তাঁর উদ্দেশ্যে যা বলছেন এতো বলতে গেলে রীতিমতো সতর্কীকরণ।

এটা জানাই ছিল যে, রাবাত সম্মেলনে উত্থাপিত প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে এমন একটি সিদ্ধান্ত বিল যাতে বলা হবে যে, ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থাই (পিএলও) হচ্ছে ফিলিস্তিন জাতির একমাত্র বৈধ ও আইনগত প্রতিনিধিত্বকারী। এই বিলটিতে সাধারণভাবে আরব অক্ষমতাই প্রতিফলিত হয়েছে। অক্টোবর যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনীদের কোন কিছু দিতে আসলেই আরবরা ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যর্থতা ঢাকার জন্য তারা এর আকার–আকৃতিকে অতিরঞ্জিত করে দেখতে চেয়েছে। যা হোক এই সিদ্ধান্ত বিলটি পিএলও'র চাহিদার সাথে সঙ্গতিশীলই ছিল। কারণ এ সংস্থা দেখল, অক্টোবর যুদ্ধের পর আরব দেশগুলো ফিলিস্তিন ইস্যুকে বাদ দিয়ে যতদূর সম্ভব নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টাতেই নিরত হয়ে গেছে। অবস্থা যখন এই, তখন ফিলিস্তিনীরা নিজেদের ইস্যুতে নিজেরাই কাজের দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার জন্য এগিয়ে আসাই শ্রেয়। এসব বাস্তবতা সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হেনরি কিসিঞ্জার চাচ্ছিলেন না যে, ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থাকে ফিলিস্তিনীদের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তার মূল্যায়নে এতে ব্যাপারটা সহজ হওয়ার বদলে আরও জটিল হয়ে পড়বে। কাজেই, তাঁর মতে জর্ডানী এখতিয়ার হচ্ছে– সমাধান নিজে থেকেই আসবে। তাছাড়া তিনি তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি হিসাবে ইসরাইলী দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেন। তাঁরা বলেন যে, পিএলওকে ফিলিস্তিন জাতির একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দিলে এক সময় এ সংস্থাটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ফিলিস্তিনী অস্তিত্ব (রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে পারে।

অবশেষে হেনরি কিসিঞ্জার চাইলেন যেন রাবাত সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তটি পাস হয়ে না যায়। ন্যূনপক্ষে তিনি চাচ্ছিলেন যেন, অন্তত মিসর এ ব্যাপারে সম্মতি না

জানায়। বরং তাকে অনুরোধ করল যেন এটা ইস্যু না হয় বরং সে তা প্রত্যাখ্যান করে।

কিসিঞ্জারের কায়রো সফরের সময় কিছু করা সম্ভব ছিল না। কারণ রাবাত সম্মেলনের পূর্বে সময় খুব সঙ্কীর্ণ। প্রেসিডেন্ট সাদাত খুবই বিচলিত বোধ করতে লাগলেন। তিনি এতটা বিমর্ষ হলেন যে, নিজে উদ্যোগী হয়ে দীর্ঘ আট মাসের পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের পর মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। হাইকাল প্রেসিডেন্ট সাদাতের এই যোগাযোগ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের আমন্ত্রণে বিস্মিত হন। যখন তিনি তাঁর বাসভবনে পৌছলেন, দেখলেন তিনি বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তাঁর অপেক্ষা করছেন। এরপর তিনি তাঁর সাথে পিরামিড অবকাশ কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এখানে উভয়ের মধ্যে চারঘণ্টা স্থায়ী বৈঠক হয়। তিনি উভয়ের মধ্যে আট মাস আগে ভিন্ন পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠক থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তাঁর দুশ্চিন্তার কারণগুলো সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন।

দক্ষিণ ইয়েমেনের সাথে সৌদি আরবের বিশেষ সম্পর্ক বিষয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রস্তাব রাখেন যে, তিনি একজন দঃ ইয়েমেনী দায়িত্বশীলের সৌদি আরব সফরের ব্যবস্থা করতে চান যাতে দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান বিবাদ মিটে যেতে পারে। কিন্তু বাদশাহ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মহামান্য প্রেসিডেন্টের আলোচনাটি ব্যাখ্যা করলাম। বললাম, এ মুহূর্ত পর্যন্ত মহামান্য প্রেসিডেন্ট জানেন না যে, মিসরী ফ্রন্টিয়ারে বাহিনীগুলোকে প্রত্যাহার করা হবে কি না বা কোন সীমা রেখা পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হবে। কিসিঞ্জার ওয়াদা করেছেন যে, ইসরাইল থেকে ফিরে এসে তিনি নতুন পরিকল্পনা পেশ করবেন। আমি তাঁকে বললাম যে, মহামান্য প্রেসিডেন্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট তিনটি জিনিস দাবি করেন ঃ

(ক) মিসরী ফ্রন্টিয়ারে বাহিনী বিয়োজন এমনভাবে করতে হবে যাতে এতে চলাচলের পথ আর তেল ক্ষেত্রগুলো থাকে।

(খ) সিরীয় ফ্রন্টিয়ারেও বাহিনী বিয়োজন (প্রত্যাহার) করতে হবে।

(গ) যুক্তরাষ্ট্র পিএলওকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সে অনুসারে তার সাথে সরকারী যোগাযোগ করতে হবে।

বাদশাহ বললেন যে, কিসিঞ্জার সৌদি আরব সফরে এলে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন। আমি বাদশাহর কাছে সিরিয়ার বাড়াবাড়ি ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করলাম। তাঁকে বললাম যে, তারা যা দাবি করবে সে ব্যাপারে তারা সত্যনিষ্ঠ নয়। মহামান্য প্রেসিডেন্ট এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আসাদের মহড়ার অর্থ বোঝতে পারছেন না। বোঝতে পারবেন না আসলে সিরিয়া কি চায়.......। কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট যে, সে

আসলে সোভিয়েত নীলনক্সা বাস্তবায়ন করছে। আমি বাদশাহকে (ফিলিস্তিনের) সংগ্রামে মিস্টার প্রেসিডেন্টের ভূমিকা এবং কেন তিনি পিএলওর সকল সদস্যের সাথে বৈঠক করতে চান তা ব্যাখ্যা করে বুঝালাম।

আমি বাদশাহকে জানালাম যে, আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট সাদাতকে জানিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের মাধ্যমে মিসরের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে রাজি হয়েছে। এটা শুনে বাদশাহ আবেগভরে বললেন, "আমেরিকার বড় বড় দায়িত্বশীলদের সাথে আমার প্রত্যেকটি যোগাযোগের সময় তাদের জোর দিয়ে বলেছি যে, মিসরকে তার কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র দেয়া খুবই জরুরী।" তিনি এও বলেন যে, তিনি সৌদি আরবের পক্ষে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে যে কোন অস্ত্র চুক্তিতে স্বাক্ষরে রাজি আছেন। তারপর বললেন, ব্যাটা, প্রেসিডেন্ট সাদাতকে গিয়ে বলো তারা এ সময় কখনও মিসরকে বা সৌদি আরবকে তার প্রত্যাশিত অস্ত্রশস্ত্র দেবে না। কারণ আমাদের জানা।

বাদশাহ বললেন, মিস্টার প্রেসিডেন্টকে এ বিষয়টির প্রতি সজাগ করে দেবেন যে, আমাদের দু'দেশের মধ্যে সন্দেহের দোলাচল সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। কারণ তারা উভয় দেশের মধ্যে কোন সমন্বয় হলে অস্থির হয়ে যায়। কিন্তু তারা সৌদি আরবের পক্ষ থেকে এই অপচেষ্টা সম্পর্কে সতর্ক রয়েছেন এবং মিস্টার প্রেসিডেন্টের সাথে সম্পাদিত ঐকমত্যে অবিচল থাকবেন।

ডক্টর আশরাফ মারওয়ান বলেন, "আমাদের দু'দেশ তথা আরব ইস্যুতে প্রয়োজনীয় যে তথ্য আমাদের আছে আমরা তা প্রেসিডেন্টের কাছে গোপন রাখা আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে করি না।"

বাদশাহ অনুরোধ করে বলেন যে, আগামী ১৯/৩/১৯৭৫ বুধবার কিসিঞ্জার রিয়াদে পৌঁছার পূর্বে কোথায় কি হচ্ছে এবং প্রেসিডেন্টের মতামত আমাদের জানানো দরকার।

বাদশাহর সাথে বৈঠকের রিপোর্ট শেষ করার পর এবার ডক্টর আশরাফ মারওয়ান সৌদি আরবের সিনিয়র আমীরদের সাথে তাঁর বৈঠকের প্রতিবেদন লেখেন ঃ

আমীর ফাহদ (বর্তমানে বাদশাহ ফাহদ) -এর সাথে সাক্ষাৎ ঃ

(ক) তিনি (ফিলিস্তিনীদের) সংগ্রামের প্রতি প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক ভূমিকাকে সমর্থন জানান।

(খ) তিনি আমেরিকার আচরণে তার ও সৌদি দায়িত্বশীলদের উষ্মা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে। এ ছাড়াও আমেরিকানরা যে ইহুদীদেরকে সৌদি আরবে কাজ করা ও সফর করার অনুমতিদানের জন্য সৌদি আরবের ওপর চাপ দিচ্ছে এতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

(গ) তিনি বলেন, আমেরিকান পত্র-পত্রিকায় যেভাবে বাদশাহকে আক্রমণ করা হচ্ছে এতেও তিনি বিরক্ত বোধ করছেন।

(ঘ) বাদশাহর কথাকে সমর্থন করে তিনি বলেন যে, আমেরিকানরা মিসর ও সৌদি আরবের মধ্যকার সম্পর্কে স্বস্তি বোধ করছে না। কারণ তারা আমেরিকার সকল দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দিয়েছে। আমেরিকা প্রতিটি দেশের সাথে আলাদাভাবে ব্যবহার করার নীতিতে চলে। আমেরিকানদের যে কারণে গা-জ্বালা করছে তা হচ্ছে সকল অবস্থান ও ক্ষেত্রে উভয় দেশের পূর্ণ সংহতি ও সমন্বয়।

(ঙ) তিনি আমাকে অনুরোধ করেন যেন আরব দ্বন্দ্ব-বিভেদ সমাধানে মিস্টার প্রেসিডেন্টের প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দেই। বিশেষ করে ইরাক-ইরান, ইরাক-সৌদি, সৌদি ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের মধ্যকার বিবাদ নিরসনের ক্ষেত্রে তাঁর চেষ্টা ধন্যবাদাহ'। তিনি ৫ এপ্রিল ইরাকে সরকারী সফরে যাচ্ছেন।

(চ) আমি ডঃ হেজাতীর বরাতে তাকে যেসব অভিযোগ জানালাম, তার উত্তরে তিনি জানালেন যে, এর কারণ হচ্ছে— মিসরী প্রতিনিধি দল সৌদি আরব পৌঁছল অথচ কামাল আদহাম বা আমীর ফাহদকে তার পৌঁছার সময় বা আগমনের উদ্দেশ্য জানানো হয়নি। তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব সকল সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রিন্স সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ

আমীর সুলতান আমার সাক্ষাৎ চান এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো জানান ঃ

(ক) তিনি সৌদি আরবের সাথে ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেনের সমস্যা নিরসনে মহামান্য প্রেসিডেন্টের প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

(খ) তিনি এপ্রিল মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে কায়রো সফর করবেন। এ সময় তিনি অস্ত্র তৈরি সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পন্ন করবেন। এমনি করে আমেরিকান অস্ত্রের জন্য মিসরের আবেদনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন।

(গ) তিনি সৌদি আরবে আমেরিকান অস্ত্রের চালান আসতে বিলম্বের জন্যও তার উষ্মা প্রকাশ করেন।

(ঘ) তিনি মহামান্য প্রেসিডেন্টকে তার শুভেচ্ছা এবং তাঁর স্বাস্থ্য ও সাফল্যের শুভ কামনা জানাবার অনুরোধ করেন।

(ঙ) তিনি ওমানের সমস্যা সমাধান তথা ওমান থেকে ইংরেজদের বিতারণ ও উপসাগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিসর, সৌদি আরব, ইরান ও ইরাক এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশের সমন্বয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের ধারণার সাথে একমত পোষণ করেন।

শেষ কামাল আদহাম, প্রিন্স তুর্কী আল ফয়সল ও মিস্টার আহমদ আব্দুল ওয়াহাব (সৌদি রাজকীয় সচিবালয়ের মুখ্য সচিব) এর সাথে সাক্ষাৎ–

–শেখ কামাল জানান যে, প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল–আসাদ বাদশাহর নিকট দু'টি পত্র পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয় যে, কিসিঞ্জার এখন পর্যন্ত সিরিয়ার জন্য কিছুই করেননি (২২ বছর পর আদ্যাবধিও না), তবে তাঁরা তৃতীয়বারের মতো ফিরে এসে সর্বশেষ আমেরিকান অবস্থান জানার ব্যাপারে একমত হন। বাদশাহ তখন হাফেজ আল-আসাদকে উত্তরে বলেন যে, তিনি পরিস্থিতি অনুসরণ করে যাচ্ছেন এবং কিসিঞ্জারের আসন্ন সৌদি সফরের সময় বিষয়টি নিয়ে তার সাথে আলাপ করবেন।

কামাল আদহাম, প্রিন্স তুর্কী আল-ফয়সল ও আহমদ আব্দুল ওয়াহাব অনুরোধ করেন যেন নিম্নবর্ণিত বিষয়টি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে পৌঁছে দেই। তবে তারা এ অনুরোধও করেন যেন এ বিষয়ে কোন সৌদি বা মিসরী দায়িত্বশীলের সাথে কথা না বলি। তারা যে এ বিষয়ে কথা বলছেন তার কারণ হচ্ছে, উভয় দেশের সম্পর্ক যে চমৎকার পর্যায়ে পৌঁছেছে তা রক্ষা করা।

কিছু মিসরী দায়িত্বশীল ব্যক্তি সৌদি প্রিন্সদের আঘাত করে সমালোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রিন্স ফাহদ ও প্রিন্স সুলতানও রয়েছেন। তাঁরা নাকি তাদের স্বার্থ না দেখলে কোন কাজ করেন না। টাকা লাভই তাঁদের আসল মতলব। এর প্রমাণস্বরূপ তারা সৌদি-মিসর সাম্প্রতিক তেল চুক্তি সম্পর্কে বহু মিসরী দায়িত্বশীলদের কানাঘুষার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলছেন যে, এ চুক্তিতে নাকি ডক্টর রাশাদ ফেরআউন (ফারউন?) ও প্রিন্স ফাহদ বড় অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন।

॥ ২॥

কামাল আদহাম

"পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল হালীম খাদ্দাম, ইসমাইল ফাহ্‌মীর চেয়ে উত্তম।"

—হেনরি কিসিঞ্জার এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে একথা বলেন

সৌদি আমীরগণ যে স্পর্শকাতরতার অভিযোগ তোলেন তা কেবল এখানে সেখানে বলা কিছু কথাবার্তার ফলেই জন্ম নেয়নি বরং তার বিরাট একটি অংশ রাজনৈতিক অনুশীলনেরই বৈষয়িক বাস্তবতার প্রকাশ ছিল। তবে এ রাজনৈতিক অনুশীলনের কিছু ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় ছিল ঃ

যেমন ধরুন, একটি পর্যায়ে ছিল অভিন্ন স্বার্থাদি ও যৌথ লক্ষ্যের সম্পর্ক। এটি হচ্ছে একটি সম্মেলনী যা ঐকমত্য ও সংলাপের মাধ্যমে, আবার কখনও কখনও বিতর্কের মাধ্যমে তার ভূমিকা রেখে যায়।

আমার ধারণা, একটি পর্যায় এমন আছে যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যকার স্বার্থাদি এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক রয়েছে। এখানে অনিবার্যভাবেই প্রতিযোগিতা রয়েছে। কখনও আবার থাকে সহজাত মানবীয় ঝগড়াঝাটি, এমনকি শত্রুতাও। উর্ধগতির সময়ে প্রথম পর্যায়টি তার নির্দেশ প্রয়োগ করে থাকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনার ওপর। নিম্নমুখী অবস্থায় দ্বিতীয় পর্যায়টিই ভরে রাখে অঙ্গনকে এবং সে ছাড়া আর সব কিছুকে ঢেকে রাখে এমনকি সবচেয়ে বড় ইস্যু বা সবচেয়ে মর্যাদাবান লক্ষ্যকেও।

১৯৭৪-এর বসন্তে আরব পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতা কেবলই হোঁচট খাচ্ছিল। অসংখ্য ঘটনায় এ সময়কার গোপন নথিপত্রগুলো ছিল ভারাক্রান্ত। এ সময়ে এ পর্যায়ের ধরন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রাজনৈতিক দিকটি ছিল বেশি ক্রিয়াশীল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সে সময়ে কেবল একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের কাগজপত্রে বড় বড় নথিগুলো ভরে গিয়েছিল। এ ঘটনাটিকে একটি মডেল ধরে নিয়ে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেতে পারে। ঘটনাটির শুরু হয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের প্রতি লিখিত কামাল আদহামের পত্রের সূত্র ধরে। পত্রটি ছিল হুবহু এ রকম ঃ

মহামান্য প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের প্রতি–

আমেরিকানরা আমাদের জানিয়েছেন যে, ভাই ইসমাইল ফাহ্‌মী কায়রোস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে কিসিঞ্জারকে এ বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে, তিনি অতিমাত্রায় বিব্রতবোধ করছেন, কারণ আমি প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে

কিসিঞ্জারের উপস্থিতিতে কায়রো বৈঠক ও দামেস্ক বৈঠকে যা যা হয়েছে তা জানিয়ে দিয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমেরিকানদের কাছে তার এ প্রতিবাদের মাধ্যমে আমাকে সীমাহীন হয়রানির মধ্যে ফেলেছে। কারণ আমি জানি না যে আসলে তার উদ্দেশ্য কি। তিনি কি চান যে, আমরা যেভাবে আমেরিকানদের সাথে কাজ করতে অভ্যস্ত সে স্টাইল বাদ দিয়ে পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে আসি। যে নিয়মে আমেরিকা প্রত্যেকের সাথে আলাদাভাবে বসবে ? নাকি এর অর্থ হচ্ছে বিশেষ করে আমার প্রতি আস্থাহীনতা ? যা হোক ভাই ইসমাইল ফাহ্মী উভয় উদ্দেশ্য সাধনেই সফল হয়েছেন। সম্ভবত তৃতীয় উদ্দেশ্যেও তিনি সফল হবেন– যখন সিরীয় পক্ষের নিকটও এই প্রতিবাদ পৌঁছবে।

ভাই ইসমাইল ঐ খেলাটিতেও সফল হবেন যে খেলাটিতে অনেকেই বহু রশিতে খেলতে গিয়ে হেরে যান। আমি যা বুঝতে পারছি, ইসমাইল ফাহ্মীর মূল রেফারেন্স হচ্ছেন কেবল মহামান্য প্রেসিডেন্ট সাদাত– অন্য কেউ নয়। তাহলে কেন তাঁর মাধ্যমেই বা ব্যক্তিগতভাবে আমার মাধ্যমে এ প্রতিবাদ করল না ? মনে হয় ভাই ইসমাইল ধারণা করছেন বা বিশ্বাসই করেন যে, মিস্টার প্রেসিডেন্টের সাথে আমার সম্পর্ক নিছক কাজের সম্পর্ক, তিনি হয়ত এ সম্পর্কের গভীরতা জানেন না। সম্ভবত তিনি মনে করেন যে, আমি সরকারী পদ রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত কাজেই তিনি আমাকে বিব্রত করতে পারবেন। আমি তাঁকে নিশ্চিতভাবে জানাতে চাই যে, আমি তাঁকে সহযোগিতা করছি এই বাস্তব উপলব্ধি থেকে যে, যার সাথে আমার ২২ বছরের বন্ধুত্ব রয়েছে এবং যে বন্ধুকে নিয়ে আমি সম্মান ও গৌরব বোধ করি তার প্রতি আমার দায়িত্ব রয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন বিবেচনা আমার মধ্যে কাজ করে না। আমেরিকানরা প্রতিবাদ করল এ জন্য যে, আমি ভাই ইসমাইলকে রাগিয়েছি।

যা ঘটেছে তা সত্যিই দুঃখজনক। কারণ এতে বিদেশীদের সামনে আমাদের দুর্বলতা ও বিভক্তি ধরা পড়ে। অবশ্য ভাই ইসমাইলও এক সময় আমেরিকানদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সে সময় আমি বিষয়টি নিয়ে হৈ চৈ করিনি। কারণ বিষয়টি ছিল সঙ্কীর্ণ গন্ডিতে। কিন্তু এবার যখন বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে আমেরিকা সৌদী আরবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে তখন আমি সহকর্মীদের কাছে খুবই বিব্রত বোধ করলাম। কাজেই আমি একদিন যে দায়িত্ব পালন করতাম, তার গুরুত্ব যতই কম হোক ভবিষ্যতে তা থেকে মহামান্য প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট ক্ষমা চাই। কারণ আমি এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চাই না। আমি যা ভয় করছি তা হচ্ছে আমেরিকানরা মনে করবে যে প্রতিবাদে যা এসেছে এতে নির্ভরযোগ্যতা কমে যাবে। আর এই আস্থা ছাড়া কি এ দায়িত্ব অব্যাহত রাখা যায়। আমি দুঃখিত যে ভর্ৎসনাকে দীর্ঘায়িত করেছি। আল্লাহ তায়ালা ইসমাইল ভাইকে ক্ষমা করুন।

আমার শুভেচ্ছা। -- কামাল আদহাম

এ পত্রটি কিছুটা প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু জেদ্দা থেকে প্রেরিত ধারাল এক তারবার্তায় এই প্রচ্ছন্নতা কেটে আসল বিষয় বেরিয়ে এলো ঃ

কামাল আদহাম-এর পক্ষ থেকে আমার শুভেচ্ছা নিন।

সৌদী আরবের বিরুদ্ধে আমেরিকান প্রতিবাদের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত আমি এমন সব তথ্য পাচার করেছি যা সিরিয়াতে আদৌ ঘটেনি।

দ্বিতীয়ত কিসিঞ্জার বলেননি যে, আব্দুল হালীম খাদ্দাম (এ অঞ্চলের) সর্বোত্তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

তৃতীয়ত কিসিঞ্জার মিসরকে অনুরোধ করেছিলেন যেন আলোচনা সম্পর্কে সিরিয়াকে কিছু জানান না হয়। কিন্তু তিনি সিরিয়া গিয়ে তাদের সাথে সকল বিষয়ে আলোচনা করেন। যখন সৌদী আরব মিসরকে সিরিয়ায় সংঘটিত বিষয়াদি জানান তখন কিসিঞ্জারের ভূমিকা ফাঁস হয়ে যায়, যা আসলে সৌদী আরব ও মিসরের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের কারণে স্বস্তিদায়ক ছিল না। কিসিঞ্জার তখন ইসমাইল ফাহ্মীর ক্রোধের সুযোগ গ্রহণ করেন। কারণ কামাল আদহাম বলেছিলেন যে, কিসিঞ্জার আব্দুল হালীম খাদ্দামকে এ অঞ্চলের সর্বোত্তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবেচনা করেন। ইসমাইল ফাহ্মী তখন কায়রোতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদ সিস্কোর মাধ্যমে সৌদী আরব পৌঁছে যায়। এদিকে জেদ্দাস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এই প্রতিবাদলিপি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ, তিনি বিষয়টিকে নিছক আরব বিষয় মনে করেন। আরবদের নিজেদের বিষয়ে নাক গলানো আমেরিকার দায়িত্ব নয় বলে মনে করেন।

চতুর্থত কামাল আদহাম আমেরিকান পত্রের প্রত্যুত্তরে জানান যে যদি এ বিষয়টি মিস্টার ইসমাইল ফাহ্মীকে উত্তেজিত করে থাকে তাহলে তিনি খাদ্দামের বদলে ইসমাইল ফাহ্মীকেই সর্বোত্তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী মানতে প্রস্তুত রয়েছেন।

এভাবেই ঘটনাটির আদ্যন্ত প্রকাশ পেল ঃ

১. মিসর ও সৌদী আরবের মধ্যে কিছু তথ্য আদান-প্রদান হয়, যা দায়িত্বশীলগণ দু'দেশের মধ্যে এক প্রকার রাজনৈতিক সমন্বয় হিসাবেই দেখেন।

২. কিসিঞ্জার অব্যাহতভাবে আরব পক্ষগুলোকে সতর্ক করে যাচ্ছিলেন যেন তারা নিজেদের মধ্যে তথ্যাদি আদান-প্রদান না করেন।

৩. এ তথ্য চালাচালির বিষয়টি কখনও ব্যক্তিগত বিবেচনায় হয়েছে, কখনও বা হয়েছে কারণ পর্যালোচনার সূত্র ধরে "বলা হয়েছে" 'কথিত আছে' ইত্যাকার মন্তব্যের রেশ ধরে।

৪. যেসব তথ্যাদি বোলচাল হয়েছে তা পরবর্তীতে বিব্রতকর হওয়ায় তথ্যের হোতারা সব অস্বীকার করেছেন।

৫. এছাড়া এসব তথ্যাদি বা মন্তব্যসমূহ আমেরিকানদের কাছে পৌঁছে গেছে– কখনও অভিযোগ আকারে তো কখনও ভিন্ন মোড়কে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই কিস্‌সার ঘটনাপ্রবাহ কেবল কামাল আদহামের কথিত অভিযোগ বা ভৎসনা সংবলিত পত্র, যা প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট লিখেছিলেন, তার মধ্যেই সীমিত থাকল না। সৌদির প্রতি আমেরিকার প্রতিবাদের কারণ ব্যাখ্যা তারবার্তার মধ্যেও সীমিত রইল না। বরং তা এতদূর গড়াল যে শেষ পর্যন্ত কিসিঞ্জারের প্রশাসনিক দফতর– আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআইএ'র মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। কারণ কামাল আদহাম সৌদি গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বশীল হিসাবে সিআইএ'র সাথে সহযোগিতা করতেন।

এই অভিনব বিপর্যয়ের বিষয়ে আমেরিকার নথিপত্রে একটি তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট পাওয়া যায়, যা জেদ্দাস্থ সিআইএ পরিচালক লেখেন। ইনিই কামাল আদহামের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি এ রিপোর্টটি সিআইএ প্রধানের "ল্যাংলী" অফিসে পাঠান। রিপোর্টটি হুবহু এরকম ছিল ঃ

১. সিস্কোর স্মারক ঃ

২৮ ফেব্রুয়ারি অনুরোধপত্র পেলাম সিস্কো থেকে যেন এটি আপনার নিকট পৌঁছাই। এতে মূলত মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্‌মীর পক্ষ থেকে কায়রোস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলেট্স-এর নিকট কিছু অভিযোগ ছিল। এই পত্রে বলা হয় ঃ

'আপনি যথাশীঘ্র সম্ভব কামাল আদহামের সাথে দেখা করে তাঁকে বলবেন যে, আমরা এখন কিছু রিপোর্টের কারণে খুবই অস্বস্তি বোধ করছি যা মিসরীয়রা আমাদের জানিয়েছেন। এ গুলোতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সফরের বিষয়ে উল্লেখ ছিল। এসব রিপোর্ট অনুসারে কামাল আদহাম নাকি বলেছেন যে,

(ক) যখন মন্ত্রী (কিসিঞ্জার) রিয়াদে ছিলেন তখন তিনি সিনাইয়ের মানচিত্র বাদশাহ ফয়সলের অবগতিতে আনেন এবং সুনির্দিষ্ট কিছু স্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এসব এলাকার ভু-প্রাকৃতিক অবস্থার বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পায়।

(খ) কামাল আদহাম বর্ণনা করেন যে, সিরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল হালীম খাদ্দাম তাঁকে জানিয়েছেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার পশ্চিম গোলান অঞ্চলের মানচিত্র ব্যাখ্যা করেছেন।

(গ) কামাল আদহাম কিসিঞ্জারের বরাতে এটাও বর্ণনা করেন যে, তিনি খাদ্দামকে আরব বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিধায় বিভূষিত করেন।

আপনি কামাল আদহামকে বলবেন যে, এ সব কথাবার্তা সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী (কিসিঞ্জার) বাদশাহ ফয়সলের কাছে অথবা অন্য কোন সৌদী দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে কোন মানচিত্র উপস্থাপন করেননি। যদিও প্রেসিডেন্ট আসাদ

একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে এসে একটি মানচিত্র ব্যবহার করে সেখানে ইসরাইলী উপনিবেশগুলোর অবস্থান নির্দেশ করেন। এটা হয়েছিল যখন গোলানে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এটা প্রেসিডেন্ট আসাদ করেছিলেন যখন তিনি গোলান মালভূমি থেকে ইসরাইলী পূর্ণ প্রত্যাহার ও গোলানের পশ্চিমাংশে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করছিলেন। কিন্তু ঐ সব ছিল সাধারণভাবে কিছু আলোচনা, এতে মানচিত্রের কোন নির্ধারিত স্থানের প্রতি সুনির্দিষ্ট ইশারা করা হয়নি।

আর যে বলা হচ্ছে যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার আব্দুল হালীম খাদ্দামকে বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করেছেন তাও আসলে ঘটেনি। কামাল আদহামকে বলা আবশ্যক যে, এসব আজগুবি কথাবার্তা কেবল কল্পনাপ্রসূতই নয় বরং এগুলো চালাচালির কারণে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে যে, এ অঞ্চলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার যে স্পর্শকাতর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তার সাফল্যের সহায়ক হবে না।

এটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই মঞ্চের প্লেয়ারদেরকে ভুল আবেগ থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ এ সকল কারণে লক্ষ্যে পৌছানোর বেলায় সংশয় আর সন্দেহের অপপ্রচার ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না। আপনি এ্যাম্বেসেডর একেঞ্জকে (সৌদি আরবে নিয়োজিত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, এই পত্র সম্পর্কে জানতে দেবেন)।

২. কামাল আদহামের প্রশ্ন ঃ

জেদ্দাস্থ, সিআইএ প্রধান তাঁর পরিচালকের নিকট (ওয়াশিংটনস্থ ল্যাংলীতে অবস্থিত সিআইএ প্রধানের নিকট) একটি জবাবপত্রে বলেন ঃ "আপনার পত্র পাওয়া মাত্র আমি রাষ্ট্রদূত একেঞ্জ-এর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি এবং নিম্নলিখিত বিবরণ গ্রহণ করি ঃ

(ক) সিস্কো আপনার কাছে যা জানিয়েছে তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। কি কারণে ইসমাইল ফাহ্মী, এলেট্স ও সিস্কো সবাই বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। বিষয়টি ন্যূনপক্ষে পারস্পরিক সঙ্গতিবিহীন।

(খ) যেহেতু পুরো ঘটনাটির সূচনা হয়েছে মিসরে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বরাবর মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিবাদের মাধ্যমে। এরপর এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কূটনৈতিক চ্যানেলে প্রবাহিত হয়। এখন আমার প্রশ্ন জাগে, সিস্কো থেকে এ ধরনের পত্র কেন সিআইএ'র ব্যক্তিগত যোগাযোগ সূত্রে আসে? তাছাড়া, নিছক টেকনিক্যাল দিক থেকেও বলা যায় যে, কামাল আদহাম ১৫ ফেব্রুয়ারি বাদশাহ ফয়সলের সাথে, কিসিঞ্জারের সাক্ষাৎকালে বাদশাহর উপদেষ্টা হিসাবেই উপস্থিত ছিলেন, সি আই,এ প্রধান হিসাবে নয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহুবার কূটনৈতিক বিষয়াদিতে সিআইএ'র নাক গলানোতে তার অসন্তুষ্টি জানিয়ে আসছে। এসবে তার কাজ কি। তা সত্ত্বেও সে অন্যান্য

ব্যাপারের মতো এ ব্যাপারেও কাগজপত্রে জড়িয়ে গেল। আমি যখন এ্যাম্বেসেডরকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কি এ ব্যাপারে একমত যে, প্রাপ্ত অভিযোগটি কোন এক কূটনীতিকের মাধ্যমে সমাধা হওয়া উচিত। এরপর আমি জোর দিয়ে বলি যে, হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে সঠিক ও যৌক্তিক পন্থা। তাছাড়া সিস্কো প্রেরিত অভব্য ও সংশয়াশ্রিত Rude and Confusing পত্রটি উচ্চ পর্যায়ের একজন রাজকীয় উপদেষ্টার নিকট পাঠাতে যথেষ্ট কূটনৈতিক যোগ্যতার প্রয়োজন। একেঞ্জ আমাকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন।

কামাল আদহাম বলেন– সত্যি বলতে কি, ইসমাইল ফাহ্‌মী কিছুই জানেন না। গত সপ্তাহে যখন তিনি কায়রোতে ছিলেন তখন তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎই করেননি। এমনকি এটাও জানেন না যে, তাঁর অভিযোগের এই ভূত কোথা থেকে নাযিল হলো। কামাল আদহাম একথা অস্বীকার করেন যে, তাঁকে ১৪ ফেব্রুয়ারিতে সাক্ষাতের সময় আব্দুল হালীম খাদ্দাম বলেছেন যে, কিসিঞ্জার দামেস্কে দক্ষিণ গোলানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সময় মানচিত্র ব্যবহার করেন। কামাল আদহাম এও ধারণা করেন যে, তিনি জানেন যে এ বিষয়ে এই ঘোরতাল কোথা থেকে পয়দা হলো। কারণ মিসরীয়রাই তো তাঁকে জানিয়েছে যে, কিসিঞ্জার তাদেরকে গোপনে সেই সব সীমারেখার কথা বলে দিয়েছেন। সেখানে ইসরাইলীরা গোলান থেকে প্রত্যাহার করে সরে যেতে পারে। কিসিঞ্জার মিসরীয়দের সতর্ক করে দিয়েছেন যেন তাঁরা এই সব প্রত্যাহার লাইন সম্পর্কে সিরীয়দের জানতে না দেন। তাহলে পাছে তারা তাদের আবেদনের সিলিং আরও উঁচু করে তুলে ধরতে পারে। প্রেসিডেন্ট সাদাত এ লাইনগুলোর কথা কামাল আদহামকে গত সপ্তাহেই বলেছেন। আদহাম হতভম্ব হয়ে বললেন, তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি যখন দামেস্কে সিরীয়দের সাথে বৈঠক করেন তখন তাঁরা তাঁকে জানিয়েছেন যে, কিসিঞ্জার প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট কিছু লাইনকে পাকাপোক্ত করেছেন। এটা তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি খোদ প্রেসিডেন্ট আসাদের সামনেই করেছেন। কামাল আদহামের শোনামতে তাঁর বক্তব্যের ভাষ্য ছিল ঠিক এ রকম ঃ

"দক্ষিণ গোলানে চার কি পাঁচ কিলোমিটার আর উত্তর এলাকায় এরচেয়ে কিছুটা কম।" আদহাম সিরীয়দের মনোভাবে বোঝালেন যে, কিসিঞ্জার মূলত এই চিন্তাটি ছুড়ে দিয়েছিলেন এভাবে যে, "এ রকম হলে কেমন হয় ?" এটাকে ঠিক ইসরাইলীদের প্রস্তাবের আকারে পেশ করেননি। এটা নিছক তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সিরীয়দের মনোভাব সম্পর্কে আন্দাজ লাগাতে পারেন। এজন্যই সাধারণভাবে কিছু ধরে নিয়ে কথা পেড়েছেন মাত্র।

এতদসত্ত্বেও কিসিঞ্জার যে ভয় করেছিলেন সে প্রতিক্রিয়াটিই আলোচনায় উঠে এল। কারণ আসাদ এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণই প্রত্যাখান করেন। তিনি মতপ্রকাশ

করেন যে, সম্পূর্ণ গোলান ১৯৬৭-এর সীমান্ত রেখায় সিরিয়া ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই তার কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তিনি উভয় বাহিনীর মধ্যে ব্যবধান রাখার জন্য জাতিসংঘ বাহিনীর উপস্থিতির বিষয়টি গ্রহণ করবেন বলে জানান।

কামাল আদহামের সূত্র অনুসারে একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ বিষয়ে ইসমাইল ফাহ্মী প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছ থেকে তৃতীয় বরাতে (থার্ড হ্যান্ড) কিছু শুনেছেন। তাঁরপর বিষয়টি তাঁর কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে এবং বাস্তবতা পড়েছে ঢাকা। তাই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে কামাল আদহাম সিরীয়দের সাথে মিসরীয় বা আমেরিকানদের আস্থাশীল সম্পর্কের সুযোগ নিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে কামাল আদহাম হচ্ছেন এ নাট্যমঞ্চের শেষ পুরুষ। যে কোন অবস্থায়ই তিনি কারও কাছে বিশেষ করে কিসিঞ্জার ও সিস্কোর কাছে এমন কোন দায়বদ্ধ ছিলেন না যে, আসাদ থেকে শোনা কোন কিছু সাদাতের কাছে গোপন রাখতে হবে।

আদহাম এ জেনে তার সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, সিস্কো জোর দিয়ে বলেছেন যে, সক কিছুর পরও খাদ্দাম সবচেয়ে বড় আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী নন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এটা ইসমাইল ফাহ্মীকে স্বস্তি দেবে। কামাল আদহাম তাঁর ব্যাখ্যাগুলো সিস্কো জানাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এভাবে বিষয়টি সুরাহা হয়ে যাওয়ায় একেঞ্জ তাঁর স্বস্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ইচ্ছে নেই বলেও জানান। তিনি চান যে, আপনি এটা জানেন যে, সিস্কোর পত্র এবং আদহামের প্রত্যুত্তর দু'টিই আমার এখানে সমন্বিত হয়েছে।

৩. কায়রো থেকে দৃশ্যপট ঃ

আমি আমার কিছু কায়রোর বন্ধুর মাধ্যমে ওখানে প্রতীয়মান ঘটনাবলীর কিছু দৃশ্য পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি। স্পষ্টতঃ কিসিঞ্জার ১২ ফেব্রুয়ারির এ রাউণ্ডে সাদাতের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে তাঁর এ সমর্থন আদায় করেছেন যে, মিসরীয়দের সাথে ভৌগোলিক বিষয়াদিসহ যে সব আলাপ-আলোচনা হয়েছে তাঁর বিস্তারিত সিরীয় অথবা সৌদীদের কোনমতেই জানতে দেয়া হবে না। এ কারণেই আশরাফ মারওয়ান যখন প্রেসিডেন্ট সাদাতের পত্র নিয়ে বাদশাহ ফয়সলের নিকট যান তখনও এই সব ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে যাননি।

যাহোক মিসরীয়রা বুঝতে পেরেছে যে, আসলে বাদশাহ ফয়সলকে সাদাত তাঁর ও কিসিঞ্জারের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি কিন্তু তাদের ও কিসিঞ্জারের মধ্যে আলোচিত বিষয়ের বিস্তারিত সম্পর্কে আরও বেশিই জানেন। এদিকে ইসমাইল ফাহ্মী ধরে নিয়েছেন যে, কিসিঞ্জারই বাদশাহ ফয়সলকে এসব বলে

দিয়েছেন। এই নিরিখেই তিনি হারম্যান এলেট্সকে বুঝিয়েছেন। আর এলেট্সও ইসমাইল ফাহ্মীর অভিযোগ সিস্কোকে জানিয়েছেন, যা আসলে ছিল নিছক অনুমাননির্ভর– যাতে হয় এলেট্স নিজে অথবা ফাহ্মী আরও কিছু জুড়ে দিয়েছেন। তবে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। এর অর্থ হচ্ছে– এসব তথ্যাদি কামাল আদহাম থেকেই পাচার হয়েছে এবং কিসিঞ্জারের দ্বৈত খেলও ফাঁস হয়ে গেছে। বোধ করি সেজন্যই সিস্কো আপনার কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

আশরাফ মারওয়ানের এ্যাম্বেসেডর এলেট্সের সাথে যোগাযোগটা ছিল আসলে মিসরীয়দের এ বিষয়টি রাখঢাক করারই প্রচেষ্টা মাত্র। তিনি চেয়েছিলেন যেন এলেট্স এ অভিযোগ করেন যে, আমেরিকান সরকার সৌদিদের সাথে রূঢ় আচরণ করেছেন। সে একই সপ্তাহে তাঁদের প্রতি পরপর তিনটি আঘাত হেনেছে ঃ

– ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরব অবরোধের বিপক্ষে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সমালোচনা।

– সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ওয়াশিংটনে বাণিজ্য আলোচনা ভেঙ্গে পড়া।

– এরপর হচ্ছে – কামাল আদহামের প্রতি সিস্কোর দোষারোপ।

আশরাফ এলেট্সকে বলেছিলেন– মিসরী সরকার ও ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট সাদাত কামাল আদহামের প্রতি ১০০% আস্থা রাখেন, তাই তাঁর সম্পর্কে লোকে যাই বলুক না কেন।

তখনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চড়াই-উৎরাই পার হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল।

॥ ৩ ॥

বাদশাহ হাসান

"চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমাদের দিকে কিছু বিপদ আছে।"

—বাদশাহ হাসানের মাধ্যমে প্রেরিত সাদাতের নিকট রাবিনের একটি বার্তা

কিসিঞ্জার মিসরীর ফ্রন্টিয়ারে দ্বিতীয় লিয়াজোঁ ছিন্ন চুক্তিতে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টায় ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি ও মার্চে বার বার আসোয়ানে যাতায়াত করেও শেষ পর্যন্ত সফল হননি। তিনি ইসরাইলীদের প্রতি দারুণ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে এ অঞ্চল ত্যাগ করেন। কারণ তারা এতই কঠিন কতগুলো শর্ত দিয়ে অনড় হয়ে বসে আছে যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত এখন এগুলো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। কিসিঞ্জার ওয়াশিংটনে ফেরার পথে লণ্ডনে ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সাহায্য দেয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ১০ নং ডাইনিং স্ট্রীট-এর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে দেওয়া মধ্যাহ্ণ ভোজসভায় বলেন যে, তিনি দীর্ঘদিন কিসিঞ্জারের সঙ্গে একসাথে কাজ করেছেন, তবে এ যাত্রা মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসে তাঁকে যে রকম রাগান্বিত ও হতাশ দেখলাম তা আর কখনও দেখিনি। উইলসন আরও বলেন যে, তিনি জানেন না, ভবিষ্যতে আমেরিকার নীতি কি হবে। তাছাড়া এ পুনর্মূল্যায়নই বা কি ফলাফলে উপনীত হবে। তবে সর্বাবস্থায়ই তিনি মনে করেন যে, সমাধানের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে সময় নেবে। এতে প্রচুর মাথা খাটাবারও প্রয়োজন হবে।

উল্লেখ্য, ঐ লাঞ্চে ইসমাইল ফাহ্মী ও মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালও উপস্থিত ছিলেন। তিনি (হাইকাল) কাকতালীয়ভাবে ঠিক সে সময়টিতেই তাঁর "রমাদানের পথে" গ্রন্থটির প্রকাশ উপলক্ষ্যে লণ্ডনে ছিলেন।

প্রকৃতই কিসিঞ্জার ইসরাইলের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস কালাহানের বর্ণনা মোতাবেক কিসিঞ্জার তাঁর অফিস থেকে আল্-কুদ্সে রাবিনের সাথে কথা বলেন। সে সময় তিনি অনেকটা গালি দেওয়ার মতো প্রচণ্ড ভঙ্গিতে কথা বলেন। তাঁকে যা বলেন এর মধ্যে ছিল "দুর্ভাগ্যবশত এখন ইসরাইলে বেন গোরিয়নের মতো ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এমনকি মায়ার-এর পর্যায়ের নেতৃত্বও নেই। থাকলে ইসরাইল বোঝতে পারত যে, সাদাত তাঁদেরকে তাঁদের বিষয়গুলো সুরাহার জন্য একটি ঐতিহাসিক সুযোগ দিচ্ছেন এবং তাঁদের এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

রাবিনের সাথে টেলিফোনে কথাবার্তা শেষ করে কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন যে, "ইসরাইলের ক্ষমতা এখন তিন ব্যক্তির হাতে– রাবিন, পেরেজ ও আলোন। আর এরা প্রথম শ্রেণীর অফিসার বটে। কিন্তু রাজনীতিক হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর। এঁদের মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্কও বেশ জটিল। কোন উদ্যোগ বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেন না। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না যে, তাঁরা একটি বিরল সুযোগ নষ্ট করছে। সুযোগটা হচ্ছে – একজন দুর্বল প্রেসিডেন্টের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কিসিঞ্জারের বিদ্যমান থাকা। এ সুযোগে তাঁরা ইসরাইলের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু তাঁরা নিয়ে নিতে পারতো।"

ওয়াশিংটনের পথে কিসিঞ্জার লণ্ডন ত্যাগ করলেন। সেখানে তিনি ইহুদী পরিষদগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। তাঁদের সাথে তিনি আলাপ শুরু করে বলেন– "তিনি এ বিশ্বাস নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরেছেন যে, ইসরাইল রক্ষা করা প্রয়োজন। তবে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে নয় বরং এর নেতৃবৃন্দের কবল থেকে যাঁরা এমন সুযোগ ছেড়ে দিচ্ছে যা কখনও ফিরে পাবার নয়।"

কিন্তু এদিকে কায়রোতে প্রেসিডেন্ট সাদাতের হাতে না ছিল সময় আর না ছিল ধৈর্য। কারণ মিসরী ফ্রন্টিয়ারে দ্বিতীয় লিয়াজোঁ ছিন্নের চুক্তির সামনে পথ খুলে যাবার মতো কোন কিছুতেই রাবিনকে বোঝাতে অক্ষম হওয়া তথা কিসিঞ্জারের আসোয়ান মিশন ব্যর্থ হওয়ায় এখন তিনি এতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, অন্য যে কারও থেকে তিনি বিষয়টি বেশি অনুভব করতে লাগলেন, বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপারে। কারণ, ফ্রন্টিয়ারের ব্যাপারে যে কোন বিবরণ এখনও মিসরীয় জনমত তথা সাধারণভাবে আরব জনমত থেকে আড়ালে রাখা তখনও সম্ভব ছিল। কিন্তু এটা ফ্রন্টিয়ারের ঘনিষ্ঠ সংস্থাগুলো থেকে গোপন রাখা এক প্রকার অসম্ভব। সে পর্যায়ে সশস্ত্র বাহিনীই ছিল সব সময় প্রেসিডেন্ট সাদাতের ভয়ের কারণ। কারণ তিনি উপলব্ধি করতেন যে, সামরিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাজনৈতিক ফলাফল কতদূর তা জনগণ জানতে চায়। মানবিক ত্যাগ-তিতিক্ষা– চাই তা কষ্ট হোক বা রক্ত – এর বিনিময়ে কি অর্জিত হয়েছে তা সবাই জানতে চায়। প্রেসিডেন্ট সাদাত আরও বেশি উৎকণ্ঠা বোধ করলেন যখন বাদশাহ ফয়সল ১৯৭৫-এর ২৫ মার্চ তারিখে রিয়াদে আততায়ীর হাতে নিহত হন। এতে তিনি এ অঞ্চলে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্রকে হারালেন, যদিও দ'জনে কোন কোন নীতিতে ভিন্নমুখী ছিলেন বৈকি। প্রেসিডেন্ট সাদাত ওয়াশিংটনে পুনর্মূল্যায়ন কাজের ফলাফলের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু কোন ফলাফলে পৌঁছতে পেরেছেন বলে মনে হলো না। কিসিঞ্জারের কাছে পত্র পাঠিয়ে তিনি নিজে নতুন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি চান যে, নিজে গিয়ে কংগ্রেস কমিটিগুলো ও তার সদস্যদের কাছে তিনি

ব্যাখ্যা করবেন, ইসরাইলীদের খামখেয়ালীপনা কতদূর গড়িয়েছে। এতে করে এ অঞ্চলের মূল ভূমিকায় আবার সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে আসতে পারে। অথচ ইতোপূর্বে তিনি ও কিসিঞ্জার সোভিয়েত ইউনিয়নকে দূরে রাখতে তথা মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর ভূমিকাকে গুটিয়ে নিতে কি কষ্টটাই না করেছেন। মনে হলো, ওয়াশিংটনে ফেরার কয়েক সপ্তাহ পর মেজাজ শান্ত হয়ে গেলে কিসিঞ্জার এখন আর আনোয়ার সাদাতের ওয়াশিংটনে আসার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন না। কিসিঞ্জারের কিছু রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল। ইসরাইলীদের প্রতি তাঁর গোসার কারণ ছিল অন্যখানে। তাঁরা তাঁর উদ্যোগ নস্যাৎ হওয়ার জন্য দায়ী ছিল এবং এতে তাঁর শৌর্য-বীর্যের ক্ষতি হয়, তাই। মূলত কিসিঞ্জারের অহংবোধের কারণেই তাঁর মন খাপ্পা হয়ে গিয়েছিল– ইসরাইলের অনুসৃত নীতির কারণে নয়। শেষতক বেশির পক্ষে এতটুকু অগ্রগতি হয় যে, অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর 'ব্রুনো ক্রাইসকি' যিনি নিজেকে সব সময় আরব-ইসরাইলের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে উপস্থাপিত করে থাকেন – তাঁর বহু চেষ্টা-তদ্বিরের পর অস্ট্রিয়ার চার্লসবর্গে প্রেসিডেন্ট সাদাত ও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন।

জায়নিস্ট আন্দোলনের কর্তাব্যক্তিরা চাইতেন না যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর চলমান লাইনে একেবারে হতাশ হয়ে গিয়ে অন্যপথ খোঁজে নিতে যান। কিসিঞ্জার তাঁর কাছে সাক্ষাৎ করতে যে-ই যেতেন তাঁর কাছেই বলতেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে অসম্ভব রকমের নমনীয়। তিনি আরব জনমতের তোয়াক্কা করতেন না বরং কেবল মিসরীয় জনমতকেই গুরুত্ব দিতেন যা তিনি স্থানীয় প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে আয়ত্তে রাখতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু কিসিঞ্জার যেটার ভয় করতেন এবং যে ভয় জায়নিস্ট আন্দোলনের নেতারাও করতেন তা হচ্ছে, সাদাত হয়ত ভিন্ন স্থানে ঝাঁপ দিতে পারেন। এভাবেই ১৯৭৫-এর পয়লা নভেম্বর দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যকার এই প্রস্তাবিত বৈঠক চার্লসবার্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট সাদাত যখন চার্লসবার্গ থেকে ফিরলেন দেখা গেল তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেছে।

কারণ সেখানে তিনি যে আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে দেখলেন তা প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এমনকি ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সেই ভারাক্রান্ত দিনগুলোর তুলনায়ও । তিনি তো মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই জানাশোনা থেকে সম্পূর্ণ দূরে অবস্থান করছেন। কাজেই তিনি এ সমস্যাটির কোন বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং পষ্টাপষ্টি বলে দিলেন– তিনি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ নন। এ বিষয়টি ' হেনরির' জন্য ছেড়ে দিতে চান যিনি এর সবকিছু ভালভাবে জানেন। আমি যা ভালভাবে জানি তা হচ্ছে আপনারা তাঁর প্রতি আস্থাশীল এবং আপনারা তাঁর সাথে একটি আস্থাশীল গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি

করেছেন আপনাদের লক্ষ্যও এখানে স্পষ্ট। অধিকন্তু জেরাল্ড ফোর্ড প্রেসিডেন্ট সাদাতকে অনুরোধ করলেন যেন রাবিন সরকার যেসব সমস্যার সম্মুখীন তা বোঝার জন্য আরেকটা চেষ্ট চালান। বিশেষ করে রাবিন হচ্ছেন একজন সামরিক লোক। হ্যাঁ, সত্য বটে তিনি বেশ কিছু বছর তাঁর দেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়াকে সামাল দেয়ার জন্য এটা যথেষ্ট নয়।

প্রেসিডেন্ট সাদাত অনুভব করলেন যে, তিনি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। যদি তিনি কিসিঞ্জারের সাথে প্রথম সাক্ষাতে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাই চালিয়ে যান তাহলে দ্বিতীয় লিয়াজোঁ ছিন্ন চুক্তিতে উপনীত হতে হলে তাঁকে ছাড় দিতে হবে। এতে সবকিছু আবার সচল হবে। না হয় দেখা যাচ্ছে তিনি এতকিছু করার পর এখন এক স্থবিরতায় এসে উপনীত হলেন।

কিসিঞ্জার আনোয়ার সাদাতের স্বভাব প্রকৃতি ও তাঁর অতীব নমনীয়তা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তার বরখেলাফ অবস্থানটিই নেন সাদাত। কারণ তাঁর ভাষায় তিনি তো 'অজানার উদ্দেশ্যে লাফ' দিতে পারেন না। তবে কিসিঞ্জার ব্যাপারটি তাঁর কাছে সহজ করে তুলতে চেষ্টা করেন। সম্ভবত আরেকটু বেশি প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যেই প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সাথে প্রথম সাক্ষাতের পরপরই প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে তিনি মৌলিক বৈঠক করতে চান। এই বৈঠকে কিসিঞ্জারের আলোচনা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় পয়েন্টেই ঘুরপাক খেয়েছে। তার সারকথা হচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনে সম্ভাব্য ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জিমি কার্টারের বিপরীতে ফোর্ডের জয়লাভের জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাহায্য করতে হবে। এই জিমি কার্টার দক্ষিণের একজন লোক। মহাযুদ্ধে সাবমেরিন বহরে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকরি করেন। এর পর তিনি মটরশুঁটির ফার্মার হন এবং তরিতরকারির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি একটি মাত্র রাজনৈতিক পদ লাভ করেন, যখন তিনি জর্জিয়া স্টেটের গভর্ণরের জন্য নির্বাচিত হন। কিসিঞ্জারের ধারণায় তাঁর জয়লাভের আশা ক্ষীণ। কিন্তু ফোর্ড একজন সফল প্রেসিডেন্ট হতে পারেন– বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে, যদি ওখানকার বন্ধুরা তাকে সাহায্য করে। কিসিঞ্জার আরও বলেন, যা চার্লসবার্গ থেকে ফিরে খোদ প্রেসিডেন্ট সাদাতই বর্ণনা করেন যে, কিসিঞ্জার তাঁকে বলেছেন, "আমি যে কারও থেকে বেশি জানি যে, আপনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জন্য অনেক কিছুই লগ্নি করেছিলেন। যদি মনে করেন যে, ওসব ভেস্তে গেছে তবুও আমি আপনাকে দোষ দেব না। তবে আমি আপনার একজন বন্ধু হিসাবে এই পরামর্শ দিতে চাই যে, আপনি ওগুলোকে বিফল লগ্নি মনে করবেন না। বরং বন্ধু হিসাবে আমি পরামর্শ দেব যে, মুক্তহস্তে আরও কিছু লগ্নি করুন। আমি আস্থশীল যে, আপনি অচিরেই লগ্নিকৃত সবকিছু তো ফিরে পাবেনই, আরও কিছু বেশি পাবেন।"

কিসিঞ্জার বর্ণনা করছেন যে, চার্লসবার্গে আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের জিতার বিভিন্ন সুযোগ সম্পর্কে আমেরিকার মঞ্চে আগামী ঘটনাসমূহের সম্ভাবনা এবং তিনি কি করতে পারেন ইত্যাকার বিষয়াদি ব্যাখ্যা করার পর প্রেসিডেন্ট সাদাত তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, "হেনরি! আমি আপনাকে মিসরের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক আমার উপদেষ্টা হিসাবে পেতে চাই। কিসিঞ্জার বর্ণনা করেন, তিনি তখন প্রেসিডেন্ট সাদাতকে উত্তর করেন যে, তাঁর উপদেষ্টা হতে পারাকে তিনি সম্মান মনে করেন।"

১১জুন রাবিন ওয়াশিংটন সফরে যাচ্ছেন এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। জুলাই মাসের প্রথম দিকেই কিসিঞ্জার আবার এ অঞ্চলে এলেন। গোটা জুলাই ও আগস্ট মাস ধরে আলেকজান্দ্রিয়াতে থেকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে দ্বিতীয় লিয়াজোঁ ছিন্ন চুক্তিতে উপনীত হলেন। স্বাক্ষর করার সময় কিসিঞ্জার তাঁকে জানান যে, প্রেসিডেন্ট ফোর্ড তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

দ্বিতীয় "লিয়াজোঁ ছিন্ন" চুক্তিটি ছিল প্রথম চুক্তি থেকেও বেশি শর্ত ভারাক্রান্ত। এর সংযোজনায় যে ১২টি গোপন প্রতিশ্রুতি ছিল, সে অনুসারে প্রেসিডেন্ট সাদাত বস্তুত মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে একক সন্ধি করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলেন। অনুরূপভাবে রাশিয়াকে কেবল পশ্চিমা বিশ্ব থেকে নয় বরং আফ্রিকা থেকেও বের করে দেয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা দানের ব্যাপারেও প্রতিশ্রুতি দেন। ফিলিস্তিন সঙ্কটের ব্যাপারে তিনি এ নীতি গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩৩৮ সংখ্যক সিদ্ধান্ত দু'টি গ্রহণের স্বীকৃতি জ্ঞাপন না করে তাহলে ইসরাইলও তাকে স্বীকৃতি দেবে না এবং যোগাযোগও করবে না।

আরও সীমিত পরিসরে কিছু অনা প্রতিশ্রুতিও ছিল যেমন ঃ

* প্রতিশ্রুতি দেন যে, আরব-ইসরাইল সংঘাতে সামরিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন।

* প্রতিশ্রুতি দেন যে, মিসর ভূমি থেকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সামরিক অথবা আধাসামরিক কর্মকাণ্ড নিষেধ করার বিষয়টি মেনে চলবেন।

সীমিত পরিসরে কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল যেমন– মিসরী সংবাদপত্র তথা সকল গণমাধ্যমে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক প্রচার প্রচারণা করা থেকে বিরত থাকবেন। সাধারণ আরব অবস্থানের অপেক্ষা না করেই ক্রমান্বয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ গুটিয়ে নিয়ে আসা শুরু করবেন। লিয়াজোঁ ছিন্ন চুক্তি ও এর সকল সংযোজনার নির্দেশ পরবর্তীতে আলোচনা সাপেক্ষে নতুন চুক্তি এটার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কার্যকর ও বলবৎ থাকবে।

প্রেসিডেন্ট সাদাতের ওয়াশিংটন সফর সুখকর ছিল না, যদিও তিনি শতবার বলেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সমাধানের ৯৯% কাগজপত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। কারণ কিসিঞ্জার তাঁকে জানালেন যে, রাবিন বার বার বলেছেন, সীমিত চুক্তিগুলোর পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। কাজেই সংঘর্ষ বন্ধের লক্ষ্যে আর কোন তৃতীয় চুক্তি নেই। কারণ দ্বিতীয় লিয়াজো ছিন্ন চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইল সিনাই প্রণালীসমূহের পূর্ব মালভূমি পর্যন্ত চলে গেছে। এহেন অবস্থায় ইসরাইলকে এক পা পিছে যেতে হলেও "আরীশ–রা'স মুহাম্মদ" লাইনে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এটা কেবল পূর্ণ শান্তি-চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পরেই সম্ভব। এর মধ্যে রয়েছে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ে অর্থনৈতিক ও পর্যটন ইত্যাদি বিষয়ে শর্তহীন সম্পর্ক সৃষ্টি করা। প্রেসিডেন্ট সাদাত তখনও এত বড় পদক্ষেপ তথা উল্লম্ফন দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর পদক্ষেপ আরও কিছু বেশি জটিল হয়ে পড়ল, যখন দ্বিতীয় লিয়াজো ছিন্ন চুক্তির বিরোধী কিছু আরব দেশ– যার পুরোভাগে ছিল সিরিয়া– জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জায়নিস্টদের বর্ণবাদী গণ্য করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড তখন প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে পত্র লিখে অনুরোধ করেন যেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে বাধা দিতে তিনি তাঁর প্রভাব খাটান।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটি পাস হয়। প্রেসিডেন্ট সাদাত কেবল নিউইয়র্কে তাঁর প্রতিনিধি দলকে ভোটাভুটির অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকার নির্দেশনা দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না। কিন্তু হেনরি কিসিঞ্জার অথবা জেরাল্ড ফোর্ডের দৃষ্টিতে এতটুকুই যথেষ্ট ছিল না।

প্রেসিডেন্ট সাদাত কিসিঞ্জারের কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন। এতে ছিল "তিনি কংগ্রেসের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর সদস্যদের এবং ক্রেডিটস সশস্ত্র বাহিনী বিষয়ক কমিটির সদস্যদের বুঝিয়ে মিসরের জন্য আরও বেশি অর্থনৈতিক সাহায্য মঞ্জুর করানো এবং আমেরিকান অস্ত্র দিয়ে এ কর্মসূচী শুরু করা। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে, সাধারণ পরিষদের এই সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের পরিষদের এই সুযোগগুলো মিলিয়ে গেল। কারণ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এই 'অপয়া' সিদ্ধান্তে জায়ানিজমকে বর্ণবাদের সমতুল্য বিবেচনা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট সাদাত অনুভব করতে লাগলেন যে, অবরোধের শিকল তাঁর চারপাশে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। ঠিক এ মুহূর্তেই ইসরাইল অবরোধ পাড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো। মুহূর্তটি ছিল মানসিক দিক থেকে জান-কাদানির মতো।

১৯৭৬-এর জানুয়ারি মাসে বাদশাহ্ হাসান প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে যোগাযোগ করে বলেন যে, তাঁর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র রয়েছে এবং এটি তাঁর ব্যক্তিগত সামরিক উপদেষ্টা–যিনি একই সময় মরক্কোর গোয়েন্দা প্রধান (পরবর্তীতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী) জেনারেল আহ্মদ দুলাইমী–তাঁর কাছে এটা বহন করে নিয়ে যাবেন। তিনি তাঁকে অনুরোধ করেন যেন তাঁকে স্বয়ং অভ্যর্থনা জানান এবং মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শোনেন। কারণ তিনি যে বিষয় নিয়ে আসছেন সেটা হয়ত নতুন পথ খুলে দেবে। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদে ফোর্ড ও কার্টারের মধ্যে চলমান ভোটযুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে এটা হয়ত আমেরিকার বদ্ধ দরজার সাময়িক বিকল্প হতে পারে।

বাদশাহ্ হাসানের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে যে সরাসরি ও স্পষ্ট পত্র নিয়ে দুলাইমী এসেছিলেন এতে প্রেসিডেন্ট সাদাত বুঝতে পারলেন যে, বাদশাহ্ হাসান ও ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী রাবিনের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছে এবং রাবিনই বাদশাহ্ হাসানকে এমন একটি পত্র প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করেছেন।

মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়া কোন সোজা ব্যাপার নয়। এর জন্য অবশ্যই পথ পরিক্রমা পূর্ণ করতে হবে। আর এটা উভয় পক্ষের স্বার্থেই। এহেন অবস্থায় মিসর ও ইসরাইলকেই এ সব বিষয়ের লাগাম হাতে নিতে হবে এবং উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বর্তমান সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। কারণ ওখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এখনও পুরো এক বছর বাকি। এ অবস্থায় আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ওপর নির্ভর করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল জেরাল্ড ফোর্ডের পক্ষে যাবার কোন গ্যারান্টি নেই। যদি এমন হয় যে, জিমি কার্টার ক্ষমতায় এসে যান এখনও ন্যূনতম গোটা একটি বছর লেগে যাবে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের বিষয়ে সিরিয়াসলি ভাবতে। এর অর্থ হচ্ছে কোন অগ্রগতি ছাড়াই দু'টি বছর নষ্ট করা।

ইসরাইল তার ও মিসরের মাঝে সরাসরি ও যৌথ এ্যাকশনের মাধ্যমে তাঁর কাছে গ্রহণীয় শর্ত পেশ করতে আরও বেশি সাহসী হতে পারবে। এটা একই সময়ে ইসরাইলী জনমতের জন্যও সহায়ক হবে। কারণ সেক্ষেত্রে তারা তাদের সরকার ও প্রেসিডেন্ট সাদাতের মধ্যে সরাসরি কারবার শুরু করার ব্যাপারে নিশ্চিত অনুভব করবে। রাবিন বাদশাহকে বলেন যে, তিনি এও আশা করেন যে, "বাদশাহ যেটা জানেন তাও যেন প্রেসিডেন্ট সাদাতকে জানান যে, ইসরাইল নিজে থেকে বোঝে-শুনে

আগ্রহী হয়ে কোন কিছু গ্রহণ করা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র তার ওপর কিছুই চাপিয়ে দিতে পারবে না।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত পত্রের ভূমিকাস্বরূপ এ কথাগুলো চুপ করে শুনছেন আর রোষানলের ধোঁয়া ছাড়ছেন কখনও বা একটু একটু মাথা দোলাচ্ছেন। দুলাইমী আরেকটু এগিয়ে বলেন, বাদশাহ তখন রাবিনকে তাঁর কথাগুলো শব্দের সীমানায় নির্দিষ্ট করে দিতে বলেন, যার ভাষ্যই হচ্ছে এই পত্র– যা কোন পার্শ্বলিখন ছাড়াই প্রেসিডেন্টের নিকট হস্তান্তর করতে যাচ্ছি। এ পর্যায়ে জেনারেল দুলাইমী নিজের পকেট থেকে একটি পাতা বের করে পড়েন– যা রাবিন তাঁকে ডিকটেশন দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত মনোযোগের সাথে তা শোনেন তারপর যা শুনছেন তা নিয়ে দুলাইমীর সাথে আলোচনা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট ছিল এই মরক্কান জেনারেল নিছক একটি লিখিত ভাষ্যের বাহক ছাড়া কিছুই ছিলেন না। এ ব্যাপারে কিছু বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

দুলাইমী প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ শেষে বের হবার পর সাদাতের মনে পড়ল যে, তিনি যে লিখিত ভাষ্যটি শুনলেন তা তো নিজের কাছে রাখেননি। তাঁর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে দুলাইমীর পিছে পিছে হোটেল শেরাটনে পাঠালেন সেই পাতাটি নিয়ে আসতে।

কিন্তু দুলাইমী বললেন, তিনি বাদশাহর কাছে থেকে যে পাতাটি বহন করে এনেছেন, তা হস্তান্তর করতে অপরাগ। তবে তিনি প্রেসিডেন্টের খাতিরে এটার একটা অনুলিপি দিতে পারেন। এ বলে তিনি হোটেল 'শেরাটনের'একটি পাতা নিয়ে পত্রের মূলভাষ্য নিজ হাতে লিখতে লাগলেন। প্রশ্নটি ছিল ফরাসী ভাষায়। এটি নিয়ে সচিব সাহেব প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে দিলে তিনি রাগে ফুঁসে ওঠে বলেন যে, তিনি এটা আরবী ভাষায় এবং দুলাইমীর নিজ হাতের লেখা চান। সচিব সাহেব শেরাটন হোটেলে দুলাইমীর সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি তখন ঘুমাতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন। তিনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে একটি পত্র নিয়ে এখনি আসছেন। দুলাইমী চমকে গেলেন, তাঁর কাছে পত্রের আরবী তরজমা চাওয়া হচ্ছে। তিনি তাই করলেন এবং তাঁর ভাষাতেই। আবার নিজ হাতে শেরাটনের কাগজে লিখলেন, যার হুবহু ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

– চুক্তি স্বাক্ষরের পর (অর্থাৎ দ্বিতীয় লিয়াজোঁ ছিন্ন চুক্তির পর) উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে অনেক আশার উন্মেষ ঘটা সত্ত্বেও আমাদের দিকে কিছু বিপদ রয়েছে।

– শান্তি আমাদের একান্ত কাম্য। বিপদ কেটে সমাধানের পথে চাকা ঘুরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কারণগুলো দূর করার লক্ষ্যে সরাসরি গোপন আলোচনা অপরিহার্য, যা অবশ্যই ইতিবাচক ফল দেবে। কারণ বৈঠকগুলোতে

("বৈঠকগুলোতে" শব্দটি কাটা, এর বদলে দুলাইমী 'যোগাযোগ' শব্দটি প্রতিস্থাপন করেন) তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই এমন কিছু বিষয় এসে পড়ে যা মূল দু'টি পক্ষের স্বার্থের সাথে সব সময় সঙ্গতিশীল হয় না। আমরা বিশ্বাস করি যে, এ ধরনের যোগাযোগ আসন্ন বিপদ কেটে দেয়। আমি অঙ্গীকার করছি যে, সম্পূর্ণ ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এ সকল যোগাযোগ আমাদের স্বার্থেই গোপন রাখব। এ সকল যোগাযোগ শান্তির অগ্রগতির স্বার্থে চিন্তা-ভাবনা আদান-প্রদানের উপায়-উপকরণ হিসাবে সরাসরি আলোচনাও হতে পারে।

–ক্ষেত্রসমূহ ঃ সকল পেশাগত, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্র। প্রেসিডেন্ট সাদাত খুবই বিপাকে পড়েন। কারণ তিনি মধ্যপথ থেকে সূচিত শান্তি প্রক্রিয়ার সাথেও অবস্থান নিতে পারছেন না। তিনি সরাসরি যোগাযোগ এবং রাবিনের সাথে বৈঠক করাকে ভয় পাচ্ছেন বিশেষ করে সংশয় আশ্রিত এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে। কারণ দ্বিতীয় লিয়াজোঁ ছিন্ন চুক্তির পর এর গোপন সংযোজনাগুলোর তথ্যাদি চুইয়ে বাইরে চলে যাবার পর মিসর ও সমগ্র আরব বিশ্বে একটি অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। আবার এদিকে তিনি অপেক্ষাও করতে পারছেন না।

অ্যান্টিবী

"তাদের যা ইচ্ছা করতে দাও।"

—প্রেসিডেন্ট সাদাতকে গোয়েন্দা পরিচালক আগেভাগেই আন্তিবীতে ইসরাইলী বিমান ছিনতাই সম্পর্কিত তথ্য দিলে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাত এখন ভাবছেন আর তার চোখ ওয়াশিংটনের প্রতি নিবদ্ধ। তিনি প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে তাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সহায়ক কিছু একটি করতে চাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য, যে কোন তৎপরতার মাধ্যমেই মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি হোক। তাঁর বড় ভয়, পাছে এ ইস্যুটি স্থবির হয়ে পড়ে এবং এর সমাধানের পথে গতিশীলতা হারিয়ে যায়। এভাবেই তাঁর মাথায় আসে যে, তিনি নিজে মিসর ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে (১৯৭১-এর জুন মাসে) যে মৈত্রীচুক্তি করেছিলেন তা বাতিল করবেন।

ঠিকই তিনি ১৪ মার্চ ১৯৭৬, জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে এই চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে দেন। চার দিন পরই হোয়াইট হাউস ও আবেদীন প্রাসাদের মধ্যেকার হটলাইনে জীবন ফিরে এলো। উভয় প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রথম ও শেষ পত্র এই লাইনে চলে এলো। এর ভাষ্য ছিল এ রকম ঃ

হোয়াইট হাউস থেকে আবেদীন প্রাসাদে প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রতি গোপনীয় পত্র তাং ১৯ মার্চ ১৯৭৬।

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

আপনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রীচুক্তির ব্যাপারে ১৪ মার্চ জাতীয় সংসদে আপনার ভাষণে যে ঘোষণা দেন, এ পদক্ষেপে আমি আপনাকে আমার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমার সরকার ও আমেরিকার জনগণ এ কাজটিকে মিসর জনগণের আত্মসম্মান ও মর্যাদার প্রতীক ও তাদের জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রমাণ হিসাবে দেখছে।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ফোর্ড মহোদয় বরাবর সরাসরি যে পত্রটি পাঠিয়েছেন তার জবাবের একটি খসড়া অত্রসাথ আপনার সদয় বিবেচনার জন্য প্রেরণ করলাম। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমি চুক্তির বিষয়টি সরাসরিভাবে উল্লেখ করতে চাইনি। তবে পত্রের মর্ম সুস্পষ্ট। যদি আপনি খসড়াপত্র সদয় অনুমোদন করেন তাহলে এটাও সরাসরি প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের নিকট প্রেরণ করা যেতে পারে।

একান্ত শ্রদ্ধান্তে ইসমাইল ফাহ্‌মী ২০ মার্চ, ১৯৭৬ আর উসামা আল বায কর্তৃক প্রণীত পত্রের খসড়াটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

আমি ধন্যবাদের সাথে আপনার ১৯ মার্চ ১৯৭৬-এর বার্তাটি পেলাম। আমি এই সুযোগে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতি বিনিময় করতে চাই। আমি বিশেষ করে আপনার মন্তব্যটির সুযোগ গ্রহণ করতে চাই যা আমাদের অনুসৃত জোটনিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে আপনার সরকার ও আমেরিকান জনগণের মনোভাব বলে ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত সেটাই মিসরে আমাদের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলভিত্তি। এতে কি বিপদ হতে পারে সেদিকে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না। কারণ, আমাদের মর্যাদা ও পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হিসাবে আমাদের অনুসৃত মৌলিক দর্শনের সাথে এইসব সিদ্ধান্ত সঙ্গতিশীল হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আমি আপনার সে বাক্যগুলোতে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। যাতে আমাদের নীতির প্রতি জোর সমর্থন প্রতিফলিত হয়েছে। আমি নিশ্চিত প্রিয় প্রেসিডেন্ট, আপনি আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, আমাদেরকে শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে এবং একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও স্থিতিশীল শান্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য যৌথভাবে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এ প্রেক্ষাপটে আমি আমাদের সমস্যাগুলোর জটিলতা ও লক্ষ্যে পৌঁছবার উপযুক্ত সময় সম্পর্কে আমার পূর্ণ উপলব্ধি থেকে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, কোন সিরিয়াস অগ্রগতি ছাড়া যদি বর্তমান পরিস্থিতিকে ফেলে রাখা হয় তাহলে যে কোন মুহূর্তে আবার এ অঞ্চলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কারণ আরেকটি বিস্ফোরণের সকল উপকরণে এ অঞ্চল এখন গর্ভবতী (Pregnant) হয়ে আছে। কাজেই অচিরেই আমরা উভয়ে যদি দৃঢ়তার সাথে ন্যায়ানুগ শান্তির মৌলিক অনিবার্য দিকগুলোর সুরাহা না করি তাহলে এটা ঘটতে বাধ্য। আর এ ন্যায়নিষ্ঠ শান্তির লক্ষ্যে প্রয়োজন আরব ভূমি থেকে ইসরাইলী বাহিনীর পূর্ণ প্রত্যাহার এবং ফিলিস্তিন জাতির বৈধ অধিকার তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া। এ প্রসঙ্গে আপনার সাথে আমার বৈঠকগুলোর ভিত্তিতে তথা শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার গভীর চেতনায় আমি আশা করি আগামী অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই এ অঞ্চল সফর করলে ইস্যুটি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবেন। আমাদের এ প্রত্যাশায় আপনার অংশগ্রহণ একান্তভাবে কাম্য। আমার বিশ্বাস, আপনার এ সফর একটি রাজনৈতিক প্রয়োজনও বটে। কারণ এতে করে আপনি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবেন। আমার মতে আপনার এই প্রত্যাশিত সফরের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ আমি আশা করছি, এতে দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হবে এবং বিশেষ বিশেষ পয়েন্টগুলোতে আলোকপাত করা যাবে। কারণ এ ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার।

বিশ্বস্ত –

আনোয়ার সাদাত

প্রেসিডেন্ট সাদাত মিসরে ফোর্ডকে বিরাট গণসংবর্ধনা দিয়ে মন জয় করতে চাইলেন। কারণ এগুলো যুক্তরাষ্ট্র তাকে এমনভাবে চিত্রায়িত করবে যেন তিনিই হচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আশা-ভরসার স্থল। প্রকাশ ভঙ্গিটা ছিল এ রকম যে, "আরব জনগণ তাকে কতই না ভালবাসে আর প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাকে কতই না চায়।"

এদিকে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের বিশেষজ্ঞগণও তাদের প্রেসিডেন্টকে এ নসিহত করতে প্রস্তুত ছিলেন না যে, নিক্সনকে হোয়াইট হাউসের বাইরে ফেলে দেয়ার আগে তিনি যে ভাবমূর্তিতে ছিলেন সেই দৃশ্যকে পুনরাবৃত্তি করা বাঞ্ছনীয়। মনে হয় প্রেসিডেন্ট সাদাত মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি ভাবলেন যে, তার সদিচ্ছাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং সময় নষ্ট করা হয়েছে। দৃশ্যত তার মনোবল গভীরভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল। ঠিক সেই দিনগুলোতে জেনারেল গোয়েন্দা সংস্থা তার কাছে এই মর্মে কিছু তথ্য জানায় যে, একটি ফিলিস্তিনী উপদল একটি ইসরাইলী বিমান ছিনতাইয়ের ধান্ধা করছে। এই কাজটিই পরবর্তীতে "অ্যান্টিবী এ্যাকশন" হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী "AL" কোম্পানির বিমানটি ছিনতাইয়ের দায়িত্ব যে দলটির ওপর অর্পিত হয়েছে তারা অচিরেই এই অপারেশনের চূড়ান্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য কায়রো থেকে প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট সাদাত জেনারেল গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করেন। এ সময় মেজর জেনারেল কামাল হাসান আলী (পরবর্তীতে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী) এ দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি তাঁর কাছে বিস্তারিত শোনেন। এ সময় গোয়েন্দা সংস্থা প্রেসিডেন্টের নিকট নির্দেশনা চান যে, এ বিষয়ে কি করা যায়। কায়রো থেকে অংশগ্রহণকারী দলটিকে বন্দী করা সম্ভব অথবা এ সফরে যেতে তাদের বাধা দেয়া যেতে পারে যা এটা বাস্তবায়নের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু এটা অপরদিকে মিসরকে ইসরাইলের নিরাপত্তার সহায়তাকারীর রূপ দেবে, তাও আবার মিসর ভূমি থেকে অনেক দূরের একটি অপারেশনে। এরপর তিনি তাঁর নির্দেশনা দিয়ে বলেন, "এ বিষয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে যা ইচ্ছা করতে দাও।"

গোয়েন্দা পরিচালক মনে করলেন প্রেসিডেন্টের এ নির্দেশনার আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন যাতে জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাকানিজমের সামনে লক্ষ্যটি সুস্পষ্ট থাকে। তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত মন্তব্য করেন– "হয়ত এ অপারেশনে এমন একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে যে ইসরাইলীরা বুঝতে পারবে যে, এ অবস্থায় তারা দুগ্ধ ফেনিলভ বিছানার কোমল কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতে পারবে না। হয়ত এতে ফোর্ড হোয়াইট হাউসে মরা লাশের মতো বসে থাকার বদলে একটু নড়াচড়া করবেন।"

১৯৭৬-এর ১ জুলাই এয়ার ফ্রান্স বিমান ছিনতাইয়ের অপারেশন সফল হয়। তার রুট পরিবর্তন করে বেনগাজি বিমানবন্দরে ও পরে উগান্ডার অ্যান্টিবী এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বিমানে ২৫৭ যাত্রী ছিলেন। এ ছিনতাইয়ের নায়ক ছিল পাঁচজন আত্মোৎসর্গী। তাদের দাবি ছিল ইসরাইল, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানির বিভিন্ন কারাগারে আটক ৫৩ বন্দী ফিলিস্তিনীর মুক্তি। ৩-৪ জুলাই রাতে ইসরাইলী কমাণ্ডো ফোর্স এক দুঃসাহিক উদ্ধার অভিযান চালায়। এতে তারা অ্যান্টিবী এয়ারপোর্টে নেমেই সরাসরি বিমানের অবস্থান ও বন্দরের বিশ্রামাগারে আটক পণবন্দীদের ওপর আক্রমণ চালায়।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, উদ্ধার অভিযানে যাত্রী ইসরাইলী কমাণ্ডোদের বহনকারী ইসরাইলী বিমানটিকে সুবিধা দেয়ার ব্যাপারটি প্রেসিডেন্ট সাদাত অনুমোদন করেন। এই অনুমোদন আমেরিকার মাধ্যমে জানানো হয়। এই সুবিধাটি তিনি এ ভেবে দিয়েছিলেন যে, এতে বুঝি বা তিনি জেরাল্ড ফোর্ডকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন। অথচ ফোর্ড তাঁর প্রেসিডেন্ট মেযাদ শেষ হওয়া অবধি এতটুকু চেষ্টাও করেননি। কাজেই এই হৈ চৈ অপারেশন সফল হলো না। অ্যান্টিবীর পণবন্দীদের উদ্ধারের জন্য ইসরাইলী কমাণ্ডোদের আক্রমণ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় যান চলাচলের সুবিধাদি দিয়েও শেষ পর্যন্ত আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট সম্পর্কে মনোযোগী করা যায়নি।

এর চেয়েও খারাপ খবর হচ্ছে, জেরাল্ড ফোর্ড যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে টিকে থাকতে সফল হলেন না। তাঁকে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস ছাড়তে হলো। নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে জিমি কার্টারের জন্য আসন ছেড়ে দিতে হলো। স্বভাবতই তাঁর সাথে তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারও বের হয়ে গেলেন। যদিও তাঁর বহু বন্ধু জিমি কার্টারের কাছে ধরণা দিয়ে তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে বহাল রাখার তদ্বির করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল হেনরি কিসিঞ্জারের সুনাম সুখ্যাতি সঙ্কীর্ণ দলীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। তার কাছে রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্র্যাট বলে কিছু নেই। কিন্তু কার্টার রাজি হলেন না। তিনি সাইরাস ভ্যান্সকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করলেন। এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাত ছিলেন তখন একেবারেই বিমর্ষ। হতাশা যেন তাঁর সব দুয়ার বন্ধ করে দিল।

॥ ৪ ॥

আল্-আহ্রাম

"শুনুন, ...তাওফীক আল-হাকীম নোবেল পুরস্কার পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে।"
—মুহাম্মদ হাসনইন হাইকালের প্রতি প্রেসিডেন্ট সাদাত

ঘটনাপ্রবাহ থেকে এ মুহূর্তে একটি বিরাট প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে ঃ অক্টোবর যুদ্ধের সেই অভিনব সমাপ্তি থেকে নিয়ে প্রথম লিয়াজোঁ ছিন্ন চুক্তি, এরপর দ্বিতীয় লিয়াজো ছিন্ন চুক্তি পর্যন্ত কীভাবে এই মোড় পরিবর্তন সম্ভব হলো ? এই পথ পরিক্রমায় শেষ পর্যন্ত মিসরের স্ট্রাটেজিতে একটি পূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেল। কী নীরবে, কোন মোকাবিলা অথবা প্রতিক্রিয়া ছাড়াই তাকে থামিয়ে দেয়া হলো, ন্যূনপক্ষে তার চলার গতিকে শ্লথ করে দেয়া হলো। মিসর জাতি কি একটা মেষের পাল যে, তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলে চলে, নইলে থমকে দাঁড়ায়। পুরো জাতি কি তার "পবিত্র ও নিষিদ্ধ" বিশ্বাসকে ভাঙ্গার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে খুশিই ছিল ? তাছাড়া অক্টোবর যুদ্ধের পর এমনটি হওয়া কি আশ্চর্যজনক নয় ? কারণ এ যুদ্ধের মাধ্যমেই তো মিসর তথা গোটা আরব জাতি প্রমাণ করে ছেড়েছে যে, সে তার 'পবিত্র ও নিষিদ্ধ' বিশ্বাস রক্ষার্থে জ্ঞান, সাহস আর রক্ত দিতে প্রস্তুত। তাছাড়া গোটা বিশ্ব ঐ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এত ঘনিষ্ঠভাবে আরব-ইসরাইল সংঘাতকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মিসর জাতি কোন মেষের পাল ছিল না। আর এ উম্মাহও ছিল না কোন অক্ষম দর্শক। তাছাড়া বিশ্ব অক্টোবরের ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট ঘূর্ণিপাকের কোন রকম প্রভাবও পড়েনি। এই ভূমিকম্পের মধ্যে তেলের ধাক্কাও ছিল। বরং বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু বৈষয়িক কারণেই এই বিপ্লবটি সম্ভব হয়ে ওঠে। এসব কারণই এমন কিছু নিরাপদ সেতু নির্মাণ করে যা আগেকার বিপদসঙ্কুল সেতুর বিকল্প হিসাবে কাজ করে।

কিছু কারণ ছিল মিসরীয় রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক কারণ। কিছু কারণ ছিল আরব বিশ্বের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক। কিছু কারণ ছিল এটি কি বৈশ্বিক যা ছিল শক্তির ভারসাম্য ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত।

কিছু কারণ ছিল বিশ্বব্যাপী চলমান মতাদর্শগত কারণ। এক্ষেত্রে আরব বিশ্ব ছিল তাদের সামনে মধ্য দুনিয়ার অরক্ষিত ও প্রতিরক্ষা বিহীন এক নাঙ্গা ভূখণ্ড। তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় নতুনকে বোঝার বা তার সাথে সংলাপে অংশগ্রহণ ছাড়াই

চলছিল এ অংশের জীবন যাত্রা। এ সকল কারণ উৎসারিত ছিল নানান উৎস থেকে। তবে একটির সাথে আরেকটি মিশে গিয়েছিল। কখনও বা ছিল মিলিত পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপগুলো এমন সব দূরবর্তী সীমা পর্যন্ত অনুসরণ করে যাওয়া সম্ভব ছিল যেখানে সীমারেখা, রুট আর কোণায় কোণায় ছায়া বিস্তার করেছিল এবং কিছু বিন্দু তার পথ নির্দেশ করছিল ঃ

১। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে মিসরী জাতি ছিল পরিশ্রান্ত, সহিংস ও রুদ্ধশ্বাস। এ পথে তারা চলেছিল জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে–এমন এক চেইনে যেখানে দায়িত্ব ও অভিলাষের কোন শেষ নেই, লড়াই আর মোকাবিলার কোন ক্ষান্তি নেই। সেই বিপ্লাব ঘটানো থেকে শুরু করে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা বিনির্মাণ পর্যন্ত– স্বাধীনতার জন্য অব্যাহত চেষ্টা পর্যন্ত– প্রাচীর নির্মাণ পর্যন্ত, সকল বৈদেশিক স্বার্থের ভাগ্য বিধান করা পর্যন্ত, উষর মরুকে কৃষি উপযোগী করা পর্যন্ত, এ অঞ্চলে বৃহৎ শক্তিগুলোকে প্রতিহত করা পর্যন্ত, এবং ইসরাইলকে অব্যাহতভাবে মোকাবিলা করে যাওয়া পর্যন্ত।

জামাল আব্দুন নাসের অন্য যে কোন নেতার চেয়ে বেশি জানতেন যে মিসরী জাতি তথা আরব জাতিকে এই পথে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। কিন্তু তিনি যে কোনভাবে এটাও ভাবতেন যে, তার সামনে যথাসম্ভব শীঘ্র অগ্রসর হওয়া ছাড়া কোন পথ খোলা নেই। তার এ ধারণার পরিচয় তার ভাষাতেই পাই– যখন তিনি ইঞ্জিনিয়ার সেদকী সোলাইমানের সাথে একটি বৈঠকে বলেছিলেন। যখন তিনি প্রকল্প প্রধান হিসাবে উঁচু বাঁধ নির্মাণের কাজ ঠিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে সফল হওয়ার পর তাঁকে মন্ত্রণালয় গঠন করার দায়িত্ব দেন। ১৯৬৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে এ দায়িত্ব দেয়ার বৈঠকে তিনি বলেছিলেন ঃ

"উঁচু বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে মানুষ আপনাকে জানল বাস্তবায়নে সক্ষম এক পুরুষ হিসাবে। আমিও আপনার কাছে ঠিক এটাই চাই।" জামাল আব্দুন নাসের আরও বলেন ঃ "আমি এও জানি যে, দীর্ঘপথ পরিক্রমায় মানুষ এখন হাঁপাচ্ছে। কিন্তু আমাদের থেমে যাওয়া চলবে না। বরং আমরা সামনে এগিয়ে যেয়ে এমন এক বাস্তবতা সৃষ্টি করব যাতে আগামী দিনগুলোতে কারও সেখান থেকে পিছে সরে আসা কঠিন হয়।

মানুষের হায়াত আল্লাহর হাতে। আমি জানি না, কখন মৃত্যুর সময় এসে যায়। এও জানি না যে, এরপর কে আসছে। এ কারণে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে দ্রুত নির্মাণ করে যাওয়া যাতে ঘুরে দাঁড়াবার মতো কেউ ক্ষমতায় আসলেও এর থেকে পিছনে ফিরে আসা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।"

ভাবনা ও স্বপ্নের কথা বাদ দিলে বাস্তবতা ছিল এই যে, মিসরী জাতি প্রকৃতই এমন একটি দৌড় প্রতিযোগিতার পর হাঁপাচ্ছিল যার শুরু আছে, কিন্তু শেষ আছে বলে মনে হয় না।

ঠিক এই পরিশ্রান্ত মুহূর্তেই ১৯৬৭ সালের আঘাতটি এলো। এই আঘাত মিসরের জাতিগত দেয়ালে এক বিরাট ফাটল সৃষ্টি করল। এর প্রভাব জাতীয় কাঠামো পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। তখন পরিস্থিতিতে এটা ছিল সবারই জানা।

একটি মুহূর্তে প্রতীয়মান হলো যে,জাতীয় বীর বুঝি বা একজন আহত পুরুষ। মিসর জাতির সবাই বরং গোটা উম্মাহ ৯ ও ১০ জুন পরাজয় সত্ত্বেও তাঁর সমর্থন জুগিয়ে গেলে এবং এর প্রভাবকে মোকাবিলার জন্য তাঁকে ক্ষমতায় থাকার অনুরোধ জানাল, যখন তাঁর মনে হয়েছিল যে অন্য কারও হাতে ক্ষমতা দিয়ে তিনি চলে যাবেন। এ সমর্থন তাঁর জখমের জন্য এক রকম ওষুধ হিসাবে কাজ করল। তিনি এমনভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন যেন এর আগে জীবনে কখনও কাজ করেননি। তিনি উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, তিনি নির্ভরযোগ্যতা ফিরে পেয়েছেন– ঠিক যতটুকু একজন লোকের ওপর নির্ভর করা যায় তার পরিসীমা পর্যন্ত, কাজেই এখন তার ওপর কর্তব্য বর্তেছে তিনি সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করবেন, আরও ধৈর্য শক্তি বাড়াবেন আর আবেগকে আরও শাণিয়ে নেবেন যার মধ্যে অহংবোধও রয়েছে। তাঁর এ ইচ্ছা তাঁকে ছোট করেনি। তবে তাঁর কলব তাঁকে শরমিন্দা করেছে। দুনিয়া থেকে তিনি বিদায় নিয়ে গেলেন। অবশ্য প্রথম পাড়ির পরিকল্পনা প্রকল্পটিকে অনুমোদন দেয়ার পর। এ পরিকল্পনাটি হচ্ছে– “গ্রানাইট–১” ।এই বেদনাবিধুর হঠাৎ চলে যাওয়ার দৃশ্যটির সামনে মানুষ হয়ে পড়েছিল হতবিহ্বল।

তাদের কিছুই করার ছিল না। তবে তাঁর লাশটিকে বানিয়ে দিয়েছিল অশ্রুর নদীতে ভাসমান একটি নৌকা।

জামাল আব্দুন নাসেরের চলে যাবার পর মানুষ দেখল যে, তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই জমে উঠেছে। এই লড়াইয়ে তারা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, ভবিষ্যতের ব্যাপারেও অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। এরপর এ লড়াইয়ে জিতে আনোয়ার সাদাত বের হয়ে আসলেন কিন্তু সে সময় মিসর জাতির নিকট এ ছিল এক ঝুলন্ত সম্ভাবনা, কেউ তার ওজন পরিমাপ করতে সক্ষম ছিল না। কেউ নিশ্চিত ছিল না যে, এই ব্যক্তি তার নেতৃত্বের পিছনে অপেক্ষমাণ নির্দয় অভিজ্ঞতাকে জিতে নিতে পারবেন। কারণ এর ওপরই নির্ভর করছে ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ।

আনোয়ার সাদাত তাঁর শাসনের প্রথম বছরগুলোতে কোন কারিশমা দেখাবার ক্ষমতা অর্জন করেননি। তাঁকে মনে হলো যে, কেবল মানুষকে সরব ও অবিচল থাকার কিছু বাক্য বলা ছাড়া তাঁর আর কোন ক্ষমতা নেই। কখনও বা বলতেন, এ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বছর। এভাবে বছরের পিছে বছর চলে যাচ্ছে, গুরুত্বহীনভাবেই। এ সময় ধৈর্য ধরা ছিল যেমন কঠিন, অবিচল থাকাও ছিল অসম্ভব। বাস্তবে মিসর জনগণ ও আরব বিশ্ব আনোয়ার সাদাতকে যা ভেবেছিল তিনি ছিলেন তার চেয়েও বেশি

প্রতিভাবান। তাঁকে যত অক্ষম মনে হয়েছিল তিনি ছিলেন তারচেয়ে অনেক বেশি বেগবান। দেখা গেল সমাধান সম্পর্কে যখন হতাশা নেমে আসত তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেয়ার সাহস দেখাতেন। এরপর সুয়েজের সেতুগুলো পার হওয়া এবং প্রথম দিককার দিনগুলোর বিজয় ছিল বাস্তবায়িত ওয়াদা আর এমন কারিশমা যা এনে দিয়েছিল সুসংবাদ এজন্যই লোকেরা ভেবে নিয়েছিল এটাই বুঝি তাদের আগমনের কেন্দ্র। তারা যেন হাঁপ ছাড়ল। অনেকেই বুঝতে পারেনি যে, সীমিত যুদ্ধে সামরিক ফলাফল আসলে প্রকৃত যুদ্ধের সূচনা বিন্দু মাত্র। যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য– রাজনৈতিক ইচ্ছার বাস্তবায়ন। বস্তুত অধিকাংশ লোকই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। তাদের হাঁপিয়ে পড়া নিঃশ্বাস যেন তাদেরকে বেরহমভাবে থেমে যেতে এবং সম্ভব হলে বসে পড়তে বলছে। একটি পক্ষ তো তাদের স্নায়ুতে যেন হাতুড়ি পিটিয়ে যাচ্ছে। যেন তার মুষ্টি খুলে যেতে উপক্রম হয়েছে। এটা হচ্ছে এ জন্য যে, গোটা একটি প্রজন্ম তাদের সন্তানদের নিয়ে, অস্ত্রহাতে মিলিয়ন যুবক ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছর মরুভূমির সেনা শিবিরে, যুদ্ধের পরিখায় সেই সুয়েজের পাড়ে পাড়ে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সাথে বাস করেছে, তারপর সেই নদী পাড়ির মর্যাদাব্যঞ্জক দৃশ্যপট পর্যন্ত উপনীত হয়েছে। এ সময় লোকেরা চাচ্ছিল যে, তাদের সন্তানগুলো যেন ফিরে এসে তাদের লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করে অথবা সুযোগমতো কোন কাজে যোগ দেয়। অন্তত শান্তির ছায়ায় থেকে যেন আরেকটু ভাল জীবন শুরু করতে পারে।

শান্তির স্বপ্ন যেন মাদকাসক্তির মতোই অনেকের রগরেশায় প্রবহমান ছিল। বিশেষ করে যখন তেলের দরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে আরব বিশ্বের সামাজিক ভারসাম্যকে একেবারে পাল্টে দিল। এ সময় বর্ণাঢ্য ভোগ বিলাসের রঙিন আবেগে অনেকের অবশিষ্ট আকল আর দূরদর্শিতাও মিলিয়ে গেল। আজ বরং এই ঘড়ি, এই সেকেণ্ডের মোহতে ঝাঁপ দেয়ার আগে আগামীকালের প্রতি একটু নজর দেয়ারও বুঝি তাদের ফুরসত নেই। মিসরের সাধারণ লোকেরা মনে করত যে, তাদের দেশটিই বুঝি সবচেয়ে ধনী আরব দেশ। কিন্তু তাদের সামনে যে চিত্র ভেসে উঠল এতে তাদের শঙ্কা দেখা দিল যে, তারাই এখন সবচেয়ে দরিদ্র আরব দেশে পরিণত হয়েছে। তাদের উচিত ছিল, অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করে ধনসম্পদের দরজায় পৌঁছে যাওয়া। এখন তো হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে, দর আর মূল্যের মাঝে বিরাট ওলট-পালট ঘটে গেছে।

আনোয়ার সাদাত চাচ্ছিলেন যে, তাঁর জন্য জামাল আব্দুন নাসেরের বৈধতা (লিখে দিন) থেকে ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র বৈধতা প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, অক্টোবরের সিদ্ধান্ত তাঁকে নতুন আইনগত অধিকার দিচ্ছে। এতে তিনি বহুলাংশে যথাথই ছিলেন। কিন্তু এ বৈধতা অক্টোবর সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তিশীল হতে পারে না;

বরং এটা নির্ভরশীল হতে হবে অক্টোবর চেতনার ওপর। এবং এই সিদ্ধান্ত ও চেতনার বদৌলতে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি শান্তি যা প্রতিষ্ঠিত ও স্থিতিশীল হতে পারে। আনোয়ার সাদাতও তাঁর কাজে ছিলেন তাড়ায়। সত্য কথা বলতে কি তিনিও ক্লান্তই ছিলেন।

তাঁর ও মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের মধ্যে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভিয়ম রোডের মাথায় শুটিং ক্লাবে যে সংলাপ হয় সেখানে সাদাত বলেছিলেন– "আল্লাহ সাক্ষী আছেন লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আমিও ক্লান্ত , একটু বিশ্রাম চাই।" সংলাপের জন্য তিনিই এ স্থলটিকে বেছে নিয়েছিলেন যেন লিয়াজোঁ ছিন্ন আলোচনাকে ঘিরে যে ভিন্নমতের সূচনা হয়েছে তার কারণগুলো দু'জনেই খোলাখুলি আলোচনা করতে পারেন। তার জবাবে বলা হলো, "আপনি সব সময় গ্রাম সম্পর্কে কথা বলেন.........এর চরিত্র ও মূল্যবোধ নিয়ে। আমরা যদি গ্রাম সম্পর্কে এটাকেই সূত্র ধরে নেই তাহলে আপনি হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তির মতো যিনি জমি কর্ষণ করে মাটিকে প্রস্তুত করলেন এরপর বীজ বপন করে ফসলের অপেক্ষায় রয়েছেন।

আপনাকে এখন এই ফসল ঘরে ওঠাতে হবে এবং এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে তলে তলে তস্করেরা তা চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে।"

কেউ কেউ তো ক্লান্ত হতেই পারে। "যে ক্লান্তবোধ করবে তার উচিত অন্যদের জন্য ময়দান খালি করে দেয়া। কিন্তু জাতি কখনও ক্লান্ত হয় না। তারা তো চাষ করে ফসলের জন্যই। তারা কখনও সে ফসলকে রাতের আঁধারে লাপাত্তা করে দিতে নিশাচরদের জন্য ফেলে রাখে না।

প্রেসিডেন্ট সাদাত এটাকে স্থান-কাল-পাত্রের সাথে অসঙ্গতিশীল একটি দর্শন হিসাবেই গণ্য করেন। সে সময়টিতে প্রেসিডেন্ট সাদাত হেনরি কিসিঞ্জারের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সে সময় অব্যাহতভাবে তাঁর প্রকৃতি ছিল যে, তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বা যাঁর গুণমুগ্ধ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বিশেষ করে যে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকত না। এক সময় জামাল আব্দুন নাসেরই এ ধরনের ব্যক্তিত্বের ভূমিকা পালন করতেন। জামাল আব্দুর নাসেরের ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় আব্দুল হাকিম আমেরের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালের শরৎ থেকে ১৯৭৩-এর অক্টোবর (শরৎ) পর্যন্ত আনোয়ার সাদাতের ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল (এটা খোদ আনোয়ার সাদাতই পত্রিকার সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন)। এরপর বাদশাহ ফয়সলের উপদেষ্টা ও সৌদি আরবের গোয়েন্দা প্রধান কামাল আদহাম আস্তে আস্তে আনোয়ার সাদাতের ঘনিষ্ঠ হতে লাগলেন। এরপর এটি পালাক্রমে জনাব কামাল আদহাম ও জনাব ইসমাইল ফাহ্মীর মধ্যে চলছিল। তিনি অক্টোবর যুদ্ধের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। এরপর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি নিরঙ্কুশভাবে হেনরি কিসিঞ্জারের

কাছে চলে যায়, যার কাছ থেকে আনোয়ার সাদাত এ ওয়াদা নেন যে, যেহেতু তিনি অক্টোবর যুদ্ধের মাঝখানে হস্তক্ষেপ করে ইসরাইলকে সাহায্য করেন, যার দরুন (পূর্ণ না হলেও) সুস্পষ্টভাবে মিসরের বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। কাজেই তিনি এখন তাঁর সকল প্রচেষ্টা ও প্রভাব আনোয়ার সাদাতের খেদমতে খাটাবেন যাতে সামরিক বিজয় হারানোর বদলাস্বরূপ তিনি ব্যাপকভিত্তিক শান্তির বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন। প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে সেই প্রথম সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত কিসিঞ্জারই ছিলেন তাঁর ওপর সবচেয়ে বড় প্রভাব বিস্তারকারী। আনোয়ার সাদাত তখন কিসিঞ্জার যাই বলত তাই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন। কারণ এই ধুরন্ধর আমেরিকান সে সময়ে নতুন এক বিশ্বের মানচিত্র এঁকেছিলেন। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে সেই শক্তি যার ওপর সুখ আর সমৃদ্ধি বাস্তবায়নের ব্যাপারে নির্ভর করা যায়। তদুপরি সেই ছিল একমাত্র আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ যার কোন আদেশ-নিষেধ আমান্য করার ক্ষমতা ইসরাইলের ছিল না।

৮. অভ্যন্তরীণভাবে সুখ-সমৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর আনোয়ার সাদাত এবার ওয়াশিংটনে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে কিসিঞ্জারের ছিটকে পড়ার পর মনোযোগ দিলেন উসমান আহমাদ উসমানের মতো ব্যক্তিদের দিকে। তিনি তো নিজের জন্য সম্পদ গড়েছেন, হয়ত অন্যকেও সম্পদ গড়ার কাজে সাহায্য করতে পারবেন। এটা ছিল ভিন্ন এক সামাজিক মোড় নেয়ার ইঙ্গিত।

একই সময় যেসব মিসরী ও বিদেশী আগেকার বছরগুলোতে মিসর ছেড়ে আরব বিশ্ব অথবা ইউরোপে চলে গিয়েছিল তাদের শত শত লোক ফিরে আসতে লাগল। এরা ওখানে ঠিকাদারী বা এজেন্সির কাজ করে সম্পদের পাহাড় গড়েছিল। তারা যখন মিসরে ফিরে এলো, মনে হলো বুঝিবা গুপ্তভাণ্ডারের গুহার দরজা তাদের সামনে খুলে গিয়েছিল।

এ সময় এ অঙ্গনে আরও কিছু লোকের উপস্থিতিও ঘটে। এরা হয় নিজেরা দূরে সরে গিয়েছিল বা বিভিন্ন কারণে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এর অবশ্য নানান কারণ ছিল। শ্রেণী স্বার্থ ও সুবিধাদি আর খায়ের খাঁ হওয়ার মতো বিষয়ের সংশ্লেষ ছিল এতে। এসব এখন বহুগুণে বৃদ্ধিসহ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৯. আনোয়ার সাদাত যখন তাঁর নতুন বৈধতা বা সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং তাঁর বন্ধু ও ভাই (যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন) কিসিঞ্জারের যাদুকরী প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নতুন ধরনের সম্পর্ক পাতাতে আগ্রহী এবং কিছু সুখ-সমৃদ্ধির নমুনাও তাঁর সামনে রাস্তা খুলে দিচ্ছে, তার ওপর এ অঙ্গনে প্রবাসীরা ফিরে এসেছে। ঠিক এ সময়ে নতুন কাঠামোর পথ বলা যায় সহজেই ছিল। এ হবে সাবেক কাঠামোর মূলভিত্তিগুলোকে বাতিল করারই শামিল। স্লোগান তো

প্রস্তুতই ছিল— ১৯৬৭-এর পরাজয়। যেন এ পরাজয়ের কারণ ছিল নিছক কর্তব্য অবহেলা আর পিছিয়ে থাকা। যেন এটা বাস্তবে ঘটাবার পিছনে বাইরের কোন কলকাঠি কাজ করেনি। পরিকল্পনা করে পথ করে দেয়ার ব্যাপারে শরিক হয়নি। যেন ১৯৫২ সালে মিসর যে রাজনৈতিক ও সামাজিক লড়াইয়ের দৃশ্যের অবতারণা করেছে এবং যা ১৯৬৭ সালে শেষ হয়েছে, তার পিছনে ১৯৭৩ সালের বিজয় যুক্ত হয়নি। পূর্ব অভিজ্ঞতাটির সমালোচনা ছিল অনিবার্য। কিন্তু যে ব্যাপক নিন্দা সে সময় প্রচারিত হয়েছিল, তাতে মিসর জাতির যে কোন বিষয় থেকে আস্থা উঠে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই তারা যে কোন কিছুই গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, কিসিঞ্জারই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এ সমস্যাটির প্রতি প্রথম আলোকপাত করেন। তিনি ৭ নভেম্বর প্রথমবারের মতো মিসর সফরে এসে আনোয়ার সাদাতের সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে গিয়ে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সংলাপে এ কথা বলেন। তাঁকে যখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মলফিন ল্যার্ড জিজ্ঞাসা করেন যে, সাদাত যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করার ওয়াদা করেছেন তা করতে সক্ষম হবেন কিনা ? তখন কিসিঞ্জার জবাব দেন যে, 'তাঁর ধারণা সাদাত তা করতে সক্ষম অন্তত তার সে সুযোগ রয়েছে।' তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, "নাসের মিসরী সমাজে গভীর পরিবর্তনের ধারার সূচনা করেন। কিন্তু তাঁর সমস্যা হচ্ছে, তিনি এ সমাজের সনাতনী শক্তিগুলোকে হটিয়ে দিয়ে নতুন শক্তির জন্য পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এই নতুন শক্তি এখনও এসে পৌঁছেনি যে, তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াবে বা তাঁর প্রতিশ্রুত ব্যাপক পরিবর্তনের ডাকে সাড়া দেবে।"

১০. এভাবে মিসর সে সময় এমন অবস্থায় দিন পার করছিল যেন সে সমুদ্রপীড়ায় (malaie) আক্রান্ত সে তখন ভারাক্রান্ত অতীত আর আকর্ষণীয় ভবিষ্যতের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে। এরপর অবচেতন মনের আবেগকে জাগিয়ে তুলল। যেন মিসরী জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। অথবা এ দাবি যে, ১৯৬৭ সালে আরবরা যে হাতুড়ি পিটানোর নিচে পড়েছিল, সে দিনগুলোতে তারা অপদস্থ হয়েছিল। আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো তারা হয়ে গেল দরিদ্র আর দরিদ্ররা হয়ে গেল ধনী।

অক্টোবর যুদ্ধের আগে মিসরের যে মানসিক ও মানবিক সমস্যা ছিল যুদ্ধের পরও তা অব্যাহত রইল। স্বভাবতই মিসরের সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের সংবেদনশীল আবেগ ও উপলব্ধির মাধ্যমে অন্যদের চেয়ে আগেই ধরতে পেরেছিলেন যে, মিসর সমাজ এমন একটি যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে পীড়া আক্রান্ত অবস্থায় আছে, যার লক্ষণগুলো পূর্বে প্রকাশ পায় না (এরপর যুদ্ধের ফলাফলই কেবল দেখবে)।

১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে এক অভিনব ঘটনা ঘটে গেল। এটি পরে 'লেখক-সাহিত্যিকদের বিবৃতি' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সময় 'আল্ আহরাম'

(পিরামিড) পত্রিকাটি ছিল এক প্রকার জাতীয় চিন্তা-চেতনার একটি ফ্রন্টস্বরূপ যা চরম বামপন্থী থেকে চরম ডানপন্থী পর্যন্ত সব শ্রেণীর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত ছিল। আর এটা কাম্যও ছিল এমন একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কাছে যে, একটি যুগ একটি অবস্থা ও একটি সংলাপের ভাষ্য প্রকাশের দায়িত্বশীল। কাজেই বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শের মধ্যে ছেদ রাখা তার জন্য ঠিক নয়। কাজেই যে বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয় সে বিষয়েও চিন্তা করাকে স্বাগত জানানো হতো। এ ছিল অব্যাহত গতিতে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া আর নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনের জন্য এক অবিশ্বাস্য অভিযাত্রা।

এ সময় মহান সাহিত্যিক প্রফেসর তাওফিক আল্ হাকীমের অফিস ছিল বিভিন্ন মতাদর্শের লোকদের সাক্ষাৎ ও সংলাপের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সে সময় মিসরের এক বিপর্যয়কর মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিরাট অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। স্বভাবতই তারা ছিল অধিক সংবেদনশীল গোষ্ঠীসমূহের একটি। তারা ছিল বিস্ফোরণ উন্মুখ।

তখন আল্ আহরামের এ শক্তি ছিল না যে এ ভবনের অভ্যন্তরে বুদ্ধিজীবীদের সাথে দেখা করার চেষ্টায় আগত একদল যুবক শ্রেণীকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেয়। এভাবেই এক প্রকারভাবে যুব শ্রেণীর উত্তেজনা প্রবীণদের উত্তরাধিকারের সাথে সক্রিয় হয়। দেখা গেল কেউ কেউ তাওফিক আল্ হাকীমের অফিসে এসে তাঁকে প্রেসিডেন্ট সাদাত বরাবর একটি দরখাস্ত লেখার প্রস্তাব দেয়। তাদের অনুভূতি ছিল যে লোকটি তাঁর ওপর আরোপিত পরিস্থিতির হাতে বন্দী। এর বাইরে তিনি নিশ্চিন্তে একটি পাও বাড়াতে পারছেন না। আসলেও তারা তার কাছে লিখে ফেললেন। এই লিখিত স্মারক বৈরুতে পাঠানো হয় এবং আস সফীর পত্রিকায় তা প্রকাশ করা হয়। লেখক-সাহিত্যিকদের বিবৃতিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

আমরা এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী লেখক সাহিত্যিকগণ সমাজে আমাদের অবস্থান থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করে চলমান বিভিন্ন ঘটনায় প্রতীয়মান অস্থিরতার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা আমাদের কর্তব্য মনে করছি। আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্বের অনুভূতি, জাতির প্রতি আস্থা এবং রাষ্ট্রপতির জাতীয়তাবোধের মূল্যায়ন আমাদেরকে এ ব্রতে অনুপ্রাণিত করেছে।

যেহেতু আমাদের বিশ্বাস, বিপদসঙ্কুল পথে দেশ পরিচালনায় লাগাম টেনে ধরতে তিনি সক্ষম। যখন চারদিক থেকে ঘূর্ণিঝড়ে ঘিরে ধরেছে তখন দেশকে শতধা বিভক্তি থেকে রক্ষার জন্য প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। প্রয়োজন সেই দিকনির্দেশনা দেয়া, যেখানে সে নিজেকে খুঁজে পায়, নিজের ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় করতে পারে এবং আপন শক্তি ফিরে পেতে পারে।

যেহেতু লেখক ও সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের লেখনীর মাধ্যমে জাতির হৃদয়ের অস্ফুট ভাষাকে আবিষ্কার করা আর সাংবাদিকতার ভূমিকা হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদ

নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করা আর সরকারী সংস্থাগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে নির্ধারিত কিছু ঘটনার বাস্তবতা থেকে সেগুলো খতিয়ে দেখা। কখনও সেগুলো হতে পারে কোন সমাহিত ব্যাধির বাহ্যিক ফোঁড়া। অথবা বালুর নিচে চাপা গুমরিত অগ্নি থেকে উদাত্ত ধোঁয়া। সে জন্যই চিত্রকে পূর্ণতা দেয়া, সুপ্ত বিষয়কে সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করা এবং সেই বিষয়টিকে উদঘাটন করা, যা জাতির অন্তরকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এটা শুধু এ উদ্দেশ্যে নয় যে, অন্যান্য সংস্থা যে কাজ করে যাচ্ছে তার পরিপূর্ণতা দেয়া বরং এই আশঙ্কা রয়েছে যে, এই টগবগে উত্তেজনাকে এড়িয়ে যাওয়া হবে। অথচ এটা এখন মানুষের মনে ফুটছে আর বাষ্পায়িত হচ্ছে, যা যে কোন মুহূর্তে তার পথ খুঁজে নেবে বিস্ফোরণের মাধ্যমে। আর তখনই ঘটবে বিরাট বিপর্যয় আর দুঃসহ দুর্যোগ। কারণ , আমাদের সন্দেহাতীতভাবে মনে হয়, দেশ ভিতর থেকে এমনভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে যে, বলতে গেলে এটা কারও অজানা নয়। হয়ত সবাই তার অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। কিন্তু উদ্বেগ, অস্থিরতা ও অন্তরজ্বালা অনুভব করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ও নিরপরাধ যুবকরা চিন্তা-ভাবনা না করেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণ বের করে তা তাদের বিভিন্ন আলোচনায় বলে বেড়ায়, কখনবা তাদের হ্যাণ্ডবিলে লিখে দেয়। এ সকল কারণ ও ব্যাখ্যাদি বা দাবি-দাওয়া অথবা প্রতিবাদ লিপিগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে ভাসা ভাসা, অপরিপক্ক ও অনধীত। তবে এসবের পিছনে নিঃসন্দেহে যে বাস্তবতা রয়েছে সেটাই যথেষ্ট, তা হচ্ছে তাদের সবাই এটা অনুভব করছে যে, তারা কোন কিছু একটা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন এবং তারা যে অবস্থায় আছে তাতে ধ্বংস হয়ে যাবার অনুভূতি এখন তাদের পেয়ে বসেছে।

কবি-সাহিত্যিকদের বিবৃতিতে বলা হয় যে এখন ভাববার বিষয় হলো এই যে, মানুষের মনে অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা আর ধ্বংস হয়ে যাবার সাধারণ অনুভূতি কাজ করছে এর উৎস কি ? সম্ভবত এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে– তাদের সামনে পথের অস্পষ্টতা । প্রতি মুহূর্তে এখন লড়াইয়ের উচ্চ চিৎকারই শোনা যায়। লড়াই যেন একমাত্র পথ। সম্ভবত এটাই তাদের প্রশ্নাবলীর জবাব এবং এটাই তাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল পথ। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্র এটাকেই জবাব হিসাবে বা ভবিষ্যতের আঁধিয়ার পথে চলার চেরাগ হিসাবে পেশ করতে চেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দিন যায় আর লড়াই শব্দটি যেন রহস্যময় হয়ে যায়। এর যেন কোন সীমা নেই। এর মর্মের যেন কোন পরিসীমা নেই। এর উপায় উপকরণের নেই কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এ যেন মুখ থেকে বের হওয়া একটি সাধারণ শব্দ। যেন বহুবার চিবানো এক লোকমা ভোগ্যপণ্য। সকাল-সন্ধ্যা লোকেদের সকল কবিতার পয়ার, গানের ছন্দ, ভাষণ আর স্লোগানে স্লোগানে এ শব্দটি ঘুরছে ফিরছে। এত করে এর শক্তি ও সক্রিয়তা বরং সত্যতাও হারিয়ে গেছে। মুখ গহ্বরে চর্বিত চর্বন লোকমাটি হয়ে গেল একটি ঢোক,

যা না তারা গিলতে পারছে, না তারা তা ফেলে দিতে সাহস পাচ্ছে। তারা যেন উদ্‌ভ্রান্ত। তাদের সামনে আবার যেন পথ বন্ধ, অথচ তারা নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছে। যেহেতু যুব শ্রেণীই হচ্ছে জাতির সংবেদণশীল অংশ। তারাই অন্যদের চেয়ে ভবিষ্যৎকে বেশি ভাবে। অথচ তারা তাদের সামনে অপয়া আগামীকাল ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই সে এখন তার অধ্যয়নে বেশ খাটুনি দিচ্ছে, যাতে তার শেষ সনদটি লাভ করতে পারে। কিন্তু সহসাই সে এ সাটিফিকেটকে যুদ্ধ ফ্রন্টের বালুতে ছুড়ে মারল। যা শিখেছে তা ভুলে গেল। অথচ তার সামনে কোন শত্রু পেল না যার সাথে সে লড়বে। এটাও একটি ধ্বংস। আর বাকি দেশবাসীরা সে তুলনায় কঠিন জীবনযাপন করছে। পাবলিক সার্ভিস খুবই খারাপ। সকল অপ্রতুলতা, অনীহা, স্থবিরতা আর বেহুদা আচরণ লড়াইয়ের আওয়াজের পিছে চাপা পড়ে রইল। লড়াইয়ের অপেক্ষায় পড়ে রইল। লড়াইয়ের সাথে জড়িয়ে রইল। সহসাই তাদের কাছে মনে হলো বিষয়টি যেন পর্যবসিত হলো– এক নিদারুণ পরিহাস, ক্রোধ আর গণরোষে। বর্তমান দিনগুলোতে এটাই মনে হয়। এই পরিস্থিতির একটি দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। কেবল সত্যেই এর সমাধান সম্ভব একমাত্র সত্যেই। কারণ সত্যই হতভম্বতার অবসান ঘটাতে পারে। মানুষকে বোঝ দিতে পারে এবং তাদেরকে শান্ত করতে পারে।

কারণ পাতিলের ভিতর যা বলকায়, ঢাকনা উঠিয়ে নিলে তা শান্ত হয়ে যায়। এখন জাতি কোন কিছু দিয়ে নিজেকে বোঝ পেতে চায়। কারণ সে এখন অপরিতৃপ্ত। তার সামনে বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে মেলে ধরলেই সে বোঝ পেতে পারে, তার হৃদয় শান্ত হতে পারে। এ জন্য রাষ্ট্রের চলমান কিছু প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ব্যাপারে নজর দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মত ও চিন্তার স্বাধীনতা, আলোচনা ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। যাতে সব কিছুতে আলোকপাত করা যায় এবং এভাবে দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা হতে হবে সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরেই যদি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে গোপনীয়তার প্রয়োজন থাকে। অর্থাৎ চিন্তাবিদ বা বুদ্ধিজীবীদের ওপর রাষ্ট্র আগে থেকে কিছু চাপিয়ে দেবে না। তাহলে তো তারা কেবল ঢোলের মতোই প্রতিধ্বনি তুলে তাকে প্রচার প্রসার করল।

বরং রাষ্ট্র মনোযোগ দিয়ে আগে শুনে তারপর নিজের মত প্রকাশ করবে। তাকে প্রথমে শুধু মিসরের মুক্ত চিন্তার প্রতি আন্তরিক ও আগ্রহী হতে হবে। সে তার মতটি জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের থেকেই গঠন করবে। এভাবে নয় যে, নিজে একটা মত গঠন করে তাকে প্রতীক হিসাবে নিয়ে, এরপর জনগণের দিকে ছুঁড়ে মারবে, যেন তাদের এটা গ্রহণ করতেই হবে।

সময়ের এ সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্র নিজের দায়িত্বভার হাল্কা করে জাতির পিঠে রাখতে পারে। এতে তারই স্বার্থ রয়েছে এবং ইতিহাসের সামনেও পরিষ্কার থাকতে

পারবে। সোমবার, ৮ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সাল "সাহিত্যিকদের এ পত্রের অর্থ হচ্ছে তাঁরা প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট চাচ্ছেন যে তিনি লড়াইয়ের কিস্‌সা থেকে যেন নজর ফিরিয়ে নেন এবং শান্তিপূর্ণ কোন সমাধানের পথ খুঁজে নেন, তারা এর পথ সুগম করার জন্য সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছেন।"

ও সকল সাহিত্যিকদের সমস্যা হচ্ছে যে, তারা জানত না যে লোকটি একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করে যাচ্ছে। তিনি সমাধানের জন্য অন্য পথও খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যদি সে পথ লড়াইয়ের পথও হয়। প্রেসিডেন্ট সাদাত লেখক ও সাহিত্যিকদের বিবৃতি পড়ে এর লেখক ও স্বাক্ষরকারীদের প্রতি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন যে, সমাধানের লড়াইয়ে তিনি তার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সাধ্যমতো যুদ্ধের জন্যও সামর্থকে বিন্যাস করে চলেছেন। তিনি খাপ্পা হয়ে উঠলেন, কারণ যারা এসব জানে না তারা ঠিক এ সূক্ষ্ম সময়টিকেই বেছে নিয়েছে তাকে বিব্রত করতে এবং এমন বিষয়ে তাকে জড়াতে যার পরিকল্পনা আর হিসাব নিকাশের সময় এখনও আসেনি। ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট সাদাত সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের তথা প্রচার মাধ্যম সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকের সুযোগকে কাজে লাগালেন। লেখক–সাহিত্যিকদের বিবৃতির প্রতিবাদ করলেন ঠিক এ ভাষায় ঃ "এটা বড়ই আহমকি যে, একদল লেখক লড়াইকে হিংসা ও সুযোগ সন্ধানী কালিতে প্রকাশ করে ভবিষ্যৎকে এমনভাবে চিত্রিত করেছে যাতে হতাশা, অপদস্থতা আর পরাজয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়।" এরপর প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রচণ্ডভাবে উস্তাদ তাওফিক আল্ হাকীমের ওপর আক্রমণ শানিয়ে তার কলমকে কালে বিষে ভরা কলম বলে অভিহিত করেন। আরও বলেন, "তাঁকে বালখিল্যতায় পেয়ে বসেছে, যা জানে না, তা নিয়েও বাচালতা করেন।" তাওফিক আল হাকীমের মতো অবস্থানের একজন ব্যক্তির ব্যাপারে এটা গ্রহণ করা অথবা চুপ থাকা কঠিন ছিল। তাই মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল (তৎকালীন আল আহরামের এমডি ও প্রধান সম্পাদক) তখন মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেন যাতে প্রেসিডেন্ট সাদাতের রাগ কিছুটা পড়ে। এ সময় প্রেসিডেন্ট প্রচণ্ড গোস্‌সায় ছিলেন, কোন কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছেন না। তিনি বলেন, "শোন তাওফিক আল্ হাকীম নোবেল পুরস্কার লাভের স্বপ্ন দেখছে। ভাবছে ইহুদীরাই কেবল তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। সে তা পাক, কি না পাক, এতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি কাউকে এ সুযোগ দেব না যে, যুবকরা যে কষ্টে জীবনযাপন করছে এটাকে পুঁজি করে তাদের মধ্যে হৈ চৈ সৃষ্টি করতে পারে।" কয়েক দিন না যেতেই প্রেসিডেন্ট সাদাত সরাসরি মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের সাথে যোগাযোগ করে বলেন, "আপনি জানেন, তাওফিক আল হাকীম এখন জামাল আব্দুন নাসেরকে আক্রমণ করে একটি বই

লিখেছেন ?" হাইকাল তখন তাওফিক আল হাকীমকে প্রশ্ন করলে তিনি তা অস্বীকার করেন। হাইকাল প্রেসিডেন্ট সাদাতকে তার এ অস্বীকারের কথা জানালে তিনি আরও বেশি করে ক্ষেপে যান এবং বলেন, " আমার কাছে সাধারণ গোয়েন্দা বিভাগ ঐ বইয়ের কয়েকটি পরিচ্ছেদ নিয়ে এসেছে।

আমি আপনার কাছে এগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি যাতে নিজের চোখে দেখে বিচার করেন এবং আমার সামনে আর তার পক্ষ হয়ে কথা না বলতে পারেন।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত ঐ গ্রন্থের তিনটি পরিচ্ছেদ পাঠিয়ে দিলেন। এগুলোর রচনাশৈলী থেকে সুস্পষ্ট যে এগুলো তাওফিক আল্ হাকীমেরই লেখা। হাইকাল তখন তাওফিক আল হাকীমের অফিসে গেলেন। সামনে বসা তিনজনকে অনুরোধ করলেন যেন তার বন্ধুর সাথে একান্তে কথা বলতে একটু সময় দেন। এরপর তিনি ঘটনাটি খোলাখুলি বলে ফেলেন। তাওফিক আল্ হাকীম এর উত্তরে যা বলেন তার মূল কথা হচ্ছে- "ঠিকই তিনি এই পরিচ্ছেদগুলো লিখেছেন। তবে এগুলো খসড়া বা একটা চেষ্টা হিসাবেই লিখেছেন। এগুলো কোন বই বা বইয়ের পরিচ্ছেদ নয়।" পরে তাওফিক আল্ হাকীমের "আওদাতুল ওয়াঁঈ" শিরোনামে একটি বইয়ে ঠিক এই পরিচ্ছেদগুলোই অন্যান্য লেখার সাথে প্রকাশিত হয়। এ ছিল আরেকটি লম্বা চওড়া ঘটনা, যা এখানে বলার অবকাশ নেই। যাক, মূল কথা এই নেতিয়ে পরা ভাব- এমনকি অক্টোবর যুদ্ধের পরও এবং এর সমাপ্তিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও চুক্তিসমূহের কারণে- মিসরকে ঘিরে রেখেছিল এবং সম্পদের উচ্চ-শিখর থেকে দারিদ্র্যের গভীর গর্তে তা ছিল প্রবহমান, চিন্তার জগত থেকে ধ্বংসের গুহা পর্যন্ত বিস্তারিত। এ ছিল আরেক সুদীর্ঘ কাহিনী। যে কোন ভাবেই হোক সে সময় ইসরাইলের সাথে চুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছিল। যেন এটা একটা যুদ্ধসঙ্গত বিবেচনা এবং সময়ের আবেদন। এই বিবেচনার জন্য যেসব চুক্তি বিন্যাস করা হয়েছিল তা যেন এ রকম ঃ

আমরা যৌথ আরব এ্যাকশনকে পরীক্ষা করে দেখেছি। এতে কোন ফলোদয় হয়নি। তাই নয় কি ? আমরা ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে সোভিয়েত অস্ত্রকে ব্যবহার করে দেখেছি। সেখানেও ইসরাইল আমেরিকান অস্ত্র দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দেখাল। তাই নয় কি ?

আমরা অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মোকাবিলা করার বিষয়টিও পরীক্ষা করে দেখলাম। অথচ সে আমাদের উপর নিজেকে চাপিয়ে দিল। তাই নয় কি ? যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এখন একটাই পথ আছে তা হচ্ছে তাকে সম্পর্কের এমন একটি রূপের কৌশল গ্রহণ করবার জন্য ছেড়ে দেব যা আমাদের ও ইসরাইলের মাঝে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকবে। তাই নয় কি ?

আমরা ঐ সকল বিকল্প নিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অর্থ-কড়ি ব্যয় করেছি, রক্ত দিয়েছি। তারপর এই তো ফল হল- তাই নয় কি ?

এখন একটি মাত্র বিকল্পই অবশিষ্ট রয়েছে, তা হচ্ছে ইসরাইলের সাথে একসাথে কাজ করা। কারণ এটা হচ্ছে এমন এক বাস্তবতা যাকে অস্বীকার করা কঠিন।

তাছাড়া এ বিকল্পটিকে আমরা কখনও পরীক্ষা করে দেখিনি। হয়তো এতে কিছু ফলও হতে পারে– তাহলে তা করতে বাধা কোথায় ? এই সব যুক্তি তার চেয়েও দূরে ফিলিস্তিন ইস্যু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই যুক্তিগুলোর পক্ষে এ অঞ্চলের ইতিহাস বাস্তবতা ও এর ভবিষ্যতের কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। তারা কেবল এ কথার উপরই জোর দিচ্ছে যে, ফিলিস্তিন জাতি নিয়ে আমাদের কি ? "তারাই তো তাদের জমিজমা ইহুদীদের কাছে বিক্রি করেছে। এই যদি হয় তাহলে আমাদের কি গরজ ঠেকেছে যে সেই জমি তাদেরকে ফেরত এনে দেব ?" তারা তো তাদের জিলেপি (কুনাফা) আর পেষ্ট্রি (বাকলাওয়া) ইত্যাদির ব্যবসা নিয়ে বেশ ব্যস্তই আছে। কেউ কেউ তো আরও দূরে বাহু বিস্তার করে বলেই ফেলেছে– "আমরা তো দীর্ঘকাল ধরে ইহুদীদেরকে চিনি, তাদের সাথে কাজ-কারবারও করেছি। তারা আমাদের মুক্তি ও নতুন রোডে বণিক হিসাবে ছিল। তারা আমাদের কাছাকাছি ইহুদী পট্টিতে শান্ত ও নিরীহভাবেই তো ছিল।"

এটা যারা বলছে তারা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে যে, এটা তো ইহুদী হওয়ার ব্যাপার নয়। কারণ আমরা যেসব ইহুদীকে জানি তারা হচ্ছে গিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার এবং এখানকার সংস্কৃতির। আর যে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে আমাদের মোকাবিলা করছে তারা হচ্ছে ভিনদেশী।

তারা এসেছে কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী বা তার আশপাশ থেকে। আমরা যেসব ইহুদীকে চিনি বা তাদের সাথে কাজ-কারবার করেছি তারা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের। আর যে সকল ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি তারা হচ্ছে পূর্ব ইউরোপের।

যেসব ইহুদীকে আমরা চিনি এবং যাদের সাথে আমরা চলাফেরা ও কাজ-কারবার করেছি তারা তো হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের, আর যেসব ইহুদীর সাথে আমরা যুদ্ধ করেছি তার হচ্ছে পূর্ব ইউরোপের!

যখন প্রেসিডেন্ট সাদাত ৯ নভেম্বর ১৯৭৭ তারিখে সংসদে দাঁড়িয়ে ইসরাইলের সাথে লিয়াজো ছিন্ন চুক্তি উপনীত হওয়ার চেষ্টাকে তুলে ধরছিলেন তখন তার কথা ছিল ঃ

"আমরা তো সব ক'টি সম্ভাবনাকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি, এখন সময় এসেছে শান্তির সম্ভাবনাকে পরখ করে দেখার।"

এদিকে ওয়াশিংটন বা জেনেভা অথবা কিলো ১০১ কিংবা আসোয়ানে প্রেরিত ইসরাইলী প্রতিনিধি দলের আচার-আচরণে একই দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনা বা ধারণা প্রতিফলিত হয়নি। বরং সেখানে তাদের পুরো গতিবিধিই ছিল– প্রখ্যাত কূটনীতিক

"ক্লাউজভেটস" এর ভাষায় "যুদ্ধ তবে ভিন্ন পন্থায়।" এসব কিছুর সাথে আরও ভয়াবহ প্রক্রিয়ার অবতারণা হয়। সেটা হচ্ছে, বাস্তবতার ভিত্তিতে ইসরাইলের সাথে শান্তির ধারণা গ্রহণে আরব বিবেককে বশ করানোর প্রক্রিয়া। সেদিনগুলোতে কিসিার ছিলেন আরেকজন! যিনি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার কথা বলতেন। তাঁর লেখায়, কথাবর্তায় আর দুঃসাহসিক সব রাজনৈতিক পদক্ষেপে এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার শব্দাবলী প্রকাশ পেত। আরব ও মিসরের অনেক চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, বিশ্বে নতুন কিছু একটা হয়েছে। ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকেই কেউ কেউ প্রকৃতই বিষয়টি টের পেয়েছিলেন। কিন্তু অক্টোবর যুদ্ধের আগে-পরের বিবর্তনগুলো সবাইকে এমনভাবে নাড়া দিল যেন সবাইকে ঝাঁকি দিয়ে ঘুম থেকে উঠাল। সবাই অপ্রস্তুত হয়ে বিষয়টি জানার জন্য দৌড়াল। তবে সেই সূচনা লগ্নে বিশ্বের পরিবর্তনশীল এই নতুনের সূক্ষ্ম সুরতহাল করা যায়নি। এ জন্যই মিসর ও আরবের বহু চিন্তাবিদ কেবল ততটুকুই বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন যতটুকু তাঁরা দেখতে পেতেন, এর বেশি নয়। চিন্তাবিদের বেলায় যা হয়, তা হচ্ছে তিনি কেবল বিদ্যমান ঘটনার তরজমা করেন, সংলাপে বা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করেন না!

আবার এদিকে অনেক শক্তি তাদের অজ্ঞাতে এই নতুন বিশ্বের দিকে মিসর তথা আরব 'চিন্তাধারার অভিযাত্রার কর্মসূচী আর ধারা-উপধারার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল।

১৯৭৪ সালে আমেরিকা ও ইউরোপে প্রায় ছ'শরও বেশি চিন্তাগত সেমিনার ও সাক্ষাৎকারের জন্য আরব চিন্তাবিদ ও সংস্কৃতিকর্মীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এসব সেমিনার হয়েছিল নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ওপর, অথবা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পর্কের ওপর, কিংবা আরব-ইসরাইল সংঘাতের ওপর। কখনও বা ভূমধ্যসাগরের পানি-সম্পদে সহযোগিতা নিয়ে অথবা এমনি কত শত বিষয়!

এভাবে হঠাৎ করেই শত শত ফাউণ্ডেশন-সংস্থা ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটল যারা এসব চিন্তার ফল বা 'মতবাদিক ভ্রমণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিল–সে সব আরব জনমতের নেতাদের জন্য বা যাঁরা নিজেদেরকে এমনটি ভাবতেন। এ সব সংস্থার কর্মতৎপরতা অনেকটাই প্রচলিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর মতোই ছিল, যদিও ক্ষেত্র ছিল ভিন্ন। পর্যটকরা আগে যেখানে দেখতে যেতেন ভার্সাই প্রাসাদ, লণ্ডন টাওয়ার, সানপেট্রো গির্জা বা হলিউডের স্টুডিও, এখন এসবের বদলে তাদের কাফেলাগুলোর গন্তব্যস্থল হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ও সংস্থা, যারা সেমিনারের আয়োজন করছে। তারা এসব করছে এমন ব্যক্তিদের অর্থায়নে যাদের আগ্রহ এসব কর্মসূচীতে রয়েছে।

সফরে টিকিট ছিল প্রস্তুত, হোটেলের কক্ষও ছিল সংরক্ষিত, আর কর্মপত্রগুলো ভরা ছিল এমন সব জিনিসে, যাকে বলা যায়,স্নায়ু গ্যাসে ভরা মাইন। প্রথমদিকে

এগুলোতে অংশ নিত ইহুদীরা। এরপর শান্তির দলের ইসরাইলীরাই অংশ নিত। তারপর অংশগ্রহণ করত ক্ষমতাসীন দলের ইসরাইলীরা।

বরফ গলতে শুরু করল। এর পর তো কোন আরব চিন্তাবিদ বা সংস্কৃতিসেবীর মর্যাদা ও 'আধুনিকতা' পরিমাপ করা হতো, তিনি কতগুলো আন্তর্জাতিক সেমিনারে দাওয়াত পেয়েছেন তার ওপর। অনেক মিসরী ও আরব বুদ্ধিজীবী ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলেন। তাঁরা নতুন যমানার রূপ দেখার ও জানার মৌলিক ও আন্তরিক আগ্রহ নিয়েই গিয়েছিলেন। নতুন যমানার সংলাপে তাদের প্রবেশ করার অধিকারও ছিল। কিন্তু সমস্যাটি ছিল, তাঁরা নিজেদেরকে এর জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত করতে পারেননি। হয়ত সেই সুযোগও তাদের ছিল না।

অপরদিকে অন্যরাই কিন্তু বিষয় নির্ধারণ করেছিল, আলোচনায় অনুচ্ছেদ আর পর্বগুলোকে স্থির করে দিয়েছিল। আবার কেউ তো এমন ছিল যে তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব চয়ন করে নিয়ে তা-ই আবার অন্যখানে ঢেলে দিতে চাইত। তা দিয়ে প্রভাবিত করে, পারলে তাকে নিয়ে আরেকটু উপরে উঠতে চেষ্টা করত। সঙ্কট সমাধানের পটভূমি রচনার লড়াইয়ে এই আরব চিন্তাধারাকে বশ করার লড়াইটি ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি আসাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল "পবিত্র ও নিষিদ্ধ" ধারণা থেকে উৎসারিত কিছু শর্তকে ঢিলে করে দেয়া।

মোদ্দা কথা আরব বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীরা অন্য যে কারও চেয়ে বেশি ঘোরতালে পড়ে গিয়েছিল। কারণ নতুন বিন্যাস-ব্যবস্থা কেবল মৌলনীতি আর দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাদের চমকে দেয়নি বরং যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রভাবও তাদের চমকে দিয়েছিল। এ স্রোত তাদের প্রত্যাশারও অতীত নিমজ্জিত করে ফেলেছিল। তারা আরব বিশ্বে অনিরুদ্ধগতিতে ও দ্রুতলয়ে যে পরিবর্তনগুলো প্রত্যক্ষ করেছিল তাতেও চমকিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাদের সামনে ঘটমান বিষয়গুলোর কোন মৌলিকায়ন, পরীক্ষণ অথবা ব্যাখ্যায়নে তাদের অংশগ্রহণ ছিল না। তবে কোন না কোনভাবে মৌলিক পরিবর্তনগুলো ঘটছিল সেসব লোকদেরই সাংগঠনিক কাঠামোতে যারা মৌলিকায়ন, পরীক্ষণ আর ব্যাখ্যায়নের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে থাকেন।

বিপ্লবের আগে একটি অনুসরণকারী সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয় ছিল কিন্তু বিপ্লবের পরে বিশেষ করে, সুয়েজের পর আরেক সমন্বয়ের সূচনা হলো।

আরব জাতীয়তাবাদের উচ্ছ্বসিত আবেগ যখন তার সুদূরপ্রসারী সামাজিক প্রভাব নিয়ে শিক্ষা ও শিল্পে প্রবেশ করল এবং নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি সমাজের উচ্ছল জাগ্রতি দেখা দিল তখন আরব মননে অতি আত্মবিশ্বাস এসে পড়ল যা সহসাই একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আলস্যে পরিণত হলো। জাগল সেই ১৯৬৭-এর ধাক্কায়। যখন অনেকেই

অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরাশায়ী হলো (যেমনটি মিসরী প্রবাদে বলা হয়ে থাকে–বাথরূমের দেয়াল ধসে পড়ল) তখন পরাজয়ের ওপর ভৎসনা ঝাড়া ছাড়া তাদের আর সাফাই গাওয়ার কিছুই ছিল না। তাদের প্রতি ঠিক কথাটাই বলা হয়েছিল।

অনেক পরে তারা আবিষ্কার করল যে, আসলে তো তারা ছিল সন্দেহের বলি। ওসবই ছিল দায়িত্বহীন প্রক্রিয়া আর এক ধরনের পলায়নপরতা– হোক না তা সামনের দিকে পলায়ন। প্রতিনিয়ত বুদ্ধির দৌড়কে পিছনে রেখে ঘটনাবহুল পরিবর্তনগুলো এগিয়ে যেতে লাগল। প্রতিদিন যেন এই সঙ্কট স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকল।

পরিশেষে দৃশ্যপটে আরেকটু যুক্ত হলো, প্রেসিডেন্ট সাদাতের কিছু নতুন নৈকট্যভাজন লোকদের মনে জাগল যে, মানুষের মনে ব্যাপক পরির্তনগুলো নির্গমন সহজ করার মতো কিছু জিনিস আছে। তা হচ্ছে, মোটামুটি সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের চেতনায় যে মূল্যবোধগুলো এখনও সুসংহত আছে তা কাজে লাগানো। এ প্রক্রিয়ার সূচনায় যুব শ্রেণীর মধ্যে হতে ধর্মীয় ভাবাপন্ন মহলকে অনুপ্রবেশ দেয়া হলো। উদ্দেশ্য ছিল, যেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-তরুণীদের মাথায় এই বিষয়টি ধরিয়ে দিতে পারে যে, বিভিন্ন চিন্তাধারাকে বিতাড়িত করতে সক্ষম এমন চিন্তা-চেতনা নিয়ে তারা যেন এগিয়ে আসে। এতে করে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আর সিদ্ধান্তের ওপর যুবকদের চাপ হাল্কা হয়ে যাবে। বাস্তবতার মাটিতে ফল হলো এই যে, বিভিন্ন মতাদর্শের সাথে তাদের চিন্তা ও মতাদর্শের সংঘাত ঘটল। বিষয়টি এরপর মতাদর্শের সংঘাত থেকে গড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হাতাহাতি, লাঠালাঠি আর শ্বেত অস্ত্রবাজিতে রূপ নিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জানুয়ারি ১৯৭৭ ও এর পরের ঘটনা!

যখন কোন সমাজে সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর বৃত্ত প্রসারিত হয়ে হাজার হাজার মানুষকে তার অন্তর্ভূক্ত করে নেয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় সহিংসতার বৈশিষ্ট্যটি রাজনৈতিক। এই বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক হওয়ার অর্থ হচ্ছে এর চিকিৎসা কেবল নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর ন্যস্ত থাকা অসম্ভব। তখন এর বিহিত ব্যবস্থা হতে হবে অবশ্যই রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে। না হয় এ হবে আগুন নিয়ে খেলা। কারণ এই সহিংসতা ক্রমেই দ্রোহে রূপ নেবে আর এই দ্রোহ পৌঁছে যাবে বিপ্লবের পর্যায়ে!

॥ ১ ॥

কার্টার

"ক্ষেপা ষাঁড় লাল রুমাল দেখলে যেমনি তেড়ে আসে, ব্রেজনেভ আমার সাথে সে রকমই আচরণ করেছেন।"

—প্রেসিডেন্টের নিকট মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর রিপোর্ট

১৯৭৭-এর ১৮ জানুয়ারি সকাল সাড়ে এগারোটায় প্রেসিডেন্ট সাদাত আসোয়ানের খাজ্জান অবকাশ কেন্দ্রের বাগানে বসে লেবাননী সাংবাদিক মিসেস হুদা হুসাইনীর সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সাংবাদিক মহিলা তাঁর কথায় মনোযোগ না দিয়ে বার বার তাঁর পিছনের দিকে দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে কিছু একটা বুঝতে চাইছেন। এ ধরনের আচরণে তিনি অবাক হলেন। সাংবাদিক অনুভব করলেন যে, তার এ আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। তাই তিনি বললেন, তিনি দেখছেন শহর থেকে একটি ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে— মনে হয় বেশ দূরে দৃষ্টির শেষ সীমানায়। প্রেসিডেন্ট সাদাত সেদিকে ফিরে দেখলেন কয়েকটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কিন্তু এর প্রতি বেশি একটা নজর দিলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই একজন নিরাপত্তা অফিসার হন্তদন্ত হয়ে তার কাছে এসে একটি চিরকুট দিলেন। এটি পড়তে গিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতের কপাল ঘেমে গেল। আলোচনা অসম্পূর্ণ রেখেই সেই লেবাননী সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎকার শেষ করে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে পড়লেন। ঘটনার অনিরুদ্ধ গতি ছিল তার চেয়েও দ্রুততর।

প্রেসিডেন্ট সাদাত যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখেছিলেন তা ছিল গণরোষের দৃশ্যপটের একটি পলক মাত্র। দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের পর (১৭ জানুয়ারি ১৯৭৭) এ নিয়ে গণরোষের সৃষ্টি হয় এবং ঘটনা অনেক দূর গড়ায়। পরবর্তীতে এ ঘটনা পরিচিতি পায় "১৮ ও ১৯ জানুয়ারির বিক্ষোভ" বা খাদ্যের বিক্ষোভ হিসাবে। এর তৃতীয় নাম দিলেন খোদ প্রেসিডেন্ট সাদাত— 'লুটতরাজের অভ্যুত্থান।'

১৮ ও ১৯ জানুয়ারির ঘটনাপ্রবাহকে যে অভিধায়ই অভিষিক্ত করা হোক না কেন, এ ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল মিসরের মধ্যবিত্ত ও এর কিছু উপর-নিচের জনতার উচ্চকণ্ঠ বিক্ষোভ। এ বিক্ষোভ ছিল অক্টোবর যুদ্ধ থেকে উদগত সামাজিক ফলাফলের বিরুদ্ধে।

কারণ দেশমাতৃকার প্রতিরক্ষায় যে জাতীয়তাবাদীরা তাদের উত্তম সন্তানদের দান করেছিল তারা কর্তব্য সাধনে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে। অনেক ধৈর্য ধরেছে শুধু

এই ভেবে যে, একদিন এই কঠিন যুদ্ধের দিনগুলোর অবসান হবে এবং তখন তারা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল, আনোয়ার সাদাতের গৃহীত নীতিতে যুদ্ধের ফসল ব্যবসা-উদ্যোগীরাই ঘরে তুলল। এ যেন মিসরী জীবনধারার ওপর হঠাৎ করে আবির্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য গনিমতের মাল। এরা কোন চেষ্টা-শ্রম ছাড়াই বিপুল ধনসম্পদ ছিনতাই করে নিয়ে যচ্ছে।

কেউ কেউ যে বিপুল ধনসম্পদের মালিক হয়েছিল তার ছিল না কোন প্রকাশ্য বা বৈধ উৎস। বরং এক ঐতিহাসিক মুহূর্তকে যে 'উবূর' (নদীপার) শব্দের অভিধায় ব্যক্ত করা হয়, নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তার অবমূল্যায়ন হয়ে এখন 'উবুর' অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'পাড়ি দিয়ে' সম্পদের পাহাড়ে পৌঁছে যাওয়া। এই 'উবূর' যেন ধনী হওয়ার সেতু অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। সব যেন অন্ধকারে সন্দেহের গুহায় সম্পন্ন হচ্ছে, আলো না আগুনের খেলা চলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

প্রেসিডেন্ট সাদাত জাতির সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণে এই সরোষ বিক্ষোভে চমকে গেলেন। এই বিক্ষোভের পুরোভাগ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের জীবন দিনকে দিন অসম্ভব হয়ে উঠছিল। এই ইঁচড়েপাকা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তাদের আবেগ-অনুভূতি এবার বিস্ফোরিত হলো। হঠাৎ দেখা গেল লাখ লাখ লোক রাস্তায় নেমে উচ্চকণ্ঠে বিক্ষোভ জানাতে শুরু করেছে।

এই গণরোষের কথা প্রেসিডেন্ট সাদাত ভাবতেও পারেননি। বিশেষ করে এত দৃঢ়চেতা ও এত প্রচণ্ড বিক্ষোভ। তিনি ভেবেছিলেন অক্টোবরের সিদ্ধান্ত তাঁকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছাড় দিয়ে রাখবে। কিন্তু হঠাৎ তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। তিনি এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে লাগলেন। বিশেষ করে তিনি যেখানে একই আরব নীতি গ্রহণ করে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন সেখানে এ ঘটনাকে তিনি তাঁর মর্যাদাহানিকর হিসাবে গণ্য করলেন। কারণ তিনি একক সিদ্ধান্তে মধ্যপ্রচ্যের সঙ্কট সমাধানের ৯৯% কাগজপত্র যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রাখলেন। এখন এই পণ প্রেসিডেন্ট ফোর্ড ও তাঁর পিছনে কিসিঞ্জারের পতনের কারণে ধ্বংসন্মুখ। ফলত তিনি এখন আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্টের সামনে পড়ে গেলেন। এবার জিমি কার্টারের সাথে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি ধরনের হবে– তিনি তা জানেন না। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট সাদাতও এখন অনুভব করছেন যে, সাম্প্রতিক পরিমণ্ডলে নিজ দেশে এবং বহির্বিশ্বে তাঁর গহণযোগ্যতা এখন ঝাঁকুনি খাচ্ছে। তিনি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন যখন আসোয়ান থেকে তাঁকে একলা একটি বিমানে কায়রো যেতে দেখে বলাবলি করা হচ্ছিল যে, ইরানের বাদশাহ মুহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহলভী তাঁর সাথে ফোনে আলাপ করে প্রস্তাব দেন যে, তিনি চাইলে তেহরানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। ন্যূনপক্ষে পরিস্থিতি শান্ত ও স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারকে তেহরানে থাকার জন্য পাঠাতে

পারেন। যে সংবেদনশীল বিষয়টি তাঁর নিদ্রা হরণ করছিল, তা হচ্ছে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন এবং নির্দেশ দেয়ার ভার তার ওপরই ন্যস্ত ছিল। দেখা গেল যখন বিক্ষোভ মিছিল বের হলো এবং প্রধানমন্ত্রী মামদুহ সালেম আবিষ্কার করলেন যে, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে না, তখন তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুহাম্মদ আব্দুল গনি জেম্‌সীর সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে অনুরোধ করেন–যেন সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে অংশ নেয়। কারণ অবস্থা এতই নাজুক যে, এখন পুলিশ একলা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে না। কিন্তু জেম্‌সী দু'টি কারণে মামদুহ সালেমের কাছে ওজর করেন। প্রথমত যদি সেনাবাহিনীকে নামানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসে তাহলে তা আসতে হবে সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিংবা গোটা মন্ত্রিপরিষদ এক সাথে বললেও হবে না। দ্বিতীয়ত অভ্যন্তরীণ সমস্যা তথা জাতির গণমানুষের মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনী নামানোর বিষয়টি সংরক্ষিত। এ ব্যাপারে তাঁর ও এ্যাডমিরাল আহমদ ইসমাইলের সাথে প্রেসিডেন্ট সাদাতের ঐকমত্য হয় যে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন এসব থেকে সেনাবাহিনীর দূরে থাকতে হবে। কারণ সেনাবাহিনী অক্টোবর যুদ্ধে জনগণের সামনে যতদূর সম্ভব তার একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে। এখন সে যদি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়ে জনগণের সাথে তার শক্তি প্রদর্শন করে তাহলে এটা সেনাবাহিনীর সুনাম নষ্ট করবে।

প্রধানমন্ত্রী মামদুহ সালেম তখন রাষ্ট্রপতির সাথে যোগাযোগ করে রাস্তায় সেনাবাহিনী নামানোর জন্য জেম্‌সীকে নির্দেশ প্রদানের অনুরোধ করেন। নইলে ১৯৫২ সালের কায়রো শহর ভস্মীভূত হওয়ার সেই বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি হবে বলে জানিয়ে দেন। জেম্‌সীর কথা শুনে প্রেসিডেন্ট সাদাত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে স্বভাবতই তিনি নির্দেশ মানতে প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী মামদুহ সালেম অনুরোধ করেছেন যেন রাষ্ট্রপতি বাড়তি দ্রব্যমূল্য বাতিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি মনে করেন যে, ঐসব সিদ্ধান্তের ছত্রছায়ায় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যদি সেনাবাহিনী রাস্তায় নামে তাহলে জনগণের প্রতি সেনাবাহিনীর ভূমিকার কোন গ্যারান্টি দেয়া যায় না। প্রেসিডেন্ট সাদাতের হাতে তখন চিন্তা করার মতো সময় নেই। তিনি অবিলম্বে তা অনুমোদন করেন। কারণ পরিস্থিতি তখন দ্রুত মোড় নিচ্ছিল। কিন্তু তাঁর এই অনুমোদন তাঁর অহংবোধে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করল। তিনি এখন কারণ খুঁজছেন না, বরং একে কিভাবে সামাল দেয়া যায় সেটাই খুঁজছেন। এভাবেই তিনি এ ঘটনার একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যার দিকে মনোযোগ না দিয়ে এর পুলিশী ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁর মনে প্রথমেই যা জাগল তা হচ্ছে এটা একটা সোভিয়েত ষড়যন্ত্র যা মস্কো তার সহযোগীদের মাধ্যমে

ঘটিয়েছে। এটা হচ্ছে সমাধান প্রক্রিয়া থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দূরে রাখার প্রতিশোধ। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সামনের দৃশ্যত কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত তাদের বিরুদ্ধে কিসিঞ্জারের সাথে চুক্তি করেছে। এর প্রকাশ্য আলামত হচ্ছে ১৪ মার্চ ১৯৭৬-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রীচুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত।

প্রেসিডেন্ট সাদাত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন, যাতে এর সম্পর্ক তার সন্দেহ প্রত্যাখ্যাত হয় তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন মূলত তার সাথে যে কোন সংঘাতকে এড়িয়ে যাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করত।

এমনকি, অক্টোবর যুদ্ধের পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকটাই হতাশ হয়ে গেল, বিশেষ করে জেনেভা সম্মেলনসহ সমাধানের প্রতিটি চেষ্টায় যেভাবে প্রেসিডেন্ট সাদাত তার সাথে আচরণ করেছেন, তারপরও সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সব সময় নতুন পাতা উল্টাতে প্রস্তুত ছিলেন। যেমন ধরা যাক, যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্‌মী জানুয়ারি ১৯৭৪-এ জেনেভা সম্মেলনের কাজ শেষ করে মস্কো সফরে গেলেন তখনও সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ এমন একটি মধ্যপন্থার সমাধানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন যাতে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের আংশিক হলেও একটা অবস্থান থাকে। কারণ তারা অনুভব করল যে, সে ধ্বংসের হুমকির সম্মুখীন যদি তার ও মিসরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। জেনেভা সম্মেলন শেষে জানুয়ারি ১৯৭৪-এর সেই বৈঠকে ইসমাইল ফাহ্‌মীর সাথে ব্রেজনেভ তার সাক্ষাতের শুরুতেই মিসরী নীতির প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণ শানালেন। প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট প্রেরিত ইসমাইল ফাহ্‌মীর রিপোর্ট অনুসারে ব্রেজনেভ তাঁর সাথে এমন আচরণ করেন যেমনটি লাল রুমাল দেখে ক্ষেপা ষাঁড় করে থাকে। ইসমাইল ফাহ্‌মী লক্ষ্য করলেন, যে ব্রেজনেভ সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে জানতেন তিনি সিগারেটের একটি প্যাকেট চেয়ে নিয়ে পুরো আলাপে সেগুলো টানতে থাকলেন। এরপর আরেক প্যাকেট চেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটাও শেষ করলেন। এরপর এক সময় কথায় ছেদ দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার উঠালেন তৃতীয় প্যাকেট সিগারেট পাঠাতে বলার জন্য। ইসমাইল ফাহ্‌মী মস্কোর সেই যুগ্ম কর্মসভায় ব্রেজনেভ ও তাঁর সাথে অংশগ্রহণকারী সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের গোসা শীতল করার চেষ্টা করলেন। ইসমাইল ফাহ্‌মী আক্রমণের একটি দিক নির্বাচন করে ব্রেজনেভকে বলেন সমস্যার শুরু তো সোভিয়েতই করেছে যখন তারা ১৯৬৭ সালে হানাদার ইসরাইলী বাহিনীকে স্বস্থানে ফিরে যাবার গ্যারান্টি ক্লজ ছাড়াই অস্ত্রবিরতিতে সম্মতি দিয়েছিল। কারণ এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের কারণে দখলকৃত ভূমি ইসরাইলের হাতে পণবন্দী হয়ে রইল। এখন সে সময়ের দিক থেকে নিশ্চিন্ত। এভাবেই সমাধানের

প্রক্রিয়া পুরো ছয়টি বছরের জন্য জমে রইল। সোভিয়েত অস্ত্রের কথা উঠল। কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিল যা তাকে অব্যাহতভাবে ওপরে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। এ সময় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই পাদগোরনী ডাইনিং টেবিলে থাপ্পড় মেরে বললেন, "যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে কোন্ অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়েছিল? আপনাদের হাতে সব সময়ই তা মোকাবিলা করার মতো অস্ত্র ছিল, অক্টোবর যুদ্ধে আপনাদের লোকেরা তা প্রমাণও করে ছেড়েছে। ইসমাইল ফাহ্মী পরিস্থিতিকে সহনীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে বললেন, যা হোক, অক্টোবর যুদ্ধে আমরা সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রকে যে পদ্ধতিতে ব্যবহার করেছিলাম সেটাই তাকে পাশের সনদ graduation Certificate দিয়েছে। পাদগোরনী আরও ক্ষেপে বললেন- "আমাদের অস্ত্র কোন গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেটের অপেক্ষায় ছিল না।"

এরপর সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ অনুভব করলেন যে, ব্যাপারটি এখন খিস্তি-খেউর, পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তখন একভাবে আলোচনার তীব্রতা কমে গেল ইসমাইল ফাহ্মীর মূল্যায়ন ছিল এ সবের পিছনে একটি ইঙ্গিত কাজ করেছে। তা হচ্ছে- "আমাদের এখন প্রয়োজন ভবিষ্যতের দিকে নজর দেয়া, অতীতের দিকে নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য এখন যে বিরাট দায়িত্ব অপেক্ষা করছে তা হচ্ছে পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় তার সহযোগিতা। এ ছাড়া অনেক চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য অপেক্ষা করছে। এসব চুক্তির জন্য আরব অর্থায়ন মজুদ ও প্রস্তুত রয়েছে।" যদি ইসমাইল ফাহ্মীর মূল্যায়ন সঠিক হয়- হ্যাঁ, আংশিক সঠিক বটে, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এসব পুনর্গঠন বা নির্মাণ চুক্তি থেকে কিছুই পায়নি। মিসরের সাথে মতপার্থক্যের কারণগুলোর সাথে এটিও আরেকটি কারণ হিসাবে যুক্ত হলো।

বস্তুত নির্মাণ চুক্তি থেকে কিছু ভাগ পাওয়ার লোভ দেখানো বাঞ্ছিতই ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নও তীব্র আগ্রহের সাথে তা চাচ্ছিল। এটা কেবল ইসমাইল ফাহ্মীই উপলব্ধি করেননি বরং ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতও অনুভব করেন। তিনি তখন ইসমাইল ফাহ্মীর সফরের কয়েক সপ্তাহ পরেই মস্কো সফরে যান।

ইয়াসির আরাফাত লক্ষ্য করেন যে, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ নাখোশ। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের অর্থ অন্যদের কাছে চলে যাচ্ছে অথচ তার কিছুই সোভিয়েতের হাতে আসছে না। যখন ইয়াসির আরাফাত মস্কো থেকে ফিরলেন তখন তিনি ভাবছেন যে, এমন কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাতে ঐ অর্থের একটি ভাগ সোভিয়েত ইউনিয়নও লাভ করে। তিনি প্রেসিডেন্ট আসাদ ও প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি (কায্যাফী)-এর সাথে পরামর্শক্রমে লিবীয় প্রেসিডেন্টকে রাজি করান যে, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অস্ত্রের একটি বড় চালান কিনবেন। এর গুরুত্বের রহস্যটি হবে লিবীয় বাহিনী

এ অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়ে এগুলো ব্যবহার করবে। সামরিক শক্তি অর্জনের চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এটা সোভিয়েতের বড় " নগদ বিক্রি"।

প্রেসিডেন্ট সাদাত এ কেনাবেচার কিস্সা এবং এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন বরং পরিস্থিতি তাঁকে আরও বেশি কিছু জানার সুযোগ দিয়েছিল। দেখা গেল, ডেভিড রকফেলার, এমডি, চেজ ম্যানহাটন ব্যাংক তাঁকে জানালেন যে, লিবীয়রা অস্ত্রের দাম হিসাবে দু'বিলিয়ন ডলার সোভিয়েত ব্যাংক "নওরোদনী"-তে স্থানান্তর করেছে। কিন্তু ঐ দিনই ব্যাংক নওরোদনী এ অর্থের অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কাছ থেকে কেনা গমের মূল্য পরিশোধের জন্য স্থানান্তর করে দেয়। ডেভিড রকফেলার এ ঘটনাটি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে জানালেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদ্যমান দৈন্যদশার প্রমাণস্বরূপ। তিনি তাঁকে বলেন, আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ কিভাবে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় তা পরীক্ষা করে দেখেছে এবং তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থা ইতোপূর্বে যা ভাবা হয়েছিল তার চেয়েও অনেক খারাপ। প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর বাসায় রাতের খাবার খাওয়ার সময় ডেভিড রকফেলারের কাছে শোনা বিস্তারিত বিবরণ বলছিলেন। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর দু'জামাতা– ইঞ্জিনিয়ার সাইয়্যেদ মারয়ী ও ইঞ্জিনিয়ার উসমান আহমাদ উসমান। এ সময় তিনি মন্তব্য করে, "বাচ্চারা কেবল অক্ষমই নয়, অসচ্ছলও বটে।"

এমনকি যখন সোভিয়েত নেতারা তাদের দেশের প্রতি প্রেসিডেন্ট সাদাতের ভূমিকায় তাঁদের উষ্মা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তখনও এর চেয়ে বেশি কিছু করার সাধ্য ছিল না যে, তারা কেবল জানাল যে, ব্রেজনেভ যে ইসমাইল ফাহ্মীকে উভয়ের সাক্ষাতের সময় ওয়াদা করেছিলেন ১৯৭৬-এর প্রথমদিকে মিসর সফরে যাবেন, এখন তিনি আসন্ন কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনের ব্যস্ততার কারণে এই সফরে আসতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবার মন্তব্য করলেন "বারাকাহ ইয়া জামে" অর্থাৎ "বরকত রে ভাই, আল্লাহ বাঁচিয়েছেন।" আসলে তিনি এই সফরকে পিছিয়ে দেয়ার অজুহাত খুঁজছিলেন, কিন্তু এটা প্রকাশ করতে বিব্রতবোধ করছিলেন। কারণ তিনি হচ্ছেন মেজবান আর তিনিই হচ্ছেন মূলত দাওয়াতদাতা।

এখন হয়ত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দলিলাদি যোগ করার সুযোগ আছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রামাণ্য কাগজপত্র। এখন আগ্রহী পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত। সেগুলোর মাধ্যমে গোপন সত্যগুলো প্রকাশ পেতে পারে। এ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক নীতি প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এটা সহায়ক হতে পারে।

প্রকাশিত নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, আরব জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে শক্তি যোগাবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দায়ী ছিল এবং যদিও সে এক পর্যায়ে

এটাকে সোভিনিয়া বা স্বজাত্যবোধের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি আন্দোলন মনে করেছিল, তবুও তার বিশেষজ্ঞদের কয়েক-বছরের মূল্যায়নে ক্রেমলিনকে জোর দিয়ে জানাচ্ছিল যে, একমাত্র এই জাতীয়তাবাদী শক্তিই এ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব প্রতিপত্তিকে মার খাওয়াতে পারে।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত সময়ের নথিপত্রগুলো থেকে জানা যায় যে, জামাল আব্দুন নাসেরের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই রোষ তার উপলব্ধি ও অনুভূতিকে সামলে রাখত। কারণ আব্দুন নাসেরের নেতৃত্বে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল একমাত্র শক্তি বা যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে প্রতিহত করতে সক্ষম।

১৯৬৪ সালের মে মাসে 'ক্রুশ্চেভ' মিসর সফর শেষে তাঁর আলোচনার সারসংক্ষেপে তিনি বলছিলেন "আমরা নাসেরকে কমিউনিস্ট বানাতে পারব না। কাজেই তাঁর সাথে আমরা লেনদেন করতে চাইলে সে যেমনটি আছে তেমনটি রেখেই করতে হবে।" লিবিয়া বিপ্লবের পর যখন পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়তে শুরু করল তখন থেকেই সোভিয়েত রাজনৈতিক অফিসগুলোর বিভিন্ন বৈঠকে বার বার একটি প্রশ্নই ঘুরেফিরে আসছিল যে, 'কখন আরব বন্ধুরা সোভিয়েত অর্থনীতিতে বিশ্বাস ফিরে পাবে এবং তাদের কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ এদিকে দিবে ?"

দেখা গেল, যখন মোসলভের মতো ব্যক্তিকেও হতাশ মনে হয়েছে তখনও সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন এবং এটাকে সময়ের দাবি মনে করেন। তাঁর বিরাট আশা ছিল ইরাক, লিবিয়া, আলজিরিয়ার ওপর। কখনও কখনও প্রসঙ্গত কুয়েতের কথাও উঠেছে। এ সকল নথিপত্রের ভাষ্য অনুসারে একটি নজরকাড়া বাস্তবতা ছিল এই যে, সোভিয়েতের সুপ্রীম কমাণ্ড ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক ফোরাম ও কেজিবি-এর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরামর্শটি ছিল, মিসরে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন বা তার সাহায্য করার বিষয়টি অনুমোদনের ক্ষেত্রে ফিরে আসা। ইতোপূর্বে অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যানের কারণ ছিল– "মিসরের সাথে সম্পর্কটি হলো 'কৌশলগত'। এর একটি বিশেষ সংবেদনশীলতা রয়েছে। কাজেই জাতীয়তাবাদী সরকারকে বিব্রত করার মতো কোন তৎপরতা করতে দেয়া যায় না।" সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রত্যাখ্যানের অযুহাত ছিল "মিসরের প্রভাবশালী প্রগতিবিমুখ পক্ষকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল করার কোন সুযোগ না দেয়া।"

লক্ষণীয়, মিসরের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের বিশেষ নথিপত্রগুলোর অধিকাংশই পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক ফোরাম অফিসের "ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির" বিশেষ শাখায়। অনুরূপভাবে আলজিরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, লেবানন ও ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের নথিপত্রেও তা পাওয়া যায়।

মিসরে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অনুমোদনের পরামর্শ প্রথম উত্থাপিত হয় ১৯৭৬ সালে, এরপর সাহায্য তালিকায় প্রকাশ – মিসরী কমিউনিস্ট পার্টি ৫০ হাজার ডলার সাহায্য পেয়েছিল। এতে বোঝা যায় যে, ১৯৭৭ সালের কোন এক সময় পার্টি পুনর্গঠিত হয়। খুব সম্ভব এটা হয়েছিল ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৭-এর পরেই– আগে নয়। স্বভাবতই প্রেসিডেন্ট সাদাত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন সম্পর্কিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন নথিপত্রের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কিন্তু কার্যত তিনি যা জানতেন তাই এ তথ্যের জন্য যথেষ্ট ছিল যে, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারির ঘটনার আড়ালে সোভিয়েতের হাত ছিল না। প্রেসিডেন্ট সাদাত অন্য অভিযুক্তদেরকেও খুঁজে বের করতে লেগে গেলেন। তার সন্দেহ এবার ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর দিকে নিবদ্ধ হলো। তিনি মনোযোগ দিলেন মিস্টার আলী সবরি ও আরও কিছু ব্যক্তিবর্গের দিকে যাদেরকে ১৪মে ১৯৭১-এর ঘটনাবলীর পর ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। তাকে বলা হলো যে, এই অভিযোগের মাধ্যমে এমন সব ব্যক্তিকে শক্তি যোগানো হচ্ছে যারা এ ধরনের কিছু ঘটাবার মতো অবস্থানেই নেই। কেউ তো আছে জেলের ভেতর আর কেউ তো বর্তমান অবস্থায় জনগণের কাছে কোন প্রভাবই রাখে না। অথচ এ অভিযোগের মাধ্যমে তিনি এমন কিছু ছায়ামূর্তিকে বর্তমানের দিকে টেনে আনতে যাচ্ছেন যাদেরকে সময় তার ভুলে যাবার চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। এটা শুনে প্রেসিডেন্ট সাদাত সাময়িকভাবে হলেও এ অভিযোগ থেকে চুপ মেরে গেলেন। পরে দেখলেন যে, ঘটনার আসল নাটের গুরু হচ্ছে কিছু বাইরের ব্যক্তি, যাদের উল্লেখই ছিল না। তিনি তাদেরকে অর্থায়ন, প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত করলেন এবং নিজ বাড়িতে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের তিন তিনটি বৈঠক করেন। তিনি জোর দিয়ে দাবি করেন যে, এটা একটি ষড়যন্ত্র। কিন্তু তাঁর সাথে বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা বলতে চান অন্যকিছু। তাদের কথা হলো এটা একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু। এটাকে সেভাবেই সুরাহা করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তিনি এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে আদৌ রাজি ছিলেন না। বরং তিনি তার প্রশাসনযন্ত্র দিয়ে এই ধারণা প্রতিষ্ঠার মতো প্রমাণ পেতে চেয়েছিলেন।

প্রমাণের অভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি সেই 'আরবদের' অভিযুক্ত করতে লাগলেন যাদের জন্য মিসর এত ত্যাগ-তিতিক্ষা করার পরও তারা কোন সাহায্য করল না। কারণ দেখালেন যে, তিনি সৌদি আরব থেকে কিছু বাড়তি সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু বাদশাহ খালেদ (সাদাতের ভাষায় যিনি কোন সিদ্ধান্তের মালিক ছিলেন না), তার মধ্যে ফয়সলের সেই হিম্মত পাওয়া গেল না।

তিনি ওজরবাহী করে বলেন– "সৌদি আরব বর্তমানে ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে কারণ অনেক আফ্রিকান দেশ এই ভিত্তিতে আর্থিক সাহায্য চাচ্ছে যে,

তারা আরবদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসরাইলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে এবং তারা এ কারণে সাংঘাতিক অর্থনৈতিক সমস্যায় আছে।"

বাদশাহ খালেদ, প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে বৈঠকের সময় বলেই ফেলেন যে, "কিছু লোক আমাদের সম্পর্কে ভাবে যে, আমরা বুঝি গোটা দুনিয়াটাই কিনে ফেলার মতো ধনী হয়ে গিয়েছি এটা ঠিক নয়।"

প্রকৃতপক্ষে, সৌদী আরব ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশ সাহায্য করেছিল। যদিও ক্রমবর্ধমান সাহায্যের আবেদন ছিল, তারপরও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ১৯৭৩-এর অক্টোবর যুদ্ধের পর থেকে নিয়ে ১৯৭৭ সালের সূচনা পর্যন্ত এবং ১৮ ও ১৯ জানুয়ারির ঘটনার পর মিসর, পেট্রোডলারের দেশগুলো থেকে যে সাহায্য লাভ করে তার পরিমাণ হবে প্রায় ১৬ থেকে ২১ বিলিয়ন ডলার। কাজেই আরবদের উপর দায়িত্ব ফেলাটা যুক্তি ও ইনসাফের নিরিখে মোটেই ঠিক নয়।

এবার প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাজ হলো অপর অভিযুক্তের সন্ধান লাভ করা। তিনি তাঁর রাজনৈতিক অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করলেন যে আসলে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট এখন–"নয় যুদ্ধ, নয় শান্তির" মাঝখানে অবস্থান করছে; এমনকি, অক্টোবরের লড়াই সত্ত্বেও। হয়ত এটিই হচ্ছে কারণ। কাজেই এর সমাধান ত্বরান্বিত করতে এটাই হয়ত একটা উপায় হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হচ্ছে– কীভাবে ? যে প্রশ্ন গোটা অঞ্চলটির বাস্তবতা থেকে উৎসারিত হয়ে বিরাট আকারে দেখা দিয়েছে তার জবাব কেবল প্রেসিডেন্ট সাদাত একাই খুঁজছিলেন না বরং এ অঞ্চলের সকল বাদশাহই অস্থির হয়ে তার জবাব খুঁজছিলেন। রাবাতে বাদশাহ হাসান থেকে নিয়ে রিয়াদে বাদশাহ খালেদ পর্যন্ত তেহরানে ইরানের শাহ থেকে নিয়ে আম্মানে সুলতান কাবুস পর্যন্ত সবাই অনুভব করছিলেন যে মিসরে সরকারের পতন ঘটলে তা গোটা মধ্যপ্রাচ্যে একটি ভূমিকম্প সৃষ্টি করবে। অন্যভাবে হলেও একই অনুভূতি সে সকল ব্যক্তির মধ্যেও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে যাঁরা এ অঞ্চলের শান্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন। এঁদের মধ্যে অগ্রণী হচ্ছেন রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকোলাই চচেস্কু, ভিয়েনার চ্যান্সেলর ব্রুনো ক্রাইসকি ও সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট। ব্রান্ট দ্বিতীয় যৌথ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রকাশ্য ও পূর্বঘোষিত। খোদ ওয়াশিংটনেও এ অনুভূতির প্রতিধ্বনি ছিল। কারণ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কার্টার তাঁর উপদেষ্টাদের কাছে মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে শুনতে শুরু করেন। তাঁরা বার বার বলছিলেন যে, যদি আমেরিকার স্বার্থের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত এ অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় দ্রুতগতিতে সামলে নেয়া না যায় তাহলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যই খোয়া যাবে। রিপাবলিকানরা কিসিঞ্জারের নেতৃত্বে সেখানে এক ধরনের অলৌকিক কাজ করেছিল। তারা একে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ছাড়িয়ে

এনেছিল। আর এখন সেখানে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিচ্ছে। কায়রোতে ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি যা ঘটেছে তার উন্মাদনাই এর পিছনে কাজ করছে। এটা হয়ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে আবার ফিরে আসার সুযোগ করে দেবে। গণচাপের মুখে যদি প্রেসিডেন্ট সাদাতের সরকারের পতন ঘটে তাহলে এটা কেবল শান্তি প্রক্রিয়াকেই ব্যর্থ করে দেবে না বরং মধ্যপ্রাচ্যের অনেকের মনেই এ কথা দেখা দেবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার কারণে অনেক সমস্যা আর অস্থিরতা ডেকে এনেছে।

২০ জানুয়ারি– কায়রোর ঘটনার একদিন পর প্রেসিডেন্ট কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। একই দিন তিনি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকেন। এতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্স, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজনেস্কি ও তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী হ্যারাল্ড ব্রাউন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার মন্ডেল এবং হোয়াইট হাউসের প্রধান উপদেষ্টা হ্যামিল্টন জর্ডান। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, নতুন প্রেসিডেন্টের কর্মকাণ্ডে মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

কার্টার নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করেন যেন মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ কীভাবে নেয়া যায় তার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে দেন। এদিকে রাজনীতি ও কৌশল শিক্ষা বিষয়ক 'ব্রুকিংস' ইনস্টিটিউট– যা সাধারণত ডেমোক্র্যাটিক দলের ঘনিষ্ঠ ইতোমধ্যেই মধ্যপ্রাচ্য শান্তির বিভিন্ন পথ-নির্দেশ করে একটি রিপোর্ট" তৈরি করে ফেলে। এ রিপোর্ট প্রণয়নে অন্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন এমন কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ যাঁরা পরবর্তীতে জিমি কার্টারের প্রশাসনের সদস্য হয়েছিলেন। একইভাবে নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৭৭-এর ৪ ফেব্রুয়ারি আবার বৈঠকে বসে "ব্রুকিংস" ইনস্টিটিউটের রিপোর্টের মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন যাতে এর ভিত্তিতে এ অঞ্চলে আমেরিকার নয়া নীতি গ্রহণ করা যায়। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন মতামতের পর দু'টি মতে এসে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় ঃ

১. জেনেভা সম্মেলনকে পুনরায় শুরু করার প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটকে সমাধানের পথে নতুন করে এগিয়ে নেয়াটাই শ্রেয়।

২. জেনেভা সম্মেলনকে পুনরুজ্জীবিত করলে আশঙ্কা আছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার এ অঞ্চলে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এটা নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত এমনকি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছেও। এরপর জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্স অবিলম্বে এ অঞ্চলে অনুসন্ধানী সফরে যাবেন এবং তিনি ফিরে এসে সমাধানের পথ হিসাবে আমেরিকার নীতি নির্ভর করতে পারে এমন একটি দিকনির্দেশনা দিয়ে তার সুপারিশ পরিষদের নিকট উপস্থাপন করবেন।

সাইরাস ভ্যান্স দেরি না করে ১৫ ফেব্রুয়ারি এ অঞ্চলে পৌঁছলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর এ সফরের লক্ষ্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের দুর্ভেদ্য জটলা ভেঙ্গে দেয়া। সাইরাস ভ্যান্স তাঁর ভাষায় শ্রোতা হিসাবে শিখতে এলেন– যাতে জিমি কার্টারের জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট সাদাতের অনেক কিছুই বলার ছিল কিন্তু এর অধিকাংশই হচ্ছে অতীতের কাসুন্দি, যার মধ্যে রয়েছে হেনরি কিসিঞ্জারের দেয়া প্রতিশ্রুতির হতাশাবাদ।

প্রেসিডেন্ট সাদাত কিসিঞ্জারের দেয়া দু'টি প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন– যেখানে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় ঃ

প্রথমত, কিসিঞ্জার তাঁকে দ্রুত শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এটা ছিল অক্টোবর যুদ্ধে ইসরাইলের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র যোগান দিয়ে যুদ্ধের ভারসাম্য নষ্ট করার ক্ষতিপূরণস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, কিসিঞ্জার তাঁকে এ অঞ্চলের জন্য মার্শাল প্রজেক্টের প্রতিশ্রুতি দেন। এতে এ অঞ্চলের জাতিগুলোকে বিশেষ করে মিসর জাতিকে শান্তির সুফলগুলো বুঝতে দিবে ঠিক সেভাবে, যেটা হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর পশ্চিম ইউরোপে মার্শাল প্রকল্পের মাধ্যমে। এরপর প্রেসিডেন্ট সাদাত বলেন– তিনি কিসিঞ্জারের সাথে সর্বশেষ যোগাযোগের পর অস্বস্তিতে আছেন। কারণ সেই যোগাযোগে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে জানান যে, পদক্ষেপের রাজনীতিতে এমন এক পদক্ষেপ ছিল যা শেষ হয়ে গেছে। তিনি এখন কঠিন সব সিদ্ধান্তের সমন্বয়ে সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন। এর প্রথমটি হচ্ছে– ইসরাইলের সাথে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আলোচনা করা। এতে কোন আরব দেশও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে না। কারণ এসব দেশ সরাসরি আলোচনার জন্য প্রস্তুত নয়। প্রেসিডেন্ট সাদাত এরপর তাঁর মত প্রকাশ করেন যে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটলে তিনি কিসিঞ্জারের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন। এর মধ্যে ১৮ ও ১৯ জানুয়ারির ঘটনাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন পরিস্থিতি এমন মোড় নিয়েছে যে, এ অবস্থায় এ সকল প্রস্তাবে চিন্তাও করতে পারেন না। এছাড়াও এখন অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে আরব দেশগুলোর মনোবল বৃদ্ধির প্রয়োজন অনেক বেশি। এই বৈঠকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সবচেয়ে উজ্জ্বল পয়েন্ট ছিল যে মুহূর্তে ভ্যান্স তাঁকে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট কার্টার তাঁকে যথাশীঘ্র সম্ভব যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত বলেন, তিনি এ সফরের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত রয়েছেন। ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগের পর ভ্যান্স প্রেসিডেন্ট সাদাতকে প্রস্তাব দিলেন যে, তাঁর জন্য সুবিধা হলে মার্চের প্রথমদিকে কার্টারের সাথে তাঁর বৈঠকটি হতে পারে। প্রেসিডেন্ট সাদাত নির্দ্বিধায় তাতে সম্মতি দেন। ১৮ ও ১৯ জানুয়ারির পর ইসরাইলও অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। মিসরের অবস্থানের মূল্যায়নে

তারা নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে। অনুরূপভাবে জায়নিস্ট আন্দোলনের কিছু সংখ্যক নেতাও ইসরাইলে দৌড়ে এসে মিসরের পরিস্থিতি পরিবর্তনের বিপদ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। এদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থার প্রধান ফিলিপ ক্লোতজনেক। খোদ নাহুম গোল্ডম্যানকেও ভিয়েনা ও বনে দেখা গেল। তিনি ক্রাইসকি ও ব্রান্টকে আহ্বান জানান যে, তারা ইসরাইল সরকারকে আরও বিবেচনা সম্পন্ন ভূমিকা গ্রহণের জন্য বলে দেন। না হয়, কিসিঞ্জারের প্রচেষ্টার বদৌলতে মিসরের কাছে যা লাভ করেছিল তা সবই হারাবে। বরং স্বয়ং কিসিঞ্জারই রাবিনকে নসিহত করে চিঠি লেখেন যেন তিনি সিনাই পাড়ি দিয়ে ইসরাইলের দিকে প্রেসিডেন্ট সাদাত যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সে হাতের প্রতি আরেকটু বেশি উদারতা দেখান।

রাবিন যখন জানতে পারলেন যে, প্রেসিডেন্ট কার্টার প্রেসিডেন্ট সাদাতকে ওয়াশিংটন যাবার দাওয়াত দিয়েছেন তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি সাক্ষাতের আবেদন জানাবেন, যাতে তার কাছে ইসরাইলের অবস্থান স্পষ্ট হয় এবং সাদাতের সাথে কার্টারের দেখা হওয়ার আগেই তাকে জানাতে পারেন যে, তিনি সামনে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। ঠিকই রাবিন ৭ মার্চ হোয়াইট হাউসে কার্টারের সাথে দেখা করেন। অর্থাৎ ভ্যান্স ওয়াশিংটনে ফেরার অল্প ক'দিন পরেই।

সম্ভবত তার কাছে প্রদত্ত ভ্যান্সের রিপোর্ট ও তার সাথে রাবিনের সাক্ষাতের ফল হিসাবে প্রেসিডেন্ট কার্টার ১৬ মার্চ মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সমাধানের লক্ষ্যে তার মনে জাগা কয়েকটি চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেন। তিনি চারটি পয়েন্ট পেশ করেন ঃ

১। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ব্যাপকভিত্তিক সমাধানে পৌছাই হবে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের লক্ষ্য। সমাধানের মূলনীতিগুলোতে ঐকমত্য হবার পর এ লক্ষ্য অর্জনে সবার চেষ্টা করতে হবে।

২। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঈষৎ সংশোধন সাপেক্ষে ইসরাইল ১৯৬৭ সালের জুনের আগে যে সীমান্তের মধ্যে ছিল তার অভ্যন্তরে তার নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম।

৩। তিনি এও বিশ্বাস করেন যে,'মিসর একলা কোন শান্তি বাস্তবায়নে সক্ষম হবে না। হ্যাঁ, যদি এমন কোন সাক্ষ্য দেখা দেয় যাতে বোঝা যাবে যে, ব্যাপক শান্তি প্রক্রিয়া এখন সম্ভব।

৪। পরিশেষে তিনি এও বিশ্বাস করেন যে, শান্তি প্রক্রিয়ায় ফিলিস্তিনীদের অংশগ্রহণ অনিবার্য। তিনি ইঙ্গিত করেন যে, ফিলিস্তিনীদের একটি জাতীয় অস্তিত্ব তথা Home Iand থাকার অধিকার রয়েছে। এটা ছিল বেশ উৎসাহব্যঞ্জক।

॥ ২ ॥

বেগিন

"ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) যদি ইসরাইলকে একটি রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে 'ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার' আর প্রয়োজন হবে না।"

—আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্স-এর প্রতি ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রেসিডেন্ট সাদাত ওয়াশিংটনের দিকে রওনা হলেন। জিমি কার্টারের সাথে সাক্ষাতের তারিখ পড়ল শেষ পর্যন্ত ৪ এপ্রিল। ভ্যান্সের প্রস্তাবিত তারিখ থেকে এক মাস পর। কারণ নয়া আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, "রাবিনের" সাথে সাক্ষাতের পর জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের পর পর কয়েকটি বৈঠক ডেকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে কি পেশ করা হবে তার ফিনিশিং টাচ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত এই দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ওয়াশিংটনে পৌঁছেন যে, তিনি তার ও জিমি কার্টারের মধ্যে একটি সত্যিকার সমঝোতা বের করতে সফল হবেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, নতুন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের হোয়াইট হাউসে আরও আট বছর থাকার সুযোগ রয়েছে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তিনি হোয়াইট হাউসে তখনও বসে থাকবেন যখন মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট এক প্রকার সমাধানে পৌঁছে যাবে।

বহুলাংশে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত তার উদ্দেশ্যে সফল হন। তিনি জিমি কার্টারের হৃদয়ে পৌঁছতে সক্ষম হন। এর প্রমাণ হচ্ছে, কার্টারের ডায়েরিতে তার একটি গোলাপী ভাষ্য ছিল এর রকম ঃ "৪ এপ্রিল আমার সামনে মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপটে একটি আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আমি মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি ইতিহাসের পথ পরিবর্তন করতে সক্ষম! আমি অন্য যে কোন প্রেসিডেন্টের চেয়ে তাকে দেখে বেশি চমৎকৃত হয়েছি।" কার্টার বর্ণনা করেন– "তিনি সাদাতের সাথে সাক্ষাতের সূচনায় অনুভব করলেন যে তিনি বোধহয় লজ্জিত, এক রকম অস্থির। বৈঠকের প্রথমে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় তিনি ঘামছিলেন সাদাত তাকে বললেন, তিনি প্যারিসে যাত্রা বিরতি করার সময় তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে এবং জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে। এরপর কার্টার লক্ষ্য করলেন যে, সাদাত তার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি গৌর বর্ণের। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, তার ললাটের মাঝখানে ঈষৎ কালো হয়ে আছে। বুঝলেন, এটা নামাজের সময় দীর্ঘ সিজদারই চিহ্ন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তিনি বেশি ধূমপান

করেননি। যদিও তার পাশেই ‘গেলন’ রেখে দিয়েছিলেন। অথচ তার একজন সঙ্গী গেলন নিয়ে আসতে দেরি করাতে তার প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেন।” ওই বৈঠকের সরকারী নোট অনুযায়ী কার্টার শুরু করে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বলেন – “ তিনি তার মন খুলে স্পষ্ট করে কথা বলতে চান।”

(১) তিনি নিশ্চিতভাবে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী।

(২) তিনি আশা করেন যে, তার মেহমান জেনে থাকবেন যে ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার নেই– কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্টেরই নেই। বেশি হলে এতটুকু করা সম্ভব যে, তাকে তার স্বার্থের কথা দিয়ে বোঝানো যেতে পারে – এসব স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

(৩) যদিও তিনি বিশ্বাস করেন যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ খুব গুরুত্বপূর্ণ, ইসরাইলও এর জন্য পীড়াপীড়ি করছে, এছাড়া তিনিও লক্ষ্য করেছেন যে, কয়েক সপ্তাহ আগে মিসরে যখন সাইরাস ভ্যান্স প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি ভ্যান্সকে বলেছেন যে, তিনি ইসরাইলের সাথে সরাসরি আলোচনার সম্ভাবনা নিয়ে গুরুত্বের সাথে চিন্তা করছিলেন– কিসিঞ্জারও সেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন– কিন্তু তিনি এখন উপলব্ধি করছেন যে সেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে কঠিন হবে। তিনি এ বিষয়ে কোন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে চান না। তবে তিনি আশা করেন যে সে সময় ও সুযোগ কবে আসবে – তার মূল্যায়ন প্রেসিডেন্ট সাদাতের জন্য ছেড়ে রাখলেন। তিনি যথা সময়ে সেই সাহসী পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকবেন বলে কার্টার আশা করেন। তিনি এও বিশ্বাস করেন যে, সেটা হবে সঙ্কট সমাধানের চৌরাস্তা।

(৪) তিনি গোপন করতে পারছেন না যে, তিনি রাবিনের সাথে সাক্ষাতের সময় অনুভব করেন যে, ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আরও আরব ভূমি দখল করার লোভে আছে। তবে তিনি ঠিক এ পয়েন্টে এ ধরনের পদক্ষেপের প্রতিরোধে তার প্রভাব খাটাতে প্রস্তুত রয়েছেন।

(৫) অবস্থা যখন এমনই, তখন তিনি জেনেভা সম্মেলনের প্রেক্ষাপট ব্যতীত পক্ষগুলোর মধ্যে আলোচনার আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি ধারণা করেন যে, এই প্রেক্ষাপট প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

(৬) তিনি আশা করেন যে, নতুন করে জেনেভা সম্মেলনটি হবে ঠিক এর পূর্ববর্তী পর্যায়ের আঙ্গিকেই। অর্থাৎ সম্মেলনটি হবে আলোচনার সাধারণ প্রেক্ষিত। তবে এবার আলোচনা হবে এর ছত্রছায়ায় দ্বিপাক্ষিক– প্রত্যেক আরবীয় প্রতিনিধি দলের সাথে ইসরাইলী প্রতিনিধি দলের।

(৭) তিনি প্রস্তাব করেন যে, আলোচনার বিষয়বস্তু হবে সঙ্কটের মূল চারটি প্রেক্ষিতে। সেগুলো হচ্ছে ঃ (ক) শান্তির প্রকৃতি (খ) প্রত্যাহারের সীমারেখা (গ) প্রতিটি দিক থেকে ফিলিস্তিন ইস্যু (ঘ) আল্-কুদ্সের ভবিষ্যৎ।

কার্টার আরও বলেন যে, তিনি এ সঙ্কট সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন তার মাধ্যমে জেনেছেন যে, কিছু আরব পক্ষ– এর মধ্যে সিরিয়া রয়েছে সম্মেলনের সাধারণ ছত্রছায়ায়। সরাসরি সিরীয় প্রতিনিধি দলও ইসরাইলী প্রতিনিধি দলের মধ্যে আলোচনা চলার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না।

এছাড়াও সম্মেলনে ফিলিস্তিনীদের অংশগ্রহণের সমস্যাও রয়েছে। এতে ইসরাইল আপত্তি তুলবে। তবে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যান্স এসব কিছু জটিলতার একটা সমাধান বের করেছেন। তা হচ্ছে– আরবরা সম্মেলনে একটি যৌথ প্রতিনিধি দল হিসাবে অংশগ্রহণ করবে যাতে সকলের সমন্বয় থাকবে। অংশগ্রহণকারীদের জাতীয়তা নিয়ে কেউ যাচাই-বাছাই করতে যাবে না। তারা হবে মিসরী, সিরীয়, জর্ডানী ও ফিলিস্তিনী। তিনি আগেই জানেন যে, ইসরাইল একই প্রতিনিধি দল একসাথে আরবদের থাকার ধারণাটির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবে। তবে তিনি ওয়াদা দিচ্ছেন যে, ইসরাইলকে তাতে রাজি করাতে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। কার্টার এ পয়েন্টে এসে একটি শর্ত যোগ করেন। তিনি বলেন, "আরব প্রতিনিধি দলে ফিলিস্তিনী সদস্যগণ থাকতে হলে পিএলওকে নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩৩৮ নং সিদ্ধান্ত দু'টি মেনে নিতে হবে। কার্টার স্মরণ করেন যে, ভ্যান্স এ পয়েন্টে ঈগল আলোনের প্রতি সরাসরি একটি প্রশ্ন করেন (তখন তিনি ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন) যে, ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা যদি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং সিদ্ধান্তটি মেনে নেয় তাহলে সম্মেলনে পিএলও'র অংশগ্রহণ মেনে নিতে প্রস্তুত কিনা। ঐ সিদ্ধান্তে ইসরাইলকে একটি রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নেয়ার কথা রয়েছে।

আলোন ভ্যান্সকে বলেন, " সে ক্ষেত্রে তারা কোন আপত্তি করবে না, কারণ যখন ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা ইসরাইলকে একটি রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নেবে তখন সে এ অবস্থায় আর ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা থাকবে না। সে সময়, যদি তা হয়, ইসরাইলের অবস্থান হবে ভিন্ন।" এভাবেই আলোচনা চলল এবং শান্তি প্রক্রিয়ার আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বের হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু কার্টার চাচ্ছিলেন চূড়ান্ত সমাধান ও আরব ইসরাইলের মধ্যে পূর্ণ শান্তির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট সাদাতের চিন্তার গভীর প্রদেশকে আবিষ্কার করতে।

এজন্যই দেখা গেল হোয়াইট হাউসে আনুষ্ঠানিক নৈশভোজের পর কার্টার তাঁকে হোয়াইট হাউসের ওপর তলায় আমন্ত্রণ জানান। এখানে বিশেষ উইংয়ে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা থাকেন। তখন তাঁরা প্রাইভেট বাসায় কেবল দু'জন মুখোমুখি হলেন তখন কার্টারের লেখা ডায়েরি অনুসারে– কার্টার প্রেসিডেন্ট সাদাতকে জিজ্ঞাসা করেন– ইসরাইল পিছে সরে আসলে প্রত্যাহার সীমায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে বলে ভাবছেন। সে সকল ফ্রন্টিয়ারে ১৯৬৭ সালের ৪ জুনের সীমান্তে পুরোপুরি

প্রত্যাহার করবে না। কারণ তার নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সাদাত কিছু সংশোধনী মেনে নিতে রাজি আছেন বলে জানান। কার্টার বর্ণনা করেন যে তিনি সাদাতকে প্রশ্ন করেছিলেন– "আপনারা মিসরী ও ইসরাইলী হিসাবে একলা কখন বসতে প্রস্তুত আছেন ? সাদাত জবাব দেন–"ফিলিস্তিন ইস্যুতে অগ্রগতি হলে।" তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কখন আরব অবরোধ প্রত্যাহার করা সম্ভব হতে পারে ? সাদাত জবাব দেন–"শান্তির পরিমন্ডলে এই অবরোধ শেষ হয়ে যেতে পারে।" তাঁকে প্রশ্ন করেন কখন আপনাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে ? উত্তর দেন– যেটা কয়েক বছরের মধ্যে হতে পারে, যদি বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়। তিনি আবার প্রশ্ন করেন যে, দু'দেশের মধ্যে কখন কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে এবং রাষ্ট্রদূত বিনিময় হতে পারে ? কার্টার তার ডায়েরিতে লেখেন যে, এর উত্তর সাদাত এক বাক্যে দেন ঃ "আমার জীবদ্দশায় নয়।" (Not in my life time.) প্রেসিডেন্ট সাদাত ভ্যান্সের নিকট আমেরিকান অস্ত্র লাভের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কারণ মিসরের কাছে যেসব সোভিয়েত অস্ত্র ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া সামরিক বাহিনী ১৮ ও ১৯ জানুয়ারির পর তাদের মনোবল চাঙ্গা করার মতো কিছু চাচ্ছে। কোন বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা করতে নতুন অস্ত্রের চেয়ে বেশি কি আছে ? কার্টার তাকে বলেন, এটা একটা কঠিন চাহিদা হবে। সাদাত সাথে সাথে বলে ওঠেন– "আমি তো এখনই কোন অস্ত্র চাই না। কারণ আমি জানি এতে সমাধানের সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর আমি তো দেখছি শান্তিপূর্ণ সমাধানে আপনার শুভ প্রচেষ্টা রয়েছে। কার্টার লেখেন–প্রেসিডেন্ট সাদাতের কথায় তিনি বুঝেছেন যে, তার শুভ ইচ্ছা ও শান্তির জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

আনোয়ার সাদাত কায়রোতে ফিরে এলেন। তার সাথে ফিরে এলো বিরাট আশ্বাস ও স্বস্তি। কিন্তু সাদাত ও কার্টার দু'জনকেই বেশিদিন নির্বিঘ্নে থাকার সুযোগ হয়নি। কারণ ইসরাইলে একটি সমস্যা বিস্ফোরিত হলো। এর কারণ আর্থিক কেলেঙ্কারি। প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রাবিন বিদেশী মুদ্রায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একটি এ্যাকাউন্টে অর্থ জমা করার কথা ফাঁস হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত রাবিন ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। ৭ এপ্রিল তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করে 'শিমন পেরেজকে' ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। ইসরাইলী শ্রমিক পার্টি সিদ্ধান্ত নিল যে, নির্বাচনের সময় এগিয়ে এনে ইসরাইলী জনগণের আস্থা অর্জন করবে। তাই নির্বাচনের স্বাভাবিক সময় অক্টোবর ১৯৭৭-এর বদলে মে মাসে নির্বাচনের ঘোষণা দিল। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল কেবল যে কার্টার ও সাদাতের জন্যই একটি শক্ ছিল তা নয় বরং বিশ্বজুড়ে যাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে গুরুত্ব ও আগ্রহ পোষণ করেন তাঁদের সকলের জন্যই এ ছিল একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত। কারণ "লিকুদ" গ্রুপ নির্বাচনে জয়লাভ করে। ফলে

মেনাহেম বেগিন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হলেন। আর তিনি তো কট্টর হিসাবে পরিচিতই ছিলেন। বেগিন তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে জেনারেল মোশে দায়ানকে মনোনীত করেন।

নির্বাচনে লিকুদ গ্রুপের বিজয় ছিল একটি অকল্পনীয় ধাক্কা। যদিও এমন সম্ভাবনার কিছু আলামত দেখা গিয়েছিল বটে। এ অঞ্চলের বিষয়ে আগ্রহী সবাই বাস্তবে এমন কিছু ঘটাকে সুদূর পরাহত মনে করতেন। তাঁদের এ বিশ্বাসের পিছনে কিছু কারণও ছিল ঃ

(১) ইসরাইল রাষ্ট্রের সূচনা লগ্ন থেকে রাজনীতির মঞ্চে লেবার পার্টিরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। এ দল থেকেই এ রাষ্ট্রের প্রাতঃস্মরণীয় রাজনীতিকগণ বের হয়ে এসেছিলেন, যাঁরা এর বিনির্মাণ ও শক্তিকে সুসংহত করতে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। যেমন, বেন গোরিয়ন, শারেট, আশকুল, গোল্ডা মায়ার।

(২) তাছাড়া ইসরাইলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দু'টি বিজয়কে ঘরে তোলার সময় এই লেবার পার্টিই ক্ষমতায় ছিল। এ দু'টি বিজয় ছিল ১৯৪৮ ও ১৯৬৭ সালে। অধিকন্তু যে প্রধানমন্ত্রী এবার সাধারণ নির্বাচনের জন্য ডাক দিলেন সেই আইজ্যাক রাবিন ছিলেন ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি। তেমনি তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজও ছিলেন বেন গোরিয়নের এক অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং ইসরাইলকে অস্ত্রে সজ্জিত করার প্রক্রিয়ায় এক দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। সেই ১৯৫৬ সালের ফরাসী অস্ত্র চুক্তি থেকে শুরু করে ফ্রান্সেরই সাথে ডেমোনাতে পারমাণবিক স্থাপনা পর্যন্ত।

(৩) এ সকল পরিস্থিতির ফলে বিশ্ব জায়নিস্ট সংস্থা, বিশেষে করে যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাটি লেবার পার্টির সাথে পরিচিত হয় এবং লেনদেন করে। অন্য কারও সাথে কারবার করার সুযোগও তাদের হয়নি। বরং জায়নিস্ট সংস্থাটি নিজেও লিকুদ গ্রুপের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা অনুভব করত এবং এ বিশ্বাস করত যে, তাদের বাড়াবাড়ি ও ধর্মীয় দাবি-দাওয়া হয়ত বা ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি করতে পারে। কারণ ওয়াশিংটনকে তো আরব বিশ্বের পেট্রোলিয়াম ও কৌশলগত স্বার্থাদির প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে, চাই জায়নিস্ট পরিকল্পনা ও ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতি তার আগ্রহ ও সমর্থনের মাত্রা যাই হোক।

(৪) লেবার পার্টি ছিল 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজবাদ'–এর সদস্য। এ কারণে তৎকালীন ইউরোপের অধিকাংশ শাসক দলের সাথে তার সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের গণ্ডি ছিল খুবই ব্যাপক। এসব দেশে তখন ক্ষমতায় ছিলেন প্রখ্যাত সব নেতৃবৃন্দ। যেমন ভিয়েনায় ব্রুনো ক্রাইসকি, জার্মানিতে উইলি ব্রান্ট ও তারপর হেলমুট স্মিথ, ইংল্যাণ্ডে হ্যারোল্ড ওয়েলসন ও জেমস্ কালাহান। এ সব সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের বদৌলতে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদীরা কেবল যে তাকে নৈতিক সমর্থনই দিয়েছে তা নয় বরং

লেবার পার্টির নির্বাচনে এত অর্থ সাহায্যও দিয়েছে যাতে সে ইসরাইলের নির্বাচনী লড়াইয়ের খরচ চালাতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদীদের আর্থিক সাহায্য ছাড়াও আমেরিকান সংস্থার এমন কিছু জায়নিস্ট ব্যক্তিও তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়ান যাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, এবার লেবার পার্টি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দীর্ঘদিন শাসনের বগিডোর এ দলের হাতে থাকাতেই এটা হয়েছে। তদুপরি রয়েছে রাবিনের মুখের ওপর বিস্ফোরিত অর্থ কেলেঙ্কারি। এতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এদিকে রাবিন তাঁর অর্থ কেলেঙ্কারির এ বিব্রতকর অবস্থায় নিজেকে সাহায্য করার বদলে বরং কার্টারের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে খুবই কট্টর অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, নতুন প্রেসিডেন্ট তাঁর কথা বোঝতেই পারেননি। এ ছাড়া আরও কিছু কথা যা তিনি বলেননি, তাও তাঁর বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন। এটা রাবিনের অবস্থান ও লেবার পার্টির পজিশনকে খারাপ করে দিয়েছিল।

এছাড়াও এমন কিছু প্রমাণও রয়েছে যে, আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ), লেবার পার্টির নির্বাচনী প্রচারণাকে জোরদার করার জন্য গোপনে তার তহবিলকে সমৃদ্ধ করেছিল, যাতে অপ্রত্যাশিত কোন চমক সৃষ্টি না হয়। এত কিছুর পরও সবাই শেষ পর্যন্ত এমন চমক পেল যা কখনও হিসাবেও আনেনি। আর তা হচ্ছে লিকুদের সফলতা।

দেশে দেশে সকল যুগেই আমলাতান্ত্রিক ম্যাকানিজম অপ্রত্যাশিত চমকগুলোর অচিন্তনীয় সব ব্যাখ্যা বের করায় ওস্তাদ। সে জন্যই সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের সামনে তাদের ইতোপূর্বেকার ভাবনা-চিন্তাগুলোর সত্যতা এমন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ায় তারা নতুন সুরে এর ব্যাখ্যা খোঁজতে লাগল। দেখা গেল যখন প্রেসিডেন্ট কার্টার সংশ্লিষ্ট ম্যাকানিজম (দফতর ও সংস্থা)-কে লিকুদ গ্রুপের বিজয়ের কারণ ও এর ফলে তার মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনায় কি প্রভাব পড়তে পারে তার ব্যাখ্যা চাইলেন তখন সাথে সাথেই এর জবাব প্রস্তুত করে, পুরো লিপিবদ্ধ করে কভার লাগিয়ে তা মেলে ধরল। এতে ছিল ঃ

১। লেবার পার্টির পতনের কারণ রাবিনের আচরণ বিশেষ করে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কার্টারের সাথে সাক্ষাতের সময় বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যায় রাবিন যেভাবে মারমুখী তর্ক করেন এটা তার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ ছাড়া লেবার পার্টি ঝিমিয়ে পড়েছিল। তাঁরা সেই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক নেতৃত্বহারা হয়ে পড়েছেন। এখন যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁরা হচ্ছেন হয় বিভিন্ন দফতরের পরিচালক (যেমন পেরেজ, বেন গোরিয়নের ক্ষেত্রে), না হয় অফিসার (যেমন রাবিন, যিনি সামরিক বাহিনী থেকে এসেছেন)।

২। মেনাহেম বেগিনের সাফল্যের বিরাট সুযোগ ছিল। যিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ইসরাইলের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি দ্য গলের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন। তিনি (দ্য গল) তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আলজিরিয়ার সাথে ফ্রান্সের সমস্যার সমাধান করেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ফরাসী জনগণকে বুঝিয়ে নিতে পারতেন না। এভাবেই কার্টারকে বলা হলো– বেগিনের জয়লাভ হয়ত বা একটি বড় নেয়ামত। যদিও ভাসাভাসা দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এটা লানত। কারণ ইনিই হচ্ছেন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতাদের সর্বশেষ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি যদি বোঝ পান তাহলে ইসরাইলী জনগণকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। এমনকি তাদের চিল কাউয়াদেরকেও। তিনি এ যুক্তি দেখিয়ে সমাধানের পথে অগ্রসর হতে পারেন যে, কেউ ইসরাইলের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না। এছাড়া, যে বেগিন সারা জীবন কট্টর সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত হয়ে এসেছেন তিনি হয়ত তাঁর জীবনের শেষ দিকটিকে ইসরাইলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ হিসাবে বেছে নিতে পারেন। আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআইএ কর্তৃক এসব আশাব্যঞ্জক যুক্তিপ্রমাণ দেয়া সত্ত্বেও জিমি কার্টার ভিতরে ভিতরে বেগিনের আগমনে শঙ্কিতই ছিলেন তিনি আল্-কুদ্স থেকে পরিষ্কার ইশারার অপেক্ষায় ছিলেন। লিকুদ গ্রুপের প্রধানের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে এদিকে ঝুকবেন না ওদিকে। কার্টারকে বেশি সময় অপ্রস্তুত থাকতে হয়নিকারণ বেগিন নেসেট-এর সামনে ২১ জুন ১৯৭৭-এ তাঁর প্রথম ভাষণে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সমাধানে তাঁর চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরেন ঃ

(১) তিনি ঘোষণা করেন, যে কোন পরিস্থিতিতেই পশ্চিম তীর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে না।

(২) ঘোষণা করেন, গোটা ফিলিস্তিনে কোন শর্ত ও সীমা ছাড়াই ইহুদী পুনর্বাসনের আন্দোলনকে তিনি সমর্থন দিয়ে যাবেন।

(৩) তিনি এও ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে নিছক সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে একসাথে বসানোর চেষ্টা করার বেশি এর সমাধানে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে জড়িত করার কোন অধিকার নেই। স্বভাবতই এ কথাগুলো ছিল ভয়-ভীতিপ্রদ। বেগিন ২১ জুন কথা দিয়ে যা শুরু করেছিলেন, ২৩ জুন কাজ করে তা নিশ্চিত করেন। নতুন বসতি স্থাপনে তিনি অংশগ্রহণ করলেন। স্থানের নাম 'এলোন মোরিয়া'। এখানে তিনি ঘোষণা করলেন ইসরাইলের জমিনে যে কোন স্থানে এ ধরনের উপনিবেশ স্থাপনে তিনি সমর্থন যুগিয়ে যাবেন।

কার্টার তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে যাতে তিনি তাঁর প্রতিদিনকার ভাবনাগুলো লিখে রাখতেন এবং যার কিছু অংশ তাঁর নোটবুকে স্থান পেত। তার সমসাময়িক

মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বেশকিছু মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন। ২৫ এপ্রিল ১৯৭৭-এ বাদশাহ 'হুসেইন' সম্পর্কে তাঁর দিনলিপিতে লেখেন ঃ

জর্ডানের বাদশাহ হোসেইন এলেন। আমরা তাঁর অভ্যর্থনাতে সবাই সুখী ছিলাম। তাঁর সফরকে সবাই উপভোগ করলাম। তাঁকে মনে হলো একজন শক্তিশালী ও ধৈর্যশীল মিত্র। তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি বিগত ২৫, ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথম কিছু আশা অনুভব করছেন যে, এ বছরই হয়ত মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের একটা সমাধান দেখতে পাওয়া যাবে। একই অনুভূতি আমারও হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে, ভ্যান্স আবার যাতে ওই অঞ্চলটি পরিদর্শন করতে পারে সে জন্য আমরা মঞ্চকে প্রস্তুত করতে এবং এরমধ্য দিয়ে কিছু ভাল ফল লাভে সমর্থ হব।

কার্টার তাঁর ৯মে, ১৯৭৭ তারিখের ডায়েরিতে লেখেন– "প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ। যার সাথে আমি জেনেভায় সাক্ষাৎ করি। এখানে উড়ে এসেছি বিশেষ করে তার সাথে দেখা করতেই। ইনি বেশ প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। তার সাথে সাক্ষাৎটি একটি উপভোগ্য অভিজ্ঞতা। তাকে মনে হলো দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বেশ গঠনমূলক এবং যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও বেশি নমনীয়। তিনি আমাকে বলেন, দু'এক বছর আগেও সিরিয়ার ভিতর বসে ইসরাইলের সাথে শান্তির কথা বলা ছিল একরকম আত্মহত্যার শামিল।" কার্টার এখনও বেগিনের সাথে সাক্ষাৎ করেননি। তখনও বেগিন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হননি। এতদসত্ত্বেও কার্টার তাঁর রোজনামচায় ২৩ মে ১৯৭৭-এ লেখেন— "তখন ইসরাইলে নির্বাচনী প্রচারণা চলছে–'লিকুদ দলের প্রধান মেনাহেম বেগিন প্রশ্নোত্তর প্রোগ্রামে যা যা বলেছিলেন আমি তার একটি ক্যাসেট চেয়ে পাঠিয়েছি। ইনিই ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসার সম্ভাবনা। আমি তার অবস্থান ও ভূমিকায় প্রকৃতই বেশ শঙ্কিত। আমার মন বলছে– এই ব্যক্তির সাথে শান্তি বাস্তবায়ন খুবই কঠিন হবে।"

কিন্তু মেনাহেম বেগিন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হবার পর কার্টার দেখলেন, এ লোকটির সাথেই কাজ করা ছাড়া আর কোন গতি নেই। তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ১৪ জুলাই ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানান। কার্টার তাঁর দিনলিপিতে লেখেন–"আজ আমরা হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন ও তাঁর স্ত্রীকে স্বাগত জানালাম। আমিও তাঁর এ সফরের জন্য নিজেকে ভালভাবেই প্রস্তুত করে রেখেছি। সত্যি বলতে কি আমি এতে কিছুটা শঙ্কিতই ছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম বেগিন লোকটি বন্ধুবৎসল, আন্তরিক ও খুবই ধার্মিক। আমার বিশ্বাস তিনি একজন চমৎকার মানুষ। যদিও আমি উপলব্ধি করছিলাম যে, তাঁকে বুঝিয়ে তাঁর অবস্থান থেকে সরানো আমার পক্ষে খুবই কঠিন হবে। কিন্তু আমি আমার কাছে প্রাপ্ত রিপোর্টের ওপর নির্ভর করব। এ সব রিপোর্ট অনুসারে ইসরাইলী জনমত একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌছার পক্ষে।"

কার্টারের সাথে আলোচনাকালে মেনাহেম বেগিন মনোযোগের সাথে শুনছিলেন আর কার্টার ঠিক যেভাবে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে শান্তির ব্যাপারে তাঁর ভাবনাগুলো তুলে ধরেছিলেন সেভাবেই ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিলেন। কার্টার তখন বেগিনকে এও বলেন যে, তিনি উপনিবেশ ইস্যুতে তাঁর অবস্থানে বেশ উদ্বিগ্ন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর বিবৃতিগুলো অনুসরণ করে গেছেন। এ ছাড়া তিনি টেলিভিশনে দেখেছেন "এলোন মোরিয়া" উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে তিনি কিভাবে অংশগ্রহণ করেন। পুরোটা সময় ধরে মেনাহেম বেগিন কোন মন্তব্য না করে চুপচাপ শোনতে থাকেন। তিনি বলে নিয়েছেন যে, তিনি প্রথম ও প্রধানত আমেরিকান প্রেসিডেন্টের চিন্তা ও পরিকল্পনা শোনতে আগ্রহী। এক সময় কার্টার কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন– "আমার আশাবাদের অনুভূতি ছিল নিতান্তই স্বল্পায়ু।"

ব্যাপার যা ঘটল, বেগিন আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে সে একই পরিকল্পনা জানালেন যা তিনি নেসেটের সামনে পেশ করেছিলেন।

॥ ৩ ॥

গাদ্দাফি

"লিবিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অপারেশন তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হবে।"
—প্রেসিডেন্ট কার্টারের বরাতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলেটস্ প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রতি।

প্রেসিডেন্ট সাদাতও পরিস্থিতি অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন। কার্টারের মতো তিনিও অনুভব করলেন যে, ওয়াশিংটনের দিক থেকে যে ভরসা এসেছিল তা এখন উবে যাচ্ছে। তাকে এখন অন্য রাস্তা বের করতে হবে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, বেগিনের অবস্থান পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকলে অনেক সময় লেগে যাবে। এতদিন, এত মাস, এমনকি দু'বছর পর্যন্ত ধৈর্য ধরা অসম্ভব। এদিকে তিনি তাঁর সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। সমস্যা স্তুপ হয়ে আছে। ১৮ ও ১৯ জানুয়ারির ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার হুমকিও রয়েছে। এমনকি এর চেয়ে বড় কিছু বিপদও ঘটে যেতে পারে।

হঠাৎ করেই প্রেসিডেন্ট সাদাত অতি আশ্চর্য এক সমাধানে পৌঁছলেন। তাঁর মনে হলো, লিবিয়ার ওপর আক্রমণ করে বসবেন এবং মনে মনে ভেবেছিলেন যে, "পূর্ব বেরকা" প্রদেশ দখল করে নেবেন। কারণ ওখানেই হচ্ছে অধিকাংশ তেলকূপ। এ ধরনের মনোভাব জানার কারণ কি, এ সম্পর্কে অনেক জটিল প্রশ্ন আর অবাক করা সব চিন্তা এসে পড়ে ঃ

১. প্রেসিডেন্ট সাদাতের কি ইসরাইলী প্রস্তাবটি মনে পড়ে গেল যেটা ১৯৭৩-এর শেষে ও '৭৪-এর প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনের বৈঠকগুলোতে মিসরী সামরিক প্রতিনিধি দলকে তারা দিয়েছিল। তাই যদি হয়, তাহলে এটা কি প্রেসিডেন্ট সাদাত নিজে নিজেই মনে করেছিলেন। নাকি কেউ একজন পুরনো সেই প্রস্তাবকে তাঁর মনে করিয়ে দিয়েছে। সাথে ওই নোটটির মধ্যে যে সব প্ররোচক বিষয়াদি ছিল তাও ধরিয়ে দিয়েছিল ? ওই নোটটির শিরোনামই ছিল– 'মিসরের আসল আশা ঃ লিবিয়া।'

২. তিনি কি ভেবেছিলেন যে, লিবিয়ার তেলক্ষেত্রগুলো মিসরের আর্থিক সমস্যা কিছু হালকা করতে পারবে, সম্ভবত মূল থেকে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ? যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে কি কার্যত এবং আরব সমর্থনে এটা বাস্তবায়ন ও সাফল্য লাভে সক্ষম হবেন ? আসলে প্রেসিডেন্ট সাদাত দ্বিতীয় লিয়াজোঁ ছিন্ন চুক্তির পর তাঁর ওপর হামলা

হওয়ার পর থেকেই গোটা আরব জাতির ওপরই হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। বরং বলা যায়, তিনি ১৮ ও ১৯ জানুয়ারির ঘটনার পর খোদ মিসর জাতির ব্যাপারেই হতাশ হয়ে যান। অক্টোবর যুদ্ধের পর এমন কাণ্ড করাকে তিনি এমন অকৃতজ্ঞতা ধরে নিয়েছেন, যা তার প্রাপ্য ছিল না।

৩. প্রেসিডেন্ট সাদাত কি ভেবেছিলেন যে, মুয়াম্মার আল গাদ্দাফির প্রতি পশ্চিমাদের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তির কারণে এখন গাদ্দাফিকে পশ্চিমাদের উত্ত্যক্ত করার শাস্তি হিসাবে সামরিক দখলদারীকে সবাই উৎসাহ যোগাবে। তাছাড়া, তেলআবিবের মতো ওয়াশিংটনও বোধ হয় ব্যাপারটিকে এমনভাবে দেখছে যে, আমেরিকার ভাণ্ডার থেকে কোন খরচা না করেই এভাবে মিসরের আর্থিক সমস্যা ঘুচে যাবে ? যদি এটাই হয়, তাহলে প্রেসিডেন্ট সাদাত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিম ইউরোপসহ বাকি দুনিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন ?

৩. প্রেসিডেন্ট সাদাত কি ভেবেছিলেন যে, এটা একটা গনিমতের মাল যা মিসর জাতির জন্য সাজিয়ে রাখা আছে। কেবল অপারেশনের মাধ্যমে তা গ্রহণ করবেন ? তিনি কি ভেবেছিলেন যে, মিসরী সেনাবাহিনীকে দ্বিতীয় লিয়াজোঁ ছিন্নের কাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নতুন একটি দায়িত্বে ব্যস্ত রাখবেন। যদি তাই হয়, তাহলে মিসর জাতি বা মিসর সেনাবাহিনীর জন্য এ রকম আচমকা পদক্ষেপ নেয়ার কথা তিনি ভাবলেন কি করে ? কিছু উপায়-উপকরণ বা ছলছুতো প্রস্তুতই ছিল– বরং আরও শুদ্ধভাবে বলা যায়– সেগুলো ছিল ঘুমন্ত, অতি সহজেই এগুলোকে জাগানো সম্ভব ছিল। এর একটি হচ্ছে ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে লিবিয়া যে সোভিয়েত অস্ত্র কেনার চুক্তি করেছিল সেটি। প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ ও জনাব ইয়াসির আরাফাত এ চুক্তির জন্য সুপারিশ করেছিলেন কেন, এটা সংশ্লিষ্ট মহলের জানা থাকার কথা বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট সাদাতের। বরং তিনি চুক্তির প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি জানতেন বলেই বলতে পেরেছিলেন যে ' সোভিয়েত ইউনিয়ন দেউলিয়া' হয়ে গেছে। ঘটনার সূচনা হয় এ চুক্তিটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর মধ্য দিয়ে। মিসরে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় , চুক্তির সাইজ প্রকৃত পরিমাণের চেয়ে হঠাৎ করেই বেড়ে যায়। ছিল দু'বিলিয়ন ডলার, এটাকে দ্বিগুণ করে ৪ বিলিয়ন ডলারে ওঠানো হয়। বলা হয়, এর একটি ধারায় ছিল আর্মড ফোর্সে দু'হাজার ট্যাঙ্ক। আরও বলা হয় যে, "এ চুক্তিটি যে সামরিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়, সে অনুসারে লিবিয়া নাকি এই অনুমোদন দেয় যে, সোভিয়েত স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী লিবিয়ার ভূখণ্ডে এবং এর নৌবন্দরগুলোতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবে।" আরও বলা হয় যে, "চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন লিবিয়াকে সোভিয়েত অস্ত্র কারখানাগুলোতে উৎপাদিত সব ধরনের সর্বাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করবে এবং এ ধরনের অস্ত্র লিবিয়ার আশপাশের দেশকে সরবরাহ করবে না। অনুরূপভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চুক্তিতে সই করার জন্য শর্তারোপ করে যে, লিবিয়াতে সামরিক সকল দিকের, সকল

পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা হবে। যাতে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে সোভিয়েত-লিবিয়া সামরিক মৈত্রী গঠনের কৌশলগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।"

এরপর "এভিয়েশন উইক" পত্রিকার মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সূচনা করা হয়। এটি সামরিক বিমান বিষয়ক আমেরিকার পত্রিকা। এটি বলেছে – "লিবিয়া যে মিরেজ বিমানগুলোর মালিক বনেছে সেগুলোর চালানোর মতো বৈমানিক পাচ্ছে না। লিবিয়া এগুলো চালনায় সক্ষম হতে আরও বিশ বছর লেগে যাবে।" এরপর এ কথার একটি যৌক্তিক মন্তব্য করে ঃ "লিবিয়ার যদি মিরেজ বিমান চালানোর মতো বৈমানিক না থাকে তাহলে এখন লিবিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক যে সব মিরেজ বিমানের মালিক বলেছে সেগুলো কে চালাবে আর কে-ই বা ব্যবহার করবে ? এ মন্তব্যের ওপর যৌক্তিকভাবেই যে মন্তব্যটি এসে পড়ে তা হচ্ছে এ সব বিমান চালনা আর ব্যবহার এখন সোভিয়েত বৈমানিকদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে।

লিবিয়া-সোভিয়েত চুক্তির অতিরঞ্জিত প্রচারণা ছিল প্রাথমিক ভূমিকা। দ্বিতীয়, পদক্ষেপ ছিল বার বার এই ইঙ্গিত দেয়া যে, এত বিপুল অস্ত্রশস্ত্র মিসরের সীমান্তবর্তী লিবীয় এলাকাতেই মোতায়েন করা হয়েছে। সাথে রয়েছে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ও বৈমানিকগণ। এহেন পরিস্থিতিতে কায়রো ও মস্কোর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এসব মিলিয়ে মিসরের নিরাপত্তার ওপর একটি বড় বিপদের ঘণ্টা দেখা দেয়।

১৯ জুলাই, ১৯৭৭, কায়রোতে এমন কিছু খবর প্রকাশ ও প্রচার শুরু হয় যে, লিবিয়ার বাহিনী মিসরের সালুম অঞ্চলে আক্রমণ করেছে। এরপর ঘোষণা করা হয় যে, মিসর বাহিনী হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত করে এবং যে স্থান থেকে মিসরী লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলা পরিচালনা করা হয় সেখানে তারা ঢুকে পড়ে। সেগুলো ধবংস করে মিসরে নিজ ঘাঁটিতে তারা ফিরে আসে। ২৩ জুলাই ১৯৭৭ তারিখে একজন সামরিক মুখপাত্রের বিবৃতি প্রকাশ করা হয় যে, "আমাদের বাহিনী গতকাল বৃহস্পতিবার ২১ জুলাই ১৯৭৭ তারিখে হানাদার লিবীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তার দায়িত্ব পালন শেষে মিসরী ভূখণ্ডে ফিরে আসার পর গতরাতে লিবীয় প্রশাসন আমাদের সম্মুখভাগের এলাকায় থেকে থেকে গোলাবর্ষণ করে। আমাদের বাহিনী পাল্টা গোলাবর্ষণ করে তার উপযুক্ত জবাব দিয়ে তাদের স্তব্ধ করে দেয়। ২২ জুলাই ১৯৭৭ তারিখ সকালে লিবীয় সামরিক বিমান তিনবার আক্রমণ চালায়। প্রতিবারই দু'টি করে বিমান সালুম অঞ্চলে আঘাত হানে। তিনজন সামরিক ব্যক্তি এতে আহত হয়। যেহেতু লিবীয় প্রশাসন অব্যাহতভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে তার বিমান বাহিনী দিয়ে এতে আমাদের বাহিনী ও ভূখণ্ডের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ায় আমাদের বাহিনী আজ শুক্রবার মধ্যাহ্নের পর 'আল-আদম' বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়।

প্রেসিডেন্ট সাদাত মনে করেন, "লিবীয়রা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে এ ঘাঁটিই ব্যবহার করে। এটি তুবরুক শহরের দক্ষিণে ৩০ কি.মি. দূরত্বে এবং মিসর সীমান্তের পশ্চিমে ১২০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। এ ঘাঁটিতে আমাদের বিমান আক্রমণে ঘাঁটির ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হয় এবং অন্যান্য স্থাপনা ও ওখানকার কিছু বিমানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই আক্রমণে অংশগ্রহণকারী আমাদের সকল বিমান কোন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েই নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে।" অপারেশনের পরিসর বেড়ে গেল। প্রেসিডেন্ট সাদাত এ মুহূর্ত পর্যন্ত এটাকে 'গাদ্দাফিকে আদব দেয়ার' অপারেশন বলে অভিহিত করছেন। কিন্তু 'বেরকাতে' লিবীয় বিমানবন্দরগুলোতে আক্রমণের সাইজ দেখে মনে হয় যে, লক্ষ্য হয়ত বা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিছু দিক থেকে দৃশ্যপট ছিল হতাশাব্যঞ্জক। কারণ লিবীয় ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণের ফলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় হলো যেমন ধরুন আল আদম ঘাঁটিতে আক্রমণে যারা আহত হলো তাদেরকে ত্বরিত গতিতে তুবরুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় এখানকার অধিকাংশ ডাক্তারই ছিলেন মিসরী। এর পরিচালকও ছিলেন একজন প্রখ্যাত মিসরী শল্য চিকিৎসক। ইনি ডাক্তার 'মুস্তফা শারবিনী'। তাঁর অনুতাপ এ পর্যন্ত পৌঁছে যে, তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে এ বলে একটি টেলিগ্রাম পাঠান যে, "এখানে লিবীয় অফিসার ও জোয়ানদের অপারেশন চলছে কিন্তু তিনি তাঁদের আহত স্থান দেখতে পাচ্ছেন না বলা যায়। কারণ অশ্রু তাঁর দু'টি চোখকে ঢেকে দিচ্ছে।"

মিসরী জনমত ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অন্যান্য আরব রাজধানী এখানকার চলমান ঘটনাবলী বলতে গেলে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তবে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট 'হুয়ারি বুমেদিন' যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানালেন। জনাব ইয়াসির আরাফাত কায়রো ও ত্রিপলীর মধ্যে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিলেন। মিসর-লিবিয়া সীমান্তে এই বিপজ্জনক ঘটনায় ওয়াশিংটন চমকে গেল। লিবিয়াতে কর্মরত আমেরিকান তেল কোম্পানিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল। তারা বেরকায় তেলক্ষেত্রগুলোর নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করল যে, প্রেসিডেন্ট সাদাতের এই হামলা লিবিয়াকে 'আদব দেয়ার' আক্রমণের চেয়ে বড় কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অপরদিকে, ওয়াশিংটনে এমন কেউ প্রস্তুত ছিল না যে, মিসরের লিবীয় তেলক্ষেত্র দখলের পাঁয়তারাকে গ্রহণ করে। কাজেই আমেরিকার স্থির লক্ষ্য ছিল তেলের বাজার বা এর উৎসে কোন প্রভাব পড়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মিসরকে বাধা দেয়া।

হয়ত যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের পূর্বেকার ইঙ্গিতের কিছুই জানত না যে, "ইসরাইল পশ্চিমে মিসরের হাত বাড়ানোকে মেনে নেবে যদি সে ইসরাইলকে পূর্বে হাত বাড়াতে দেয়। "ইসরাইলের পূর্বেকার ইশারা-ইঙ্গিতের মর্ম এটাই বোঝা যায়। কায়রোতে

নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলেট্স নির্দেশনা পেলেন যেন প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাতে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে লিবিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অপারেশন বন্ধ করার অনুরোধ জানান। কারণ " এই অপারেশন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বিপজ্জনক অবস্থা ডেকে আনছে যা এখনকার বর্তমান অবস্থা ও সার্বিক পরিস্থিতি সহ্য করতে পারবে না।" চমক ছিল এই যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত কস্মিনকালেও আমেরিকার হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করেননি। তিনি প্রায় স্থির বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, গাদ্দাফিকে আদব দেয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত এ্যাকশনে যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি থাকবে না। তার মনে এটাও ছিল যে, কোন না কোনভাবে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই ইসরাইলের সেই পুরনো প্ররোচনার কথা জানে। মনে হয় তিনি তাঁর নিয়ত সম্পর্কে পূর্বে কিছুই জানাননি যাতে তাদেরকে বা নিজেকে বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলেন। কিন্তু সর্বশেষ তিনি যা ভাবলেন তা হচ্ছে–আমেরিকা দৃঢ়ভাবেই চাচ্ছে যেন তিনি মিসর–লিবিয়া সীমান্তে সামরিক অপারেশন বন্ধ করেন।

হারম্যান এলেট্স আমেরিকার অনুরোধ জানাবার সময় বৈষয়িক যুক্ত-প্রমাণ দিয়ে তা জোরদার করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন যে, এই সামরিক আক্রমণটা ব্যাপক রাজনৈতিক পরিকল্পনারই অংশ কি না, যার একটি সমরূপ রাজনৈতিক অংশ লিবিয়ার অভ্যন্তরেও রয়েছে ? অর্থাৎ মিসর ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে ত্রিপলীতে গাদ্দাফির বিরুদ্ধে একটি সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয় অথবা তার বিরুদ্ধে একটি গণ আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এর উত্তরে বলা হয় যে, মিসর তা করেনি। যদিও এর একটা সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে, যখন লিবিয়ার সেনাবাহিনী বা লিবীয় জনগণ দেখবে যে মিসরের বিরুদ্ধে গাদ্দাফির মাথাচাড়া দেয়ার পরিণতি কি।

এরপর এলেট্স আরেকটি বিষয় উত্থাপন করেন যে, বেরকার মতো সাইজের একটি এলাকা দখল করার অপারেশনের জন্য মিসরের সম্মিলিত সামরিক বাহিনী কি যথেষ্ট ? তিনি এতে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেন।

তিনি জানান যে, তিনি অপারেশন এলাকার ওপর উপগ্রহের মাধ্যমে গৃহীত ছবিগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, লিবিয়া সীমান্ত অভিমুখী কিছু সেনা পরিবহনকারী যান নষ্ট হয়ে আছে। যদি এই সামরিক অপারেশন সফল না হয় তাহলে অক্টোবরে মিসরী বাহিনীর গৌরবময় কৃতিত্বের পর এখন তাদের আত্মবিশ্বাসে ধস নেমে আসবে। এখানে কেন্দ্রীয় বিষয়টি হচ্ছে অপারেশনের অঞ্চলটি খুব বিস্তৃত। এটার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা খুবই দুরূহ। বিশেষ করে যদি লিবিয়া এটাকে গেরিলা কায়দায় মোকাবিলা করে।

এলেট্সে এবার একটি যুক্তি খুঁজে পেলেন। যা দিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারবেন বলে অনুভব করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন,

মিসরী বাহিনী কি এ মুহূর্তে পূর্বদিকে ইসরাইলের মোকাবিলায় কেন্দ্রীভূত হওয়া বাদ দিয়ে পশ্চিমে একটি আরব দেশের বিরুদ্ধে সমাবেশ ঘটাতে প্রস্তুত আছে ? এ ছিল এক চূড়ান্ত বিস্ময়ের কথা! যাহোক, অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধের ব্যাপারে এ ছিল ওয়াশিংটনের সুস্পষ্ট বার্তা। সৌভাগ্যক্রমে সে মুহূর্তেই প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন লিবিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এরপর হঠাৎ করেই আলেকজেন্দ্রীয় বিমানবন্দরে তাঁর বিমান দেখা গেল, অবতরণের অনুমতি চাচ্ছে। সে মুহূর্তে মিসরের একটি সামরিক বিবৃতি ছিল এ রকম ঃ মিসরের এক অমিততেজ সামরিক ইউনিট বিমান বাহিনীর সহায়তায় মিসরের সিওয়া মরূদ্যান থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত জাগবুর মরূদ্যান অঞ্চলে লিবীয় সেনা শিবিরগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মিসরী বিমানগুলো 'আদম' ও 'কাফারাহ' এ দু'টি বিমানবন্দর ও অনেক রাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত ও প্রেসিডেন্ট বুমেদিনের মধ্যকার সাক্ষাতটি ছিল একটি ঝড়োহাওয়ার মতো। প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে যদিও আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানায় তবুও তিনি মনে করেন যে, এর কৃতিত্ব প্রেসিডেন্ট বুমেদিনকে দেয়াই শ্রেয়। হোক না তা আমেরিকার হস্তক্ষেপকে ঢেকে রাখার পর্দা হিসাবে। এভাবে তিনি বুমেদিনকে বোঝাতে লাগলেন যে, তিনি সামরিক একশনে যেতে নিত্যন্তই বাধ্য হয়েছেন। তাঁর যুক্তি ও অজুহাত ছিল এ রকম ঃ গাদ্দাফি সোভিয়েত ইউনিয়নের আঁটা পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। যুদ্ধ বাধার পর তাঁর বিবৃতিগুলোতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, "সে লিবীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে।"

গাদ্দাফি তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকেন। তিনি "জুলুমকে রোখো" স্লোগানকে পুঁজি করে লিবীয় জনগণের মনকে মিসরের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সন্দেহে ভরে দিচ্ছেন। এর প্রমাণ হচ্ছে তিনি নাটকীয়ভাবে "মিসরীয়দের হাতে শহীদ লিবীয়দের নামের তালিকা" ঘোষণা করেন। গাদ্দাফি তাঁর অভ্যন্তরীণ সমস্যা ঢাকা দিতে চান। এ জন্যেই মিসরের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে বসেছেন। কাজেই গাদ্দাফিকে একটা সীমায় থামিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিবাদ না করে তাঁর সামনে গত্যন্তর ছিল না। প্রেসিডেন্ট সাদাত এ সময় প্রেসিডেন্ট বুমেদিনের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরেন। এর সারকথা হচ্ছে-"গাদ্দাফি মিসর বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবাণু-যুদ্ধের উপকরণ ব্যবহার করছে। মিসর বাহিনী পানীয় জলের জন্য নির্ভর করে এমন কিছু কুপে গাদ্দাফি বিষ ঢেলে দিয়েছে।"

টানা সাড়ে ছয় ঘণ্টা ধরে বুমেদিন ও সাদাতের মধ্যে বৈঠক চলে। এরপর বুমেদিন ত্রিপলীতে ফিরে আসেন। প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে যুদ্ধ বন্ধের নীতিগত স্বীকৃতি পেয়ে তিনি এখন যুদ্ধ বন্ধের ব্যবস্থাদি বিন্যাস করতে লেগে গেলেন।

বুমেদিন মিসর ত্যাগ করে যেতে না যেতেই আরব ও আফ্রিকার বেশ কিছু রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধি এসে হাজির হলেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট আয়াদিমা, টোগো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। তিনি তাঁর সাথে করে এনেছেন মিস্টার উইলিয়াম আটিকি'কে। ইনি হচ্ছেন আফ্রিকা ঐক্য সংস্থার মহাসচিব। এ দু'জনের পর এসে পৌছলেন ইয়াসির আরাফাত ও আব্দুল হালীম খাদ্দাম এবং শেখ সাবাহ্ আল আহমাদ আস-সাবাহ্। আগুনের লেলিহান শিখা মিসর-লিবিয়া সীমান্তে স্তিমিত হয়ে আসতে শুরু করল।

প্রেসিডেন্ট সাদাত দেখলেন যে, লিবিয়া আগ্রাসনের চিন্তাটিকে সূচনাতে থামিয়ে দেয়া হলো। তাছাড়া এতে তিনি যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন তার তেমন কোন পরিবর্তনই বয়ে নিয়ে এলো না। এতে না আর্থিক কোন ফায়দা পাওয়া গেল, আর না এতে মিসরী জনগণের কোন আগ্রহ বাড়ল। এটা মিসরী সশস্ত্র বাহিনীগুলোকেও কোন বাড়তি মনোবল এনে দিল না। বরং উল্টোটাই ঘটেছে। এ ধরনের একটি সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল বিষয়ে আগপাছ না ভেবেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বেহিসাবী অভিযাত্রার মতো শুরু করা হয়। কাজেই এখন নতুন চিন্তা করতে হবে। আর বের করতে হবে সফলকাম হওয়ার মতো কোন রাস্তা।

॥ ৪ ॥

আল্-কুদ্স

"বাদশা হাসান পুরো সময় ধরে আমার সাথে কথা বলছিলেন যেন আরব বাদশাহ সংঘের একজন সদস্য।"

—মরক্কোর বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎকার সম্পর্কে 'মোশে দায়ান

প্রেসিডেন্ট সাদাত ১৯৭৭ সালের প্রথমভাগে তিনটি বেদনাদায়ক আঘাত পেয়েছেন ঃ ১৮ ও ১৯ জানুয়ারির ঘটনা, যখন দেখা গেল যে, মিসরের জনগণ তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করছে।

১. ইসরাইলের নতুন নেসেটের (সংসদের) নির্বাচনে লিকুদ গ্রুপ জয়ী হলো। তিনি দেখলেন, তাঁর সামনে সব ইসরাইলী শকুন। অথচ ভেবেছিলেন যে, তাঁর সামনে পাবেন এক ঝাঁক পায়রা (যদি ধরে নেয়া যায় যে লেবার পার্টি ছিল শান্তির পায়রা)।

২. লিবীয় তেলের আয়ে মিসরের আর্থিক সমস্যা সমাধানের সর্বশেষ চেষ্টাটিও ব্যর্থ হলো। আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর উদ্যোগকে ঠেকাতে তাঁর আরব প্রতিপক্ষরা এগিয়ে আসেনি বরং এসেছেন তাঁর হোয়াইট হাউসের বন্ধুটি।

এ ছিল ঘটনার অনিরুদ্ধ ধারায় আরোপিত এক অবরোধ অবস্থা। পরিস্থিতি তাঁর পাশে এখন এমন এক পরিমণ্ডল তৈরি করে রেখেছে যে, যে কোন মুহূর্তে দাবানল জ্বলে ওঠতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত মিসরে তখনকার সার্বিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এমনই ছিল যে, তাঁর চারপাশে তখন যে বন্ধুভাজন ও উপদেষ্টাবৃন্দ ছিলেন তাদের কৌশলগত ও অর্থনীতিক কিংবা বৃদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অস্বচ্ছ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতে তার অনুভূতি হয়ে ওঠে– যাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে অবরুদ্ধ অনুভূতি বা ক্লাস্ট্রোফোবিয়া। তিনি হন্যে হয়ে এ অনুভূতিকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছেন অথচ মনে হচ্ছে আরও বেশি জড়িয়ে যাচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাতের সমস্যাটিকে সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন ওয়াশিংটনে বসে কার্টার। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তাঁর প্রতি তার একটি বিশেষ দায়-দায়িত্ব রয়েছে। কারণ তিনি তাঁদের দু'জনার ওয়াশিংটন বৈঠকের সময় তাঁর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে তাঁর ইস্যুটি আমানত হিসাবে সোপর্দ করে এসেছিলেন এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এর মোকাবিলায় তিনি কিছুই পেশ করতে পারেননি। বরং পরিস্থিতি তাকে সতর্ককারীর ভূমিকা পালনে বাধ্য করেছে।

তাঁর ও বেগিনের মধ্যে কি কথাবর্তা হয়েছে তা তাঁকে জানালেন। কিন্তু এতে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু নেই।

লিবিয়ায় তাঁর অপারেশন বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। তখন তিনি ভেবেছেন তিনি হয়ত তাঁর জন্য একটি আশা ঝুলিয়ে রাখলেন।

যে ভাবেই হোক, কার্টার অনুভব করলেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত আমেরিকার রাজনৈতিক সিস্টেমের ধরণ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত নন। কারণ এর প্রশাসন বেশ কিছু আইন–কানুন আর গ্যারান্টি তথা চেক এণ্ড ব্যালান্সের উপর ভিত্তিশীল। বিশ্বের অনেকে যেমনটি মনে করে থাকেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কিন্তু সে রকম কোন ক্ষমতা রাখেন না। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন যেহেতু প্রতি দু'বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচনে পড়ে (অর্থাৎ প্রতি চার বছর অন্তর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, কংগ্রেস বা সংসদ নির্বাচন ও অর্ধ সিনেটর পরিষদ এবং প্রাদেশিক গভর্নর নির্বাচন করা হয়ে থাকে– আর প্রতি দু'বছর অন্তর অর্ধ কংগ্রেস নির্বাচন), এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে অব্যাহতভাবে নির্বাচনী অবস্থা মোকাবিলা করে যেতে হয় এবং আমেরিকান নির্বাচকের মনে তাদের স্বার্থাদি ও বিভিন্ন চাপ এবং আমেরিকান তাদের আগ্রহ ইত্যাকার বিষয়াদির প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। এতদসত্ত্বেও এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রকে নতুনত্ব দিতে বিরাট প্রাণময়তার যোগান দিয়ে থাকে । এ কারণে নীতি গ্রহণে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের এখতিয়ার বেশ সীমিত থেকে যায়।

কার্টার অনুভব করলেন যে, তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের ফ্রন্টে অগ্রসর হতে হবে। না হয়, মিসরে প্রেসিডেন্ট সাদাতের অবস্থান খুব শীঘ্রই বিপদের মুখে পড়বে। কারণ তিনি গেল অর্ধেক বছরেই তিনটি বড় আঘাত পেয়েছেন। এর পিছনে আরেকটি কারণও রয়েছে তা হচ্ছে , মিসরে ক্ষমতার মসনদ রক্ষার আগ্রহ থেকে তিনি যে কর্মকাণ্ড করেছেন তাও কিছুটা দায়ী। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ছিল মিসরের পশ্চিমের প্রতি ঝুঁকে পড়া। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের বুক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বের করে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কখনও সম্ভব হতো না। সম্ভব হয়েছিল খোদ মধ্যপ্রাচ্যেরই সহায়তায়। আর এ ভূমিকাটিই কার্যত পালন করে গেছেন প্রেসিডেন্ট সাদাত।

৩০ ও ৩১ জুলাই ১৯৭৭, এ দু'টি তারিখে প্রেসিডেন্ট কার্টার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী কমিটির দু'টি বৈঠক করেন। এতে তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের সামনে কি পথ খোলা আছে তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই অনুসন্ধানী আলোচনায় তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও ব্রেজনেস্কির বিশেষ সহকারী বেল কাউন্টের বর্ণনা অনুসারে– প্রেসিডেন্ট সাদাতের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে

আলোচনা চলে। এর আলোকেই তার জন্য উপযুক্ত পন্থা বের করা হবে। কাউন্ট লিখেছেন ঃ ভ্যান্স বললেন, "প্রেসিডেন্ট সাদাত সাধারণ ব্যবস্থাপনায় বেশ শক্তিশালী, তবে বিষয়টি যখন চূড়ান্ত বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছে তখন তিনি দুর্বলতার পরিচয় দেন।"

এদিকে ব্রেজনেস্কির অভিমত ছিল– প্রেসিডেন্ট সাদাতের সমস্যা হচ্ছে, বাস্তবতা ও স্বপ্নচারিতার (Fact and Fiction) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে তাঁর অক্ষমতা। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফল দাঁড়িয়েছিল– প্রেসিডেন্ট সাদাতের সামনে এখন করণীয় হলো শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে তাঁর চেষ্টা অব্যাহত রাখা। যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে– এই প্রক্রিয়ায় শক্তি জুগিয়ে অব্যাহতভাবে একে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা। এভাবে কার্টার বিষয়টি নিয়ে কিছু করার ত্বরিত ব্যবস্থা নিলেন এবং তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্সেকে ওই এলাকায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৭৭-এর আগস্টের শুরুতে এ সফরে বাহ্যত প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে সাক্ষাতই উদ্দেশ্য। এ ছিল লিবিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ বন্ধের মাত্র দশ দিনের মাথায়।

প্রেসিডেন্ট কার্টারের স্বহস্তে লেখা নোটে সাইরাস ভ্যান্সের প্রতি কিছু নির্দেশনা লেখা ছিল। সেটা ছিল এ রকম– আপনি আপনার আসন্ন সফরে একটি গুরুদায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আশা করি আপনি নিম্নরূপে তা পালন করবেন।

(ক) আপনি আমাদের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন। তাতে যদি সফল না হন তাহলে আমি চাই আপনার ভূমিকা এমনভাবে নির্ধারণ করবে যাতে আমরা সমাধানের পথে বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে সম্ভব সবচেয়ে বড় ধরনের সমর্থন যোগাতে পারি।

(খ) আমি আশা করি আপনি জেনেভা সম্মেলন সংগঠিত হওয়ার প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সমঝোতার আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করবেন। এর পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজটি সম্পন্ন হতে পারে–আসছে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে যখন তাঁরা সবাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য আসবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো থেকে এ মর্মে স্বীকৃতি নিয়ে নিতে হবে যে, ইতোপূর্বে জেনেভা সম্মেলনে যে ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছিল তা অনুসরণ করা হবে।

(ঘ) অন্য আরব দেশগুলোর সাথে সম্মেলনে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার উপস্থিতিকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে এ হবে নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩৩৮ নং সিদ্ধান্ত যদি পিএলও মেনে নেয়, তার ভিত্তিতে। এটাও তাঁদের মেনে নিতে হবে যে, সম্মেলনের কার্যসূচীর মধ্যে ফিলিস্তিন সমস্যাটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আমাদের পদক্ষেপ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আবশ্যই অবহিত রাখতে হবে। সকল পক্ষের সাথে স্পষ্টবাদিতার পদ্ধতিও আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে। আমাদেরকে

আপনি ফেরার পর অবশ্যই শক্তিশালী ও প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি পিএলও আমাদের চাহিদা মতো ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় তাহলে আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন- প্রকাশ্যে বা গোপনে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করবেন। শুভেচ্ছান্তে- জিমি।

যখন ভ্যান্স, প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে আলেকজান্দ্রিয়াতে সাক্ষাৎ করলেন, তখন দেখলেন পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট কার্টারের নিকট পাঠানো রিপোর্টের ভাষ্য অনুসারে যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত ধৈর্যহারা ও বিরক্ত হয়ে আছেন। তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য 'বিস্ফোরণ ঘটান'। ভ্যান্স তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। একটু পরেই বুঝলেন যে তাঁর সামনে প্রকৃতই একটি সমস্যা রয়েছে। কারণ প্রেসিডেন্ট সাদাত চাচ্ছেন না যে, আগের মতো জেনেভা সম্মেলনের নিগড়ে সকল আরব পক্ষ আলাদা আলাদা প্রতিনিধি দল নিয়ে একটি সাধারণ মহাসম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে আসন্ন পর্যায়ে কোন সমাধান হোক। এমনকি এখন ভ্যান্সের অনুসারে একটি অভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের উপস্থিতির প্রস্তাব মাধ্যমেও কোন সমাধানে তিনি রাজি নন। একক ও অভিন্ন আরব প্রতিনিধি দল সম্পর্কে কথা ওঠাতেই ভ্যান্স আশ্চর্যের সঙ্গে শুনছেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁকে বলছেন-"যদি আমরা একক প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ করে বৈঠক করি তাহলে আমরা নিজেদের ভিতর থেকেই বিস্ফোরিত হয়ে যাব। কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই অপরের বিরুদ্ধে ভেটো পাওয়ার থাকবে।" কাজেই প্রেসিডেন্ট সাদাতের দৃষ্টিতে শ্রেয়তর সমাধান হচ্ছে- ইসরাইলের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র একটি পূর্ণ শরিকের ভূমিকা গ্রহণ করবে, যাতে একটি 'মিসর-ইসরাইল' সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয় এবং সিরিয়া ও জর্ডান তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন পথ না থাকে। এতে সোভিয়েত ইউনিয়নেরও কোন কিছু করার সাধ্য থাকবে না।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যান্সের সাথে আলোচনায় মনে হয়, প্রেসিডেন্ট সাদাত ফিলিস্তিন বিষয়টি এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যাতে পিএলও ২৪২ ও ৩৩৮ নম্বর সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেয়ার বিষয়টি শামিল থাকে, যদিও সুপ্তভাবে। জনাব ইয়াসির আরাফাত তখন মিসরেই ছিলেন। ভ্যান্সও সে কথা জানতেন। সে সময়কার পিএলও'র প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব 'আবু ইয়াদও' আরাফাতের সাথে মিসরেই ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত এ সময় আরাফাতের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি পত্র ভ্যান্সকে প্রদান করেন। এতে ছিল ঃ

"পিএলও নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, তবে এটা সংরক্ষিত থাকবে যে- সংস্থা এই সিদ্ধান্তকে ফিলিস্তিন সমস্যার নির্দেশনায় যথেষ্ট বলে গণ্য করছে না। কারণ এ সিদ্ধান্তে কোন ধারা-উপধারায় ফিলিস্তিন জাতির জন্য একটি

স্বদেশের নির্দেশনা নেই। সংস্থা মনে করে যে, ২৪২ নং সিদ্ধান্তের ভাষা এ অঞ্চলের প্রত্যেক জাতির শান্তিতে বসবাসের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত।" ভ্যান্স এ ভাষা বিন্যাসেই সন্তুষ্ট ছিলেন। যদিও কায়রোস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, এর শেষে একটি বাক্য যোগ করে দেন-"এতে ইসরাইলও রয়েছে।" কিন্তু ভ্যান্স মনে করলেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত যে ফিলিস্তিনী শব্দ বিন্যাসে তার কাছে পেশ করেছেন তা 'যুক্তিগ্রাহ্য' এবং ফিলিস্তিনীদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যথেষ্ট। আরব একক প্রতিনিধি দলে তাদের প্রতিনিধি থাকার জন্য এতেই চলবে। যদিও এই পরিকল্পনাতে প্রেসিডেন্ট সাদাত এখনও রাজি হননি। কিন্তু তার ধারণা যে, পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত একটা পথ খুঁজে পেতে পারে। ভ্যান্সের সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর এই প্রস্তাবে পৌঁছল যে, একক আরব প্রতিনিধি দলে ফিলিস্তিনী প্রতিনিধি যিনি থাকবেন তিনি হবেন ফিলিস্তিনী জাতীয় সংসদের সদস্য ভিন্ন কোন একজন। এটাই ভ্যান্স চাচ্ছিলেন। যাতে ইসরাইল সন্দেহ পোষণ করতে না পারে যে, কেউ বুঝি পরোক্ষভাবে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থাকে স্বীকৃতি দেয়ার ফাঁদ পেতে রেখেছে। যা ইসরাইলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট সাদাত তখন ভ্যান্সের নিকট ডক্টর এডওয়ার্ড সাইদের নাম পেশ করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট ফিলিস্তিনী চিন্তাবিদ। ইনি নিউইয়র্কের কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। তাছাড়া তিনি আমেরিকান পাসপোর্টধারী।

এক সময় মনে হলো বুঝি বা সব কিছু ঠিকঠাক মতো এগুচ্ছে, যদিও প্রেসিডেন্ট সাদাত তখনও একক আরব প্রতিনিধি দল সম্পর্কে সন্দেহের দোলাচালে রয়েছেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন, যদি ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে নিয়ে ইসরাইলের সাথে সমাধানের পথে যান তাহলে আর কোন আরব পক্ষ হাতে থাকবে না যে তার ওপর বেশি দাবি করবে।

এভাবেই তিনি জেনেভার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কথা বাদ দিয়েই ফিলিস্তিনী প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে হন্যে হয়ে পড়েন। সম্মেলন আদৌ হবে কি হবে না অথবা এতে আরবরা একক প্রতিনিধি দল হিসাবে উপস্থিত হবে কি হবে না-এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

অধিকন্তু, প্রেসিডেন্ট সাদাত আলেকজান্দ্রিয়ায় ভ্যান্সের অবস্থানের একটি দিনে আবু ইয়াদের উপস্থিতিতেই জনাব আরাফাতকে "প্রথমে গাজা ও আরিহা" পরিকল্পনাটি পেশ করেন। এতে অন্তত পিএলও গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরে পা রাখার জায়গা পাবে। এতে করে সে তার স্বদেশে থেকে আলোচকের মর্যাদা পাবে। সেখান থেকেই বোধগম্য সীমায় এবং নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো ব্যাখ্যার আলোকে অবশিষ্ট ভূমি দাবি করার কাজ করতে পারবে।

কিন্তু ভ্যান্সের প্রচেষ্টা ভিত্তিসহ মুখ থুবড়ে পড়ল যখন তিনি ইসরাইলে গেলেন এবং বেগিনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে আলেকজান্দ্রিয়ার আলোচনার ফলাফল

তুলে ধরলেন। বেগিন প্রথমেই জেনেভা অথবা অন্য কোথাও ফিরে যাবার ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। এমনিভাবে একক আরব প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবকেও দ্ব্যর্থহীনভাবে নাকচ করে দিলেন। ফিলিস্তিনীদের ব্যাপারে বেগিন ভ্যান্সের আনা খসড়া পাতাটি হাতে নিয়ে ভ্যান্সকে বললেন ঃ

"এটা এমন একটি জিনিস যাকে মিউনিখে চ্যাম্বারলেনের কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনা করা যায়, যখন তিনি হিটলারের সামনে আত্মসমর্পণ করেন অথচ তিনি এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আশ্চর্য হন, কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দেশ পিএলও'র মতো একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ থেকে একটি পাতা হলেও গ্রহণ করতে পারে!" এরপরও তিনি ভ্যান্সের সাথে তার কথা শেষ করেন এই বলে যে, ইসরাইল এটা করছে না এবং এখনও গ্রহণ করবে না। ভ্যান্স আবারও মিসর গিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে সাক্ষাৎ শেষে ওয়াশিংটনে ফিরে এলেন। তিনি তখনও জোর দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট কার্টার অচিরেই বেগিনকে একথা বোঝাবার কোন পথ পেয়ে যাবেন যে, জেনেভা স্টাইলে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনই হবে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের সমাধানে পৌঁছার একমাত্র পথ। এর ভিতর থেকেই প্রকৃত শান্তি পয়দা হবে।

ভ্যান্স অনুধাবন করলেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাতও এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নন। এরপর দেখলেন কিছু সময়ের জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাত একলা চলার নীতি গ্রহণ করে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তিচুক্তির পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট কার্টারের নিকট পেশ করছেন। ভ্যান্স তাঁর ডায়েরিতে লেখেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁকে বলেছেন, "তিনি যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন এটা হচ্ছে নীতিগত অবস্থান যা আলোচনার ভিত্তি হতে পারে। তবে এটা আমার চূড়ান্ত অবস্থান নয়।" এরপর তাঁকে অনুরোধ করেন যেন এটা প্রেসিডেন্ট কার্টারকে বলেন এবং তাঁকে এ অনুরোধও করেন যেন এটাকে গোপন রাখেন, এখনই ইসরাইলীদের তা জানতে না দেন। এই নাজুক মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট সাদাত 'নিকোলাই চচেস্কু থেকে একটি পত্র পান। রুমানীয় প্রেসিডেন্ট এতে বেগিনের একটি বার্তা পাঠান। একই বার্তা চচেস্কু লেবার পার্টির নেতাদের কাছ থেকে ইতোপূর্বে বেশ কয়েকটি পেয়েছেন। এখনকার বার্তায় বলা হয়, বেগিন প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে যে কোন স্থানে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। চচেস্কু বলেন– তিনি বেগিন ও তাঁর মধ্যকার বৈঠকের পর অনুভব করেন যে, ইসরাইলের নয়া প্রধানমন্ত্রী শান্তির নায়ক হিসাবে ইতিহাসে প্রবেশ করতে আগ্রহী। তিনি নিজের দিক থেকেও তাঁকে একজন বন্ধু হিসাবে এই সুযোগ গ্রহণের নসিহত করেন। বিশেষ করে তিনি বিশ্বাসের সাথে কল্পনা করেন যে, বেগিন প্রেসিডেন্ট সাদাতকে কার্টার বা অন্য কোন মাধ্যমে যা দেবেন, প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে সরাসরি আলোচনায় তার চেয়ে বেশি

দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। তাছাড়া বেগিন যা ওয়াদা করবেন তা পূরণ করতে সক্ষম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চচেস্কু আবারও প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে বেগিনের অবস্থাকে দ্য গলের অবস্থার সাথে তুলনা করেন, যিনি আলজিরিয়ার স্বাধীনতাকে অনুমোদন করেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ফরাসী জাতিকে এতে রাজি করাতে পারত না। যাহোক বেগিনের বার্তার উৎস কেবল চচেস্কুই ছিলেন না। কারণ ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী সদ্য কার্টারের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর যোগ্যতাকে দুর্বল বলে মূল্যায়ন করে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, সমাধানের উত্তম পন্থা হচ্ছে– মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে সরাসরি চুক্তি। এভাবে তিনি তাঁর প্রধান বার্তা চচেস্কুর মাধ্যমে প্রেরণ করে এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে মরক্কোর বাদশাহ হাসান ও ইরানের সম্রাট মুহাম্মদ রেজা শাহ পাহ্‌লভীর মাধ্যমেও একই মর্মে কয়েকটি পত্র পাঠান। বেগিন কার্টারের সাথে সাক্ষাতের পর যথাসম্ভব আরবদের দিকে যাবার জন্য আমেরিকান দরজা এড়াতে চান। এখন থেকেই– নথিপত্রে যা বোঝা যায়– তিনি ক্ষমতায় কয়েক সপ্তাহ হলো আসার পর প্রথমত বাদশাহ হুসেইনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ শুরু করেন। কার্যতও আকাবাতে বাদশাহ হুসেইন ও বেগিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল মোশে দায়ানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এই বৈঠকে দায়ানকে বাদশাহ বলেন যে, তিনি কোন বিরূপ আরব ভূমিকার তোয়াক্কা না করে একাই ইসরাইলের সাথে চুক্তি করতে প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু তিনি এ পথে অগ্রসর হতে হলে "অবশ্যই কিছু উদার শর্ত লাভ করতে হবে যাতে আরব প্রতিপক্ষদের রাঙা চোখকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হন।" এইসব প্রতিপক্ষের প্রথমেই রয়েছে পিএলও। কারণ এ সংস্থাটি ১৯৭৪ সালে রাবাতে ফিলিস্তিনী জাতির একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত হওয়ার পর তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করে নিয়েছে। বাদশাহ ইসরাইলের সাথে আলাদা চুক্তি কবুল করতে প্রস্তুত ছিলেন যদি তিনি পশ্চিম তীর, পূর্ব আল্‌-কুদ্‌স ও গাজা পান। তাঁর হিসাব ছিল, যদি তা লাভে সমর্থন হন তাহলে কোন আরব প্রতিপক্ষ তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারবে না। দায়ানের অভিমত ছিল— যা তিনি সরাসরি বাদশাহকে বললেন– তাঁর চাহিদাটি পূরণ অসম্ভব। বাদশাহ জবাব দেন, এই চাহিদা পূরণ ছাড়া একলা সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া তাঁর জন্যও অসম্ভব। বাদশাহ হাসান ছিলেন আরব ইসরাইল সংঘাতের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। বেগিন তাঁর সাথে যোগাযোগ করার পর তিনি রাবাত থেকেই চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সাদাত ও বেগিনের মধ্যকার সরাসরি বৈঠকের প্রস্তাবটি সংশোধন করে এটাকে প্রেসিডেন্ট পর্যায় থেকে নিম্নতর পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেন। তবে এমন দায়িত্বশীল পর্যায়ে হতে হবে যাতে উভয় পক্ষ বিষয়টিকে গুরত্বের সাথে গ্রহণ করে এ বিষয়ের গুরুত্বকে বাড়তি মাত্রা দেয়ার লক্ষ্যে এই বৈঠক তার পৃষ্ঠপোষকতায় হওয়ার ব্যাপারে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন।

জেনারেল 'আহমাদ দুলাইমী' আবারও প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট বাদশাহর প্রতিনিধি হলেন। তিনি মরক্কোর জেনারেলের সাথে বসে প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে বাদশাহর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট সাদাত বলেছিলেন– তিনি মা'মূরার সমুদ্র সৈকতে দশ কিলোমিটার একলা হেঁটে গেছেন আর প্রস্তাবটি নিয়ে ভেবেছেন। এরপর তিনি পূর্ণ গোপনীয়তার শর্তে তা কবুল করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর ভাবনা-চিন্তা ছিল এ রকম ঃ

১. তিনি যদি বৈঠকের গোপনীয়তা সম্পর্কে বাদশাহর দেয়া ওয়াদা গ্রহণ করে ইসরাইলের অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটনে যান তাহলে তো ক্ষতির কিছু নেই।

২. প্রেসিডেন্ট কার্টার তো কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

৩. সমস্যাটি তো এখন তাঁর ভাষায়— আসমান-জমীনের মাঝখানে ঝুলে আছে। লিয়াজোঁ ছিন্ন তথা যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিগুলো তো একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা। এতে তো শান্তি আসবে না, কেবল যুদ্ধ ঠেকিয়ে রেখেছে মাত্র।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিন্ন আরব ভূমিকা গ্রহণের অবস্থানে পৌঁছার কোন আশা নেই। যদি অভিন্ন আরব ভূমিকা পৌঁছতে পারার সম্ভাবনা থাকেও তাহলে, তার সমস্ত কাগজপত্র থাকবে অন্যের হাতে, বিশেষ করে সিরীয়দের হাতে। তিনি অনেক কারণে এও জানেন যে, ইসরাইলীদের আসল চাওয়া পাওয়া মিসরে নয়। কাজেই মিসরী জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানে পৌঁছা সম্ভব।

একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে পারলে এর মাধ্যমে মিসরের আর্থিক সঙ্কট সমাধানের দরজা খুলে যেতে পারে। কারণ এরপর আমেরিকান সাহায্য লাভ করা সম্ভব হবে। এরপর সহসাই প্রেসিডেন্ট সাদাত বাদশাহ হাসানের কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন যে, ইসরাইলী পক্ষ তাকে জানিয়েছে যে, বাদশাহর উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে তাদের প্রতিনিধি হবেন স্বয়ং মোশে দায়ান। প্রেসিডেন্ট সাদাত সে সময় জানতেন না যে, বাদশাহ হাসান ইতোমধ্যে মোশে দায়ানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। মোশে দায়ান বাদশাহর সাথে ১৯৭৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে বিস্তারিত কর্মসূচী রচনা করে ফেলেন। নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে 'দায়ানের বর্ণনাটি সঠিক। কারণ তিনি একদিকে অবশ্যই বাদশাহ হাসানকে রাগাতে চান না, অপরদিকে বাদশাহ হাসান দায়ানের বর্ণনা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে যাননি। দায়ান বলেন, আজ সন্ধ্যায় বাদশাহর সাথে, তাঁর বৈঠক ছিল ফাসনগরীর রাজপ্রাসাদে। এটি শুরু হয় সাড়ে আটটায় এবং নৈশভোজের পূর্বে দেড়ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এতে বাদশাহর কিছু ঘনিষ্ঠজন উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহর সাথে গোপন বৈঠকে আসা দায়ানের সঙ্গী হিসাবে কিছু সংখ্যক ইসরাইলীও ছিল। দায়ান বলেন, নৈশভোজের আগে দেড় ঘণ্টার এই আলোচনা ছিল খুবই সারগর্ভ ও ফলপ্রসূ। দায়ান তাঁর ভাষার বর্ণনা করেন— আমরা

একান্তে আলাপ করি, বাদশাহ আর আমি। কোন দোভাষীও ছিল না। বাদশাহ বেশ খোলামেলা ও আন্তরিক আর সরাসরি কথা বলেন। তিনি আমার কাছ থেকে কোন ইঙ্গিত না পেয়েও আমাদের আলোচ্য বিষয়ে তার অবস্থানের ব্যাখ্যা করার গুরুত্ব অনুভব করেন। তিনি বলেন, "যদি এই বৈঠকের কথা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে আমার সিংহাসনের পতনও হতে পারে। আমার মরক্কোতে বড় একটি ইহুদী লবি রয়েছে। তাদের মধ্যে আমার জনপ্রিয়তাও বেশ। আমার চোখে তারা কেবল মরক্কোর অধিবাসী। ইহুদীদের সাথে আমার সম্পর্কের কথা খোলাখুলিই বলছি। তেমনি আরব দেশসমূহ ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি বাস্তবায়নেও আমার আগ্রহের বিষয়টি সুস্পষ্ট।" বাদশাহ তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করাও প্রয়োজন মনে করেন, তাই বলেন— তিনি এখন কায়রোতে আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভায় যোগ দিচ্ছেন। বাদশাহ 'ক্ষমা দিবসের' যুদ্ধে (অক্টোবর যুদ্ধের) প্রতি ইঙ্গিত করে আরব বিশ্ব সম্পর্কে বলেন যে, সেখানে একজন মরক্কান মেজর জেনারেল সিরীয়দের সাথে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে গোলান মালভূমিতে যুদ্ধ করেছিলেন, এরপর তিনি আবারও স্মরণ করিয়ে দেন যে, "ইসরাইল সরকারের একজন সদস্য হিসাবে আমার সাথে তাঁর দেখা করা তাঁর জন্য বিপজ্জনক।"

দায়ান তাঁর বর্ণনায় আরও বলেন ঃ বাদশাহর কাছ থেকে এই ব্যাখ্যা শোনার পরও আমার কাছে স্পষ্ট নয় যে, এখনই কেন শান্তির জন্য এ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ? আসল কারণটা কী, যার জন্য তিনি এটা করতে গেলেন ? তাঁর দেশ ও আমাদের মধ্যে বেশ কিছু মোকাবিলাও হয়। আমার মনে হতে লাগল যে, বাদশাহ তাঁর সহজাত মেজাজ থেকেই কিছু ভাল কাজ করতে আগ্রহী। (মূলত বাদশাহর এ উদ্যোগের অন্যতম কারণ ছিল মিসরে কোন বিপদ হলে রাবাতেও তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা থেকে বেঁচে থাকা।) দায়ান বলে যাচ্ছেন– "বাদশাহ আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব ছিলেন, যাতে আমার কাছ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় সমস্যাটি সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে পারেন। অর্থাৎ কিভাবে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি ?" আমি তাঁকে বললাম, এই বিষয়ে আরব বিশ্বের সাথে নানামুখী সমস্যায় আছি। এর মধ্যে তাদের কেউ তো আছেন এমন যে, ইসরাইলের সাথে শান্তিই চায় না। তারা চায় না যে, দামেস্কে ইসরাইলী রাষ্ট্রদূতের গাড়ির সম্মুখ ভাগে ইসরাইলী পতাকা দেখুক। অর্থাৎ হাফেজ আল্ আসাদের কথা বলছি। তারপর ব্যাখ্যা করে বাদশাহকে বোঝালাম যে, আমরা আরব বিশ্বে আমাদের সামনে কিছু পরস্পর বিরোধী দৃশ্য দেখছি। একদিকে কোন আরব দেশ চায় না যে, আমাদের সাথে একলা শান্তি চুক্তি করে, একই সময়ে আরবরা সম্মিলিতভাবে আমাদের সাথে শান্তির জন্য একটি পরিকল্পনায় পৌঁছতেও সক্ষম হচ্ছে না। বাদশাহ বলেন যে, একটি রাষ্ট্র আপনাদের

সাথে কথা বলতে প্রস্তুত আছে, সেটি মিসর। আমি এ কথাটি লুফে নিয়ে বাদশাহকে বলি, "যদি আমাদের সাথে কোন মিসরী রাজনৈতিক প্রতিনিধির সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করা যেত তা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতো। আমরা চাই, সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি বৈঠক হোক। সাদাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক বা খোদ সাদাতের সাথে এ বৈঠক হতে পারে। অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তি যাকে প্রেসিডেন্ট সাদাত নিজের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করেন। বাদশাহ্ বলেন যে, তিনি কয়েক দিনের ভিতর এ ব্যাপারে জবাব দেবেন।" দায়ান আরও লেখেন— নৈশভোজে বাদশাহর উপদেষ্টাবৃন্দ ও আমার সহকারীগণের উপস্থিতিতে বাদশাহ্ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, তাঁর ধারণা প্রেসিডেন্ট কোনদিন না কোনদিন আমাদের সাথে সভা করতে রাজি হবেনই। আমি অনুভব করলাম যে, বাদশাহ্ আসলে 'আসাদের' প্রতি উচ্চ সম্মানবোধ পোষণ করেন। আমি তাঁকে এও বললাম যে, আমাদের ও আসাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোন যোগাযোগ হয়নি। আমরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। বাদশাহ্ ফিলিস্তিনীদের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন না। তাঁর মতে বাদশাহ্ হুসেইন আমাদের সাথে কোন চুক্তি করতে সক্ষম নন। কারণ এ ধরনের চুক্তির অনিবার্য পরিণতি হবে তাঁর সিংহাসন হারানো। বাদশাহ্ প্রেসিডেন্ট সাদাতকে তাঁর পূর্বসূরি জামাল আবদুন নাসেরের ওপর মূল্যায়ন করে বলেন আব্দুন নাসের লোকটি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন না। তিনি তাঁর দোস্ত ও দুশমন সবাইকে সমভাবে ধোকা দিয়েছেন। কিন্তু সাদাত হচ্ছেন ভিন্ন। দায়ান বলেন— "বাদশাহ্ পুরোটা সময় ধরে যেন আরব বাদশাহ্ সংঘের সদস্য হিসাবে কথা বলেছেন।" দায়ান বাদশাহ হাসানের সাথে বৈঠকের চার দিন পর ৯ সেপ্টেম্বর ইসরাইলে ফিরে আসেন। বাদশাহর কাছ থেকে একটি বার্তা পেলেন যে, সব কিছুর ব্যবস্থা হচ্ছে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী মিসরী প্রতিনিধি হচ্ছেন জনাব হাসান তেহামী—মিসরের উপ-প্রধানমন্ত্রী।

মরক্কোতে দায়ানের সাথে এই গোপন বৈঠকের জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাতই হাসান তেহামীকে মনোনীত করেন। এই মনোনয়ন দীর্ঘকাল ধরে একটি বিস্ময়ের বিষয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে তাঁর মূল ভূমিকা পালনের পূর্বে গৃহীত ব্যবস্থাদির বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবার পর। এর মধ্যে একটি ঘটনা ছিল তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধান মেজর জেনারেল কামাল হাসান আলীকে হাসান তেহামীর সাথে যোগ দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি তাঁর সাথে সফরও করেন, কিন্তু তিনি দায়ানের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। এতে অংশগ্রহণও করেননি। এমনকি তেহামী ইসরাইলী কোন্ দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তাঁর নামও জানতেন না, যদিও এটা জানতেন যে, তিনি একজন বড় ইসরাইলী দায়িত্বশীল।

॥ ৫ ॥

হাসান তেহামী

"আমাদের যা বলার তা বলেছি, এখন আপনারা তা গ্রহণও করতে পারেন, প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন। তবে এখনে দরকষাকষির কোন সুযোগ নেই।"

—বাদশাহ হাসানের সামনে মোশে দায়ানের প্রতি হাসান তেহামী

বাদশাহ হাসান ও মোশে দায়ানের মধ্যকার প্রথম সাক্ষাতের ব্যাপারে তো বর্ণনা আছে একটি, কিন্তু হাসান তেহামী ও জেনারেল দায়ানের মধ্যকার বৈঠকের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। প্রত্যেকেই তার দিক থেকে দৃশ্যপটকে প্রকাশ করেছে।

মোশে দায়ানের বর্ণনা

দায়ান বলেন, বৈঠকটি রাবাতের রাজপ্রাসাদে সন্ধ্যা আটটায় নির্ধারিত ছিল। তারপর শেষ মুহূর্তে জানানো হয় যে, বৈঠকটি কয়েক মিনিট দেরি হবে। কারণ তার মিসরী প্রতিপক্ষ সভার আগে বাদশাহর সাথে একলা কয়েক মিনিট বৈঠক করতে চান। এরপর দায়ান বলেন ঃ "আমাদেরকে এই বৈঠক কয়েক মিনিটের জন্য হবে বলা হলেও তা পুরো এক ঘণ্টা চলেছিল।"

দায়ানের বর্ণনা এভাবে চলছে ঃ "দেখলাম আমাকে বড় একটি হলরুমে প্রবেশ করতে হচ্ছে, যেখানে বাদশাহ থাকবেন, তাঁর পাশে থাকবেন ডক্টর তেহামী ও বাদশাহর কিছু ঘনিষ্ঠজন। অথচ আমার সাথে ছিল কেবল একজন সফরসঙ্গী, তিনি হচ্ছেন– মরক্কোয় আমাদের লোক। বাদশাহ আমাকে উষ্ণ স্বাগত জানালেন। আমি তাঁকে একটি উপহার দিলাম, এটি ছিল একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত কেনআনী তলোয়ার ও একটি বল্লমের মাথা। উভয়টি ছিল খৃস্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগেকার।

এদিকে বাদশাহ যখন উপঢৌকনটি খুঁটিয়ে দেখছিলেন, আমি তাঁকে বললাম, ফ্যান্টম আর মিগ বিমান আবিষ্কৃত হওয়ার আগে সম্রাটগণ এই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করতেন। এসব অস্ত্র ইসরাইলীদের হাতে আসে মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর। আর এগুলো দিয়েই ইসরাইল জাতি কেনআন ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী রাজ্য পদানত করে। বাদশাহ আমাকে ধন্যবাদ জানান। এরপর বললেন– এসব অস্ত্র হচ্ছে পুরনো যুদ্ধবিগ্রহের স্মৃতি। এখন সময় এসেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার। বাদশাহ আমাকে ডক্টর তেহামীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

ইনি বেশ সুদর্শন ও কেতাদুরস্ত। তাঁর ছিল সুবিন্যস্ত রূপালী দাঁড়ি। এর ওপরে মুখাবয়বটিতে স্বাস্থ্য ও সৌম্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। তিনি এমন ভঙ্গিতে কথা বলা শুরু

করেন যাতে এতই আত্মবিশ্বাসের প্রতিধ্বনি ছিল যে আমাকে টেনশনে ফেলে দেয়। তিনি তাঁর পকেট থেকে একটা পত্র বের করে বলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছ থেকে এসেছেন এবং তিনি তা আমাকে পড়ে শোনাতে চান। তিনি আবৃত্তির সুরে পড়েন। উদ্দেশ্য, প্রভাব বিস্তার করা। পত্রটি ছিল শান্তির মিসরীয় প্রস্তাব। হাসান তেহামী তাঁর আবৃত্তি শেষ করেন এই শব্দাবলীর ওপর চাপ দিয়েঃ "এটাই আমাদের বক্তব্য, এখন হয় আপনারা গ্রহণ করবেন, না হয় তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তবে এখানে দরকষাকষির কোন অবকাশ নেই। আমি কিছুই বললাম না।"

দায়ান তাঁর বর্ণনায় আরও বলেন– আমরা যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে বাদশাহ যার নাম রাখেন 'কার্যকালীন নৈশভোজ'-এ গেলাম। এই ডিনার চলে চার ঘন্টাব্যাপী। এটি শেষ হয় রাত দুটোয়।

আলোচনার সূচনা করে বাদশাহ তাঁর মায়ের সাথে দেখা করার কথা বলে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন এবং আমাদেরকে একলা ছেড়ে যান যাতে আমরা মুক্ত আলোচনা করতে পারি। তেহামী কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে আমি অনুভব করি যে আসলেই তিনি শান্তি আলোচনা করতে এসেছেন। কিন্তু আমার নজরে ধরা পড়ে যে তিনি বাস্তবতাসমূহের কিছুই জানেন না। তিনি একটি কথার ওপরই বার বার জোর দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের পর অধিকৃত ভূমি থেকে ইসরাইলী প্রত্যাহার হতে হবে। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, আমার সাথে এ বৈঠক তাঁদের পক্ষ থেকে একটি বড় দুঃসাহসী পদক্ষেপ। এ বিষয়টি মিসরের দু'জন লোক ছাড়া আর কেউ জানেন না। তাঁরা হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট সাদাত ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। এরপরও তিনি এর গোপনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, যেন আমরা এ বৈঠকের কথা কাউকে না বলি, এমনকি আমেরিকানদেরকেও না।

যে কোনভাবেই হোক আমি অনুভব করলাম যে, গোপনীয়তার প্রতি তাঁর এই আকুতির অর্থ তাঁর অহংবোধে বিপর্যয় হতে পারে, সেটাই তিনি প্রকাশ করার ভাষা পাচ্ছেন না। বুঝতে পারছেন না কিভাবে তা সামাল দেবেন।

প্রায় এক ঘন্টা পর বাদশাহ আবার বৈঠকে ফিরে আসেন। ইত্যবসরে আমরা ডিনার সেরে নিয়েছি। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন যেন আমরা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করি। তাই বললেন যে, তিনি এখন আলোচনার সূচনা করছেন। কারণ এই বৈঠকই হতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের জন্য নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো নিজেদের মধ্যে সরাসরি আলোচনার জন্য এটি একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ডক্টর তেহামী প্রেসিডেন্ট সাদাতের ঘনিষ্ঠজন এবং তাঁর আস্থাভাজন ব্যক্তি। এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন যে, ইসরাইলে আমার মর্যাদা সপরিচিত। আমাদের উভয়েই সাদাত ও বেগিনের মধ্যে সাক্ষাতের পথ সুগম করতে

সক্ষম। এরপর বাদশাহ মূল সমস্যার ভিতর প্রবেশ করে বলেন– "চলমান সংঘাতের মূল বিষয় হচ্ছে অধিকৃত ভূমি।" এরপর তাঁর দৃষ্টি তেহামীর ওপর নিবদ্ধ করে বলেন–এই ভূমি এখন ইসরাইলের কব্জায়, ইসরাইল কখনও নিরাপত্তার যথেষ্ট গ্যারান্টি ছাড়া তা ছেড়ে দেবে না। কাজেই যে বিষয়টি এখন আলোচনা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

এবার বাদশাহ ফিলিস্তিন সঙ্কটের দিকে গেলেন। তিনি বলেন যে, তিনি এই যুক্তি মেনে নিতে রাজি আছেন যে, একটি বিপদ ইসরাইল ও বাদশাহ হুসেইনের জন্য হুমকি হয়ে আছে। এটা হচ্ছে আরবীয় সমস্যা। এ ব্যাপারে ইসরাইলের পক্ষে সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছা সম্ভব। তবে সেটা হতে হবে সকল আরব রাষ্ট্রের মাধ্যমে।

সিরিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আসাদ তার ইসরাইল বিরোধী সকল স্পষ্ট উচ্চারণ সত্ত্বেও শান্তির পথে আসবেন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এটা ইসরাইলের সাথে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সন্ধির পূর্বে আদৌ সম্ভব হবে। এবার বাদশাহ তেহামীকে কথা বলতে দেন। তিনি শুরু করে বলেন যে, তিনি কখনও ভাবেননি যে, আমার সাথে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও দেখা হতে পারে। কিন্তু বাদশাহ হাসানের বাড়িতে এই সাক্ষাতে তিনি সন্তুষ্ট।

বাদশাহর প্রচেষ্টার বদৌলতে আজ শান্তির সন্ধানে এখানে এসেছেন। এর পিছনে কাজ করেছে ব্যক্তিগতভাবে বেগিন আমার প্রতি সাদাতের আস্থা। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ববর্তী সরকারের প্রতি সাদাতের আস্থা ছিল না। কিন্তু আমাদের লিকুদ মন্ত্রিসভার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল।

এরপর তেহামী বলেন– তাঁরা শান্তি আলোচনায় এখনই আন্তরিক। আসুন, দেখি আমরা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারি। তবে শর্ত থাকবে যে, আমরা যা করছি এটা যুক্তরাষ্ট্র জানতে পারবে না। পরবর্তীতে যখন আমরা চুক্তিতে উপনীত হব তখন তাদের বলতে পারব। তিনি বলেন, সাদাত বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সাথে এখন বিস্তারিত আলোচনার সময় এসেছে। রুমানীয় প্রেসিডেন্ট নিকোলাই চচেস্কু তাঁর কাছে রুমানিয়াতে বেগিনের সাথে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদাত মরক্কোর বাদশাহর মাধ্যমে এ বৈঠক হওয়াতে শ্রেয় মনে করেন। কারণ তিনিও বেগিনের সরকারের প্রতি আস্থাবান। প্রেসিডেন্ট সাদাত আমাদের এ সাক্ষাৎকে তাঁর ও বেগিনের মধ্যে সাক্ষাতের প্রস্তুতি হিসাবে বিরাট গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি চাননি যে, শীর্ষ বৈঠক ব্যর্থ হোক। কারণ তাঁর কাছে শান্তির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ওপরই নির্ভর করছে সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সম্মান এমনকি সাদাতের পদ টিকে থাকা।

এরপর তেহামী আরেকটু পরিষ্কার করে বলেন যে, তাঁরা আমাদের মধ্যে আরও নিবিড় আলোচনার কিছু রাউণ্ডের ব্যবস্থা করতে চান। এরপর জেনেভা সম্মেলনে

বিষয়টি স্থানান্তর করা হবে। এ সম্মেলন হবে সবার মাথার ওপর ছাদের মতো। তিনি আরও বলেন যে, মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে কোন চুক্তি হলে তা প্রেসিডেন্ট আসাদ ও বাদশাহ হুসেইনের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলবে। তিনি আরও বলেন যে, চার থেকে পাঁচ বছরের ভিতর এই সঙ্কট পুরোপুরি সমাধান হয়ে যাবে। এ বিন্দুতে এসে বাদশাহ হাসান তেহামীকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "আপনার সময় নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।" হাসান তেহামী তাঁর কথায় ফিরে এসে বলেন, প্রেসিডেন্ট সাদাত শান্তি চান তবে আত্মসমর্পণ নয়। আমি তার কথা শুনতে থাকি এবং শেষে বলি, "আমি প্রধানমন্ত্রী বেগিনের কাছে ফিরে গিয়ে আজ রাতে যা শুনলাম তা জানাব।" তিনি যখন আমার কাছ থেকে আরও বিস্তারিত জবাব লাভের চেষ্টা করেন, তখন তাঁকে বললাম ঃ "আপনি দয়া করে স্মরণ করুন যে, আমি এখানে কেবল বেগিনের দূত মাত্র। আপনার কাছ থেকে শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে আমার কোন অভিমত দেয়ার অধিকার নেই। আমি মনে করি কিছু সংখ্যক বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে বুঝে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তারপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইসরাইলের সাথে একলা একটা সমাধানে পৌছার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট প্রস্তুত রয়েছেন কিনা। লোহিত সাগরে অবাধ নৌ-চলাচল সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি ? গোলান সম্পর্কে তাঁর মত কি আর আল্-কুদ্স সম্পর্কেও তাঁর কি মতামত? এছাড়া ফিলিস্তিন ইস্যুর সমাধানে তাঁর চিন্তা-ভাবনা কি? আমি তাঁকে আরও বললাম যে, আমরা সাদাতের ব্যাপারে আস্থাশীল কিন্তু অপরাপর আরব নেতাদের, বিশেষ করে হাফেজ আল্ আসাদকে মোটেই বিশ্বাস করি না।

বাদশাহ আলোচনায় প্রবেশ করে বৈঠকটিকে মতৈক্যের পয়েন্টগুলোর দিকে ধাবিত করতে প্রয়াসী হন। শেষ পর্যন্ত তিনটি বিষয়ে মতৈক্য হয়–

১. উভয় পক্ষ নিজ নিজ সরকার প্রধানের কাছে ফিরে গিয়ে বৈঠকের বিষয়টি অবহিত করবেন। আর আমার দায়িত্ব হলো বেগিনের নিকট এই মর্মে সাদাতের অনুরোধ পৌছাব যে, আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে আমাদের দখলকৃত ভূমি থেকে সরে যাওয়ার ইসরাইলী অঙ্গীকার তাঁকে দেয়া হয়।

২. উভয় পক্ষ শান্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে একে অন্যকে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেবে। তিনি ও আমার আগামী বৈঠকের আগেই তা সম্পন্ন হবে। আমাদের উভয় পক্ষের পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পেশ করা হবে।

৩. যদি সরকার প্রধানগণ এটা অনুমোদন করেন তাহলে আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে মরক্কোতে আমাদের আগামী বৈঠক হবে।

হাসান তেহামী আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন আর আমি জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম যে, সব কিছুই আলোচনায় স্থান পেতে পারে। হাসান তেহামী এরপর আব্দুন নাসেরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমাকে এক অবাক করা প্রশ্ন করে বসলেন। তিনি আমার

প্রতি তাঁর দৃষ্টি স্থিরভাবে নিবদ্ধ করে প্রশ্ন করলেন– "আমাকে স্পষ্ট করে বলুন তো ১৯৬৭ সালে জামাল আব্দুন নাসের কি আপনাদের সাথে ষড়যন্ত্র করেননি ?" এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে ছিল না। তেহামী আরও বলেন, "এ লোকটি ছিল বদ্ধ উন্মাদ, আমি তার ওপর একটি বই লিখতে যাচ্ছি।" দায়ান তাঁর বক্তব্য এভাবে শেষ করেন– এরপর আমি ইসরাইলে ফিরে আসি এবং বেগিনের নিকট আমার রিপোর্ট পেশ করি। আমরা নিচে বর্ণিত বিষয়গুলোত একমত হই–

(১) আমরা সাদাতের সাথে শান্তি চুক্তির প্রকল্প বিনিময় করতে পারি যাতে আমরা একে অন্যের অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারি। এদিকে আমরা আমেরিকানদের জানাব যে, আমরা একটি আরব দেশের সাথে আলাপ-আলোচনা করে যাচ্ছি। তবে কোন্ দেশের সাথে তা বলব না।

(২) হাসান তেহামীর সাথে আমার বৈঠক চালিয়ে যাওয়া দরকার।

(৩) বেগিন ও সাদাতের মধ্যে সরাসরি সাক্ষাতের ব্যাপারে এখন চিন্তা করার দরকার নেই। কারণ বেগিন এখন অধিকৃত ভূমি থেকে ইসরাইলী প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত নন।

দায়ান প্রধানমন্ত্রীর একটি উক্তি উল্লেখ করেন– "আমরা শান্তির যে ফর্মূলা পেশ করব তাতেই প্রত্যাহারের শর্ত সম্পর্কে সাদাত আমাদের অভিমত জানতে পারবেন।"

হাসান তেহামীর বর্ণনা

ঘটনাটি এবার হাসান তেহামীর বর্ণনায়, তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের আলোকে দেখব– "সে সময়কার দু'টি বৃহৎ শক্তির অভিপ্রায় ছিল দড়ি ঢিল করে দিয়ে অধিকার নষ্ট করা। এ প্রেক্ষাপটে (দায়ানের সাথে এই বৈঠকে) সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল মূলত এই স্থবিরতাকে ভেঙ্গে বিশ্বময় আন্তর্জাতিক এই প্রভুত্বকে অস্বীকার করার স্পর্ধা প্রতিষ্ঠা করা এবং এটা জানান দেয়া যে, আমাদের পদক্ষেপ ও নীতি গ্রহণে আমরা স্বাধীন। যখন আমাকে বলা হলো যে, বনী ইসরাইলের দায়ানের সাথে বৈঠকে বসা এক রকম চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। কারণ দায়ান বিশ্বের নজরে ১৯৬৭ সালের সাঁড়াশি আক্রমণের নায়ক এবং ইসরাইলের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নকারী পুরুষ। অথচ আমার নজরে সে কেবল একজন কানা বনী ইসরাইল যে কিনা আমাদের ইসলামী উম্মাহ আর তার ইতিহাসের অমনোযোগের সুযোগে পবিত্র আল্-কুদ্সে ঢুকে পড়ে। কাজেই কোন একদিন এই ব্যক্তির এই শৌর্যকে আমাদেরই কোন পুরুষ এসে ভেঙ্গে দিতে হবে। এই উপলব্ধি থেকে এবং এই নীতিগত উচ্ছ্বাস ও সিদ্ধান্ত থেকেই আমি এ অবস্থানকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সেখানে যাই। তিনি যখন আমাকে প্রথমে সালাম দিয়ে করমর্দনের জন্য ডান হাত বাড়িয়ে দেন তখন আমি তাঁর সাথে হাত মিলাইনি। তবে তিনি আরবীতে যে সালাম দেন আমি তাঁর প্রত্যুত্তর করি। ইনি

শাম দেশীয় বাচনভঙ্গিতে অনর্গল আরবী ভাষায় কথা বলতে পারেন। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি ভাবিনি যে, জীবনে কোনদিন লড়াইয়ের ময়দান ছাড়া আপনার সামনাসামনি হব। তিনি উত্তর করলেন যে, তিনি এই সাক্ষাতে সম্মানিত বোধ করছেন এবং এটা তাঁর জন্য একটি মর্যাদার বিষয়। তিনি আশাও করেননি যে, মিসরের এত উচ্চপদস্থ একজনের সাথে ব্যক্তিগত ইতিহাস সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাৎ হবে!" কুয়েতের 'আল আনবা' পত্রিকার সাথে ১৮-৪-১৯৮৬ তারিখে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে হাসান তেহামী বলেন, দায়ান তাঁকে মরক্কোয় দেখা হলে বলেন, "(১৯৭৩-এ) আপনারা আমাদেরকে ভূমিকম্পে ফেলে দিয়েছিলেন। আমরা যখন ইসরাইলী সেনাদের মিসরের সাথে লড়াইয়ের ময়দানে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিলাম তখন তারা ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি নষ্ট করার আশ্রয় নেয়, অথবা তারা সেগুলো নিয়ে কবরস্থানের ভিতর আত্মগোপন করতে থাকে, যাতে মিসরীদের হাতে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে না হয়।

দায়ান বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন রাখেন– "আপনারা কেন চতুর্থ দিন যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন, অথচ আমরা কেবল জানে বেঁচে থাকার শর্তে আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম ? আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, আপনারা ইসরাইলে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবেন। সম্পূর্ণ পতন ঘটেছিল আমরা যে কোন মুহূর্তে জীবনে বেঁচে থাকার বিনিময়ে নিজেদের সঁপে দিতে প্রস্তুত ছিলাম। এদিকে গোল্ডা মায়ার তাদের কাছে আত্মসমর্পণের অনুরোধ নিয়ে আমেরিকা যান। আর এটা খোদ ইসরাইলী সূত্রগুলোতেও স্বীকৃত ও প্রমাণিত।" কিসিঞ্জার তাঁর ডায়েরিতে (গোল্ডা মায়ারকে) বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন তিনি যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁকে দেখাচ্ছিল যেন জ্বলন্ত অঙ্গার, যদিও এর আগে তাঁকে দেখে মনে হতো যেন একটি পেলব পুষ্প। এ জন্যই আমার সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাঁকে বলি– "শুনুন, আমরা ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে আলোচনা করছি।" এখন বাকি রইল হাসান তেহামী প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে কিভাবে বর্ণনা করেছিলেন। এক্ষেত্রে কেবল একটি বর্ণনায় আছে যা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাদাত নিজেই করেছেন ১২ নভেম্বর, ১৯৭৭ তারিখে জাতীয় দলের রাজনৈতিক অফিসে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি তার উল্লেখ করেছিলেন। রাজনৈতিক অফিসের সদস্যগণ মরক্কোতে দায়ান ও হাসান তেহামীর মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা প্রেসিডেন্ট সাদাতকে জানালে তিনি বলেন, তেহামী তাঁকে জানিয়েছেন যে, ইসরাইল অবিলম্বে মিসরী ভূমি থেকে সরে যেতে প্রস্তুত রয়েছে। এরপর তারা প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত রয়েছে। এছাড়া তাঁরা রজার্স পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তনের ভিত্তিতে অবশিষ্ট অধিকৃত আরব ভূমি থেকে প্রত্যাহারকেও গ্রহণ করে নেবে। তিনি এখন সাফল্যের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, বিশেষ

করে তিনি স্মরণ করছেন যে, কিসিঞ্জার তাঁকে বলেছিলেন, আরব-ইসরাইল সংঘাত প্রথমত একটি মানসিক ইস্যু। যদি এই মানসিক বাধার দেয়াল ধসে পড়ে তাহলে ইসরাইলী নিরাপত্তার সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। শান্তির জন্য ইসরাইলের প্রস্তুত থাকতে সেটাই হচ্ছে প্রধান প্রতিবন্ধক। প্রেসিডেন্ট সাদাত এখনও ভাবছেন কিভাবে বিষয়গুলো গুছিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, বিশেষ করে তাঁর মনে প্রতিনিয়ত জেনেভা সম্মেলন বাদ দেয়ার কথাই উঠত। তিনি চাইতেন না যে, নিজেকে সিরীয় ও ফিলিস্তিনীদের দয়ার ওপর বা যাকে বলে তাদের দরকষাকষির নিচে ছেড়ে দেন। এ প্রেক্ষিতেই তিনি রুমানিয়া সফরের সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট চচেস্কুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন আর কিছু শুনবেন। তাঁর ছিল দু'টি প্রশ্ন যা তিনি ৩০ অক্টোবর ১৯৭৭-এ তাঁদের মধ্যকার বৈঠকে রুমানিয়ার প্রেসিডেন্টকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন।

স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাদাতের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম প্রশ্ন ছিল– "বেগিন কি শান্তির লোক ?" চচেস্কু ইতিবাচক জবাব দেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল– "বেগিন কি একটি চুক্তিতে পৌঁছে তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখেন ?" এবারও চচেস্কু ইতিবাচক উত্তর দেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত রুমানিয়া থেকে ফেরার পথে তেহরান হয়ে আসেন। তিনি ইরানের শাহের সাথে দেখা করেন, যিনি মিসরীয় প্রেসিডেন্ট ইরানী রাজধানীতে পৌঁছার দিনই বেগিনের একটি পত্র পান। এটি তেহরানে ইসরাইলী দূতাবাসের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স ইউরি লুবরানি সম্রাটের মুখ্য সচিব আসাদুল্লাহ ইল্‌ম-এর নিকট পৌঁছান। বেগিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত পত্রের ভিত্তিতে ইরানের শাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, এটা হচ্ছে একটি দুঃসাহসিক কাজ যা মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদাত এ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই "দুঃসাহসিক পদক্ষেপ" নেয়ার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেননি। তিনি এ নিয়ে বিচলিত ছিলেন। এদিকে ওয়াশিংটনের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। কারণ আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্স এখনও জেনেভা সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যদিও তিনি জানেন যে তাঁর এ পরিকল্পনাকে প্রেসিডেন্ট সাদাত ও প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন প্রত্যেকেই বিরোধিতা করছেন। তিনি এ মুহূর্ত পর্যন্ত এমন কোন রূপরেখা আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি যা সকল পক্ষের বৈঠককে নিশ্চিত করে। তিনি এও জানতেন না যে, মরক্কোতে ইতোমধ্যে হাসান তেহামী ও দায়ানের মধ্যে একটি বৈঠক হয়ে গেছে।

১৯ সেপ্টেম্বর যখন জাতিসংঘের বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্য দায়ান নিউইয়র্ক পৌঁছেন তখনও তিনি এই গোপন সাক্ষাতের কথা জানতেন না। তিনিই আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করে ঐ বৈঠকের ভেদ জানান এবং প্রেসিডেন্ট কার্টার ও তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজনেস্কি ব্যতীত কাউকে না বলার জন্য অনুরোধ করেন।

লক্ষণীয় যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত কায়রোতে বসে এ ধরনের কিছু ঘটার আশঙ্কা করেছিলেন। আর তাই তিনিও তাঁর এক সহকারী উপদেষ্টা 'উসামা আলবায'-এর মাধ্যমে কায়রোস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলেট্সকে জানান যে, হাসান তেহামী ও মোশে দায়ানের মধ্যে মরক্কোতে একটি বৈঠক হয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল এটা জানা যে, শান্তির জন্য কাজ করতে ইসরাইল কতটুকু আন্তরিক। উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, মিসর একা ইসরাইলের সাথে সন্ধির চুক্তি করতে প্রস্তুত। এদিকে মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্মীও নিউইয়র্ক পৌছেন। তাঁর সাথে ছিল প্রেসিডেন্ট সাদাতের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট কার্টারের প্রতি লেখা আট পৃষ্ঠার একটি পত্র। ইসমাইল ফাহ্মী নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনে যাত্রা করেন এবং কার্টারের সাথে দেখা করে পত্রটি হস্তান্তর করতে যান। সাক্ষাতের সময় ইসমাইল ফাহ্মী কার্টারকে বলেন (উইলিয়াম কাউন্টের কার্যবিবরণী অনুসারে), "প্রেসিডেন্ট সাদাত কালক্ষেপণ করার মতো ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইসরাইলের সাথে দৃঢ়চেতা ব্যবহার করার সময় এসে গেছে। এখন তার ওপর আমেরিকান চাপ আরও বাড়ানো প্রয়োজন।" কার্টার উত্তরে বলেন, এ ধরনের চেষ্টা করলে তা হবে নীতিগত আত্মহত্যা, তাই তিনি তা করতে প্রস্তুত নন। তারচেয়ে শ্রেয় জেনেভা সম্মেলন তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠান করা। আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবশ্যই দৃশ্যপটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এরপর প্রেসিডেন্ট কার্টার সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার আমন্ত্রণ জানালেন। সাধারণ পরিষদের সভায় যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে গ্রোমিকোও নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বৈঠক শেষে উভয়ে যৌথ বিবৃতি দেন। এতে সমাধানের প্রেক্ষাপট রচনায় দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় এবং এতে সাফল্যের জন্য কিছু মূলনীতির বর্ণনাও ছিল। আমেরিকান-সোভিয়েত যৌথ বিবৃতি যে দিন প্রচারিত হয়, ঐ দিনই দায়ান কার্টারের সাথে একটি জরুরী সাক্ষাৎ চান। উদ্দেশ্য, "পক্ষগুলোর মধ্যে চলমান সরাসরি যোগাযোগের পথ যেন বন্ধ না করে দেন।" দায়ান ইতোপূর্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্সকে যে অভিমত দেন সেটাই আবার কার্টারকে বলেন। তিনি বলেন, ইসমাইল ফাহ্মী (মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কি বলছেন তার প্রতি এখন বেশি গুরুত্ব দিবেন না। কারণ তিনি এখন কেবল নিজের কথাই বলেন, সাদাতের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তবে এ বর্ণনার কোন ভিত্তি দায়ান উল্লেখ করেননি। তিনি তাঁর ও হাসান তেহামীর মধ্যকার বৈঠকের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে প্রেসিডেন্ট কার্টার দায়ান ও তেহামীর মধ্যকার এ বৈঠককে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। তিনি এটাকে কেবল শুভ ইচ্ছার প্রতিফলন হিসাবেই ধরে

নেন। কিন্তু সঙ্কটের মোকাবিলায় স্বভাবতই এটা ছিল ছোট মাপের। অবশ্য তিনিও এ সঙ্কট মোকাবিলার পন্থা নিয়ে বিচলিত ছিলেন, বিশেষ করে সিরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল হালীম খাদ্দাম নিউইয়র্কে পৌঁছার পর আরব পক্ষগুলোর ভূমিকা নিয়ে তিনি বেশ উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট থেকে আট পৃষ্ঠার যে পত্রটি ইসমাইল ফাহ্‌মী বহন করে নিয়েছিলেন, কার্টারকে তার উত্তর দেয়া প্রয়োজন। এটা কেবল তার ওপর এসে পড়া সঙ্কট সমাধানের উদ্দেশ্যেই নয় বরং এই সঙ্কটের সাথে তার নির্বাচনী স্বার্থাদিও এসে মিলেছে। এ সময়টি ছিল ১৯৭৭ এর শরৎ। সিনেটের মধ্যবর্তী নবায়নের নির্বাচনের কেবল এক বছর বাকি। পরবর্তীতে এই নির্বাচন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর এর প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। কাজেই কার্টার মনে করেন যে, মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সমাধানে যতদূর সাফল্য লাভ করবেন সেটাই মধ্যবর্তী নবায়নের লড়াইয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং তাঁর দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারেও এটা ব্যাপক প্রভাব ফেলবে– আর এটা তো প্রথম মেয়াদে থাকাকালে সকল প্রেসিডেন্টেরই উদ্দেশ্য থাকে। সম্ভবত আরও বেশি নাটকীয় প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট কার্টার তাঁর পত্রখানি স্বহস্তে লেখেন, প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রতি ছিল এটা তাঁর ব্যক্তিগত ও যারপরনাই উষ্ণ আন্তরিকতায় ভরা পত্র। এর ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

হোয়াইট হাউস
ওয়াশিংটন
২১ অক্টোবর ১৯৭৭

প্রিয় প্রেসিডেন্ট সাদাত,

যখন আমরা হোয়াইট হাউসে একান্তে মিলিত হই, তখন আপনার এই প্রতিশ্রুতিতে আমি বেশ আনন্দিত ও কৃতজ্ঞতা বোধ করি যে, আমি দুঃসময়ে আপনার সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে পারি এবং মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সমাধানে আমাদের যৌথ প্রচেষ্টার সামনে যখন সমস্যা জটিল আকার ধারণ করবে তখন আমি আপনার আশ্রয় নিতে পারব। এখন আমি ঠিক সে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং আমার এখন আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে (আপনার চাওয়া আপনার আট পৃষ্ঠার পত্রে উল্লিখিত) প্রায় সকল ব্যাখ্যাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যান্স প্রদান করেছেন। এর ভাষায় যথেষ্ট নমনীয়তা ছিল, আপনার সম্মতি লাভ করতে পারে।

সময় হয়েছে সামনে এগিয়ে যাবার। সকল পক্ষকে জেনেভার দিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তথা মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের সমাধানে আমাদের পরিকল্পনায় আপনার প্রকাশ্য সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বরং সঞ্জীবনী সুধা।

আপনার সমর্থনের প্রত্যাশায় এটা আমার ব্যক্তিগত আবেদন। আপনি ও আপনার পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

আপনার বন্ধু
জিমি কার্টার

কার্টার জেনেভা সম্মেলন ত্বরান্বিত করার কথা বলছিলেন। এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাত আরও বেশি নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে, জেনেভা সম্মেলনে কোন লাভ নেই। তবে একই সময়ে তিনি চাচ্ছিলেন–তাঁর ভাষায় কার্টারের সাহায্য। তিনি তাঁর চারপাশের লোকজনকে বলছিলেন যে, এখন একটা নাটকীয় কাজের প্রয়োজন। সঙ্কট এখন একটা 'বৈদ্যুতিক শক' চায়। এরপর হঠাৎ করে বলেন, তিনি বেগিনের সাথে মুখোমুখি বসতে চান। তিনি চচেস্কু ও বাদশাহ হাসান এবং ইরানের শাহের প্রস্তাব অনুসারে গোপন বৈঠক করতে চান না। কারণ তিনি ভাবেন যে, বেগিনের সাথে গোপন বৈঠকের কথা অচিরেই ফাঁস হয়ে পড়বে, তখন এটা একটা ছুতো হয়ে দাঁড়াবে। প্রেসিডেন্ট সাদাত বেগিনের সাথে মুখোমুখি বৈঠকে বসার পরিকল্পনাটি সম্পর্কে সর্বপ্রথম কথা বলেন, যখন তিনি বুখারেস্ট থেকে তাঁর বিমানে করে ফিরছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট চচেস্কুর সাথে সাক্ষাৎ শেষে ইরানের শাহের সাথে দেখা করার জন্য তেহরান যাচ্ছিলেন। সে সময় তার বর্ণনা অনুসারে ইসমাইল ফাহ্‌মী বেশ ভড়কে যান, যা তিনি লুকিয়ে রাখতে পারেননি। এ বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাত আবার ভাবতে লাগলেন। তখন তাঁর পকেটে কার্টারের পত্র। যখন তিনি প্রায় স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে, তিনি জেনেভার পথে কখনই পা বাড়াবেন না, তখন ইসমাইল ফাহ্‌মী একটি যৌক্তিক পথ বের করতে চেষ্টা করলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট প্রস্তাব রাখলেন যে, কার্টারের কাছে একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব দেয়া যায় যে, তিনি হোয়াইট হাউসে একটি সভার আমন্ত্রণ জানাবেন।

এতে সঙ্কটের সাথে সংশ্লিষ্ট আরব দেশের প্রধানগণ উপস্থিত থাকবেন। আরও উপস্থিত থাকবেন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশগুলোর প্রধানগণ। যাঁরা সিদ্ধান্তের জন্য প্রথম ও প্রধানত দায়িত্বশীল তাঁরা সবাই থাকবেন এ সভায়। সাদাত মত দেন যে, প্রস্তাবটি যুক্তিপূর্ণ কিন্তু এটা কার্টারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবে। কারণ এতে প্রক্রিয়া বা প্রটোকল সম্পর্কিত বিষয়াদি ও স্পর্শকাতর অনেক ব্যাপার উঠে আসবে। এই বৈঠকের সফলতার গ্যারান্টির জন্য পূর্বশর্ত হিসাবেও বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে টানাহেঁচড়া চলবে। এ কারণে পুরো পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত বদ্ধ দেয়ালে ঠেকে যাবার আশঙ্কা বেশি। এবার ইসমাইল ফাহ্‌মী তাঁর প্রস্তাব সংশোধন করে বললেন, তবে এই প্রস্তাবিত বৈঠক পূর্ব আল্-কুদ্‌সে হতে পারে। শান্তির শহরে পবিত্র স্থানগুলোর পরিমণ্ডলে হতে পারে। মুহূর্তেই পরিকল্পনাটি প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে

বেশ মনে হলো। তিনি তা প্রেসিডেন্ট কার্টারের কাছে প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। তিনি ৩ নভেম্বর সীমিত পরিসরের বৈঠকে তা আলোচনার জন্য উত্থাপন করলেন। তাঁর সাথে ভ্যান্স ও 'ব্রেজনেস্কিকেও রাখলেন। সকলেই এটা বাস্তবায়নে বিপদ হবে বলে মত দেন। এর কিন্তু কারণ ছিল ঃ

–এটা ভাবাই যায় না যে, পূর্ব আল্-কুদ্সে অনুষ্ঠিত কোন সভায় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট 'লিওনিদ ব্রেজনেভ' ও চীনের প্রেসিডেন্ট 'হুয়া জো পেং উপস্থিত থাকবেন। আর ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত তো দূরেই থাকুক।

–কিন্তু আরব দেশ, বিশেষ করে সিরিয়া কোন পূর্ব প্রস্তুতি বা গ্যারান্টি লাভের আগে কখনই এতে হাজির হবে না।

–তাছাড়া আল্-কুদ্সে এ ধরনের বৈঠক হবে নিরাপত্তার দিক থেকে একটি দুঃস্বপ্নের মতো। কোন অংশগ্রহণকারীর জীবনের নিশ্চয়তা দেয়া যায় না, চাই চরমপন্থী ইহুদীদের পক্ষ থেকে বা আরব চরমপন্থীদের দিক থেকে।

–যদি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ধরেও নেয়া যায়, তবুও এই আকারের ও এহেন গুরুত্বের একটি সম্মেলনের জন্য অন্তত এক বছরের প্রস্তুতি দরকার।

–আরও কারণ আছে। যদি ইসরাইল তার কব্জায় থাকা আল্-কুদ্সে সম্মেলনের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে এই সম্মেলনে নাটকীয়তার বদলে অপমান বয়ে নিয়ে আসবে।

যখন কার্টার আর তার উপদেষ্টাগণ আল-কুদ্সে সম্মেলনের পরিকল্পনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছিলেন সে সময় সাদাতের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছিল যে, এ সম্মেলনের প্রভাব হবে নাটকীয় ও প্রচারণাপূর্ণ। এর সাফল্যের সম্ভাব্যতার মধ্য দিয়ে শীর্ষ পর্যায়ে আরব ও ইসরাইলের মধ্যে সরাসরি ও প্রকাশ্য যোগাযোগের বাধাও অপসারিত হয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট সাদাত তখন রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলেট্স-এর মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপারে কার্টারের উত্তর পাওয়ার জন্য জলদি করছিলেন। তাঁর এ তড়িঘড়ির কারণ হচ্ছে তিনি চাচ্ছিলেন যেন, ৭ নভেম্বর মিসরীয় সংসদে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশনে তাঁর এই প্রস্তাবের ঘোষণা দিতে পারেন। এলেট্স চেষ্টা করছিলেন যেন সত্বর কার্টারের উত্তর পান। এদিকে কার্টার চাচ্ছিলেন যে, এমন একটি পরিশীলিত জবাব দেবেন যাতে সাদাতকে নতুন করে ধকল পোহাতে না হয়। হারম্যান এলেট্স-এর পক্ষ থেকে তাগিদের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রেসিডেন্টের উদ্বোধনী ভাষণ দু'দিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে কার্টার তাঁর ইতিবাচক জবাবের জন্য আরেকটু সময় পান।

প্রেসিডেন্ট সাদাতের ভাষণের সময় ছিল সন্ধ্যা ছ'টায়। কার্টারের জবাব পেলেন কেবল দু'ঘণ্টা আগে। রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলেট্স প্রেসিডেন্টের সাথে জরুরী সাক্ষাৎ করে পত্রটি দেন। কার্টারের জবাব ছিল নেতিবাচক। এলেট্সের বর্ণনা মতে– প্রেসিডেন্ট সাদাত ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক খেয়ালের অনুপস্থিতিতে তাঁর গভীর হতাশাব্যঞ্জক অনুভূতি প্রকাশ করেন।

এই প্রেক্ষাপটে যখন প্রেসিডেন্ট সাদাত সংসদে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে রওনা হলেন তখন তাঁর উপস্থিতিতে একবার ধরা দিচ্ছিল— আল্-কুদ্সে বৈঠক হওয়া উচিত, আবার উদিত হচ্ছিল কার্টারের অস্বীকৃতি। এ কারণেই আল্-কুদ্সে যাবার তাঁর প্রস্তুতির কথাটি উত্থাপিত হয়েছে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে।

সপ্তম অধ্যায়

শান্তির পটভূমি

কোন রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক চুক্তির শর্তগুলো বাস্তবায়ন শুরু করার আগে পক্ষগুলোর মধ্যে গ্যারান্টি থাকা চাই। কোন চুক্তির ক্ষেত্রেই এটা যুক্তিসম্মত নয় যে, কোন একটি পক্ষ তার প্রদেয় বস্তুটি আগেই দিতে শুরু করে, এর পর ভাবে যে, অন্য পক্ষের সাড়াও সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে লাভ করবে। এমনকি এটা ব্যক্তিগত পর্যায়েও খাটে। দেখুন না, বিয়ের ক্ষেত্রেও মোহর নির্ধারিত হয় বাসর রাতের আগে, পরের দিন সকালে নয়।

॥ ১ ॥

নেসেট

"মহামান্য প্রেসিডেন্ট, তারা আপনাকে অবরুদ্ধ করে ফেলবে।
ভেবেছিলাম, আপনি আমাকে আরেকটু বেশি চেনেন এবং জানেন যে, কেউ আমাকে কোণঠাসা করতে পারবে না।"

—প্রেসিডেন্ট সাদাত ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হারম্যান এর মধ্যকার সংলাপ

প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রত্যাশা করছিলেন যে, তাঁর এ ভাষণ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রভাব ফেলবে। এদিকে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য মিসরে আশিজনেরও বেশি বিদেশী সংবাদদাতাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। তাদের কাছে এ ধরনের উপলক্ষ্যে ইতোপূর্বে কোন দাওয়াত আসেনি।

অনুরূপভাবে প্রেসিডেন্ট সাদাত একান্তভাবে কামনা করেন যে, আমন্ত্রিতদের একজন থাকবেন ইয়াসির আরাফাত। তিনি জানতেন আরাফাত তখন মিসরেই আছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদাত সভার মাত্র একদিন আগে আবিষ্কার করলেন যে, পিএলও প্রধান ত্রিপোলীর উদ্দেশ্যে কায়রো ত্যাগ করেছেন। তখন তিনি ইয়াসির আরাফাতের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দিলেন এবং তাকে বার বার অনুরোধ করলেন যেন তিনি আগামী সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। ঠিক হলো তাকে নিয়ে আসার জন্য একটি বিশেষ বিমান পাঠানো হবে। তিনি খুশির সাথে এলেন। ধরে নেন, এটা তার সম্মানার্থে এবং তাঁর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেই হয়েছে। এ সকল ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির সময় সাদাতের পরিকল্পনা ছিল যে, তিনি তাঁর বক্তব্যে আগের প্রস্তাবটিই পেশ করবেন অর্থাৎ আল্-কুদ্সে ব্যাপকভিত্তিক সভা আহ্বান করবেন। তিনি তাঁর ভাষণ দিতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি সেই পয়েন্টটিতে পৌঁছলেন। যেখানে তিনি বোমা ফাটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে, "তিনি শান্তির সন্ধানে পৃথিবীর যে কোন স্থানে যেতে প্রস্তুত রয়েছেন, এমনকি যদি সে জায়গাটি হয় খোদ আল্-কুদ্স অথবা একেবারে নেসেট।" এ কথায় উপস্থিত সকলে হতবাক হয়ে গেলেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত যখন মঞ্চ থেকে নামেন তখন তাঁর সিনিয়র সহকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁদের কেমন লেগেছে। তখন প্রধানমন্ত্রী মামদুহ সালেম তাঁকে বলেন যে, "আল্-কুদ্সে যাবার কথাটি বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।" জাতীয় সংসদ নেতা ইঞ্জিনিয়ার সাইয়্যেদ মারয়ী বলেন

যে, "তিনি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে খুবই শঙ্কিত।" আর এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী "ইসমাইল ফাহ্‌মী যিনি এই ব্যাপকভিত্তিক আল্-কুদ্‌স সভার প্রেক্ষাপট জানতেন তিনি নিজেকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম ছিলেন। তাই প্রেসিডেন্টকে কেবল এ কথাটিই বলেন যে, "ভাষণটিকে আরেকটু পাঠ করা প্রয়োজন যাতে কেউ ভুল না বোঝে।" তাঁর মূল্যায়ন ছিল আল্-কুদ্‌সে ব্যাপকভিত্তিক সম্মেলনের ধারণার প্রতি অতি উৎসাহের বশে প্রেসিডেন্ট সাদাতের মুখ ফসকে ওই বাক্যটি বের হয়ে গেছে। এতে তাঁর আল্-কুদ্‌সে, যাবার উৎসাহ প্রতিফলিত হওয়ার চেয়ে বরং এ পরিকল্পনাকে কার্টারের প্রত্যাখ্যান করা তাঁর হতাশাই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে।

ইয়াসির আরাফাত খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তাঁর মন্তব্য ছিল ঃ "ছিলাম তাঁর সামনে বসা— পরিয়ে দিল পাগড়ি ঠাসা।" তিনি জাতীয় সংসদ থেকে বের হয়ে সরাসরি বিমানবন্দরে চলে যান। যত তাড়াতাড়ি পারেন কায়রো ত্যাগ করবেন যাতে 'সাদাত বোমা' ফেটে কিছু তার গায়ে এসে না লাগে।

এখন ঘটনাপ্রবাহ যে কোন পরিকল্পনার আয়ত্তের বাইরে আপন গতিতে এগিয়ে চলল।

–রাত দশটায় জাতীয় সংসদ থেকে বের হয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্‌মী পত্রিকার সম্পাদকগণের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন যেন তাঁরা ভাষণের ঐ অংশটুকু প্রকাশ না করে, যেখানে প্রেসিডেন্ট সাদাত আল্-কুদ্‌স ও খোদ নেসেটে যেতে প্রস্তুত আছেন বলে উল্লেখ করেন। যে কোন অবস্থায় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার-শিরোনাম বা উপশিরোনামে এ বিষয়টি ছাপানো যাবে না।

–যখন প্রেসিডেন্ট সাদাত নিজ বাসভবনে ফিরে গেলেন দেখলেন তাঁর স্ত্রী বেগম জিহান তাঁর ভাষণ শোনে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। তিনি বুঝলেন যে, তিনি (জিহান) এটাকে তাঁর স্লিপ অব ট্যাং মনে করেছেন। তাই তিনি রাগত স্বরে সেটিকে নিশ্চিত করে বলেন যে, "তিনি জানেন তিনি কি বলছেন।" অর্থাৎ জেনেশুনে সচেতনভাবেই বলেছেন। যখন রেডিও খুলে কিছু বিদেশী স্টেশন ধরলেন, শোনতে পেলেন যে, তাঁর ঐ কথাটিই সকল খবরের পয়লা শিরোনাম। বেগম জিহানের দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুরে বললেন, দেখলে, তুমি যেটিকে স্লিপ অব টাং মনে করেছিলে তা এখন দুনিয়া জুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। আরও বললেন যে, "তিনি তাঁর সাথে, এতগুলো বছর কাটিয়ে দেবার পরও রাজনীতির পাঠ কিছুই শিখতে পারেননি!"

–রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটের সময় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলেট্‌স প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে তাঁর বাসায় ফোন করে বলেন– মহামান্য প্রেসিডেন্ট, এর অর্থ কি, আপনি আল্-কুদ্‌সে যাচ্ছেন ? প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রত্যয়ের সাথে উত্তর দেন– "হারম্যান! আমি যা করতে প্রস্তুত সেটাই বলেছি।" উত্তরে এলেট্‌স বলেন–আপনি

যাচ্ছেন বলেই আমার শঙ্কা হচ্ছে। কারণ বেগিন এ সুযোগ তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক গলিয়ে চলে যেতে দেবেন না। আমার ভয় হচ্ছে–তিনি আপনাকে কোণঠাসা করে ফেলেন কিনা। প্রেসিডেন্ট সাদাত উচ্চস্বরে হেসে উঠে বলেন, হারম্যান! আমার ধারণা আপনি আমাকে বেশ চেনেন এবং আপনি জানেন যে, কেউ আমাকে কোণঠাসা করতে সক্ষম হবে না।"

–রাত সাড়ে এগারোটায় প্রেসিডেন্ট কোন কোন সম্পাদককে ফোন করে তাঁর ভাষণকে কীভাবে গ্রহণ করলেন তা জানতে চাইলেন। তাঁরা যখন ইসমাইল ফাহ্মীর নির্দেশনার কথা জানালেন যে, তিনি আল্-কুদ্সে যাবার প্রস্তাবটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, তখন তিনি ইসমাইল ফাহ্মীর ওপর খেঁপে গেলেন এবং তাঁর নির্দেশনা বাদ দিয়ে সেদিকে লক্ষ্য না করতে বললেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবকেই পত্রিকার ব্যানার হেডলাইন করতে বলেন। রাত সাড়ে বারোটার সময় প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে একটি বার্তা নিয়ে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলেট্সের কাছে পাঠান যেন তাঁকে অফিসিয়ালি জানান যে, "প্রেসিডেন্ট যা বলেছেন তা যথার্থই বলেছেন। তিনি বেগিনের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলে ঠিকই আল্-কুদ্সে যেতে প্রস্তুত রয়েছেন।"

–মধ্যরাতের পর একটার সময় প্রেসিডেন্ট সাদাত তখনও বিনিদ্র, প্রাণচঞ্চল ও জীবনময়তায় স্ফূর্ত ছিলেন। এ সময় তাঁকে জানানো হলো যে, টেলিভিশনের সবচেয়ে সুপরিচিত ভাষণের ওয়াল্টার ক্রংকেট ও সে সময়কার সবচেয়ে উজ্জ্বল টেলিফোন তারকা বারবারা ভোল্টার্স উভয়ই তাঁর সাথে কথা বলতে চান এবং তাঁর বাসভবন থেকে সরাসরি সচিত্র প্রতিবেদন বিশ্বময় প্রচার করতে চান। ঠিকই ছবি পাঠানোর সরঞ্জামাদি প্রেসিডেন্ট সাদাতের বাসভবনে এসে পড়ে। ক্রংকেট উপগ্রহের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে আলাপ শুরু করেন। এ সময় সে তাঁকে বলছে "মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আপনি কি সত্যিই আল্-কুদ্সে যেতে প্রস্তুত ?"

প্রেসিডেন্ট টিভি তারকাদের সাথে ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীতি-সম্ভাষণে বলেন—ওয়াল্টার! আমি তো এ জন্য আমার প্রস্তুতির কথা জাতীয় সংসদে ঘোষণাই করেছি।" ক্রংকেট তাঁকে প্রশ্ন করেন "মহামান্য প্রেসিডেন্ট! আপনি এই সফরে কখন যাওয়ার ইচ্ছা করছেন ? সাদাত উত্তর করেন–"ওয়াল্টার যখন এ ব্যাপারে আমন্ত্রণ লাভ করব।" চমক ছিল অপেক্ষায়! ওয়াল্টার ক্রংকেট প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বলেন। মহামান্য প্রেসিডেন্ট– আমার সাথে দ্বিতীয় লাইনে এবং পর্দায় আমাদের দর্শকদের সামনেই প্রধানমন্ত্রী বেগিন অপেক্ষায় রয়েছেন। আপনি আমাকে অনুমতি দেবেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, কখন তিনি আপনাকে এ আমন্ত্রণ জানাবেন ?" সাদাত উত্তরে বললেন ঃ অবশ্যই, অবশ্যই। ক্রংকেট আওয়াজ শোনা গেল, তিনি মেনাহেম

বেগিনের দিকে, প্রশ্ন রুজু করছেন। আবার বেগিনের আওয়াজ শোনা গেল, তিনি বলছেন— "আমরা এখনই প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট তাঁর আল্-কুদ্স সফর ও তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে নেসেটের বিশেষ অধিবেশনের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক সরকারী আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিচ্ছে।

পরদিন সকালে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত 'হারম্যান এলেট্স' একটি দাওয়াতপত্র নিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতের বাসভবনে এলেন। এটা ওয়াশিংটন হয়ে বেগিনের কাছ থেকে তার কাছে পৌঁছে। এটাও ছিল একটি চমক। কিন্তু গোটা বিশ্বে যে বিরাট রাজনৈতিক ও প্রচার মাধ্যমে মেলা জমে উঠেছে তাতে যোগ দেয়া থেকে পিছে পড়ে থাকা বা বিলম্ব করার মতো সাধ্য ছিল না।

ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত পরিবর্তনে প্রেসিডেন্ট সাদাতের বহু সহকারী বেশ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মামদুহ, সালেম, স্পীকার ইঞ্জিনিয়ার সাইয়্যেদ মারয়ী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্মী প্রতিরক্ষামন্ত্রী লে. জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল গনি জেম্সী। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদাতের বন্ধু মহলে আরও কিছু লোক ছিলেন যাঁরা এই পরিকল্পনাটিকে উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁদের বিশ্বাস ছিল–তাঁদের একজনের ভাষায়– 'ইসরাইলের সাথে এই ভারি মুসিবত' থেকে মুক্তির বুঝি বা সময় এসে গেছে। ইনি হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার 'উসমান আহমাদ উসমান'–যিনি দিনকে দিন প্রেসিডেন্ট সাদাতের আরও বেশি প্রিয়ভাজন হয়ে উঠছিলেন।

এ পরিকল্পনায় উৎসাহ যোগাবার মতো আরও কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা ছিলেন প্রেসিডেন্ট সাদাতের সরাসরি সার্কেলের বাইরে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর মোস্তফা খলীল, যিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে টেলিফোনে কথা বলে জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁর সাথে আল্-কুদ্সে যেতে প্রস্তুত রয়েছেন এবং এই প্রতিনিধি দলে যেভাবে প্রেসিডেন্ট ভাল মনে করেন সেভাবেই তাঁকে জায়গা দিতে পারেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে এটাই হচ্ছে আরব-ইসরাইলী সংঘাত সমাধানের সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

এ পরিকল্পনা নিয়ে বিভক্তিটি ছিল বেশ গভীর। প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর বাসভবনে তাঁর ভাষায় 'উৎসুকদের' ভরসা দেয়ার জন্য এবং তাঁর পরিকল্পনার সমর্থকদের জোরদার করার লক্ষ্যে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠক ডাকেন। এ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট সাদাত, উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারী ডক্টর মোস্তফা খলীলের বর্ণনা অনুসারে কয়েকটি পয়েন্টের ওপর জোর দেন ঃ

১। সমাধানের সকল দুয়ার বন্ধ। কাজেই তাঁকেই এখন বিষয়টি হাতে নিতে হচ্ছে। পুরনো উপায়ে এখন আর কাজ হবে না। এখন সময় এসেছে বৈদ্যুতিক শক দেয়ার। প্রেসিডেন্টের মতে ইতোমধ্যে সেই বৈদ্যুতিক শক হয়ে গেছে এবং

আশাতীতভাবে এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সকলের এখন বিশ্বের পত্র-পত্রিকাগুলো পড়া দরকার। বহির্বিশ্বের রেডিও শোনা ও টেলিভিশন দেখা প্রয়োজন।

২। সময় আসার আগেই তাঁর মুখ ফসকে পরিকল্পনাটি বের হয়নি, এটা বহুকাল আগে থেকেই তাঁর মাথার পিছন দিকে ঘুরছিল। বিভিন্নভাবে এটাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখেছি, সময় যতই গড়িয়েছে ততই এই বোঝটি পাকা হয়েছে। তিনি বলেন যে, এটার গুরুত্ব বোঝেই তিনি উপস্থাপন করেছেন। আর এ জন্যই প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি চমকে ওঠেননি। আর এটাও ঠিক নয় যে ঘটনার প্রতিক্রিয়া তাঁকে উদ্দেশ্য থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেছে। তিনি যেখানে পৌঁছেছেন, শুরু থেকেই ঠিক এখানেই পৌঁছুতে চেয়েছিলেন।

৩। 'চচেস্কু' থেকে যতদূর বোঝা গেল 'বেগিন' মিসর থেকে প্রত্যাহারে রাজি আছে, এমনকি উভয় পক্ষের সমঝোতার আলোকে সামান্য রদবদল সাপেক্ষে অধিকৃত আরব ভূমি থেকেও প্রত্যাহারে প্রস্তুত রয়েছে। (এই বিন্দুতে এসে প্রেসিডেন্ট সাদাত একটি খাম থেকে মানচিত্র বের করে সামনে মেলে ধরলেন।) তিনি বলেন—"প্রত্যাহারের রূপরেখা গ্রহণযোগ্য।" কেউই এই মানচিত্রের ধারে কাছে আসেনি। সবাই ধারণা করেছিল, এখনও অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত এই মানচিত্র প্রেসিডেন্ট চচেস্কু থেকে লাভ করেছেন। যা হোক, সবাই এই স্থির চিন্তা-ভাবনা করেন যে, এই অভিযাত্রা নিরাপদ এবং এই শকের সুফল সুনিশ্চিত।

৪। এখান থেকে এই সফর সম্পন্ন হওয়া পর বেগিন আমেরিকান ও বৈশ্বিক প্রচণ্ড চাপের মুখে থাকবে, যাতে তিনি এ উদ্যোগের একটি ইতিবাচক সাড়া দেন। হেলাফেলা করার আর কোন সুযোগ পাবে না। প্রেসিডেন্ট সাদাত মত প্রকাশ করেন যে, তাঁর এই পদক্ষেপ আরব ও ইসরাইলের মধ্যকার মানসিক বাধা ভেঙ্গে দিয়েছে। এবং সারা দুনিয়াকে তারা কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে, এর মধ্যে আমেরিকান কংগ্রেস ও হোয়াইট হাউসও রয়েছে। এটাই হবে তাঁর বড় ভিত্তি, যখন তিনি আল্-কুদ্সে বেগিনের সাথে বৈঠকে বসবেন।

৫। প্রেসিডেন্ট সাদাত আরও বলেন যে, তাঁর এই উদ্যোগ কোন মিসর-ইসরাইলী সমাধানের ভূমিকা নয় বরং এটাকে তিনি শান্তির অন্বেষায় আরব আক্রমণ হিসাবে শানাতে চান। এ প্রেক্ষিতেই তিনি দামেস্কে যাচ্ছেন এবং প্রেসিডেন্ট 'আসাদকে' বোঝাবেন যেন তিনি তাঁকে আল্-কুদ্সে মিসর ও সিরিয়ার পক্ষে কথা বলার অনুমতি দেন।

॥ ২॥

ওয়াইজম্যান

"মাননীয়, আমার ওপর দয়া করুন। আমি তো কেবল একজন চাষী, যোদ্ধা, আপনার মতো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় অধ্যাপক নই।"

—'মোশে দায়ান' বুট্রস ঘালির প্রতি

প্রেসিডেন্ট সাদাত ১৭ নভেম্বর ১৯৭৭-এ দামেস্কে পৌঁছলেন। কালবিলম্ব না করে তখনই তিনি প্রেসিডেন্ট আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট আসাদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের মধ্যকার সাক্ষাৎকারের ঘটনাবলী ঘটেছিল এভাবে ঃ

আলোচনার শুরুতে প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর ইসরাইলে যাবার পরিকল্পনাটিকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তিনি আশা করলেন যেন মিসর ও সিরিয়ার পক্ষ থেকে তিনি আল্-কুদ্সে যান। তখন তাঁকে প্রেসিডেন্ট আসাদ জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার নিকট কি কোন সমাধানের নিশ্চিত পথ আছে যা আমরা গ্রহণ করতে পারি বা তার গ্যারান্টি পেতে পারি ?" সাদাত উত্তর দিলেন যে, তিনি কেবল নাড়ি পরীক্ষার কাজটিই করেছেন। কিন্তু আমানতদারির কথা হচ্ছে তিনি এমন দাবি করতে পারেন না যে তাঁর কাছে কোন নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি আছে। প্রেসিডেন্ট আসাদ তখন জিজ্ঞাসা করেন, "তাহলে আপনি সেখানে যেতে চান কেন ?" তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত বলেন যে, তিনি চান ইসরাইলকে তার দায়-দায়িত্বের সামনে তথা বিশ্বের সামনে এনে খাড়া করতে এবং মানসিক বাধা ভেঙ্গে দিতে। প্রেসিডেন্ট আসাদ উত্তর দেন, "ইসরাইলে কেবল যাওয়ার জন্যই যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ। এর সাথে যদি যোগ হয় যে, এই সফর হবে কোন নিশ্চয়তা অথবা গ্যারান্টি ছাড়াই, সেক্ষেত্রে তিনি আশঙ্কা করছেন, কেউ হয়তো এটাকে আত্মসমর্পণ ছেড়ে খেয়ানতও বলে ফেলতে পারে। অথচ এটা তিনি তাঁর অক্টোবর যুদ্ধের অংশীদার ও বন্ধুর জন্য মেনে নিতে পারেন না। এছাড়াও তিনি তা সত্য বলে মেনে নেবেন না। কারণ তিনি সাদাতকে চেনেন এবং তাঁর সাথে একযোগে কাজ করেন।" এ পর্যায়ে এসে প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তেজিত হয়ে সরোষে প্রশ্ন রাখেন ঃ "আমাকে খেয়ানতের অপবাদ দেবে সে কে ? সে সব লিলিপুটের বাচ্চা, যারা যুদ্ধ না করে কেবল ভাষণ দিয়েই ক্ষান্ত ছিল, তারা ?" এরপর তিনি বলেন– "লোকেরা এখন যুদ্ধ ক্লান্ত, আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" আসাদ উত্তর দেন, কোন জাতি তার উদ্দেশ্য সাধনে দেয়া আত্মত্যাগে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। তবে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হারিয়ে গেলে সেটাই তাদের ক্লান্ত করে দেয়।"

এরপর প্রেসিডেন্ট আসাদ জাতীয় দায়িত্ব ও বিভিন্ন জাতির সংগ্রামের কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁকে মাঝপথে বাধা দিয়ে বলেন– এই কথাগুলোই আমাদেরকে বহু বছর যাবৎ বেকার করে রেখেছে। তখন প্রেসিডেন্ট আসাদ জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি এ উদ্যোগটিকে কিভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, এটা কার নির্দেশনায় হচ্ছে ? তিনি ইঙ্গিত করেন যে, এটা বোধ হয় আমেরিকারই পরামর্শ। প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তর দেন যে তিনি তাঁকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে, ওয়াশিংটনে বসে আমেরিকানরা তাঁর জাতীয় সংসদের ঘোষণায় তেমনটিই চমকে উঠেছিলেন যেমনটি তিনি এখানে দামেস্কে থেকে চমকে উঠেছেন।"

প্রেসিডেন্ট আসাদের ধৈর্য ফুরিয়ে যেতে লাগল। তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বললেন, "এটা হচ্ছে একটা মস্তানী আর বকোয়াস।" প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তরে বলেন যে, তিনি তাঁর ও আসাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি চান না। যদি তিনি তাঁকে সিরিয়ার পক্ষ থেকে কথা বলতে দিতে প্রস্তুত থাকেন তা হলে তো ভাল, নইলে বলব, "হে ঘর, তোমাতে খারাপ কিছু ঢোকেনি। (অর্থাৎ আমায় নিয়ে আমি চলে গেলাম)। প্রেসিডেন্ট আসাদ উত্তর করলেন– "খারাপে তো পুরো বাড়িই ভরে গেছে।"

প্রেসিডেন্ট আসাদ তাঁর পুর্ব অভিজ্ঞতার কথায় ফিরে এসে বলেন, "আমরা আপনার কাছে অক্টোবরের সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় লড়াইয়ের নেতৃত্ব সোপর্দ করেছিলাম, কিন্তু আপনি যুদ্ধের সময় আমাদেরকে এই অপবাদ দিয়েছিলেন যে, আমরা আপনার অজান্তে পিছনে পিছনে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করেছি। পরে আপনার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা সঠিক নয়। এরপর আপনিই আমাদের সাথে পরামর্শ না করে, আমাদেরকে আদৌ অবহিত না করেই যুদ্ধবিরতি করলেন। তারপর একা একা কিসিঞ্জারের সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন। তাঁকে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন আমাদের অজ্ঞাতসারে। শেষে তাঁর সাথে একাই চুক্তিতে পৌঁছে গেছেন। এরপর সিরীয় ফ্রন্টের ব্যাপার কোন সুরাহা হওয়ার আগেই তেল অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার জন্য বাদশাহ ফয়সলকে চাপ দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত এ সময় বলে ওঠেন, "আমার ধারণা ছিল যুদ্ধের পর আপনার সাথে কুয়েতের বৈঠকে এ সব ব্যাপারে চুকিয়ে নিয়েছি।" আসাদ বলেন যে, তিনি অতীতকে ভুলে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ভাই, আপনি তো অদ্ভুত লোক। সব সময় কেবল তড়িঘড়ি করেন। যুদ্ধবিরতির বেলায়ও তড়িঘড়ি করেছেন এবং সবচেয়ে নাজুক মুহূর্তে তা বন্ধ করেন। তারপর লিয়াজোঁ ছিন্নের ব্যাপারেও তাড়াহুড়া করেছেন। আমাদের সিনাই ও গোলান অঞ্চলে সংঘাতময় অবস্থায় থাকাও মেনে নিয়েছিলেন। এতে আমরা অক্টোবরের যুদ্ধের অর্জনকেও বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। জেনেভা সম্মেলনে যাওয়ার ব্যাপারেও তড়িঘড়ি করেছেন। অথচ এ সম্মেলন মিসর ইসরাইল সন্ধির দরজা উন্মুক্ত করা ছাড়া

আর কিছুই করতে পারেনি। সেই আপনি এখন আবার সেই তড়িঘড়ি করছেন আর কোন পূর্ব প্রস্তুতি, নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি ছাড়াই আল্-কুদ্সে যেতে চাচ্ছেন। এখন যদি আমি আপনার এ প্রচেষ্টাকে অনুমোদনও করি কিন্তু সিরীয় জনগণ তা কখনও মেনে নেবে না বরং তারা নিন্দা জানাবে।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর মত প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি তাঁর পথে অগ্রসর হয়ে আল্-কুদ্সে যাচ্ছেন। আর এর ফলাফল নির্ণয়ের জন্য প্রেসিডেন্ট আসাদকে রেখে যাচ্ছেন। আসাদ তাঁকে বলেন, আপনার এ উদ্যোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে বরং তাকে ধ্বংস করবে। কারণ মিসর ও ইসরাইলের মধ্যকার চুক্তি হলো এক জিনিস আর প্রকৃত শান্তি হচ্ছে অন্য জিনিস। সন্ধি হতে হবে, হয় ব্যাপকভিত্তিক নইলে কখনও নয়। আমরা সিরিয়া থেকে জেনেভা সম্মেলনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু শর্ত আরোপ করেছি। আমরা এতে জেনেভা সম্মেলন বয়কট করতে চাইনি। বরং আমরা চেয়েছিলাম যে, আলোচনার আগে আরব অধিকারের ন্যূনতম, সীমার গ্যারান্টি পেতে। তাহলে দেখুন, কোন পূর্বশর্ত ছাড়া আপনার আল্-কুদ্সে যাওয়া কি স্বাভাবিক হবে ? প্রেসিডেন্ট সাদাত যখন এই বৈঠকের পর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল্ আসাদ সিরীয় নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করেন। সভায় তিনি তাঁর ও প্রেসিডেন্ট সাদাতের যে আলোচনা হয় তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, এহেন বিপজ্জনক বিষয়ে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বিশেষ করে আরব ইতিহাসে এর কোন নজির নেই। তখন সিরীয় কমাণ্ডের কিছু সদস্য বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলেন।

এদের কেউ কেউ এতটাই ক্ষেপে গেলেন যে, আল্-কুদ্সে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বন্দী করে রাখার অনুরোধ জানান। নইলে একটি আরব কেলেঙ্কারি ঘটবে, যার ফলে জাতীয় বিপর্যয়ও নেমে আসতে পারে। প্রেসিডেন্ট আসাদের চোখেমুখে তখনও হতভম্বতা দৃশ্যমান। তবুও তিনি বলেন যে, দামেস্কে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বন্দী করে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে তো এটাই হবে একটি আরব কেলেঙ্কারি।

কমাণ্ডের অন্য সদস্যগণ তখন আবেগ উত্তেজনার ঘোরে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে যে কোন মূল্যে দামেস্ক ত্যাগে বাধা দেয়ার মত দেন। প্রেসিডেন্ট আসাদ প্রশ্ন রাখেন– "কি অধিকারে বা কিসের ভিত্তিতে তিনি বা অন্য কেউ এমন ধরনের আচরণ করতে পারেব ?" কমান্ডের সদস্য আহমদ বলেন, "যৌথ আরব ভূমিকার অধিকারে, যৌথ আরব ত্যাগ-তিতিক্ষার অধিকারে।" প্রেসিডেন্ট আসাদ উত্তর দেন, এ ধরনের কাজ যৌথ ভূমিকা আর যৌথ ত্যাগ-তিতিক্ষার অবমূল্যায়ন করবে। কারণ মিসর জাতি তাদের প্রেসিডেন্টের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও তার সাথে এ পর্যায়ের ব্যবহার কোনদিন মেনে নেবে না। ফলে দু'টি জাতির মধ্যে চিরদিনের জন্য বিভেদ সৃষ্টি হয়ে

যাবে। মনে হয় শেষ বিবেচনাটি প্রেসিডেন্ট আসাদের মনেই ছিল। তা হচ্ছে দামেস্ক ত্যাগের সময় হলে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বিদায় জানানো। তাঁর সাথে তিনি বিমানবন্দরে গেলেন, গাড়িতে দু'জনই চুপচাপ, কেউ কোন কথা বলছেন না। এই নীরবতা ছিল স্নায়ুর জন্য খুবই ভারি আর শ্বাসরুদ্ধকর। এয়ারপোর্টের গেটে প্রেসিডেন্ট আসাদ প্রশ্ন রাখেন, এ কাজে মিসরের সশস্ত্র বাহিনীর মত কি ? প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তর করেন– মিসর জাতির সকল শক্তি ও বাহিনী তার সাথে রয়েছে এবং তাকে শতকরা একশ' ভাগ সমর্থন জানাচ্ছে। তখন প্রেসিডেন্ট আসাদের ধৈর্য ছিল না যে, প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে বিমানের দরজা পর্যন্ত যাবেন। কাজেই তিনি এয়ারপোর্ট চত্বরে বের হওয়ার দরজাতেই তাঁকে বিদায় জানান এবং দ্রুত ওয়েটিং রুমে এসে একটি সিটে বসে মেজাজটাকে বশে আনতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

অবশিষ্ট আরব বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। বড় বড় রাজধানীগুলো যেমন আলজিরিয়া, ত্রিপলী, দামেস্ক ও বাগদাদ বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উপসাগর ও আরব উপদ্বীপের শাসকদের অবস্থান ও ভূমিকায় বেশ পার্থক্য দেখা যায়। সৌদি আরবের বাদশাহ খালেদ ছিলেন খুবই চিন্তিত ও দুঃখিত। তিনি বলেন যে, তিনি দু'দিন পর অনুষ্ঠিতব্য আরাফাতের সমাবেশের দিন (হজ্জের দিন) কা'বা শরীফে যাবেন এবং দোয়া করবেন যেন প্রেসিডেন্ট সাদাত আল্-কুদ্স সফরে গিয়ে 'আমাদের সবাইকে কলঙ্কিত করার কাজ সমাপ্ত করার আগেই তাঁর বিমানটি যেন মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। কিন্তু উপসাগরীয় শেখদের কেউ কেউ আবার প্রেসিডেন্ট সাদাতের দুঃসাহসের প্রশংসা চেপে রাখতে পারলেন না। কাতারের শাসক 'শেখ খলিফা' তাকে 'অসাধারণ মাস্টার' অভিধায় বিভূষিত করেন। খোদ কায়রোতেই ছিল হতবুদ্ধিতা। বরং প্রেসিডেন্ট সাদাতের ঘনিষ্ঠ সার্কেলেই ছিল। যখন ইঞ্জিনিয়ার উসমান আহমাদ উসমান উৎসাহ যুগিয়েছেন তখন সাইয়্যেদ মারয়ী ছিলেন শঙ্কিত। এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহ্মী তাঁর পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। তাঁর ধারণায় ছিল যে, লে. জেনারেল "মুহাম্মদ আব্দুল গনি জেম্সী" ও তাঁর সাথে সংহতি প্রকাশ করে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন। সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট সাদাত আল্-কুদ্সে যাবার মতো হিম্মত পাবেন না। কিন্তু জেম্সী পদত্যাগ করলেন না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়া আর কোন পদত্যাগকারীও পাওয়া গেল না। এদিকে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচনেও ছিল সমস্যা। কারণ এ পদের জন্য প্রথম প্রার্থী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 'মুহাম্মদ রিয়াদ'-এর একটি মন্তব্যকে ভুল বোঝা হলো। যা পরবর্তীতে ধরা পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি আল্-কুদ্সে যাবার জন্য প্রস্তুত নন। (মুহাম্মদ রিয়াদ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আল্-কুদ্সে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত নেই, কিন্তু ধারণা করা হলো যে, তিনি বুঝিবা নিজে ব্যক্তিগতভাবে নীতিগত প্রশ্নে যেতে রাজি নন)। এ জন্যই

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করা হয় ডক্টর বুট্রস ঘালিকে। তিনি সে সময় প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে কাজ করছিলেন। বুট্রস ঘালি এই সফরকে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। এর পুরস্কারস্বরূপ তিনি সে রাতেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। এই পরিচয়েই তিনি আল্-কুদসে যান।

যখন 'ইসমাইলিয়ার' নিকটবর্তী আবু সবীর এয়ারপোর্ট থেকে বিমান উড্ডয়ন করে তখন প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে ছিলেন তিনজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ডঃ মোস্তফা খলীল, প্রকৌশলী উসমান আহমাদ উসমান ও ডঃ বুট্রস ঘালি। প্রেসিডেন্ট বিমানে বসেই প্রত্যেকের দায়িত্ব ভাগ করে দিতে চাইলেন। তাই প্রস্তাব করলেন যে, তিনি মেনাহেম বেগিনের দায়িত্ব নেবেন। ডঃ মোস্তফা খলীল নেবেন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিদের সামলাবার দায়িত্ব আর ডক্টর বুট্রস ঘালি নেবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোসে দায়ানের ভার। তারপর প্রকৌশলী উসমান আহমাদ উসমান নেবেন নেসেট সদস্যদের দায়িত্ব। যখন বিমানে লেবার পার্টির সাথে যোগাযোগের কথা ওঠে, এ দলে রয়েছে শিমন পেরেজ, আইজ্যাক রাবিন ও গোল্ডা মায়ার প্রমুখ। তখন এর জন্য প্রতিনিধি দলের উচ্চ পদস্থদের কারও সময় ছিল না। তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর পিএস ফৌজি আব্দুল হাফেজকে এ দায়িত্ব দেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাতকে নিয়ে যখন প্রেসিডেন্সিয়াল বিমানটি বাস্তবেই আল্-কুদ্সের পথে পাড়ি জমাল তখনও ইসরাইলী নেতারা বিশ্বাসেই আনতে পারেননি যে, এ ধরনের কোন সফরের ঘটনা আদৌ ঘটতে পারে। সন্দেহ এতদূর পর্যন্ত গড়াল যে, ইসরাইলী বাহিনীর অধিনায়ক বিমানবন্দরের চারদিকে একদল গেরিলা কমাণ্ডোকে মোতায়েন করে রেখেছিল, পাছে বিমানের দরজা খোলার সাথে সাথে কিনা একদল মিসরীয় কমাণ্ডো বের হয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে স্বাগত জানাতে আসা ইসরাইলী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দকে তাক করে ব্রাশফায়ার শুরু করে দেয়। কিন্তু দেখা গেল, বিমানের দরজা খুলে গেল, হাসিমুখে বের হয়ে আসছেন প্রেসিডেন্ট সাদাত। তবে তার পদক্ষেপগুলো ছিল কিছুটা স্লথ। কারণ শেষ মুহূর্তে বৈরী আরব বুলেটের ভয়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে নিয়েছিলেন। তাতে চলার ছন্দ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হতভম্ব ছিলেন বেগম গোল্ডা মায়ার যিনি কয়েকবার উচ্চারণ করেন যে, এ তো অবিশ্বাস্য! পরবর্তীতে যখন সাদাত ও বেগিন ভাগাভাগি করে নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন তাঁর এই হতভম্বতা প্রকাশ পেয়েছিল আরও আকর্ষণীয় ভাষায়। তিনি বলেছিলেন-"দুজনের কেউই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নয়। বরং তার আগে তাদের "অস্কার পুরস্কার" পাওয়া উচিত ছিল। (বলা বাহুল্য, সিনেমায় অভিনয় ও প্রযোজনার জন্য 'অস্কার' দেয়া হয়।) সাদাত বলেন, যখন গাড়ি বহর বেন গোরিয়ন এয়ারপোর্ট থেকে আল্-কুদ্সে বাদশাহ

দাউদ হোটেলে পৌঁছল তখনও তিনি বেগিনের সাথে বেশি কথা বলেননি। তিনি পথের দু'পাশের দৃশ্যগুলো ভালভাবে দেখার চেষ্টা করেন। তিনি আরও বলেন যে, বেগিন লোকটি স্বল্পভাষী। তাদের মধ্যে কেবল শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। সাহসী উদ্যোগ নিয়ে আল্-কুদ্সে আগমনের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বেগিন আশা প্রকাশ করেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত ভাল ফল নিয়ে স্বদেশে ফিরবেন। তবে ডঃ বুট্রস ঘালি 'বেন গোরিয়ন এয়ারপোর্ট থেকে কিং দাউদ হোটেলে মোটর শোভাযাত্রা শেষে দায়ানের পক্ষ থেকে কিছু শুভ প্রতিক্রিয়া নিয়েই বের হন। মনে হয় ডক্টর বুট্রস ঘালি তাৎক্ষণিকভাবেই আলোচনার কর্মসূচী ঠিক করার চেষ্টা শুরু করেন। তখন মোশে দায়ান তাঁকে বলেন, যার মূল কথা হচ্ছে-তিনি যেন তাঁর সাথে একটু সহজ ব্যবহার করেন। কারণ তিনি হচ্ছেন নিছক একজন চাষী যোদ্ধা, বুট্রস ঘালির মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় অধ্যাপক নন। সম্ভবত ডক্টর মোস্তফা খলীল হচ্ছেন এই ডেলিগেটের প্রথম ব্যক্তি যিনি বিবেচনা করেন যে, আল্-কুদ্সে সফর কোন প্রমোদ ভ্রমণ নয়। বেন গোরিয়ন এয়ারপোর্ট থেকে কিং দাউদ হোটেলে যাবার পথে গাড়িতে তাঁর সরকারী সহযাত্রী ছিলেন অর্থনীতি বিষয়ক উপ-প্রধানমন্ত্রী 'সিমহা এরলেখ'। তাঁকে মোস্তফা খলীল বলেন, প্রেসিডেন্ট সাদাত আন্তরিকভাবে শান্তির অন্বেষায় এখানে এসেছেন এবং তিনি প্রত্যাশ্যা করছেন যে, ইসরাইলের পক্ষ থেকে তিনি একটি ইতিবাচক সাড়া পাবেন যা তিনি মিসরে ফিরে গিয়ে মিসরী জনগণ ও আরব জনমতের সামনে তুলে ধরতে পারেন। 'সিম্হা এরলেখ' একমত পোষণ করে পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, কি ধরনের সাড়া পেলে এটা ইতিবাচক ধরে নেয়া হবে ? 'মোস্তফা খলীল' বলেন— অধিকৃত ভূমিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। এ ভূমি থেকে প্রত্যাহারের সুস্পষ্ট প্রস্তুতিই কাঙ্খিত বার্তা দিতে পারে। এ সময় এরলেখ তাঁর মাথা দোলান এবং তাঁর ভিতর থেকে দুর্বোধ্য কিছু গুঞ্জন বের হয়। কিন্তু সাড়া দেবার কথাটি স্পষ্ট হয়নি। এরলেখ বলেন, "আমাদের সামনে দীর্ঘ সিরিয়াস আলোচনা রয়েছে, বলা যায় কঠিন আলোচনা। তবে পরিশেষে সবকিছুরই সমাধান আছে।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত লক্ষ্য করলেন যে, এয়ারপোর্টের অভ্যর্থনায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজরা ওয়াইজম্যান অনুপস্থিত রয়েছেন। তিনি একবার হেনরি কিসিঞ্জারের মুখে শুনেছেন যে, মেনাহেম বেগিনের সিদ্ধান্তের ওপর ওয়াইজম্যান ও দায়ান এ দু'জন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। দায়ানকে তো এয়ারপোর্টে দেখেছেন কিন্তু ওয়াইজম্যানকে দেখেননি। হোটেলে পৌঁছে তাঁর খোঁজ করলেন। তখন জানতে পারলেন যে, তিনি কয়েকদিন আগে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন।

মনে হয় ওয়াইজম্যান সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট সাদাতের খোঁজ করার কথা তার কানে গেছে তাই তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে কিং দাউদ হোটেলে এসে পৌঁছেন। দেখা গেল

তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্লাজায় প্রবেশ করছেন আর মিসরীয় বাকরীতিতে আরবী জবানে বলছেন (এটা তিনি ব্রিটিশ এয়ারফোর্সে চাকরিকালীন যুদ্ধের সময় আলেকজান্দ্রিয়ার সন্নিকটে একটি বিমানঘাঁটিতে দায়িত্ব পালনের সময় রপ্ত করে নিয়েছিলেন) ঃ "আহ্‌লান, ইয়া রীস! শার্রাফ্‌তুল বেলাদ।" (প্রেসিডেন্ট, আপনাকে স্বাগত। আমাদের দেশকে আপনি ধন্য করলেন।) তাঁর প্রতি প্রেসিডেন্ট সাদাতের মনের দুয়াল খুলে গেল। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, ওয়াইজম্যান তাকে প্রায়শ "ইয়া রীস" বলেই সম্বোধন করতেন। যাক, ওয়াইজম্যান এসে প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প করতে লাগলেন, কীভাবে, ইসরাইল তাঁর আগমনের কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। কীভাবে তারা বিষয়টিকে এতটাই সন্দেহের নজরে দেখে যে, তারা ভেবেছিল এটা সব ইসরাইলী নেতৃবৃন্দকে হত্যার একটি ষড়যন্ত্র, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে তার কাছে একদল গেরিলা বাহিনী মোতায়েনের দাবি করা হয় যারা খারাপ কিছু দেখলে তৎক্ষণাৎ বিমানটি লক্ষ্য করে গুলি চালাবে। প্রেসিডেন্ট সাদাত হাসছিলেন আর ওয়াইজম্যান এই চমকে আরও অতিরঞ্জিত করে বলছিলেন যাতে তাঁর শ্রোতা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাত এ সময় ওয়াইজম্যানের কাছে অভিযোগ করেন যে, বেগিন আমাদেরকে অসংখ্য কাগজপত্রের ভিতর ডুবিয়ে রাখতে চান। কারণ বেগিন তাঁকে হোটেলে পৌঁছে দেবার পর প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁকে বলেন যে, তিনি তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে সেই চুক্তি পরিকল্পনার খসড়াটি নিয়ে এসেছেন যেটি কার্যকরের অনুরোধ তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এটা সাথে করে নিয়ে এসেছেন কারণ তার মতে, এটিই হচ্ছে আলোচনা শুরু করার একটি যৌক্তিক ভিত্তি। তিনি প্রস্তাব রাখেন যে, মোস্তফা খলীল ও উপ-প্রধানমন্ত্রী ঈগল আলোন তাঁর সাথে করে আনা এই খসড়া চুক্তিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য বসতে পারেন, এর ভিত্তিতেই সিরিয়াস আলোচনা শুরু হতে পারে। কিন্তু বেগিন বলেন যে, "আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের জন্য অনেক কাগজপত্র প্রস্তুত করে রাখা আছে। এগুলো উভয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেখেশুনে ঠিক করে নিতে পারেন।" বেগিনের কাগজপত্রাদি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রথম অভিযোগ শোনার পর ওয়াইজম্যান তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে বেগিনের সাথে কাজ করার কতগুলো চাবি তাঁকে দিয়ে বলেন, আমি তাঁকে অন্য যে কোন মানুষ থেকে বেশি বুঝি যদিও সে মূলত লেবার পার্টিরই লোক লিকুদের নয়। কিন্তু তিনি লেবার পার্টির প্রতি হতাশ হয়ে লিকুদে যোগ দেন এবং বেগিনের নির্বাচনী প্রচারণার তত্ত্বাবধানে থাকেন। এই নির্বাচনী প্রচারণার সফলতার বদৌলতেই বেগিন তাঁর জীবনে প্রথমবারের মতো ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন। অথচ তিনিই হচ্ছেন এই রাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিষ্ঠাতাদেরই একজন। ওয়াইজম্যান আরও বলেন, নির্বাচনী এই প্রচারণায়

সহযোগিতার ফলেই তার ও বেগিনের মধ্যে একটি সঠিক ও নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর প্রেসিডেন্টের প্রতি ওয়াইজম্যানের পরামর্শ ছিল যে, বেগিনকে এভাবে ধরে নেবেন যে তিনি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে একজন এ্যাডভোকেট তিনি যে কোন এ্যাডভোকেটের মত কাগজপত্র, ভাষ্য ও সূত্রকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কাজেই প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর প্রতি যেন কিছু বেশি ধৈর্য ধারণ করেন এবং আগে থেকেই মূল্যায়ন করে রাখেন যে, "বেগিন তার মতো দুঃসাহস ও সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনার অধিকারী নন।"

এবার ওয়াইজম্যান সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রেসিডেন্টের প্রতি প্রথম আবেদন জানান। তিনি জানতে চান, প্রেসিডেন্ট নেসেটে দেয়া ভাষণে 'ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার' উল্লেখ করবেন কি না। প্রেসিডেন্ট সাদাত এ প্রশ্ন করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ওয়াইজম্যান বলেন, "কারণ আপনি এটা করলে দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবেন।" যে সময় ওয়াইজম্যান প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে তাঁর প্রেসিডেন্সিয়াল প্লাজায় সাক্ষাৎ করছিলেন সে সময় ডেলিগেটের অন্য বড় বড় সদস্যগণ অনুভব করেন যে, আগামীকালের বৈঠকের পূর্বে প্রত্যেকের অবস্থানটা যাচাই করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, বেন গোরিয়ন এয়ারপোর্ট থেকে কিং দাউদ হোটেলে পৌঁছার সময়টুকুতে গাড়িতে বসে আলোচনা খুবই সামান্য ছিল।

এগুলো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতেই ডক্টর মোস্তফা খলীল সিম্হা এরলেখ–এর সাথে সাক্ষাতে যান। এভাবে ডঃ বুট্রস ঘালিরও দায়ানের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানী বৈঠকে বসা দরকার। আগামীকাল সকাল দশটায় মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পূর্বেই এটা হওয়া দরকার। ডক্টর মোস্তফা খলীল বলছেন— তিনি 'সিম্হা এরলেখ'কে একজন ইউরোপিয়ান হিসাবে পান। তিনি পোল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর সাথে কথা বলার সময় তিনি কোন মানসিক বা রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা আছে বলে অনুভব করেননি। দু'জনের মধ্যে কোন মানসিক বাধা ছাড়াই ১৫ মিনিটের উন্মুক্ত আলোচনার পর ডক্টর মোস্তফা খলীলের এ উপলব্ধি বেড়ে গেল যে, তিনি আল্-কুদ্স সফরের আগে যেমনটি ভেবেছেন, বিষয়টি কিন্তু তত সহজ ও সংক্ষিপ্ত নয়। বরং সূচনা থেকেই হরফের ওপর নোক্তা চড়িয়ে আসতে হবে। কারণ স্বাভাবিকভাবেই এই সফরের সময় হচ্ছে সীমিত অথচ এর কর্মসূচী হচ্ছে ভারাক্রান্ত, এদিকে এর সাথে ঝুলে আছে বিরাট প্রত্যাশা। পক্ষান্তরে জেনারেল দায়ানের সাথে ডক্টর বুট্রস ঘালির বৈঠকের খবর হচ্ছে 'ঘালি' চাননি যে, প্রথাগতভাবে দায়ান তাঁকে তাঁর প্লাজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তার পর ফিরে যান। বরং তিনি তাঁকে বলেন যে, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আগামীকাল প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকের প্রস্তুতি গ্রহণের দায়িত্ব তাদের দু'জনের ওপর

ন্যস্ত। বিশেষ করে আমাদের বিশেষজ্ঞগণ ইতোপূর্বে বৈঠকের আলোচ্যসূচী নির্ধারণে বসেননি। তাছাড়া আমরা যে কাগজপত্রের ভিত্তিতে কাজ শুরু কবর তাও সরাসরি আদান-প্রদান করিনি।

ডক্টর ঘালি দায়ানের নিকট ব্যাখ্যা করেন যে, এহেন উদ্যোগ গ্রহণ করতে প্রেসিডেন্ট সাদাতের মনে কত বড় সাহস সঞ্চার করতে হয়েছে। দায়ান বলেন যে, তিনি তা মূল্যায়ন করছেন। কারণ তিনি তাঁর জীবন ক্ষয় করে দিলেন আরব-ইসরাইলের সংঘাতে– যোদ্ধা ও রাজনীতিকভাবে। এ কারণেই তিনি মূল্যায়ন করতে পারেন যে, এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে কি ধরনের সাহস ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন। দায়ান এও উল্লেখ করেন যে, তিনি যখন রাবাতে হাসান তেহামীর সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন হাসান তেহামী তাঁকে বলেছিলেন– যতক্ষণ পর্যন্ত মিসরের একখণ্ড জমিও ইসরাইলের অধিকৃত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বেগিনের হাতের ওপর প্রেসিডেন্ট সাদাতের হাত রাখা সম্ভব নয়। দায়ান আরও বলেন যে, এ তো মাত্র দু'সপ্তাহের আগের কথা। তা সত্ত্বেও আমি আপনি একটি ঘণ্টা আগে উভয়ের মধ্যে করমর্দন হতে দেখলাম। এতে বোঝা যায়, প্রেসিডেন্ট সাদাত কত নমনীয়তায় বিভূষিত। আশা করি তিনি তা অক্ষুণ্ন রেখে যাবেন। বুট্রস ঘালি এই সুযোগ গ্রহণ করে বলেন— নমনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার আগে আপনাদের জানা দরকার যে, এ কারণে প্রেসিডেন্ট সাদাত আরব বিশ্বে কত বড় আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এমনকি মিসরেই বেশ কিছু শক্তিশালী পক্ষ রয়েছে যারা আল্-কুদ্সের এই সফরের ঘোর বিরোধিতা করছে।

সবাই তখন ফলাফলের অপেক্ষায়। এ অবস্থায় তার নীতির সঠিকতা সম্পর্কে সন্দিহান লোকদের সামনে যদি যথেষ্ট কিছু তুলে ধরা না যায় তাহলে এর ফল হবে খুবই বিরক্তিকর। বুট্রস ঘালির কথার জবাবে মন্তব্য করে দায়ান বলেন যে, তিনি যেটা বুঝেছেন তা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট সাদাত এ উদ্যোগ নিয়েছেন এ কারণে যে, তিনি জানেন, জেনেভা সম্মেলনে কোন আশা নেই। কারণ সিরীয় ও ফিলিস্তিনীরা শান্তির পথে এগুতে চায় না। এ কারণেই আরব বিশ্বে তার নীতির বিরোধিতার প্রতি খেয়াল না করাই প্রেসিডেন্ট সাদাতের উচিত। ডক্টর ঘালি বলেন যে, দায়ানের এ কথায় তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ আরব বিশ্বের সাথে মিসরের লিয়াজোঁ হচ্ছে একটি প্রাণময় বিষয়। প্রেসিডেন্ট সাদাতও এখানে কেবল একক মিসরী সমাধানের জন্য আসেননি। বরং তিনি প্রথমত সকল আরব ও ইসরাইলের মধ্যকার মানসিক বাধার দেয়াল ভেঙ্গে দেয়ার কথা মনে রেখেই এখানে এসেছেন। মনে হয় এ সময় দায়ান তর্কাতর্কিতে যাননি। যাতে আগামীকালের বৈঠকে ইসরাইলী ডেলিগেটের আলোচনা পরিকল্পনায় প্রভাব না পড়ে। দায়ান নেসেটে প্রেসিডেন্ট সাদাতের ভাষণের অগ্রিম

কপি চান। বুট্রস ঘালি জবাব দেন যে, ভাষণের খসড়া এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দায়ান ডক্টর ঘালিকে ছেড়ে যাবার আগে 'বন্ধু হিসাবে' একটি মন্তব্য রেখে যেতে ভুললেন না যে, তিনি আশা করেন নেসেটের সামনে প্রেসিডেন্ট সাদাত যে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন তাতে পিএলওর কোন উল্লেখ থাকবে না বলে আশা করেন। নইলে বেগিনের প্রতিক্রিয়ার কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে না।

এ ছিল আল্-কুদ্স সফরের প্রথম প্রহরে একই বিষয়ে দ্বিতীয় সতর্কবাণী। পরের দিনের বৈঠক নির্ধারিত সময় সকাল দশটায় অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ প্রেসিডেন্ট সাদাত মসজিদে আকসায় ঈদের নামাজ আদায় করতে গিয়েছিলেন। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে চেয়েও কিছু দেরি করেন। এর পর বেগিন সরাসরি প্রস্তাব করেন যেন তিনি (ফাদ ইয়াশিমের) হলকস্টের আত্ম-উৎসর্গীদের স্মৃতি ভবনটি পরিদর্শন করেন। এর পর উভয় প্রতিনিধি দল দুপুরে এক বৈঠকে মিলিত হন। বেগিন যার নাম রাখেন 'ওয়ার্কিং লাঞ্চ'। মিসরের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন তিনজন প্রেসিডেন্ট সাদাত, ডক্টর মোস্তফা খলীল ও ডঃ বুট্রস ঘালি। এদিকে ইসরাইলের পক্ষ থেকেও ছিলেন তিনজন ঃ প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন, তাঁর ডেপুটি ঈগাল ইয়াদীন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে দায়ান। বেগিন শুরুতেই প্রেসিডেন্ট সাদাতকে 'ইসরাইল ভূমি ও তার রাজধানী আল্-কুদ্সে' আসার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানান। এর পর আলোচনার দরজা উন্মুক্ত করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তরে বলেন যে, তাঁর ধারণা ইসরাইলী পক্ষ অবগত আছেন, কি উদ্দেশে তিনি এখানে এসেছেন। অনুরূপভাবে তারা সমাধানে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর মতামত ও শর্তাদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত আছেন। তিনি মনে করেন যে, তিনি প্রকাশ্য বিবৃতিতে যা বলেছেন এবং প্রেসিডেন্ট কার্টার ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যান্সের কাছে যে সব কাগজপত্র পেশ করেছেন তাঁর ওপর সংযোজন করার মতো নতুন কিছু নেই। তার আগের অবস্থানই এখনকার অবস্থান। তার এ উদ্যোগে তার সংলাপগত অবস্থানে কোন প্রভাব ফেলবে না। তবে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক বাধা দূর করা, যা প্রকৃতপক্ষে সমস্যার ৭০% দখল করে আছে। যখন বেগিন চুপ করে অপেক্ষা করছিলেন, তখন তাঁর ডেপুটি ঈগাল ইয়াদীন প্রেসিডেন্ট সাদাতের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আবেদন করেন। তিনি বলেন যে, তিনি আশা করেছিলেন– তাঁর কাছে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যকার শান্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুনবেন। এ পর্যায়ে ডক্টর 'মোস্তফা খলীল' ঈগাল ইয়াদীনের উত্তর দেন যে, এটা সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যে, প্রেসিডেন্টের এ সফরের লক্ষ্য ইসরাইলের সাথে কোন একলা চুক্তি করা নয়, এমনকি তার সাথে একাকী সংলাপ চালিয়ে যেতে চান না। বেগিন এতে বিরক্ত হয়ে যা বলেন, তার মূল কথা হচ্ছে "তাহলে এখানে এখন আমাদের বসার কি অর্থ হতে পারে ? আমি এই বৈঠকে প্রবেশের আগে

প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে প্রস্তাব রেখেছি যে, আমার ও তার অফিসের মধ্যে একটি সরাসরি ইট লাইন স্থাপন করা যায়। তিনি এতে কোন আপত্তি করেননি।" মোস্তফা খলীল বলেন যে, তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চান যে, "মিসর একলা কোন চুক্তি করার ইচ্ছা পোষণ করে না।"

এবার প্রেসিডেন্ট সাদাত আলোচনায় প্রবেশ করে এ আলোচনা কি সরাসরি না পরোক্ষ অথবা মিসর কি একলা চুক্তি চায় কি না চায় এ বাকবিতণ্ডা থেকে সরিয়ে এনে সমস্যার মূল স্রোতে আলোচনাকে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন যে, আনুষ্ঠানিকতা বা বাগাড়ম্বর তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তিনি মূল বিষয়কে প্রাধান্য দেন। তিনি এই চান না যে, এই সফরে তাঁর মেজবানের সাথে বিস্তারিত কাগজপত্রে ডুবে যান। বরং তিনি চান একটি সাধারণ কৌশলগত চুক্তি যা তাঁর এই ধরনের একটি ঐতিহাসিক কাজের সাথে সঙ্গতিশীল হয়।

বেগিন বলেন যে, তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত কি চাচ্ছেন। তিনি ভাবছেন যে, সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলীর জন্য সুনির্দিষ্ট কাগজপত্র প্রয়োজন। এ সব কাগজপত্রে বিস্তারিত বিবরণ থাকে, কিভাবে তা বাস্তবায়িত হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। এবার দায়ান বলে ওঠেন যে, কিছু সুবিদিত সমস্যা রয়েছে যেমন ফিলিস্তিনের সমস্যা, সিনাই, গোলান ও জর্ডান নদীর পানি সমস্যা। এখন প্রেসিডেন্ট কি তাঁর সফরে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে চান না কি অন্য কিছু ? আমাদের এমন কিছু স্থায়ী যোগাযোগ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে– যাতে সব সময় যোগাযোগ ও আলোচনা করা যায়। সেটা কি আলোচ্য বিষয় হতে পারে ? প্রেসিডেন্ট সাদাত সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, তিনি কাগজপত্রে ডুবে যেতে চান না, কোন ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে চান না বরং তিনি ইসরাইলের কাছে শোনতে চান যে, তার জন্য কি কি প্রদান করতে প্রস্তুত রয়েছে।

বেগিন জানতে চায় যে, প্রেসিডেন্ট এ কথা দ্বারা কি বোঝাতে চান ? এর পর বলেন যে, তিনি আলোচনা বলতে যা বোঝেন এতে এমন কিছু নেই যে, এক পক্ষ কিছু প্রদান করবে আর অন্য পক্ষ কেবল তাকে দেয়া বিষয় গ্রহণ করবে। বরং আলোচনা নিজ গতিতে প্রতিটি পক্ষই কিছু দেবে—কিছু নেবে। ওয়ার্কিং লাঞ্চ দ্রুতই শেষ হয়ে যায়। কারণ নেসেটে প্রেসিডেন্ট সাদাতের পরিদর্শন ও ভাষণের সময় নির্ধারিত ছিল বিকাল চারটায়। এটাকে পিছানো সম্ভব নয়। দায়ান তাঁর স্মৃতিকথায় মন্তব্য করেন যে, তাঁর অনুভূতিতে জাগে যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত বুঝি এমন ভাবছেন যে, তিনি কিছুক্ষণ পর নেসেটে গিয়ে কতগুলো প্রস্তাব সংবলিত তাঁর ভাষণ দেবেন এবং সাথে সাথেই নেসেটে ভোটাভুটি হয়ে তা পাস হয়ে যাবে। উভয় পক্ষ ওয়ার্কিং লাঞ্চ থেকে বের হয়ে যাবার সময় প্রেসিডেন্ট সাদাত বেগিনের কানে কানে বললেন, তিনি বৈঠকে দায়ান যে আলোচনার একটি ধারা হিসাবে সিনাইয়ের উল্লেখ করলেন

এর অর্থ বুঝতে পারেননি। তার ধারণায় রাবাতে হাসান তেহামীর সাথে তাঁর (দায়ানের) বৈঠকের সময় এ বিষয় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। বেগিন হতভম্ব সুরে বলেন, দায়ান তো ঐ বৈঠকের পর আমার নিকট পেশ করা রিপোর্টে এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেনি। তাছাড়া মূলত এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দায়িত্বও দেয়া হয়নি। প্রেসিডেন্ট সাদাতের মধ্যে উষ্মা প্রকাশ পেল, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কিন্তু কথা বাড়াবার সময় নেই। কারণ প্রেসিডেন্ট তখন প্রথমে হোটেলে ফিরে গিয়ে পোশাক পাল্টাতে চান, তারপর নেসেটে দুনিয়াজোড়া টেলিভিশনের সামনে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নেবেন। বুট্রস ঘালির নিকট দায়ান চাইলেও নেসেটের সামনে প্রেসিডেন্ট সাদাতের ভাষণের অগ্রিম কপি ইসরাইলী পক্ষ লাভ করেনি। কারণ প্রেসিডেন্ট সাদাত চেয়েছিলেন যে, নেসেটের সামনে দেয়া তাঁর ভাষণটি যেন সকলের কাছেই নতুন হয়। যার মধ্যে ইসরাইলী সরকারের প্রধান ও সদস্যগণও থাকবেন। ঠিক নির্ধারিত সময় প্রেসিডেন্ট সাদাত দাঁড়িয়ে নেসেটে তার সেই বিখ্যাত ভাষণ দেন। সাধারণ বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যা বলেন, তা হচ্ছে তিনি ইসরাইলী জাতির সামনে পূর্ণ আরব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। আর সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তিনি এ বিষয়টি জোর দিয়ে বলেন যে, মিসর ১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত সকল আরব ভূখণ্ড থেকে পরিপূর্ণ ইসরাইলী প্রত্যাহার চায় এবং ফিলিস্তিন সমস্যাই হচ্ছে সংঘাতের মূল আর সেটাই হচ্ছে সমাধানের শুরু। সাদাতের ভাষণের জবাব দেয়ার জন্য বেগিন দাঁড়ালেন। তিনি এতক্ষণ তাঁর অতিথির ভাষণ শুনছিলেন আর দৃষ্টি আকর্ষণীয় পয়েন্টগুলো কলমের আঁচড়ে সাথে সাথে লিখে রাখছিলেন। বেগিনের বক্তৃতাটি ছিল যথার্থই একটি বিপর্যয়। মনে হচ্ছিল যে, তিনি দৃঢ়ভাবে তাই চাচ্ছিলেন। কারণ তিনি ওয়ার্কিং লাঞ্চের সময় প্রেসিডেন্ট সাদাতের কথাতে আঁচ করেছিলেন যে, "তিনি তাঁর এ উদ্যোগের জন্য হাদিয়াস্বরূপ একটি ইসরাইলী অফারের অপেক্ষা করছেন।" বেগিনের এটাও সন্দেহ হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত চাচ্ছেন নেসেটের মঞ্চ থেকে তথা ইসরাইলী সরকারের মাথার ওপরে থেকে তিনি বিশ্বজনমতের নিকট কথা বলবেন। এভাবে বেগিন প্রেসিডেন্ট সাদাতের জবাবে তার সুপরিচিত সব কয়টি কঠোর অবস্থানকে পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর বলেন– "কেউ কিছু না দিয়ে কিছু গ্রহণ করতে পারে না।" বেগিনের বক্তৃতাটি ছিল মিসরের প্রতিনিধি দলের ওপর পাহাড় থেকে পড়া পাথরের মতো। যদিও প্রেসিডেন্ট সাদাত শান্তভাব দেখিয়ে তাঁর অবয়বকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দেখে মনে হলো যে কোন সময় তাঁর মেজাজ আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে।

ভাষণের পর আনুষ্ঠানিক নৈশ-ভোজ ছিল। মিসরীয় প্রতিনিধি দলের কোন কোন সদস্য অনুভব করলেন যে, এত ভোজ সভা নয়, এ হচ্ছে শোক সভা। দেখা গেল পুরোটা সময় ধরে প্রেসিডেন্ট কপালে হাত রেখে চুপচাপ চিন্তায় ডুবে ছিলেন। মনে হচ্ছে যেন, তিনি বহুদূর যাচ্ছেন। একমাত্র ব্যক্তি যিনি সভায় থমথমে ভাবকে দূর

করতে চেষ্টা করেন তিনি হচ্ছেন– আজরা ওয়াইজম্যান। তিনি তার জন্য কিছু কিছু মিসরীয় চুটকি বলছিলেন।

কিন্তু পরিস্থিতি কথা বলতে বাধ্য করে, যখন দায়ান বলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আসা একটি মন্তব্য সূত্রে জানতে পারেন যে, তিনি নাকি রাবাতে মিস্টার হাসান তেহামীর সাথে বৈঠকের সময় শর্তহীনভাবে সিনাই থেকে ইসরাইলী প্রত্যাহারের বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি সকলের সামনে স্পষ্ট করে বলতে চান যে এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে কেবল হাসান তেহামীর সকল কথাবার্তা, মনোযোগ দিয়ে শোনেন, পরে এর ওপর মন্তব্য করেন যে, "সব কিছুই আলোচনাযোগ্য।" এখনও এটাই ইসরাইলী অবস্থান। কিন্তু আলোচনার জন্য প্রস্তুতির অর্থ তো প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নয়।

এ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত জরুরী। এর যথার্থতা যাচাই করাও ছিল জরুরী। যখন ডক্টর মোস্তফা খলীল ও ডঃ বুট্রস ঘালি দায়ানকে নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন তখনও দায়ান তাঁর অবস্থানে অবিচল থাকেন যে, তিনি কোন ওয়াদা করেননি, কোন ওয়াদা করার দায়িত্বও তিনি পাননি। তাছাড়া এ বিষয়ে আসলে কোন আলোচনাই হয়নি। এ ব্যাপারে মরক্কোর বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। তিনি বৈঠকের অধিকাংশ সময় উপস্থিত ছিলেন। তদুপরি তিনি নিশ্চিত যে, মরক্কোবাসীদের কাছে এর টেপ রেকর্ড আছে। আরও বলেন যে, "অন্যদের কাছেও আছে।" এ ইঙ্গিত ব্যাখ্যাযোগ্য– স্পষ্টভাবে স্বীকার না করলেও বোঝা যায় যে হাসান তেহামীর সাথে দায়ানের বৈঠকের সময় তাঁর কোন সহকারী গোপনে সভার কথার্বাতা রেকর্ড করেন। দুঃখজনকভাবে দায়ানকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করায় তিনি পষ্টাপষ্টি বলে ফেলেন– "যদি এখন যা শুনলাম তা তেহামী–আমি বলেছি বলে থাকেন তাহলে আমার ভয় হচ্ছে আমি তাঁকে মিথ্যুকে বলতে বাধ্য হব।"

এবার প্রেসিডেন্ট সাদাত চরমভাবে হতাশ হলেন। তিনি আফসোসের সুরে বলেন–"মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বেগিনের সাথে আসন্ন সংবাদ সম্মেলনে আমার ব্যর্থতা ঘোষণা দিয়ে কায়রো ফিরে যাবার কথা ছাড়া আর বলার কিছুই থাকবে না।" সে রাতে ডিনারের পরে কেউ ঘুমাননি। ডক্টর মোস্তফা খলীল প্রস্তাব করলেন যে কিং দাউদ হোটেলে তাঁর উইংয়ে উভয় ডেলিগেটের কিছু দায়িত্বশীল কিছু সময়ের জন্য বসতে পারেন। কারণ এত উচ্চ পর্যায়ে এমন একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগকে বন্ধ পথের মাথায় এসে যাত্রা শেষ করতে দেয়া যায় না। তখনই আজরা ওয়াইজম্যান, সিম্‌হা এরলেখ ও ঈগাল ইয়াদীন ও বুট্রস ঘালি তাঁর উইংয়ের দিকে গেলেন। আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল পরিস্থিতিকে উদ্ধার করা এবং এই উদ্যোগকে নষ্ট হতে না দেয়া। শুরুতেই ডক্টর মোস্তফা খলীল এভাবে কথা পাড়লেন যে, উভয় পক্ষ এর পূর্বে কখনও বৈঠক করেনি। এ দিকে সন্দেহ আর সংশয়ে বেশ ভারি উত্তরাধিকার পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া রয়েছে স্মারক আর প্রস্তাবাবলীর আকারে টনকে টন

কাগজপত্র। এছাড়াও রয়েছে নানা ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও মানসিক বিষয় যা সংঘাতের ভিটাকে আরও ভারাক্রান্ত করে রাখছে– এ রকম একটা পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে কয়েক ঘণ্টার একটি সফরই যথেষ্ট নয়। আবার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে এই সফরের মূল্যায়নে আঁচড় লাগাও উচিত হবে না। কারণ এর ভিতর কি ঘটছে তার প্রতি নজর না করেও এরকম একটা ঘটনা ঘটাই এর মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট। এটা ঠিক যে, আজ নেসেটে দেয়া প্রধানমন্ত্রী বেগিনের ভাষণ সবাইকে জানান দিয়ে গেলে যে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গভীর ভিন্নতা রয়েছে। তবে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে–এই বিরাট সূচনাকে কিভাবে অমলিন রাখা যায়, তারপর এখান থেকে পথ বের করে প্রধান প্রধান ইস্যু ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখা যায় ?' এরপর ডক্টর মোস্তফা খলীল শান্তির অন্বেষায় প্রেসিডেন্ট সাদাতের আকুল আগ্রহের কথা বলতে লাগলেন। বললেন প্রেসিডেন্ট বাস্তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যত সম্ভব সব কিছু করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

এ পর্যায়ে আলোচনা বেশ দীর্ঘ হয় এবং নানা ডালপালা বিস্তার করে। রাত আড়াইটায় সবাই যখন ক্লান্ত, তখন ওয়াইজম্যান বলেন, তিনি বৈঠকের সূচনায় ডক্টর খলীলের কাছে শুনেছেন, প্রেসিডেন্ট সাদাত শান্তির জন্য আকুল প্রয়াসী এবং এর বাস্তবায়নে সম্ভব সবকিছু করার জন্য প্রস্তুত আছেন। এতে তিনি বুঝেছেন যে ঃ

১. শান্তি পরিকল্পনা এমন একটি বিবেচনা যা থেকে ফেরার কোন পথ নেই।

২. শান্তিতে পৌঁছতে হলে এর উপায়-উপকরণকে কার্যত খোঁজে বের করতেই হবে।

তবে ডক্টর মোস্তফা খলীলের প্রতি সম্মান রেখেও বলতে হয় যে, সুনির্দিষ্ট ভাষা এ শব্দবিন্যাসে ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছ থেকে শোনার প্রয়োজন রয়েছে।

সকাল ৬টায় ডক্টর মোস্তফা খলীল সাদাতকে ঘুম থেকে ওঠালেন। তিনি তাঁর ওখানে বসে ফজর পর্যন্ত যে সব আলোচনা হয়েছে তা বিস্তারিত জানান। এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাতও একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। তিনি যে হুমকি দিয়েছেন, যে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন তাঁর উদ্যোগের ব্যর্থতার ঘোষণা দিবেন বাস্তবে তা করতে পারেন না। তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে। কাজেই আলোচনার দরজা আরেকটি সুযোগের জন্য খোলা রাখার উদ্দেশ্যে যে কোন প্রয়াসকে কবুল করে নিতে হবে।

এ প্রেক্ষাপটেই পরের দিন সকালে তিনি বেগিনকে জানালেন, তিনি তাঁকে অচিরেই মিসর সফরে আমন্ত্রণ জানাবেন, খুব সম্ভব ইসমাইলিয়ায়। সেখানে বসে আলোচনা চালিয়ে যাবেন। বেগিন উত্তরে জানান যে, তিনি কায়রোতে আমন্ত্রণ লাভের অপেক্ষায় ছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখবেন, যেমনটি তিনি ইসরাইলের রাজধানী সফর করে নেসেটের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

॥ ৩॥

টেলিভিশন

"আমি এমন কিছু একটা খোঁজছিলাম যা তরঙ্গ সৃষ্টি করবে।"

—মোশে দায়ানের প্রতি আনোয়ার সাদাত।

প্রেসিডেন্ট সাদাত আল্-কুদ্স থেকে কায়রো ফিরে গিয়ে দেখেন, তাঁর জন্য বিপুল সংবর্ধনা অপেক্ষা করছে। যদিও মিসরের অনেকেই নেসেটের অধিবেশন কক্ষ থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত বেগিনের বক্তৃতা শুনেছিলেন, একনাগাড়ে পুরো ৪৮ ঘণ্টাই মিসরী টেলিভিশন এই অবিশ্বাস্য ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাঁদের লেন্স তাক করে রেখেছিল। তবুও তারা বেগিনের সেই অপয়া বক্তৃতা শোনেও তাদের ওপর এই সফরের প্রভাবকে হারায়নি।

মোট কথা, এই সফরের প্রতিটি প্রহরজুড়ে মিসরী জাতির মধ্যে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া আর প্রভাব দেখা দিয়েছিল তার নিরিখে জনগণের সাধারণ মানসিকতাকে অধ্যয়ন করার জন্য একটি বিষয় হওয়ার দাবি রাখে। কারণ এসব অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার আর চার্জ শক্তির কবলে পড়েছিল ঃ যখন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে তিনি আল্-কুদ্সে যাবেন এবং নেসেটের সামনে ভাষণ দেবেন, তখন সাধারণ অনুভূতি ছিল অস্বীকার আর অবিশ্বাসের। আবার যখন তার কয়েকটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মনে হলো যে, তিনি যা বলেছেন তা ঠিকই করবেন এবং তিনি আল্-কুদ্সে যাচ্ছেন, তখন জনগণের অনুভূতি ছিল এ যেন এক দুঃসাধ্য অভিযাত্রার চ্যালেঞ্জ।

যখন প্রেসিডেন্ট সাদাতের বিমানটি ঠিক আল্-কুদ্সে পৌঁছে গেল এবং দেখা গেল যে ইসরাইলী নেতৃবৃন্দ তাঁর অভ্যর্থনায় বেন গোরিয়ন এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে তখন সাধারণ অনুভূতি ছিল যেন তিনি এমন এক বিস্ময়কর অজানা জগতে প্রবেশ করছেন যাতে এর আগে কেউ যায়নি। যেন এ জগতের সকল বাসিন্দা হচ্ছে এক ধরনের দেওদানব, যাদের কথা শোনা যায়, দেখা যায় না। এ ছিল এক ধরনের থ্রিলিং! যখন প্রেসিডেন্ট সাদাত নেসেটের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং তাঁর বক্তব্য ছিল চলমান সংঘাতে মিসর ও আরব বিশ্বের অবস্থানেরই যুক্তিপূর্ণ ভাষ্য তখন সাধারণ অনুভূতি ছিল এরকম যে, এই বক্তব্য সত্যিই সকলেরই বক্তব্য। যখন প্রেসিডেন্ট তাঁর আল্-কুদ্সের অভিযাত্রা শেষ করে ফিরলেন তখন সকলের উপলব্ধি

ছিল যেন তারা এই ঘটনার অংশীদার এবং এই দায়-দায়িত্বেরও অংশীদার। অস্থায়ীভাবে হলেও এসব কিছু মিলিয়ে মনের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিল। মানুষ পূর্ববর্তী দশকগুলো ধরে যে ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস লালন করে আসছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্যকে গ্রহণের বেলায় পরিবর্তন সূচিত হলো। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রেসিডেন্ট সাদাত নিজেও ইসরাইলে মূল সমস্যাগুলো আবিষ্কার করার পরেও কায়রোতে ফিরে নিজেকে আশাব্যঞ্জক অনুভূতিতে সপে দিলেন, যার কোন হেতু খোঁজে পাওয়া ভার।

প্রেসিডেন্ট সাদাত আল্-কুদ্স থেকে ফেরার পর অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক অনুভূতি প্রকাশ করেন। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, তিনি লেখক অধ্যাপক আহমদ বাহাউদ্দিনকে তাঁর সাক্ষাতে ডেকে নিয়ে মুখে বিরাট হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন–এখন কি করার চিন্তা-ভাবনা করছেন ? বাহাউদ্দিন অপ্রস্তুত হয়ে এর অর্থ জানতে চাইলেন। তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তর করলেন "কারণ আপনি ও অন্য লেখকরা এখন হঠাৎ করেই বেকার হয়ে গেলেন। আপনারা বহুদিন থেকে আরব-ইসরাইল সংঘাত নিয়েই ছিলেন, এখন তো এই সংঘাত শেষ হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে ওই সকল বিষয়ও ফুরিয়ে গেল, যেগুলো ছাড়া আপনারা আর কোন বিষয় লিখতে জানেন না।" সাদাত আরও বলেন যে, "তিনি এখন রাজনৈতিক লেখকদের জন্য শোক প্রকাশ করছেন।" কিন্তু 'বাহাউদ্দিন' আরব-ইসরাইল সংঘাত শেষ, এই কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে পাল্টা প্রশ্ন করেন– 'তাহলে তারা কি সিনাই ছেড়ে চলে যাবে ? প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তর দিলেন– আত্মপ্রত্যয়ের সাথে কিছুটা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে– "অবশ্যই, আপনি কি ভেবেছেন, সিনাইয়ের বিষয় সুরাহা না হলে আমি সেখানে যাব ?" বাহাউদ্দিন তখন পশ্চিম তীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তর দেন ঃ ওই ব্যাপারটা নিশ্চিত। সাংবাদিকতার বাহুল্য বাড়াতে বাড়াতে তিনি আবার প্রশ্ন করেন ঃ "আর আল্-কুদ্স ইয়া রেস!" প্রেসিডেন্ট সাদাত হাসলেন। তারপর বললেন– "আরে বাহা, নিশ্চিন্ত থাকুন, আল্-কুদ্স তো আমার পকেটেই!"

বাহাউদ্দীন প্রেসিডেন্টের বাসভবন থেকে বের হয়ে সোজা মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের অফিসে গিয়ে এই রোমাঞ্চকর সংলাপের ঘটনা বর্ণনা করতে লাগলেন। উভয়ে পুরো দু'ঘণ্টা এক সাথে বসে হতভম্বের মতো এই সফরের মূল্যায়ন করছিলেন। সাদাত কি বলছেন আর সফরের ভিডিও ছবিতে কি দেখা গেল, আর সংবাদ সংস্থাগুলোই বা কি ধরনের রিপোর্ট আর বিবরণ দিচ্ছে।

আরব রাজধানীগুলোতে নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক এবং নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে বিপজ্জনক বিভক্তি দেখা দেয়। সাধারণভাবে আরব জনগণ এ উদ্যোগে ক্রুদ্ধ হয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মিসরের প্রেসিডেন্টের আল্-কুদ্স সফরে তারা

প্রকৃতই বেদনাহত হয়েছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি হচ্ছে, আরব জাতির গণমানুষের বিরাট অংশ প্রেসিডেন্ট সাদাতের আল্-কুদ্সে যাবার প্রস্তুতি ও নেসেটের সামনে কথা বলার বিষয়টি আদৌ বিশ্বাসই করতে পারেনি। তারা ধরে নিয়েছিল যে, তাঁর এ ঘোষণা ছিল একটি বিপজ্জনক রাজনৈতিক মহড়া যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসরাইলকে বিব্রত করা। কিন্তু যখন ঠিকই প্রেসিডেন্ট সফর করলেন তখন আরব জনসাধারণ, জ্ঞানের আগে অনুভূতি দিয়েই উপলব্ধি করেন যে, এটা হচ্ছে শুধুমাত্র একক মিসর-ইসরাইলী সমাধানের সূচনা।

শাসক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কেউবা কট্টর পন্থা অবলম্বন করল, কেউ তো ফের অক্ষম অথবা নীরব ভূমিকা পালন করে অপেক্ষা করতে লাগল ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয় ঃ

—প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি (কায্যাফী) ত্রিপলীতে একটি জরুরী সভা আহ্বান করে প্রেসিডেন্ট সাদাতের আচরণকে নিন্দা জানান এবং তার এহেন কাজকে 'বিরাট খেয়ানত' হিসাবে ঘোষণা করেন। তিনি আরব লীগের কায়রো থেকে স্থানান্তর করারও দাবি জানান। এটাই ছিল– যাকে বলে "প্রতিরোধ ফ্রন্ট"-এর সূচনা। এ ফ্রন্টের কাজ ছিল কেবল প্রত্যাখ্যান করা, প্রকৃত কোন কাজের পরিকল্পনা ছিল না এদের। কাজেই এ ফ্রন্টের ভূমিকাকে বড়জোর বলা যায় নিষ্ফলা বন্ধ্যা ভূমিকা।

—উপসাগরীয় কিছু আমির শাসিত দেশে ছিল প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাজে চাপা স্বস্তি। কারণ বহু শেখ ক্রমেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ নেয়াকে আশঙ্কার চোখে দেখছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, আরব-ইসরাইল সংঘাত হচ্ছে এইসব জাতীয়তাবাদের শক্তি বিস্ফোরণের একটি উছিলা এবং সাধারণ আরব পরিস্থিতিতে বিপ্লবের শিখাকে উস্কে দেয়ার একটি বড় আবেগ। এ সকল শেখ ঘটনার ওপর নজর রেখে যাচ্ছিলেন নিঃশব্দে। এতে আনন্দিত ছিলেন, নিজেদের একান্ত জলসায় এই পুরুষটির সাহসের কথা আলোচনা করতেন কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁর পদক্ষেপের সমর্থন জানাবার মতো সাহস ছিল না।

—একটি মহল আবার এই উদ্যোগে হতবাক হয়ে যায়। তারা ভেবেছিল যে, নিশ্চয়ই এ ঘটনার আগে-পিছে কিছু আছে। এদের মধ্যে ছিলেন আলজিরীয় প্রেসিডেন্ট 'হুয়ারি বুমেদিন' যিনি বাদশাহ খালেদের নিকট একথা বলে পাঠান যে, "আমরা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের এ উদ্যোগের সফলতা নিয়ে সন্দিহান, তবে যদি তার উদ্যোগ আরব দাবি-দাওয়া পূরণে সফল হয় তাহলে আমি কায়রোতে গিয়ে তার সামনে এবং সকল মানুষের সামনে এ কথা ঘোষণা করতে প্রস্তুত যে, আমি ভুলে ছিলাম। আর যদি এ উদ্যোগ বিফল হয় এবং এ থেকে ফিরে আসার সাহস প্রেসিডেন্ট সাদাতের থাকে তাহলেও আমি কায়রোতে যাব। আমি একক আরব এ্যাকশনের নতুন পর্যায় শুরু করার খেদমতে আলজিরিয়ার সকল সামর্থ তার এখতিয়ারে নিবেদন করার জন্য।"

এদিকে ইসরাইলের সাধারণ লোকদের মধ্যে একটা সুখের অনুভূতি এনে দিল। কিন্তু ইসরাইলী নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাজ করছিল একটি হতভম্বতার অনুভূতি। বিশেষ করে যাদের আল্-কুদ্সের বৈঠকগুলোতে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল।

কারণ ইসরাইলী নেতৃত্ব অনুভব করেছিল যে, তারা কিছু ঝুলন্ত প্রশ্নের সম্মুখীন এর উত্তর দেয়া চাই ঃ

১. আসলে ঠিক কি জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাত এ সফরে এলেন ?

২. এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট সাদাত কিসের অপেক্ষায় আছেন ?

৩. বিশ্ব কি আশা করছে– বিশেষ করে, এরপর ইসরাইলের কাছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কি প্রত্যাশা করছে ? প্রথম প্রশ্নের ব্যাপারে অর্থাৎ এই সফরে প্রেসিডেন্ট সাদাতের আগমনের উদ্দেশ্য কি, এর ব্যাখ্যা, তার বিশ্লেষণের উপায়-উপকরণের বিভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্নভাবে এসেছে। গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্লোমো গ্যাজেটকে দায়িত্ব দেয়া হলো যে এ সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা উপ-কমিটিতে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে যেন একটি পেপার প্রস্তুত করেন। এই কর্মপত্রটি প্রস্তুতে জেনারেল শ্লোমো গ্যাজেট নানা ধরনের সূত্রের ওপর নির্ভর করেন। এই সফর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল সবই এই কর্মপত্রে স্থান পায়। পত্র-পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে অথবা কায়রোতে ইসরাইলী গোপন দালালরা যা খবর দিয়েছে সবই এতে ছিল। এর ভিতর এই সফর সম্পর্কে আরব বিশ্ব বা বিশাল বহির্বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় যে সব বিশ্লেষণ ও মন্তব্যধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়েছিল সবই ছিল। শ্লোমো গ্যাজেট এর সাথে যোগ করেন তাঁর অধীনে থাকা গোপন রেকর্ডিংয়ের সব ক্যাসেট। এইসব অডিও ক্যাসেটে ছিল কিং দাউদ হোটেলের কক্ষগুলোতে, উইংয়ে, সভাকক্ষে বিনোদন এলাকায় এমন কি আলাদা গাড়িতে মিসরের ডেলিগেশন নিজেদের মধ্যে কি কি কথাবার্তা বলেছিলেন সবই। এছাড়াও তাঁর অধীনে ছিল— সভাগুলোতে অংশগ্রহণের সময় মিসরী আলোচকরা যে সব কথাবার্তা বলেছেন তার শব্দতরঙ্গের বিশ্লেষণ, এগুলোতে তাদের আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার যে মাত্রা পরিমাপ করা হয় তা ছিল সত্য আর মিথ্যার মিশ্রণ।

অনেক কারণ পর্যালোচনার পর তারা তিনটি বিষয়কে শনাক্ত করেন যা প্রেসিডেন্ট সাদাতকে আল্-কুদ্সের পথ ধরতে প্রভাব ফেলেছিল ঃ

১. মিসরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। কারণ ওখানে তখন একদিকে ছিল অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, অপরদিকে সমাজের বুকে এমন একটি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে যারা দ্রুতই এ ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে চায়। অন্তত পক্ষে তারা এমন একটি পরিস্থিতিকে পেতে চায় যাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা না থাকে।

২. প্রেসিডেন্ট সাদাত জেনেভা সম্মেলনের মাধ্যমে সমাধান হওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালে কিসিঞ্জার যে দ্বিতীয় লিয়াজো ছিন্ন চুক্তি

পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। বরং সমাধান প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবার দাবি ছিল তাঁর ওপর। এদিকে সোভিয়েতের প্রতি অপছন্দ আর অন্যান্য আরব পক্ষের প্রতি সন্দেহের কারণে তিনি জেনেভার পথ মাড়াতে চাননি। যখন জেনেভার পথ বন্ধ, তখন অন্য পথ তো খুলতেই হবে।

৩. প্রেসিডেন্ট সাদাতের আসল উদ্দেশ্য ছিল—বিশ্বজনমত, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে শক্তিশালী জনমত সৃষ্টি করে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। তিনি তাঁর এ পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্ভব সর্বোচ্চ নাটকীয় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। জেনারেল দায়ানের মন্তব্য ছিল যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত সেক্ষেত্রে সফলই হয়েছেন। এর প্রমাণ, প্রেসিডেন্ট কার্টার তাঁর আল্-কুদ্স সফরকে তুলনা করেছেন চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম মানব অবতরণের সাথে। অনুরূপভাবে জেনারেল শ্লোমো গ্যাজেট দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, আল্-কুদ্সগামী প্রেসিডেন্ট সাদাতের বিমানটি সে সময়কার সবচেয়ে উজ্জ্বল তিন টিভি তারকাকে বহন করে নিয়েছিল। এঁরা হচ্ছেন ওয়াল্টার ক্রংকেট, CBS স্টার, বারবারা ভোল্টার্স, ABC স্টার ও জন চ্যান্সেলর, NBC স্টার। গ্যাজেট আরও বলেন যে, বারবারা ওয়াল্টার আল্-কুদ্সেই ছিলেন, তিনি মেনাহেম বেগিনের সাক্ষাৎকার, নিচ্ছিলেন। কিন্তু একটি মিসরী বিশেষ বিমান আল্-কুদ্সে পৌঁছে তাঁকে ইসমাইলিয়ায় নিয়ে যায়, এ ছিল প্রেসিডেন্ট সাদাতের আল্-কুদ্স সফরের মাত্র তিন ঘণ্টা আগের ঘটনা। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন তিনি তাঁর সাথে বিমানের অন্যতম আরোহী হিসাবে থাকতে পারেন এবং তাঁর পিছনে পিছনে ইসরাইলের রাজধানীতে আগমনকারীদের একজন হিসাবে থাকতে পারেন। ইসরাইলী নেতৃবৃন্দ সব সময়ই একটি প্রশ্ন মাথায় রেখেছিলেন যে, আসলে কী কারণে প্রেসিডেন্ট সাদাত আল্-কুদ্স সফরে এসেছিলেন ? মোশে দায়ান তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ–Breakthrongh-তে লেখেন ঃ সব সময় আমার একটি ভাবনা ছিল যে, সুযোগ পেলে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাদাতকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। আর নিজ কানে তাঁর জবাবটি শোনব। তাঁর আল্-কুদ্স সফরের বছর দেড়েক পরে আমার সে সুযোগ এসে গেল। এটা ছিল ১৯৭৯ সালের ৪ জুন, ইসমাইলিয়াতে— যখন মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। আমার সাথে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাক্ষাতের সময়ক্ষণ পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল না। কারণ আমি কায়রোতে এসেছিলাম ডক্টর মোস্তফা খলীল ও ডক্টর বুট্রস ঘালির সাথে সাক্ষাৎ করে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে জানার জন্য। এরপর বুট্রস ঘালি আমাকে জানালেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত আমাকে দেখতে চাচ্ছেন। তিনি এখন ইসমাইলিয়ার আছে। সেখানে যাবার জন্য একটি বিমান আমাদের অপেক্ষা করছে। এক ঘণ্টা ওড়ার পর তাঁর সান্নিধ্যে গেলাম। তখন তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ও বুট্রস ঘালি। সাক্ষাতের শুরুতেই প্রেসিডেন্ট সাদাত আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"এ স্থানটি চেনেন ? আমি জবাব দিলাম; হ্যাঁ, আমি এটাকে অন্যদিক থেকে দেখেছি।" এরপর আমরা চুক্তি সম্পর্কে আলাপ করি। তিনি বলেন যে, তিনি এটা বাস্তবায়নে পূর্ণ দায়িত্বশীল। যখন হোসনি মোবারক ও বুট্রস ঘালি তাঁর এত উচ্ছ্বাসকে খানিকটা লঘু করতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁদেরকে চুপ করিয়ে দেন। এ সময় আমি আমার প্রশ্ন করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমি কথাটা পেড়ে তাঁকে বললাম ঃ 'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আমাকে একটু খুলে বলুন তো আপনি আল্-কুদ্সে গিয়েছিলেন কেন ? মনে হলো প্রেসিডেন্ট সাদাত আমার এ প্রশ্নে বেশ খুশি হলেন। তিনি আমার প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আমি আপনাকে কাহিনীটি প্রথম থেকে বলি।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত বেশ জাঁকিয়ে বসে তাঁর উপাখ্যানের বিস্তারিত বলতে লাগলেন ঃ

একেবারে প্রথমে, যখন সবেমাত্র বেগিন প্রধানমন্ত্রী হলেন, আমার বিশ্বাস ছিল না যে, তিনি শান্তি স্থাপনে আগ্রহী। কিন্তু আমি রুমানিয়া সফরের সময় চচেস্কুকে দু'টি প্রশ্ন করেছিলাম ঃ বেগিন কি দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো শক্তিশালী ? তিনি কি তাঁর শান্তির আগ্রহে আন্তরিক ? চচেস্কু আমাকে উভয় প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেন। তিনি আমাকে বলেন যে, "তিনি সম্প্রতি বেগিনের সাথে ছয় ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠক করেন। এতে তাঁর মনে হয় যে, তিনি শক্তিশালী ও আন্তরিক।"

আমি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বললাম যে ঃ 'কিন্তু আল্-কুদ্স সফরের চিন্তাটি কখন আপনার মধ্যে এল ?" প্রেসিডেন্ট সাদাত বললেন, "আমি যখন বুখারেস্ট থেকে তেহরানের পথে তুর্কিস্তানের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় আমি এমন কিছু খুঁজছিলাম যা একটা বিজলীর শক তরঙ্গ (Shock Wave) সৃষ্টি করতে পারে। আমি ভাবলাম, আমাদের ইসরাইলী চাচাতো ভাইয়েরা সব সময় বলে আসছেন যে, তাঁদের সাথে আমাদের সমস্যাটা নাকি নিরাপত্তার সমস্যা। বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ আমাদের সাথে বসে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা ধরে কেবল ইসরাইলী নিরাপত্তার সমস্যার সমাধানই খোঁজেন। তাই আমি মনে মনে ভাবলাম যে, ভাল হয়, আমরা ও ইসরাইলীরা বসে নিজেরাই কিছু করি। মোশে, আপনি তো জানেন, ইরান থেকে আমি সৌদি আরব গেলাম তারপর মিসর ফিরলাম। তখনই আমার মনে ভাবনাটি জাগল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আল্-কুদ্সে যাব। যখন সৌদি আরব ত্যাগ করছি তখন বিষয়টি আমার কাছে পুরোপুরিই পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার মূল প্রেরণা ছিল যা আপনাকে বললাম– ইসরাইলের নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান করা। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা, তাহলে আমি নিজেই যাব, আর তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করব– আমি আর ইসরাইল। I and Israel.

আমি তাঁকে এবার মরক্কোয় আমার সাথে বৈঠকের জন্য হাসান তেহামীকে কেন নির্বাচন করলেন তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বলেন–"আসলে আমি ভিন্ন

একটি কারণে তেহামীকে আপনার সাথে বৈঠকের জন্য পাঠাই। সে সময় জেনেভা সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি চলছিল, যা আমি আদৌ চাচ্ছিলাম না। আপনার সাথে তেহামীর দায়িত্ব ছিল এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, আপনারা ও আমরা– অর্থাৎ মিসর ও ইসরাইল সম্মেলনের আগে একসাথে এমন একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম হবে যাতে সম্মেলন কোন বিপদে না পড়ে। তেহামীর এ দায়িত্বের লক্ষ্য ছিল আমার ও বেগিনের মধ্যে একটি বৈঠকের পটভূমি রচনা করা। বেগিনের সাথে আমার বৈঠকের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। আমার উদ্দেশ্য ছিল ইসরাইলের সাথে মুখোমুখি বসা। যুক্তরাষ্ট্রের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমি জেনেভা যেতে স্বস্তিবোধ করছিলাম না। আসাদ চাচ্ছিলেন একটি একক আরব ডেলিগেট। কার্টারও পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন এবং আমাকে রাজি করানোর চেষ্টা করেন। তখন আমি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বললাম (এখনও মোশে দায়ানই বর্ণনা করে যাচ্ছেন), সেদিনগুলোর কথা আমার এখনও মনে আছে, মনে পড়ে আমি কার্টারকে বলেছিলাম, আসাদ চান ঐক্যবদ্ধ আরব প্রতিনিধি দল জেনেভায় যাক। এতে রাশিয়ানরা এই সমস্যায় চলে আসবে। আমি উপলব্ধি ও প্রত্যাশা করছিলাম যে, আপনিও আমার সাথে একমত হবেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত আবেগের উচ্ছ্বাসে তখন গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মোশে! আমি তোমার মতোই পোষণ করতাম। দায়ান আরও বলেন—

এ প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে আমার সাথে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সম্পর্ক বেশ ভাল হয়ে ওঠল। কিন্তু তা কখনই আজরা ওয়াইজম্যানের সাথে তার সম্পর্কের পর্যায়ে পৌঁছেনি। আমার সাথে তো করমর্দন করতেন। আর ওয়াইজম্যান তো তার সাথে প্রতিবার আলিঙ্গন করতেন এবং চুমু খেতেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, এ সফরের কারণে প্রেসিডেন্ট সাদাতের জন্য কি অপেক্ষা করছে। ইসরাইলের প্রতিজন নেতার কাছেই এটা স্পষ্ট ছিল যে তিনি এ পর্যায়ে কিছু ফিরতি জবাব পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন! ইসরাইলী নেতৃবৃন্দকে যেটা ভাবিয়ে তুলেছিল তা হচ্ছে অন্যরাও এই ইশতেহারে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে অংশগ্রহণ করছে। দেখা গেল, ২১ নভেম্বর বিকালে আল্-কুদ্সে প্রেসিডেন্ট সাদাতেকে বিদায় জানানোর সময় ইসরাইলে নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে দায়ানকে বলছেন– "কয়েকটা দিন গেল, যা কখনও ভোলা যাবে না। মনে হয়, মিনিস্টার স্যার! আপনারা এ কয়দিন যা কিছু গ্রহণ করেছেন তার বিনিময়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে এবার কিছু দেয়া উচিত।" দায়ান তখন বিরক্তি আর বিদ্রূপের সুরে বললেন ঃ 'বুঝি না কেন যে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্-কুদ্সে যা হয়ে গেল এর একটা মূল্য যেন আমরা পরিশোধ করি। যা ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে বিরাট কিছু। কিন্তু বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। অন্যরা এবং গোটা পৃথিবী আমাদের দেশে বিরাট মেলায় নিজেদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আমরা তাদের

স্বাগত জানালাম। এ মেলা ছিল অনেকটা আকস্মিক অনুষ্ঠানের মতো যেখানে স্বআমন্ত্রিতরা তাদের নিজেদের খানাপিনা আর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এসে থাকে, এরপর অনুষ্ঠান শেষে যারা তাদের ঘরবাড়ি এদের মেলার মঞ্চ হিসাবে ছেড়ে দিয়েছিল, তাদের শোকরিয়া জানিয়ে চলে যায়।'

ফরাসী রাষ্ট্রদূত প্রমাদ গুনলেন। তার মূল্যায়নে ইসরাইল প্রেসিডেন্ট সাদাতের এ সফরের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারছে না। তার এই উদ্যোগের পর্যায়ে তাদের পক্ষ থেকে কোন ফিরতি জবাবদানের চিন্তাও করছে না।

বাকি থাকল তৃতীয় প্রশ্ন, তা হচ্ছে– এরপর বিশ্ববাসী কি প্রত্যাশা করতে পারে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সংক্ষেপে এই যে, গোটা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র অচিরেই ইসরাইলের কাছে ঠিক সে জিনিসটিরই অপেক্ষা করছে যা ফরাসী রাষ্ট্রদূত 'বেন গোরিয়ন' বিমানবন্দরে মোশে দায়ানকে প্রশ্ন করেছেলেন।

॥ ৪ ॥

মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল

"যা কিছুই ঘটুক না কেন বেগিনের সামনে আমার কসম করা সম্ভব নয়।"

—প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের প্রতি মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ওয়াশিংটন আল্-কুদসের এ সফরকে অনুসরণ করে যাচ্ছিল এমন এক ঘোরে যা আল্-কুদ্সে ঘটমান দারুণ নাটকীয় দৃশ্যের শেষ নিয়ে নানান অজানা শিহরণমোড়া। যা ঘটেছে সে সব জানিয়ে বেগিন তখন কার্টারকে লেখেন, প্রেসিডেন্ট সাদাতও তা করলেন। যখন বেগিন ছিলেন সতর্কবাক তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত ছিলেন আবেগ উদ্বেলিত, তিনি সকল সূচনাকে তাঁর হাতের তালুতে রাখতে চান। তিনি চাচ্ছিলেন, অব্যাহতভাবে গতি সঞ্চার করে যেতে। তিনি কার্টারকে বলেন যে, তিনি পরপর তিনটি পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন ঃ

১. মরক্কোর বাদশাহর পৃষ্ঠপোষকতায় তেহামী ও দায়ানের মধ্যে দ্বিতীয় বৈঠকের ব্যবস্থা করা যাতে তাদের পূর্ববর্তী বৈঠকের অস্পষ্ট পয়েন্টগুলো খোলাসা করে নিতে পারেন। বিশেষ করে তেহামী যে দায়ানের কথা থেকে বুঝেছিলেন যে, 'মিসরী ভূমি থেকে প্রত্যাহার কোন সমস্যা নয়।'

২. এরপর তিনি কায়রোতে একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে চান। এতে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্কের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট সকল শক্তিকে আমন্ত্রণ জানাবেন। এদের মধ্যে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্-কুদ্সে গিয়ে সম্প্রতি তিনি যে ভিত রচনা করেছেন তার ওপর ইমারত নির্মাণ করা !

৩. তিনি বেগিনকে তাঁর সাথে ইসমাইলিয়ায় বেঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চান। এতে পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা বাড়বে এবং উভয়ই শান্তির দিকে যৌথ উদ্যোগের পরিকল্পনা করতে পারবেন।

কার্টার দেখলেন যে, আল্-কুদ্সে যে বিরাট রাজনৈতিক ও প্রচারমূলক উত্তরণ ঘটেছে এ থেকে যুক্তরাষ্ট্র পিছে পড়ে থাকতে পারে না। মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনমুখী। তবে ভ্যান্স তাঁর প্রেসিডেন্টের সাথে একমত ছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র পিছিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু তাকে অন্য যে কারও চাইতে খুব সাবধানে সূক্ষ্মভাবে বিষয়টিকে ভারসাম্যপূর্ণ পথে ধাবিত করতে হবে। না হয় শান্তি মধ্যপ্রাচ্যে কখনও আসবে না। তদুপরি সেখানে আরব– আরব সংঘাত সৃষ্টি হবে যা আরব-ইসরাইল

সংঘাতের সাথে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে। ফলে এ অঞ্চলটি কোন শান্তিতেই পৌঁছতে পারবে না, এমনকি মিসর ইসরাইলের সাথে একলা কোন চুক্তি করলেও না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্স প্রেসিডেন্ট কার্টারের জন্য (হোয়াইট হাউসের কাগজপত্রাদি অনুসারে) একটি নোট প্রস্তুত করেন, এতে তাদের অবস্থানের মৌলিক পয়েন্টগুলো সংক্ষিপ্তভাবে সাজানো ঃ

১. মধ্যস্থতাকারী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে এখন আর গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় বলে গণ্য করা হয় না।

২. এ পরিস্থিতিতে জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে মনে হয় না।

৩. মিসর ও সিরিয়া উভয়েই সিরিয়া ও সোভিয়েতকে পাশ কাটানোর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে।

৪. সাদাতের ভূমিকাকে সৌদী আরবের সমর্থন করা (ন্যূনপক্ষে আর্থিকভাবে) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সাদাত যুক্তরাষ্ট্রকে তাঁর ও সৌদীদের মধ্যে দূত হিসাবে কামনা করেন না।

৫. প্রেসিডেন্ট আসাদ ও প্রেসিডেন্ট সাদাতের মধ্যে এখন পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বিরাজ করছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই সিরিয়াকে বোঝানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে যেতে হবে যেন সে শান্তি প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে যোগ না দেয়। এদিকে জর্ডান খুব কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। সে এখন বিচ্ছিন্নভাবে মিসর-ইসরাইল চুক্তির পরিণাম নিয়ে শঙ্কিত।

কার্টার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ভ্যান্সকে আবার মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে পরিস্থিতির লাগাম পুনরায় হাতে নিতে কি করা যায় তা খতিয়ে দেখবেন। কার্টার ইসরাইলী অবস্থানের হাকিকত সম্পর্কে সাদাতের চেয়ে বেশি জানতেন এবং নিশ্চিতভাবেই অবগত ছিলেন যে, ইসরাইল কখনও সাদাতের উদ্যোগের বিনিময় এ উদ্যোগের সমপর্যায়ে দেবে না। ভ্যান্স নিজেও ভেবে কূল পাচ্ছিলেন না যে, সাদাত কি করতে চান। তিনি কার্টারকে বলেন, এ ব্যক্তি Seeing is belivings (চোখে দেখাই সত্য, চাই তা দৃষ্টিভ্রমই হোক) এ দর্শন নির্ভর নীতির অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এদিকে ওয়াশিংটনে সাধারণভাবে এ অনুভূতি কাজ করছিল যে, যদি প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর গৃহীত উদ্যোগে ইসরাইলী অবস্থানে কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি দেখে হতাশ হয়ে পড়েন তাহলে এক বিরাট বিপর্যয় ঘটবে।

প্রেসিডেন্ট সাদাতের তা কার্যতই বাস্তবায়নের সুযোগ ছিল। দেখা গেল, দ্বিতীয়বার রাবাতে হাসান তেহামীর সাথে দায়ানের বৈঠকে তাঁদের পূর্বেকার বৈঠক সম্পর্কে প্রশ্নাবলী কোন ফল বয়ে আনেনি। বাদশাহ হাসানের মতে, ভবিষ্যৎই বেশি গুরুত্বের দাবিদার। তাই দায়ান ভবিষ্যতের কথা শুরু করেন। তাঁর কাছে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নই ছিল যার চারপাশেই তিনি ঘুরছিলেন এবং বার বার ফিরে আসছিলেন।

সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সাদাত কায়রোতে যে সম্মেলন ডেকেছেন সেখানে কি এমন কোন ভিত রচনা করবেন যার ওপর ভিত্তি করে ইসরাইলের সাথে মিসর আলাদা সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত আছেন ? হাসান তেহামী এ সম্মেলন সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের কাছে শোনা সাধারণ ধারণা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।

মঞ্চ এখন কায়রোতে স্থানান্তরিত হলো যেখানে সেই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হলো যার নাম দেয়া হয়েছিল "মিনা হাউস সম্মেলন।" এতে আমন্ত্রিত একটি আরব পক্ষও হাজির হয়নি। আরবরাই কেবল এ সম্মেলনকে প্রত্যাখ্যান করেনি বরং ইসরাইলীরাও তাদের শর্তাদি আরোপ করে যাচ্ছিল, এমনকি সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা নিয়েও। এর মধ্যে ছিল বেগিনের মুখ্য সচিব ও এ সম্মেলনের প্রতিনিধি দল প্রধান 'ইলইয়াহু বিন ইয়াসার' একটি ফিলিস্তিনী পতাকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যেটি মিনা হাউসের সম্মেলনে আমন্ত্রিত পক্ষগুলোর প্রতীক হিসাবে উত্তোলিত অন্যান্য পতাকার সাথে উত্তোলিত ছিল। 'ইলইয়াহু' এখন মিসরী ডেলিগেশন প্রধানের কাছে গিয়ে বলেন যে, তিনি হোটেল প্রাঙ্গণে একটি অভিনব পতাকা দেখতে পেয়েছেন যা তিনি চেনেন না। তিনি চান এটা তুলে নেয়া হোক অথবা ইসরাইলী পতাকাও উত্তোলন করা হোক। অন্যথায় এ অবস্থায় তিনি সভাকক্ষের দিকে এক পাও বাড়াবেন না। প্রেসিডেন্ট সাদাত মেনাহেম বেগিনের সাথে জানাশোনা বাড়াবার উদ্দেশে এবং সমাধান পরিকল্পনায় যৌথ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ইসমাইলিয়ায় যে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন তাতে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সামনে একটিই মাত্র পথ খোলা ছিল যে, সত্যকে মুখোমুখি হয়ে তাঁর চেহারায় দৃষ্টি রাখবেন। এতদসত্ত্বেও তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তার চেহারা বিগড়ে দিবেন যদিও সে চেহারাটা ছিল পূর্ণভাবে স্পষ্ট— দিকচক্রবাল ঘিরে।

ইসমাইলিয়ায় বৈঠকটি ছিল পরবর্তী বৈঠকগুলোর একটি মডেল, চাই তা প্রেসিডেন্ট পর্যায়ে হোক বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে। যা হোক, মেনাহেম বেগিন এবার প্রেসিডেন্ট সাদাতের উদ্যোগের প্রত্যুত্তর সাথে করে এলেন। সেটা ছিল প্রেসিডেন্ট কার্টারের নিকট উপস্থাপিত মধ্যপন্থার একটি সমাধান ফর্মূলা। এখন তা প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে পেশ করার সময় এল।

ইসমাইলিয়ার সম্মেলনের প্রধান সাক্ষী ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যাকে সাদাত ঠিক সম্মেলনের আগে আগে বেছে নেন। তাঁকে ইসমাইলিয়ায় ডেকে পাঠান যাতে বেগিনের সাথে বৈঠকের মাধ্যমেই তাঁর সরকারী দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে পারেন এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল তাঁর "ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে হারানো শান্তি" শিরোনামের স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন ঃ তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগের ঘোষণার পূর্বে তিনি 'বনে' নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৭ তারিখে কায়রোতে এসেছিলেন জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট স্মীথের দু'দিনের কায়রো সফরের প্রস্তুতি নিতে। এরপর তিনি রেডিও ও টেলিভিশনের

ঘোষণায় চমকে উঠলেন। বলা হচ্ছে তাঁকে ইসমাইল ফাহ্মীর স্থলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মামদুহ সালেমের সাথে সাক্ষাৎকালে তাঁকে তাঁর নিয়োগ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। এরপর ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক তাঁর সাথে যোগাযোগ করে জানান যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত চান, আগামীকাল তিনি যেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ইসমাইলিয়ার আলোচনায় তাঁর সাথে যোগ দেন। এটি অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১১টা থেকে– প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সভাপতিত্বে মিসরী ডেলিগেশন এবং মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে ইসরাইলী ডেলিগেশনের মধ্যে। উক্ত স্মৃতিকথার ৪০ পৃষ্ঠায় 'ইসমাইলিয়ার বৈঠক' শিরোনামে মুহাম্মদ ইব্রাহীম কামেল লিখছেন ঃ

আমরা আল্-মাযা সামরিক বিমানবন্দরের দিকে রওনা দিলাম। সেখানে জনাব হোসনি মোবারককে পেলাম। আমরা সামরিক হেলিকপ্টারে উঠে ইসমাইলিয়ার দিকে রওনা দিলাম এবং সাড়ে ৯টায় সেখানে পৌঁছলাম।

ইসমাইলিয়ার অবকাশ কেন্দ্র, যাকে আলোচনার স্থান নির্বাচন করা হয়, সেখানে বেশকিছু বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও মিসরী প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। এরা হচ্ছেন ডঃ ইসমত আবদুল মজীদ, জাতিসংঘে নিযুক্ত মিসরের প্রতিনিধি, হাসান কামেল, মুখ্য সচিব, ডক্টর বুট্রস ঘালি, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও ডক্টর উসামা আল বায, সচিব, ভাইস প্রেসিডেন্টের দফতর।

আমি ডক্টর ইসমত আবদুল মজীদকে অনুরোধ কললাম যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত আহূত প্রস্তুতিমূলক কায়রো শান্তি সম্মেলনে সারসংক্ষেপ কি ছিল। এটি পিরামিডের সামনে মিনা হাউসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে মিসরী, ইসরাইলী ও আমেরিকান পক্ষ ছাড়া কেউই অংশগ্রহণ করেনি। এতে সিরিয়া, জর্ডান ও পিএলওসহ সবাই হাজির হতে অস্বীকৃতি জানায়।

তিনি কিছু বলতে যাবেন এ সময় আমাকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাক্ষাতে ডাকা হলো। তিনি এ সময় অবকাশ কেন্দ্রের বাগানে বসে উজ্জ্বল রোদ উপভোগ করতে করতে আমার অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানালেন এবং বললেন তিনি আমার এখানে থাকার কথা জানতেন না। তিনি ভেবেছিলেন আমি বুঝি এখনও বনে।

এরপর তিনি আরব দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান স্ববিরোধিতা সম্পর্কে দীর্ঘ কথাবার্তা বলেন। বিশেষ করে সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল-আসাদের কথা যিনি তাঁকে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছেন আর বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা যে ব্যক্তিগতভাবে তার পতনের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং যে কোন সুরাহা পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। তিনি এও বলেছেন যে, মিসর নিজেকে অব্যাহতভাবে আরবদের এমন

কাফেলার চাকার সাথে বেঁধে রাখতে পারে না যাতে সব সময় গোস্বা, গাদ্দারী, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আর অহংকারের অনলে জ্বলছে।

এরপর হাসান কামাল এসে খবর দিলেন যে, ইসমাইলিয়ায় ইসরাইলী ডেলিগেশনের বিমান এসে পৌঁছেছে। তখন সাদাত আমাকে রেখে তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। ডেলিগেশন পৌঁছার পর তাদের সাথে করে প্রেসিডেন্ট সাদাত অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে গেলেন। এখানে তাদেরকে কিছু পানীয় দেয়া হয়। একটু পরেই হাসান কামেল এসে জানালেন প্রেসিডেন্ট আমাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবার জন্য তলব করেছেন। তিনি আরও জানান যে, বন্ধুত্ব ও শান্তির চেতনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি এই শপথ অনুষ্ঠানে মেনাহেম বেগিন ও ইসরাইলী ডেলিগেশনের সদস্যদেরও আমন্ত্রণ জানাবেন। আমি যেন চেতনার গভীরে একটি ধাক্কা খেলাম। আমি তাকে অনুরোধ করলাম যে, প্রেসিডেন্ট সাদাতকে যেন জানান যে, ইতোপূর্বে বিশ্বে এমন ঘটনা কোথাও ঘটেনি। যা হবার হবে, আমি কখনও ইসরাইলীদের সামনে শপথ নেব না।

হাসান কামেল হাসিমুখে ফিরে এসে আমাকে জানান যে, প্রেসিডেন্ট আমার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আমি তাঁর সাথে অভ্যর্থনা কক্ষে গেলাম। এখানে মেনাহেম বেগিন ও তাঁর কিছু সহকারীসহ সাদাত বসা ছিলেন। তিনি তাঁদের অনুমতি চেয়ে কক্ষের এক কোণে গেলেন। তার ডান পাশে দাঁড়ালেন জনাব হোসনি মোবারক আর বাম পামে জনাব মামদুহ সালেম। আমি শপথ গ্রহণ করলাম। আমি শেষ করতে না করতেই মেনাহেম বেগিন ও তার সঙ্গিগণ আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে করমর্দন করেন। এরপর সাদাত বেগিনকে নিয়ে তাদের মধ্যে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন।

মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল তার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি "ক্রোধের অনুভূতি" শিরোনামে (উক্ত বইয়ের ৪৩ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন– মিসরী ও ইসরাইলী ডেলিগেশনের সদস্যগণ সাদাত ও বেগিনের মধ্যকার রুদ্ধদ্বার বৈঠকের সময় বসে অপেক্ষা করছিলেন। এর পর দরজা খুলে সাদাত ও বেগিন প্রবেশ করলেন। আমি চমকে গেলাম, সাদাতের হাতের মধ্যে মেনাহেম বেগিনের হাত জড়িয়ে আছে। সাদাত বলছেন, তিনি বেগিনের সাথে একমত হয়েছেন যে দু'টি কমিটি করা হবে ঃ প্রথমটি হবে রাজনৈতিক। এটি হবে মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে। মিটিং হবে আল্-কুদ্‌সে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সামরিক, যার নেতৃত্বে থাকবেন দু'দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীগণ। এর বৈঠকগুলো হবে কায়রোতে। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, সাদাত ও বেগিন তো ঘোড়ার আগে গাড়ি বেঁধে দিয়েছেন। কারণ এ ধরনের ঐকমত্য তো আসা দরকার ছিল উভয় দেশের মধ্যে আলোচনার ফল হিসাবে, আলোচনার

আগে নয়। সাদাতের ওপর আমার রাগ হলো। তিনি কেন দুটো কমিটিতে একমত হলেন। যুক্তি কি এ ছিল না যে, প্রথমে উভয় দেশ শান্তির মূল নীতিগুলোর ওপর ঐকমত্য স্থাপন করে নেবে, যখন বিষয়টি ছিল একান্তই রাজনৈতিক! যখন এ বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপিত হবে তারপর এই চুক্তির ধারা অনুসারে যতটা প্রয়োজন ততটা কমিটি গঠন করা যেতো। আমার চিন্তার সুতো ছিঁড়ল যখন প্রেসিডেন্ট সাদাতের কণ্ঠস্বর শুনলাম। তিনি ইসমাইলিয়ায় ইসরাইলী ডেলিগেশনকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে বলছেন ঃ "আজ আমার জন্মোৎসব। এটি একটি শুভ উপলক্ষ্য যে, আমরা মিসর-ভূমিতে উভয় জাতির দুঃখ-কষ্ট ঘুচাতে একত্রিত হয়েছি। গোটা বিশ্ব এ বৈঠক ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। উত্তরে বেগিন সাদাতকে তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানান এবং কামনা করেন যেন তিনি একশ' বিশ বছর বেঁচে থাকেন যেমনি ঘটেছে মুসার বেলায়, যিনি মিসর থেকে স্বজাতিসহ পালিয়ে গিয়ে সিনাই পাড়ি দিয়েছিলেন এবং দিকভ্রান্ত হয়ে মরুমাঠে চল্লিশ বছর হন্যে হয়ে ফিরেছেন। অথচ তিনি (বেগিন) মাত্র চল্লিশ মিনিটে সিনাই পাড়ি দিয়ে মিসর পৌঁছে গেছেন।"

বেগিন আনুষ্ঠানিক বৈঠকে তার কথা বলা শুরু করেন। তিনি বলেন, তিনি ও প্রেসিডেন্ট সাদাত খুবই ফলপ্রসূ একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। তিনি এখন ডেলিগেটদের উপস্থিতিতে এ আনুষ্ঠানিক বৈঠকে তার অবস্থানকে সকলের সামনে তুলে ধরতে চান। তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট সাদাত একটি বিশাল ব্যক্তিত্ব, তিনি গোটা মিসরী জাতির আস্থাভাজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৈশিষ্ট্য আমার ভাগ্যে হয়নি। কারণ আমি নির্বাচনী মেনুফেস্টোতে দেয়া দলীয় কর্মসূচীর শিকলে বাঁধা। এছাড়া আমি লিকুদ ফ্রন্টের সম্মিলিত কর্মসূচীতেও বাঁধা রয়েছি দলীয় কর্মসূচী আমার সামনে তিনটি পদক্ষেপ রেখে দিয়েছে, যা লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ঃ

প্রথমত, ইসরাইল ভূমিতে ইহুদী জাতির অধিকারের বিষয়টি সমালোচনার উর্ধ্বে। কেউ আমাদের ওপর এমন পরিকল্পনা চাপিয়ে দিতে পারবে না যা মুক্ত ইসরাইল ভূমির বিভক্তি টানতে পারে। আমি তা উল্লেখ করেছি এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা যখন এক সঙ্গে ছিলাম তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত তা মেনে নেন। মিসরই ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ শুরু করে। এটি ছিল আল–আকাবা প্রণালী বন্ধ করে দিয়ে আমাদের ক্ষেপিয়ে তোলার প্রেক্ষাপটে। প্রেসিডেন্ট সাদাত আমাকে, যখন আমরা এক সাথে বসি, এ বিষয়ে নিশ্চিত করছেন যে, তিনি কখনও এ কথায় একমত ছিলেন না যখন মিসরে বলা হতো যে, ইসরাইলকে সাগরে ফেলে দেয়া হবে। তিনি এ বিষয়েও আমার সাথে একমত পোষণ করেন যে, ১৯৬৭-এর যুদ্ধ ছিল আমাদের জন্য আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, যাতে জড়িয়ে পড়তে আমরা বাধ্য হই। আপনারা সবাই জানেন

যে, প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে যেখান থেকে আগ্রাসন শুরু হয় সে ভূমি পর্যন্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এটা কোন আগ্রাসন নয় অথবা যুক্ত করে নেয়া নয় বরং এটা হচ্ছে মুক্ত করা আর নিরাপত্তা বিধান করা। (তবে সাগরে ফেলে দেয়া অথবা '৬৭-এর যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক ছিল–এ দু'টি দাবিই ছিল ভিত্তিহীন –লেখক)।

দ্বিতীয়ত, শান্তি আমার দলের কর্মসূচীতে এবং লিকুদ ফ্রন্টের সম্মিলিত কর্মসূচীতে যেভাবে আছে তাতে শান্তির অর্থ— সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে কেবল সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে কোন চুক্তি স্বাক্ষরে উপনীত হওয়া। আরব দেশগুলোর সাথে সম্ভাব্য শান্তি-চুক্তিগুলোতে ইসরাইলের নিরাপত্তার শর্ত হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। আমি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে আমাদের বৈঠকে এও বলেছি যে, এ সকল শর্তের মধ্যে এটা নেই যে, ইসরাইল সরকার চাইবে কেউ তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিক। অস্তিত্বের অধিকার কথাটি আমরা এমনকি ইসরাইলেও বহুবার শুনেছি, এটা আমরা প্রত্যাখ্যান করি। কোন ব্রিটিশ, ফরাসী, বেলজিকী অথবা হল্যাণ্ডী, রুশ অথবা আমেরিকান বা মিসরী কিংবা সৌদীর মনে কি কখনও জাগে যে, তার জাতির অস্তিত্বের অধিকারের স্বীকৃতি কারও কাছে চাইবে? আমি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বলেছি যে, আমরা আমাদের অস্তিত্বের অধিকারের স্বীকৃতির জন্য কারও অপেক্ষায় বসে নেই। আমাদের চাহিদা হচ্ছে অন্য এক স্বীকৃতি তা হচ্ছে ইসরাইলের ভূখণ্ডে আমাদের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি।

তৃতীয়ত, দল ও ফ্রন্টের কর্মসূচী এটাও ইঙ্গিত করে যে, ইয়াহুদা, সামেরা, গাজ্জা, গোলান ও সিনাইতে ব্যাপকহারে পুনর্বাসনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আমাদের গুরুত্বারোপকে কেউ পাল্টে দিতে পারবে না। আমি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে ব্যাখ্যা করে বলেছি যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কখনও আমাদের বিশ্বাস বিরোধী কিছু চাপিয়ে দিতে পারবে না। স্বভাবতই আমরা আমাদের ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করতে সচেষ্ট। আমরা মনে করি, ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যের সূত্র কেবল একই ধরনের নৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গভীর অনুভূতি ও বিশ্বাসই নয় বরং আমাদের উভয়ের পারস্পরিক স্বার্থের উপলব্ধিও বটে। আর এটি যে কোন সরকারের চেয়েও বেশি স্থায়ী এবং যে কোন সামরিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চেয়েও শক্তিশালী। আমরা আস্থাশীল যে, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও প্রশাসন আমাদের জন্য কেবল সেটাই গ্রহণ করবে– যা আমরা আমাদের নিজেদের জন্য গ্রহণ করি। কাজেই বন্ধন ও স্বার্থের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু নেই যার নাম চাপ, যা এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর আরোপ করবে। আমাদের ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চেষ্টা আছে– আমি প্রেসিডেন্ট সাদাতকেও বলেছি– তা হচ্ছে পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে এক ধরনের সম্পর্ক।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত উপলব্ধি করলেন যে, বেগিন এতক্ষণ ধরে যতটুকু বলেছেন তাই আনুষ্ঠানিক বৈঠকের জন্য যথেষ্ট, বিশেষ করে উপস্থিত মিসরী প্রতিনিধি দলের

সদস্যদের জন্য। তাই তিনি বৈঠক এখানেই শেষ করার প্রস্তাব দিলেন, যাতে তিনি ও বেগিন আসন্ন যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। এ সম্মেলনটি ছিল এক প্রকাশ্য বিপর্যয়। কারণ বেগিন, মাইক্রোফোন ও ক্যামরার লেন্সের সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরেফিরে সে কথাগুলোই বলেছেন যা আলোচনা বৈঠকগুলোতে বসে করেছিলেন, এর মধ্যে ছিল– প্রেসিডেন্ট সাদাত ও তার মধ্যে আলোচিত বিষয়ে সাদাতকে সাক্ষী মানা।

ইসমাইলিয়ায় যা কিছু ঘটেছে তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট তাঁর উদ্যোগের ব্যাপারে যথেষ্ট শঙ্কিত ছিলেন। তাঁর মতে, উদ্দেশ্য সাধনে অব্যাহতভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা এবং সব কিছুকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তৎপর থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তাই তিনি তাঁর ও ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কার্টারের সাথে যোগাযোগ করে এই মর্মে উপনীত হন যে, বেগিনের ওপর 'চাপ' সৃষ্টি করে যেতে হবে। এছাড়া এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ইসমাইলিয়ায় গঠিত উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক কমিটি অচিরেই আল্-কুদ্সে তাঁর কার্যক্রম শুরু করে দেবেন। প্রেসিডেন্ট কার্টারও সাদাতের অনুরোধ রেখে পূর্ণ শরিকের ভূমিকা পালন তথা অনুপ্রেরণাদায়ী শক্তি হিসাবে থাকার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্সকে আল্-কুদ্সে পাঠাবেন– যাতে ওখানে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেলের ও মোশে দায়ানের সাথে যোগ দিতে পারেন।

১৬ জানুয়ারি ১৯৭৮, বৈঠকের দিন তারিখ ঠিক হয়। আবারও সে সময়কার মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই দৃশ্যপটকে তাঁর দিক থেকে দেখা অনুসারে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আল্-কুদ্সে হোটেল হিলটনে আমার জন্য নির্ধারিত প্লাজায় পৌঁছে নৈশভোজের পর আগামীকালের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনায় বসলাম। ইসরাইলের খবরাখবর জানার জন্য ইসরাইলী রেডিও খুললাম। প্রথমেই ছিল আল্-কুদ্সে রাজনৈতিক কমিটির বৈঠকের জন্য মিসরী প্রতিনিধি দলের আগমনের সংবাদ। দ্বিতীয় খবরটি ছিল— ইসরাইলে সফররত হল্যাণ্ডের একটি ইহুদী প্রতিনিধি দলকে প্রধানমন্ত্রী বেগিন জানিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁকে ইসমাইলিয়ার বৈঠকে বলেছিলেন যে, পিএলও'র নেতারা আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের দালাল। আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছ থেকে বর্তমান সময়ের জন্য অপ্রাসঙ্গিক কিছু নির্দেশনা সংবলিত একটি প্রতীকী তারবার্তা পেলাম। এতে তিনি আমাকে আমার স্নায়ু নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুরোধ জানান। আর যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যাকে উস্কানিমূলক গণ্য করা যায়, তাহলে প্রয়োজনে কায়রো তার প্রত্যুত্তর দিবে।"

প্রথম বৈঠকেও বোঝা যায়নি যে, ইসমাইলিয়াতেও ইসরাইলের যে অবস্থান ছিল তা কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল প্রকাশ্য বৈঠকে তার

অবস্থানটা স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। দায়ানও তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন। মুহাম্মদ ইব্রাহীম কামেল তাঁর– "ক্যাম্প ডেভিডে হারিয়ে যাওয়া শান্তি" শিরোনামের আত্মজৈবনিক গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন ঃ " উদ্বোধনী বৈঠকের পর আমি হোটেলে ফিরে হোসনি মোবারক মহোদয়ের কাছ থেকে একটি তারবার্তা পেলাম। এতে লেখা ছিল ঃ মাননীয় প্রেসিডেন্ট উদ্বোধনী সভা অনুসরণ করেছেন এবং আপনার যোগ্য নেতৃত্ব ও বক্তব্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তিনি আশা করছেন, আপনি সব সময় শান্ত থাকবেন এবং ধীরস্থিরভাবে মেজাজ শান্ত রেখে কথা বলবেন। কোন বিষয়ে আপনি হোঁচট খেলে কায়রোতে যোগাযোগ করার কথা বলে চিন্তা করার সময় নেবেন এবং আমরা আপনাকে কাঙ্খিত বিষয়ে নির্দেশনা দেব। যে কোন বিষয়ে জানার প্রয়োজন হলে রাতে হোক বা দিনে, আমাদের কাছে জানতে চাইবেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব আপনার কাছে এর জবাব পৌঁছে যাবে। প্রেসিডেন্ট আপনার সফলতা কামনা করছেন।"

মিসরীয় আলোচকদের হোঁচট খেতে বেশি দেরি লাগেনি। প্রধানমন্ত্রী বেগিন আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ডেলিগেটদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করেন। ডিনার শেষ হওয়ার আগেই ঘটনাটি ঘটে গেল। মুহাম্মদ ইব্রাহীম কামেল তাঁর আত্মজীবনীতে ঘটনাটি বর্ণনা করেন এভাবে ঃ

নৈশভোজ শেষ হওয়ার আগে আগে হঠাৎ করে হলটির দরজা খুলে গেল এবং ফটোগ্রাফার সাংবাদিক এবং টেলিভিশন নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিগণের বিরাট এক বাহিনী এতে ঢুকে পড়ল। এদের সংখ্যা ছিল সত্যিই খুব বিরাট, আমি বেগিনের দিকে তাকালাম। তিনি আয়েশী ভঙ্গিতে আমাকে বলেন, "গোটা পৃথিবী এখানে আমাদের দেখতে চলে এসেছে, মন্ত্রী মহোদয়" তিনি তাঁর পকেট থেকে একটি ছোট্ট চিরকুট বের করে আমাকে দেখান। এতে হিব্রু ভাষায় কিছু লেখা ছিল (তাঁর নিজ হাতে আলোচনার কিছু পয়েন্ট)। আমাকে বললেন–এটাই আমার ভাষণ। আমি হেসে বললাম–"আশা করি আমাদেরকে নতুন করে কোন সমস্যায় ফেলবেন না যেন।" উত্তরে বললেন– "অবশ্যই না........ নতুন সমস্যায় যেতে কে চায়?"

বেগিন (ইংরেজী ভাষায়) তাঁর বক্তৃতা দিতে লাগলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সভার আবহাওয়া বদলে গেল। তাঁর বক্তৃতার আগে যেখানে একটি শান্ত ও হালকা আমেজ ছিল সেখানে এখন চিন্তা আর হতাশায় ছেয়ে গেল। কারণ তিনি সেই প্রাথমিক যুগ থেকে ইহুদীদের ইতিহাস বর্ণনা করতে শুরু করেন এবং যুগে যুগে তাদের কি কি দুর্দশার শিকার হতে হয় এবং মিসরের ফেরাউন ও জার্মানীর হিটলারের হাতে তারা যে কী নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয় তার ফিরিস্তি টেনে যেতে লাগলেন। লেকচার দিতে দিতে হাঁপিয়ে গেলেও তিনি স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে নিজের আওয়াজ শোনাবার জন্য যেন বেঘোর-বিভোর অবস্থায় রয়েছেন।

এর পর তিনি সেই মন্তব্যটির দিকে গেলেন যা আমি বিমানবন্দরে পৌঁছেই করেছিলাম। তার রেশ ধরে তিনি বলেন, "মিসর থেকে আগত এ আগন্তুক কিভাবে আমাদের কাছে এ দাবি জানাবার দুঃসাহস দেখাতে পারে যে, একীভূত হওয়ার পর আমাদের রাজধানী আল্-কুদ্সকে আবার দু'ভাগ করে দেই ? তিনি কি রাজি হবেন যে, আমি কায়রোতে গিয়ে এভাবে তা ভাগ করার দাবি জানাই। এরপর আমাদের কাছে ১৯৬৭-এর আগের সীমায় প্রত্যাহারের দাবি করছে। তিনি কি ভুলে গেছেন যে আমরা তাদের চাপিয়ে দেয়া আক্রমণাত্মক যুদ্ধে আমাদের জান আর সন্তানদের বাঁচাবার জন্য কেবল চেষ্টা করছিলাম ? এরচেয়েও খারাপ হচ্ছে, আবর ফিলিস্তিনীদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দাবি করা। কিন্তু কেন ? আমাদের দরজার কাছে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আমাদের নারী ও শিশুদের জবাই করার জন্য ? আরবরা তাদের ভাগ্য গড়ার জন্য একুশটি রাষ্ট্র পেয়েছে। এখন আবার আমাদের দশা শেষ করে তাদের ভাগ্য গড়ার অধিকারের ধোঁয়া তুলে আরেকটি নতুন রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। আমরা উচ্চৈস্বরে একেবারে স্পষ্ট করে বলতে চাই, আল্-কুদ্সের কোন বিভক্তি হবে না........ ১৯৬৭-এর সীমায় কোন প্রত্যাহারও হবে না। সন্ত্রাসীদের ভাগ্য নিশ্চিত করারও কোন অধিকার নেই।" মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্ণনা করে যাচ্ছেন– "আমি আস্তে আস্তে দাঁড়ালাম। মেজাজটাকে বশে রাখলাম। এ উপলক্ষ্যে প্রণয়ন করা ভাষণের কপিটি ছিড়ে ফেলে দিলাম। এরপর দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বললাম ঃ "আমি মিসরী ডেলিগেশনকে উত্তম অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ইসরাইলী সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা যখন এই নৈশভোজের দাওয়াত গ্রহণ করি তখন আশা ছিল যে, দিনভর কর্মক্লান্তির পর টেনশনমুক্ত। কিছু ভাল সময় কাটবে। এতো ছিল আমাদের আশা, কিন্তু ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী চাইলেন ভিন্ন কিছু। এটা তাঁর অধিকার। আমি মনে করি, তিনি যা বলেছেন এর জবাব দেয়ার এটা উপযুক্ত স্থান নয়। আমি এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, রাজনৈতিক কমিটির উদ্বোধনী সভায় আমি যে বক্তব্য রেখেছিলাম, যা এখন প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাখ্যান করছেন– সেটাই হচ্ছে একটি ন্যায়ানুগ ও পূর্ণাঙ্গ শান্তির জন্য একমাত্র ভিত্তি। তবে তিনি যা বলেছেন তার প্রত্যুত্তর আমি আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য রাজনৈতিক কমিটির সভার জন্য তুলে রাখলাম, কারণ সেটিই হচ্ছে এ ধরনের আলোচনার জন্য নির্ধারিত ফোরাম।" বেগিন কিন্তু এটা করেই ক্ষান্ত হননি বরং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের ওপর সর্বশেষ মন্তব্য রাখার জন্য দাঁড়ালেন তিনি বললেন যে তিনি স্বাভাবতই জানেন যে মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাল করে স্মরণ করতে পারছেন না ইহুদীদের বিরুদ্ধে হিটলার কী করেছিল। কারণটি সুস্পষ্ট। তা হচ্ছে ওই ইহুদী নিধনযজ্ঞ, যখন চলছিল তখন মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ছোট্ট শিশু। তখন মুহাম্মদ ইব্রাহীম কামেল ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর এই সর্বশেষ মন্তব্যটিকে এড়িয়ে যাবার

সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন তার মনে কায়রোর নির্দেশনাগুলো জাগরুক ছিল। নৈশভোজ শেষে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যান্স দ্রুত পায়ে তাঁর কাছে এসে প্রশংসা করতে লাগলেন যে, কী ভাবেই না তিনি তাঁর মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন।

একটি অপয়া দিনের ক্লান্তি নিয়ে মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল কেবলই বিছানায় গেলেন, তখনই তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁর সহকারী কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট সাদাতের তারবার্তা হাতে দিলেন। এতে তাঁকে কায়রো ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। তারবার্তায় এও বলা হয় যে–"আপনি এটা স্পষ্ট করে আসবেন যে আপনার কায়রো ফিরে যাওয়া আলোচনায় ছেদ টানা নয়। এটা কেবল একটা প্রয়োজনে ডাকা হয়েছে। আর আপনি ভ্যান্সের সাথে দেখা করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবেন এবং কায়রোতে প্রেসিডেন্ট তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করছেন জানাবেন।" বেন গোরিয়ন এয়ারপোর্টের পথে, জেনারেল দায়ান ছিলেন তাঁর সাথে। মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সে মুহূর্তগুলোর কথা লিখেছেন ঃ

"দায়ানের সাহচর্যে নতুন করে আবার গাড়িতে চড়লাম। বেন গোরিয়ন এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিলাম। কিছু সময় আমরা কথাবার্তা বিনিময় করলাম। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি নৈশভোজে বেগিনের ভাষণের জন্য দুঃখিত। কারণ তার মতে ওটাই ছিল মিসরী ডেলিগেশনকে ডেকে পাঠানোর প্রত্যক্ষ কারণ। তিনি বলেন যে, বেগিন একজন সুসভ্য মানুষ, কিন্তু কোন উপলক্ষ্যেই তিনি ইহুদী ইতিহাস ও তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের বর্ণনা না দিয়ে থাকতে পারেন না। কথা এখানেই শেষ। এর পর আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আশার দিক ফিরে গেলাম।

এয়ারপোর্টে এসে বিমান পেলাম না। এটি ডেলিগেশনের সাথে আসা কলাকুশলীদের রেখে আসার জন্য চলে গেছে। এতে এক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। আমরা বন্দরের ক্যাফেটেরিয়ায় কাটালাম। আমাদেরকে স্যান্ডুইচ দেয়া হলো। আমি ছোট একটি টেবিলে দায়ান ও বুট্রস ঘালিসহ বসলাম। আমি কোন আলোচনায় অংশ নিলাম না। কারণ আমি তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এ সময় দায়ান ফিলিস্তিনীদের সাথে তার যোগাযোগ ও জানাশোনার কথা বলছিলেন। এর পর শুনলাম বুট্রস ঘালিকে বলছেন– গাজা উপত্যকা তাদের জন্য কম বেশি কোন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এটি ছোট আয়তনের একটি জায়গা– যাতে লাখ লাখ ফিলিস্তিনী বাস করে। এর কোন আর্থিক আয়ের উৎস নেই। এতে রয়েছে কেবল চড়াই–উৎরাই, পাথর আর দারিদ্র্য। যদি এটা বিষয়গুলোকে সহজ করে দিতে পারে, তাহলে তারা এটা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছে। তবে আমাদেরকে এ মর্মে অঙ্গীকার দিতে হবে যে,এটাকে আমরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের আস্তানা হতে দেব না।

আল্-কুদ্‌সে যা প্রকাশ পেল তাতে প্রেসিডেন্ট কার্টারের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া প্রেসিডেন্ট সাদাতের সামনে আর কোন পথ রইল না। আমেরিকান প্রেসিডেন্টও নিজে

থেকে উপলব্ধি করছিলেন যে কতটুকু হতাশ হয়ে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট সাদাত। এ প্রেক্ষাপটেই তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ তারিখ নির্ধারণ করে উভয়ের মধ্যে বৈঠকের জন্য তাকে ক্যাম্প ডেভিডে আমন্ত্রণ জানান।

প্রেসিডেন্ট সাদাত, রাবাত হয়ে ওয়াশিংটনে যেতে চাইলেন যাতে বাদশাহ হাসানকে দৃশ্যপট সম্পর্কে অবহিত করা যায়। কারণ তিনিই মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনার প্রাথমিক বৈঠকগুলোর ব্যবস্থা করেন এবং নিজেও প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাত বাদশাহকে ভর্ৎসনাও করেছেন। কারণ তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের আল্-কুদ্সে সফরে প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তিনি ভাবতেও পারেননি যে, তিনি মধ্যস্থতা করা অবস্থায় প্রেসিডেন্ট সাদাত এভাবে আল্-কুদ্সে যেতে পারেন। এভাবেই তিনি উভয় দেশের মধ্যে যোগাযোগ চ্যানেল সৃষ্টির ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা চালান এবং আল্-কুদ্স সফরের যে নাটকীয় কাজ করেন– এ দুটোর মধ্যে যদি চিহ্ন দিতে চান। বাদশাহর পক্ষ থেকে এ ভূমিকা নেয়াকে প্রেসিডেন্ট সাদাত ভাল চোখে দেখেননি। আর তাই গোড়াতেই উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার অবকাশকে নিরসন করতে চান, যাতে পরে এটা বিরাট আকার ধারণ না করে।

ক্যাম্প ডেভিডে প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর ও কার্টারের মধ্যে দু'জনার একান্ত মিটিংয়ে কথাবার্তা শুরু করতে চান। এটা ছিল এক আকস্মিক প্রটোকল যা করতে তখনকার পরিস্থিতি বাধ্য করেছিল, যাতে বিশেষ করে মিসরী ডেলিগেটদের কাছ থেকে আলোচনার বিস্তারিত গোপন করা যায়। এতে মিসর ও আরব জনমত থেকেও আড়ালে থাকা যাবে। কার্টার প্রেসিডেন্ট সাদাতের এই আবেদনে সাড়া দেন এবং দু'জনে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে একান্ত আলাপ করেন। এর পর আনুষ্ঠানিক সভা শুরু হয়।

কার্টার ইচ্ছা করেই তাঁর কথা এভাবে শুরু করেন যে, তিনি চান রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁর ও প্রেসিডেন্ট সাদাতের মধ্যে যা আলোচনা হয় তার সারসংক্ষেপ সকলের সামনে তুলে ধরবেন, যাতে বিষয়টি সুস্পষ্ট থাকে এবং আগের মতো নানা বর্ণনায় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। প্রেসিডেন্ট কার্টার প্রায় আধঘণ্টা ধরে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আলোচনা তুলে ধরেন। মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্ণনা করেছেন ঃ

"কার্টার আশঙ্কা করেছিলেন যে, পাছে প্রেসিডেন্ট সাদাত ইচ্ছা করে অথবা ভুল বোঝাবুঝির কারণে এমন দাবি করে বসেন যে, একাকী রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কার্টার কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বা দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই তিনি সবাইকে সাক্ষী রেখে দু'জনার আলোচনাকে আবার মেলে ধরাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন। প্রায় দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে প্রেসিডেন্ট কার্টার বেশ ধীরস্থিরভাবে এবং বেশ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায়

ধারাবাহিকভাবে দু'জনের মধ্যে আলোচিত বিষয় তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের উপসংহার টানেন এ বলে ঃ "প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁকে জোর দিয়ে বলেন যে, সৌদী আরব মিসরী জনগণ ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বন্ধুসহ সকল আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যারপরনেই কুণ্ঠিত এবং গভীরভাবে হতাশ। কারণ তাদের বিশ্বাস, আমেরিকান সামরিক ও অর্থনীতিক সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া ইসরাইলের এই শক্ত অবস্থান গ্রহণ কোনদিন সম্ভব ছিল না। তিনি (কার্টার) বেশ উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, যখন প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আর ইসরাইলের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারছেন না এবং তিনি আগামী সোমবার আন্তর্জাতিক সংবাদ ক্লাবে তা ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

মুহাম্মদ ইব্রাহীম কামেল তাঁর বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন–"কার্টারের সার-সংক্ষেপের ওপর মন্তব্যের পালা এলো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্সই প্রথম মুখ খুললেন। তিনি বলেন—এখন এ ধরনের বিবৃতি প্রকাশ পেলে তা হবে বিরাট এক আঘাত। কারণ এটাকে আমেরিকার জনগণ ব্যাখ্যা করে বলবে যে, শান্তির পথে অগ্রগতি থেমে গেল। এর একটা গভীর ও বিপজ্জনক প্রভাব পড়বে। কাজেই এ ধরনের বিবৃতি প্রকাশ না করার জন্য আমি অনুরোধ জানাই। বরং আমরা একযোগে কাজ করে লক্ষ্য স্থির করতে পারি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। এরপর ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার মন্ডেল প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বলেন, আপনি জানেন? আপনার ঐতিহাসিক আল্-কুদ্স সফরের প্রভাব ছিল দারুণ। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভিতর আপনি একজন রাষ্ট্রনায়ক ও শান্তির দূতে পরিণত হন। অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষের চোখে আপনার প্রতি এই দৃষ্টি অব্যাহত থাকলে তা ইসরাইলে বিবর্তন আনার ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মানুষ জিজ্ঞাসা করতে থাকবে যে আপনার এ উদ্যোগের বিনিময়ে ইসরাইল কি দিয়েছে। কাজেই ইসরাইলকে ফসকে যাবার সুযোগ দেবেন না যাতে সে দাবি করে বসতে পারে যে আপনি যা কিছু করেছেন তা আসল ছিল না। তাছাড়া বেগিন আপনাকে এমন অবস্থানে নিয়ে যাবে যাতে সে বলতে পারে যে, আপনার প্রতি কিছু করার ব্যাপারে এখন আর তাকে কিছু বলার নেই।"

কার্টর আলোচনার রশি এবার হাতে নিয়ে বলেন, "আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে জানি, কিভাবে– ইসরাইলীরই নিজ সংকল্পে অবিচল থেকে যায়। প্রেসিডেন্ট সাদাত যখন আল্-কুদ্সে যান, এখন তারা এ জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই সফর তাদেরকে এক ঘরে করে দেয়। কিন্তু আল্-কুদ্সের আলোচনা থেকে যখন আপনি মিসরী ডেলিগেশন প্রত্যাহার করে নিয়ে আসেন তখন সবাই ভাবল এটা প্রেসিডেন্ট সাদাতের ভুল। অথচ এর আগে বেগিন প্রচণ্ড আক্রমণের শিকার হচ্ছিলেন। আমি

জানি কি কারণে মিসর তার প্রতিনিধি দলকে প্রত্যাহার করে নেয়, কিন্তু জনমত বলে, হয়ত এটা বেগিনের ভুল ছিল না।"

মুহম্মদ ইব্রাহীম কামেল আরও বর্ণনা করেন যে, এ পয়েন্টে এসে কার্টার প্রেসিডেন্ট সাদাতের দিকে তাকান এবং তাঁর মুখোমুখি বলেন– "আমি আপনাকে ধোঁকা দিতে চাই না, আবার আমার দায়িত্ব থেকেও সরে যেতে চাই না। কিন্তু আপনার সহযোগিতা ও জনসমর্থন ব্যাতিরেকে ইসরাইলকে তার অবস্থানে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে বাধ্য করতে সক্ষম নই, দ্রুতভাবেও নয় আস্তেও নয়। তবে আপনার দিকে চেয়ে আমি তাদের ওপর পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারি। আর আমেরিকার ইহুদীদের সম্পর্কে বলছি, দিন দিন তাদের অনুভূতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, বেগিন ও তাঁর সরকারই হচ্ছে শান্তির পথে বড় বাধা। কিন্তু আমি ও বেগিন যদি মুখোমুখি হই তখন আমেরিকার ইহুদীরা বেগিনের পক্ষে না দাঁড়ানো তাঁদের জন্য কঠিন হবে। এ জন্যই বেগিনের ওপর চাপ দেয়ার জন্য আমি কিছু কংগ্রেস নেতা ও ইহুদী নেতাকে আমার পাশে রাখতে চাই। কিন্তু যদি প্রেসিডেন্ট সাদাত সংলাপ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে বেগিন বলবে– আমরা চাই, সাদাত চায় না।

প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর উদ্যোগের প্রেক্ষাপট আবারও সবিস্তারে তুলে ধরেন এবং আমেরিকার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রেসিডেন্ট কার্টার প্রস্তাব করেন যে, তিনি বেগিনকে ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমেরিকার অবস্থান জানিয়ে দেবেন। সভা শেষ হওয়ার আগে ব্রেজনেস্কি (কার্টারের উপদেষ্টা) প্রেসিডেন্ট সাদাতকে অনুরোধ জানান যেন তিনি ওয়াশিংটনের ইহুদী লবির সাথে যোগাযোগ করে বেগিনের ওপর চাপ সৃষ্টিতে কার্টারকে সহযোগিতা করেন। তিনদিন নিউইয়র্কে কাটিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাত যেদিন থেকে বুঝতে পারলেন যে, ইসরাইলী সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে থাকে– বিশ্ব জায়নিষ্ট সংস্থা।

॥ ৫ ॥

শিমন পেরেজ

"শোনে হে আজরা! আমি নীল নদ থেকে অচিরেই একটি শাখা বের করে মাকাবে তোমাদের জন্য পানি নিয়ে আনবো।"

—আজরা ওয়াইজম্যানকে (প্রেসিডেন্ট সাদাত

সাদাত ও কার্টারের মধ্যে অনুষ্ঠিত ওয়াশিংটনের বৈঠকে যদিও এ সিদ্ধান্ত হয় যে, কার্টার বেগিনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাবেন। কিন্তু তাবত দুনিয়ার যতসব সমস্যার ভিড়ে কার্টার এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেননি। অথবা বলা যায় নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি এমন কিছু করাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন।

প্রেসিডেন্ট কার্টার ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হলেও সময় তার নির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে যায়। এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাতও হাত গুটিয়ে আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। তিনি তাঁর সর্বশেষ ওয়াশিংটন সফরের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেন যে বেগিনের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য অন্য আরও কিছু ফোরাম রয়েছে। তিনি ওয়াইজম্যানকে বেগিন থেকে খসিয়ে আনার চিন্তা করেন। অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ক্রাইসকির মধ্যস্থতায়, অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত ইসরাইলী শ্রমিক দলের সমাবেশে আগত বিরোধী দলীয় নেতা পেরেজের সাথেও বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারেন প্রেসিডেন্ট সাদাত। আর তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাঁর সফরসঙ্গী না হওয়ার কথা জানান। কারণ এটি একটি দলীয় সমাবেশ। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে তিনি একে সরকারী রূপ দিতে চান না। কিন্তু সফরের দিন সকাল সাড়ে ছ'টায় ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করে জানান যে তাকে আজ প্রেসিডেন্টের সাথে ভিয়েনায় যেতে হবে।

সাদাতের সাথে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। বিমান যখন অস্ট্রিয়ায় উদ্দেশ্যে আকাশে উড়ছে, প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর খাস কামরায় ঘুমাতে যান। যাতে ওখানে পৌঁছে ক্লান্তিহীন সতেজতায় দিনের কর্মসূচীতে মনোযোগ দিতে পারেন। দুপুরে খাবার সময় সাদাতের স্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে একই টেবিলে খাবার খান। এর ফাঁকে তিনি অনুরোধ করেন যে, প্রেসিডেন্ট যেন একলা ইসরাইলীদের সাথে কথা না বলেন। তিনি যেন সাথে থাকেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল তখন বলেন, তিনি তো চান না যে আমি এসব আলোচনায় থাকি। তখন বেগম সাদাত বলেন,

দেখুন, প্রেসিডেন্ট মনের কথা মুখে বলে ফেলেন। আর ইসরাইলীরা হচ্ছে খুবই কুটিল ও ধুরন্ধর। তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট সরাসরি কি বলে ফেলেন। এবার মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল বললেন, এটা তো আপনিও তাঁকে বলতে পারেন। বেগম সাদাত বলেন, আমি বলতে পারব না। কারণ আমি তার সাথে সরকারী কোন বিষয়ে কথা বললে তিনি রাগ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাত শেষ পর্যন্ত পেরেজের সাথে একাই সাক্ষাৎ করেন। কাজেই তাঁদের মধ্যে কি কথা হয় তা জানার সূত্র কেবল প্রেসিডেন্ট সাদাত নিজেই। তিনি তাঁর সফর সঙ্গীদের যতটুকু বলেন, তাছাড়া কিছুই জানা যায়নি। তিনি দু'টি পয়েন্টে গুরুত্বারোপ করে তাদেরকে জানান।

প্রথমত পেরেজ তাঁকে বলেন যে, "দুর্ভাগ্য হলো, আপনার আল্‌-কুদ্‌স সফরের ঐতিহাসিক উদ্যোগটি বেশ দেরিতে নিলেন। যখন সফর করলেন তখন ক্ষমতায় আছেন বেগিন। তিনি এখন এ বিশ্বাসটি জোরেশোরে নিজের পক্ষে কাজে লাগিয়েছেন যে, তিনিই শেষ পর্যন্ত আরবদেরকে ইসরাইলে আসতে বাধ্য করেছেন।"

দ্বিতীয়ত ইসরাইলের সকল রাজনীতিক, যাদের মধ্যে বেগিনের ঘনিষ্ঠজনরাও রয়েছেন, তাঁরা এখন অভিযোগ করছেন যে, তাঁদের নেতাকে এখন এঁক ধরনের অহংকার ও আত্মশ্লাঘায় পেয়ে বসেছে যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত আল্‌-কুদ্‌সে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সফরের পর তিনি এখন কারও পরামর্শ শোনতে প্রস্তুত নন। কারণ তিনি হচ্ছেন প্রথম ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী যিনি ইসরাইলের রাজধানীতে একজন আরব নেতাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর সফর সঙ্গীদের আরও জানান যে, তিনি এখন একটি ফন্দি আঁটছেন কিভাবে " বেগিনকে যা দিয়েছেন তা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবেন অথচ তাঁর আল্‌-কুদ্‌স সফরের মাধ্যমে যে উচ্ছ্বসিক শৌর্য সৃষ্টি হয়েছে তা বহাল থাকে।"

সম্ভবত এই দিক থেকে চিন্তার ধারাবাহিকতাই তাঁকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে, ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াইজম্যানকে তিনি অস্ট্রিয়ায় তাঁর সাথে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর মনের কথা ছিল 'আজরাকে মেনাহিম বেগিন থেকে ছিনিয়ে নেয়া।'

ভিয়েনা থেকে সালজবুর্গ–অস্ট্রিয়ার এই সফরের পরিবেশ ছিল অদ্ভুত রকমের। এটা ছিল এমন সব ঘটনাতে ঠাসা যা প্রথম মুহূর্তে চিন্তা করাও অসম্ভব। এর কিছু ঘটনার প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সাক্ষী হিসাবে আমরা মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেলের স্মৃতিকথা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে পারি। ৩১৫ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল বর্ণনা করেছেন ঃ

অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ক্রাইসকির দেয়া নৈশভোজ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট সাদাত, চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট? অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্টের স্পীকার, অস্ট্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাদের স্ত্রীগণ এবং তিনি (মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল) নিজে। এ সময় মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চলে। ক্রাইসকি বলেন, শান্তি আলোচনায় এখন বাদশাহ্ হুসেইনের যোগ দেয়ার সময় এসে গেছে। এতে ফিলিস্তিন সঙ্কটের সমাধান পাওয়া যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তর দেন যে, "বাদশাহ্ হুসেইন সুবিধাবাদী রাজনীতি অনুসরণ করে থাকেন। তিনি কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে চান না। এখন তো অপেক্ষায় আছেন কখন পশ্চিম তীর তাঁকে হাদিয়াস্বরূপ দেয়া হবে।" সকলকে উদ্দেশ্য করে প্রেসিডেন্ট সাদাত আরও বলেন– "স্বভাবতই আপনারাও জানেন যে, বাদশাহ্ হুসেইনের পিতা বাদশাহ্ তালাল উন্মাদ অবস্থায় মারা যান। তাঁর কাছে খবর আছে যে, বাদশাহ্ হুসেইনের মধ্যেও 'শেজোফ্রেনিয়া' রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।" সাদাতের কথা শোনে খারাপ লাগল। বেশ বুঝতে পারলাম, অন্যরাও আমার মতোই অনুভব করেছেন। ক্রাইসকি ও ব্রান্ট প্রত্যেকেই বাদশাহ্ হুসেইনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহস ও মেধার প্রশংসা করলেন এবং বললেন, তিনি জর্ডানের বিরাজমান কঠিন পরিস্থিতিকে বুঝতে পারেন। ৩১৬ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমরা ভিয়েনা এয়ারপোর্ট থেকে সালজবুর্গ এয়ারপোর্টের পথে বিমানে ছিলাম। আমাদের সাথে হাসান তেহামীও বিমানে চড়েছিল। আমাদের মধ্যে কথা চলছিল ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে দায়ানকে নিয়ে। প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁকে আদৌ সহ্য করতে পারতেন না। এর বিপরীতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজরা ওয়াইজম্যানকে বেশ পছন্দ করতেন। হঠাৎ করে হাসান তেহামী বলে উঠলেন যে, তাঁর বিশ্বাস, দায়ান হচ্ছে সেই মসীহ দজ্জাল যার আবির্ভাবের কথা তাওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি সেভাবেই তাঁকে দেখতে পান যখন মরক্কোতে তাঁর সাথে বৈঠক করেন। এ সময় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সাদাত বলেন– হাসান, ওই বিষয়টিকে এখানে টেনে আনতে চাই না।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর সালজবুর্গের বৈঠকগুলোর ঘটনাবলীর বড় রহস্যটি কিন্তু কাউকেই বলেননি, বিশেষ করে ওয়াইজম্যানের সাথে বৈঠকে যা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট সাদাত ওয়াইজম্যানকে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি বেগিনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এবং অনেক দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন। সে জন্যই পুরস্কারটি মূল্যবান হওয়ার দরকার ছিল। যাতে তা থেকে কেউ চোখ ফিরিয়ে নিতে না পারে বা তার কথা খেয়াল থেকে ছুটে যায়।

প্রেসিডেন্ট সাদাত স্পষ্টবাদী ছিলেন, যখন তিনি বর্ণনা করেন, তিনি ওয়াইজম্যানকে বলেছিলেন ঃ "বেগিন রাজনীতির কিছুই বোঝেন না। কিন্তু তিনি সব কিছুতেই স্পষ্টবাদী ছিলেন না। কারণ এরপর ওয়াইজম্যানকে বলা তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে গেছেন। উভয়ের মধ্যে আলাপের এক পর্যায়ে তিনি ওয়াইজম্যানকে বলেন, শান্তির পিছনে অনেক বড় বড় সুযোগ অপেক্ষা করছে, যেগুলোকে বেগিন নদীতে নিক্ষেপ করছেন নিছক তাঁর বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা আর দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার কারণে। প্রেসিডেন্ট সাদাত ওয়াইজম্যানকে বলেন, 'শোন আজরা আমি যা ভাবছি তা হচ্ছে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ শান্তি। এটা হচ্ছে সব কিছুতেই সহযোগিতা— শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে.......।'

এরপর তাঁর শব্দাবলীতে আরেকটু চাপ দিয়ে বলেন– হ্যাঁ, কৃষিতে। আমি নীল নদের একটি শাখা বের করে সুয়েজ থেকে ভার্টির দিকে আরীশে নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি। সেখান থেকে আপনাদের কাছে সিনাই ও নাকাবে এক সাথে পৌঁছে যাবে। আপনি এ সহযোগিতার দিগন্তকে ভাবতে পারেন ? বেগিন তাঁর গ্রাম্য এ্যাডভোকেটের ঘিলু নিয়ে এটা বুঝতে কখনও সক্ষম হবেন না। তিনি দূর দর্শনের (Big vision) লোক নন। ওয়াইজম্যান খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। মন্তব্য করলেন, এখন তিনি যা শুনছেন তা মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তির নিশ্চিত ভবিষ্যতের শক্তিশালী প্রমাণ।

প্রেসিডেন্ট সাদাত বলেন, আপনাকে যা বললাম তা যেন কেউ না জানে। তিনি আরও বলেন, তিনি এ বিষয়ে দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং যারা সুয়েজ খাল ও সিনাই অঞ্চলকে ভালভাবে জানে এমন বড় বড় প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। তারা সবাই এ পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে এটা বাস্তবায়ন করতে পারা যাবে বলে মত দেন। তিন বছরের বেশি সময় লাগবে না।

ওয়াইজম্যান শান্ত গলায় বলেন, প্রেসিডেন্ট, আপনি পূর্ণ গোপনীয়তার অনুরোধ করে তো এত বড় প্রস্তাবকে কাজে লাগানোর পথে আমার তৎপরতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন। আপনি যেভাবে শান্তির ভবিষ্যৎ রূপরেখা পরিকল্পনা করছেন এতে অন্যদের বোঝাতে হলে তো কিছু লোককে তা বলতেই হবে। এর মধ্যে বেগিনও আছেন। প্রেসিডেন্ট তখন এ কথা ফাঁস হলে মিসরে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা বোঝাতে চেষ্টা করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি ওয়াইজম্যানকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেন, "আমরা এমন কি বেড়িবাঁধের পরও মিলিয়ন মিলিয়ন ঘনমিটার পানি সমুদ্রে ফেলে দেই। সমুদ্রে ফেলে দেয়ার চাইতে আমরা সিনাই ও নাকাবের দিকে তার প্রবাহ দিতে পারি। আমি কোন

সম্পদকে, কেবল এমন কি শত্রু থেকেও বাধ্যগ্রস্ত করার জন্য নষ্ট করাকে অপছন্দ করি। আর এক্ষেত্রে তো এমন শত্রু যে অচিরেই বন্ধু হতে চলেছে।" এ প্রস্তাবটি ছিল সত্যিই অচিন্ত্যনীয়। প্রস্তাবটির উৎস সম্ভবত ইঞ্জিনিয়ার উসমান আহমাদ উসমান। এ প্রস্তাবের রেশ ধরেই ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে চলল বিভিন্ন বৈঠকের মাধ্যমে। যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি।

অষ্টম অধ্যায়

ক্যাম্প ডেভিড ও তারপর !

অক্টোবর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে যে সব বিপজ্জনক ডিগবাজি খেল তাতে আরব বিশ্ব প্রমাণ করল যে, সেটাই এখনও একমাত্র অঙ্গন যার অধিবাসীদের থেকে এখনও যে কোন অক্ষম আমেরিকান প্রেসিডেন্টও তার নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার সুযোগ-সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন সুবিধা লাভ করতে পারে। অথচ একই সময় ইসরাইল এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজটি করত। কারণ নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার সময়টি হলো হোয়াইট হাউসে প্রবেশ আকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে তার বড় বড় পাওনা বোঝে নেয়ার মহেন্দ্রক্ষণ।

॥ ১ ॥

কার্টার

"সাদাত সবুর করতে পারছেন না, কার্টারও না। কিন্তু আমি পারি। কারণ আমার হাতে সময় আছে।"

—আমেরিকার জায়নিস্ট আন্দোলনের নেতাদের উদ্দেশ্যে মেনাহেম বেগিন

ঘটনার অনিরুদ্ধ বিবর্তন, পরিস্থিতির ভিন্নতা, শাসকদের মেজাজের পারস্পরিক বৈপরীত্য, আরব জাতিকে পেয়ে বসা সাধারণ ঘুরপাক ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিবান ও চিন্তাবিদদের অভ্যন্তরে টানাপোড়েনের আকার আর যুগের জঞ্জাল সবকিছু মিলে দৃষ্টিকে ঢেকে দিয়েছিল এবং ভূমধ্যসাগরের সেই দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ওপর সেই গুরুত্বপূর্ণ সেতুর ছায়া আবার বিস্তার করল। ফলে 'পবিত্র ও নিষিদ্ধ' ধারণা যা এতে প্রকাশ পায় এবং তার চারপাশে মজবুত হয়ে উঠেছিল তা সহসাই পরিণত হলো এমন কিছু ঐতিহ্য লালিত স্মৃতিতে যার অনুভূতি ও উচ্ছ্বাস এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু ইসরাইল ছিল সদা সজাগ ও সতর্ক। এদের মধ্যে অনেকেই উচ্চাঙ্গের দূরদর্শী কৌশল অনুসরণ করে থাকেন। আল্-কুদ্স থেকে সালজবুর্গে বিমানগুলো যাওয়া–আসাই করল। কিন্তু সবকিছু ঝুলে রইল প্রেসিডেন্ট সাদাতের সেই উজ্জ্বল উদ্যোগটির সীমানায়। এখনও ইসরাইল এর কোন জবাব দিল না, কেবল কয়েকটি প্রকল্প ছাড়া যা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম, এমনকি অর্ধেক শান্তিও ।

সালজবুর্গের পর ইংল্যাণ্ডের লীডস দুর্গে একটি সম্মেলন হয়। এতে মিসর, আমেরিকা ও ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। এই বৈঠকের ভাগ্যও অন্যগুলোর মতো হলো। কেবল ইসরাইল ছাড়া সকলের সামনেই ব্যর্থতা মূর্তিমান হয়ে রইল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় মেয়াদের নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন। এ সময় মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট ছাড়া তার আর কোন আশা নেই। তদুপরি তিনি বাস্তবেও সেই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই এ বিষয়কে তার কর্মতৎপরতায় রেখেছেন। ভেবেছিলেন যে, এটাই হবে তার প্রেসিডেন্ট আমলের সবচেয়ে বড় সাফল্য। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত বিনা হিসাবেই অগ্রিম দিয়েছেন, এখন ইসরাইল সেই অগ্রিমের কিছুটা হলেও পরিশোধ করা দরকার। [সম্ভবত কার্টারের আসল ভাবনাটি ছিল– ইসরাইলের উচিত তাকে (কার্টারকে) কিছু বিনিময়

দেয়া– যা প্রেসিডেন্ট সাদাত তার সম্মানে ইসরাইলকে দিয়েছিল] প্রেসিডেন্ট সাদাত যেমনটি ফেব্রুয়ারির বৈঠকে ওয়াদা করেছিলেন সেভাবে কার্টার এখন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও আমেরিকার ইহুদী নেতাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দেন। কখনও কখনও তো এতদূর পৌঁছে যান যে, ফিলিপ ক্লুতজনেককে বলেন– "যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীগণ এখন একটি পরীক্ষার সম্মুখীন। আমার ও বেগিনের মধ্যে কোন সঙ্কট দেখা দিলে তাদের তো মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে এখন ঠিক করে নির্দেশ করতে হবে তাদের ভক্তি ও আনুগত্যের স্থল কোনটি।"

এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাত সম্ভবত কার্টারের সাথে সমন্বয় না করেই একই ধরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন বিশ্ব জায়নিস্ট পরিষদ ও আমেরিকান ইহুদী নেতাদের সাথে। চ্যান্সেলর ক্রাইসকির সাথে ভিয়েনাতে যেসব বন্ধুদের সাথে পরিচিত হয়েছেন তাদেরকে এটা বোঝাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন যে, বেগিন এখন এমনকি আমেরিকান ইহুদীদের স্বার্থ নিয়েও জুয়া খেলছে। আর তিনি এখন গোটা অঞ্চলটিকে এক ব্যাপক গোলযোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন যদি তিনি তার গোঁড়ামিতে অনড় থাকেন। এতে কিছু ফল হলো। বেগিনের ওপর এমনকি ইসরাইলের অভ্যন্তরেও চাপ বাড়তে লাগল। বিশেষ করে যখন তার দলীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রভাবশালী ও প্রিয়ভাজন মহলে প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রস্তাবটির কথা জানাজানি হয়ে গেল। নীল নদ থেকে শাখা বের করে ইসরাইলের পানি সরবরাহের ব্যাপারে ওয়াইজম্যানকে প্রেসিডেন্ট সাদাত ইতোপূর্বে প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন। ১৯৭৮-এর জুলাই মাসের শেষের দিকে আমেরিকার ইহুদী লবি প্রধান "মোরিস অমিতাই" ইসরাইলে যান। ইনি আমেরিকা-ইসরাইল পাবলিক এ্যালায়েন্স কমিটির প্রধান।

ইনি আমেরিকাতে জায়নিস্ট ও ইহুদী আন্দোলনের পক্ষ থেকে এই উদ্বেগ ও আকুলতা নিয়ে আসনে যে, তাদের অধিকাংশই সাদাতের এই উদ্যোগে বিস্ময় বিমুগ্ধ। আমেরিকার প্রশাসন বিশেষ করে স্বয়ং কার্টার তাদের প্রতি প্রতিদিনই একই সুরে বলছেন যে, এই মহতী উদ্যোগের জবাবে বেগিন ইসরাইলের পক্ষ থেকে কোন প্রত্যুত্তর করল না। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট সাদাত আমেরিকাতে এখন টেলিভিশন তারকা হয়ে উঠেছেন। প্রতিটি সংবাদ বুলেটিনে তাঁর ছবি যেন এ কথাই বলছে যে, তিনি তাঁর সাধ্যমতো বরং তার চেয়েও বেশি করেছেন। কিন্তু তিনি এখন পর্যন্ত এর কোন উপযুক্ত জবাব পাননি। সকাল-সন্ধ্যায় প্রকাশিত আমেরিকার পত্র-প্রত্রিকা কেবলি বলে যাচ্ছে যে, তাঁর প্রশাসনের ওপর বিপদ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যদি না তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যে, তার এ ঐতিহাসিক সফর নিছক কোন টেলিভিশনের দৃশ্য ছিল না যেমন তা অন্তর্হিত হওয়ার পর তার সব রং আর শব্দ মিলিয়ে যায়!

বেগিন আঁচ করলেন যে, অমিতাই যে চিত্র তুলে ধরছেন তাতে তার কিছু ঘনিষ্ঠ সহকারীসহ ইসরাইলের বেশকিছু সংখ্যক রাজনীতিক প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারেন।

তাই তিনি অমিতাইয়ের নিকট আমেরিকার জায়নিস্ট ও ইহুদী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে যাঁরা উৎকণ্ঠিত ও দ্বিধান্বিত তাদেরকে তাঁর সাথে জরুরীভাবে একান্ত সাক্ষাতে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্র 'নেছাবিয়ায়' আমন্ত্রণ জানান।

আমেরিকার জায়নিস্ট সংস্থার মহারথিদের নিয়ে বিমানগুলো এলো এবং গোটা পরিবেশ নতুন আবহ পেল। তাদের এই নিবিড় সমাবেশের আসনে বসে মেনাহেম বেগিন তাঁর চিন্তাধারাকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সত্যিই বটে তিনি একটি সুধীত মামলার যোগ্য এ্যাডভোকেট। বেগিন তাঁর বক্তব্য শুরু করে বলেন, তিনি আমেরিকান ইহুদী নেতৃবৃন্দের উদ্বেগের কথা শুনেছেন। তিনি তাঁদের এ উদ্বেগের কারণগুলো বেশ বুঝতে পারেন। কিন্তু তিনি তাদের কাছে এ সময়সন্ধিক্ষণে এই আরজ করছেন, যেন তাঁদের উদ্বেগ পাছে তার ও ইসরাইলী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টিকারী একটি বিষয়ে পরিণত হয়ে না যায়।

তারপর তিনি বলেন – কেউ কেউ বলছেন যে, আমি দীর্ঘ সময় অপচয় করছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে, কোন সময় অপচয় হয়েছে। আমার ধারণা, আমাদের কৌশল আমাদের পরিকল্পিত পথেই অগ্রসর হচ্ছে। আমি দু'টি পয়েন্টে তা বুঝিয়ে বলছি–

প্রথমত আমি মনে করি, এটাই শ্রেয় হবে যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত এক পা দু'পা করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করুক যে তিনি যদি আমাদের সাথে কোন চুক্তি করতে চান তাহলে কেবল মিসর-ইসরাইল দ্বিপাক্ষিক চুক্তিই করতে হবে। তিনি শুরুতে দাবি করলেন ইয়াহুদ ও সামুরা থেকে ইসরাইলের পূর্ণ প্রত্যাহার। বরং তিনি আল্-কুদ্সের বিভক্তিতে ফিরে যাবার জন্য আমাদেরকে অনুরোধ করেন। এটা আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে– হয়ত আমার সাথে আপনারাও একমত হবেন যে– এটা অসম্ভব। আমি তো ইসরাইলের ঐতিহাসিক স্বপ্ন নষ্ট হতে দিতে পারি না। তাছাড়া ইসরাইল জাতি আমাকে সবার কাছে পরিচিত কিছু কর্মসূচীর ভিত্তিতেই নির্বাচন করেছে। আর এই কর্মসূচী হচ্ছে গোটা ইসরাইল ভূমির ওপর ভিত্তি করেই। আমরা তো মিসর থেকে কেবল এটুকু চাই যে, সাদাত এটা উপলব্ধি করুন যে, আমাদের সাথে তার একলা শান্তি-চুক্তি করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। তিনি কেবল মিসরের পক্ষ থেকেই আমাদের সাথে শান্তি-চুক্তি করবেন, আর কারও নয়।

তাছাড়া আমি যে সরকার চালাচ্ছি তার নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল হয়েই প্রেসিডেন্ট সাদাত আল্-কুদ্সে এসেছিলেন। আমি যখন তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই তখনও এ নীতির রূপরেখার ওপর জোর দিয়েছি। কারণ আমি চাইনি যে, আকস্মিক কোন চমকের জন্য আমি কিছু ছেড়ে দেই। কাজেই লোকটি আমাদের কাছে কি পেতে পারে তা জেনেশুনেই এসেছিলেন। আর যদি তাঁর দরাজ প্রত্যাশা

তাঁকে এই কল্পনায় নিয়ে গিয়ে থাকে যে, আরও বেশি কিছু পাবেন, সেটা তো ইসরাইলের কোন অপরাধ নয়। সরকারেরও নয়, আমার গোনাহ্ও নয়। আমাদের সামনে কেবল একটাই করার আছে যে, তিনি নিজে নিজে এই বাস্তবতায় পৌঁছার জন্য সুযোগ করে দেয়া। আমাদের যা বলার ছিল তা আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতেই বলে দিয়েছি। সরকারী বিবৃতিগুলোতেও তা জানিয়ে দিয়েছি। একই কথা আমাদের সাথে আলোচনা বৈঠকগুলোতেও বলেছি। আমরা কোন কিছুই লুকিয়ে রাখিনি।"

বেগিন আরও বললেন– "এ ছাড়া সাদাত তো আমাদের কাছে অন্য কারও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আসেননি। তিনি আমাদের কাছে আসার আগে কোন আরব বাদশাহ বা প্রেসিডেন্টের সাথে পরামর্শও করেননি। একমাত্র যে প্রেসিডেন্ট আসাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন তিনিও তাঁর পক্ষ থেকে কথা বলার ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করেন। কাজেই তিনি আমাদের কাছে এসেছেন একা। কাজেই আমাদের সাথে চুক্তি করতে চাইলে তিনি একাই স্বাক্ষর করবেন– কেবল তাঁর দেশের পক্ষে। আপনাদের কেউ কেউ যে অপেক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত তা বস্তুত একটি প্রয়োজনীয় অপেক্ষা যাতে সাদাতের মাথায় এই বাস্তবতাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাঁর কর্মকাণ্ডও এই বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত এ ব্যাপারে যদি তড়িঘড়ি করার থাকে তাহলে তা করবেন প্রেসিডেন্ট সাদাত– আমরা নই। কারণ তিনি তাঁর ভবিষ্যৎকে নিজ হিসাব-নিকাশে এ উদ্যোগের সাথে জড়িয়ে ফেলেছেন। তিনি নিজেই তো এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। আশা করি আমার এ মূল্যায়নে আপনারাও দ্বিমত করবেন না যে, এমন কোন আরব রাজনীতিক নেই যে ব্যর্থ হলে পদত্যাগ বা ইস্তফা দিতে প্রস্তুত আছে। তবে যে বাস্তবতাকে আমিও স্বীকার করি তা হচ্ছে সাদাত আসলে ব্যর্থ হননি। বরং তাঁর উদ্যোগে তিনি সফলই হয়েছেন। অবশ্য তিনি যেভাবে ভাবেন সেভাবে নয়। তিনি এ উদ্যোগের মাধ্যমে মিসর-ইসরাইল চুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন। এর বেশি তাঁর সীমা অতিক্রম করার অধিকার নেই। যদি তিনি ক্ষমতায় থাকতে চান বা লাইম লাইটে থাকতে চান তাহলে তাঁকে আমাদেরকে নয়– এ উদ্যোগের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে চলতে হবে। কাজেই তড়িঘড়ি তাঁর করা দরকার, আমাদের নয়।

বেগিন এবার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কার্টারের অবস্থান সম্পর্কে বলেন– "হয়ত প্রেসিডেন্ট কার্টার হচ্ছেন আরেকজন যিনি এ ব্যাপারে দ্রুত চলতে চান। সেটা তাঁর নির্বাচনী কারণে। আমি আপনাদেরকে খোলাখুলিই বলতে চাই যে, আমেরিকান প্রেসিডেন্টের রুটিন ওয়ার্কের কারণে আমার অবস্থানে কোন হেরফের হবে না। কারণ

আমেরিকার নির্বাচনী বিধিমালায় ইসরাইল ভূমির ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন ধারা-উপধারা নেই। এটা তো আমরা এখানে সিদ্ধান্ত নেব।"

বেগিন তাঁর বক্তব্যের পরিসমাপ্তিতে বলেন, তিনি চেয়েছেন জায়নিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও আমেরিকার ইহুদী নেতাদের সামনে তাঁর যা বলার তা তুলে ধরবেন যাতে তারা ইসরাইলকে সাহায্য করতে পারেন– ইসরাইলের বিপক্ষে নয়। এটা তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

নাহুম গোল্ডম্যান এ সভার কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় অস্ট্রীয় চ্যান্সেলর ব্রনো ক্রাইসকির কাছে বলার সময় মন্তব্য করেন– "বেগিন এ বৈঠকে তাঁর প্রতিভাকে প্রমাণ করেন এবং মৈত্রী সংস্থাগুলোর কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আদায় করে নেন। তাঁরা তাঁর সাথে সহানুভূতি দেখাতে প্রস্তুত হয়ে যান। যদিও ইতোপূর্বে তাঁদের মনে কিছু ওয়াসওয়াসা ঢুকেছিল।"

এটা নিশ্চিত ছিল যে, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার যিনি তাঁর নির্বাচনী কারণে তড়িঘড়ি করছিলেন, তার কাছে "নাহারিয়ার বৈঠকের কিছু বিবরণ পৌঁছেছিল। এ সময় তিনি ভাবছিলেন, এটাই কি এখন একমাত্র পথ যে মিসর-ইসরাইল একলা সমাধানের উপায় সন্ধান করবে। তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজনেস্কি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, তিনি এ মর্মে প্রেসিডেন্ট থেকে নির্দেশনা পেয়েছেন, যেন মিসর-ইসরাইল চুক্তির সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দেয়া হয়। উইলিয়াম কার্ডাট তাঁর 'ক্যাম্প ডেভিড' গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় লেখেন– "আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কার্টার মিসর-ইসরাইল চুক্তির লাইনে কাজ করতে লেগে গেলেন। তাঁর উপলব্ধি ছিল এই হচ্ছে একমাত্র পথ যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি আনা সম্ভব। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্স কিন্তু এ পথে এগুতে রাজি হলেন না। এ কারণে হয়ত বা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তাঁকে বাদ দিয়ে ওই অঞ্চলে যাবার জন্য তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার মণ্ডেলকে দায়িত্ব দেন। তিনি সেখানে গিয়ে এই পরিকল্পনা পেশ করেন যে, ক্যাম্প ডেভিডে একটি শীর্ষ সম্মেলন হবে। সেখানে তাঁর (কার্টার) সাথে প্রেসিডেন্ট সাদাত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিন উপস্থিত থাকবেন। এখানে প্রথমত মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়াই লক্ষ্য থাকবে। তবে একটি ব্যাপকভিত্তিক শান্তি–সমাধানের সম্ভাবনাকেও খতিয়ে দেখা হবে। সেটা হবে সাধারণ ও অনির্দিষ্ট ভিত্তিতে। কারণ স্পষ্ট। তা হচ্ছে, এই সমাধানের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো যেমন সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জর্ডান এই শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রিত নয়। তাছাড়া এরা এখন পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে ইতিবাচক অংশগ্রহণ থেকে পিছে পড়ে আছে।

ওয়াল্টার মণ্ডেল এই (ক্যাম্প ডেভিড) পরিকল্পনাটি প্রেসিডেন্ট সাদাত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিনের নিকট পেশ করার জন্য তখনই ওই অঞ্চলের দিকে উড়ে যান।

প্রেসিডেন্ট সাদাত এক শর্তে রাজি হন যে, যুক্তরাষ্ট্রকে কার্যত এ আলোচনায় অংশীদার হিসাবে যোগ দিতে হবে। এদিকে বেগিন কিছু সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। তাঁর ভাষায়, তিনি ভয়ে ছিলেন, পাছে এ বিষয়ে কোন ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছেন কিনা। কিন্তু তার এ সাধ্য ছিল না যে, আমেরিকান প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা তথা অংশগ্রহণে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে আলোচনায় যেতে অস্বীকার করবেন। কারণ তাতে তিনি আমেরিকান জায়নিস্ট ও ইহুদী আন্দোলনের নেতাদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার যে ভিত অর্জন করেছেন তা হারিয়ে ফেলতে পারেন। স্বয়ং আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে রাগাবার বিষয়টি তো রয়েছেই।

ভ্যান্স মূলত ক্যাম্প ডেভিড পরিকল্পনায় দোদুল্যমান ছিলেন এই ভেবে যে, এটা সাদাত বা বেগিন কেউই মেনে নেবে না। এখন যখন উভয়ই ফর্মূলাটা মেনে নিলেন এখন তো আর ভ্যান্স বসে থাকতে পারেন না। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে এসে এই সম্মেলনের আয়োজনে লেগে যান। এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাত এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন তিনি গোড়া থেকে এটাই চাচ্ছিলেন। কারণ তিনি তো মিসরের ভূমিকা শিকেয় তুলে রাখতে পারেন না বা আসাদ, আরাফাত অথবা গাদ্দাফি বা অন্য কারও দয়ার ওপর ছেড়ে রাখতে পারেন না। তিনি চান কিছু করতে। তিনি তাঁর তৎপরতায় একলা কোন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান না, বরং তিনি চান এমন একটি আদর্শ নমুনা রেখে যেতে যা অবশিষ্ট আরবরাও অনুসরণ করবে, অন্তত কোন একদিন যখন তাদের সামনে এ ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। যখন মণ্ডেল ওয়াশিংটনে ফিরে এলেন এবং মনে হলো যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত মিসর-ইসরাইল চুক্তির লক্ষ্যে অগ্রসর হতে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– তখন ওয়াশিংটনে সবাই ভাবলেন যে, চুক্তিটি এখন হাতের নাগালে। ব্রেজনেস্কির মন্তব্য ছিল, যা তিনি প্রেসিডেন্ট কার্টারকে উৎসাহ দেবার জন্য বলেন– "মিসর-ইসরাইল সম্পর্ক থেকে ফিলিস্তিন ইস্যুকে দূরে রাখুন। বাকিটা দেখবেন সবই সহজ।"

ক্যাম্প ডেভিডের ত্রিমাত্রিক শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সম্মতির কথা শোনে মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো চমকে উঠলেন। কারণ 'মিসর ও ইসরাইলের মধ্যকার বিরোধ যখন ১৮০ ডিগ্রীতে অবস্থান করছে তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এতে হাত দেয়া এক রকম জুয়া খেলা বা বিপদসঙ্কুল অভিযাত্রায় নামার মতো।

রাত গভীর হলেও তখনই পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে তার আপত্তি জানাতে যান। মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল বর্ণনা করেছেন ঃ

মধ্যরাতের পর প্রায় একটা বাজতে চলেছে, তখন আমি মামুরাং অবকাশ কেন্দ্রে পৌঁছলাম। ভয়ে ছিলাম, হয়ত প্রেসিডেন্ট এখন বিছানায় চলে গিছেন। কিন্তু আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম এবং তার প্রতিক্রিয়া জানতে আমার ছিল আকুল আগ্রহ। মুখ্য সচিব

হাসান কামেলের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তিনি তখন চলে যাওয়ার পথে। প্রেসিডেন্টের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, তিনি এখন বাগানে সেহ্রীর খাবার খাচ্ছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসিডেন্টের ওখানে গেলাম। দেখি তাঁর সামনে মাহে রমাদানের সব বিশেষ বিশেষ খাবার। আমাকে দেখে তার সাথে বসতে আমন্ত্রণ জানালেন, তবে কোন কিছু বললেন না। তিনি তাঁর মজাদার খাবার খেতেই ব্যস্ত থাকলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমি বললাম ঃ ভ্যান্স আমাকে ক্যাম্প ডেভিডে একটি শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়ে জানিয়েছেন, আপনি নাকি সেখানে উপস্থিত থাকার সম্মতি দিয়েছেন।" তিনি বললেন হ্যাঁ, হ্যাঁ, এর জন্যই তো আমি শুরু থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমেরিকা এখন পূর্ণ শরিকের ভূমিকা পালন করবে। ভ্যান্স আমাকে প্রেসিডেন্ট কার্টারের নিশ্চয়তা জানিয়েছেন যে, তিনি এটা অবশ্যই করবেন। ভুলে যাবেন না, এই সম্মেলন ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট কার্টার তাঁর ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দেবেন। এ জন্যই আমি আস্থাশীল ও নিশ্চিত যে, আমরা সফল হবই। কারণ সম্মেলনের সফলতা ও ব্যর্থতা এখন আমাদের হাতে। এখন সময় এসেছে, ইসরাইলের ওপর আমেরিকার চাপ সৃষ্টির এবং মেনাহেম বেগিনকে তার প্রকৃত আকার ও স্থানে সাইজ করার। আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আমি আশাবাদী এবং আমার উদ্যোগ ব্যর্থ হতে পারে না ? আমি বললাম "ইনশাআল্লাহ আপনি অচিরেই সফল হবেন।" এ ছাড়া আমি আর কিছু বলার মতো ভেবে পেলাম না। কিছু সময়ের জন্য নীরবতা নেমে এলো। তাই আমি আঙ্গুরের একটি ছড়া হাতে নিয়ে আঙুল চালাতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর সাদাত বললেন, মনে পড়ে, যখন আমরা জেলে ছিলাম ? মুহাম্মদ! তুমিও আমার সাথে ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হবে।" আমি আপনা থেকেই জবাব দিলাম "ইনশাআল্লাহ।" মুহাম্মদ ইব্রাহীম কামেল বর্ণনা করে যাচ্ছেন, "হঠাৎ আমি বলে ফেললাম, "আমার একটু ছুটির প্রয়োজন।" প্রেসিডেন্ট হতভম্বের ভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন– "আপনার উদ্দেশ্য কি ? আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ।" আমি উত্তর করলাম ঃ আমি তা জানি সে জন্যই তিন-চারদিন একটু বিশ্রাম নিতে চাই। তখন প্রেসিডেন্ট বললেন, আপনি 'হযরত আব্দুর রহমান উপকূলে' কেন যাচ্ছেন না ?"

ক্যাম্প ডেভিডের জন্য প্রস্তুতি শুরু হলো। তিনটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও তাদের গোয়েন্দা অফিসগুলো তাদের কাগজপত্র, নোট ইত্যাদি ও আলোচনাগত অবস্থান নির্ধারণে লেগে গেল। কিন্তু এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাত তেমন গা করলেন না। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদাতকে বললেন, এভাবে চলতে পারছি না। সম্মেলনে আমাদের কৌশল কি হবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তিনি তাঁকে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সভায় যোগ দিতে বলেন। ইসমাইলিয়ার এ বৈঠক সম্পর্কে মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিখছেন ঃ প্রহরীরা আমাদেরকে ফোরসান দ্বীপের অবকাশের সুপরিসর

টেরাসে নিয়ে গেল। এ অবকাশ কেন্দ্রটি আল-মুর্রার হ্রদ বেষ্টিত ছিল। এখানে প্রেসিডেন্ট সাদাত তখন টেলিভিশনে মাহে রমাদানের অনুষ্ঠান দেখছিলেন। আমাদের স্বাগত জানাতে উঠে এলেন। আমার সাথে যখন করমর্দন করলেন তখন এই প্রথমবারের মতো অনুভব করলাম যে, আমাকে স্বাগত জানাতে তিনি একটু বুঝি কুণ্ঠিত। যাক আমরা বসে টেলিভিশন দেখতে লাগলাম। বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি ও পানীয় এলো। মাহে রমাদানে যে রকম হয়ে থাকে। এ সময় বারান্দায় একটি লম্বা টেবিল রেখে তার সাথে চেয়ার রাখা হলো। একটু পরেই প্রেসিডেন্ট এসে আমাদেরকে সভার টেবিলে ঘিরে আসন গ্রহণ করতে বললেন। মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। প্রেসিডেন্ট তার চারপাশে তাকিয়ে হাত তালি দিলেন তৎক্ষণাৎ একজন প্রহরী হাজির হলো। তখন প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন, হিম্মত ও সা'দ জগলুল কই ? তাদেরকে ডেকে পাঠানো হলো এবং সভার টেবিলের কাছে তাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করা হলো। এক মিনিট পরেই টেলিভিশনের পরিচালিকা হিম্মত ও প্রেসিডেন্টের সংবাদ বিষয়ক দায়িত্বশীল সা'দ জগলুল কাগজ কলম নিয়ে ঢুকলেন এবং প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের স্থানে বসলেন। হতভম্বতায় আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেল। কারণ জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠক হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক বৈঠক। এ বৈঠকে যা কিছু হয় তা সর্বোচ্চ গোপনীয় বিষয়। সাধারণত এ বৈঠকের বিষয়ে কিছু প্রকাশ করতে চাইলে প্রেসিডেন্ট সভার কোন সদস্য বা প্রধানমন্ত্রী অথবা কখনও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তা বলার দায়িত্ব দেন। আর বিশেষ করে এ সভাটি ছিল ক্যাম্প ডেভিডে মিসরী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার মতো একটি বিপজ্জনক গোপনীয় বিষয়। কারণ সম্মেলনে কি স্ট্র্যাটেজি ও টেকনিক অনুসরণ করা হবে তা-ই এখানে আলোচনা করা হবে। এটি ছিল খুবই স্পর্শকাতর ও টপ সিক্রেট ব্যাপার। আমি কিছুটা রাগ ও অস্বস্তিবোধ করলাম। আমি আমার আসন ছেড়ে প্রেসিডেন্টের দিকে অগ্রসর হই, এ বিষয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য। কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছার পর দ্রুত নিজেকে সংবরণ করে নিলাম। কারণ বিষয়টি তাকে ও আমার নিজেকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবে। কারণ তাদের দু'জনকে সভায় আমন্ত্রণ জানানোর পর তাদের উঠিয়ে দেয়া কঠিন। আর তিনি যদি আমার কথা না রাখেন, এবং তাদেরকে বসিয়ে রাখার ব্যাপারে গোঁ ধরেন তখন তো আমার অবস্থা হবে করুণ। প্রেসিডেন্ট আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, মুহাম্মদ। কিছু দরকার ?" প্রেসিডেন্ট সাদাত তার পরিকল্পনার কথা বলতে লাগলেন ঃ "ভ্যান্স যখন কার্টারের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন আমি তা গ্রহণ করলাম এবং তাকে জানালাম যে, আমিই এ পরিকল্পনার প্রস্তাব দেয়ার ছিলাম, কিন্তু তারা আমার আগেই তা দিলেন। আমি ভ্যান্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ও প্রেসিডেন্ট কার্টার কেমন জমিনে দাঁড়িয়ে আছেন ? উত্তর করলেন– শক্ত মাটির ওপর। আামি তাকে

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা বেগিনকে নিয়ে কতদূর যেতে প্রস্তুত ?" তিনি উত্তরে বলেন– "শেষ পর্যন্ত। কারণ প্রেসিডেন্ট কার্টার দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না, যদি না তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট সমাধান করে শান্তির হিরো হিসাবে ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পারেন।"

আমি ইসরাইলের সাথে একাকী সমাধান চাই না। এ ধরনের কিছুর জন্য আমি আমার উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। আমি চুক্তির একটি মডেল রেখে যেতে চাই। এতে দাখিল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সবাই স্বাধীন। আমি সকল আরবকে স্পষ্ট করেই বলব যে যুদ্ধ ও শান্তির ফয়সালা মিসরের হাতে। মিসর আরব জাতির অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশির পক্ষ থেকে কথা বলবে। এরপর গোয়েন্দা পরিচালক হিসাবে কামাল হাসান আলী তার কাগজপত্র পেশ করেন। সভার কিছু সদস্য এ নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তাঁকে জানিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট কার্টার মনে করেন, এ সম্মেলন পুরো সপ্তাহব্যাপী চলবে। তার মতে আমরা যেন ক্যাম্প ডেভিডের প্রথমদিককার দিনগুলোতে কঠিন অবস্থান গ্রহণ করি, যাতে পরে আমেরিকানদের সামনে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে আমাদের সামনে সুযোগকে জায়গা করে দেই। একথা শোনে প্রেসিডেন্ট বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে যাত্রার নায়কের মতো অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়েন। তারপর বলেন, আরে মুহাম্মদ, এরপরও কি তুমি নিজেকে একজন কূটনীতিক ভাবতে পার ? এরপর আবারও হেসে বলেন, কসম, তুমি কোন কূটনীতিক নও। আমি যাওয়া মাত্র সরাসরি ফর্মূলা পেশ করে সম্মেলনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বেশি হলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।

প্রেসিডেন্ট সাদাত এ সময় এমনভাবে কথা বলতেন যেন ক্যাম্প ডেভিড সম্মেলনটি তাঁর দয়ার ওপর আছে। কারণ তিনি তাঁর ভাষায় সবকিছু বাস্ট করে দিতে পারেন, প্রেসিডেন্ট কার্টারের নির্বাচনী সুযোগ ধূলায় মিটিয়ে দিতে পারেন, মেনাহেম বেগিনকে নিরাভরণ করে ছেড়ে দিতে পারেন এবং স্বভাবতই তাঁরা দু'জনে এ ধরনের বিপদকে মোটেই সামলাতে পারবেন না। কাজেই তাঁর মূল্যায়নে তাঁদের উভয়ের সামনে এখন তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছাড়া কোন গতি নেই। অধিকন্তু তিনি লণ্ডন ও প্যারিসে লোক লাগিয়ে রেখেছেন যেন ক্যাম্প ডেভিড থেকে তাঁর নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার সাথে সাথেই বেগিনের বিরুদ্ধে প্রচারণা যুদ্ধ শুরু করে দেয়। প্রেসিডেন্ট সাদাতের বিমানটি প্যারিসে নেমে তাঁর পরিবারকে এখানে অপেক্ষায় ছেড়ে গেল। তবে ঐ রাতে ফরাসী প্রেসিডেন্ট জেসকার দেস্তাঁর সাথে ডিনার করলেন। ফরাসী প্রেসিডেন্ট, ক্যাম্প ডেভিডের বৈঠকে আদৌ কোন ফলোদয় হওয়ার ব্যাপারে তাঁর নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁকে বলেন যে, তিনি (আইজেনহাওয়ারের আমলে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী) জন ফস্টার ডালাসের সেই

পুরনো স্টাইলেই কাজটি করবেন। সবাইকে গভীর গর্তের একেবারে কিনারে এনে ছাড়বেন। দেস্তাঁ এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না। ভাবলেন, হয়ত তাঁর এমন কোন পরিকল্পনা রয়েছে যা কাউকে জানাতে চান না।

ক্যাম্প ডেভিড সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় সবাই নিজ নিজ বর্ণনা লিখে গেছেন। সেই পুরো তিন দিনের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি না করেও উল্লেখযোগ্য দু'একটি দৃশ্যের অবতারণা করা যায়।

সূচনা দৃশ্য ঃ প্রেসিডেন্ট সাদাত কার্টারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন, যাকে তিনি নিজেই বলেছেন (কার্টারের বর্ণনা অনুযায়ী) যে, এটা হচ্ছে নিছক আলোচনাগত অবস্থান। এটা অবস্থান রেকর্ড করর জন্যই পেশ করা হয়েছে মাত্র। তা ছাড়া এটা হচ্ছে ডেলিগেশনে মিসরের কিছু কট্টর সদস্যকে চুপ রাখার কৌশল। কারণ তারা কোন দিকে ছোটেন কিছু বলা যায় না। কার্টার এ ধরনের আচরণে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি এটা বুঝতে পারেননি। কার্টারের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল যখন প্রেসিডেন্ট সাদাত বললেন– তিনি এ পরিকল্পনাটি বেগিনের উপস্থিতিতে পুরোটা পড়বেন, যখন তিনজনে প্রথম বৈঠকে বসবেন। কার্টার বলেন– সাদাত জানতেন যে, সাদাতের পেশ করা এ পরিকল্পনাটি শোনে বেগিন বিস্ফোরণে ফেটে পড়বেন, আর তাই মিসরী প্রেসিডেন্ট তাঁকে অনুরোধ করেন যেন এটা শেষ অবধি শোনার জন্য বেগিনকে অনুরোধ জানান। কিন্তু এটাই মিসরের চূড়ান্ত অবস্থান নয়। এরপর প্রেসিডেন্ট সাদাত বলেন, তাঁর কাছে আরেকটি নমনীয় পরিকল্পনা রয়েছে যা এ কট্টর পরিকল্পনা থেকে ভিন্ন। ডেলিগেশনের একজন সদস্য তা জানে, কারণ এটা প্রণয়নে তিনিই সহযোগিতা করেছিলেন।

এ ছিল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের অভিনব সূচনা যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক, স্ট্র্যাটেজিক, জাতীয় ও দেশীয় ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সূচনা পর্ব ও সমাপ্তি পর্বের দৃশ্যপটগুলোর মাঝখানে ক্যাম্প ডেভিডে আরও কত যে চিত্রের অবতারণা ঘটে! মিসরী ডেলিগেশন বলা যায় কিছুই জানত না যে আসলে হচ্ছেটা কী! অথচ তারা পাশাপাশি কক্ষেই অবস্থান করছিল।

–পররাষ্ট্রমন্ত্রী পুরোটা সময় সন্দেহে ছিলেন যে তাঁর থেকে দূরে কিছু একটা ভোজন চলছে, তিনি তার ঘ্রাণ তো পাচ্ছিলেন, কিন্তু দস্তরখান দেখতে পাচ্ছেন না।

–এদিকে বুট্রস ঘালি তো হাসান তেহামীর অবস্থা দেখে বেহাল। তিনি অদৃশ্য কাদেরকে সালামের জবাব দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, কাকে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন ? হাসান তেহামী নাকি বলেন যে, সাইয়্যেদেনা খিজির (আ)-এর সালামের জবাব দিয়েছেন। বুট্রস ঘালি বলেন, হাসান তেহামীর অবস্থার এতই অবনতি হয়েছে যে, তাঁর জীবনের আশঙ্কা করছিলেন।

–প্রেসিডেন্ট সাদাতকে ওয়াইজম্যান বলেন যে, তাঁর প্রতি প্রেসিডেন্টের আস্থার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখন তিতা ওষুধের মতো পররাষ্ট্রমন্ত্রী দায়ানকেই দরকার। তিনিই পারেন বেগিনকে প্রভাবিত করতে।

পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট সাদাত ভাবছেন, হয়ত তাঁর টেলিফোন মনিটর করা হচ্ছে। সম্ভবত তাঁর ধারণা ঠিকই। তাই তিনি এ মনিটরদের মাধ্যমেই কিছু বার্তা চালান করে দিতে চাইলেন। যেমন ধরুন আলোচনা চলছে মাঝখানে তিনি ফ্রান্সে অপেক্ষমাণ তাঁর বেগম জিহান সাদাতকে ফোনে বলছেন– এখানে ব্যাপার সব জটিল হয়ে যাচ্ছে, তাঁর মনে হচ্ছে আগামীকালই ক্যাম্প ডেভিড ছেড়ে চলে আসতে হবে। এর পিছনে স্বভাবতই তাঁর উদ্দেশ্য হলো কার্টার জানুক যে তাঁর ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। এর পর তিনি আরেকটু এগিয়ে তাঁর সেক্রেটারি ফৌজি আব্দুল হাফেজকে নির্দেশ দেন যেন তাঁর লাগেজ, বাক্স-পেটরা গুছিয়ে নেয়, ডেলিগেশনের অন্যান্য সদস্যকেও একই কাজ করার কথা বলেন। উদ্দেশ্য একটাই, এটা দেখানো যে তাঁর সফর শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা ছিল, অন্যরা এসবের মাজেজা বুঝতেন যা ধৈর্য শেষ হওয়ার প্রকাশ থেকেও বেশি কিছু ছিল।

প্রেসিডেন্ট কার্টার নতুন এই ফর্মুলা নিয়ে অগ্রসর হবেন বলে মনে হয়। সেটাই হবে শান্তির প্রেক্ষিত এবং তাতে প্রেসিডেন্ট সাদাত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিন স্বাক্ষর করবেন। এর পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে এর সাক্ষী হিসাবে এতে স্বাক্ষর করেন। প্রেসিডেন্ট কার্টার উভয় পক্ষের কাছে অনুরোধ জানচ্ছেন যেন এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার কংগ্রেসের যৌথ সভার সামনে তাঁর বিবৃতি প্রদান শেষ করার আগে, এ চুক্তি সম্পর্কে কোন বিবৃতি, মন্তব্য ইত্যাদি হতে বিরত থাকেন।

আমি এটা পড়া শেষ করার পর প্রেসিডেন্ট সাদাত আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হেহ্, এখন তোমার কি মত ? আমি বললাম, কি বিষয়ে আমার মত ? তখন তিনি বললেন, মুহাম্মদ, তোমার দোষ ওই একটাই, তোমার ঘিলু হচ্ছে একরোখা তুর্কি ঘিলু, বুঝতে চাও না কিছু। আমি বললাম, বরং আমি পুরোটাই বুঝতে পারছি। তখন সাদাত উসামা আল বাযের দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে বললেন, উসামা, তাঁকে বলো তো, তোমার কি মত ? উসামা আমার দিকে তাকালেন। তিনি তাঁর অবয়বের ভাষাকে বশে রাখতে চাইলেন যাতে হাসি না পায়। তবে মুখে কিছুই বললেন না। সাদাত হাঁটুতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, মুহাম্মদ, আশা করি তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখবে, আমাকে বিশ্বাস কর না তুমি ? আমি বললাম, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বৈষয়িকভাবে কার্টারের ফর্মূলাতে কি আছে। আর এ পাতাটির তো কোনই মূল্য নেই। এ সময় সাদাত দ্রুত হাত বাড়িয়ে আমার আঙ্গুলের ফাঁক থেকে কাগজটি টান দিয়ে নিয়ে যান আর বলেন, "বরং এটা একটা বিপজ্জনক দলিল, একেবারে স্বয়ং

কার্টারের হাতের লেখা। আমি এটা আমার সাথে নিয়ে যাব এবং মিসরের গোপন ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করব।" পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাম্প ডেভিডে তার কক্ষে এসে তার সহকারীকে বলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে তার পদত্যাগপত্র পাঠাতে চান। তখন তার সচিব এ্যাম্বেসেডর "আহমদ মাহের" আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন।

এ সময়ে প্রেসিডেন্ট কার্টারের পরিকল্পনাটি এল। এ ছিল ইসরাইলী প্রস্তাবাবলীরই অবিকল নকল। তা হচ্ছে, নির্বাচনী বৈতরণীর কথা মনে রেখে প্রেসিডেন্ট কার্টার এখন বেগিনের ওপর এমন একটি শব্দও চাপিয়ে দিতে পারেন না, যা ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী চান না। বেগিনও জানেন যে, ক্যাম্প ডেভিডের এই অবকাশ কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এখন তার হাতের তালুতে বন্দী।

ডেলিগেশনের অপরাপর সদস্যের মতো পররাষ্ট্রমন্ত্রীও কার্টার-পরিকল্পনাটি পড়ে দেখেন। তিনি এগারোটার দিকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের বিশ্রামস্থানে যান। তিনি বারান্দায় ডঃ বুট্রস ঘালি ও ডঃ আশরাফ গেরবালসহ বসা ছিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল কয়েক মিনিট প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একা থাকতে দিতে অনুরোধ জানালে তারা দু'জন ওঠে চলে যান। এখন কেবল প্রেসিডেন্ট ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল লেখেন ঃ "আমি শান্তভাবে প্রেসিডেন্টকে বললাম আমি তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নয়, এ হিসাবে কিছু কথা বলতে চাই যে, আমি তার বন্ধু ও ছোট ভাই, এক সাথে তেত্রিশ বছর জেলে নুনরুটি খেয়েছি। আপনিও অবগত আছেন আপনার প্রতি ও সত্যের জন্য আমার আন্তরিকতা কতটুকু! আমি চাই আপনি এমন কিছু না করেন যার জন্য আপনি পরে লজ্জিত হতে পারেন। সাদাত শান্ত কণ্ঠে বললেন, মুহাম্মদ তোমার আমার মধ্যে কোন পর্দা আছে ? যা ইচ্ছা বিনা দ্বিধায় বলো।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার আশঙ্কার সকল কারণ বলতে লাগলো।কিন্তু পরিশেষে প্রেসিডেন্ট সাদাত একথা বললেন যে, যত যুক্তিই দেখাও না কেন, ক্যাম্প ডেভিডের সাফল্যের ওপর প্রেসিডেন্ট কার্টারের নির্বাচনী সাফল্য নির্ভর করছে। দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি আমার সাথে দেয়া ওয়াদাগুলো বাস্তবায়ন করবেন। কারণ তিনি একজন মূল্যবোধ ও নীতির লোক। এরপর প্রেসিডেন্ট তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেন, "তোমার কি হয়েছে ? তুমি কি আমার বিরোধিতা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাফেজ আল-আসাদ আর গাদ্দাফির গালি শোনাতে চাও ? প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি বুঝি আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি এর শেষ পর্যন্ত যাব। তখন মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেল বলেন, তাহলে আমি অনুরোধ করছি, আমার ইস্তফা গ্রহণ করে নিন। সাদাত উত্তরে বলেন, আমি প্রথম থেকেই জানি, তুমি এপাশ ওপাশ করছ শেষে একথা বলার জন্যই, ঠিক আছে, আমি তোমার ইস্তফা গ্রহণ করব।"

॥ ২ ॥

মোস্তফা খলীল

"এসব কিছু কেবল প্রেসিডেন্ট কার্টারের ওয়াস্তে? ......ওপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক।"

—মিসর পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের প্রতি

ক্যাম্প ডেভিড থেকে আনোয়ার সাদাত ফিরে এলেন। অভিযাত্রী আর উচ্চাকাঙ্খীর অনুভূতি দিয়েই উপলব্ধি করলেন যে, তার সামনে খুবই জটিল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। কারণ তিনি ক্যাম্প ডেভিডে তার পুরো রসিদটাই একব্যক্তির মধ্যে পুঁজি খাটালেন। তিনি হচ্ছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। যিনি চূড়ান্ত মুহূর্তে তার সামনে থেকে সরে গেলেন আর সব কিছুই দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ওপর নির্ভরশীল আশায় ঝুলিয়ে রাখলেন। তখন তিনি সব বিনিময় চুকিয়ে দেবেন যা এখন অগ্রিম ও বেহিসাবীভাবে পেলেন।

এটা নিশ্চিত নয় যে, প্রেসিডেন্ট কার্টার প্রেসিডেন্ট সাদাতকে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এখন অগ্রিম যে ছাড় দেয়া হলো তা পরবর্তীতে চুকিয়ে দেবেন। কারণ সাদাতই এসব তার সহকারীদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন। কার্টার এ ধরনের কোন কারবারের কথা অস্বীকার করেন। তবে এটা স্পষ্ট যে, কার্টার এ ধরনের একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যখন তিনি সাদাতকে বলেছিলেন–" আমার ক্যাম্প ডেভিড থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং বৈঠক হওয়ার ঘোষণা দেয়া দুটোই। আমার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়ার বিপক্ষে প্রভাব ফেলবে।" প্রেসিডেন্ট সাদাত তার দিক থেকে এই ভাষ্যকে আশা হিসাবে লুপে নেন এবং এটাকে সুনির্দিষ্ট কারবারে পরিণত করেন। এ বিষয়টি পরখ করে দেখার সুযোগ কাউকে দেননি। যে বৈঠকে মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম কামেলের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ডঃ বুট্রস ঘালি, উপদেষ্টা উসামা আল-বাযের সামনে সাদাতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি কারণে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন ? প্রেসিডেন্ট সাদাত তার একটি রহস্যময় উত্তর দেন– "প্রেসিডেন্ট কার্টার দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়াই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।" এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন—"এসব কিছুই কেবল কার্টারের খাতিরে ? ....ওপর লা'নত। (অভিশম্পাত সম্পূর্ণ করেন কার্টারের মা এবং বাপের ওপর ফেলে!)

যাহোক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্তফা দিয়ে একলা মিসরে ফিরে আসেন। সাদাতের সামনে পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক। যা গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া, নয়তো ব্যর্থতা স্বীকার করা। সেক্ষেত্রে মিসর ও আরব বিশ্বে তার অবস্থান হতো খুবই কঠিন।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে যে প্রেক্ষিত রচিত হলো তা হচ্ছে মিসর-ইসরাইল একলা চুক্তি। তাছাড়া এতে বেগিন যে সিনাই অঞ্চল থেকে "ইয়ামিত" বসতি সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছেন তা ছিল শেষ পর্যন্ত মিসর একলা চুক্তির বিষয় কবুল করার বিনিময়ে। বেগিন নিজেই কার্টারকে বলেন যে, "সাদাত মিসরের জন্য ততটুকুই নিতে পারবেন যতটুকু তিনি ফিলিস্তিন থেকে দেবেন।"

বস্তুত সাদাত কেবল ফিলিস্তিনের অংশই দেননি বরং মিসরকে প্রাচ্যের আরব থেকে গুটিয়ে এনেছেন। ঐতিহাসিক স্থল সেতুবন্ধনও শেষ করে দিলেন কেবল কতকগুলো ফাঁকা বুলির তুবড়িতে– যা কোন নীতি তো দূরে থাকুক কোন একটি কৌশলও নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। ফিলিস্তিনের ব্যাপারে একটি উপধারাতে সাদাত স্বাক্ষর করে এসেছেন যাতে বলা ছিল যে, ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অংশে স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার ব্যাপারে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে যদি বাদশাহ হুসেইন অপরাগ সাব্যস্ত হন, সেক্ষেত্রে মিসর সে ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।

এ কারণেই প্রথমে বাদশাহ হুসেইন প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রথম পরিকল্পনাটি দেখে একমত পোষণ করলেও ইউরোপে বসে ক্যাম্প ডেভিডের ফলাফলের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু চুক্তির বিষয় জানতে পেরে তিনি মরক্কোর বাদশাহ হাসানকে জানিয়ে দেন যে, রাবাতে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে আসন্ন বৈঠকে তিনি যোগ দিচ্ছেন না।

এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের মাথাব্যথা জর্ডানকে নিয়ে নয়– সৌদী আরবকে নিয়ে। তাই তিনি প্রেসিডেন্ট কার্টারকে অনুরোধ করেন যে, অচিরেই যেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্সকে সৌদি আরবে পাঠিয়ে তাদের শান্ত রাখেন। কারণ, ক্যাম্প ডেভিডের ব্যাপারে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এজন্যই মিসরে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হারম্যান এলেট্সকে সাথে নিয়ে তিনি যখন মিসরের উদ্দেশে রওনা দেন তখন ব্যাকুলতার সাথে জিজ্ঞাসা করেন, ভ্যান্স কি রিয়াদে রওনা হয়ে গেছে। এলেট্স তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, "ভ্যান্সের বিমান এখন রিয়াদের পথে টেক অফ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তার সাথে রয়েছে প্রেসিডেন্ট কার্টারের একটি জোরাল বার্তা।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত মিসরের পরিস্থিতি আঁচ করে ভাবতে লাগলেন যেন জনগণকে শান্তির ফায়দা নিয়ে ব্যস্ত রাখা যায়। চুক্তির বিস্তারিত নিয়ে সংলাপ চলাকালীন তারা

যেন ফিলিস্তিন ইস্যু এবং আরব বিষয়াবলী থেকে দূরে থেকে নিজেদের ভাগ্য চিন্তায় মশগুল থাকে। তাই সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। তার আশা ছিল, বিশেষ করে আমেরিকান সাহায্যের প্রতি। বিশেষ করে কার্টার তাকে এ ওয়াদা দেয়ার পর যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে আমেরিকা মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে সমতা বিধান করবে। কার্যত কংগ্রেসে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। 'মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির সাহায্য' নামে একটি বিল গ্রহণ করে আমেরিকান সাহায্য বাজেটে তার স্থান করে দেয়া হয়। যাহোক, দেশে ফিরে প্রেসিডেন্ট সাদাতের মনে হলো নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা দরকার। উদ্দেশ্য (১) ক্যাম্প ডেভিডের বিস্তারিত কার্যাদি দ্রুত সম্পাদন (২) আর অভ্যন্তরের সব কাজকে এভাবে বিন্যাস করা যাতে শান্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় সত্বর পৌঁছে যায়। যাতে তারা আবার বিশ্বের সমস্যাবলী থেকে দূরে নিজেদের নতুন জীবন নির্মাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

কায়রো পৌঁছার পরের দিনই ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে ডেকে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনে দায়িত্ব দেন। তিনি প্রায় এগারোজন মন্ত্রীর সাথে কথাও বলেন। কিন্তু আমেরিকান রাষ্ট্রদূত সাদাতকে পরামর্শ দেন যে, ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন রাষ্ট্রের জরুরী মুহূর্তের জন্য রিজার্ভ ব্যক্তি। এ অবস্থায় তিনি একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে থাকলে সমস্যা দেখা দিবে। তাছাড়া অন্য ব্যক্তি হলে প্রয়োজনে তাকে পাল্টানোও যাবে। এ পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাত ডঃ মোস্তফা খলীলকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠনের জন্য অনুরোধ করেন। কারণ তিনি একা আর পারছেন না। ডঃ মোস্তফা খলীল বলেন, মাননীয়, আমরা তো সবাই আপনার সাথেই রয়েছি। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই আপনি আল্-কুদ্সে যেতে চাইলে আমি আপনার সফরসঙ্গী হতে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তিনি উত্তরে বলেন, এখন আরও বড় দায়িত্ব দিতে চাই। ডঃ মোস্তফা বললেন, আপনি তো হোসনি মোবারককে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। সাদাত বললেন ও চিন্তা আপনার করার দরকার নেই। ওসব আমি দেখছি। যা হোক, মোস্তফা খলীল প্রধানমন্ত্রী হয়ে ক্যাম্প ডেভিডের সেই প্রেক্ষিতকে শান্তিচুক্তিতে রূপ দেয়ার জন্য কাজে লেগে গেলেন। তিনি অভিজ্ঞ রাজনীতিক, পেশাদার কূটনীতিক ও তারকা টেকনোক্র্যাট হিসাবে যোগ্যতার সাথে মোশে দায়ান ও ইউসুফ বার্গের সাথে সংলাপে বসলেন। ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী দায়ানের সাথে মিসর-ইসরাইল চুক্তির মূলনীতির প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করছেন আর শেষোক্ত জন হচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার সাথে ফিলিস্তিনের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ পর্যায়ে মিসরী আলোচক দলের মধ্যে সংহতির অভাব আর বেশ কিছু গ্যাপ দেখে তিনি এদিকে পুনরায় ঢেলে সাজালেন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেন– ইসরাইলী ও মিসরী আলোচকদের মধ্যে আচরণ বিধি আরোপ করে। যেমন–

১. উভয় পক্ষের মধ্যে ভাল সম্পর্ক থাকতে হবে। কারণ আমরা এখানে শত্রু হিসাবে আসিনি যে একে অপরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করব। বরং শান্তিচুক্তিতে উপনীত হবার আগ্রহের সাথে সামনাসামনি বসব।

২. আলোচনা চলবে সভ্যতা, ভদ্রতা ও আদব এবং পারস্পরিক সম্মানবোধের মাধ্যমে। আলোচনাকালে কেউ আওয়াজ উঁচু করবেন না এবং কেউ কাউকে শব্দ ও বাক্যবাণে আহত করবেন না।

৩. আলোচনা অব্যাহত থাকবে বৈষয়িকভাবে। এতে কোন পবিত্র গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া চলবে না। এতে ঐতিহাসিক বিভিন্ন দাবি ও অযথা পথরোধ করতে পারবে না।

৪. সকলের রেফারেন্স হবে ক্যাম্প ডেভিডে স্বাক্ষরিত 'রূপরেখা চুক্তি।' ওই নীতিমালাসমূহের প্রেক্ষিতেই বিস্তারিত আলোচনা চলবে যাতে শান্তিতে উপনীত হওয়া যায়। কাজেই আলোচকদের উদ্দেশ্য হবে বিতর্ক থেকে বের হয়ে বাঞ্ছনীয় একটি রূপরেখা খুঁজে বের করা।

৫. সংলাপের কোন পক্ষই বৈঠক থেকে বের হয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর কথা বলতে যেতে পারবেন না। নিজ দেশের জনমতের ওপর নির্ভর করে মত বদলাতে থাকলে সমস্যা এসে পড়বে। কাজেই প্রতিটি বৈঠকের পরেই সংবাদ বিবৃতি দিতে হবে যাতে তা থেকে কেউ সরে যেতে না পারে।

৬. বৈঠকের বিষয় পূর্ণভাবে গোপন রাখতে হবে। উভয় দলনেতা যেটুকু সংবাদ মাধ্যমকে জানাবেন সেটুকুর বাইরে কেউ কিছু ফাঁস করতে পারবে না।

আলোচনা সুশৃঙ্খলভাবে এগুতে লাগল। কিন্তু ইসরাইলীরা বেকায়দায় পড়ল। কারণ ধর্মগ্রন্থের উদ্বৃতি ছাড়া তাদের কোন অধিকার কোথায়ও প্রতিষ্ঠিত নেই। এমনকি তাওরাতের উদ্ধৃতি বাদ দিলে তারা এখন আলোচনার টেবিলেও স্থান পায় না।

এদিকে ইতিহাসের উদ্ধৃতি ছাড়া আরবরা তাদের আইনগত ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছেন না। সেজন্যই 'বাস্তবতাই' হচ্ছে এখন সংলাপের মূল দিশারী।

আলোচনা যখন স্পর্শকাতর পর্যায়ে পৌঁছল তখন প্রেসিডেন্ট কার্টার তার দু'জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন যারা যোগাযোগ রেখে যাবেন এবং বৈঠকগুলোকে অনুসরণ করে যাবেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ দু'জন ব্যক্তিই ছিলেন ইহুদী– "রবার্ট স্ট্রাউস ও মূল লিনোভিশ"। এর উদ্দেশ্য ছিল জায়নিস্ট সংস্থাকে নিশ্চিত রাখা যে, যা কিছু হচ্ছে তাদের নিজস্ব পন্থাতেই হচ্ছে!

॥ ৩ ॥

খোমেনী

"প্রেসিডেন্ট কার্টার এখন তাঁর বন্ধু প্রেসিডেন্ট সাদাতের সহযোগিতার অপেক্ষায় আছেন।"

—প্রেসিডেন্ট কার্টারের উপদেষ্টা ব্রেজনেস্কি প্রেসিডেন্ট সাদাতের নিকট পৌছঁলে এক বার্তায় একথা বলা হয়।

ঘটনাবলী বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইসরাইলের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবার যে দায়িত্ব মোস্তফা খলীলকে দেয়া হয়েছিল তা বেশিদিন জীবন পায়নি। মাত্র কয়েক সপ্তাহ চলেছিল। তবে সময়ের এ সীমিত পরিসরেই মোস্তফা খলীল কিছু ভাবনা-চিন্তার উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—কোন না কোনভাবে মিসরের সাথে সমাধানের সঙ্গে ফিলিস্তিনীদের স্বায়ত্তশাসনের যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা।

ইসরাইলের সাথে মিসরের শান্তি-সন্ধির অগ্রাধিকারের সাথে অন্যান্য সংশ্লেষের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। এর মধ্যে রয়েছে আরব লীগের অঙ্গীকারের আবেদন অনুযায়ী আরব দেশগুলোর সাথে মিসরের সংশ্লিষ্টতা।

এ দুটো ভাবনার পিছনে মোস্তফা খলীলের উদ্দেশ্য ছিল যেন আরব বিশ্বের সাথে মিসরের সম্পর্ক বজায় থাকে।

কিন্তু ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৮-এ যখন মোস্তফা খলীল ব্রুকসেলে দায়ানের সাথে বসলেন, তখন দায়ান বললেন– (ঐ বৈঠকে উপস্থিত সাইরাস ভ্যান্সের বর্ণনা অনুযায়ী) মিসর ও ইসরাইলের সাথে শান্তি-সন্ধির অগ্রাধিকারের সাথে মিসরের যাবতীয় সংশ্লেষ—যার মধ্যে আরব বিষয়ক সংশ্লিষ্টতাও রয়েছে—এটা মিসরের পক্ষে আদৌ কাজে আসবে না। এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, এটা ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র কারোই স্বার্থ রক্ষা করছে না। অর্থাৎ এই ভাষ্যটি সকল আরব দেশের নিকট নিশ্চিত করে দেবে যে, মিসর ইসরাইলের সাথে একাই শান্তিচুক্তি করেছে এবং এ কারণে সে সকল আরব দায়-দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। তখন আরব দেশগুলো ভিতর অথবা বাইরে থেকে নানান হুমকির সম্মুখীন হবে। এর চেয়ে ভাল, এ সকল দেশ এটা জেনে রাখুক যে, প্রয়োজনে তারা মিসরের সাহায্য পাবে। এ প্রসঙ্গেও এটাই শ্রেয় হবে যে, আরব দেশগুলো নিজেরাই দেখুক যে মিসর ফিলিস্তিন সঙ্কট

নিয়ে বার বার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং ফিলিস্তিনের স্বায়ত্তশাসন ও মিসরের সমাধানের মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করছে। এছাড়াও যেহেতু বড় রাজনৈতিক ইস্যুগুলো গভীর ও ব্যাপক জটিলতার শেকড় বিস্তার করে থাকে, তাই মনে হয়, মোস্তফা খলীল প্রস্তুতির জন্য আরও কিছু সময় নিতে চান।

এভাবেই তিনি যদি জানতেন যে, ক্যাম্প ডেভিডের চুক্তি স্বাক্ষরের ৬ মাসের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে, কিন্তু স্বাভাবিকীকরণের প্রশ্নে ইসরাইলীদের স্পর্শকাতরতার বিষয়টি মনে রেখে সে পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই দু'মাসের মাথায় ইসরাইলী পক্ষকে স্বাভাবিকীকরণ চুক্তিসমূহের আলোচনায় আমন্ত্রণ জানান। একটার পর একটা চুক্তি হতে হতে তেইশটি চুক্তি হয়ে গেল। এ সময় মোস্তফা খলীল তার সহকারীদের একটি দলের মাধ্যমে অনেক টেকনিক্যাল বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করে নিলেন। এর মধ্যে রয়েছে ভূমি, পানি, অভিবাসন ও ইসরাইলে পুনর্বাসনের বিষয়সমূহ। এর মধ্যে কিছু আইনগত বিষয়ও ছিল–যার মাধ্যমে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির ফাঁকটি বন্ধ করার চেষ্টা ছিল। ঐ চুক্তিতে ফিলিস্তিনের স্বায়ত্তশাসন অঞ্চলের অধিবাসী ও ভূমির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার চেষ্টা চলে। কারণ ঐ চুক্তিতে ফিলিস্তিনীদেরকে তাদের ভূমির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি বরং তাদেরকে নিজ ভূমির স্বীকৃতি থেকে দূরে রাখার সকল উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মোস্তফা খলীল তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে বসে যা স্থির করেন তা হচ্ছে– কিছু সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী সার্কেলের ভিত্তিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিষদের নির্বাচন শুরু করাকে অগ্রাধিকার দেয়া। এ নির্বাচন যেন হাওয়ায় ঝুলে থাকা কোন তালিকা না হয়ে থাকে। তারপরে তার প্রস্তাব থাকবে যে, ভূমির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সার্কেলে থেকে নির্বাচিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিষদই হবে বৈধতার মূল তথা বিধান জারির উৎস। এরপর মোস্তফা খলীল কিছু ইসরাইলী নেতার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নিয়ে ঘনিষ্ঠ হতে চান। এদের মধ্যে ছিলেন আজরা ওয়াইজম্যান ও শিমন পেরেজ। এটা এই ভেবে করেন যে, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব অনেক সময় পথের বাধা অপসারণে সহায়ক হয়। মোস্তফা খলীলের এসব চেষ্টা তদবির যতটা পদ্ধতি ও প্রটোকলগত ছিল ততটা কিন্তু নীতি ও স্ট্র্যাটেজিগত ছিল না। হয়ত স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় সেটা এক সময় হতে পারত, কিন্তু তিনি সে সময় পেলেন না। মোস্তফা খলীল থেকে দায়িত্ব উঠিয়ে নেয়ার কিছু বাস্তবতা ও ব্যাখ্যা এমন ছিল–

১. কাউকে ক্ষমতা দেয়া প্রেসিডেন্ট সাদাতের ধাতেই নেই। হয়ত তিনি 'পরের মাথায় নুন রেখে বড়ই খেতে' চেয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে তো এটাকে ক্ষমতায়ন বা ক্ষমতা অর্পণ বলা যায় না।

২. মূলত প্রেসিডেন্ট সাদাত এ দায়িত্বটা মোস্তফা খলীলকে দিয়েছিলেন– ক্যাম্প ডেভিড জ্বর থেকে উঠে কিছুটা হালকা আমেজে বিশ্রাম নিতে। কারণ তিনি বলতেন

যে, ক্যাম্প ডেভিড থেকে বের হয়ে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর হাড় ভেঙ্গে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নৈতিক হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল।

৩. এ দায়িত্বটা তিনি দিয়েছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে যে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল আলোচক দলের মধ্যে তা চাপা দিতে। কারণ প্রচার মাধ্যমকে চাপে রেখেও ক্যাম্প ডেভিডের মূল কাহিনী পুরোপুরি আড়ালে রাখা যায়নি।

৪. যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ও ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক এ দুটো বিষয়ই হচ্ছে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আর প্রেসিডেন্ট সাদাতেরটা হচ্ছে স্বর্ণমুদ্রা। এটা তিনি অন্যের কাছে ছেড়ে রাখতে পারে না। কারণ আল্-কুদ্স সফর তাঁরই উদ্যোগ, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক তাঁরই বন্ধকী জিনিস। আর শান্তিই হচ্ছে সেই মানদণ্ড যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকভাবে হিসাব-নিকাশ করা হবে। কাজেই এমন একটি জিনিস প্রেসিডেন্ট সাদাত কর্তৃক তাঁর প্রধানমন্ত্রীর হাতে ছেড়ে রাখা যুক্তিসম্মত নয়, তা তিনি যেই হোন! মোস্তফা খলীল থেকে এই দায়িত্ব তুলে নেয়ার পিছনে এ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পাশাপাশি অন্য একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল। তা হচ্ছে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য। আর এ ছিল ক্যাম্প ডেভিড রূপরেখা চুক্তিকে শান্তি-সন্ধিতে পরিণত করার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাত কর্তৃক তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেয়ার অল্প কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। ইরানী বিপ্লব মধ্যপ্রাচ্যের চেহারাই পাল্টে দিল— যেমনি চিন্তা ও আন্দোলনগত দিক থেকে, তেমনি আবহ ও নীতির দিক থেকে।

মুহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহ্লভী ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে বের হয়ে যাবার পর যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে তার একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হারাল। মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য কৌশলগত বিন্যাসের নিগড় থেকে ইরানের বের হয়ে যাওয়াতে সাধারণ ভারসাম্যে এক বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটল। উপসাগরে চলে এলো অজ্ঞাত পরিচয় একটি পক্ষ, যা অতিশয় প্রভাব সৃষ্টিকারী। তাঁর হিসাব-নিকাশের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত তা আদৌ জানাই যায়নি।

তদুপরি ইরানের ভৌগোলিক অবস্থান, শাহ্ ও সেনাবাহিনী পশ্চিমা বিশ্বের নজরে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেলক্ষেত্রের নিকট পুলিশের ভূমিকা পালন করত। কাজেই এখন আঞ্চলিক বাস্তবতায় অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। আর তাই সকল দলিল দস্তাবেজ তালগোল পাকিয়ে গেল। সামনে এখন সম্পূর্ণ নতুন অবস্থা। মারাত্মক তো বটেই।

১৯৭৮-এর ডিসেম্বরে নতুন বছরের বিদেশনীতির রূপরেখা নিয়ে আলোচনার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্স প্রেসিডেন্ট কার্টারের অবকাশ কেন্দ্রে গেলেন। তখন দেখতে পেলেন, কার্টার মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে খুবই চিন্তিত। তাঁর বিশ্বাস (১৯৮০ এর আসন্ন নির্বাচনে) তার দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া না হওয়া

নির্ভর করছে এই উত্তপ্ত অঞ্চলের বিবর্তনশীল পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকে তার ওপর। প্রথমেই তো দেখা যাচ্ছে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হয়ে গেল। এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। আর শাহ্ তো নিজের মেজাজ নষ্ট করে এখন নিজের সিংহাসনও হারাতে বসেছেন। তিনি তো এখন তেহরান ছাড়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ভ্যান্স লক্ষ্য করলেন, কার্টার মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তাঁর প্রত্যাশাগুলোকে ঝুলিয়ে রাখছেন মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছা। ক্যাম্প ডেভিডের রূপরেখা দু'দেশের মধ্যে পূর্ণ শান্তি-সন্ধিতে রূপান্তরই হচ্ছে চূড়ান্ত রূপ। তার মতে, ইরানী বিপ্লব এ অঞ্চলকে যে ঝাকুনী দিয়েছে তার মোকাবিলায় এ অঞ্চলকে স্থিতিশীল রাখাই হচ্ছে একমাত্র পথ। কার্টারের উক্তি উদ্ধৃত করে ভ্যান্স বলেন, "আমাদেরকে ওখানে খুব জোরেশোরে কাজ করে যেতে হবে এবং যত কঠিনই হোক চুক্তিকে পিছানো যাবে না। কারণ এতে হয়ত আমাদেরকে স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে চড়া মাসুল দিতে হবে।"

ভ্যান্স জেনে নিলেন, আর সেটা কোন চমকও ছিল না যে, কার্টার যখন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থের চিন্তা করছেন একই সময়ে তাঁর দ্বিতীয় নির্বাচনের সুযোগটির কথাও চিন্তা করছেন। কার্টার তখন ভ্যান্সকে অনুরোধ করেন যেন মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছতে যে সব বিরোধের ক্ষেত্র রয়েছে তা যেন তিনি চিহ্নিত করেন। তিনি তা এভাবে চিহ্নিত করেন ঃ

১। মিসরের নতুন আলোচক (মোস্তফা খলীল) চেষ্টা করছেন মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে সমাধান ও ফিলিস্তিনীদের স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে একটি যোগসূত্র বের করতে। উদাহরণস্বরূপ মিসরের এই আলোচক চাচ্ছেন মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের বিষয়টি স্বায়ত্তশাসন শুরু হওয়ার সাথে বেঁধে দিতে।

২। অস্বাভাবিকভাবে বেগিনের চরম অবস্থান নেয়া এবং ফিলিস্তিনীদের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে কোন অর্থপূর্ণ আলোচনার বাইরে রাখার ব্যাপারে তার আগ্রহ। তিনি চান মিসর ইসরাইলের সাথে একা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে আরব বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য থেকে বেরিয়ে যাক।

৩। কিছু অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে কোন ঐকমত্য হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিকীকরণে দ্রুততা এবং মিসরী তেল ইসরাইলে সরবরাহ করা।

এ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট কার্টার তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে এ অঞ্চলে কাজ করার ব্যাপারে তিনটি দিকনির্দেশনা ছিল। প্রথমত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কার্টার একমত হন যে, মিসর-ইসরাইলী আলোচনার গতি ত্বরান্বিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে মোস্তফা

খলীল ও দায়ানকে ওয়াশিংটনে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিবিড় আলোচনার একটি বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হ্যারল্ড ব্রাউনকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের কবলে ইরানের পতনের পর সামরিক অবস্থান পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

তৃতীয়ত, কার্টার সিদ্ধান্ত নেন যে তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজনেস্কিকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে একটি বিশেষ ধরনের সাক্ষাতে পাঠানো হবে। তিনি এ অঞ্চলে ইরানের শূন্যতা পূরণে মিসরী ভূমিকাকে আরও নিবিড় করার ব্যাপারে চুক্তি করবেন। এর মধ্যে রয়েছে গোপন কার্যক্রমের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও মিসরের মধ্যে যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, চাই তা ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিপক্ষে হোক অথবা তার আশপাশের অঞ্চলে এর প্রভাব বিস্তারের বিপক্ষে। কারণ লক্ষ্য করা গেছে যে, এর আশপাশের অঞ্চল তার ডাকে সাড়া দিতে শুরু করেছে।

ব্রেজনেস্কি সাদাতের সাথে দেখা করার পর কার্টারের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠান যা পরে "কার্টার ফর্মূলা" হিসাবে অভিহিত হয়। এতে কয়েকটি নীতি ছিল এ রকম ঃ

প্রথমত, কোন সম্ভাব্য অথবা সুনিশ্চিত হুমকি দেখা দিলে উপসাগরীয় তেল সম্পদকে রক্ষার জন্য আমেরিকা সামরিক শক্তি দিয়ে তার সুরক্ষার প্রত্যয় ঘোষণা করে।

দ্বিতীয়ত, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে যথাশীঘ্র সম্ভব এটাকে শান্তিচুক্তিতে রূপান্তরিত করা। এমনকি যদি এ শান্তি কেবল মিসর ও ইসরাইলের মধ্যেই হয় এমনকি ফিলিস্তিনী ইস্যু এর মধ্যে জায়গা না পেলেও, যদি উভয় ইস্যুর মধ্যে সমন্বয়ের কোন উপায়ই না থাকে।

তৃতীয়ত, মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে পূর্ণ শান্তি চুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাবার সময় যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী জায়নিস্ট শক্তির সাথে প্রেসিডেন্ট কার্টারের সম্পর্ক বজায় রেখে যেতে হবে। বেগিনের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে কিছুটা নমনীয় রাখার কাজটি তারা করবে এবং এর বিস্তারিত সম্পর্কে ইহুদী ও জায়নিস্ট প্রেসার গ্রুপগুলো সব সময় অবহিত থাকবে। বরং তারা আলোচনায় কার্যত অংশগ্রহণ করবে। ব্রেজনেস্কির এই রিপোর্ট পড়ে কার্টার শেষে নিজ হাতে লেখেন–"নষ্ট করার মতো সময় দুনিয়ার কারও কাছে নেই, আমাদেরকে সর্বোচ্চ গতিতে এগুতে হবে।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত ব্রেজনেস্কির সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি কি বলবেন তার অপেক্ষা না করেই সাদাত আগে থেকেই ইরানের ঘটমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন—এ সম্পর্কে আগেই অব্যাহতভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে শৈথিল্য ও কাজে ধীর গতি তার কারণ যাই হোক—চাই কংগ্রেসের কারণে অথবা জনমতের তোয়াক্কা করে হোক—এ সব কারণেই মধ্যপ্রাচ্যের সবকিছু এখন যেখানে গিয়ে ঠেকল, সেখানে পৌঁছতে সুযোগ করে দিয়েছে। তার

মূল্যায়ন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম জটিলতার কারণে শাহ্‌কে সময়মতো উদ্ধারের উদ্যোগ নেয়নি। এখন ভিয়েতনামের বিষয়টি শেষ করে আসার সময় সমাগত। ঠিক আমি যে দৃঢ়তা ও অভিপ্রায়ে আল্-কুদ্স সফর করেছি সে রকমটিই করা দরকার।

ব্রেজনেস্কির বর্ণনা অনুসারে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা-এর উত্তরে প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রশংসা করেন। তারপর বলেন যে, দুঃখজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলোর এমনই প্রকৃতি যে আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে কোন কাজ করার সুযোগ দেয় না। এমনকি জনমত গঠনের আগে আকস্মিকভাবে কোন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারেন না। এ কারণেই আমেরিকার নীতি অনেক মূল্যবান সময় অপচয় করে ফেলে এবং বিরল সুযোগগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু এগুলো হচ্ছে আমেরিকা প্রশাসনের স্বভাব-প্রকৃতি, এটা পাল্টানোর ক্ষমতা কারও নেই।

এরপর ব্রেজনেস্কি মঞ্জিলে মকসুদে প্রবেশ করে বলেন–"কিন্তু আমাদের বন্ধুরা আমাদের ত্রুটিগুলোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন।" আরেকটু আগ বাড়িয়ে বলেন– "প্রেসিডেন্ট কার্টার এখন তাঁর দৃষ্টিতে তাঁর বন্ধু সাদাতের দিকে নিবন্ধ রেখেছেন এবং তাঁর সাহায্যের অপেক্ষা করছেন।" ব্রেজনেস্কি বলেন, আলোচনার এ বিন্দুতে এসে প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর পাইপ চেয়ে আনলেন এবং তামাক দিয়ে তা পূর্ণ করে তাতে আগুন ধরাতে চেষ্টা করে আমাকে বলছেন–"তিনি প্রস্তুত।" একটু সামলে নিয়ে আবার বলেন, "কিন্তু এবার আমাদেরকে পূর্ণ একমত হতে হবে যে, আমরা যদি কোন নীতিতে কাজ করা শুরু করি তাহলে কার্যসিদ্ধির পূর্ব পর্যন্ত কোন বিরতি ছাড়াই চূড়ান্তভাবে তা সুসম্পন্ন করতে হবে। এবার ব্রেজনেস্কি তাঁর যা বলার তা প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে পেশ করলেন। এর মধ্যে ছিল তেহরানের ক্ষমতায় যেন ইরানী বিপ্লব সুদৃঢ় হতে না পারে সেজন্য এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে কিছু কর্ম-পরিকল্পনা। তাঁর কাছে কিছু সংখ্যক উপসাগরীয় দেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিকল্পনাও ছিল। তিনি মিসর-ইসরাইল আলোচনাকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারেও প্রেসিডেন্ট কার্টারের আগ্রহের কথাও ব্যক্ত করেন এবং একে ফিলিস্তিনীদের স্বায়ত্তশাসন সমস্যাকে অন্ততপক্ষে কোন সময়সীমার সাথে যেন বেঁধে না দেন। এছাড়া ইসরাইলের সাথে শান্তি-সন্ধির অগ্রাধিকারের সাথে মিসরের অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বকে যেন যুক্ত করা না হয়। কারণ এ প্রশ্নগুলো এমন কিছু ইস্যুকে টেনে আনে যা বেগিন যথেষ্ট তাড়াতাড়ি স্বীকার করে নিতে বেগ পাচ্ছেন। এগুলো বেগিনের ওপর চাপিয়ে দেয়াও যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের পক্ষে কঠিন।

স্পষ্টতই প্রেসিডেন্ট সাদাত যেন তার সামনে একটি প্রস্তাব দেখতে পেলেন। তিনি নিজে নিজে এর ব্যাখ্যা করলেন যে, প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে এমন ভূমিকা

পালন করার অফার দিচ্ছে যাতে ইরানের শাহের শূন্যতা পুষে যায়। এ অঞ্চলে তিনি আমেরিকার বিশ্বস্ত পুলিশের ভূমিকা পালন করবেন।

ব্রেজনেস্কি ওয়াশিংটনে ফিরে কার্টারের কাছে তার মূল্যায়ন রিপোর্ট পেশ করেন যে ঃ

১. প্রেসিডেন্ট সাদাত এ অঞ্চলের উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

২. প্রেসিডেন্ট সাদাতের মূল গরজ হচ্ছে মিসর-ইসরাইল চুক্তিতে উপনীত হওয়া। ফিলিস্তিন ফ্রন্টিয়ারে কি হচ্ছে তা নিয়ে তার তেমন মাথাব্যাথ্যা নেই, যদিও তিনি চান ফিলিস্তিন ফ্রন্টিয়ারে শেষবারের মতো চেষ্টা করাই শ্রেয়। এতে দু'টি পথ খোলা রয়েছে ঃ

হয় আমেরিকা পিএলও'র সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেবে যে, মিসর এখনও তাদের ইস্যুটির ব্যাপারে সাহায্য করে যাবে।

অথবা গাজা উপত্যকাকে মিসরের কাছে দিয়ে দেয়া, যাতে সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে ফিলিস্তিনী স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা যায়। এটা হবে পিএলও'র সামনে তার হাতের তুরুপ। এতে একই সময় বাদশাহ হুসেইনের প্রতিও একটি ইশারা থাকবে যে, যখন তিনি এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত নন সেক্ষেত্রে ফিলিস্তিনীদের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে ভূমিকা পালনে মিসর প্রস্তুত রয়েছে। এতে আরব জনমতের সামনে ফিলিস্তিনীদের জন্য আরও বেশি কিছু চাওয়ার জন্য মিসরের ওপর চাপ দেয়া থেকে বাদশাহ বিরত থাকবেন।

৩. প্রেসিডেন্ট সাদাত নীতিগতভাবে তাঁর প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা খলীল ও ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে দায়ানের মধ্যে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কার্টারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বৈঠক হওয়ার ব্যাপারে একমত হন। এর আগে তিনিও তাঁর পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনীদের সাথে শেষ চেষ্টার আয়োজন করবেন।

একই সময় আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হ্যারল্ড ব্রাউনও মধ্যপ্রাচ্য সফর করে গেছেন এবং কার্টারের নিকট রিপোর্ট পেশ করেছেন। এর সারসংক্ষেপ হলো, প্রেসিডেন্ট সাদাত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিন ইরানে চলমান ঘটনাবলীতে উদ্বিগ্ন। উভয়ই আসন্ন নতুন বিপদের মোকাবিলায় এ অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এরপর তিনি পরামর্শ দেন যে, এ অঞ্চলের আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি আরও জোরদার করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, তাঁর সঙ্গে যে নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ হয় সবাই তা গ্রহণ করতে রাজি আছেন বরং কেউ কেউ আমেরিকার উপস্থিতি দ্রুত জোরদার করার অনুরোধ জানান। তাঁর মতে, সাদাত ও বেগিন উভয়ই ফিলিস্তিনীদের স্বায়ত্তশাসনের বিস্তারিত বিষয়ের জটিলতা নিরসনের অপেক্ষা না করেই উভয় দেশের মধ্যে পূর্ণ শান্তি-সন্ধির দিকে অগ্রসর হতে প্রস্তুত। সব শোনে কার্টার

মন্তব্য করলেন, তিনি সেই ক্যাম্প ডেভিড থেকেই উপলব্ধি করেছেন যে, সাদাত কার্যত পশ্চিম তীরের ইস্যুকে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি যদি কোনভাবে গাজ্জা উপত্যকা লাভ করতে পারেন, সেটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট।

যখন জেনারেল ডেভিড ব্রোঞ্জ (জয়েন্ট ওয়ার স্টাফ প্রধান প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সফরসঙ্গী) উল্লেখ করেন যে, এ অঞ্চলে বিশেষ করে সৌদী আরবে আমেরিকান সামরিক দায়-দায়িত্বের ধরন কি হবে তা পরিষ্কার হওয়া দরকার, তখন প্রেসিডেন্ট কার্টারের মন্তব্য ছিল "সৌদীদেরকে যুক্তরাষ্ট্র ও মিসরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।" ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ প্রেসিডেন্ট কার্টার সাদাত ও বেগিনকে পত্র লেখেন যেন ক্যাম্প ডেভিডে আলোচনার জন্য মোস্তফা খলীল ও মোশে দায়ানকে পাঠানো হয়। সাদাত ও বেগিনের মধ্যে অনমনীয়তা লক্ষ্য করে এ যাত্রা কার্টার তাঁদের ডেকে নিজে মধ্যস্থতা করতে গেলেন না। মোস্তফা খলীল ও মোশে দায়ানের বৈঠক শুরুর আগে কায়রো ফিলিস্তিনের ব্যাপারে দু'টি বিষয়ে খতিয়ে দেখল।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধির সঙ্গে গোপন যোগাযোগের সম্ভাব্যতা, যাতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে সম্পর্কের পরবর্তী ধাপগুলোর জন্য ভূমিকা রচনা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাঁদের মতে, গাজাকেই প্রাথমিক কেন্দ্র বানিয়ে সেখানে ফিলিস্তিন জাতীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এ প্রেক্ষাপটেই ডঃ মোস্তফা খলীল কায়রোস্থ পিএলও প্রতিনিধি সাঈদ কামালকে ডাকলেন, যদিও তাঁর অবস্থান তখন অনেকখানি অস্পষ্ট ছিল। তিনিই পিএলও'র কায়রোস্থ প্রতিনিধি হওয়ার কথা। কিন্তু আল্-কুদ্স সফর ও ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর পিএলও'র অভ্যন্তরে তাঁর কায়রোতে উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি ওঠে। কিন্তু পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত অন্যদের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকেই কায়রোতে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরাফাত এই পরামর্শ করেন যে, তাঁকে সরকারীভাবে প্রত্যাহারের পাঁয়তারা করবেন বটে, তবে কার্যত তিনি কায়রোতেই থেকে যাবেন। তাঁকে পিএলও হেড কোয়ার্টারে পরামর্শের জন্য ফিরে আসতে বলা হবে। কিন্তু গোপনে আরাফাত তাঁকে বললেন, তিনি যেন এ আদেশ না মেনে সেখানেই থাকেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি প্রধান কার্যালয়ে ফিরে না যাওয়ার কারণ দেখিয়ে ফিলিস্তিন জাতীয় সংসদে তাঁর সদস্যপদকে বাতিল করার ঘোষণা দেবেন। এভাবেই সাঈদ কামালই আরাফাতের প্রতিনিধি হিসাবে রয়ে গেলেন, যদিও পিএলও প্রতিনিধিত্ব তাঁর থেকে খসিয়ে ফেলা হয়। এ ছিল এক অদ্ভুত অবস্থা। কিন্তু এ অভিনব অবস্থাতেই সাঈদ কামালের সঙ্গে কাজ করা অব্যাহত থাকে এবং তাঁর মাধ্যমেই যোগাযোগ চলে। কাজেই মোস্তফা খলীল যখন তাঁকে ডাকেন তখন এটা জানতেন যে, বার্তাটি ব্যক্তিগতভাবে ইয়াসির আরাফাতের কাছে পৌঁছে যাবে। হয়েছেও তাই। কিন্তু ইয়াসির আরাফাতের কাছ থেকে যে উত্তর এলো তাও ছিল অস্পষ্ট। তিনি লিখেন–

গোপন থাকার শর্তে এই যোগাযোগে কোন আপত্তি নেই। কারণ সোভিয়েত ও সিরিয়া তা কখনও মেনে নেবে না। আপনার অবগতির জন্য বলছি, সিরিয়া আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। তারা একাধিকবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, আপনার সেখানে অবস্থান তাদের প্রতি একটি বিদ্রূপমাত্র। কাজেই যদি মিসরী ভাইয়েরা আপনাকে সহায়তা দেয় তাহলে সামনে এগিয়ে যান। তবে যদি মিসরীরা আপনার সহায়তায় এগিয়ে না আসে, তাহলে আমরা আপনার সাহায্যে কখনও অগ্রসর হতে পারব না। ডঃ মোস্তফা খলীল এ ধরনের অস্পষ্টতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই সাঈদ কামালকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন স্পষ্ট করে বলেন–তিনি তাঁর হাইকমাণ্ড থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত কি না। তিনি জানান যে, "গোপন রাখার শর্তে তিনি ক্ষমতা প্রাপ্ত।" এ দিকে হঠাৎ করে নিউইয়র্কে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, পিএলও মিসরী চ্যানেলে আমেরিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। তাই সিরীয় বিদেশমন্ত্রী আব্দুল হালীম খাদ্দাম ফিলিস্তিনী কমাণ্ডের সদস্য আব্দুল মুহসেন আবু মীযারকে ডেকে পাঠান এবং রাগের সঙ্গে তাঁকে অভিযুক্ত করে বলেন, "পিএলও আমাদের পিছন থেকে আমাদের সঙ্গে খেলা করছে।"

এতে ইয়াসির আরাফাত তার কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার থেকে আবার জোর দিয়ে তাঁর অসম্মতি প্রকাশ করে বিবৃতি প্রকাশ করলেন যে, সাঈদ কামালকে ফ্রিজড আপ করা হলো। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরে প্রকাশ পেল যে, জাতিসংঘে আমেরিকার প্রতিনিধি দলই এই খবর ছড়ায় যাতে ফিলিস্তিনীদের সাথে যে কোন যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

শুরুতেই উদ্যোগটি নস্যাৎ হয়ে গেল। কাজেই ড. মোস্তফা খলীল নিউইয়র্কে রওনা দিলেন, তখন তার সাথে মিসরীয় পাতাগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই।

॥ ৪ ॥

জীযার পিরামিড

"গিয়ে শুনুন আমাকে দায়ান কী বলেছে।"

—বুট্রস ঘালি ইসরাইল থেকে ফিরে এসে মোস্তফা খলীলকে বলেছেন

ড. মোস্তফা খলীল ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে দায়ান-এর সাথে (দ্বিতীয়) ক্যাম্প ডেভিডে তার বৈঠকগুলো শুরু করলেন। আগের দিন উভয়কে প্রেসিডেন্ট কার্টার নিজে স্বাগত জানালেন এবং তাদেরকে জানালেন যে, তিনি আশা করেন যেন পূর্বেকার ক্যাম্প ডেভিডের পুনরাবৃত্তি হয়। তিনি তাদেরকে প্রেসিডেন্সিয়াল অবকাশ কেন্দ্রে রেখে যাচ্ছেন যাতে তারা একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেন। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এখন কোন ব্যর্থতাকে গ্রহণ করার মত নয়। তাঁর মতে—"ব্যর্থতা পিছনে টেনে নেবে এবং ইরানী বিপ্লবের গণ্ডগোলের মধ্যে অনুরূপ আরেকটি গোলমাল সৃষ্টি করবে– যা প্রেসিডেন্ট সাদাতের আল্-কুদ্স সফরের উদ্যোগী ভূমিকা থেকে শুরু করে ক্যাম্প ডেভিডে সাদাত ও বেগিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি পর্যন্ত সকল শান্তি উদ্যোগের ব্যর্থতা থেকেই উৎসারিত হবে। তাদেরকে এও বলে গেলেন যে, তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভ্যান্সকে এখানে রেখে যাচ্ছেন– তিনি তাদের সাথে তার স্বাভাবিকতার ওপরে প্রতিনিধি হিসাবে থাকবেন।

কার্যতালিকার প্রথম জটিল পর্যায়টি ছিল–"ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির স্পষ্ট ধারা।" সেটি হচ্ছে–মিসর ও ইসরাইলের মধ্যকার শান্তি-চুক্তির অগ্রাধিকার–মিসরের সাথে আন্তর্জাতিক ও আরব রাষ্ট্রসমূহের যে কোন সংশ্লিষ্টতা ও লিয়াজোঁর ওপরে থাকবে। প্রথম বৈঠকে এই বিষয় এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর সাধারণ মতবিনিময় হয়। বিশেষ করে ফিলিস্তিনীদের জন্য ইসরাইল কোন শুভ কামনা পোষণ করে কিনা। যে কোনভাবেই হোক ড. মোস্তফা খলীল অনুভব করলেন যে, চুক্তিতে পৌঁছার মত যথেষ্ট ক্ষমতা দায়ানকে দেওয়া হয়নি। এই অনুভূতি আরও প্রগাঢ় হলো যখন তিনি জানতে পারলেন যে, বেগিনের কার্যালয়ের পরিচালক 'ইল্ইয়াহু বেন ইয়াসার' ক্যাম্প ডেভিডে পৌঁছেছেন এবং ইসরাইলী প্রতিনিধি দলে যোগ দিয়েছেন। এটি ছিল ইঙ্গিত যা মোস্তফা খলীল বুঝেছেন যে, দায়ানকে সীমিত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সাইরাস ভ্যান্স-এর মূল্যায়নও একই ছিল।

যখন মোস্তফা খলীলের সামনে দায়ান এমনভাব দেখাতে চাইলেন যে, তিনি আলোচনার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা রাখেন তখন সাইরাস ভ্যান্স-এর কাছে কিছুটা বেশি খোলামেলা ছিলেন। কারণ তাকে তার বিব্রতকর অবস্থার কথা জানান। কেন না বেগিন এ ব্যাপারে অনড় যে কোন বিষয় চূড়ান্ত করার আগে তিনি যেন আল্-কুদ্সে আলোচনার সব পয়েন্ট তার কাছে পেশ করেন। এই অবস্থার কথা যখন প্রেসিডেন্ট কার্টার জানতে পারলেন তখন তার মন্তব্য ছিল— তার জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ব্রেজনেস্কি ঠিকই বলেছেন যখন তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে মোস্তফা খলীল ও দায়ানের আলোচনা আদৌ এমন কোন ফলাফলে পৌঁছবে না, যা একটি শান্তিচুক্তিতে উপনীত হতে পারে।

মনে হয় দায়ান এমন এক পরিস্থিতিতে পৌঁছেন যে তিনি আর সত্য গোপন রাখতে পারছিলেন না যে, তিনি কত যে চাপের মুখে আলোচনা করে যাচ্ছেন। তাই তিনি নিজেই মোস্তফা খলীলের কাছে গিয়ে বললেন– “I Feel incompetent to continue the negotiations with you.”

আপনার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবার মত আমার যোগ্যতা আছে বলে আমি মনে করি না। মোস্তফা খলীল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই মন্তব্যের অর্থ কি? দায়ান উত্তরে বললেন– তিনি ধারণা করছেন যে, উত্তম হবে এখন বেগিন এসে আপনার সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করুক। দায়ান আরও বলেন–বর্তমানে বেগিন যুক্তরাষ্ট্র সফররত এবং জায়নিস্ট সংস্থাসমূহের মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। তিনি অচিরেই তার সাথে যোগাযোগ করে আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবেন। তখন মোস্তফা খলীল উত্তরে বললেন– “মোশে আপনি এখন আমাকে এ কথা বলবেন না। কারণ ইসরাইলী প্রতিনিধি দল গঠনের ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই, এটা আপনাদের ব্যাপার। দায়ান আবারও জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আলোচনা সফল করতে চাইলে এখন বেগিন এসে ইসরাইলী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।”

এ সময় আমেরিকার তথ্য মাধ্যমগুলো বেগিনের কর্মসূচী ও বিবৃতিতে ভরপুর ছিল। এর মধ্যে একটি বিবৃতি দৃষ্টি আকর্ষণীয় ছিল, এতে বেগিন বলেছেন যে, ইহুদীরাই জীযার-এর পিরামিডগুলো বানিয়েছিল। এই পিরামিডগুলো হচ্ছে ইসরাইলীদেরই কীর্তি -এর কৃতিত্ব মিসরীদের বা অন্য কাউকে দেওয়া উচিত নয়। সে রাতেই নিউইয়র্কে জায়নিস্ট মহাসম্মেলনের সামনে প্রদত্ত বক্তৃতায় আরেকটি মন্তব্য করেন যা ওয়াশিংটনের নিকটস্থ ক্যাম্প ডেভিডে বসে মোস্তফা খলীল সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে জেনে চমকে উঠেন। বেগিন বলেছেন, “তিনি মোস্তফা খলীলের সাথে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত নন। বেগিন আরও বলেন যে, আমি ইসরাইলের জনগণ

কর্তৃক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আর সে (মোস্তফা খলীল) হচ্ছে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত কর্তৃক নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী। কাজেই যদি আমাকে আমার সমকক্ষ কারও সাথে আলোচনা করতে হয় তাহলে সাদাত নিজে এসে আমার সাথে আলোচনা করুক।"

মোস্তফা খলীল নিজেই ভ্যান্স ও দায়ানকে জরুরী ভিত্তিতে তার সাথে বৈঠকে বসার আমন্ত্রণ জানালেন। ইতোমধ্যেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়ই বেগিনের বিবৃতিগুলো সম্পর্কে অবহিত হলেন। ড. মোস্তফা খলীলের কাছে মনে হলো ভ্যান্স ক্ষুব্ধ এবং দায়ান বিব্রতবোধ করছে। বিষয়টি মোস্তফা খলীলই পারলেন। তিনি বলেন যে, তিনি বেগিনের বিবৃতিগুলোতে হতবাক হয়েছেন। কারণ প্রথমত ঃ তিনি (মোস্তফা খলীল) ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনা প্রবেশের প্রস্তাবকারী নন। দ্বিতীয়ত ঃ 'নিয়োগকৃত প্রধানমন্ত্রী' বলাটা বেগিনের মিসরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপস্বরূপ। এরপর মোস্তফা খলীল দায়ানের দিকে তাকালেন এবং তাকে তার নিজ মুখে এই কথাটা জানাবার জন্য বললেন যে— তিনি এমন এক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী যা ইসরাইল থেকে দশগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং যার রয়েছে সাত হাজার বছরের ইতিহাস। এরপর দায়ানকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাকে এ কথাটিও তাকে জানাবার অনুরোধ করছি যে, আমিই এখন তার সাথে আলোচনাকে প্রত্যাখ্যান করছি। আপনি এ কথাটিও তাকে জানিয়ে দেবেন যে আমি তার ও আমার মধ্যে আলোচনার প্রস্তাব দেইনি।

এভাবেই দ্বিতীয় ক্যাম্প ডেভিডের বৈঠকগুলো ব্যর্থ হয়ে গেল- যা ব্রেজনেস্কি আশঙ্কা করেছিলেন।

দ্বিতীয় ক্যাম্প ডেভিড বৈঠকের সমাপনী দিনে ব্রেজনেস্কি প্রেসিডেন্ট কার্টারের নিকট একটি নোট লিখে পাঠান। এর ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

"ইরানের পরিস্থিতি এখন আপনাকে, খলীল-দায়ান আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর, নিশ্চিন্তে দর্শকের মত থাকতে দেবে না। আমরা যদি প্রথম ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি পতন হতে দেই তাহলে এর অর্থ হবে বিজয়কে বিপর্যয়ে পরিণত হতে দেওয়া। আর সার্বিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ পরিস্থিতিতে এর ফলাফল হবে হতাশাব্যঞ্জক। পরিস্থিতি এখন আপনাকে দ্রুত অগ্রসর হতে বাধ্য করছে। কারণ বেগিন এটা জেনেই এ রকম কঠোর আচরণ করে যাচ্ছেন যে, তিনি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার ফলাফলকে সহ্য করতে পারবেন। অথচ আপনি তা পারবেন না, আপনার নির্বাচনী পরিস্থিতির কারণে। মাঝে মাঝে আমাকে এই বিশ্বাস তাড়া করে ফেরে যে, বেগিন আসলেই চায় না যে আপনি আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সফল হোন। এ প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে এখন আলোচনার পর্যায়কে—বেগিন-সাদাত পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে এবং আপনাকে

ব্যক্তিগতভাবে এ কাজে ঠিক সেই শক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে আপনি ক্যাম্প ডেভিডের রূপরেখা চুক্তিতে উপনীত হতে পেরেছিলেন।”

স্পষ্টত প্রেসিডেন্ট কার্টার তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে এতে অংশগ্রহণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে হোয়াইট হাউসে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য বেগিনকে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তখন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের দায়িত্বে নিয়োজিত উইলিয়াম কাউন্ট– যিনি তাদের দু'জনের বৈঠকের কার্যবিবরণী লিখেছিলেন– তার বর্ণনা মতে, বেগিন কার্টারের সাথে তাঁর ২ মার্চ ১৯৭৯-এর বৈঠকে আলোচনা শুরু করেন একটি ভূমিকা দিয়ে। এতে তিনি বলেন– যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে এ হিসাবে সাহায্য করা উচিত যে ওই অঞ্চলে ইসরাইলই তার একমাত্র মিত্র। সে-ই মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর হয়ে আছে। সে-ই একমাত্র শক্তি, যে সৌদি আরবে সোভিয়েত দখলদারীকে রুখতে পারে। আরেকটু অগ্রসর হয়ে বেগিন এবার কার্টারকে প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনার আওতায় সিনাই অঞ্চলে বিমানঘাঁটি ব্যবহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অনুমতি দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। বেগিনের এ কথায় প্রেসিডেন্ট কার্টার ও সভায় উপস্থিত তার উপদেষ্টাবৃন্দ হতভম্ব হয়ে গেলেন। কারণ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি অনুযায়ী ইসরাইল এ সকল বিমানঘাঁটি মিসরকে ফিরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু তখন কেউ একথায় আপত্তি জানাবার আগেই বেগিন তার কথা চালিয়ে গিয়ে বলেন— মিসরের সাথে আলোচনা একটি গভীর বিপর্যয় আতিক্রম করছে। কারণ সাদাত এখন ইয়াহুদা ও সামুরা (পশ্চিম তীর) এবং গাজার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয় উত্থাপন করে বসে আছেন। তিনি বলেন, ইসরাইল কেবল সুনির্দিষ্ট শর্তেই গাজা ছেড়ে দিতে রাজি আছে। কিন্তু তিনি এখন অথবা আগামীকালই ইয়াহুদা ও সামুরা (পশ্চিম তীর) সম্পর্কে কথা বলতে প্রস্তুত নন।

এরপর বেগিন আরেকটি মন্তব্য করেন যে, তিনি আলোচনার ব্যাপারে তড়িঘড়ি করার কোন কারণ দেখেন না। কারণ নীতিনির্ধারণী কথা বলার আগে অনেকগুলো বাস্তব ইস্যুর সমাধান করা আবশ্যক। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পেট্রোলিয়াম। কারণ, “তার মতে– ইসরাইল সিনাইতে পাওয়া তেলের পাশাপাশি ইরান থেকে তেল ক্রয় করত। সে এখন দুটো উৎসই হারিয়েছে বা হারাতে বসেছে। কাজেই সিনাইয়ের তেল ইসরাইলে সরবরাহ করা হবে। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে মিসরের সাথে চুক্তি করতে হবে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে অন্য কোন উৎস থেকে অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় তেল ইসরাইলের জন্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।” পরিশেষে বেগিন বলেন– ইসরাইল কখনও সিনাইয়ের তেলক্ষেত্রগুলো মিসরকে ফিরিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না মিসর ইসরাইলকে তেল সরবরাহের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট চুক্তি করে।

কার্টার এ আলোচনার পর একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তবে তার উপদেষ্টাগণ বেগিনকে কিছু নমনীয় করে বেগিন-সাদাত বৈঠকের জন্য চেষ্টা করে যাওয়ার পরামর্শ

দেন। তারা বলেন এ আলোচনা বৈঠকগুলো প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কার্টার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি নিজেই ওই অঞ্চল সফর করবেন। তিনি মিসর ও ইসরাইল সফর করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে কাছাকাছি নিয়ে এসে চুক্তি সম্পাদনের আশা করেন। তাদের দুজনকে ওয়াশিংটনে ডেকে আনার চেয়ে নিজেই ওই অঞ্চল সফর করার পরামর্শটি দিয়েছিলেন ব্রেজনেস্কি। কারণ তার আশঙ্কা ছিল দু'জনে ওয়াশিংটনে এসে ঝগড়া বাড়িয়ে তুলবেন। এতে কোন চুক্তি করা হবে না। কারণ বেগিনকে মনে হচ্ছে একেবারে অনড়। কারণ সে জানে, নির্বাচনী প্রচারনার মনোভাবের কারণে প্রেসিডেন্ট কার্টার এখন দুর্বল অবস্থায় রয়েছেন। বিশেষ করে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সফলতায় আমেরিকান নীতি যে আঘাত পেয়েছে এ পরিবেশে তিনি খুবই নাজুক সময় অতিক্রম করছেন।

আমেরিকান প্রেসিডেন্টের আগমনের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক সফরে ব্রেজনেস্কি কায়রোতে এসে সাদাতকে বিশেষ গোপনীয় একটি বার্তা দেন।

"প্রেসিডেন্ট কার্টারের অভ্যন্তরীণ অবস্থান আসন্ন নির্বাচনী হাওয়ায় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত বেগিনও চান যে, প্রেসিডেন্ট কার্টার পরাজিত হোক এবং রিপাবলিকান কোন প্রেসিডেন্ট তার স্থলাভিষিক্ত হলে তাঁর সাথে তার কাজ করতে সুবিধা বেশি হবে।"

৬ মার্চ, ১৯৭৯ তারিখে ব্রেজনেস্কি বার্তাটি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে দিলেন মনে হলো তিনি বেগিনকে সহজ করতে পারার সামর্থের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। তিনি ব্রেজনেস্কিকে বলেন– "প্রেসিডেন্ট কার্টারকে নিশ্চিন্তে আসতে দিন, তবে এ সফরে সফলতা নিশ্চিত। আমার কাছে যে গোপন অস্ত্র আছে তা ব্যবহার করব। এটা তো সুবর্ণ মুহূর্তের অপেক্ষায় রেখেছি। মনে হলো ব্রেজনেস্কি প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে গোপন অস্ত্র আছে শোনে হতভম্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি অপ্রস্তুত হয়ে যান যখন প্রেসিডেন্ট সাদাত তাকে বলেন যে, তার গোপন অস্ত্র হচ্ছে "নাকাব কলোনীগুলোতে সেচ দেওয়ার জন্য নীল নদের পানি সরবরাহ করা।"

তবে ব্রেজনেস্কি কোন কিছু মন্তব্য করলেন না।

এদিকে মোস্তফা খলীল যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় ইউসুফ বুর্গ-এর সাথে স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কেবলি হোঁচট খাচ্ছিলেন তখন ইসরাইলী ডেলিগেটদের অনড় মনোভাবের অভিযোগ নিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে গেলেন। বুট্রস ঘালির সামনেই প্রেসিডেন্ট সাদাত তখন মোস্তফা খলীলকে বলেন–"মোস্তফা! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সমাধান তো আমার পকেটে।"

আরেকবার যখন প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টকে বললেন যে, আমাদেরকে এভাবে পেরেশানীতে না রেখে সমাধানটা বলে দেন না। তখন তিনি এভাবে অট্টহাসি হেসে বললেন, "সময় মতো জানবে।"

১৯৭৯ এর প্রথম দিকে বুট্রস ঘালি ইসরাইল সফর শেষে ফিরে এলে প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা খলীলকে জানান যে, দায়ানের দেওয়া নৈশভোজের সময় ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে তাদের প্রধানমন্ত্রী অনড় অবস্থানে আছেন এবং এক পর্যায়ে বেগিন তাকে বলেন, "শোন, আমি নীল নদের পানির বিনিময়ে ইসরাইলের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেব না।" বুট্রস ঘালি বলেন, এ সময় আমি জানতে পারি যে, প্রেসিডেন্ট গোপনে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন যে, পশ্চিম তীর থেকে পাইপ লাইনে নাকাবের বসতিগুলোতে পানি সরবরাহ করতে তিনি প্রস্তুত আছেন, যদি পশ্চিম তীরের ব্যাপারে চুক্তিতে উপনীত হয়।"

বিষয়টি মারাত্মক ভেবে মোস্তফা খলীল বুট্রস ঘালিকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে যান এবং দায়ানের কাছে যা শুনেছেন তা বর্ণনা করার জন্য বুট্রস ঘালিকে বলেন। দুজনেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, প্রেসিডেন্ট শান্তভাবে সবকিছু শোনে বলে ওঠলেন– "তাতে কি হয়েছে? আমরা তো বেড়িবাঁধ দেওয়ার পরও নীল নদের বেশ কিছু পরিমাণ পানি সাগরে ফেলে দিচ্ছি। আমাদের সমস্যা সমাধানের বিনিময়ে তাদেরকে কিছু পানি দিলে ক্ষতি কি?"

ডক্টর মোস্তফা খলীল উত্তরে বলেন যে, "ঠিকই আমরা কিছু পানি সাগরে ফেলে দেই। তবে সেটা হচ্ছে খুব সীমিত পরিসরে, তাও হচ্ছে প্রধান মৌসুমের বাইরে নীল নদের নাব্যতা বজায় রাখার স্বার্থে। এছাড়াও বেড়িবাঁধের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো চালু রাখার উদ্দেশ্যে এটা করা হয়। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট পানি পতনের দরকার হয়। এ সময় প্রেসিডেন্ট সাদাত তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন– "খালাস ওই পানিটুকুই আমরা তাদের দেব।"

আবারও মোস্তফা খলীল বোঝাতে চাইলে প্রেসিডেন্ট সাদাত বলেন, এটা পর্যালোচনা করতে হবে। আমি তো বেগিনকে একটা প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছি। তার মতে এটাই সব কিছু সমাধান করে দেবে। তবে বুট্রস ঘালির মুখে দায়ানের কথা শোনে (অর্থাৎ বেগিন নীল নদের পানির বিনিময়ে ইসরাইলের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেবেন না) প্রেসিডেন্ট কিছুটা হতবাক হলেন বটে। কিন্তু তখনও তার ধারণা ছিল যে, তার কাছে এমন এক গোপন অস্ত্র আছে যা সুযোগ মত ব্যবহার করে তিনি আলোচনার অচলাবস্থা নিরসন করে সমাধানে পৌঁছতে পারবেন।

এ বৈঠকের পর মোস্তফা খলীল দেখলেন এ প্রস্তাব থেকে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাকে বোঝাবার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি দ্রুত একটি কমিটি গঠন করেন। এতে সেচমন্ত্রী ও কিছু বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; আরও ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ডক্টর বুট্রস ঘালি ও মন্ত্রণালয়ের কিছু সংখ্যক আইন উপদেষ্টা। মোস্তফা খলীল বুট্রস ঘালিকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে এসে এই কমিটির সমীক্ষার ফলাফল বর্ণনা করেন।

ডক্টর বুট্রস ঘালি আইনগত দিক তুলে ধরে বলেন– গবেষণা ও পর্যালোচনার ফলাফলে দেখা যায় ঃ

১. নীল নদের অববাহিকার দেশগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে অববাহিকার কোন দেশ কোন তৃতীয় পক্ষকে কোন পরিমাণ পানি, সংশ্লিষ্ট সকল দেশের অনুমতি ছাড়া দিতে পারবে না।

২. যদি কোন তৃতীয় পক্ষ কোন পরিমাণ পানি এক বছরের জন্য লাভ করে এবং তা দিয়ে কোন ভূমিকে কৃষি-আবাদ করে, এতে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ওই পক্ষ ওই পরিমাণ পানি সব সময় ব্যবহারের অধিকার পেয়ে যায়।

৩. নীল অববাহিকার দেশগুলোর মধ্যে এ পর্যন্ত বারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ দেশগুলোর–স্বভাবতই সবকটি দেশই আফ্রিকার– বর্তমানে মিসরের সম্পর্ক উত্তম অবস্থায় নেই। এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি পানি বন্টনের চুক্তিকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য যাই তাহলে পানির হিস্যার নতুন বন্টন ব্যবস্থা কখনই আমাদের স্বার্থের পক্ষে যাবে না। কারণ আমরা এখন কার্যত আমাদের হিস্যা থেকে বেশিই নিচ্ছি এবং অববাহিকার দেশগুলোকে বলে আসছি যে, আমরা বিস্তৃর্ণ ভূমি সংস্কার করছি এবং আমরা যে পানি নিচ্ছি তার প্রতিটি ফোটাই আমাদের প্রয়োজন। যদি এখন আমরা ইসরাইলকে পানি দিতে যাই তাহলে বলতে হবে যে, এটা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আর এতে করে অববাহিকার দেশগুলোর সামনে আমরা এই সুযোগ করে দেব, যাতে তারা পানির হিস্যা বন্টনের চুক্তি লজ্ঘন করে। এটা ঠিক যে, অববাহিকার কিছু দেশ এখনও নদী থেকে কিছু পানি বেশি নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা এ কাজটি করছে গোপনে এবং লজ্জা রেখে। যদি এখন আমরা তৃতীয় কোন পক্ষকে পানি দিতে যাই, তাহলে এটা তাদের সবাইকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র দেওয়া হবে যে, তারা সবাই এখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাত বুট্রস ঘালির যুক্তিগুলো মন দিয়ে শোনেন। তারপর বলেন, "আমরা আফ্রিকানদের বলতে পারি যে, আমরা ফিলিস্তিনী আরবদেরকে পানীয় জল দিতে যাচ্ছি।" আলোচনায় এবার মোস্তফা খলীল ঢুকে পড়ে আবেগ উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলে ওঠেন– "আমি আপনার প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর আপনার প্রতিও আমার কর্তব্য রয়েছে যেন আমি জনগণের কাছে আপনার ভাবমূর্তি রক্ষা করি। আমি সঙ্গত কারণেই নিঃসঙ্কচিত্তে ইসরাইলের দিকে এক ইঞ্চি পাইপও সরবরাহ করতে পারব না।"

মোস্তফা খলীল এর কারণগুলো বলে যেতে লাগলেন ঃ

১. আমাদের আদৌ কোন অতিরিক্ত পানি নেই।

২. আমরা এখন থেকে সুদানের জন্য নির্দিষ্ট হিস্যা থেকে কিছু অংশ ধার নিতে যাচ্ছি।

৩. সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নীল নদের পানির পরিমাণে মারাত্মক ওঠানামা দেখা দিচ্ছে। দক্ষিণে এখনই দুর্ভিক্ষের বছরগুলো শুরু হয়ে গেছে। আমরা বেড়িবাঁধ নির্মাণ না করলে মিসরেও এতদিনে বিপর্যয় দেখা দিত। যদি এই দুর্ভিক্ষের বছরগুলো অব্যাহত থাকে তাহলে আমাদের বেড়িবাঁধের হ্রদের জলাধারগুলোও কয়েক বছরের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৪. আমাদের বর্তমান পানির চাহিদা হচ্ছে ৫৫ বিলিয়ন ঘনমিটার। বস্তুত আমাদের আশা এখন দুটো সম্ভাবনার মধ্যে দোল খাচ্ছে।

(ক) হয় আমরা মিসরের সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হব এবং প্লাবিত করার বদলে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এই পদ্ধতি পুরনো এলাকার পরিবর্তে নতুন ভূমিতে কাজে লাগাবো। আর এটা তো দীর্ঘ কয়েক বছর পর ছাড়া হবে না।

(খ) নতুবা পাওয়ার পাম্প দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এতে বিরাট মূলধন খাটাতে হবে এবং সময়ও অনেক লেগে যাবে। তারপর সম্ভবপর হবে।

প্রেসিডেন্ট সাদাত চুপচাপ শোনে যেতে থাকলেন। মোস্তফা খলীল ভাবলেন, তিনি হয়তো তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন।

অনেক ক্ষমতাধর আলোচকের ভূমিকা থেকে মোস্তফা খলীলের ভূমিকা এখন পরিবর্তিত হলো বজ্রপাত ঠেকানোর এক ধরনের ভূমিকায়।

মোস্তফা খলীল এবার আরেকটি বিষয় সমাধানের দিকে নজর দিলেন। কার্টারের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাদাত ও বেগিনের মধ্যে নীতিনির্ধারণী আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হবার আগেই এটা সমাধান করতে চাইলেন। বিষয়টি হচ্ছে পেট্রোলের ইস্যু। ইতোমধ্যে সরকারী ডেলিগেশন নিয়ে ইসরাইলের জ্বালানীমন্ত্রী ইসহাব মুদাঈ কায়রো এসে পৌঁছেছেন। তার সাথে এই সফরে আজরা ওয়াইজম্যানও এলেন। তবে, তিনি এসেছেন সাধারণভাবে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তিসমূহের ব্যাপারে রাজনৈতিক দায়িত্বশীল হিসাবে। বৈঠকের শুরুতেই ইসরাইলী জ্বালানীমন্ত্রী মুদাঈ মিসরী পেট্রোলিয়াম দাবী করলেন। এটাকে মোস্তফা খলীল সীমাছাড়া বাড়াবাড়ি মনে করলেন। এ ব্যাপারে যখন তার মতামত ব্যক্ত করলেন তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, মুদাঈ বেগিনের কাছে লেখা কার্টারের একটি পত্র বের করে দিচ্ছেন, যেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, "প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর সামনে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেগিনের কাছে এ দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসরাইল এ উপদ্বীপ দখলে রাখার সময় সিনাই থেকে যে পরিমাণ পেট্রোল লাভ করত ন্যূনপক্ষে সে পরিমাণ পেট্রোলিয়াম মিসর ইসরাইলকে দেবে এবং এর দর হবে তুলনামূলক কম। আর এ সরবরাহ চলবে অব্যাহতভাবে।"

এ চিঠিতে মোস্তফা খলীল চমকে ওঠলেন। কিন্তু তিনি এটাকে পাত্তা না দিয়ে মুদাঈকে বলেন যে, এই পত্রের কারণে মিসরী সরকারের ওপর কোন দায়-দায়িত্ব বর্তায় না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন না যে প্রেসিডেন্ট সাদাত বিশেষ করে

বেগিনকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাছাড়া ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির সরকারী সংযোজনগুলোর মধ্যে এ পত্রটির কোন উল্লেখ নেই। মুদাঈ তাকে বলেন যে, "পত্রটি আপনার কাছেই আছে। মোস্তফা খলীল উত্তর করলেন যে, তিনি নিজেকে ইসরাইলের দয়ার ওপর ছেড়ে দিতে আদৌ প্রস্তুত নন। কারণ মিসর ইসরাইলের বার্ষিক দু'মিলিয়ন টন তেল সরবরাহের প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার বাজার হারাতে চায় না। এরপর তিনি আরও বলেন যে, মিসর ইসরাইলের কাছে হ্রাসকৃত দরে তেল বিক্রি করতে পারে না। যদি তা করে তাহলে ন্যূনপক্ষে আমেরিকান কোম্পানিগুলো একই ধরনের আচরণ আশা করবে। এতে দর পতন হয়ে বার্ষিক ৮০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হবে।

এরপর মোস্তফা খলীল বলেন– তিনি ইসরাইলের কাছে সেভাবে তেল বিক্রি করতে পারেন যেভাবে অন্য কোন পক্ষের কাছে বিক্রি করে থাকেন। এর শর্তগুলোও হবে সেই শর্তগুলোই যা মিসরী তেল সংস্থা অন্যান্য খরিদ্দারের ওপর আরোপ করে থাকে।

তিনি ইসরাইলী জ্বালানীমন্ত্রীকে আরও বলেন–"আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না যে ইসরাইলকে অব্যাহতভাবে বার্ষিক দু'মিলিয়ন টন দিতে পারব। আর তা প্রযুক্তিগত কারণেই। কারণ আপনি জানেন যে, পেট্রোল উৎপাদন নানান অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার শিকার হয়। যেমন সম্পতি এ ধরনের উৎপাদন বন্ধের ঘটনা মারজান তেলক্ষেত্রেই ঘটে গেছে। এতে কয়েক সপ্তাহের জন্য এর তেল উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এতে প্রতিদিন ৫৩ হাজার ব্যারেল উৎপাদন হতো। এটা ছিল টেকনিক্যাল কারণে। কাজেই আপনি কিভাবে আশা করতে পারেন যে, আমি বাৎসরিক এত বিপুল পরিমাণ তেলের প্রতিশ্রুতি দেব অথচ আমি এ ধরনের জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হতে পারি?

এরপর মোস্তফা খলীল মুদাঈকে বললেন ঃ "আপনি কেন আমাকে বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের তেল বেঁধে দিতে চাচ্ছেন, অথচ আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে, আপনাদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি আছে যার মাধ্যমে তারা আপনাদের ১৫ বছরের তেলের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব নিয়েছে। মুদাঈ উত্তরে বললেন– কারণ আমি আমেরিকানদের জুতার নীচে নিজের গর্দান রাখতে চাই না।"

এভাবে মিসরী প্রধানমন্ত্রী ও ইসরাইলী জ্বালানীমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হোঁচট খেল। এই প্রথমবারের মত আজরা ওয়াইজম্যান হস্তক্ষেপ করে মোস্তফা খলীলকে বললেন– এভাবে তো আপনি আমাকে প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে যেয়ে তার সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য বাধ্য করবেন।

মোস্তফা খলীল নিজেকে আর চেপে রাখতে পারলেন না, তিনি ওয়াইজম্যানের কথার জবাবে বলেন– আসুন, আমার মাথার ওপর ফিরে প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে

যান। আপনি তার কাছে চাচ্ছেন যে, তিনি এমন কিছু শর্ত মেনে নেবেন যা আমি তার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নেইনি।"

ওয়াইজম্যান বের হয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাক্ষাৎ চাইতে গেলেন। এদিকে মোস্তফা খলীল দ্রুত প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে ওয়াইজম্যানের সাথে সাক্ষাতের আগেই তাকে অবস্থানটা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। তিনি (মোস্তফা) তাকে বললেন যে, "তিনি কোন গোপন প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব বহন করতে পারবেন না।" দীর্ঘ প্রায় পৌনে একঘণ্টা উভয়ের মধ্যে ফোনে কথা চলে। আলাপের এক পর্যায়ে মোস্তফা খলীল প্রেসিডেন্ট সাদাতকে বলেন– "এ ব্যাপারে ইসরাইলকে দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতিই গোপন থাকবে না। আর এটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তা নিষেধাজ্ঞা আইনের বিপরীতে যাবে। এই আইন এখনও বলবৎ রয়েছে। এছাড়া যদিও এটা সংসদে উত্থাপনের ইচ্ছা রয়েছে, তবুও তা তো এখনও উত্থাপন করা হয়নি। মোস্তফা খলীল প্রেসিডেন্টকে বললেন যে, তিনি ওয়াইজম্যানকে এ প্রস্তাব দিয়েছেন যে, সুইজারল্যান্ডে তেল কেনার জন্য কয়েকটি ইসরাইলী কোম্পানি নাম রেজিষ্ট্রি করতে পারেন এবং মিসরী তেল সংস্থার গৃহীত নিয়ম-কানুন অনুসারে যদি নিলামে দর পড়ে যায় তাহলে তারা তা গ্রহণ করতে পারেন। টেলিফোনে এ দীর্ঘ আলাপে প্রেসিডেন্ট সাদাত কথা বলার চেয়ে শুনেছেন বেশি।

ওয়াশিংটন থেকে যখন খবর এল যে, প্রেসিডেন্ট কার্টার নিজেই এ অঞ্চলে এসে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে নতুন আলোচনার মধ্যস্থতা করবেন এবং ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ শান্তি-সন্ধির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন, তখন বেগিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি নিজেই মিসরে যাবেন।

পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয় যে, বেগিনের আগমনের প্রস্তুতিকে সামনে রেখে আজরা ওয়াইজম্যানই মিসর আসবেন। ডঃ মোস্তফা খলীল লক্ষ্য করলেন, এই সফরে ওয়াইজম্যান তার সাক্ষাৎকে এড়িয়ে সরাসরি আসোয়ানে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চলে গেলেন। উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপের জন্য কায়রোতে থামলেন না।

এরপর মোস্তফা খলীল প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছ থেকে ডাক পেলেন– জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য। বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে আসোয়ান জলাধারের পিছনে অবস্থিত অবকাশ কেন্দ্রে। এ ছিল প্রেসিডেন্টের সাথে ওয়াইজম্যানের বৈঠকের পর। উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের সামনে তার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা পেশ করা। কিন্তু বড় বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল এই যে প্রেসিডেন্ট সাদাতের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ছিল এই তিনটি বিষয়ের সমষ্টি ঃ

প্রথমত, নীলের পানি ইসরাইলে পৌঁছানোর বিষয় (যে বিষয়টিকে মোস্তফা খলীল ভেবেছিলেন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে)।

দ্বিতীয়ত, ইসরাইলকে তেল সরবরাহের বিষয় (যে বিষয়ে মোস্তফা খলীল এখনও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন)।

তৃতীয়ত, অপ্রত্যাশিত এক সাম্প্রতিক বিষয়। তা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সাদাত "আরব লীগ" বাতিল করে তার স্থলে 'আরব জাতিপুঞ্জ' প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন।

ডক্টর মোস্তফা খলীল ভাবলেন অবকাশ কেন্দ্রে একা গিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে ওয়াইজম্যানের সফর সম্পর্কে জেনে নেওয়া ভাল হবে। কারণ ওয়াইজম্যান তার সাথে সাক্ষাৎ না করে কেবল আসোয়ানে এসেই চলে গেছেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তরে বললেন– ওয়াইজম্যান গুরুত্বপূর্ণ যেটা নিয়ে এসেছেন তা হচ্ছে– তার ভাষায় "আপনি এবার বেগিনকে দেখবেন প্রতিবারের থেকে ভিন্ন এক ব্যক্তি।" স্বাগতভাবে মোস্তফা খলীল জিজ্ঞাসা করলেন– "কিসের বেলায় ভিন্ন, প্রেসিডেন্ট ? প্রেসিডেন্ট সাদাত উত্তর দিলেন যে, ওয়াইজম্যান তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে যে, "বেগিনকে অন্য এক ব্যক্তি হিসাবে পাবেন যে সব কিছুতে সমঝোতা করতে প্রস্তুত।"

মোস্তফা খলীল এর বেশি প্রেসিডেন্টের সাথে বাকবিতণ্ডা করতে চাইলেন না। বরং পরদিন সকালে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ বৈঠক পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলেন। সে রাত্রে মোস্তফা খলীল ওই পরিকল্পনা সম্পর্কে আরো বেশি বিস্তারিত জানতে পারলেন, যেটিকে প্রেসিডেন্ট জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি এটাও জানতে পেরেছেন যে, ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকও প্রেসিডেন্টকে তার মত পরিবর্তনের জন্য বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন।

পরদিন সকালে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে প্রেসিডেন্ট সাদাত তার যা কিছু ছিল পেশ করলেন। তিনি পানি ও পেট্রোলিয়ামের বিষয়ে ফিরে আসলেন এবং আরব লীগ বাতিল করার বিষয়ে বেশ বিস্তারিত কথাবার্তা বলেন। এরমধ্যে একথাও বলেন যে, এতে (আরব লীগ দিয়ে) কোন ফায়দা হয়নি, এটা থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। অন্যান্য দেশ যদি তা আঁকড়ে থাকতে চায়, তাহলে মিসর থেকে দূরে থেকে যেন তা নিয়ে থাকে। (পরে জানা যায়, এ প্রস্তাবটি এসেছে মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল থেকে, যাতে ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যে জায়গা করে নিতে পারে)।

॥ ৫ ॥

রোনাল্ড রিগান

"আনোয়ার সাদাত আমাকে ব্লাঙ্ক চেক দিয়েছে।"

—নেসেটে লাঞ্চের সময় প্রেসিডেন্ট কার্টার বেগিনকে একথা বলেন

প্রেসিডেন্ট সাদাত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে তার কথা শেষ করার পর বৈঠকে এক গভীর নিরবতা নেমে আসে। মোস্তফা খলীল দেখলেন যে, দায়িত্বের আবেদনে তার কথা বলা দরকার, না হয় সময় হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি কথা বলার জন্য হাত ওঠালেন এবং প্রেসিডেন্ট সাদাতকে লক্ষ্য করে বললেন–

"মাননীয় প্রেসিডেন্ট সব সময় আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ মতামত স্পষ্ট করে বলাকে গ্রহণ করে থাকেন। আমি যেদিন থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঘনিষ্ঠতায় এসেছি সেদিন থেকেই স্পষ্ট করে নিজের মত প্রকাশে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমি আমার সীমা জানি। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমার মত প্রকাশ করে থাকি। মহামান্য প্রেসিডেন্ট সকল বিষয়ে আরও উঁচুতে ও দূরবর্তী পরিসরে দেখতে পান এবং সম্যক অবহিত আছেন। কোন বিষয় যদি আমার মন স্পর্শ করতে না পারে সেক্ষেত্রে আমি আমার মত পাল্টাতে সব সময় প্রস্তুত থাকি, যদি দেখি যে অন্য মতটি বেশি সঠিক। আমরা এ বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে এর আগেও আলোচনা করেছি। আমি মহামান্যকে বলেছি যে, আমি আপনার অবস্থানকে একটি প্রতীক ও আশা হিসাবে হেফাজত করতে চাই। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপনার কাছে সত্য কথা বলা। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি এই সিদ্ধান্ত আমার মতে না পড়ে তবুও বিষয়টি আপনারই এখতিয়ারে। যে কোন অবস্থায় ব্যক্তি পরিবর্তন করা সহজ ব্যাপার।"

এছিল মোস্তফা খলীলের ইস্তফা দেওয়ার ইঙ্গিত। বৈঠকের উত্তেজনা বেড়ে গেল। মোস্তফা খলীল তার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি তুলে ধরার জন্য বিস্তারিত বলে গেলেন। তিনি পানির বিষয়টি দিয়ে শুরু করেন এবং পূর্বের যুক্তি-প্রমানগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। এরপর তেলের বিষয়ে গিয়ে ইসরাইলী জ্বালানিমন্ত্রী মুদাঈ'র সাথে যে কথা হয় তা বিস্তারিতভাবে বলেন। এরপর তিনি আরব লীগ বাতিলের বিষয়ে উপনীত হন। তিনি বলেন, "মিসর এটাকে একা বাতিলের অধিকার রাখে না। সে পারে নিজেকে তা থেকে গুটিয়ে নিয়ে আসতে। যদি প্রেসিডেন্ট– যতদূর তার কথা থেকে বুঝেছেন–

আরব লীগের পরিবর্তে "আরব জাতিপুঞ্জ" গঠন করতে চান, এটা তার অধিকার আছে। এটা হতে পারে। কিন্তু এজন্য আরব লীগ বাতিলের আবশ্যক নেই। তাছাড়া কোনভাবে আরব লীগের অস্তিত্ব থাকাটা ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিয়ম-কানুন পরিবর্তনশীল। আজ যা প্রত্যাখ্যাত হয়, কাল তাই গৃহীত হয়।"

প্রেসিডেন্ট সাদাতের অবয়বে টেনশনের ভার বেড়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে, যখন তার মনে হল যে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই মোস্তফা খলীলের বক্তব্যকে সমর্থন করছে।

প্রেসিডেন্ট সাদাত আবেগ অনুভূতিকে বশে রেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন– তিনি যা শুনলেন তা ভেবে দেখবেন। এই বলে তিনি বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। (এ দিন কার্যত মোস্তফা খলীলের মন্ত্রিপরিষদের শেষ বৈঠক। কারণ, এরপর ১০ মে ১৯৭৯ তারিখে প্রেসিডেন্ট সাদাত তাকে জানান যে, অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির নাজুকতা দেখে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাস্তবিকই তিনি ১৪ মে ১৯৭৯ তারিখে এই মন্ত্রিসভা গঠন করে ফেলেন।)

৭ মার্চ ১৯৭৯ তারিখে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার মিসরে পৌঁছেন এবং প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত তার জন্য রেলপথে আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি সফরের ব্যবস্থা করেন। কায়রো থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় যাবার পথে রেল স্টেশনগুলোর প্লাটফরমে তার অভ্যর্থনায় বিপুল গনসমাবেশের আহ্বান জানান। নিক্সনের সাথে যা করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। ভেবেছিলেন, মিসরে কার্টারের জনপ্রিয়তার পরিমাণ দেখে তার ভোট যুদ্ধে জেতার সুযোগ বেড়ে যাবে।

বিপুল অভ্যর্থনার পালা শেষে যখন মা'সূরার অবকাশ কেন্দ্রে আলোচনার সময় এল তখন প্রেসিডেন্ট সাদাত কার্টারকে Carte blanche অর্থাৎ অবাধ ক্ষমতা দিয়ে দিতে প্রস্তুত, যাতে তিনি যেভাবে খুশি বেগিনের সাথে একটা সমাধানে পৌঁছতে পারেন। এতে তার কাজে সাফল্যের নিশ্চয়তা থাকবে। আর এ "Carte balance" ভাষ্যটি ব্যবহার করেছেন প্রেসিডেন্ট কার্টার, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যান্স ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজনেস্কি প্রত্যেকেই এটা বোঝাতে যে প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রেসিডেন্ট কার্টারকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন।

১০ মার্চ প্রেসিডেন্ট কার্টার ইসরাইলে পৌঁছেন। বেগিনের কোন তাড়া ছিল না। যখন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মিসর ও ইসরাইলের মধ্যকার সমস্ত ঝুলন্ত বিষয়ে তার অবস্থানকে নাড়া দিতে চাইলেন তখন বেগিন কাঁধ দুলিয়ে প্রেসিডেন্ট কার্টারকে বলেন– তিনি তাড়াহুড়ার তো কিছু দেখছেন না। ইসরাইলে আলোচনা অনেক সময় আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ওপর জবান দরাজি পর্যন্ত গড়ায়। দেখা গেল, যখন মিসরী

পেট্রোলিয়াম ইসরাইলকে সরবরাহের বিষয়ে কথা ওঠল, কার্টার ইসরাইলী ডেলিগেশনকে সাদাতের অবস্থানের সমস্যা মূল্যায়নের জন্য আহবান জানান যে, সাদাতের সহকারীবৃন্দ, তার জনগণ এবং আরব দেশগুলো কেউই তার দৃষ্টিভঙ্গি শোনতে প্রস্তুত নয়। যখন কার্টার তার এক মন্তব্যে বলেন যে, ইসরাইলের কাছে তো সব সময় এ মর্মে আমেরিকান প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে আমেরিকা তার চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় তেল সরবরাহ করে যাবে, তখন ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরিয়েল শ্যারন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কথার জবাবে বলে ওঠেন– "আমরা ইসরাইলের তেলের চাহিদার বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দয়ার ওপর থাকতে পারি না।"

বেগিন ও তার মন্ত্রীরা এমন আত্মবিশ্বাসী লোকের মত আচরণ করছিলেন যে, আসন্ন নির্বাচনে জেতার জন্য আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ইসরাইলের মুখাপেক্ষী, সে তুলনায় মিসরের সাথে শান্তিচুক্তি করার জন্য তারা আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ততটা মুখাপেক্ষী নয়।

আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সম্মানে দেওয়া নেসেটের নৈশভোজে কার্টার বেগিনকে যা বলেন তার মূল কথা ছিল– সাদাত প্রমাণ করলেন যে, তিনি তার থেকে অনেক বেশি সৌজন্যবান। তিনি ইসরাইলের সাথে একটি চুক্তিতে পৌছার জন্য সাদা পাতা "Carte balnche" দিয়ে দিয়েছেন।

উইলিয়াম কাউন্ট বলেন– এই মুহূর্তে বেগিন বুঝতে পারলেন যে, পুরো বিষয়টি এখন তার হাতে চলে এসেছে। কারণ কার্টার এখন প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছেন যে, শর্ত যাই হোক বেগিনের সাথে চুক্তি করতে পারবেন, একই সময় কার্টারেরও একটি চুক্তির প্রয়োজন যাতে তার উদ্দেশ্য সফল হয় এবং আবার নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

কার্টার আবার ইসরাইল থেকে মিসর গেলেন। কায়রো বিমানবন্দরেই তিনি প্রেসিডেন্ট সাদাতকে জানালেন, যা তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী মনে করেন। তিনি তারপর বিষয়টি মেনে নেওয়া বা সামর্থের বাইরে মনে করলে তা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি তার ওপর ছেড়ে দেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাতের চিন্তা এতদূর পৌছেনি যে, তার ওপর কি আরোপ করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে চিন্তা করার পর তিনি প্রেসিডেন্ট কার্টারকে তার সম্মতি জানিয়ে বলেন যে, "এসব কিছুকে অনুমোদন করছেন কেবল তার জন্য– বেগিনের জন্য নয়।" উভয়ে বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্টের বিশ্রামাগারে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আল্-কুদ্সে মেনাহেম বেগিনের সাথে লাইন লাগাতে বলেন। প্রেসিডেন্ট কার্টার তাকে প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট সাদাতের সম্মতির কথা জানান। এরপর টেলিফোনের

রিসিভার সাদাতকে দেন তিনি টেলিভিশনের ক্যামরা আর রেডিওর মাইক্রোফোন-গুলোর সামনে বেগিনকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান। মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে পূর্ণ শান্তিচুক্তির পথ উন্মুক্ত হলো।

২৬ মার্চ, ১৯৭৯ তারিখে ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সাউদার্ন পার্কে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল।

মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর জিমি কার্টারের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে সফল হয়নি। ১৯৮০ সালের নির্বাচনে তিনি হলিউডের এক পুরনো অভিনেতা– রোনাল্ড রিগানের কাছে পরাজিত হন।

প্রেসিডেন্ট সাদাত তখন সব কিছুতেই ক্ষীণ হৃদয় ও হতবল হয়ে পড়েন। তাকে আবারো নতুন করে শুরু করতে হবে। শুরু করেছিলেন নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সাথে এরপর চেষ্টা চালান ফোর্ড ও কিসিঞ্জারের সাথে। এরপর তার তৃতীয় অভিজ্ঞতা ছিল কার্টার ও ভ্যান্সের সাথে।

তিনি তার যা কিছু ছিল, বরং তার চেয়েও বেশি উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনজন প্রেসিডেন্টকেই তাদের দ্বিতীয় মেয়াদে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাহায্য হিসাবে। আশা ছিল তাদের কেউ দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হলে এই অবদানের কিছু বিনিময় লাভ করবেন। কিন্তু হায়! তিনজনই হেরে গেলেন। এদিকে তিনি তো মিসর ও ইসরাইলের একলা চুক্তি নিয়ে আসমান-জমীনের মাঝখানে ঝুলে আছেন। আরেকটি চুক্তিরও একই অবস্থা। দুটো চুক্তিই ফিলিস্তিনীদের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে বাস্তবায়নের অযোগ্য।

তিনি এসব কিছুর মধ্য দিয়ে কেবল যে একা মিসরের রসিদই দিয়ে দিলেন তা নয়, বরং গোটা আরবের কুপনটাও দিয়ে দিলেন বটে। এর প্রথমটি হচ্ছে মিসর ও শামের মধ্যকার সেই স্থল সেতুবন্ধন যাকে বলা হয় ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব বিরাট কৌশলগত কোণ। এই অঞ্চলটি হচ্ছে অভিযাত্রীদের চির লালায়িত লক্ষ্যবস্তু এবং জাতীয়তাবাদীদের স্বপ্নভূমি।

এরপর তিনি (সাদাত) ইরান ও সেখানকার ইসলামী বিপ্লবের ভাবমূর্তি নষ্ট করার রাজনীতিকে সহযোগিতা দিয়েছেন। তার সাথে শত্রুতা সৃষ্টির বালখিল্যতার পরিচয় দেন যখন সিংহাসনচ্যুত ইরানের শাহ্‌কে মিসরে থাকার অনুমতি দেন। তিনি আমেরিকান বাহিনীকে তাদের পণবন্দীদেরকে আমেরিকান দূতাবাস থেকে উদ্ধারের অপারেশনে ব্যবহারের জন্য 'ক্বেনা' ঘাঁটি ব্যবহারে অনুমতি দেন। এই ব্যর্থ অপারেশন 'ডেজার্ট ওয়ান' নামে পরিচিত। এ কারণে মিসর দালালীর অভিযোগের সাথে ব্যর্থতার কলঙ্কেরও ভার বহন করে।

এর চেয়ে বড় কথা তিনি ইরাক ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্যও উস্কে দেন, এভাবে গোটা এ অঞ্চলের শক্তিক্ষয় হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে দারিদ্র্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

পরিশেষে তিনি এত কিছু করেও নিজের আরাধ্য বস্তু বা তার অংশ বিশেষ লাভ করতে পারেননি। যা লাভ করলেন তা হচ্ছে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে একলা একটি সন্ধি। আর এটাই তো ইসরাইল তার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে কামনা করে আসছিল। সে যে কোন বড় সশস্ত্র সংঘর্ষ বা ব্যাপক কোন রাজনৈতিক সংঘাতের পরপরই এই দাবী পুনরাবৃত্তি করে আসছিল। সে এই দাবী করে আসছে প্রকাশ্যে, গোপনে– যে কোন পন্থায়– যে কোন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে।

হয়তো লেবাননের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দৃশ্যপটগুলো সেই হতাশা ও বিপর্যয়েরই ব্যঞ্জনা যা সৃষ্টি হয়েছে আরব বিশ্বের মালা ছিঁড়ে যাবার পর থেকে, যখন শক্তির ভারসাম্য থেকে মিসর বের হয়ে যাওয়া সূক্ষ্ম ভারসাম্যে বিপর্যয় দেখা দেয়।

১৯৮১ সালের বসন্তের শেষ লগ্নে প্রেসিডেন্ট সাদাত আবারও হোয়াইট হাউসে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান।

রোনাল্ড রিগানের অবস্থা দেখে প্রেসিডেন্ট সাদাত স্বস্তি পাননি। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি অনুভব করলেন যে, লোকটি তো মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাবলী থেকে বহুদূরে আছেন। তিনি মিসরী প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় যা বলতে হবে তা তার হাতে ধরা একটি লিখিত কাগজ থেকে পড়ে পড়ে বলছেন!

রিগান গুরুত্বপূর্ণ যা বলেন, তা হচ্ছে– "শান্তির শত্রুরা মিসরে ইসরাইলের সাথে করা সন্ধির মোকাবিলা করতে তৎপর রয়েছে। এটা শান্তির জন্য যতটুকু বিপজ্জনক ততটুকুই প্রেসিডেন্ট সাদাতের জন্যও বিপজ্জনক। ইসলামী চরমপন্থীরা মিসরের জন্য ততটুকুই বিপজ্জনক যতটুকু তারা ইরানে বিপদ নিশ্চিত করেছিল।"

সম্ভবত প্রেসিডেন্ট সাদাত অনুভব করেছিলেন যে তার হোস্ট প্রেসিডেন্ট রিগানের কথায় তার সাথে ইরানের মুহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহ্লভীর অপ্রত্যাশিত তুলনার ইঙ্গিত রয়েছে। সম্ভবত তার মনে জেগে ছিল যে তিনি নিজের ও অন্যান্যদের জন্য এ প্রমাণ করে ছাড়বেন যে, তিনি মুহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহলভী থেকে ভিন্ন ধাতুর তৈরি।"

প্রেসিডেন্ট সাদাত মিসরে ফিরে এলেন আর ক্রুদ্ধ শরতের প্রলয়ঙ্করী ঝড় জড়ো হচ্ছিল। ঠিকই ১৯৮১ এর সেপ্টেম্বর মাসের আগমনের সাথে মিসরের ওপর সেই ক্রুদ্ধ শরতের ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল।

ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট সাদাত সিদ্ধান্ত নিলেন ক্রুদ্ধ শরতকে রুখতেই হবে। সহসাই নির্দেশ জারী করলেন ১৯৮১ এর সেপ্টেম্বরের সেই বিখ্যাত গ্রেফতার অভিযান। এই

গ্রেফতারি অভিযান মিসরের সকল শক্তিকেই শামিল করায় কাউকে বাদ দেওয়া হল না।

কিন্তু তার কর্তৃত্ব থেকে ক্রোধের ঝড় ছিল বেশি শক্তিশালী। ভাগ্যও চরম রহস্যের খেলায় মেতে ওঠল। দেখা গেল, যেই সেনাবাহিনীকে তিনি ক্ষমতায় আরোহনের (১৯৭০–৭১) প্রথম প্রহর থেকে তার বিরুদ্ধে অভ্যুথানের ভয় করে আসছিলেন.... । যেই সেনাবাহিনী ১৯৭৩ এর ৬ অক্টোবর নদী পার হওয়ায় সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছিল .... । যেই সামরিক বাহিনী ১৯৭৭ এর ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি তার কারফিউ অর্ডার বাস্তবায়ন করেছিল... সেই একই বাহিনীর অবস্থান থেকে– তার একজন ব্যক্তি থেকে বেরিয়ে আসল সেই ঘাতক বুলেটের ব্রাশফায়ার মঞ্চে তার অবস্থানের দিকে– ১৯৮১ এর ৬ অক্টোবর সামরিক প্রদর্শনীর সময়।

তিনি চেয়েছিলেন ১৯৭৩ হোক শেষ সামরিক যুদ্ধ।

তার আশাই পূর্ণ হলো, ১৯৭৩ এর অক্টোবর– আজকের এ মুহূর্ত পর্যন্ত— শেষ যুদ্ধই। তবে তিনি চাননি যে ১৯৮১ সালের অক্টোবরই হোক শেষ সামরিক প্রদর্শনী। কিন্তু তার এ চাওয়া বাস্তবায়িত হয়নি, ১৯৮১ এর অক্টোবর– এখনও পর্যন্ত– শেষ প্রদর্শনী!

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

৬ অক্টোবর ১৯৮১। সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের সময় একজন সৈনিক গুলি করল প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে। তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন। শেষ হলো একটি অধ্যায়।

তিনি এমন এক সময় ইন্তেকাল করলেন যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন হলিউডের প্রাক্তন অভিনেতা রোনাল্ড রিগান, যিনি মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে কোন খবরই রাখতেন না। সাদাতের সাথে তার বৈঠকে দেখলেন তিনি কয়েকটি লিখিত পাতা আবৃত্তি করে যাচ্ছেন মাত্র। প্রতিপক্ষ প্রেসিডেন্ট হিসাবে বৈঠকে এটাই যেন তার দায়িত্ব। তিনি ইরানের রেজা শাহ্ পাহ্লভীর সাথে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন, যেটা আনোয়ার সাদাতের আদৌ কাম্য ছিল না।

মধ্যপাচ্যের পরিস্থিতি নতুন মোড় নিল। ফিলিস্তিনীরা নিজেরাই ইসরাইলীদের সাথে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক আলোচনার বসতে চাইল। কিন্তু প্রথমদিকে ইসরাইল পিএলওকে আলোচক হিসাবে গ্রহণ করতে চায়নি। এমনকি এ সময় আমেরিকান কোন কূটনীতিক যেন ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও)-এর সাথে কোন সরকারী বৈঠক বা যোগাযোগ না করেন এ ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্রের গোপন নিষেধাজ্ঞা ছিল। বিশেষ করে ওয়ারেন ক্রিস্টোফার স্বাক্ষরিত পত্রাবলী সে তথ্যই বহন করছে।

আলোচনার প্রেক্ষাপট তৈরিতে ইরানী বিপ্লবের একটি বিরাট অবদান ছিল। কারণ এ বিপ্লব পিএলও'র জন্য আসমানী সাহায্যের মতই ছিল। বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলোতে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর ঘনিষ্ট সহযোগী কয়েকজন তরুণ নেতার সাথে পিএলও'র পূর্ব যোগাযোগ ছিল। এদের মধ্যে ইব্রাহীম ইয়াযদী যিনি বিপ্লবের পর উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, মোস্তফা শামরান, যিনি বিপ্লবের পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন এবং সাদেক কুতুবজাদেহ্ যিনি বিপ্লবোত্তর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ পান— এঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব তরুণ বিপ্লবীরা শিয়া অধ্যুষিত দক্ষিণ লেবাননের আমেল পাহাড়ে অবস্থিত শিবিরে ট্রেনিং দিয়েছিলেন।

এদিকে ইরানের শাহ্ মিসরী প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের মধ্যস্থতায় পিএলও'র সাথে সম্পর্ক রেখে যাচ্ছিলেন। মিসর-ইসরাইল লিয়াজোঁ চুক্তির পর পিএলও'র মন জয় করার জন্য ইরানের "শাহেনশাহ্" রেজা পাহ্লভী তাঁর গোপন বাহিনী 'সাফাক'-এর পরিচালক নেআমাতুল্লাহ্ নাসেরির মাধ্যমে ২৫ মিলিয়ন ডলারের

সাহায্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার ভাষায় এ ছিল একজন মুসলমান হিসাবে আল্-কুদ্সের অবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে ফিলিস্তিন ইস্যুতে অবদান রাখার প্রচেষ্টা।

তবে পাঁচ মিলিয়নের পর সম্ভবত আর কোন অর্থ লেনদেন হয়নি।

যাহোক, ইরানী বিপ্লবে পিএলও মর্টারসহ বিভিন্ন প্রয়োজনী অস্ত্র দিয়ে বিপ্লবী কমাণ্ডকে সাহায্য করেছিল এবং ইসরাইলীরা যে শাহের পক্ষে কাজ করছে তাও তুলে ধরা হয়েছে ইরানী জনগণের কাছে। তাছাড়া আল্-কুদ্স ইস্যু বিপ্লবের অন্যতম প্রণোধন দায়ী শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

এজন্যই বিপ্লবের পর ইসরাইলী দূতাবাসের জন্য নির্ধারিত জায়গা পিএলওকে দেওয়া হয়েছে এবং পিএলওকে সাহায্যের জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছে।

এদিকে আনোয়ার সাদাত ও আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ইরানী বিপ্লবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় মিসরের সাথে ইরানের সম্পর্কের অবনতি হয় এবং রাজতন্ত্রী আরবদের সাথেও সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে।

এ সময় ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে ইরানী ছাত্ররা আমেরিকান এ্যাম্বেসীতে আগুন লাগানোর সময় প্রাপ্ত কিছু পত্র পিএলও'র দুমুখী ভূমিকাকে সনাক্ত করে। বিপ্লবের পর ইরানের নেতৃবৃন্দের নিকট ফিলিস্তিনীরা যেসব প্রস্তাব দেয় তা অনেকটাই অতি উৎসাহ ও ঔদ্ধত্যের পর্যায়ে পড়ে।

এরমধ্যে তারা ইরানী ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। হুরমুজ প্রণালীতে ফিলিস্তিনী কন্টিনজেন্ট মোতায়েনরও প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, এক লক্ষ ইরানী রিয়াল সমান মাসোহারায় ফিলিস্তিনের ফাতাহ্ গ্রুপের একজন উচ্চ পর্যায়ের নেতা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করছে।

ইমাম খোমেনী ছাত্রদের অভিযোগ শুনে তাদেরকে উত্তেজিত না হয়ে সহিষ্ণুতার সাথে কাজ করতে বলেন। কিন্তু পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত যখন কোম শহরে গিয়ে ইমাম খোমেনীকে এ প্রস্তাব দেন যে, আমেরিকান দূতাবাসের জিম্মিদেরকে পিএলও'র হাতে সোপর্দ করা হোক। এতে আমেরিকা থেকে পিএলও'র প্রতি স্বীকৃতি আদায় করা যাবে। তখন ইমাম খোমেনী তা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন– "এরা ইরানের খরচে বড় শয়তান (যুক্তরাষ্ট্র)-এর সাথে সওদা করতে চায়।"

বিপ্লবোত্তর ইরানী সরকারের সাথে পিএলও'র অম্লমধুর সম্পর্ক চলতে থাকে।

শান্তির খোঁজে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিত্রতা

ক্রেমলিনের উত্তরাধিকার নিয়ে যখন পতনপর রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ মশগুল তখন পিএলও শান্তির নিয়ামক হিসাবে আলোচনা ও সংলাপকে সশস্ত্র বিদ্রোহের ওপর স্থান দিতে শুরু করেছে।

"The Establishment" নামে আমেরিকার যে ইহুদী প্রতিষ্ঠান তা যুক্তরাষ্ট্রের 'পলেসি মেকার' না হলেও পলেসি মেকিং-এর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ওখানকার ইহুদীরা "যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী পদ দখল করলেও প্রথম যোগসূত্র তাদের ইসরাইলের সাথেই। 'স্টিফেন কোহেন' তাদের পালের গোদা। আনোয়ার সাদাত এ সব নসিহত করার আগেই পিএলও আমেরিকা প্রবাসী আরব শিক্ষক ও অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্রুনো ক্রাইসকি মারফত তা আগেই অবগত ছিলেন।

যাহোক ড. এসাম সারতাবী পিএলও'র প্রতিনিধি হিসাবে ইসরাইলীদের মধ্যকার নমনীয় ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে লেবাননভিত্তিক শান্তি আলোচনা ব্যাপক আলোচনার ঝড় উঠায়। তখনকার পিএলও'র মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনায় বসা।

আলেকজাণ্ডার হেগ

আমরা জানি ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি অনুসারে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হলো, নেসেট আইন পাশ করল যে, আল্-কুদ্স ইসরাইলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে চিরদিনের জন্য এর রাজধানী থাকবে। এদিকে ইরাক ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। পিএলও ইরাকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হলো। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসলো প্রেসিডেন্ট রিগান, তার সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হলো আলেকজাণ্ডার হেগ। আর এ দুজনই ছিলেন ইসরাইলের পরম মিত্র। এরপর ইরাকে ওজিরাক পরমাণু কেন্দ্রে ইসরাইলীরা আঘাত হানলো। সব কিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি হয়ে ওঠল দারুণ ঘোলাটে।

১৯৮২ এর বসন্ত যেন যুদ্ধের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। যে কোন সময় যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। কিন্তু কোথায় ? এটি ফিলিস্তিনের শক্ত ঘাঁটি লেবাননেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে আলোচনার বিষয়টি উঠে আসে। ৮২ এর মাঝামাঝি স্টিফেন কোহেন হঠাৎ কায়রো এসে ফিলিস্তিনী দূত সাঈদ কামালকে জানান যে, যে কোন সময় শ্যারন বৈরুত আক্রমণ করে ফিলিস্তিনীদের বের করে দেবে। এতে তারা জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত নং ২৪২ মেনে নিতে বাধ্য হবে।

এ খবরটি প্রেসিডেন্ট মোবারক লেবাননে পিএলওকে জানিয়ে দেন। ৩ জুন ১৯৮২। ব্রিটেনে ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত শ্লোমো আরজুভ আবু নেদাল গ্রুপের গুলিতে নিহত হন। পরদিন ইসরাইলী বাহিনী লেবানন অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু বৈরুতের কাছে এসে ফিলিস্তিনী প্রতিরক্ষা বেস্টনীর কারণে আর অগ্রসর হলো না।

জর্জ শুল্‌জ

ইসরাইলীরা লেবাননে ৪০ কি.মি.এর বেশী গভীরে ঢোকার ব্যাপারে আলেকজাণ্ডার হেগ নিজ থেকে সম্মতি দেওয়ায় ডুনাল্ড রিগানসহ প্রেসিডেন্ট রিগানের উপদেষ্টারা ক্ষুব্ধ হন এবং হেগ পদত্যাগ করেন। এবার এলেন জর্জ শুল্‌জ।

এক পর্যায়ে পিএলও লেবানন থেকে বের হয়ে যেতে রাজি হলো। যুক্তরাষ্ট্র ৩০০০ মাইল দূরে তিউনিসিয়ায় তাদের আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করল।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮২। বোমা বিস্ফোরণে লেবাননের নয়া প্রেসিডেন্ট বশীর জামীল নিহত হন। ১৭ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক সিবরা ও শাতিলা হত্যাযজ্ঞ ঘটে। লেবানন রক্তের সমুদ্রে ভেসে যায়।

তিউনিসিয়া

তিউনিসিয়ায় পিএলও'র অবস্থা যেন ওপেন হার্ট সার্জারী করা এক জীবন্মৃত রোগী যাকে যুদ্ধের ময়দানে অপারেশন করে ধমনীগুলোও বদলে ফেলা হয়েছে। বৈরুত জনসমাগমে সরগরম শহর আর তিউনিসিয়া এক শান্ত নগরী, এখানে পিএলও হচ্ছে এক অপ্রত্যাশিত মেহমান। এখানে তিউনিসিয়া কর্তৃপক্ষ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সন্ধানী দৃষ্টি তাদের প্রতি মুহূর্ত অনুসরণ করে যাচ্ছে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যেই অন্ধকারে আলোর পথ বের করতে হবে পিএলও-কে।

এ সময় (১৯৮২) এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এসাম সারতাবী সাহসী উচ্চারণ করলেন– পিএলও-কে এখনই সরকারীভাবে ইসরাইলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে দ্বিধাহীন ও অনড়। কিন্তু চেয়ারম্যান আরাফাত তাকে সভা থেকে বের করে দিতে বাধ্য হলেন। কারণ প্রকাশ্যে একথা বলার সময় তখনও আসেনি।

তবে ১৯৮৩ ফেব্রুয়ারিতেই ফিলিস্তিন জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত হয় যে, ইসরাইলের সাথে যোগাযোগ করা হবে। এতে আবু জেহাদ, আবু ইয়াদ ও আবু মাযেন-এর মত নেতারাও তা মেনে নেন।

১০ এপ্রিল ১৯৮৩, ড. সারতাবী আততায়ীর হাতে নিহত হন। সম্ভবত আবু নেদাল গ্রুপই তাকে হত্যা করে। কারণ তারা শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধী। এ ঘটনার একটি বেদনাবোধ সবাইকে আড়ষ্ট করে রাখে।

আস্তে আস্তে পিএলও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুল্জ-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করল। মন্ত্রী হওয়ার আগে ইনি 'পিকথল' কোম্পানির প্রধান নির্বাহী ছিলেন। এ কোম্পানির সাথে আরব বিশ্বের বড় কণ্ট্রাক্টরী কোম্পানি কনসোলিডেটেড এর সাথে বড় ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। এর প্রধান নির্বাহী ছিলেন 'সাব্বাগ'। সাব্বাগ যোগাযোগ শুরু করতে যাচ্ছিলেন— এ সময় জর্জ শুল্জ তাকে এক পত্রে জানান– পরবর্তী নির্দেশনার আগ পর্যন্ত পুরনো বন্ধুত্ব ফ্রিজড্ থাকবে।

এ সময় রাশিয়াকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পেতে চেয়েছিল পিএলও। কিন্তু রাশিয়া তখন আফগানিস্তান, ইরান আর যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়েই ব্যস্ত। এরপর যখন গরবাচভ ক্ষমতাসীন হলেন তখন তিনি পিএলওকে পরামর্শ দিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রকে ধরুন। তারা সবচাইতে বেশি সমাধান দিতে সক্ষম।

এ সময় সৌদী বাদশাহ্ ফাহ্দ রাবাতের বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা করলেন– এ অঞ্চলের সকলে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার রাখে, অর্থাৎ ২৪২ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

এ দিকে শুল্জ সিআইএ-এর মাধ্যমে অবগত হলেন যে, তিউনিসিয়ায় এখন সিরীয় চাপমুক্ত আরাফাত শান্তির কথাই ভাবছেন।

ইসরাইলীদের মনভাব তখন লেবাননের সাথে অবিলম্বে চুক্তি করা। অন্য কথা তারা ভাবতে চাচ্ছে না। অগত্যা শুল্জের প্রাণান্তকর চেষ্টায় ১৯৮৩-এর মে মাসে ইসরাইল লেবানন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই এর অসাড়তা প্রমাণিত হলো এবং জর্জ শুল্জ মূল ইস্যু "ফিলিস্তিন"কে নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন।

প্রেসিডেন্ট রিগান ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির আলোকেই চিন্তা-ভাবনা করলেন। তিনি ২৪২ নং সিদ্ধান্ত অনুসারে ফিলিস্তিনকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা ভাবলেন।

পরবর্তীতে ১৯৮২-এর ৬ ফেব্রুয়ারিতে 'ফাস'–ঘোষণায় সকল আরব দেশ ৩৩৮ ও ২৪২ নং সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন এবং আল্-কুদ্সকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বিষয়টি নিয়ে মরক্কোর বাদশাহ হাসান প্রেসিডেন্ট রিগানের সাথে কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পিএলওকে আলোচকের মর্যাদায় আনা হলো না। তার পক্ষে জর্ডানের বাদশাহ্ হুসেইন কথা বললেন।

বাদশাহ্ হুসেইন খুবই আশাবাদী মন নিয়ে দৃঢ়তার সাথে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু পিএলও-এর সাথে ১৯৭০–৭১ এর সংঘর্ষের কথা মনে রেখে একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। এ সময় উভয় পক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মিসরকেই উপযুক্ত পেল। যুক্তরাষ্ট্রও মিসরকেই চায়। এভাবে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক সকল আরব রাষ্ট্রের কাছে গ্রহণীয় একজন মধ্যস্থতাকারী হিসাবে অগ্রসর হলেন।

১৯৮৫ সাল জুড়ে বাদশাহ্ হুসেইন আলোচনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি জর্ডান ও ফিলিস্তিনের পক্ষে আলোচনা করতে সক্ষম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রিগান, প্রেসিডেন্ট মোবারক ও বাদশাহ্ হুসেইন যখন হোয়াইট হাউসে একসাথে বসলেন, তখন হঠাৎ করেই প্রেসিডেন্ট মোবারক বলে উঠলেন যে, "ফিলিস্তিনীদের ছাড়া এবং তাদের সম্মতি ছাড়া কোন আরব রাষ্ট্রের পক্ষেই ফিলিস্তিন ভূমি নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।" প্রেসিডেন্ট রিগান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুল্জ এতে বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন। রিগান বলেই ফেললেন যে, "মিসরকে আলোয় টেনে আনতে চাইলাম, এখন হঠাৎ করেই আপনি আরাফাতের ঘোড়ায় চাপলেন। এটা তো আরব দেশসমূহে আপনার মুখ উজ্জ্বল করার চেষ্টা মাত্র।" এই বাকবিতণ্ডার অবস্থাতেই উভয় প্রস্থান করলেন।

বাদশাহ হুসেইন আর আলোচনায় হালে পানি পেলেন না।

এদিকে ইসরাইলের রাজনৈতিক অবস্থা তখন এক অদ্ভুত রূপ ধরে। লেবার পার্টি ও নিকুদ পার্টি এই সমঝোতায় উপনীত হয় যে, দু'বছর করে উভয় পার্টি থেকে প্রধানমন্ত্রী হবে। অপরজন তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে থাকবেন। শিমন পেরেজ ও পরে আইজ্যাক শামির প্রধানমন্ত্রী হবেন।

১৯৮৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাদশাহ হুসেইন প্রকাশ্যে ইয়াসির আরাফাতের সাথে তার বিরোধের কথা জানান এবং একাই ইসরাইলের সাথে শান্তি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন। ১০ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখে বাদশাহ হুসেইন লণ্ডনে শিমন পেরেজ-এর সাথে সাক্ষাত করেন। ততদিনে শিমন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শামিরের অধীনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে গেছেন।

শুল্‌জ তখন সোভিয়েতে ইউনিয়নের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড শেভার্নাদজের সাথে হেলসিঙ্কিতে বৈঠকে বসা নিয়ে ব্যস্ত। এ সময় পেরেজ-এর পত্র নিয়ে লণ্ডন থেকে তার সহকারী বেলিন এলেন শুল্‌জ-এর কাছে। এতে তিনি বলেন যে ঐতিহাসিক অগ্রগতি হয়েছে; বাদশাহ হুসেইন-এর সাথে তার অনেক বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন ডাকার বিষয়ে উভয়ে একমত হয়েছেন।

এ ছিল কিছুটা উচ্ছ্বাস মিশ্রিত রিপোর্ট। প্রকৃতপক্ষে আইজ্যাক শামির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পক্ষে ছিলেন না। তার ভয় ছিল, এতে বিশ্বসমাজ আলোচনায় পিএলওকে টেনে আনতে চাইবে এবং ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। এতে জাতিসংঘ ও সোভিয়েত অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আঁতুড় ঘরেই নাভিশ্বাস উঠেছে। এসময় ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তারিখে মিখাইল গরবাচভ প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানকে ওয়াশিংটনে বোঝাতে সক্ষম হন যে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আসলে সবাই শ্রোতা-দর্শক হিসাবে বসে থাকবেন। মূলত পেরেজ বাদশাহ হুসেইন-এর পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী নমনীয় হলেন। শুল্‌জ বাদশাহ হুসেইনের দেওয়া তারিখে লণ্ডন গেলেন। কিন্তু বাদশাহ এবার বলছেন যে, এই চুক্তিকে শামির কখনও পালন করবে না। সে এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়বে না। শামিরকে তিনি চেনেন, তার সাথে এক কক্ষে বসতেও তিনি ভয় পান। শুল্‌জ বিরক্ত হয়ে ফিরে যান।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা নতুন মোড় নিল। ইরাক-ইরান যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ও বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহৃত হতে লাগল। এ ছিল এই প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের অবসানের পূর্ব মুহূর্ত। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রে ইরানকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছিল। ইরান-কাণ্ট্রা কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ায় এ সব তথ্য বের হয়ে আসে।

ইন্তেফাদাহ

যখন কোন জাতির বেঁচে থাকার আর কোন পথ থাকে না তখন সে হাতের কাছে যা পায় তা দিয়েই মরণপণ প্রচেষ্টা চালায়। ফিলিস্তিন জাতি নিজেদের ভাগ্যের রাস্তা নিজেরাই খুলতে লাগল। ফিলিস্তিনের শিশু-কিশোরেরা কুড়িয়ে নিল রাস্তার পাথর, আর তা-ই ছুড়ে মারতে লাগল ইসরাইলী বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে। শুরু হলো এক নতুন ধরনের অভ্যুত্থান— ইন্তেফাদাহ। এই যুদ্ধে কোন অস্ত্রের চালান বা প্রস্তুতির দরকার নেই। কেবল রাস্তা থেকে ঢিলা হাতে নিয়ে মেরে দেওয়া। ব্যস।

এই নতুন ধরনের লড়াইয়ে ইসরাইলের আণবিক অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি কোন কাজে আসল না। অল্প কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে এই ইন্তেফাদাহ সারা দুনিয়াকে ঝাঁকুনি দিল।

ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাবিন প্রথমে বলেছিলেন– "তোমাদের হাড্ডি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব।" কিন্তু পরবর্তীতে বলেছিলেন– "ইসরাইলী সেনাবাহিনীকে তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র শহরের রাস্তায় এমন পুলিশী শক্তিতে পরিণত করতে পারি না যে কেবল বাচ্চাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াবে।"

১৯৮৮ সালের গোড়ার দিকেই ইসরাইলী শীর্ষ নেতারা বুঝতে পারল যে, ইন্তেফাদাহকে সামরিক শক্তি দিয়ে দমানো যাবে না, এর জন্য চাই একটি রাজনৈতিক সমাধান।

এদিকে ১৯৮৮ সালে তিউনিসিয়ায় এক সম্মেলনে ফিলিস্তিনী নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসেন। ২৪২ নং সিদ্ধান্তের আলোকেই আলোচনা চলে। মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল (প্রধান সম্পাদক, আল্ আহ্রাম ও এ গ্রন্থের লেখক) তাদের পরামর্শ দেন, ১৯৪৭ সালে গৃহীত ১৯১ নং জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুসারে অগ্রসর হওয়া উচিত। এতে বিভক্তি রেখার কথা রয়েছে এরপর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে ফিলিস্তিন জাতির সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়নের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যায়।

জর্জ বুশ

৮ নভেম্বর, ১৯৮৮। জর্জ বুশ আমেরিকান নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন। এ সময় সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ইয়াসির আরাফাত ভাষণ দেয়ার কথা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দিতে রাজি না হওয়ায় সভাটি জাতিসংঘের জেনেভাস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

ফিলিস্তিন আন্দোলনের নতুন অধ্যায়

১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৮, ইয়াসির আরাফাত জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন। এ ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য স্টকহোমে The establishment-এর ইহুদী কর্তাদের সাথে আগেই ঠিক হয়েছিল। সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ইয়াসির আরাফাত লিখিতভাবে জানান

যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে পিএলও'র আলোচনার পূর্বে এমর্মে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে— ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ থেকে এর নির্বাহী পরিষদ—যা ফিলিস্তিনের অস্থায়ী সরকারে পরিবর্তিত হয়েছে–এর প্রতিনিধি হিসাবে নিম্নবর্ণিত সরকারী ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

১. পিএলও আরব-ইসরাইলী সংঘাতের ব্যাপক সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে ইসরাইলের সাথে জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত নং ২৪২ ও ৩৩৮ এর ভিত্তিতে সংলাপে প্রস্তুত।

২. পিএলও ইসরাইলসহ সকল প্রতিবেশীর সাথে শান্তির সাথে বসবাস করার অঙ্গীকার করছে এবং স্বীকৃত নিরাপত্তার সীমায় শান্তিতে বসবাসের অধিকারকে সম্মান জানায়। এটাই হবে অধিকৃত ভূমিতে গণতন্ত্রী ফিলিস্তিন সরকারের আচরণ যা ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

৩. এ সংস্থা যে কোন ধরনের ব্যক্তিগত, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে নিন্দা জানাচ্ছে, এবং কখনও এ ধরনের কোন কিছুর আশ্রয় নেবে না।

স্বাক্ষর/

ইয়াসির আরাফাত

এর কিছুদিন পরেই ইয়াসির আরাফাত ফরাসী প্রেসিডেন্টের দাওয়াতে ফ্রান্সে যান এবং তাকে একজন প্রেসিডেন্টের মর্যাদায় গ্রহণ করা হয়। এখানে তিনি ফরাসী প্রেসিডেন্টকে কৃতিত্ব দেওয়ার জন্য ঘোষণা করেন যে, "ফিলিস্তিনের জাতীয় অঙ্গীকার" (যেখানে ইসরাইলকে স্বীকৃতি না দেওয়া ও ধ্বংস করার কথা আছে) এখন থেকে (Caduc) বাতিল।

তখনও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার ইয়াসির আরাফাতের নামও শোনতে রাজি নয়।

ইয়াসির আরাফাত তিউনিসিয়া ফিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে মূল্যায়নে বসলেন। অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের কথায় ফুটে ওঠেছে দোদল্যমানতা। যুক্তরাষ্ট্র যদি তার ওয়াদা রাখে এবং সত্যিসত্যিই ইসরাইলকে চাপ দেয় তাহলে কিছু অগ্রগতি হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শামির যখন দেখলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র পিএলওকে সরকারীভাবে আলোচকের মর্যাদা দিয়েছে, তখন তিনি আরেকটু আগ বাড়িয়ে বললেন স্থানীয় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে যারা ফিলিস্তিনের অন্তর্বর্তীকালীন স্বায়ত্তশাসন হাতে নেবে এবং পাঁচ বছর ফিলিস্তিন ইস্যুর পর চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে।

ইসলাম আসছে!

ইরান ইরাকের কাছে হার মানল। তবুও গাজা উপত্যকায় হামাসের তৎপরতা, দক্ষিণ লেবাননে হেজবুল্লাহর অপারেশন এবং মিসরে ধর্মীয় উপদলগুলোর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা দেখে নিউইয়র্ক ও তেলআবিবে গুঞ্জন ওঠে যে ইসলাম আসছে! ইসলামের পক্ষ থেকে বিপদ ধেয়ে আসছে।

কাজেই সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন।

এ সময় (৯ নভেম্বর ১৯৮৯) বার্লিন প্রাচীরের পতন হয়। একটি পরিবর্তনের হাওয়া লাগে সবখানে। স্নায়ু যুদ্ধের দিন শেষ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর এখন মোড়ল একজনই— যুক্তরাষ্ট্র।

৩০ মে ১৯৯০ ফিলিস্তিন লিবারেশন মুভমেন্টস আত্মঘাতি হামলা করে- তেল আবীরের উপকূলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জানায় যে, সে ফিলিস্তিনীদের সাথে সংলাপ পেকআপ করে রাখল। কারণ ঐ হামলাকারীরা পিএলও-এরই একটি পক্ষ।

হতাশার বাতাস বইতে শুরু করল।

হঠাৎ করেই ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে বসল। দ্বিতীয় উপসাগরীয় সঙ্কট দেখা দিল।

ইয়াসির আরাফাত এই নতুন সঙ্কটে ফিলিস্তিনী ভূমিকা রাখতে চাইলেন। কিন্তু বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ফিলিস্তিনীদের সেই ওজন ছিল না যে, প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বিশেষ করে বাহ্যত মনে হচ্ছিল যে, ইয়াসির আরাফাত বুঝিবা ইরাকের পক্ষে কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে অনেকেই তাঁকে নিজের ইচ্ছার চেয়ে বেশি দূর নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যাহোক সে সময় ইয়াসির আরাফাতের কতগুলো বাস্তব পয়েন্ট ছিল ঃ

১. ইয়াসির আরাফাত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, এত ছাড় দেওয়ার পর "ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলন" নামক একটি অংশের হামলার কারণে যুক্তরাষ্ট্র পিএলও'র সাথে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিল।

২. উপসাগরীয় দেশগুলো তেল অস্ত্র ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর প্রভাব ফেলার যে আশা করেছিল বাস্তবে তার কিছুই হলো না।

৩. সাদ্দাম ফিলিস্তিন ইস্যুকে তার পক্ষে কাজে লাগাতে চেয়েছেন এবং মিসর ও সোভিয়েত সরে যাবার পর ফিলিস্তিনীদের জন্য ইরাকের মত শক্তিধর দেশের সমর্থন প্রয়োজন ছিল।

৪. ফিলিস্তিনীরা মনে করে যে শান্তি আলোচনা একটি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়, এ ক্ষেত্রে ইরাক হুমকি দেয় যে ইসরাইলের অর্ধেক উড়িয়ে দিতে সক্ষম, তা ফিলিস্তিনীদের মনে একটি প্রণোধান জাগায়।

৫. প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম বাগদাদ শীর্ষ সম্মেলনে পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– "আল্লাহর কসম, আবু আম্মার! ইরাক আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে রাখবেনা যে আপনি ঐ সব শেখদের কাছে ট্রে হাতে নিয়ে সদকা চেয়ে বেড়াবেন।" আসলেই সাদ্দাম হোসেন ১৯৯০ প্রথমার্ধেই পিএলওকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিলেন।

যাহোক, আমেরিকা এমন আভাস দিয়েছিল যে ইরাক যদি কুয়েত আক্রমণ করে, এতে আমেরিকা নাক গলাবে না। কারণ তাদের সাথে উপসাগরীয় দেশসমূহের কোন নিরাপত্তা চুক্তি নেই।

কিন্তু যেদিন (২ আগস্ট ১৯৯০) ইরাকী বাহিনী কুয়েতে প্রবেশ করে সেদিনই প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ইরাকের সামরিক শক্তি শেষ করে দেবেন, প্রয়োজন হলে ইরাককে ধ্বংস করে হলেও।

আমেরিকান মিত্র বাহিনীর কাছে হার মেনে ইরাক কুয়েত ছাড়ে। জান-মালের ক্ষতির কোন ইয়ত্তা রইল না।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১-তে দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ থেমে গেল। পিএলও এখন পরাজিত শক্তি হিসাবে পরিগণিত হলো।

মাদ্রিদ সম্মেলন

৬ মার্চ ১৯৯১, বিজয় ভাষণে জর্জ বললেন তিনি মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট চূড়ান্তভাবে সমাধান করতে চান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস্ বেকারকে তিনি ঐ এলাকায় পাঠাচ্ছেন। বেকার তখন পরপর ৮ বার উপসাগরীয় অঞ্চল সফর করেন। মাদ্রিদে সম্মেলন ডাকা হয়। সেখানে বাদশাহ হুসেইন-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল সেখানে যান।

পিএলওকে প্রত্যাখ্যান করায় ইয়াসির আরাফাত প্রায়ই বলতেন– ওরা আমাকে বাদ দিল, তবে হুসেইনকে কেন গ্রহণ করল। ভুল করলে তো উভয়ই একই ভুল করেছিলাম। (উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের পক্ষ নিয়েছিলাম)।

পিএলও'র বাইরে থেকে ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধি দলে নেওয়ায় ইয়াসির আরাফাত ক্ষুব্ধ হলেও ঐ প্রতিনিধিদের তিনিই আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন– মাদ্রিদ সম্মেলনে যাবার খরচা হিসাবে।

এ প্রতিনিধি দলে ফিলিস্তিনের যে সব স্টার যোগ দেন তা ছিল জেম্স বেকারের আবিষ্কার। এর মধ্যে ছিলেন– ড. হায়দার আব্দুশ শাফি, ড. হানান আশরাবী ও ফয়সাল আল্-হুসেইনী। পরবর্তীতে এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। (যদিও সম্মেলনের আগের দিন মিসরী উস্তাদগণ তাদেরকে হোটেলে বসে ইসরাইলীদের সাথে সংলাপের ট্রেনিং দিয়েছিলেন)।

শামির নিজেই সম্মেলনে ইসরাইলী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনীদের স্বাতন্ত্র্য কোনভাবেই মেনে নেবেন না পণ করলেও হায়দার আব্দুশ শাফির যোগ্যতা ও হানান আশরাবী ডেপুটেশনের মুখপাত্র হিসাবে বিস্ময়কর যোগ্যতার মাধ্যমে মাদ্রিদ সম্মেলনের শেষের দিকে জর্ডাণ ও ফিলিস্তিনের আলাদা দুটো প্রতিনিধি দলের অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। গোটা বিশ্ব দেখল ইসরাইল একই কক্ষে আরবদের সাথে আলোচনায় বসেছে।

এরপর বহুপক্ষীয় সম্মেলন বসল ওয়াশিংটনে। কিন্তু এ সম্মেলনের খবর ওয়াশিংটনে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল নরওয়ের রাজধানী ওসলো-তে।

এদিকে ইসরাইলের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন রাবিন। তিনি বলেন—হায়েম ওয়াইজম্যান ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। বেন গোরিয়ন সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর আমার দায়িত্ব হচ্ছে এ রাষ্ট্রকে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণীয় করে তোলা।

বহুপাক্ষিক আলোচনায় তেমন অগ্রগতি ছিল না। এর মধ্যে ওসলোভিত্তিক গোপন চ্যানেলে আলোচনা এগুতে থাকে ধীর লয়ে। ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে রাবিন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। পেরেজ হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৯৯৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন বিল ক্লিনটন এবং তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন ওয়ারেন ক্রিস্টোফার।

এ সময় ইয়াসির আরাফাত নতুন আশায় বুক বাঁধেন। তিনি গাজা ও আরিহা (আরিজোনা) ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে কায়রোতে আলোচনার সূত্রপাত করল। সাইরাস ভ্যান্স ১৯৭৭ সালে গাজার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আনোয়ার সাদাতকে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে প্রত্যাখ্যাত বিষয়টিই হয়ে উঠেছে পরম কাম্য।

এ সময় ১৯৯২ এর ডিসেম্বরে ইসরাইলী বাহিনী ৪১৫ জন ইসলামপন্থী নেতাকে পাকড়াও করে দক্ষিণ লেবাননের "মুরজ আয-যুহুর"-এ নির্বাসন দেয়, যাতে প্রচণ্ড শীত আর ক্ষুৎপিপাসায় মারা পড়ে। তাদের উদ্ধারের ব্যাপারেই বেশির ভাগ আলোচনা হয় মোবারক ও আরাফাতের মধ্যে। তবে মূল বৈঠকের আগে মোবারকের সাথে আসল কথা পেড়েছেন আরাফাত। তা হচ্ছে গাজা।

গাজা ছেড়ে দিতে ইসরাইলও প্রস্তুত। সকল আলোচনা গাজ্জার দিকেই ইঙ্গিত করছে। ওসলো চ্যানেলে অগ্রগতি হয়েছে। পঞ্চম বৈঠকে ৮ মে ১৯৯৩-তে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমঝোতা নীতিমালার খসড়া প্রণীত হয়। গাজা উপত্যকায় সম্ভাব্য উন্নয়নের পরিকল্পনাটিও এর সাথে সংযুক্ত হয়।

১৭ আগস্ট ১৯৯৩ শিমন পেরেজ নিজেই স্টকহোম গিয়ে নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোলেস্ট-এর সাথে দেখা করেন। সেখান থেকেই নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াসির

আরাফাতের সাথে তিউনিসিয়ায় যোগাযোগ করেন এবং এক নাগাড়ে ৭ ঘন্টা আলোচনা করে একটি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করতে সক্ষম হন।

পেরেজ সেদিনই চুক্তি স্বাক্ষর করতে চান। তিনি ওসলোর পথে পাড়ি জমান এবং হোলেস্টের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের মূখ্য আলোচক আবু 'আলাকে ওসলোতে আসার জন্য অনুরোধ জানান।

আরাফাত আবু আলাকে তাৎক্ষণিকভাবে ওসলোতে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন এবং মিসর থেকে মিসরী রাষ্ট্রদূত তাহের শাশকে চুক্তির খসড়া চেক করে দেওয়ার জন্য ওসলোতে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য সাঈদ কামালকে অনুরোধ করেন (সাঈদ কামাল মিসরে ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রদূত)।

তাহের শাশ ওসলো থেকে আরাফাতকে Ok রিপোর্ট দেন।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। সকল পক্ষ আপাতত এটা গোপন রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করলেন। পর্যায়ক্রমে বিশ্বসংবাদ সংস্থাগুলো এর খবর প্রকাশ করে যাবেন এবং প্রকাশ্য ঘোষণা আসবে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের মুখ থেকে মাসখানেক পর।

কিন্তু পেরেজ আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবাক করে দিয়ে চুক্তিটি দেখান এবং সাংবাদিকদের সামনে তা প্রকাশ করে দেন। তিনি নিজেকে শান্তিবাদী হিসাবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন। রাবিন এদিকে তার সুযোগ সন্ধানী স্বভাবের অংশ এবং নোবেল পুরস্কার পাওয়ার লোভ বলে উল্লেখ করেন।

ইয়াসির আরাফাত সান-ফ্রান্সিসকোতে এই নাটকীয় ঘোষণায় অবাক হয়ে যান। কারণ হঠাৎ করে এই সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ায় তাকে এখন সবদিক সামলাতে হিমশিম খেতে হবে।

বাদশাহ ফাহ্দ এতে বিব্রতবোধ করেন। কারণ ফাসে তিনি ফাহ্দ পরিকল্পনা হিসাবে যা আরব শীর্ষ সম্মেলনে পেশ করেছিলেন তা তার ধারণায় এর চেয়েও বেশি ভাল ছিল।

আরাফাত প্রেসিডেন্ট মোবারকের মাধ্যমে বাদশাহ ফাহ্দকে রাজি করাতে চান কিন্তু কুয়েত-ইরাক যুদ্ধের সময় আরাফাত যে মন্তব্য করেন (সৌদি এয়ারবেস থেকে ইসরাইলী জঙ্গী বিমান ইরাকে আক্রমণ করেছে)। তার জন্য তিনি আরাফাতকে ক্ষমা করবেন না। যাহোক আমেরিকার মধ্যস্থতায় এবং মোবারকের চেষ্টায় এ চুক্তি তারা মেনে নেয়।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেয আল্ আসাদ চুক্তির কথা শোনে চোখ কপালে উঠালেন এবং মোবারক ও ক্লিনটনের যোগাযোগেও এ চুক্তি গ্রহণ করলেন না।

জর্ডানের বাদশাহ ভাবতেই পারেননি, তাকে ছাড়া এমন চুক্তি হতে পারে। তবে তিনি ধীরে ধীরে তা মেনে নেন। এ ছাড়া আর করার কি ছিল।

আরাফাত বাগদাদে গেলে সভাস্থলে হঠাৎ করেই ইরাকী প্রেসিডেন্ট তাকে 'উম্মুল মাআরেক' মালা গলায় পরিয়ে দেন। এ ছাড়া ইরানের আর দেওয়ার মত কিছুই নেই।

যাহোক এ চুক্তির ফায়দা যেন ইসরাইলের ঘরে যায়। সেজন্য আমেরিকার সব চেষ্টা ছিল। তারা ১৯৪৮ থেকে আরবদের অর্থনৈতিক অবরোধ ইসরাইল থেকে তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান।

চুক্তির পর আরাফাত দেখলেন এর ফায়দা যদি ফিলিস্তিনীরা না পায় তাহলে এ হবে এক ব্যর্থ চুক্তি। আর ফায়দা পেতে হলে অর্থের দরকার। এ সময় ফিলিস্তিনী মিলিনিয়ার "হাসীব আব্বাস" ১০০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

আমেরিকাও সাহায্যের অঙ্ক ঘোষণা করতে লাগলো। আরাফাত আশ্বস্ত হলেন।

যাহোক ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩। হোয়াইট হাউসে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। দুপাশে ইয়াসির আরাফাত ও রাবিন, মাঝখানে ক্লিনটন। ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রথমবারের মত ইয়াসির আরাফাত একজন ইহুদীর সাথে হাত মেলালেন। যদিও রাবিন হাত বাড়াতে ইতস্ততঃ করেছিলেন, ক্যামেরার সামনে।

চুক্তির পর দেখা গেল যে গাজ্জার ক্রসিং পয়েন্ট বা প্যাসেজগুলো ইসরাইলী বাহিনীর দখলে। আরাফাত চান ইসরাইলী বাহিনী প্র্যাসেজ, বড়রাস্তা ইত্যাদি থেকে সরে যাক। না হয় কোন ভিজিটর এসে দেখবে স্বায়ত্তশাসন বলতে কিছুই পরিবর্তন হয়নি।

কিন্তু ইসরাইল তার নিরাপত্তার দোহাই পেড়ে স্থান ত্যাগ করল না। এ নিয়ে রাবিন ও আরাফাতের মধ্যে বাকযুদ্ধ চলে।

১৯৯৩-এর ডিসেম্বরে কায়রোতে রাবিন ও আরাফাত বৈঠকে বসেন। মোবারকসহ বসার আগে, কেবল তারা দুজন একটি কক্ষে আলোচনার বসেন। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ অবস্থানে অনড় থাকেন। রাবিন কখনই আরাফাতকে প্রেসিডেন্টের মত মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন না।

প্রেসিডেন্ট মোবারকসহ বৈঠকে বসার পরপরই রাবিন প্রস্তাব রাখেন যে, তাকে দশ দিন সময় দেওয়া হোক, এরমধ্যে আবার কায়রোতে বসা যেতে পারে। এর মধ্যে গ্রুপ ডিসকাশন চলতে পারে।

দশ দিন পর আর বৈঠক বসল না। বৈঠক বসল প্যারিসে। অনেকটা গোপনে। ইসরাইলী জেনারেল আমনূন শাহাক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অপরদিকে ফিলিস্তিনীর নেতৃত্বে আছেন ড. নবীশ শা'দ।

এখানে আরিহাতে ফিলিস্তিনী পতাকা উত্তোলন, সাগর পাড়ের ২০ কি. মি. কৃষি জমি, ফিলিস্তিনী পাসর্পোট, আরিহার আয়তন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হয়। কিন্তু

চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। তবে এ সময় স্পেনে ইউনেস্কোর একটি সম্মেলনে শিমন পেরেজ ও ইয়াসির আরাফাত উপস্থিত হলে আলোচনার সুযোগ হয়, কিন্তু সময়ের স্বল্পতা ও আয়োজকদের তড়িঘড়ির কারণে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। এদিকে জেনেভায় ক্লিনটনের সাথে আসাদের বৈঠকও নতুন কোন বার্তা বয়ে আনতে পারেনি।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে সুইজারল্যান্ডের "দাভোস" শহরে একটি অর্থনৈতিক সম্মেলনে আরাফাত ও পেরেজ মুখোমুখি হন। তারা একটি চুক্তির প্রায় কাছাকাছি উপনীত হন। এ সময় পেরেজ প্রধানমন্ত্রী রাবিনের অনুমোদনের জন্য ফোন করেন। কিন্তু রাবিন বলেন এসব বিষয় জেনারেল স্টাফদের কাছে উত্থাপন করতে হবে। কাজেই সে রাত্রে আর চুক্তি হলো না।

প্রকৃতপক্ষে ইসরাইলী সেনাবাহিনীই নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনার আসল কর্তৃপক্ষ। তারা ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ তারিখে এক পত্রে জানান গাজ্জা ও আরিহাতে ফিলিস্তিনী পুলিশের সংখ্যা কত হরে অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা ও প্রকৃতি কি হবে।

ইতোমধ্যে মিসরের মাধ্যমে ইসরাইলীরা চুক্তিতে স্বাক্ষরের অভিপ্রায় জানায়। কারণ কিছু কিছু শর্তে সমঝোতা সৃষ্টি হয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের আলাদা আলাদা চেকপোস্ট হবে, ক্রসিং পয়েন্টে খুবই কম সংখ্যক ইসরাইলী সৈন্য থাকবে যা পর্যটকদের নজরে পড়বে না।

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪। পেরেজ ও আরাফাত উভয় কায়রোতে এসে প্রেসিডেন্ট মোবারকের উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ ক্ষেত্রে মিসরী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমর মূসা" ও প্রেসিডেন্ট মোবারকের ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এ চুক্তির প্রতি ফিলিস্তিনীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। কেউ কেউ হতাশাও ব্যক্ত করেছেন। আবার কেউ বলেছেন– দেখা যাক কতটুকু কার্যকর হয়।

আল-হারাম

এর মধ্যে ঘটে গেল এক দুঃখজনক ঘটনা। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ তারিখটি ছিল রমযানের ১৫ তারিখ। খলীল শহরে ইব্‌রাহীমী হারাম শরীফের আঙ্গিনায় ফজরের নামাজে শতশত মুসল্লি যখন সেজ্‌দারত তখনই ইসরাইলী উপনিবেশ "কারায়াত আবাবা" থেকে ৩৫ বছরের এক ইহুদী ডাক্তার নির্বিচারে মেশিনগানের গুলি চালায়। এতে ৪২ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন আহত হয়ে পড়ে থাকে।

আধঘণ্টার মধ্যেই ওয়ারেন ক্রিস্টোকার ও ক্লিনটন বিষয়টি অবগত হন। শান্তি প্রক্রিয়ার পিঠে এ যে এক ছুরিকাঘাত তা তারা উপলব্ধি করেন। আরব নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এদিকে তিউনিসিয়া

পিএলও'র কাছে এ সংবাদ একটি বজ্রাঘাতের মত অনুভূত হলো। ইয়াসির আরাফাত এটাকে ইসরাইলী সেনাবাহিনীর কৌশল বলেই ধরে নিলেন। যাতে প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায়।

ওয়ারেন ক্রিস্টোফার আরাফাতকে ফোন করে বলেন– "আপনি, স্যার, এ জাতির নেতা তার প্রতীক ও তার মাথার ওপর পতাকাস্বরূপ। আপনি তাদের শান্ত থাকতে বলুন।" ক্লিনটনও একই ভাষায় তাকে সম্বোধন করেন। এ ধরনের প্রশংসামূলক ভাষা ছিল কোন আমেরিকান নেতার মুখে এই প্রথম।

সারা বিশ্বকে এ ঘটনা নাড়া দেয়। এর জের ধরে ফিলিস্তিনী অঞ্চলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনীর দাবী ওঠে। মিসর নিরাপত্তা পরিষদে তিনটি দাবী করে ঃ (১) নিরপেক্ষ তদন্ত, (২) ইসরাইলী কলোনী গড়ার কাজ বন্ধ রাখা, (৩) যে ইহুদী বস্তিগুলো থেকে অস্ত্র বের করে নিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু আমেরিকার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল যেন এ ধরনে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়।

ঘটনায় মোড় ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য ইসরাইলী গোয়েন্দা বাহিনী "মুসাফ" সাইয়্যেদাতুন-নাজাত চার্চে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং ৪জনকে হত্যা করে। কিন্তু এটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা ইহুদীদের কাণ্ড।

ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিউনিসিয়ায় ইয়াসির আরাফাতের সাথে যোগযোগ করে গোল্ডেস্টেন এর ঘটনাটিকে নিন্দা জানানোর কথা অবহিত করতে চান কিন্তু আরাফাত তার সাথে কথা বলেননি।

এদিকে নিরাপত্তা পরিষদ ইহুদী বস্তি স্থাপনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই ইসরাইল চাইল এটা মধ্যস্থতা করতে। তাই গ্রীক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফাঁসোয়া মিতেরাঁ আরাফাতের সাথে যোগাযোগ করল। কিন্তু এসবই ছিল নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ঠেকানো। ১৮ মার্চ ১৯৯৪। অর্থাৎ হারামে ইব্রাহীমীর ঘটনার প্রায় একমাস পর নিরাপত্তা পরিষদ ৯০৪ নং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। কিছু সংরক্ষণসহ জাতিসংঘে আমেরিকার দূত মেডেলিন অলব্রাইটও তা মেনে নিলেন। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ওসলো ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য আবার দ্বিপাক্ষিক (ফিলিস্তিন-ইসরাইলী) আলোচনা শুরু হলো।

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খলীলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করার বিষয়টি ইসরাইল মেনে নেয় এবং গাজ্জা থেকে ইসরাইলী বাহিনী প্রত্যাহার করারও প্রতিশ্রুতি দেয়।

আত্মঘাতি হামলা

১২ এপ্রিল হামাস এক আত্মঘাতি হামলায় একটি ইসরাইলী বাস বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। বহু লোক হতাহত হয়। পাঁচ দিন যায় আরেকটি সুইসাইড আক্রমণ চালিয়ে 'হামাস" ঘোষণা দেয় যে এভাবে তারা 'খলীলের' ঘটনার প্রতিশোধ নিতে থাকবে এবং যে ঘটনায় হতাহতের সংখ্যার সমান হওয়া পর্যন্ত এক কাজ চালিয়ে যাবে।

এ ঘটনায় রাবিন শান্তি আলোচনায় আরো দ্রুত অগ্রসর হলেন। তবে জর্ডানের বাদশাহকে ওয়ারেন ক্রিস্টোফার সতর্ক করে দিলেন যে, আম্মানে হামাসের কার্যক্রম বন্ধ না হলে জর্ডানেও সন্ত্রাসীদের তালিকাভূক্তি করা হবে। তাই বাদশাহ ইসরাইলের সাথে চুক্তি করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেন।

৪ মে ১৯৯৪। কায়রোতে আরাফাত ও রাবিনের মধ্যে চুক্তি হলো। প্রেসিডেন্ট মোবারকের জন্মদিন হওয়ায় এ অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ করতে চাইলেন। ক্রিস্টোফার ও কেজিরিভও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। কিন্তু ৯ ফেব্রুয়ারির চুক্তির মত এখানেও "আরিহা"-এর সীমানা মানচিত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় আরাফাত মানচিত্রে স্বাক্ষর করেননি। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি পরে আলোচনা হওয়া সাপেক্ষে তিনি স্বাক্ষর করেন।

এ চুক্তির পর আরাফাতের মন খারাপ থাকে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের অনুষ্ঠানে যান। সেখানে জোহান্সবার্গের বড় মসজিদে এক ভাষণে আরাফাত বলেন– আল্ কুদ্সই হচ্ছে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী— চাই যে কোন চুক্তিই হয়ে থাকুক। তার এ জ্বালাময়ী ভাষণ রেকর্ড করে ইসরাইলীরা প্রপাগাণ্ডা চালায়। সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, ফিলিস্তিনীদের নিয়ত ভাল না।

চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য আরাফাতকে তার দলবলসহ তিউনিসিয়া ছেড়ে গাজাতে আসতে হবে। কিন্তু এখানে আসলে দুটো অসুবিধা হতে পারে।

১. ইসরাইল তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলবে।

২. স্বায়ত্তশাসিত এলাকা পরিচালনায় অর্থ সঙ্কটে পড়তে হবে, এক সময় হামাসের সাথে দ্বন্দ্বও লেগে যেতে পারে।

তবুও ইসরাইলও চায় আরাফাত তার নিজ ভূমিতে ফিরে আসুক। এতে ইন্তেফাদাহ-এর ল্যাটা চুকে যাবে এবং নিজেদের দৈনন্দিন কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এ ছিল ওপরে রহমত ভেতরে আযাব।

অনেক ভেবে চিন্তে ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ইসরাইলীরা পথে এমন কঠোর বিধি ব্যবস্থা রাখল যা অপমানকর এবং জটিল।

যেমন– যারা ফিলিস্তিনে ঢুকবে তাদের তালিকা আগেই ইসরাইল থেকে অনুমোদন করে নিতে হবে– ইত্যাদি।

প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে সঙ্গে নিয়ে আরাফাত ফিলিস্তিনে প্রবেশ করলেন। মোবারক সীমান্তে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে চলে যায়।

আরাফাত এখন নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি। সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থের। আমেরিকা ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ইতোপূর্বে ২.১ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এমনকি খোদ ইসরাইলও ফিলিস্তিন স্বায়ত্তশাসনের জন্য চাঁদা তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল। বাস্তবে আরবদের অর্থসহ প্রতিশ্রুত অর্থের ১.৪ অংশ পাওয়া যায়। অর্থ খরচের ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাগুলোর অনেক নিয়ন্ত্রণ ছিল।

আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিন সফরে বাধার সম্মুখীন হতে লাগলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভূট্টোকেও ফিলিস্তিনে ঢোকতে দেওয়া হলো না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরকেও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিল জায়নিস্টরা। ইহুদীদের এ ধরনের আচরণ শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

এদিকে দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের পর New Ordede সম্পর্কে উপসাগরীয় রাজন্যবর্গ উৎসাহী হয়ে উঠল। রাজনৈতিক জটিলতাকে একপাশে রেখে অর্থনৈতিক যোগাযোগ কায়েম করে সারা বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করার কাজে একে অপরের আগে এগিয়ে যেতে প্রতিযোগিতা শুরু করল। আরবের অর্থ যেন রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে কোন অবদান রাখার প্রয়োজনই মনে করল না।

এদিকে আরবের রোশিল্ড নামে খ্যাত হাসীব সাব্বাগ আর্থিক সহযোগিতা দিলেন না। কারণ আরাফাত তার মেয়েকে বলেছিলেন– মোসাদের কথা ধরে তোমার পিতা হোয়াইট হাউসের নীতিমালা ঘোষণা অনুষ্ঠানে আসেননি। এটাকে সাব্বাগ অপমান মনে করেন। আরব ব্যাঙ্ক প্রধান আব্দুল মজীদ শোমানও সাহায্যের হাত বাড়ালেন না। এদিক বাদশাহ হুসেইনের সাথে আরাফাতের ভাল যাচ্ছিল না। তবে তিনি কিছুটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন এবং হামাসের সাথেও যেন গৃহবিবাদ না হয় সে ব্যাপারে তাদের সাথে সমঝোতা করে নেন।

মিসরকে ছাড়াই ইসরাইল-জর্ডান চুক্তি হয়ে গেল। ১৯৯৫ সাল এলো। পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণ বিরোধী চুক্তি নবায়নের সময় এলো। মিসর এ সুযোগে প্রশ্ন তুললো যে, কারো কাছে এ অস্ত্র আছে আর কারও কাছে নেই– এ অবস্থায় এই অসম চুক্তি হতে পারে না। বিশেষ করে ইসরাইলের কাছে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে অথচ এই ইসরাইলীরা ১৯৮১ সালে ইরাকী পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র ওজিরাক-কে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

১৯৯৫ এর মার্চে যখন ইসরাইল কর্তৃপক্ষ আল্-কুদ্সের সকল পথে তালা লাগিয়ে দিল তখন আবার এ অঞ্চল উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

এদিকে প্রেসিডেন্টে ক্লিনটন দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়ার জন্য আগাম ওয়াদা করল যে, আল্-কুদ্সে ইসরাইলস্থ আমেরিকান দূতাবাস স্থানান্তর করা হবে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা বরং বলল আজ এখনই আল্ কুদ্সে দূতাবাস স্থানান্তর করা হোক।

এ সময় একটি ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন শুরু হলো। ইতোমধ্যে 'নেসেটে' আরব প্রতিনিধিগণ রাবিনকে হুমকি দিল যে, তাহলে তারা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবেন। রাবিনের সরকার পতন হতে পারে ভেবে রাবিন আল্-কুদ্সকে অধিগ্রহণের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে নেয়। ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনও আর হলো না।

এ ক্ষেত্রে সেই পুরনো সূত্র ফিরে এলো– "পবিত্র ও নিষিদ্ধ– পবিত্রভূমির আবেগেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।"

৪ নভেম্বর ১৯৯৫। আইজ্যাক রাবিন এক ইহুদীর (ঈগাল আমীর) হাতে নিহত হন। এ যেন ইহুদী পুত্রের হাতে ইহুদী বাপের মরণ!

২৯ মে ১৯৯৬। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। শিমন পেরেজ-এর পরাজয়ে আরব বিশ্ব চমকে যায়, হতাশ হয়। (অবশ্য পেরেজ প্রত্যেক বারই পরাজিত হন। ৪ বার যুক্তরাষ্ট্রও হতাশ হয়।)

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন অন্য যেকোন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট থেকে ইসরাইলের বেশি ত্রাণকর্তা হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু বিল ক্লিনটন তখন মণিকা লিউনেস্কির যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে নাকানী চুবানী খাচ্ছেন। এ সময় তিনি বহির্বিশ্বে তার অভিযাত্রিক কর্মকাণ্ড দিয়ে হারানো ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এদিকে 'নেতানিয়াহু' ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। যদিও আরবরা তাকে চায়নি। তিনি নতুন প্রজন্মের প্রধানমন্ত্রী। তার সাথে পুরনো তিন জেনারেল রয়েছে– শ্যারন, মূরদোখাই ও ঈতান।

৯ জুলাই ১৯৯৬। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানান। এবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আর্থিক সাহায্যে চাইলেন না। বরং সিরিয়া ও ইরানকে শায়েস্তা করতে চাইলেন।

আরব নেতৃবৃন্দ তবুও শিক্ষা গ্রহণ করলেন না বরং তাদের অর্থ দিয়ে ইসরাইলকে সমৃদ্ধ করতে থাকল।

১৯৯৭–১৯৯৮ সাল জুড়ে ইন্তেফাদাহ আবার বেগবান হয়। এ সময় হামাসের নেতা শেখ ইয়াসীনের আপোসহীন সংগ্রামের অংশ হিসাবে আত্মঘাতি হামলা চলতে

থাকে। ইসরাইলী বাহিনীর সামনে প্রায় নিরস্ত্র ফিলিস্তিনীদের অসম যুদ্ধে এটাই হচ্ছে– তাদের মতে– মোক্ষম অস্ত্র। ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণার প্রস্তুতি নেন, কিন্তু বার বার তা আমেরিকান বিরোধিতার মুখে ব্যর্থ হয়।

নেতানিয়াহুর সরকারের পতন হয়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন এরিয়েল শ্যারন। ফিলিস্তিনের প্রতি তার কট্টর মনোভাব পূর্বপরিচিত। স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে যখন আরাফাত তার প্রশাসনকে গুছিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন এবং বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীকে সুসংহত করতে উদ্যোগ নেন, তখনই শ্যারন সরকার পশ্চিম তীরের ৭টি শহরেই ইসরাইলী বাহিনীর বর্বরোচিত হামলা শুরু করে দেয়।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ করার আগে ফিলিস্তিনী ইস্যুর একটি ফয়সালা করে ইতিহাসে নিজেকে শান্তিবাদী হিসাবে অমর করে যেতে চান, কিন্তু নির্বাচনের আগে ইহুদীদের তোষণ নীতিই বড় হয়ে ওঠে।

২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্লিনটনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলগোর-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের নায়ক প্রেসিডেন্ট বুশের পুত্র জুর্জ বুশ জুনিয়র। এই নির্বাচনের ফলাফল ঝুলে থাকে কয়েকদিন। পরবর্তীতে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা ৫-৪ ভোটে বুশের পক্ষে রায় দেন। এতে যেন যুদ্ধের দামামা আবার বেজে ওঠে।

বুশ ক্ষমতায় এসেই রণ হুঙ্কার ছাড়েন। ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি প্রকাশ্যেই ইসরাইলের পক্ষপাতিত্ব করেন। ইরাক, ইরান, সিরিয়াকে তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নেন। আরাফাত এবার সত্যিসত্যিই হতাশ হয়ে পড়েন।

এদিকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে ঘটে দুনিয়া কাঁপানো এক ঘটনা। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চু দালান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার এক আত্মঘাতি বিমান হামলায় ধূলিস্যাৎ করে দেয় একটি সংঘবদ্ধ দল।

প্রায় পাঁচ হাজার কর্মরত লোকসহ টাওয়ার দু'টি মুহূর্তের মধ্যেই মাটিতে মিশে যায়। একই দিন আরেকটি বিমান হামলা হয় খোদ পেন্টাগণের ওপর। হোয়াইট হাউসেও হামলা হওয়ার আশঙ্কায় কয়েক মিনিটের মধ্যে বুশকে বিমানে তুলে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এ হামলা যেমন অকল্পনীয় তার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর হচ্ছে, যে কৌশল এখানে অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা দেন এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। তিনি আফগানিস্তান ভিত্তিক আল্-কায়দা নেটওয়ার্ককে এর জন্য দায়ী করেন। ওসামা বিন লাদেন এই আল কায়দার নেতা। ইনি সৌদী আরবের একজন ধনকুবের। ভিন্নমতালম্বী হিসাবে তিনি দেশ ছেড়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে আসেন। তখন

যুক্তরাষ্ট্রই তাকে মদদপুষ্ট করেন। সময়ের ব্যবধানে এই ওসামা বিন লাদেনই বুশ প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।

বুশ তার পিতার মতই সন্ত্রাস নির্মূলের নামে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জোট গঠন করল। ব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি দেশও এর সাথে শরিক হয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ তখন বাধ্য হয়ে আমেরিকার যুদ্ধ পরিকল্পনাকে মেনে নেন। শুরু হয় বোমা বর্ষণ। হাজার হাজার টন বোমা ফেলে আফগানিস্তানের ভূপ্রকৃতির দৃশ্যই বদলে ফেলা হয়। মোল্লা ওমর আফগানিস্তানের সরকার প্রধান 'আমীর'।

এক সময় মোল্লা ওমর ও ওসামা বিন লাদেন পালিয়ে যান। তবে এ সময় বিভিন্ন মুসলিম দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশে লাদেনকে বীর হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়।

আফগানিস্তান পদানত হওয়ার পর সেখানে স্বেচ্ছায় প্রবাসে থাকা আফগান নেতা হামিদ কারযাই অস্থায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বাদশাহ জহির শাহ্ দীর্ঘকাল পর দেশে ফেরেন এবং ঐতিহ্যবাহী লয়া জিরগা বা গোত্রীয় প্রতিনিধি সভায় হামিদ কারযাই আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। জহির শাহ্ তাকে সমর্থন করেন।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলা ও এর জের হিসাবে যখন আফগানিস্তানে আমেরিকার অপারেশন সফল হয় তখন ইসলাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন ফিলিস্তিনীদের ওপর নতুনভাবে নির্যাতন শুরু করেন।

২০০২ সালটিতে আত্মঘাতি হামলা সামলাতে না পেরে ইসরাইল প্রথমবারের মত থেকে ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট আরাফাতের অবস্থানকালেই তার অফিস কমপ্লেক্সে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে। বিদ্যুৎ, পানি টেলিফোনের লাইন কেটে দেয়। অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে আরাফাত বসে থাকেন তাঁর অফিসেই। পরিস্থিতির এ অবনতির পিছনে প্রত্যক্ষ মদদ জোগায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ। তিনি প্রেসিডেন্ট আরাফাতকে আত্মঘাতি হামলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য দায়ী করেন। বুশ তার বক্তৃতাগুলোতে বলতে থাকেন যে, ইসরাইল নিজেকে রক্ষা করার অধিকার রাখে।

এ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের কথাও ঘোষণা করেন। উপসাগরীয় দেশগুলো প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে অপসারণের দোহাই পেড়ে ইরাকে আক্রমণের পক্ষপাতি নয়। কারণ পিতা বুশের ইরাক আক্রমণের খেসারত দিতে হচ্ছে উপসাগরীয় দেশগুলোকে। দশটি দেশের সেনাদল পুষতে হচ্ছে অতি উচ্চমূল্যে। পুত্র বুশের ইরাক আক্রমণের পর এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। খোদ মার্কিন বাহিনীর এক কর্নেল আফগানিস্তান অপারেশনের পর বুশের ইরাক আক্রমণের হুমকির প্রেক্ষিতে পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে, যুদ্ধবাজ বুশদের পিতার প্রয়োজন হয়েছিল

সাদ্দামের, পুত্র বুশের প্রয়োজন পড়েছে একজন ওসামা বিন লাদেনের।" এ মন্তব্যের পর অবশ্য তার চাকুরী চলে যায়।

রাজনৈতিক এ প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃবৃন্দের টনকনড়ে। এবার সৌদী যুবরাজ আব্দুল্লাহ একটি ফর্মূলা নিয়ে অগ্রসর হন। তিনি মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট নিরসনের জন্য একটি শান্তি প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবটি বাদশাহ্ খালেদের আমলে প্রিন্স ফাহ্দের প্রস্তাবেরই অনুরূপ। ফাহ্দ প্রস্তাব আরব সম্মেলনে প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে অসলো চুক্তি হলে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন যে, এই প্রস্তাবই ইতোপূর্বে আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়।

আশার কথা এই যে, প্রিন্স আব্দুল্লাহ উপস্থাপিত সৌদী প্রস্তাবকে প্রেসিডেন্ট বুশ স্বাগত জানিয়েছেন এবং আরব শীর্ষ সম্মেলনে সৌদি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ পূর্ববর্তী অবস্থানে ইসরাইল ফিরে যাবে এবং জাতিসংঘের ২৪২ ও ৩৩৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত হবে। বুশ যে ইসরাইলেরই প্রতিভু তা প্রমাণিত হয় তার ২৪ জুন ২০০২-এর ভাষণে। তিনি এই ভাষণে আরাফাতকে ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধিত্বকারী নেতা হিসাবে অস্বীকার করেন। মিসর এ ভাষণের ব্যাখ্যা দাবি করেন এবং আরাফাত নতুন নির্বাচন ঘোষণা দেন এবং আরাফাত একটি অস্থায়ী সংবিধানে স্বাক্ষর করেন যাতে গণতন্ত্র, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিধিমালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইসরাইল বলেছে যে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে ফিলিস্তিনীরাই আরাফাতকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেবে। তারা হামাসের সাথে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। কারণ হামাস ইসরাইলের অস্তিত্ব মেনে নেয়নি।

মধ্য জুলাইয়ে হামাসসহ তেরটি ইসলামী গ্রুপ একযোগে বলেছে যে, বর্তমান কট্টর ইসরাইলী সরকারের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

২৩ জুলাই গাজা ভূখণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে ৯টি শিশু ও একজন অন্যতম শীর্ষ হামাস নেতাসহ ১৫ ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে। তারা এতে এফ–১৬ বিমান ব্যবহার করে। ২৪ জুলাই জাতিসংঘে এ ঘটনার ওপর ৪ ঘন্টা বিতর্ককালে প্রায় ৩০টি দেশ ইসরাইলের এ হামলাকে অকারণ অগ্রহণযোগ্য ও অপ্রত্যাশিত বলে বর্ণনা করেন। জাতিসংঘে আরব গ্রুপের বর্তমান সভাপতি রাষ্ট্র সৌদী আরবের আহ্বানে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনও এর কড়া সমালোচনা করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এর বিরোধিতা করে। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্র আরব শিশুদের ওপর বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলাকে ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার বলে চালিয়ে দেয়।

এভাবেই প্রেসিডেন্ট বুশ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস নির্মূলের অজুহাতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে আত্মরক্ষার অধিকার বলে তাদের সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে।

নিজেও ইরাকের প্রেসিডেন্টকে উৎখাতের ঘোষণা দিয়েছে এবং নেসার গাইডে বোমা জেডি এ এস এবং টমাহক মিসাইল উৎপাদন দ্বিগুণ করেছে। আফগানিস্তানে এই অস্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং লক্ষ্যভেদী প্রমাণিত হয়েছে।

ব্রিটেন সব সময় মার্কিন পরিকল্পনার সহযাত্রী হলেও এই প্রথমবার বুশের বিরোধিতা করে বলে যে আরাফাতকে বাদ দিয়ে ফিলিস্তিনের কোন শান্তি পরিকল্পনা হতে পারে না। দৃশ্যত বুশ এ ব্যাপারে একা হয়ে গেলেও বুশ-শ্যারন জোট ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পথে বিরাট বাধা হয়েই থাকবে।

তবে যে জাতি নিজের মৃত্যুকে কবুল করে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন রাখতে চায় তাকে পদানত করা য়ায় না। বিজয় তাদের সুনিশ্চিত, এটাই ইতিহাসের আমোঘ বিধান।

ইফাবা – ২০০৩-২০০৪ – প্র/৯০৫৮ (উ)–৩২৫০